শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# শ্রীগৌরভক্ত-চরিতামৃত

## মহাপ্রভু ও তাঁর পার্ষদগণের চরিত কথা





শ্রীমদ্ভক্তিবিবুধ বোধায়ন গোস্বামী মহারাজ



শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠ
ঈশোদ্যান, শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

# গ্রন্থের উপাদান

১। শ্রীচৈতন্য ভাগবত- ............................................................ শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর
২। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত- ........................................................শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী
৩। শ্রীচৈতন্য মঙ্গল- ..............................................................শ্রীল লোচন দাস ঠাকুর
৪। শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকম্-..................................................শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামী
৫। শ্রীগৌর গণোদ্দেশ দীপিকা- ...............................................শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামী
৬। ভক্তিরত্নাকর- ....................................................................শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর
৭। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত- .........................................................শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর
৮। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য- ..........................শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর
৯। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের অনুভাষ্য- ......................................শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ
১০। শ্রীচৈতন্য ভাগবতের গৌড়ীয় ভাষ্য ও বিবৃতি - ....................শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ
১১। সরস্বতী জয়শ্রী- ...............................................................শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ
১২। গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান- ..............................................শ্রীহরিদাস দাস
১৩। শ্রীশ্রীগৌর-পার্ষদ চরিতাবলী- ........................................শ্রীভক্তিজীবন হরিজন মহারাজ
১৪। শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত- ...........................................................শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
১৫। অন্যান্য গৌড়ীয় মঠ হতে প্রকাশিত কিছু গ্রন্থ
১৬। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কীর্ত্তন
১৭। গৌড়ীয়
১৮। সজ্জনতোষণী
১৯। দৈনিক নদীয়া প্রকাশ
২০। ভাগবত ধর্ম.......................................................................শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের পত্রিকা
২১। ভক্তিপ্রমোদ বাণী বৈভব.....................................................শ্রীল ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর
২২। দিব্য পারমার্থিক রত্ন..........................................................শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# শ্রীগৌরভক্ত-চরিতামৃত

## মহাপ্রভু ও তাঁর পার্ষদগণের চরিত কথা

শ্রীধাম মায়াপুর ব্রজপত্তনস্থ আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ ও বিশ্বব্যাপী
তৎশাখা শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সমূহের
মূল প্রতিষ্ঠাতা পরমহংস-কুলচূড়ামণি নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট
জগদ্গুরু প্রভুপাদ
অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের
পরমানুকম্পিত অধস্তন শিষ্য, তথা শ্রীমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মূল
শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের
প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী পরমহংস
শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর
কর্ত্তৃক মনোনীত তদনুকম্পিত অধস্তন বর্ত্তমান মঠাচার্য্য ও সভাপতি
শ্রীমদ্ভক্তিবিবুধ বোধায়ন গোস্বামী মহারাজ
কর্ত্তৃক সম্পাদিত

শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠ
ঈশোদ্যান, শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

**প্রকাশক ঃ**
শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের পক্ষে
আদিগোপাল দাস ব্রহ্মচারী
**Email : bhagabatdharma@gmail.com**
**Mob : 9046197825**

**প্রথম সংস্করণ ঃ**
শ্রীল ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের তিরোভাব তিথি
১ অগ্রহায়ণ, ২৯ দামোদর, ১৮ নভেম্বর, ২০২১ বৃহস্পতিবার



**পৃষ্ঠপোষক ঃ**
শ্রীপাদ প্রদ্যুম্ন দাস ব্রহ্মচারী (মঠ রক্ষক, শ্রীমায়াপুর)

**প্রুফ সংশোধন ঃ**
আদিগোপাল দাস ব্রহ্মচারী, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী দাসী, সুনীতি দাস, রঙ্গনাথ দাস

**কভার ডিজাইন ঃ** গোপাল দাস

**পৃষ্ঠাসজ্জা ও অলঙ্করণে ঃ** শ্রীমদনগোপাল দাস (মানিক)

**মুদ্রণ ঃ** ডি. এন. মিত্র ল্যাব প্রাঃ লিঃ
রানাঘাট, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ

**SRI GOPINATH GAUDIYA MATH**
FOUNDING ACHARYA HIS DIVINE GRACE SRILA BHAKTI PROMODE PURI GOSWAMI THAKUR
Ishodyan, Sree Mayapur, Dist. Nadia, West Bengal, India, PIN 741313.
Regd. Under Societies Registration Act XXVI of 1961 (W.B.) and Foreign Contribution (Regulation) Act,1976 No:147060077, Nature: Religious (Others) Social
Phone : 91-3472-245307 // 245094 , Mob -9851404915 // 9046197825
www.GopinathGaudiyaMath.com



# উৎসর্গ

পরম করুণাময় জগৎগুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদের বৃহৎ মৃদঙ্গের প্রধান বাদক, শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের মূল প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী তথা নিত্যলীলা প্রবিষ্ট শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের করকমলে এই গ্রন্থখানি উৎসর্গ করছি।

# উপোদ্ঘাত

**(শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ থেকে প্রকাশিত ''শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত'' গ্রন্থে শ্রীল ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের লিখিত 'উপোদ্ঘাত' এর কিছু অংশ)**

পরম করুণাময় ভক্তবৎসল ভক্তপ্রেমবশ্য অনর্পিতচর স্বভক্তিসম্পদ্ ব্রজপ্রেমদাতা মহাবদান্য শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের প্রাণাধিকপ্রিয়তম ভক্তবৃন্দের প্রেমসেবামাধুর্য্যসমৃদ্ধ পরম মধুর চরিতামৃত আমাদের সকলেরই সর্ব্বপ্রযত্নে পুনঃ পুনঃ অনুশীলনীয় হওয়া কর্ত্তব্য, তদ্ব্যতীত আমরা ভগবদ্ভজন কাহাকে বলে, তাহা কখনই-কিছুতেই বুঝিতে সমর্থ হইব না। ভক্তচরিতামৃত আস্বাদন করিতে করিতে ভক্তকৃপাকৃষ্ট হইয়া ভক্তপদারবিন্দে নিষ্কপট প্রীত্যুদয়ে আমরা ভক্তবৎসল ভগবৎপ্রীতিভাজন হইতে পারিব, এজন্যই শাস্ত্রে ভগবৎকৃপাকে ভক্তকৃপানুগামিনী বলা হইয়াছে। শ্রীভগবান্ তাঁহার ভক্তপূজাকে নিজের পূজা হইতেও বড় বলিয়া জানাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণমুখ-নিঃসৃত 'মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা' বাক্যের অর্থ শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর এইরূপ করিয়াছেন ঃ--

''আমার ভক্তের পূজা--আমা হইতে বড়।
সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈলা দড়।।''

ভক্তপূজাকে অনাদর করিয়া গোবিন্দপূজায় যতই না কেন আদর বা আড়ম্বর প্রদর্শিত হউক, গোবিন্দ সে পূজার দিকে কখনও সামান্য দৃক্পাতও করেন না, পরন্তু তাদৃশ পূজারীকে দাম্ভিক জ্ঞানে তাহার সকল পূজা প্রত্যাখ্যানই করিয়া থাকেন। ভক্তানুগত্য ব্যতীত কোনক্রমেই ভগবৎপূজা সম্পাদিত হয় না। এজন্য শাস্ত্রে কৃষ্ণ-প্রিয়তম ভক্তশ্রেষ্ঠ গুরুপাদপদ্মের পূজাই সর্ব্বাগ্রে বিহিত হইয়াছে। কৃষ্ণ তৎপ্রিয়তম ভক্তরাজ উদ্ধবকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,--হে উদ্ধব! আমাকেই 'আচার্য্য' বলিয়া জানিবে। কখনও তাঁহাকে (আচার্য্যকে) মনুষ্য বুদ্ধিতে আবজ্ঞা বা অনাদর করিবে না, গুরুদেব সর্ব্বদেবময়। শ্রীভগবানের কৃপাশক্তিই মূর্ত্ত হইয়াছেন--মূর্ত্তি বা বিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন--গুরুরূপে। সেই গুরুকে অবজ্ঞা করিয়া ভগবৎপূজার কোনই সার্থকতা স্বীকৃত হয় না।

ভক্তবৃন্দের নিষ্কপট প্রীতিমাখা প্রাণময়ী সেবার কথা পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিতে করিতে আমাদের বজ্রতুল্য কঠিন হৃদয়ও দ্রবীভূত হইতে পারে, পূর্ব্বকৃত ভক্তিহীন নিরর্থক কর্ম্মের জন্য আমাদের হৃদয়ে প্রকৃত অনুশোচনা জাগিয়া শুদ্ধভক্তকৃপা লাভের জন্য চিত্ত উন্মুখ বা ব্যাকুল হইয়া উঠিতে পারে। ভগবদ্ভক্তগণ পরদুঃখ-দুঃখী কৃপাম্বুধি অত্যদ্ভুত ক্ষমাগুণ-সম্পন্ন, তাঁহাদের হৃদয় হিংসা-দ্বেষ-মাৎসর্য্যশূন্য পরম পবিত্র। মাদৃশ কৃষ্ণবহির্ম্মুখ-- স্বরূপ-বিস্মৃত মায়াবদ্ধ জীবাধমগণের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহারা অত্যন্ত কাতর-হৃদয়ে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে আমাদের নিত্য মঙ্গল বিধানার্থ কৃষ্ণপাদপদ্মে কাতর প্রার্থনা জানাইবেন। তখন কৃষ্ণ তাঁহার নিজজনগণের সেই কাতর প্রার্থনায় আমাদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন।--''বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়। মো হেন পামর প্রতি হবেন সদয়।।'' গৌরভক্তের বুকফাটা নিষ্কপট ক্রন্দন করুণাজলনিধি ভগবান্ সহ্য করিতে পারেন না। তাই শরণাগত ভক্তের কাতর প্রার্থনায় ভক্তবৎসল ভগবান্ শীঘ্র শীঘ্রই প্রকটলীলা আবিষ্কার করেন। ভক্তকৃপায়ই জীব ভগবৎকৃপা লাভের পরমদুর্ল্লভ সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন। এজন্য শুদ্ধভক্তচরণাশ্রয় সর্ব্বাগ্রেই বরণীয়,--

"শুদ্ধভকতচরণ-রেণু-ভজন-অনুকুল।
ভকত-সেবা, পরম সিদ্ধি, প্রেমলতিকার মূল।।"

--শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ।

সুতরাং লীলাপুরুষোত্তম শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলাপরিকরই তাঁহার শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রসুতরূপে গৌরলীলায় গৌরপরিকর। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই ব্রজে মাধুর্য্যপ্রধান ঔদার্য্যলীলা এবং ব্রজাভিন্ন নবদ্বীপে গৌরসুন্দররূপে ঔদার্য্যপ্রধান মাধুর্য্যলীলা প্রকট করিয়াছেন বা করিতেছেন। কৃষ্ণভক্তের যেমন কৃষ্ণগুণ সকলই সঞ্চারিত হয়, গৌবভক্তেও তদ্রূপ গৌরগুণ সকলই সঞ্চারিত হয়। মহাবদান্য পরমোদার গৌরের ঔদার্য্য-গুণই গৌরলীলার প্রধান বৈশিষ্ট্য, সুতরাং গৌরভক্তগণে সেই ঔদার্য্যগুণেরই সর্ব্বত্র অভিব্যক্তি। এজন্য গৌরগতপ্রাণ গৌরভক্তবৃন্দের পরমোদার চরিতামৃত পুনঃ পুনঃ আস্বাদনফলে আমরাও তাঁহাদের আনুগত্যে হৃদয়ের সকল গ্লানি-- সকল সঙ্কীর্ণতা--সকল-আবিলতা দূর করতঃ হিংসা-দ্বেষ-মাৎসর্য্যাদি দোষশূন্য হইয়া 'আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়' এই সুনীতি অবলম্বনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী জগতের সর্ব্বত্র পরমোৎসাহে আচার-প্রচার-কার্য্যে সমর্থ হইব। তাহা হইলেই প্রেমের ঠাকুর মহাবদান্য মহাপ্রভুর কৃপায় জগতে পরাশান্তি সংস্থাপিত হইবে, সর্ব্বত্র মহামন্ত্র-নামের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইবে--জগতের আকাশবাতাস--সর্ব্ব দিগ্‌দিগন্ত কৃষ্ণনামগানে মুখরিত হইয়া উঠিবে--প্রেমের ঠাকুর গৌরহরির শ্রীমুখনিঃসৃত প্রেমরসসিক্ত নামমাধুর্য্য সকল জগৎকে প্রেমবন্যায় প্লাবিত করিবে--'কৃষ্ণনাম ধরে কত বল'!

এই শ্রীগৌরভক্তচরিতামৃত গ্রন্থখানির মুদ্রণাদি যাবতীয় সেবাকার্য্যে আমাদের সবিশেষ স্নেহপাত্র .................... মহারাজের অহর্নিশপ্রাণময়ী সেবাচেষ্টার প্রশস্তি আমরা শতমুখে গান করিয়াও তৃপ্তি লাভ করিতে পারি না।

প্রেসকে পরমারাধ্য প্রভুপাদ 'বৃহৎ মৃদঙ্গ' বলিতেন। ইহা দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধসিদ্ধান্তবাণী গ্রন্থ বা পত্রিকাদির মাধ্যমে জগতের সর্ব্বত্র স্থায়ী ও ব্যাপকভাবে প্রচারের সহায়তা হইয়া থাকে। এজন্য এই 'বৃহৎ মৃদঙ্গ' শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত--'যাহা তাঁহা প্রেমফল দেহ যা'রে তা'রে, 'ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যা'র। জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার।।", 'সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রচার,--বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা', 'যা'রে দেখ তা'রে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ', 'পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।।" ইত্যাদি উপদেশ-বাক্য-পালন-কার্য্যে--বিশেষতঃ স্থায়ী ও ব্যাপকভাবে প্রচার-কার্য্যে বৃহৎমৃদঙ্গের সেবা অতুলনীয় ও অভাবনীয়।

পরিশেষে আমরা এই গ্রন্থরাজ এবং শ্রীমঠের অন্যান্য যাবতীয় গ্রন্থ বা পত্রিকাদি প্রচার-সেবা-কার্য্যে প্রাণ অর্থ বুদ্ধি বাক্য-দ্বারা যাঁহারা যাঁহারা যাহা কিছু সাহায্য করিয়াছেন বা করিতেছেন, আমরা তাঁহাদের সকলেরই নিকট আমাদের আন্তরিক চিরকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি, সহৃদয়/সহৃদয়া-- গ্রাহক/গ্রাহিকা বা পাঠক/ পাঠিকাবৃন্দ গ্রন্থের প্রুফ-সংশোধনাদি কার্য্যে কোন ত্রুটী বিচুতি লক্ষ্য করিলে তাহা কৃপাপূর্ব্বক নিজগুণে সংশোধন করিয়া লইবেন, ইহাই সবিনয় প্রার্থনা,

ইতিশুদ্ধভক্তচরণ-রেণু-প্রার্থী
বৈষ্ণবদাসানুদাস শ্রীভক্তিপ্রমোদ পুরী
২৩ ভাদ্র ১৩৯৯, ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯২

# মুখবন্ধ

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গের অহৈতুকী কৃপায় শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের প্রকাশনা বিভাগের মুখ্য সদস্য শ্রীমান আদিগোপাল দাস ব্রহ্মচারীর বিপুল উৎসাহে আজ ''গৌরভক্ত-চরিতামৃত'' গ্রন্থখানি প্রকাশ করা সম্ভব হল। এই গ্রন্থখানি পাঠ করে সকলের মঙ্গল হবেই হবে। আমরা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতিতে পাই –

শুদ্ধভকত চরণ-রেণু ভজন-অনুকুল।
ভকত-সেবা, পরমসিদ্ধি,প্রেমলতিকার মূল।।

এই কীর্ত্তনের দ্বারা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাদের জানাচ্ছেন শুদ্ধভক্তের চরণধূলি পেলে ভগবৎ সেবার অনুকুল পরিবেশ পেতে কোন অসুবিধা হবে না। এই শুদ্ধভক্তের সেবা দ্বারাই আমাদের সাধনার চরমপ্রাপ্তি ভগভৎ প্রেম লাভ হয়ে থাকে।

বৈষ্ণব শাস্ত্রকারগণ আমাদের জানিয়েছেন–

''বৈষ্ণবের গুণগান কলি জীবের ত্রাণ'' অর্থাৎ বৈষ্ণবের মহিমা কীর্ত্তন ও শ্রবণ করলে জীব পরিত্রাণ লাভ করে। এই কথার অন্তর্নিহিত অর্থ এই; শুদ্ধ বৈষ্ণব ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। ভগবানের প্রিয় জনের মহিমা কীর্তন করলে জীব এই দুঃখ যন্ত্রণাগ্রস্ত অবস্থা হতে ছুটি পেয়ে আনন্দময় ধাম গোলোক বৃন্দাবন প্রাপ্তির জন্য এই কলিযুগের মহামন্ত্র–

''হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।''

অপরাধ শূন্য হয়ে হৃদয়ের অন্তঃকরণ হতে করবার উৎসাহ পায়।

ভজন জগতে অগ্রসর হতে হলে শুদ্ধ ভক্তের কৃপা অত্যন্ত জরুরী। ভগবৎ কৃপা ভক্তকৃপানুগামিনী। তাই শুদ্ধভক্তি অনুশীলনের ক্ষেত্রে এই ''গৌরভক্ত-চরিতামৃত'' গ্রন্থখানি ভক্ত সমাজের ক্ষেত্রে অত্যন্ত মঙ্গলপ্রদ হবে।

পাঠক/পাঠিকাগণের নিকট বিনীত নিবেদন অসাবধনতা বশত কোন ত্রুটি হলে আপনারা হৃদয়ের ভাব বুঝে আমাদের ক্ষমা করবেন। ইহাই একান্ত প্রার্থনা।

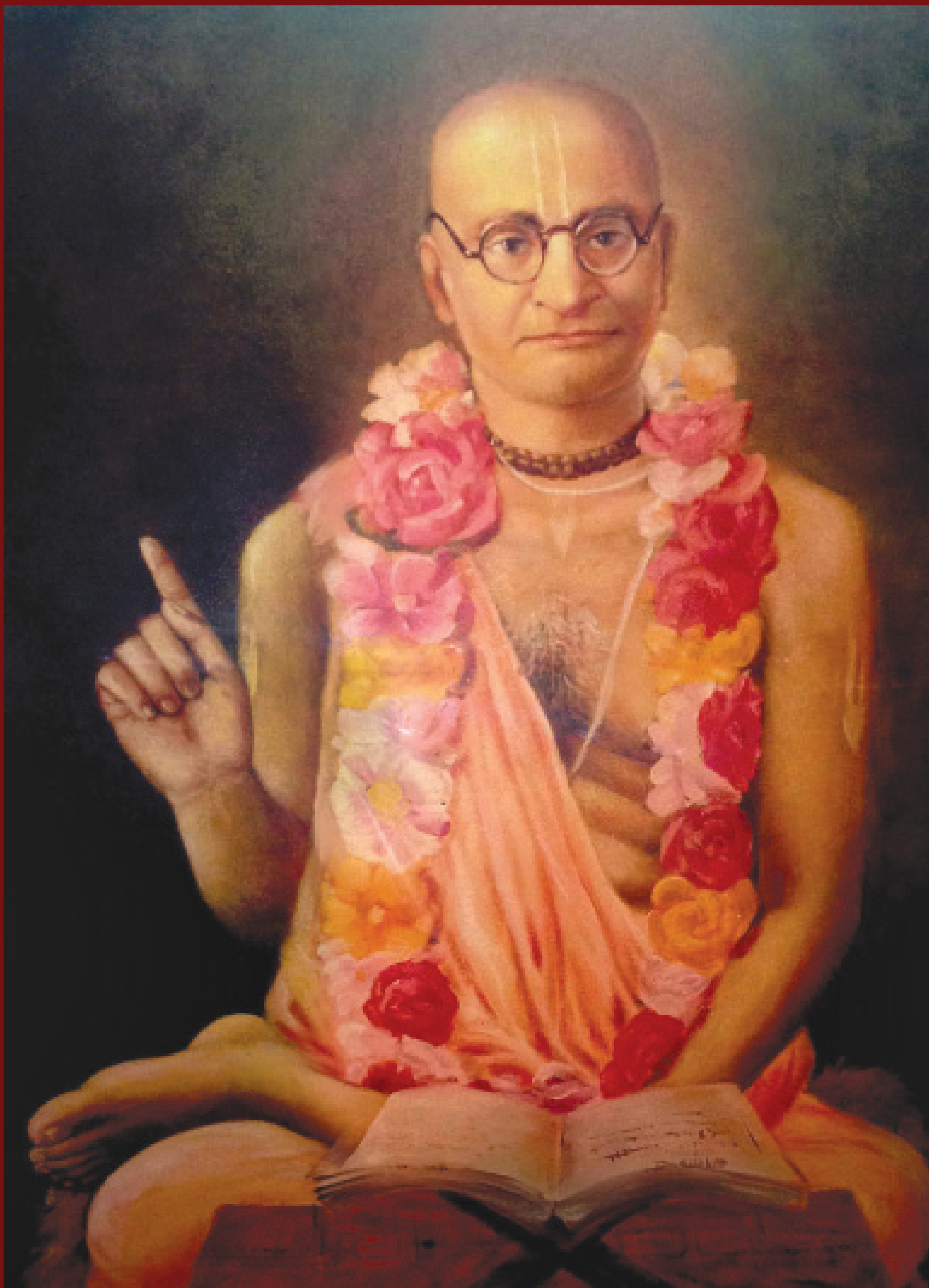
**নিবেদক**
শুদ্ধ-বৈষ্ণব-চরণ-রেণু-অনুসন্ধিৎসু
বৈষ্ণব দাসানুদাস
**ভক্তিবিবুধ বোধায়ন**



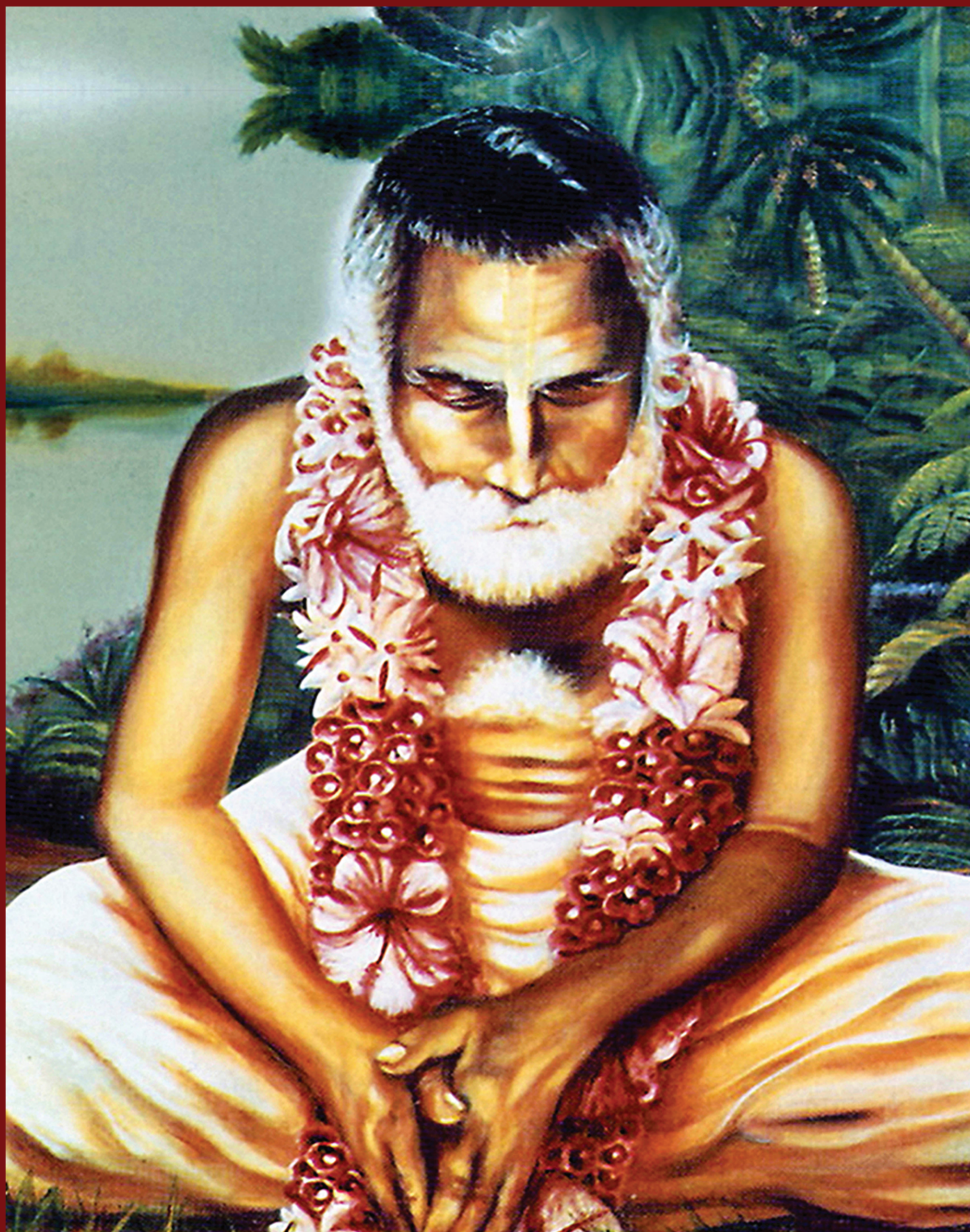
শ্রীল ভক্তিবিবুধ বোধায়ন গোস্বামী মহারাজ



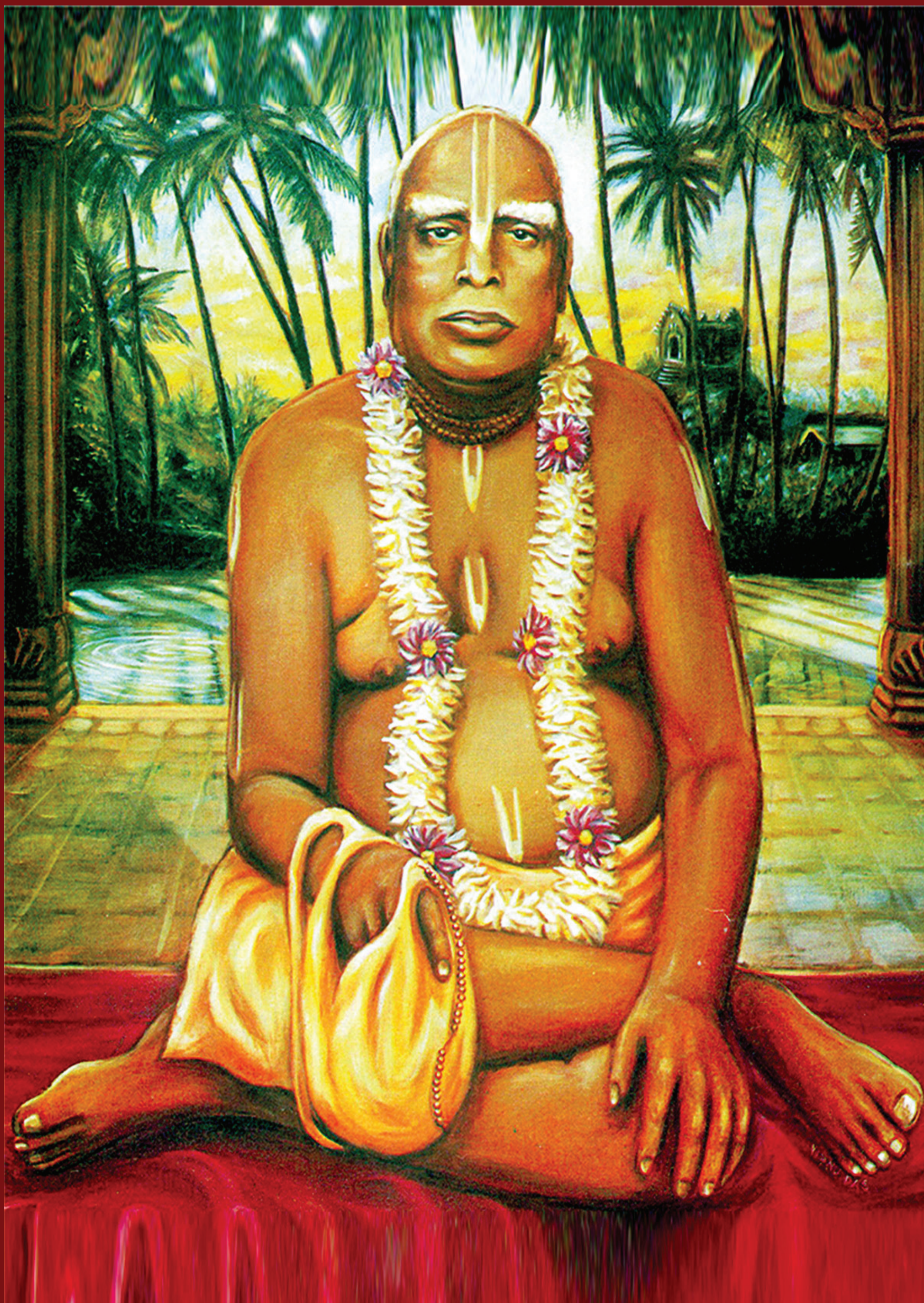
শ্রীল ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর



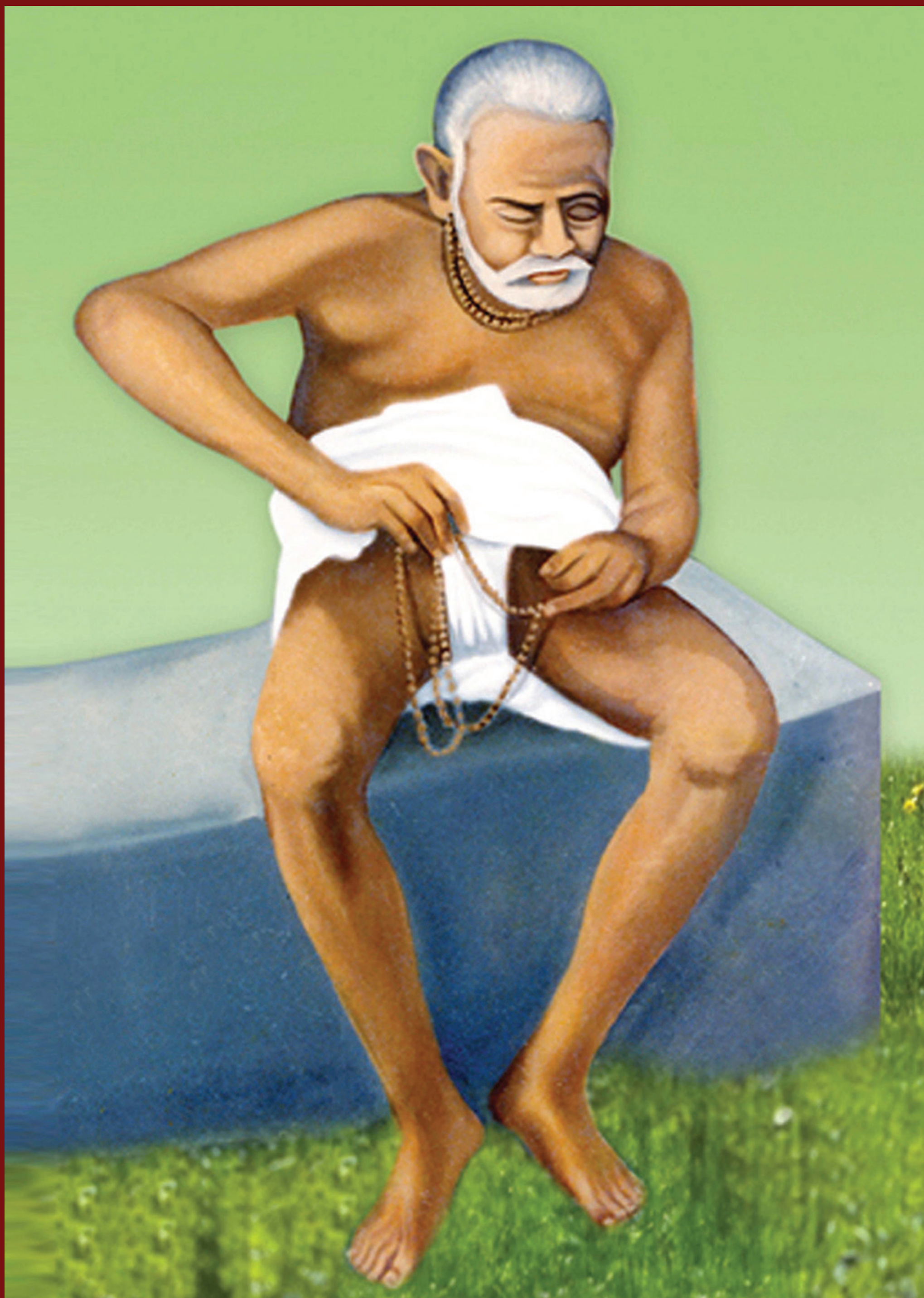
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ



শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ



শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর



শ্রীশ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ



শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের সেবিত বিগ্রহ
শ্রীশ্রীরাধা-গোপীনাথ



শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের সেবিত বিগ্রহ
শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর

# প্রস্তাবনা

প্রথমে প্রণাম। ভগবান নিজমুখেই বলেছেন; যিনি আমার ভক্ত তিনি প্রকৃত ভক্ত নন। কিন্তু যিনি আমার ভক্তের ভক্ত তিনিই আমার আসল ভক্ত।

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ।।

অর্থাৎ ভক্তি জগতে অগ্রসর হতে হলে ভক্তের কৃপা বিশেষ প্রয়োজন।

'আমার ভক্তের পূজা-আমা' হৈতে বড়।
সেই প্রভু বেদে-ভাগবতে কৈলা দড়।।

—চৈঃ ভাঃ

আমাদের গৌড়ীয় গুরুবর্গগণ ভক্তসেবার মহিমার কথা শতমুখে বর্ণনা করেছেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন--

''শুদ্ধভকতচরণ-রেণু-ভজন-অনুকুল।
ভকত-সেবা, পরম সিদ্ধি, প্রেমলতিকার মূল।।''

শুদ্ধভক্তের করুণা না হলে অপ্রাকৃত জগৎ তথা হরি গুরু বৈষ্ণবের মহিমা কিছুই উপলব্ধি হয় না। তাই শুদ্ধভক্তগণের অপ্রাকৃত চরিত কথা আস্বাদনের উদ্দেশ্যে মায়াপুরস্থ শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠ হতে ভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী ট্রাস্টের পক্ষ থেকে 'শ্রীগৌরভক্ত চরিতামৃত' নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থের নামকরণ করেছেন, শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা প্রবিষ্ট শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ থেকে প্রকাশিত একই বিষয়ক গ্রন্থের উপোদ্ঘাতে ১৯৯২ সালের ৯ সেপ্টেম্বর তিনি লিখেছিলেন,--''এই গৌরভক্তচরিতামৃত গ্রন্থখানির মুদ্রনাদি যাবতীয় সেবাকার্য্যে আমাদের সবিশেষ স্নেহপাত্র............. মহারাজের অহর্নিশ প্রাণময়ী সেবাচেষ্টার প্রশস্তি আমরা শতমুখে গান করিয়াও তৃপ্তি লাভ করিতে পারি না।''

তবে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠান গ্রন্থখানির নাম 'গৌরভক্তচরিতামৃত' না দিয়ে অন্য কিছু দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে যখন আমি ঐ গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করি তখন পরম গুরুদেবের লেখা উপাদ্ঘাত পড়ে উপলব্ধি করি হয়ত তাঁর ইচ্ছা ছিল গ্রন্থটির নাম 'গৌরভক্তচরিতামৃত' হোক। কিন্তু তা হয় নি। তবে পরম গুরুদেবের দেওয়া নামটি আমার বড়ই আর্ত্তিমাখা মনে হয়। গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করি, গুরুদেব পরম গুরুদেবের ইচ্ছা অনুসারে আমরা কি 'শ্রীগৌরভক্ত চরিতামৃত' নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করতে পারি। গুরুদেব পরম আনন্দে স্বীকৃতি প্রদান করেন। আমিও সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থটি সম্পূর্ণ নতুনরূপে সরল ভাষায় সঙ্কলনের প্রচেষ্টা শুরু করি।

গ্রন্থটি সঙ্কলনের জন্য বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সাহায্য নিতে হয়েছে। যে যে গ্রন্থ বা প্রতিষ্ঠান থেকে সাহায্য

পেয়েছি তাদের প্রত্যেককে হৃদয় থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। যাতে সকল স্তরের ভক্তগণ সহজে অনুধাবন করতে পারেন, সেজন্য ভাষাটি সরল করা হয়েছে।

এই মহান গ্রন্থ প্রকাশ করতে এই অধমকে বিশেষভাবে কৃপারূপ উৎসাহ প্রদান করেছেন আমার দিব্যজ্ঞান প্রদাতা শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ১০৮ শ্রীমদ্ভক্তিবিবুধ বোধায়ন গোস্বামী মহারাজ। তাঁর কৃপাতেই এই অধমের দ্বারা বৃহৎ মৃদঙ্গের সেবা পরিচালিত হচ্ছে। তৎসঙ্গে এই গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন আমার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী শ্রীপাদ প্রদ্যুম্ন দাস ব্রহ্মচারী। গ্রন্থের টাইপ সেটিং প্রভৃতি সেবা করেছেন শ্রীপাদ মদন গোপাল দাস (মানিক)। প্রুফ সংশোধন করেছেন বিষ্ণুপ্রিয়া নন্দী এবং সুনীতি দাস। আংশিক প্রুফ সংশোধন করেছেন রঙ্গনাথ দাস। যারা যারা এই গ্রন্থ প্রকাশে সাহায্য করেছেন প্রত্যেকের নিকট হৃদয় থেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এবং প্রার্থনা করছি, যেন এভাবে পরমোৎসাহের সাথে গুরুদেব প্রদত্ত বৃহৎ মৃদঙ্গের সেবা চালিয়ে যেতে পারি।

গ্রন্থের মধ্যে কোন ত্রুটি থাকলে সহৃদয় ভক্তগণ নিজগুণে ক্ষমা করবেন।

**ইতি**
**প্রকাশক**

# সূচীপত্র





# শ্রীজগন্নাথ মিশ্র

‘জগতের পিতা কৃষ্ণ’। সেই কৃষ্ণই শ্রীমন্মহাপ্রভুরূপে এই জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন। জগৎ পিতারও যিনি পিতা, তিনি নিশ্চয়ই আমাদের ন্যায় সাধারণ কোন জড় ব্যক্তি নন্। শ্রীমহাপ্রভুর পিতার নাম ‘শ্রীজগন্নাথ মিশ্র’।

জগন্নাথ মিশ্রের আবির্ভাব স্থান বর্তমান বাংলাদেশের শ্রীহট্ট (সিলেট) জেলার অন্তর্গত ঢাকা-দক্ষিণ গ্রামে। তাঁর পিতামহের নাম শ্রীমধু মিশ্র। এই মধুমিশ্রের চারজন পুত্র ছিল। (১) উপেন্দ্রমিশ্র, (২) রঙ্গদ মিশ্র, (৩) কীর্ত্তিদ মিশ্র এবং (৪) কীর্ত্তিবাস মিশ্র। উপেন্দ্র মিশ্র কলাবতীকে বিবাহ করলে তাঁদের ঘরে সাতটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। (১) কংসারি (২) পরমানন্দ, (৩) পদ্মনাভ, (৪) সর্ব্বেশ্বর, (৫) জগন্নাথ, (৬) জনার্দ্দন এবং (৭) ত্রৈলোক্য নাথ। উপেন্দ্র মিশ্রের পঞ্চম পুত্র শ্রীজগন্নাথ মিশ্রই মহাপ্রভুর পিতা। তিনি ব্রজলীলায় নন্দ মহারাজ, তিনিই বামন অবতারের সময়ে কশ্যপ, রাম অবতারে দশরথ, তিনিই সুতপা তিনিই শ্রীবসুদেব। মহাপ্রভুর মাতা শ্রীশচীদেবীও তদ্রূপ। তিনিই যশোদা, তিনিই দেবকী, তিনিই কৌশল্যা। তাইতো শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বর্ণনা করেছেন--

‘‘সেই ব্রজেশ্বর ইঁহ জগন্নাথ পিতা।
সেই ব্রজেশ্বরী ইঁহ শচীদেবী মাতা।।
সেই নন্দসুত ইঁহ চৈতন্য গোসাঞি।
সেই বলদেব ইঁহ নিত্যানন্দ ভাই।।

চৈঃ চঃ আদি ১৭/২৯৪-২৯৫

শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও শচীমাতাকে অবলম্বন করে প্রথমে আটটি কন্যার জন্ম হয়। কিন্তু জন্মের সাথে সাথে তাঁরা মরেও যায়। পরে জগন্নাথ মিশ্র সন্তানের জন্য ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করলে, তাঁর ঘরে নবম সন্তান রূপে বিশ্বরূপের জন্ম হয়। শ্রীবিশ্বরূপ শ্রীবলদেবের প্রকাশ পরব্যোমস্থ সঙ্কর্ষণ তত্ত্ব।

বিশ্বরূপের জন্মের কিছুদিন পরে, একদিন জগন্নাথ মিশ্র শচীদেবীকে বলেন–

জগন্নাথ মিশ্র কহে, স্বপ্ন যে দেখিল।
জ্যোতির্ম্ময় ধাম মোর হৃদয়ে পশিল।।
আমার হৃদয় হৈতে গেলা তোমার হৃদয়ে।
হেন বুঝি, জন্মিবেন কোন মহাশয়ে।।

চৈঃ চঃ আদি ১৩/৮৪-৮৫

একথা শোনার পরে শচীদেবী আনন্দিত হয়ে বলেন–

শচী কহে, মুঞি দেখোঁ আকাশ উপরে।
দিব্যমূর্ত্তি লোক আসি স্তুতি যেন করে।।

চৈঃ চঃ আদি ১৩/৮৩

আবারও সন্তান হবে জেনে দু’জনেই পরমানন্দে বিশেষভাবে শালগ্রামের সেবা করতে লাগলেন। দেখতে দেখতে তের মাস অতিবাহিত হয়ে গেলেও শিশু ভূমিষ্ঠ হচ্ছে না দেখে জগন্নাথ মিশ্র ভয় পেয়ে গেলেন। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী গণনা করে বললেন, ভয়ের কোন কারণ নেই, এই মাসেই পুত্র সন্তান হবে। অতঃপর–

চৌদ্দশত সাতশকে মাস যে ফাল্গুন।
পৌর্ণমাসীর সন্ধ্যাকালে হৈলে শুভক্ষণ।।
সিংহ-রাশি, সিংহ লগ্ন, উচ্চ গ্রহগণ।
ষড়বর্গ, অষ্টবর্গ, সর্ব্ব সুলক্ষণ।।

অ-কলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
স-কলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন প্রয়োজন।।
চৈঃ চঃ আদি ১৩/৮৯-৯১

১৪০৭ শকাব্দে ফাল্গুনী পূর্ণিমার সন্ধ্যাকালে ঈশ্বর ইচ্ছায় চন্দ্রগ্রহণ উপস্থিত হলে, অসংখ্য লোক হরিধ্বনি করতে করতে গঙ্গাস্নানে যেতে লাগলেন। যাঁরা কোনদিন হরিনাম উচ্চারণ করেননি, তাঁরাও সেদিন হরিবোল হরিবোল বলতে বলতে গঙ্গায় ডুব দিতে লাগলেন। চারিদিকে মঙ্গলময় ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর বর্ণনা করলেন–

কিবা শিশু, বৃদ্ধ, নারী, সজ্জন, দুর্জ্জন।
সবে 'হরি' 'হরি' বলে দেখিয়া 'গ্রহণ'।।
'হরিবোল' 'হরিবোল' সবে এই শুনি।
সকল ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপিলেক হরিধ্বনি।।
চতুর্দ্দিকে পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ।
'জয়' শব্দে দুন্দুভি বাজয়ে অনুক্ষণ।।
হেনই সময়ে সর্ব্বজগত-জীবন।
অবতীর্ণ হইলেন শ্রীশচীনন্দন।।
চৈঃ ভাঃ আদি ২/২০৪-২০৮

পুত্রের শ্রীমুখ দেখে শচীমাতা এবং জগন্নাথ মিশ্র উভয়ে আনন্দিত হলেন। চারিদিক থেকে আত্মীয়বর্গ নবজাত শিশুকে দর্শনের জন্য ছুটে আসতে লাগলেন। চারিদিকে জয়জয়কার হতে লাগল।

ডাকিনী-শাঁখিনী বা ভূত-প্রেত নিম গাছের নিচে যেতে পারে না, এজন্য পুত্রের মঙ্গল চিন্তা করে বাৎসল্য পরায়ণা শচীমাতা ও নারীগণ শিশুর নাম রাখলেন 'নিমাই'। সন্ন্যাস গ্রহণের পর নিমাইয়ের নাম হয় 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু'। ইনি বিশ্বম্ভর, নবদ্বীপচন্দ্র, গৌরহরি, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি নামেও প্রসিদ্ধ হন।

শচীমায়ের পিতা শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী লগ্ন বিচার করে দেখলেন, এ শিশুর মধ্যে অজস্র গুণ। এ শিশু ভবিষ্যতে রাজ চক্রবর্ত্তী হবে। নিমাই রূপে গুণে যেন সাক্ষাদ্ নারায়ণ। একথা শুনে জগন্নাথ মিশ্র ও সেখানকার উপস্থিত ভক্তগণ আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হলেন।

নিমাই অদ্ভুদ বাল্যলীলার ছলে শচীমাতা ও জগন্নাথ মিশ্রের আনন্দ বর্দ্ধন করতে লাগলেন। নিমাই কান্না শুরু করলে যখন কোন কিছুতেই ভোলানো যেত না, তখন কানের কাছে গিয়ে হাতে তালি দিয়ে হরিনাম করলেই তাঁর কান্না বন্ধ হয়ে যেত। অর্থাৎ নিমাই কান্নার ছলে সকলকে দিয়ে হরিনাম করাত।

নামকরণের পর বালকের রুচি পরীক্ষার জন্য শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ধান, খই, স্বর্ণ, শ্রীভাগবত প্রভৃতি রাখলে, নিমাই সব পরিত্যাগ করে শ্রীমদ্ভাগবতকে ধরে আলিঙ্গন করলেন। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর লিখলেন–

জগন্নাথ বোলে, ''শুন, বাপ বিশ্বম্ভর।
যাহা চিত্তে লয়, তাহা ধরহ সত্ত্বর।।
সকল ছাড়িয়া প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
'ভাগবত' ধরিয়া দিলেন আলিঙ্গন।।
চৈঃ ভাঃ আদি ৪/৫৪-৫৫

এই দৃশ্য দেখে আত্মীয় বর্গের আর আনন্দের সীমা রইল না। পণ্ডিতগণ বললেন, নিমাই বড় পণ্ডিত হবে, বৈষ্ণব হবে, ভাগবত পড়বে। শ্রীমদ্ভাগবতই যে কলির জীবের জন্য সর্ব্বপ্রধান এবং প্রামাণ্য গ্রন্থ তা দেখানোর জন্যই মহাপ্রভুর এই লীলা।

নিমাই একটু বড় হলে হামাগুড়ি দিয়ে ঘরের এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতে লাগলেন। একদিন হামাগুড়ি দিতে দিতে আঙ্গিনায় সর্পরূপধারী অনন্তদেবকে দেখে গৌরনারায়ণরূপে তাঁর সাথে কিছুক্ষণ খেলার পরে সর্পের ওপরেই শয়ন

করলেন। তা দেখে নিমাইয়ের বিপদের আশঙ্কা করে জগন্নাথ মিশ্র এবং উপস্থিত সকলে ভয়ে জড় সড় হয়ে কান্না করতে থাকলে সর্প নিমাইকে ছেড়ে চলে যায়। এই দৃশ্য দেখার পরে জগন্নাথ মিশ্র ভাবল নিমাই নিশ্চয়ই কোন মহাপুরুষ হবে।

নিমাই এখন বড় হয়েছেন, এদিক সেদিক যাতায়াত করেন, প্রতিবেশীদের বাড়িতে গিয়ে দুধ, অন্ন, কলা, সন্দেশ চেয়ে খান। যদি কেউ না দেয় তাহলে তাঁর রান্নাঘরের হাড়ি, কড়াই সব ভেঙ্গে তছ্নছ্ করে দিয়ে চলে আসেন। এভাবে বাল্যচপলতা করে ভক্তগণ পরম-আনন্দ দেন।

নিমাই একদিন জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ির বাইরে খেলছিলেন। তাঁর শরীরের মূল্যবান অলঙ্কার দেখে দু'টি চোরের খুব লোভ হলে, তাঁরা নিমাইকে কাঁধে তুলে নিয়ে অনেক দূরে নিয়ে যায়। কিন্তু বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হয়ে তারা ফের শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবনে এসে উপস্থিত হয়। তখন দুই চোর হতবম্ব হয়ে নিমাইকে রেখে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। এদিকে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র এতক্ষণ ব্যাকুল হয়ে নিমাইকে খুঁজছিলেন। হঠাৎ নিমাইকে দেখে যেন মৃত শরীরে পুনরায় প্রাণ ফিরে পেলেন। নিমাইকে কোলে তুলে আদর করতে লাগলেন।

একদিন জগন্নাথ মিশ্র বললেন, ''বাপ নিমাই! ঘর থেকে পুস্তকটি একটু নিয়ে আস।'' নিমাই পুস্তক আনার জন্য দৌড়ে গেলে, জগন্নাথ মিশ্র অদ্ভুত নুপুরের ধ্বনি শুনতে পেলেন। আবার পুস্তকটি দিয়ে নিমাই বাইরে খেলার জন্য চলে গেলে, জগন্নাথ মিশ্র ঘরের মধ্যে ধ্বজ-ব্রজ-অঙ্কুশ-পতাকা প্রভৃতি চরণচিহ্ন দেখতে পেলেন। নিমাইয়ের প্রতি অধিক স্নেহ থাকায় 'এগুলো যে নিমাইয়েরই চরণ চিহ্ন' তা বুঝতে পারলেন না। ভাবলেন ঘরে যে শালগ্রাম রয়েছে এগুলো তাঁরই পদচিহ্ন হবে। তাই বিশেষভাবে শালগ্রামের মহাভিষেক, পূজা ও ভোগরাগ সম্পাদন করলেন।

একদিন বালগোপালের উপাসক কোনও একজন তৈর্থিক ব্রাহ্মণ জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে এলে, মিশ্র তাকে যথাযথ সম্মান করে রন্ধনের ব্যবস্থা করে দিলেন। ব্রাহ্মণ রান্না করে গোপালের ভোগ নিবেদন করেছেন। অমনি নিমাই এসে নৈবেদ্য খেতে লাগলেন দেখে ব্রাহ্মণ চিৎকার করে উঠলেন। জগন্নাথ মিশ্র সব দেখে শুনে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হয়ে নিমাইকে মারতে গেলে তৈর্থিক ব্রাহ্মণ তাঁকে নিবারণ করলেন। ব্রাহ্মণের অনিচ্ছা সত্ত্বেও জগন্নাথ মিশ্রের প্রার্থনায় পুনরায় রান্না করলেন। জগন্নাথ মিশ্র নিমাইকে প্রতিবেশীর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন যাতে কোন উৎপাত না করে। তৈর্থিক ব্রাহ্মণ যেই মাত্র গোপালকে ভোগ নিবেদন করেছেন, অমনি নিমাই এসে খেতে লাগলেন। ব্রাহ্মণ পুনরায় চিৎকার করে উঠলেন। জগন্নাথ মিশ্র পুনরায় মর্ম্মাহত হয়ে নিমাইকে শাসন করতে গেলে ব্রাহ্মণ আবারও নিবারণ করলেন। ব্রাহ্মণ বললেন—

কোটি ভক্ষ্য-দ্রব্য যদি থাকে নিজ ঘরে।
কৃষ্ণ আজ্ঞা হইলে সে খাইবারে পারে।।
যে দিনে কৃষ্ণের যারে লিখন না হয়।
কোটি যত্ন করুক, তথাপি সিদ্ধ নয়।।

চৈঃ ভাঃ আদি ৫/১০৪-১০৫

এমন সময় নিমাইয়ের বড় ভাই বিশ্বরূপ এসে তৃতীয় বারের জন্য ব্রাহ্মণকে রান্না করতে অনুরোধ করলেন। তখন অনেক রাত হয়েছে, নিমাই ঘরের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছেন। বিশ্বরূপের অনুরোধে তৈর্থিক ব্রাহ্মণ রান্না করলেন। সকলেই যখন গভীরভাবে ঘুমাচ্ছেন, ব্রাহ্মণ তখন গোপালকে ভোগ লাগালেন, এমন সময় নিমাই এসে খেতে আরম্ভ করলেন। ব্রাহ্মণ চিৎকার করতে উদ্যত

হলে, নিমাই তাকে চুপ করিয়ে অষ্টভূজ মূর্ত্তি দর্শন করালেন। ব্রাহ্মণ নিমাইয়ের রূপ দেখে অচেতন হয়ে গেলেন। নিমাই বললেন, ''ওহে বিপ্র! তুমি আমার অনেক জন্মের কিঙ্কর। গোকুলে নন্দগৃহেও তুমি অতিথি হয়েছিলে, সেখানেও এই লীলা হয়েছিল।" তবে এসকল গোপন কথা তুমি কাউকে বলবে না। সেইদিন থেকে তৈর্থিক ব্রাহ্মণ প্রতিদিন ভিক্ষার ছলে একবার করে এসে নিমাইকে দেখে যেতেন।

শ্রীজগন্নাথ মিশ্র গৌরগোপালের 'হাতে খড়ি' এবং 'কর্ণবেধ' ও 'চুড়াকরণ সংস্কার' সমাপন করলেন। বিদ্যা আরম্ভ হলে নিমাই তিন দিনের মধ্যে সব বর্ণমালা আয়ত্ত করে কৃষ্ণনামমালা পড়তে ও লিখতে লাগলেন।

একদিন নিমাই কান্না করেই চলেছেন। জগন্নাথ মিশ্র জিজ্ঞাসা করলেন, ''আচ্ছা নিমাই! কি করলে তোমার কান্না বন্ধ হবে।" নিমাই বললেন, একাদশী তিথিতে জগদীশ ও হিরণ্য পণ্ডিতের বাড়ীতে ভগবান বিষ্ণুর জন্য যে নৈবেদ্য তৈরী হয়েছে, তা যদি আমাকে এনে খাওয়াতে পার তাহলে আমি কান্না বন্ধ করব। শ্রীজগন্নাথ মিশ্র একথা শুনে অবাক হয়ে ভাবলেন, নিমাই কি করে জানল, আজ একাদশী। আবার হিরণ্য-জগদীশ যে শ্রীবিষ্ণুর জন্য নৈবেদ্য তৈরী করেছেন সেকথাই বা কি করে জানল। বিস্মিত হয়ে জগন্নাথ মিশ্র তাঁর দুই বন্ধু হিরণ্য ও জগদীশের বাড়ীতে গিয়ে সব কথা বললে, তাঁরা আনন্দে বিষ্ণুর নৈবেদ্য জগন্নাথ মিশ্রকে দিয়ে দিলেন। মিশ্র সেই নৈবেদ্য নিমাইকে দিলে নিমাইয়ের কান্না বন্ধ হল।

নিমাইয়ের দুষ্টামির জন্য পুরুষগণ জগন্নাথ মিশ্রের কাছে এবং স্ত্রীগণ শচীমাতার কাছে নালিশ করতে লাগলেন। জগন্নাথ মিশ্র নিমাইকে শাসন করতে গিয়ে তাকে শান্ত ও নির্দ্দোষের ন্যায় দেখে অবাক হতেন। শচী এবং জগন্নাথ মনে মনে চিন্তা করতেন, এ বালক কে? নন্দনন্দন কৃষ্ণই কি গুপ্তভাবে এখানে অবতীর্ণ হয়েছেন?

নিমাইয়ের বড় ভাই বিশ্বরূপ শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের টোলে অধ্যয়ন করে বুঝলেন, 'সর্ব্বশাস্ত্রের তাৎপর্য্য শ্রীকৃষ্ণভক্তি'। পিতামাতা বিবাহের কথা আলোচনা করলে বিশ্বরূপ মাত্র বার বছর বয়সে সন্ন্যাস নিয়ে শ্রীশঙ্করারণ্য নামে পরিচিত হন। বিশ্বরূপ ঘর ছেড়ে চলে গেলে শচী ও জগন্নাথ উভয়ে বিরহে কাতর হয়ে গেলেন। পড়ালেখা শেখার পর নিমাইয়ের যদি সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে জ্ঞান হয়ে যায় এবং নিমাইও যদি ঘর ছেড়ে চলে যায়, এই ভয়ে জগন্নাথ মিশ্র নিমাইয়ের পড়ালেখা বন্ধ করে দিলেন। তিনি বিচার করলেন, পুত্রের পণ্ডিত হওয়ার প্রয়োজন নেই, মূর্খ হয়ে ঘরে থাকুক। নিমাইয়ের পড়ালেখা বন্ধ, তাই দুষ্টুমি করে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। ভগবানের ভোগ রান্নার পরে মাটির হাড়িগুলি যে স্থানে ফেলা হয়, নিমাই একদিন সেখানে গিয়ে বসে পড়লেন। তা দেখে শচীমাতা বললেন, 'ছি নিমাই! এভাবে অপবিত্র স্থানে বসতে আছে। আয় উঠে আয় নিমাই মাতাকে দত্তাত্রেয়ভাবে বলতে লাগলেন–'তোমরা ত' আমাকে পড়তে দাও না। মূর্খের কি পবিত্র অপবিত্র জ্ঞান থাকে? আর যে হাড়িতে বিষ্ণুর নৈবেদ্য রান্না করা হয়েছে সেটা কি কখনো অপবিত্র হয়? যেখানে আমি থাকি সেস্থান কখনই অপবিত্র হতে পারে না।" নিমাই কিছুতেই কথা শুনছেন না দেখে, শচীমাতা জোড় করে তাকে তুলে এনে স্নান করালেন। শচীদেবী ও অন্যান্য সকলে নিমাইকে পড়ানোর জন্য জগন্নাথ মিশ্রের কাছে অনুরোধ করলে, মিশ্র নিমাইকে পুনরায় পড়ার আদেশ দিলেন।

একদিন শুভক্ষণে নিমাইয়ের উপনয়ন সংস্কার করান হলে, নিমাই বামনদেবের ন্যায় ভিক্ষা করলেন।

জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের শিক্ষার জন্য নিমাইকে ‘অভিন্ন সান্দীপনি মুনি’ অধ্যাপক শিরোমণি শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ভর্তি করালেন। শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিত উপযুক্ত সুন্দর শিষ্য পেয়ে আনন্দিত হলেন। নিমাই তাঁর সহপাঠীদেরকে ন্যায়ের ফাঁকি জিজ্ঞাসা করে তর্ক-বিতর্ক করে সকলকেই পরাজিত করলে সকলে নিমাইয়ের বুদ্ধি দেখে বিস্মিত হতেন।

একদিন নিমাইকে দুষ্টামি করতে দেখে জগন্নাথ মিশ্র অনেক ভর্ৎসনা করলেন। রাতে স্বপ্নে একজন ব্রাহ্মণ এসে মিশ্রকে বললেন–

মিশ্র, তুমি পুত্রের তত্ত্ব কিছুই না জান।
ভর্ৎসন-তাড়ন কর, পুত্র করি’ মান’।।
মিশ্র কহে, দেব, সিদ্ধ, মুনি কেনে লয়।
যে সে বড় হউক, এবে আমার তনয়।।
পুত্রের লালন শিক্ষা-পিতার স্বধর্ম্ম।
আমি না শিখালে, কৈছে জানিবে ধর্ম্ম-মর্ম্ম।।

চৈঃ চঃ আঃ১৪/৮৫-৮৭

অর্থাৎ নিমাই যেই হোক না কেন, সে এখন আমার ছেলে। পিতার কাজ ছেলেকে স্বধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া। আর তা করতে গিয়ে আমার যা যা করার প্রয়োজন, আমি তাই তাই করব।

নিমাই প্রতিদিন নিয়ম করে গঙ্গাস্নান, বিধি অনুসারে বিষ্ণুপূজা, তুলসীতে জলদান এবং প্রসাদ ভোজন করেন দেখে জগন্নাথ মিশ্র আনন্দিত হয়ে পুত্রস্নেহে আপ্লুত হয়ে নিমাইয়ের মঙ্গলের জন্য শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রার্থনা করেন। জগন্নাথ মিশ্রের সবসময় ভয় হয়, ‘সংসারের অনিত্যতা বুঝে’ নিমাই ঘর ছেড়ে চলে না যায়। একদিন মিশ্র স্বপ্নে নিমাইয়ের অপূর্ব সন্ন্যাসরূপ, ভক্তগণসহ সংকীর্ত্তন নৃত্য, কীর্ত্তন, হাসি-কান্না এসব দেখে মনে মনে স্থির করলেন, নিমাই নিশ্চয়ই ঘর ছেড়ে চলে যাবে। শচীদেবী মিশ্রকে বোঝালেন, নিমাই যেভাবে পড়ালেখায় মন দিয়েছে ও কখনই ঘর ছেড়ে যাবে না। তা শুনেও মিশ্রের বিশ্বাস হল না।

শচী-জগন্নাথ নিমাইকে নিয়ে আনন্দেই দিন কাটাচ্ছিলেন। হঠাৎ একদিন শ্রীজগন্নাথ মিশ্র নশ্বর দেহ ত্যাগ করলেন। শ্রীদশরথ মহারাজের বিয়োগে রামচন্দ্র যেমন কেঁদেছিলেন, নিমাইও জগন্নাথ মিশ্রের বিয়োগে (ভক্তবিরহে) প্রচুর কাঁদলেন। বিরহে শোক সন্তপ্ত শচীমাতাকে সান্ত্বনাও দিলেন। কিছুদিন পরে পিতার শ্রাদ্ধের জন্য গয়াতেও গিয়েছিলেন।

**।। জয় শ্রীজগন্নাথ মিশ্র কি জয়।।**





# শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ

শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে মহাপ্রভুর গুরুবর্গরূপ সেবকরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী কলিযুগে শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র এবং সনক এই চারটি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রহ্ম সম্প্রদায় অর্থাৎ মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ভুক্ত গুরু। মাধবেন্দ্র পুরীর গুরু শ্রীলক্ষ্মীপতি। তিনি মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের একজন প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী। তিনি ভক্তিলতার মূল অঙ্কুর স্বরূপ।

পূর্বে যখন শ্রীমাধব পুরী বৃন্দাবন ধামে এলেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে সতত বিভোর থাক্‌তেন। দিন রাত সম্বন্ধে তাঁর কোন জ্ঞান থাকত না। কখনও ক্রন্দন করতেন, কখনও নর্ত্তন করতেন ও কখনও প্রেমে ভূমিতে গড়াগড়ি দিতেন। একদিন তিনি গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করে গোবিন্দ কুণ্ডে এলেন এবং স্নান করে একটি গাছের তলায় বসলেন। শ্রীপুরী গোস্বামী কখনও মেগে খেতেন না। শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকের বেশ ধরে এক ভাণ্ড দুধ মাথায় করে পুরীর কাছে এসে বললেন—"পুরী! তুমি এই দুধ পান কর। তুমি মেগে খাওনা কেন? দিবারাত্র কার ধ্যান কর?" গোপবালকের সেই মধুর কথা শুনে এবং অপূর্ব্ব রূপ দেখে পুরী বড়ই সুখী হলেন। পুরীর ক্ষুধা তৃষ্ণা যেন চলে গেল।

পুরী বললেন, "তুমি কে? কোথায় থাক? তুমি কি করে জানলে যে আমি উপবাসী?" গোপবালক-রূপী কৃষ্ণ আত্মগোপন করে বললেন, আমি গোপ-শিশু। এই গ্রামে থাকি। আমার গ্রামেতে কেউ উপবাসী থাকে না। কেউ অন্ন মেগে খায়, কেউ দুধ বা ফল মেগে খায়। অযাচক লোককে আমি আহার দিয়ে থাকি। স্ত্রীলোকেরা এই কুণ্ডে জল নিতে এসে তোমাকে দেখে গেছেন। তাঁরা আমার হাতে দুধ দিয়ে পাঠিয়েছেন। আমি শীঘ্রই গোদোহন করতে যাব। তুমি দুধ পান করে ভাণ্ডটা রেখে দিও। আমি পরে এসে নিয়ে যাব।" এই কথা বলে গোপবালক চলে গেল। পুরী গোস্বামী দুধ পান করে ভাণ্ডটি ধুয়ে বালকটির পথ দেখতে লাগলেন। ক্রমে রাত গভীর হতে লাগল, কিন্তু বালক আর এল না। পুরী বসে নাম জপ করতে লাগলেন, শেষরাত্রে একটু তন্দ্রা এল। তখন স্বপ্নে দেখতে লাগলেন—সেই গোপশিশু এসে পুরীর হাতে ধরে তাঁকে এক কুঞ্জ-সন্নিধানে নিয়ে গেল এবং কুঞ্জ দেখিয়ে বলতে লাগল—আমি এই কুঞ্জে থাকি। শীত-বর্ষাদিতে কষ্ট পাই। তুমি গ্রামের লোক নিয়ে কুঞ্জ কেটে আমায় বের কর। পর্ব্বতের উপরে এক মন্দির করে আমায় সেখানে স্থাপন কর এবং বহু শীতল জল দিয়ে আমার অঙ্গ মার্জ্জন কর।

বহুদিন তোমার পথ করি নিরীক্ষণ।
কবে আসি' মাধব আমা করিবে সেবন।।
তোমার প্রেম বশে করি সেবা অঙ্গীকার।
দর্শন দিয়া নিস্তারিব সকল সংসার।।

চৈঃ চঃ মধ্যঃ ৪/৩৯, ৪০

মাধব! বহুদিন ধরে তোমার পথ চেয়ে আছি, তুমি কবে আসবে! কবে আমার সেবা করবে? তোমার প্রেমে বশীভূত হয়ে তোমার সেবা অঙ্গীকার করছি। আমি দর্শন দিয়ে সকলকে উদ্ধার করব। মাধব! আমার নাম "গোপাল"। আমি গোবর্দ্ধনধারী। আমি বজ্রের স্থাপিত বৃন্দাবনের ঈশ্বর। আমার সেবকগণ ম্লেচ্ছ ভয়ে আমায় কুঞ্জে লুকিয়ে রেখে পালিয়ে গিয়েছিল। সেই দিন থেকে আমি কুঞ্জ মধ্যে আছি।




তুমি কুঞ্জ থেকে বের করে আমার সেবা কর। গোপাল এই কথা বলে অন্তর্হিত হলেন। শ্রীমাধব পুরীর ঘুম ভেঙ্গে গেল। জেগে ভাবতে লাগলেন আমি কৃষ্ণ দর্শন পেয়েছিলাম, কিন্তু ভাগ্য দোষে তাঁকে চিনতে পারলাম না। এই কথা বলে প্রেমাবেশে ভূমিতলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে চৈতন্য লাভ করে মন স্থির করলেন এবং গোপালের আজ্ঞা পালন করবার জন্য তৎপর হলেন।

শ্রীমাধব পুরী রাতশেষে প্রাতঃকাল উপস্থিত হলে গ্রামে গেলেন এবং গ্রামবাসিদের ডেকে বললেন— তোমাদের গ্রামের ঈশ্বর গোবর্দ্ধনধারী শ্রীকৃষ্ণ এক কুঞ্জ মধ্যে আছেন। কুঞ্জ কেটে তাঁকে বের করতে হবে। গ্রামবাসিগণ পুরীর কথা শুনে পরম আনন্দে সকলে কোদাল কুঠার নিয়ে কুঞ্জের দিকে চললেন। বৃক্ষ, লতা আচ্ছাদিত নিবিড় কুঞ্জ। কুঠারের দ্বারা কুঞ্জের বৃক্ষ লতাদি কেটে তার মধ্যে প্রবেশ করে দেখলেন—ঠাকুর মৃত্তিকা দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে আছেন। শ্রীমূর্ত্তিটি অতি সুন্দর এবং প্রকাণ্ড। সকলে আশ্চর্য ও আনন্দিত হয়ে ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গের ধূলা কাদা ঝেড়ে তাঁকে বাইরে আনলেন। শ্রীপুরী গোস্বামী শ্রীমূর্ত্তি দেখে আনন্দাশ্রুসিক্ত নয়নে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন। চতুর্দিকে লোক আনন্দে হরি হরি বলতে লাগল। ভারী বিগ্রহ, বহু বলিষ্ঠ লোক শ্রীবিগ্রহকে শ্রীগোবর্দ্ধনের উপর উঠাল এবং একটি মন্দির তৈরী করে সেখানে স্থাপন করল। শ্রীগোপাল দেবের অভিষেক আরম্ভ হল। গ্রামের ব্রাহ্মণগণ এসে অভিষেকের কার্য্য করতে লাগলেন। গোবিন্দকুণ্ড থেকে সহস্র ঘট জল আনয়ন করা হল। পুষ্প, তুলসী প্রভৃতি সংগ্রহ করতে কিছু ব্রাহ্মণ লেগে গেলেন। শ্রীগোপাল দেবের প্রকট সংবাদ শ্রবণ করে গ্রামের গোপগণ আনন্দে ভারে ভারে দই, দুধ, কলা, চাল, আটা, ঘি ও বিবিধ তরিতরকারী আনতে লাগলেন। শ্রীগোপাল দেবের ইচ্ছায় কে কোথা থেকে কি আনতে লাগল, তা অবর্ণনীয়। বাদ্যকার এসে বাজনা বাজাতে লাগল। গায়কগণ মধুর সংকীর্ত্তন করতে লাগল।

শ্রীমাধব পুরী স্বয়ং শ্রীগোপাল দেবের মহাস্নান অভিষেক কার্য্য করতে লাগলেন। দশ জন ব্রাহ্মণ অন্ন, পাঁচ জন তরকারী, পাঁচ জন রুটি ও কিছু লোক বিবিধ মিষ্টান্ন প্রভৃতি তৈরী করতে লাগলেন। নব বস্ত্র পেতে তার উপরে পলাশ পাতা বিছিয়ে অন্ন ও রুটির রাশি করা হল। পূর্বে শ্রীনন্দ মহারাজ যেমন অন্নকূট মহোৎসব করেছিলেন, ঠিক সেই প্রকার অন্নকূট মহোৎসব যেন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। রন্ধন সমাপ্ত হলে শ্রীমাধব পুরী শ্রীগোপাল দেবকে নিবেদন করতে বসলেন।

''বহুদিনের ক্ষুধায় গোপাল খাইল সকল।।''

চৈঃ চঃ মধ্যঃ ৪/৭৬

গোপাল বহুদিন ক্ষুধার্ত্ত, সব কিছু ভোজন করলেন। শ্রীমাধব পুরী সব দেখতে পেলেন। তাঁর কি আনন্দ, সুখে দেহস্মৃতি নাই, প্রেমানন্দে তিনি ভরপুর। শ্রীগোপাল দেব ভোজনান্তে প্রচুর সুগন্ধি জল পান করলেন। শ্রীমাধব পুরী স্বচক্ষে এসব দেখতে পাচ্ছিলেন। শ্রীগোপাল সব কিছু ভোজন করলেন তথাপিও তাঁর দিব্য শ্রীহস্ত স্পর্শে সবকিছুই পূর্বের ন্যায় রইল। শ্রীমাধবপুরী গোপালকে আচমন করিয়ে তাম্বুল দিলেন এবং পরে শয়ন করালেন।

অতঃপর শ্রীমাধব পুরী প্রসাদ পাওয়ার জন্য সকলকে আদেশ করলেন। আগে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীদের ভোজন করান হল। পরে দীন-দুঃখী সকলের ভোজন হল। শ্রীপুরী গোস্বামীর প্রভাব দেখে সকলে আশ্চর্য্য হলেন। শ্রীপুরী গোস্বামী সারাদিন পরিশ্রম করবার পর রাত্রে কিছু দুধ পান করলেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমানন্দে শ্রীমাধব পুরীর ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই। পরদিন প্রাতঃকালে

অন্যান্য গ্রামের লোকজন আগের দিনের ন্যায় সেবা সম্ভার নিয়ে এলেন। সেদিনও সেইরূপ অন্নকূট হল।

ব্রজবাসী লোকের কৃষ্ণে সহজে প্রীতি।
গোপালের সহজ প্রীতি ব্রজবাসী-প্রতি।।

চৈঃ চঃ মধ্যঃ ৪/৯৫

ব্রজবাসিগণ ''শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছু জানে না। কৃষ্ণও ব্রজবাসী ভিন্ন আর কিছুই জানেন না। ব্রজজনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিক প্রীতি। অনন্তর কাল দিনের পর দিন অন্নকূট হতে লাগল। গোপালকে ভক্তগণ বহু বস্ত্রালঙ্কার অর্পণ করতে লাগলেন। গোপালদেব দশ হাজার গাভী দানে পেলেন, গোপালের সেবা দেখে পুরীর মনে বড়ই আনন্দ হল। গৌড় দেশ থেকে আগত দুই জন বৈরাগী ব্রাহ্মণকে শিষ্য করে শ্রীমাধব পুরী তাঁদের গোপালের সেবা ভার দিলেন।

ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তের সঙ্গেই লীলা করেন। একদিন শ্রীগোপালদেব শ্রীমাধব পুরীকে স্বপ্নে বললেন—''পুরী! আমার অঙ্গতাপ যাচ্ছে না। তুমি যদি নীলাচল থেকে মলয়জ চন্দন ও কর্পূর এনে আমার অঙ্গে প্রলেপ দিতে পার, তবে আমার অঙ্গতাপ নিবৃত্ত হবে।" পুরী বললেন—''ঠাকুর আমি বৃদ্ধ; তোমার এই সেবা করতে কি পারবো?"—গোপাল বললেন— ''পুরী! তুমিই করতে পারবে। তোমাকেই করতে হবে, অন্যের দ্বারা হবে না।" পুরীর স্বপ্ন ভঙ্গ হল। স্বপ্ন কথা স্মরণ করে প্রেমে বিহ্বল হতে লাগলেন। গোপাল আমাকে আদেশ করেছেন—চন্দন কর্পূর আনতে। আহা! গোপালের কত করুণা! শ্রীমাধব পুরী বৃদ্ধ। তবুও তাঁকেই মলয়জ চন্দন আনতে আদেশ করলেন। শ্রীমাধব পুরী শ্রীগোপাল দেবের আজ্ঞা শিরে ধারণ করে মলয়জ চন্দন আনবার জন্য নীলাচলের দিকে চললেন। শ্রীমাধব পুরী ক্রমে ক্রমে চলতে চলতে গৌড় দেশে এলেন। শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে উঠলেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য তাঁকে দেখেই বুঝতে পারলেন ইনি শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় মহাভাগবত শিরোমণি। আচার্য্য তৎক্ষণাৎ তাঁর শ্রীচরণাদি ধৌত করে পাদমর্দন পূজাদি করলেন এবং সমাদরে তাঁকে ভোজনাদি করালেন। শ্রীমাধব পুরী অদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে কয়েক দিন কৃষ্ণ-কথানন্দে অবস্থান করলেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভু শ্রীমাধব পুরীপাদের থেকে মন্ত্র দীক্ষাদি গ্রহণ করলেন। শ্রীমাধব পুরীকে একদিন শ্রীজগন্নাথ মিশ্র আমন্ত্রণ করে স্বীয় গৃহে আনয়ন করেন এবং পাদধৌতাদি পূর্ব্বক, পাদ-পূজাদি করে বহুবিধ তরকারী ব্যঞ্জন অন্নাদি খুব যত্নের সহিত ভোজন করান। শচী জগন্নাথের প্রগাঢ় ভক্তি দর্শনে শ্রীপুরী গোস্বামী তাঁদের প্রচুর আশীর্ব্বাদ করেন। সেই আশীর্ব্বাদের ফলেই যেন শ্রীমহাপ্রভু তাঁদের ঘরে আবির্ভূত হলেন।

শ্রীমাধব পুরী কিছুদিন নবদ্বীপ পুরে অবস্থান করবার পর উড়িষ্যাভিমুখে যাত্রা করলেন। ক্রমে রেমুনায় এলেন। সেখানে শ্রীগোপীনাথকে দেখে পুরী প্রেমে ক্রন্দন ও নৃত্য-গীতাদি করলেন। শ্রীমাধব পুরীর অলৌকিক কৃষ্ণপ্রেমাদি দেখে পূজারিগণ আশ্চর্য্য হলেন। অতঃপর শ্রীমাধব পুরী পূজারীদের জিজ্ঞাসা করলেন— শ্রীগোপীনাথের ভোগে কি কি লাগে? পূজারীরা বললেন, সন্ধ্যায় দ্বাদশটি অমৃতকেলী (ক্ষীর) ভোগ লাগে। অন্যান্য সময়ের ভোগের বিবরণও দিলেন। শ্রীমাধব পুরী অমৃতকেলীর নাম শুনে চিন্তা করতে লাগলেন, অমৃতকেলীর স্বাদ কি রকম--তা যদি বুঝতে পারি, আমার গোপালকেও ঠিক সে রকম ভোগ দেওয়ার চেষ্টা করতে পারি। কিছুক্ষণ পরে পুরী গোস্বামী আবার চিন্তা করলেন—আমার অপরাধ হয়েছে। ঠাকুরকে ভোগ নিবেদনের পূর্বেই আমি

স্বাদ নিতে চেয়েছি। পুরী-গোস্বামী এই সমস্ত কথা ভেবে সেখান থেকে কিছুদূরে এক শূন্য হাটে বসে রাত্রে নাম-কীর্ত্তন-স্মরণাদি করতে লাগলেন। এদিকে পূজারী ঠাকুর শয়ন দিয়ে নিজের অন্যান্য কৃত্যাদি সেরে শয়ন করলেন। একটু নিদ্রিত হতেই পূজারীকে গোপীনাথ স্বপ্নে বলছেন—''পূজারী! উঠ, আমি আমার বস্ত্রাঞ্চলের আড়ালে একটি ক্ষীর ভাণ্ড লুকিয়ে রেখেছি। মাধব পুরী নামে এক সন্ন্যাসী শূন্য হাটে বসে নাম জপ করছেন। তাঁকে এই ভাণ্ড দিয়ে এসো।" পূজারী অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে তৎক্ষণাৎ শয্যা থেকে উঠলেন এবং স্নান করে মন্দিরে প্রবেশ করলেন। দেখলেন শ্রীগোপীনাথের অঞ্চলের নীচে একটি ক্ষীর ভাণ্ড রয়েছে। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই ক্ষীর ভাণ্ড নিয়ে হাটে এলেন এবং ''কোথায় মাধব পুরী!" ''কোথায় মাধব পুরী?" বলে খোঁজ করতে লাগলেন। দেখলেন এক সন্ন্যাসী অশ্রুসিক্ত নয়নে ভগবানের নাম করছেন। পূজারী দেখেই বুঝতে পারলেন, এই সেই মাধব পুরী। তথাপি বললেন—''আপনি কি মাধব পুরী? গোপীনাথ আপনার জন্য ক্ষীর পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই ক্ষীর নিয়ে সুখে ভোজন করুন।" পুরী গোস্বামী পূজারীর কথা শুনে আশ্চর্য্য হলেন। গোপীনাথ তাঁর জন্য এত রাত্রে ক্ষীর পাঠিয়ে দিয়েছেন। গোপীনাথের কৃপা স্মরণে পুরীপাদের নয়ন দিয়ে দর দর করে প্রেমাশ্রু ঝড়তে লাগল। অধমের প্রতি গোপীনাথের এত করুণা! এই কথা বলে বহু যত্ন সহকারে ক্ষীর ভাণ্ডটি হাতে নিয়ে বারংবার শিরে স্পর্শ করতে লাগলেন। তারপর পূজারী সমস্ত কথা বললেন। শুনে মাধব পুরীর অঙ্গে প্রেমবিকার ও পুলকাদি প্রকাশ পেতে লাগল। পূজারী বাহ্মণটি এ সমস্ত দেখে মনে মনে ভাবতে লাগলেন এমন ভক্তশিরোমণি পুরুষ ত কখনও দেখিনি। নিশ্চয়ই কৃষ্ণ এনার বশীভূত। পূজারী ব্রাহ্মণটি মাধব পুরীকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করে গৃহে ফিরলেন। অতঃপর শ্রীমাধব পুরী শ্রীগোপীনাথের দেওয়া ক্ষীর প্রেমাশ্রু-পূর্ণ নয়নে সানন্দে ভোজন করতে লাগলেন এবং ভাণ্ডটি খণ্ড খণ্ড করে ভেঙ্গে চাদরে বেঁধে নিলেন, প্রতিদিন এক এক টুকরা গ্রহণ করবেন এই আশায়।

শ্রীমাধব পুরী প্রসাদ পাওয়ার পর চিন্তা করলেন, ঠাকুর আমাকে ক্ষীর দিয়েছেন,— একথা শুনে দিনের বেলা আমার কাছে লোকের ভিড় হবে। অতএব এক্ষণেই এখান থেকে রওনা হওয়া ভাল। পুরী গোস্বামী এই সমস্ত চিন্তা করে সেখান থেকে গোপীনাথকে দণ্ডবৎ করে পুরীর দিকে রওনা হলেন। যদিও শ্রীমাধবপুরী প্রতিষ্ঠার ভয়ে পালিয়ে গেলেন, প্রতিষ্ঠা তাঁর পেছনে পেছনে ছুটতে লাগল।

''প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত।
যে না বাঞ্ছে তার হয় বিধাতা নির্মিত।।
প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী রহে পলাঞা।
কৃষ্ণপ্রেমে প্রতিষ্ঠা চলে সঙ্গে গড়াঞা।।"

চৈঃ চঃ মধ্যঃ ৪/১৪৭

শ্রীমাধব পুরী নীলাচলে এলেন এবং শ্রীজগন্নাথ দর্শন করলেন। পুরীর অঙ্গে প্রেমবিকার প্রকাশ পেতে লাগল। তাঁর মাহাত্ম্য চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। শ্রীমাধব পুরী গোপালের আজ্ঞা স্মরণ করে মলয়জ চন্দন ও কর্পূর সংগ্রহের জন্য বিশেষ যত্ন করতে লাগলেন। বিশিষ্ট লোক পরম্পরায় রাজা একথা শ্রবণ করলেন। ভক্ত রাজা তা শুনে বড়ই সুখী হলেন। তিনি অমাত্যবর্গকে শীঘ্রই মলয়জ চন্দন ও কর্পূর সংগ্রহ করে পুরী গোস্বামীর হাতে দিতে বললেন। পুরী-গোস্বামীর বাসনা পূর্ণ হল। চন্দন ও কর্পূর সংগ্রহ করা হল। রাজা চিন্তা করলেন—এত চন্দন ও কর্পূর বৃদ্ধ গোস্বামী কি করে নিয়ে যাবেন? তিনি তাঁর সঙ্গে একটি বলবান সেবক দিলেন এবং রাজ্য

সীমানা পার হবার জন্য সরকারী কাগজ পত্রাদিও দিলেন। শ্রীপুরীগোস্বামী পুরী থেকে রওনা হয়ে পুনঃ রেমুনায় এলেন। তথায় শ্রীগোপীনাথকে বহু প্রীতি করে দণ্ডবৎ স্তুতি প্রভৃতি করতে লাগলেন। পূজারী পুনঃ তাঁকে দেখে খুব আনন্দ সহকারে বন্দনাদি করতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন—এঁনার জন্যই গোপীনাথ ক্ষীর চুরি করেছিলেন। তারপর পূজারী খুব যত্ন সহকারে শ্রীগোপীনাথের ক্ষীরপ্রসাদ এনে দিলেন। শ্রীপুরীগোস্বামী পরম ভক্তি সহকারে তা নিয়ে বারংবার বন্দনা করতে করতে ভোজন করলেন এবং রাত্রে দেবালয়ে শয়ন করলেন। একটু তন্দ্রা হলে দেখতে লাগলেন—

''গোপাল আসিয়া কহে শুনহ মাধব।
কর্পূর চন্দন আমি পাইলাম সব।।
কর্পূর সহিত ঘসি এসব চন্দন।
গোপীনাথের অঙ্গে সব করহ লেপন।।
গোপীনাথ আমার সে একই অঙ্গ হয়।
ইঁহাকে চন্দন দিলে আমার তাপ ক্ষয়।।
দ্বিধা না ভাবিহ না করিহ কিছু মনে।
বিশ্বাস করি চন্দন দেহ আমার বচনে।।''

চৈঃ চঃ মধ্যঃ ৪/১৫৮

শ্রীগোপাল বলছেন—মাধব! শুন কর্পূর চন্দন আমি সব পেয়েছি। এ সমস্ত কর্পূর চন্দন ঘসে তুমি গোপীনাথের অঙ্গে লাগাও। তাতেই আমার অঙ্গতাপ নিবৃত্ত হবে। গোপীনাথ ও আমাতে কিছু ভেদ বুদ্ধি করো না। গোপীনাথের ও আমার অঙ্গ অভিন্ন। তুমি এতে দ্বিধা করো না। বিশ্বাস করে গোপীনাথের অঙ্গে চন্দন লাগাও। এই কথা বলে গোপাল অন্তর্হিত হলেন। মাধবপুরীও জেগে উঠলেন। স্বপ্নের কথা চিন্তা করে তিনি আনন্দে বিভোর হলেন। তারপর পূজারীগণকে ডেকে শ্রীগোপালদেবের আজ্ঞা জানিয়ে শ্রীগোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে চন্দন কর্পূর লেপন করতে বললেন। গ্রীষ্মকালে গোপীনাথ অঙ্গে চন্দন ধারণ করবেন শুনে পূজারীগণ আনন্দে বিহ্বল হ'লেন। সমস্ত ব্যবস্থা হল। চার জন লোক চন্দন ঘসতে লাগলেন। গ্রীষ্মকালে প্রতিদিন গোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে চন্দন দেওয়া হ'চ্ছে দেখে শ্রীপুরী গোস্বামীর আর আনন্দের সীমা রইল না। তারপর শ্রীপুরী-গোস্বামী গ্রীষ্মকাল অতীত করে তীর্থ ভ্রমণে বের হলেন।

''জয় জয় শ্রীমাধব পুরী।
গোপীনাথ যাঁর লাগি ক্ষীর কৈল চুরি''।।

শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীকে কৃষ্ণপ্রেমকল্পবৃক্ষের মূল বলেছেন। শ্রীগৌরসুন্দর যখন বাল্যলীলাদি করছেন, তখন শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী বার্দ্ধক্য দশা প্রাপ্ত হয়েছেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বা শ্রীচৈতন্য ভাগবতে মহাপ্রভুর সহিত শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামীর সাক্ষাৎ মিলনের কোন প্রসঙ্গ নাই। তবে শ্রীচৈতন্য ভাগবতে শ্রীমদ্ বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর তীর্থ ভ্রমণ প্রসঙ্গে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর মিলনের কথা বর্ণন করেছেন।

''মাধবেন্দ্র পুরীরে দেখিলেন নিত্যানন্দ।
ততক্ষণে প্রেমে মূর্চ্ছা হইলা নিস্পন্দ।।
নিত্যানন্দে দেখি মাত্র শ্রীমাধব পুরী।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হই আপনি পাসরি।।''

চৈঃ ভাঃ আদি ৯/১৫৯

শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর আরও বলেছেন যে, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীকে গুরু বুদ্ধি করে সেবাদি করতেন।

''শ্রীমাধবেন্দ্র প্রতি নিত্যানন্দ মহাশয়।
গুরু-বুদ্ধি ব্যতিরিক্ত আর না করয়।।''

চৈঃ ভাঃ ৯/১৮৮

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর সঙ্গে





কিছুদিন তীর্থ ভ্রমণাদিও করেছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে পেয়ে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী কত সুখী হয়েছিলেন, তা শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর এইভাবে বলেছেন–

‘‘জানিলু কৃষ্ণের কৃপা আছে মোর প্রতি।
নিত্যানন্দ হেন বন্ধু পাইনু সংহতি।।
যে সে স্থানে যদি নিত্যানন্দ সঙ্গ হয়।
সেই স্থান সর্ব্বতীর্থ বৈকুণ্ঠাদিময়।।”

চৈঃ ভাঃ আদি ৯/১৮৩

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কিছুদিন শ্রীমাধব পুরীর সঙ্গে থাকার পর বৃন্দাবনে চলে আসেন। শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীও দক্ষিণদেশে তীর্থভ্রমণে চলে যান। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর সঙ্গে শ্রীঈশ্বর পুরী, শ্রীরঙ্গ পুরী ও পরমানন্দ পুরী প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণ প্রায় সময় থাকতেন। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী অপ্রকট কালে এই শ্লোকটি উচ্চারণ করেন,--

‘‘অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্।।”

চৈঃ চঃ মধ্যঃ ৪/১৯৭

‘‘হে দীনদয়াদ্রনাথ! হে মথুরানাথ! কবে তোমাকে দর্শন করব। তোমার দর্শন অভাবে আমার কাতর হৃদয় অস্থির হয়ে পড়েছে! হে দয়িত, এখন আমি কি করব?”

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন, ‘‘শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীর কৃত ‘অয়ি দীনদ্রয়াদ্রনাথ’ শ্লোকে মহাপ্রভুর শিক্ষিত তত্ত্ব বীজরূপে ছিল।”

শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, ‘‘ইনি শ্রীমধ্বগৌড়ীয় সম্প্রদায় সেবিত ভক্তিকল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর। ইঁহার পূর্ব্বে শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ে শৃঙ্গার রসাত্মিকা ভক্তির কোন লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইত না।”

গৌড়ীয়গণ এই শ্লোকটিকে বিপ্রলম্ভ রসের সার স্বরূপ মনে করেন। ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর এই শ্লোক স্মরণ মাত্রই প্রেমাবিষ্ট হয়ে পড়তেন। ইনি বাহ্যতঃ দশনামী শঙ্কর সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ছিলেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ছিলেন কৃষ্ণপ্রেমকল্পবৃক্ষের মূল। ভগবান্ ধরাতলে অবতীর্ণ হবার পূর্ব্বেই এই সমস্ত প্রেমিক পরিকরগণকে আবির্ভূত করিয়েছিলেন। শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ও শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর জাগতিক কোন জাতি-বংশাদির কিছুমাত্র আলোচনা করেন নাই। তজ্জন্য সে সমস্ত বিষয় অজ্ঞাত। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী সুদীর্ঘকাল ধরাতলে অবস্থান করে প্রেম ভক্তি বিতরণ করেন। তিনি পরিব্রাজকরূপে ভারতের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করতেন। তিনি বহু লোককে কৃপা করেছেন। তাঁর কৃপা-পাত্রগণের পূর্ণ সংখ্যা পাওয়া না গেলেও উল্লেখ যোগ্য কিছু সন্ন্যাসী ভক্তের পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীঈশ্বর পুরী, শ্রীপরমানন্দ পুরী, শ্রীরঙ্গ পুরী, শ্রীব্রহ্মানন্দ পুরী, শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতী, শ্রীকেশব ভারতী, শ্রীকৃষ্ণানন্দ পুরী, শ্রীরামচন্দ্র পুরী, শ্রীনৃসিংহতীর্থ, শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায় ও শ্রীসুখানন্দ পুরী প্রভৃতি ভক্তগণ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ছিলেন।

‘‘মাধবেন্দ্র পুরী প্রেমময় কলেবর।
প্রেমময় যত সব সঙ্গে অনুচর।।
কৃষ্ণরস বিনু আর নাহিক আহার।
মাধবেন্দ্র পুরী দেহে কৃষ্ণের বিহার”।।

চৈঃ ভাঃ আদি ৯/১৫৪

**।। জয় শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ কি জয়।।**

# শ্রীল ঈশ্বর পুরী

শ্রীমদ্ ঈশ্বর পুরীপাদ স্বয়ং কিরূপে শ্রীগুরু পাদপদ্মের সেবা করতেন, তদ্বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এরূপ লিখেছেন,

''ঈশ্বরপুরী করে শ্রীপাদ সেবন।
স্বহস্তে করেন মলমূত্রাদি মার্জ্জন।।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম করায়ে স্মরণ।
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণলীলা শুনায় অনুক্ষণ।।
তুষ্ট হঞা পুরী তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন।
বর দিলা–'কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেমধন'।।
সেই হৈতে ঈশ্বর পুরী–'প্রেমের সাগর'।।''

চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৮ম ২৬-২৯

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলার নবম পরিচ্ছেদের একাদশ শ্লোকের অনুভাষ্যে শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর লিখেছেন– **''শ্রীঈশ্বরপুরী কুমারহট্টে (ই,বি, আর লাইনে হালিসহর ষ্টেশন) বিপ্রকুলে উদ্ভূত ও শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর প্রিয়তম শিষ্য।''** জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় শ্রীঈশ্বর পুরীর আবির্ভাব।

পূর্ব্বে এক সময় শ্রীঈশ্বরপুরী তীর্থ ভ্রমণ করতে করতে নবদ্বীপ পুরে আগমন করেন এবং শ্রীগোপীনাথ আচার্য্যের গৃহে অবস্থান করেন।

তখন শ্রীগৌরসুন্দর অধ্যয়ন সুখে অবস্থান পূর্ব্বক জননী শ্রীশচীদেবীর আনন্দ বর্দ্ধন করছেন। শ্রীঈশ্বর পুরী ছদ্মবেশে নদীয়া পুরে এলেন।

কৃষ্ণ-রসে পরম-বিহ্বল মহাশয়।
একান্ত কৃষ্ণের প্রিয় অতি দয়াময়।।
তান বেশে তানে কেহ চিনিতে না পারে।
দৈবে গিয়া উঠিলেন অদ্বৈত-মন্দিরে।।

চৈঃ ভাঃ

যেখানে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য শ্রীকৃষ্ণ সেবা করছেন সেখানে সাবধানে গিয়ে বসলেন। বৈষ্ণবের তেজ বৈষ্ণবের কাছে লুকান সম্ভব নয়। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য বারবার তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন; শেষে জিজ্ঞাসা করলেন--বাপ! তুমি কে?

''বৈষ্ণব সন্ন্যাসী তুমি হেন লয় মনে।''

শ্রীঈশ্বরপুরী অতিশয় দৈন্য ভরে উত্তর প্রদান করলেন–

.... আমি শূদ্রাধম।
দেখিবারে আইলাম তোমার চরণ।।

বিপ্র শিরোমণি সন্ন্যাসী প্রবর শ্রীঈশ্বরপুরী কত দৈন্য ভরে উত্তর প্রদান করলেন। দৈন্যই সাধুর ভূষণ।

শ্রীমুকুন্দ দত্ত তাঁকে দেখেই বুঝতে পেরেছেন ইনি বৈষ্ণব সন্ন্যাসী। তখন শ্রীমুকুন্দ অতি সুমধুর স্বরে একটি শ্রীকৃষ্ণ-লীলা কীর্ত্তন ধরলেন। শ্রীমুকুন্দের মধুর কণ্ঠধ্বনির কাছে কে স্থির থাকতে পারেন?

যেই মাত্র শুনিলেন মুকুন্দের গীতে।
পড়িলা ঈশ্বরপুরী ঢলি পৃথিবীতে।।

শ্রীঈশ্বরপুরী প্রেমে ঢলে পড়লেন ভূমির উপর। নয়নের জলে ধরাতল সিক্ত হ'তে লাগল। বৈষ্ণবগণ দেখে অবাক হলেন। পরে বলতে লাগলেন--এমন কৃষ্ণভক্ত ত' কখনও দেখিনি। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য অমনি তাঁকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করলেন। তারপর সকলে চিনতে পারলেন ইনি শ্রীমাধবেন্দ্রের প্রিয় শিষ্য শ্রীঈশ্বরপুরী। সকলে আনন্দে 'হরি' 'হরি' ধ্বনি করতে লাগলেন।

শ্রীঈশ্বরপুরী নবদ্বীপ নগরে অবস্থান করছেন। একদিন দৈবক্রমে পথে শ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। মহাপ্রভু পাঠশালা থেকে গৃহে ফিরছিলেন।

চাহেন ঈশ্বরপুরী প্রভুর শরীর।
সিদ্ধ পুরুষের প্রায় পরম গম্ভীর।।

শ্রীঈশ্বরপুরী একদৃষ্টে শ্রীগৌরসুন্দরের দিকে তাকিয়ে পরে জিজ্ঞাসা করলেন, ''বিপ্রবর! তোমার নাম কি? ঘর কোথায়? কি পুথি পড়াও?''

মহাপ্রভু দৈন্য ভরে শ্রীঈশ্বরপুরীকে নমস্কার করলেন। শিষ্যগণ বলতে লাগলেন– ইঁনি শ্রীনিমাই পণ্ডিত। ঈশ্বর পুরী বললেন–তুমি সেই নিমাই পণ্ডিত! পুরী বড় হরষিত হলেন। মহাপ্রভু বিনীত ভাবে শির নীচু করে বললেন–শ্রীপাদ, কৃপা করে অদ্য আমার ঘরে চলুন। মধ্যাহ্নে তথায় প্রসাদ গ্রহণ করবেন। কত বিনয় ভাবে মধুর বাক্যে আমন্ত্রণ। মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় শ্রীঈশ্বরপুরী তাঁর গৃহে এলেন। মহাপ্রভু প্রণয় ভরে স্বহস্তে পুরীর চরণ ধৌত করে দিলেন। শ্রীশচীমাতা তাড়াতাড়ি বিবিধ নৈবেদ্য প্রস্তুত করে ভগবানকে নিবেদন করলেন। তারপর সে প্রসাদ শ্রীঈশ্বরপুরীপাদকে ভোজন করতে দিলেন। অবশেষ প্রসাদ মহাপ্রভু গ্রহণ করলেন।

বিষ্ণুগৃহে বসে উভয়ে কিছুক্ষণ কৃষ্ণকথা বললেন। উভয়ের মন প্রেমে ভরপুর হয়ে উঠল।

শ্রীঈশ্বরপুরী কয়েক মাস এইরূপে শ্রীগোপীনাথ আচার্য্যের ঘরে রইলেন। মহাপ্রভু নিত্য একবার তাঁর শ্রীচরণ দর্শন করতে আসতেন। মাঝে মাঝে তাঁকে স্বীয় গৃহে আমন্ত্রণ করে নিতেন।

তখন শ্রীগদাধর অতি শিশু। শ্রীঈশ্বরপুরী তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। পুরীপাদ তাঁকে নিজকৃত 'শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত' গ্রন্থ অধ্যয়ন করাতেন।

মহাপ্রভু রোজ সন্ধ্যাকালে শ্রীঈশ্বরপুরীকে প্রণাম করতে যেতেন। একদিন শ্রীঈশ্বরপুরী মহাপ্রভুকে বলতে লাগলেন–

..... তুমি পরম পণ্ডিত।
আমি পুঁথি করিয়াছি কৃষ্ণের চরিত।।
সকল বলিবা; – কোথা থাকে কোন দোষ।
ইহাতে আমার বড় পরম সন্তোষ।।

শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের এ কথা শুনে মহাপ্রভু হাস্য করতে করতে বলতে লাগলেন–

''প্রভু বলে, ভক্তবাক্য কৃষ্ণের বর্ণন।
ইহাতে যে দোষ দেখে সেই পাপী জন।।
ভক্তের কবিত্ব যেতে মতে কেনে নয়।
সর্ব্বথা কৃষ্ণের প্রীতি তাহাতে নিশ্চয়।।

ভক্ত যে ভাবেই শ্রীকৃষ্ণকে বর্ণন করুন না কেন, তাতেই শ্রীহরি প্রীত হন। ভক্তের বাক্যে যে দোষ দেখে শ্রীহরি তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। ভগবান কেবল ভাব গ্রহণ করেন।

মহাপ্রভুর এ কথা শ্রবণে শ্রীঈশ্বরপুরীর ইন্দ্রিয় সমূহে যেন অমৃত সিঞ্চিত হল। তিনি বুঝতে পারলেন শ্রীনিমাই পণ্ডিত অসাধারণ মহাপুরুষ।

শ্রীঈশ্বর পুরী কিছুদিন নবদ্বীপ পুরে ভক্তসঙ্গে অবস্থান করে তীর্থ পর্যটনে বের হলেন।

এদিকে শ্রীগৌরসুন্দর বিদ্যার বিলাস সমাপ্ত করে আত্মপ্রকাশ তথা যুগধর্ম নাম প্রেম বিতরণ করবার ইচ্ছা করলেন। প্রথমে পিতৃ পিণ্ড দানের ছলনা করে গয়া ধামে গেলেন। সে সময় শ্রীঈশ্বর পুরী গয়া ধামে ছিলেন। মহাপ্রভু সর্ব্বত্র পিণ্ড দানাদি শেষ করে যখন শ্রীবিষ্ণু পাদপদ্মে পিণ্ড দানের জন্য এলেন, তখন শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করে এবং তাঁর মাহাত্ম্য শ্রবণ করে প্রেমাবেশে ধরাতলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। দৈবযোগে হঠাৎ শ্রীঈশ্বরপুরী সেখানে এলেন। শ্রীগৌরসুন্দরকে দেখে তিনি অবাক হলেন।

কিছুক্ষণ পরে মহাপ্রভুর চৈতন্য হ'লে সামনে ঈশ্বরপুরীপাদকে দেখলেন। অমনি উঠে তাঁকে দণ্ডবৎ করলেন।

শ্রীঈশ্বরপুরী শ্রীগৌরসুন্দরকে দৃঢ় আলিঙ্গন

করলেন। দুজনার প্রেমাশ্রুতে দুজনে ভাসতে লাগলেন।

মহাপ্রভু বলতে লাগলেন—

প্রভু বলে গয়া যাত্রা সফল আমার।
যতক্ষণে দেখিলাম চরণ তোমার।।
তীর্থে পিণ্ড দিলে সে নিস্তরে পিতৃগণ।
সেহ--যারে পিণ্ড দেয় তরে সেইজন।।
তোমা দেখিলেই মাত্র কোটি পিতৃগণ।
সেইক্ষণে সর্ব্ববন্ধ পায় বিমোচন।।
অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান।
তীর্থেরও পরম তুমি মঙ্গল প্রধান।।

মহাপ্রভু দৈন্যভরে বলতে লাগলেন—আমার সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ আপনার দর্শন মাত্রই সিদ্ধ হয়েছে। আপনি তীর্থ সমূহের পরম তীর্থ স্বরূপ। আপনার চরণরজঃ তীর্থসমূহ প্রার্থনা করে। হে পুরীপাদ, আমি তাই আপনার শ্রীচরণে প্রার্থনা জানাচ্ছি আপনি আমাকে সংসার সিন্ধু থেকে পার করুন ও শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মের অমৃত রস পান করান।

সংসার সমুদ্র হৈতে উদ্ধারহ মোরে।
এই আমি দেহ সমর্পিলাম তোমারে।।
কৃষ্ণ পাদপদ্মের অমৃত রস পান।
আমারে করাও তুমি—এই চাহি দান।।

মহাপ্রভুর এই উক্তি শ্রবণ করে শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ বলতে লাগলেন—

..... শুনহ পণ্ডিত।
তুমি যে ঈশ্বর অংশ জানিনু নিশ্চিত।।

আমি তোমার পাণ্ডিত্য ও চরিত্র দেখেই বুঝতে পেরেছি তুমি ঈশ্বরের অংশে অবতীর্ণ। আমি আজ শুভ স্বপ্ন দেখেছিলাম—তার ফল হাতে হাতে পেলাম। পণ্ডিত! সত্য করে বলছি- তোমাকে দর্শন করে আমি পরম আনন্দ লাভ করেছি। আমি যখন থেকে তোমাকে নবদ্বীপে দেখেছিলাম তখন থেকে আমার চিত্ত কেবল তোমার চিন্তা ছাড়া যেন অন্য চিন্তা করতে চায় না। আমি সত্য করে বলছি, তোমার দর্শনে আমি কৃষ্ণ দর্শন সুখ পাচ্ছি।

মহাপ্রভু এসব কথা শুনে নম্র শিরে বন্দনা করলেন এবং হাস্য করতে করতে বললেন—আমার পরম সৌভাগ্য।

অন্য একদিন মহাপ্রভু বিনীতভাবে শ্রীপুরীপাদের নিকট বললেন আমাকে কৃপা করে মন্ত্র দীক্ষা প্রদান করুন। মন্ত্র দীক্ষার অভাবে আমার চিত্ত বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

পুরীপাদ মহাপ্রভুর কথা শ্রবণ করে অতিশয় আনন্দিত হয়ে বলতে লাগলেন—

পুরী বলে মন্ত্র বা বলিয়া কোন কথা।
প্রাণ আমি দিতে পারি তোমারে সর্ব্বথা।।

চৈঃ ভাঃ আদিঃ ১৭ / ১০

শ্রীঈশ্বরপুরী শ্রীগৌরসুন্দরকে মন্ত্র দীক্ষা প্রদান করলেন।

একদিন শ্রীঈশ্বরপুরী দ্বিপ্রহরে মহাপ্রভুর বাসস্থলে এলেন। মহাপ্রভু তাঁকে দর্শন করে আনন্দে ভাসতে লাগলেন। দণ্ডবৎ প্রণতি করে মধ্যাহ্ন করবার জন্য প্রার্থনা জানালেন। পুরী বললেন—তোমার হস্তের অন্ন ভোজন করা পরম সৌভাগ্যের কথা।

মহাপ্রভু স্বহস্তে রন্ধন করে শ্রীঈশ্বরপুরীপাদকে বহু যত্ন করে ভোজন করালেন। ভোজনানন্তর পুরীপাদের শ্রীঅঙ্গে চন্দন লেপন করলেন এবং পুষ্প মাল্যাদি প্রদান করলেন।

স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর জগতে শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সেবা পরিচর্য্যা ধর্ম শিক্ষা প্রদান করলেন। মহতের পরিচর্য্যা ছাড়া কখনও কৃষ্ণপ্রেমভক্তি পাওয়া যায় না। শ্রীগুরু-পাদ-পদ্ম সেবাই ভক্তির দ্বার।

গৌরসুন্দর গয়া থেকে ফেরবার পথে কুমারহট্টে

শ্রীঈশ্বরপুরীর জন্মস্থানে এসে প্রেম ভরে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। মহাপ্রভুর নয়ন জলে ভূমি সিক্ত হল। পরিশেষে গুরু-পাদপদ্মের জন্মস্থানের ধূলা উড়নীতে বেঁধে নিয়ে নবদ্বীপ অভিমুখে চললেন। বললেন এই ধূলা আমার প্রাণ স্বরূপ।

অতঃপর শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন ও জননীর আদেশে শ্রীপুরীধামে অবস্থান করতে লাগলেন। সে সময় শ্রীঈশ্বরপুরীও অন্তর্ধান লীলা করলেন। অপ্রকট কালে শ্রীঈশ্বর পুরী নিজ সেবক শ্রীগোবিন্দ ও কাশীশ্বর পণ্ডিতকে মহাপ্রভুর নিকট যাওয়ার জন্য আদেশ দিলেন।

মাধবেন্দ্র পুরীবর শিষ্যবর শ্রীঈশ্বর
নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত বিভু।
ঈশ্বর পুরীকে ধন্য করিলেন শ্রীচৈতন্য
জগদ্‌গুরু শ্রীগৌর মহাপ্রভু।

শ্রীমদ্ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—

জয় শ্রীমাধবপুরী কৃষ্ণপ্রেমপূর।
ভক্তিকল্পতরুর তেঁহো প্রথম অঙ্কুর।।
শ্রীঈশ্বরপুরী-রূপে অঙ্কুর পুষ্ট হৈল।
আপনে চৈতন্যমালী স্কন্ধ উপজিল।।

—চৈঃ চঃ আদিঃ ৯/১০-১১

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ যখন গৌড়মণ্ডল পরিক্রমাকালে কুমারহট্টে শুভবিজয় করেছিলেন, সেই সময় তিনি একটি আশ্চর্য বিষয় লক্ষ্য করেছিলেন। ঘটনাটি সরস্বতী জয়শ্রীগ্রন্থে উল্লেখ আছে--

**"কুমারহট্টে সদানন্দ ভট্টাচার্য্য ওরফে পান্তুঠাকুর নামক এক ব্যক্তি বাঙ্গালা ১৩৩০ সালে চৈতন্যডোবার বরাবর একটি খড়ের ঘরে কএকটি কল্পিত মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছেন। তন্মধ্যে গৃহস্থবেশে ঈশ্বরপুরীর (সাদা ধুতি-চাদর-পরা) বৃদ্ধ বয়সের একটি মূর্ত্তি দণ্ডায়মান। তৎসম্মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু কাতরভাবে কৃপা ভিক্ষা করিতেছেন,--এরূপ একটী মূর্ত্তি এবং বেদীর নীচে কতকগুলি নব্য কল্পিত ছড়া লেখা রহিয়াছে, তৎসম্মুখে স্তূপাকৃতি বিল্বপত্র ও রক্তজবা আছে, তদ্দ্বারাই ওখানে পূজা হয়।**

**শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে কুমারহট্টের বিষয় পাঠ হইবার পর শ্রীল প্রভুপাদ বলিতে লাগিলেন—**

**শ্রীমহাপ্রভুকে 'শ্রীঈশ্বরপুরীর শিষ্য' বলিলে ইতিহাসের কথা হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে তত্ত্ববিরোধ হইয়া পড়ে। শ্রীঅদ্বৈত-তনয় পঞ্চমবর্ষীয় শিশু শ্রীঅচ্যুতানন্দ এই কথা জগজ্জীবকে জানাইয়া দেন,—**

"চৌদ্দভূবনের গুরু—চৈতন্য-গোসাঞি।
তাঁর গুরু—অন্য, এই কোন শাস্ত্রে নাই।।"

চৈঃ চঃ আঃ ১২/১৬

**শ্রীগৌরসুন্দর—অভিন্ন নন্দনন্দন। ঈশ্বরপুরী—কৃষ্ণের সেবক, তিনি বহু ভাগ্যফলে গুরুরূপে শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা লাভ করিয়াছিলেন।**

**আজ এখানে আসিয়া এইরূপ তত্ত্ববিরোধপূর্ণ ব্যাপার দেখিয়া বড়ই ব্যথিত হইলাম। বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত অবগত আছেন বা একটুকু বৈষ্ণবতা আছে,—এমন একজনও কি আধুনিক সময়ে এই স্থানে আসেন নাই? শ্রীচৈতন্যচরণে অপরাধযুক্ত বিচার হইতেই এইরূপ তত্ত্ববিরোধপূর্ণ কার্য্যের প্রচার হয়। হায়! হায়!! পাঁচ বছরের শিশু গুরুরূপে আমাদিগকে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা পর্য্যন্ত আমাদের গ্রহণ করিবার যোগ্যতা নাই। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী অধিক-কাল এইজগতে প্রকটিত ছিলেন না। সুতরাং তাঁহার বৃদ্ধাবস্থার শ্রীমূর্ত্তি হইতে পারে না।**

**দ্বিতীয়তঃ শ্রীপাদ পুরী গোস্বামী—**

মাধ্বপারম্পর্য্যে একজন একদণ্ডী সন্ন্যাসী। শ্রীঈশ্বরপুরী হইতে শ্রীগৌরসুন্দরের দীক্ষালীলাভিনয়— পুরীপাদের সন্ন্যাস- গ্রহণের পরবর্ত্তী সময়ের কথা, অতএব শ্রীঈশ্বরপুরীর গৃহস্থবেশে ধুতি-চাদর-পরিহিত শ্রীমূর্ত্তি ও তৎসম্মুখে শ্রীগৌরসুন্দরের দীক্ষা-প্রার্থনা, —এইরূপ ভাবের শ্রীমূর্ত্তির প্রদর্শনে তত্ত্বগত বিচার ছাড়িয়া ঐতিহাসিক বিচার ধরিয়া বিবেচনা করিলেও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায় না।"

।। জয় শ্রীল ঈশ্বর পুরী কি জয়।।

# শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য

'ব্রজে আবেশরুপত্বাদ্ব্যহো যোহুপি সদাশিবঃ।
স এবাদ্বৈতগোস্বামী চৈতন্যাভিন্নবিগ্রহঃ।।'

গৌঃ গঃ ৭৬

ব্রজে যিনি সদাশিব, গৌরলীলায় তিনিই শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভু। তিনি শ্রীচৈতন্যের অভিন্ন শরীর।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য সম্বন্ধে লিখেছেন--

মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ।।
অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে।।

চৈঃ চঃ আদি ১/১২-১৩

—'যে মহাবিষ্ণু মায়াদ্বারা এই জগৎকে সৃষ্টি করেন, তিনি জগৎকর্ত্তা ঈশ্বর, অদ্বৈতাচার্য্য তাঁরই অবতার। হরি হতে অভিন্ন তত্ত্ব বলে তাঁর নাম 'অদ্বৈত', ভক্তি দেন বলে তাঁকে আচার্য্য বলা হয়। সেই ভক্ত-অবতার অদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরকে আমি আশ্রয় করি'।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখেছেন 'মহাবিষ্ণু মায়ার দুই বৃত্তিতে দুইরূপে বিরাজমান। মহাবিষ্ণু প্রকৃতিস্থ হইয়া জগতের নিমিত্ত কারণ, তাহাই বিষ্ণুরূপ, দ্বিতীয় স্বরূপে প্রধানস্থ হইয়া রুদ্ররূপে অদ্বৈত।'

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদবর আদি কবি শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের মহিমা এইভাবে বর্ণন করেছেন—

''সেই নবদ্বীপে বৈসে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য।
অদ্বৈত আচার্য্য নাম সর্বলোক ধন্য।।
জ্ঞান ভক্তি বৈরাগ্যের গুরু মুখ্যতর।
কৃষ্ণভক্তি বাখানিতে যে হেন শঙ্কর।।
ত্রিভুবনে আছে যত শাস্ত্রের প্রচার।
সর্ব্বত্র-বাখানে কৃষ্ণপদ ভক্তিসার।।
তুলসী মঞ্জরী সহিত গঙ্গাজলে।
নিরবধি সেবে কৃষ্ণে মহাকুতূহলে।।






হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণ আবেশের তেজে।
যে ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদি বৈকুণ্ঠেতে বাজে।।
যে প্রেমের হুঙ্কার শুনিঞা কৃষ্ণনাথ।
ভক্তিবশে আপনে যে হইল সাক্ষাৎ।।

চৈঃ ভাঃ আদি ২/৭৮-৮৩

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর পিতা শ্রীকুবের মিশ্র, মাতা শ্রীমতী নাভাদেবী। এনারা পূর্ব্বে শ্রীহট্টে বাস করতেন। শ্রীকুবের পণ্ডিত বহুকাল অপুত্রক ছিলেন। প্রায় বৃদ্ধ বয়সে তিনি এই পুত্ররত্ন লাভ করেন। শ্রীহট্ট জেলার মধ্যে নবগ্রাম নামক স্থানে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের জন্ম হয়। মাঘ শুক্ল সপ্তমী তাঁর পবিত্র জন্ম দিন।

মাঘে শুক্লাতিথি, সপ্তমীতে অতি,
উথলয়ে মহা আনন্দ সিন্ধু।
নাভাগর্ভ ধন্য করি অবতীর্ণ
হৈল শুভক্ষণে অদ্বৈত-ইন্দু।।
কুবের পণ্ডিত হৈয়া হরষিত
নানা দান দ্বিজ দরিদ্রে দিয়া।
সূতিকা মন্দিরে গিয়া ধীরে ধীরে
দেখি পুত্র মুখ জুড়ায় হিয়া।।
নবগ্রামবাসী লোক ধায়া আসি
পরস্পর কহে না দেখি হেন।
কিবা পুণ্যফলে মিশ্র বৃদ্ধ কালে
পাইলেন পুত্র রতন যেন।।
পুষ্প বরিষণ করে সুরগণ
অলক্ষিত রীতি উপমা নহু।
জয় জয় ধ্বনি ভরল অবনী
ভনে ঘনশ্যাম মঙ্গল বহু।।

ভক্তি রত্নাকর ১২/১৭৫৯

তারপর শ্রীকুবের পণ্ডিত গঙ্গাতীরে বাস করবার উদ্দেশ্যে পুত্রকে নিয়ে শান্তিপুরে চলে আসেন এবং গঙ্গাতটে বসবাস করতে থাকেন। পুত্রের নাম করণ করলেন ‘‘মঙ্গল’’। আর এক নাম রাখলেন ‘‘কমলাক্ষ’’। কুবের পণ্ডিত অতি যত্নের সাথে পুত্রকে লালন-পালন করতে লাগলেন। অল্পবয়সে যজ্ঞোপবীত দিলেন। কিছুদিন উপাধ্যায়ের নিকট পড়ালেন। পরে কুবের পণ্ডিত স্বয়ং পুত্রকে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করান। কিছুদিন পরে কুবের পণ্ডিত পত্নীর সঙ্গে পরলোক গমন করেন। পিতা-মাতার অদর্শনে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য বড়ই দুঃখিত হন। তিনি পিতা- মাতার কার্য্যের জন্য গয়াতীর্থে গমন করেন এবং কিছুদিন অন্যান্য তীর্থও পর্য্যটন করেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভু তীর্থ ভ্রমণ করে স্বদেশে ফিরে এলে বন্ধু বান্ধবগণের একান্ত ইচ্ছা হল যে তিনি বিবাহ করেন। তাঁদের ইচ্ছানুসারে তিনি বিবাহ করতে রাজি হলেন। শ্রীনৃসিংহ ভাদুড়ী নামে এক পরমধর্মনিষ্ঠ ধনবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর ‘শ্রী’ ও ‘সীতা’ নামে দুই পরমা সুন্দরী কন্যা ছিলেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য সেই দুই কন্যারই পানি গ্রহণ করলেন। ভাদুড়ী মহাশয় কন্যা জামাতাকে বহু যৌতুকাদি দান করলেন। ‘সীতা’ ঠাকুরাণী সাক্ষাৎ যোগমায়ার অবতার এবং ‘শ্রী’ দেবী যোগমায়ার প্রকাশ স্বরূপিণী। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য সাক্ষাৎ মহাবিষ্ণুর অবতার। তাঁর মধ্যে গোলোকস্থ সদাশিবের প্রকাশ রয়েছে।

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভু ভক্তসঙ্গে কৃষ্ণ কথারসে দিন যাপন করবার জন্য শ্রীমায়াপুরে একটি বসত বাটী নির্মাণ করলেন। শ্রীআচার্য্য প্রতিদিন ভক্তসভায় গীতা-ভাগবত অধ্যয়ন করতেন। কলির জীবের দুর্গতি দেখে তাদের নিস্তারের জন্য তিনি গঙ্গাজল তুলসী দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ আরাধনা করতেন।

‘‘গঙ্গাজলে তুলসীমঞ্জরী অনুক্ষণ।
কৃষ্ণপাদপদ্ম ভাবি করে সমর্পণ।।

কৃষ্ণেরে আহ্বান করে করিয়া হুঙ্কার।
এমতে কৃষ্ণের করাইল অবতার।।

—চৈঃ চঃ আদি ৩/১০৭-১০৮

ভক্তের আহ্বান ভগবান শুনেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের আহ্বান ভগবান শুনলেন। তিনি শীঘ্রই কলির জীবের উদ্ধারের জন্য নদীয়াপুরে শ্রীমিশ্র-গৃহে অবতীর্ণ হলেন। শান্তিপুর থেকে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য ভক্তিবলে তা সমস্ত বুঝতে পারলেন। তিনি প্রথমে সীতা ঠাকুরাণীকে মায়াপুরে মিশ্রগৃহে প্রেরণ করলেন এবং পরে স্বয়ং এলেন।

''দেখিয়া বালক ঠাম, সাক্ষাৎ গোকুল কান,
বর্ণ মাত্র দেখি বিপরীত।।"

চৈঃ চঃ আদি ১৩/১১৫

সাক্ষাৎ সেই গোকুলের হরি। কেবল বর্ণটি বিপরীত—গৌরবর্ণ। আচার্য্যের আনন্দের সীমা রইল না।

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য শ্রীমায়াপুরে একটি টোল স্থাপন করে শাস্ত্র অনুশীলন শুরু করলেন। মহাপ্রভুর বড় ভাই বিশ্বরূপ অদ্বৈত আচার্য্যের টোলে পড়তে আসতেন। মায়ের আদেশে নিমাই দাদা বিশ্বরূপকে ভোজনের জন্য ডাকতে আসতেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য নিমাইয়ের অপূর্ব্ব রূপ দর্শন করে মোহিত হতেন। কিন্তু বুঝতে পারতেন না যে, ইঁনিই তাঁর আরাধ্য ইষ্টদেব।

একদিন শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদ নবদ্বীপে এসে অদ্বৈত ভবনে উপস্থিত হলেন। অদ্বৈত প্রভু ঈশ্বরপুরীর অপূর্ব্ব তেজ দেখে তাঁকে বৈষ্ণব সন্ন্যাসী বলে জানতে পারলেন। পরে মহাপ্রভুর সাথে ঈশ্বরপুরীর মিলন হয়।

একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাসের গৃহে নিত্যানন্দপ্রভুকে ব্যাসপূজা করার জন্য ইঙ্গিত করলে, নিত্যানন্দের ইচ্ছায় শ্রীব্যাসপূজার আয়োজন করা হল। ব্যাসপূজার অধিবাসের দিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দের বলদেবস্বরূপ দর্শন করালেন এবং 'নাড়া' 'নাড়া' বলে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যকে আহ্বানের ছলে নিজের অবতার তত্ত্ব প্রকাশ করলেন—

''অদ্বৈতের লাগি' মোর এই অবতার।
মোর কর্ণে বাজে আসি' নাড়ার হুঙ্কার।।
শয়নে আছিনু মুঞি ক্ষীরোদ-সাগরে।
জাগাই, আনিল মোরে নাড়ার হুঙ্কারে।।

চৈঃ ভাঃ অন্ত ৯/২৯৭-২৯৮

শ্রীবাস অঙ্গনে ব্যাসপূজা সমাপ্ত হলে, মহাপ্রভু ঈশ্বর আবেশে নিজের প্রকাশ বার্ত্তা জানানোর জন্য শ্রীবাসের ছোট ভাই শ্রীরামাইকে বললেন, ''যাও রামাই! তিনি বল, অদ্বৈত আচার্য্য ভগবানকে আনয়নের জন্য যে গঙ্গা জল ও তুলসী পত্র দিয়ে পূজা করতেন, সে পূজা সফল হয়েছে। আমি ঈশ্বর, আমার সাথে নিত্যানন্দও এসেছে। তুমি তাঁকে বল সে তাঁর স্ত্রীসহ এসে আমার পূজা করুক।' মহাপ্রভুর নির্দ্দেশে শ্রীরামাই অদ্বৈত আচার্য্যকে গিয়ে সব কথা বললেন। শুনে অদ্বৈত প্রভু মহা-আনন্দিত হয়ে পত্নী সীতাদেবী, পুত্র অচ্যুতানন্দ এবং অন্যান্য অনুচরবর্গসহ মহাপ্রভুর পূজার জন্য যাত্রা করলেন। তবে মহাপ্রভুকে পরীক্ষা করার জন্য প্রথমে শ্রীবাস অঙ্গনে না গিয়ে শ্রীনন্দন আচার্য্য ভবনে গোপনে অবস্থান করতে লাগলেন। মহাপ্রভু মহাভাব প্রকাশ করে সিংহাসনে বসলেন। নিত্যানন্দ প্রভু ছত্র ধারণ করলেন। গদাধর আদি ভক্তবৃন্দ অন্যান্য সেবায় নিয়োজিত হলেন। মহাপ্রভু বললেন, রামাই! শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য আমাকে পরীক্ষা করার জন্য নন্দন আচার্য্য গৃহে লুকিয়ে রয়েছে। যাও তাঁকে আসতে বল। রামাইর মুখে সব শুনে অদ্বৈত প্রভু

লজ্জিত হলেন। মহাপ্রভুর চরণে এসে দণ্ডবৎ প্রণতি জানালেন। মহাপ্রভুর চরণ ধৌত করে পঞ্চ উপাচারে পূজা করে প্রণাম জানালেন--

'নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।

একদিন শ্রীঅদ্বৈত প্রভু হরিদাস ঠাকুরকে শ্রাদ্ধের অন্ন ভোজন করতে দিলেন। হরিদাস ঠাকুর বললেন, ''আচার্য্য আপনি একি করছেন? শ্রাদ্ধ অন্ন ভোজনের অধিকার একমাত্র ব্রাহ্মণের। আমি অতি নীচ যবন কূলে জন্ম নিয়েছি।'' অদ্বৈত প্রভু বললেন, আপনি অপ্রাকৃত ব্রাহ্মণ–

'আচার্য্য কহেন তুমি না করিহ ভয়।
সেই আচরিব যেই শাস্ত্রমত হয়।।
তুমি খাইলে হয় কোটী ব্রাহ্মণভোজন।
এত বলি শ্রাদ্ধ পাত্র করাইলা ভোজন।।

–চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩/২১৯-২২০

'হরিদাস ঠাকুর-শাখার অদ্ভুত চরিত।
তিনলক্ষ নাম তিঁহো লয়েন অপতিত।।
তাঁহার অনন্ত গুণ, কহি দিঙ্মাত্র।
আচার্য্য গোঁসাঞি যাঁরে ভুঞ্জায় শ্রাদ্ধপাত্র।।

–চৈঃ চঃ আদি ১০/৪৩-৪৪

অদ্বৈত প্রভুর ছয়টি পুত্রের জন্ম হয়। এই পুত্রগণকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সারগ্রাহী এবং অসারগ্রাহী। যাঁরা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রতি আসক্ত এবং অনন্য প্রীতিযুক্ত তাঁরা সারগ্রাহী পুত্র। যাঁরা অদ্বৈত আচার্য্যের অনুগত কিন্তু গৌর বিমুখ অর্থাৎ অদ্বৈত আচার্য্যকেই স্বতন্ত্র ঈশ্বররূপে প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাঁরা অসারগ্রাহী পুত্র। সারগ্রাহী পুত্রগণ শ্রীঅচ্যুতানন্দ, শ্রীকৃষ্ণমিশ্র ও শ্রীগোপাল মিশ্র। অসারগ্রাহী পুত্রগণ বলরাম, স্বরূপ ও জগদীশ। সারগ্রাহী পুত্রগণকে শষ্যবিশিষ্ট ধান এবং অসারগ্রাহী পুত্রগণকে শষ্যশূন্য পাত্না বা চিটার সাথে তুলনা করা হয়েছে।

'ধান্যরাশি মাপে যৈছে পাত্না সহিতে।
পশ্চাতে পাত্না উড়াঞা সংস্কার করিতে।।

–চৈঃ চঃ আদি ১২/১২

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। মহাপ্রভুর গুরু শ্রীঈশ্বরপুরীর গুরুভ্রাতা। গুরুদেবের গুরুভাই গুরুতুল্য হয়। সেকারণে মহাপ্রভু অদ্বৈত আচার্য্যকে গুরুর মত সম্মান করতেন। যদিও মহাপ্রভু জীব শিক্ষার জন্য এসব করতেন, কিন্তু অদ্বৈত আচার্য্য এতে অনেক দুঃখ পেতেন। অদ্বৈতের দুঃখ মহাপ্রভু ভগবান, তিনি আমাকে দণ্ড দেবেন। সম্মান করবেন কেন?

মহাপ্রভুর দণ্ড লাভের জন্য শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য শান্তিপুরে গিয়ে কিছু দুর্ভাগা ব্যক্তির নিকট জ্ঞানমার্গ ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। তা শুনে মহাপ্রভু অত্যন্ত রেগে শান্তিপুরে গিয়ে অদ্বৈত প্রভুকে প্রহার করতে লাগলেন। মার খেয়ে অদ্বৈত নাচতে নাচতে বলতে লাগলেন, দেখ! আজ আমার বাঞ্চা সফল হয়েছে। মহাপ্রভু আমাকে গুরুজ্ঞান করতেন। আজ নিজের দাস জ্ঞানে আমাকে মায়াবাদরূপ দুর্ম্মতি হতে রক্ষা করতে এসেছেন। আচার্য্যের কথা শুনে লজ্জিত হয়ে মহাপ্রভু তাঁর প্রতি প্রসন্ন হলেন।

'আচার্য্য গোঁসাঞিরে প্রভু করে গুরুভক্তি।
তাহাতে আচার্য্য বড় হয় দুঃখমতি।।
ভঙ্গী করি জ্ঞানমার্গ করিল ব্যাখ্যান।
ক্রোধাবেশে প্রভু তারে কৈল অবজ্ঞান।।
তবে আচার্য্য গোসাঞির আনন্দ হইল।
লজ্জিত হইয়া প্রভু প্রসাদ করিল।।''

–চৈঃ চঃ আদি ১৭/৬৬-৬৮

'পূর্ব্বে মহাপ্রভু মোরে করেন সম্মান।
দুঃখ পাই' মনে আমি কৈলু অনুমান।।

মুক্তি শ্রেষ্ঠ করি কৈনু বাশিষ্ঠ ব্যাখ্যান।
ক্রুদ্ধ হঞা প্রভু মোরে কৈল অপমান।।
—চৈঃ চঃ আদি ১২/৩৯-৪০

মহাপ্রভু সবক্ষমা করেন, কিন্তু বৈষ্ণব অপরাধ ক্ষমা করেন না। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য এবং শচীমাতাকে দিয়ে তিনি এই শিক্ষা জগৎকে দেখিয়েছেন।

অদ্বৈত আচার্য্যের টোলে পড়তে পড়তে শচীমায়ের বড় ছেলে বিশ্বরূপ ঘর ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে যায়। দ্বিতীয় ছেলে নিমাইও অদ্বৈতের কাছে গিয়ে সারাক্ষণ বসে থাকেন, সংসারের প্রতি কোন মন নেই। লদীপ্রিয়াকে ছেড়ে সবসময় অদ্বৈতের কাছে বসে থাকে। তাই দুঃখ করে একদিন বলেই ফেললেন--

'সেই দুঃখে সবে এই বলিলেন আই।
''কে বলে, 'অদ্বৈত' 'দ্বৈত' এ বড় গোঁসাঞি।।
চন্দ্রসম এক পুত্র করিয়া বাহির।
এহো পুত্র না দিলেন করিবারে স্থির।।
অনাথিনী মোরে ত' কাহারো নাহি দয়া।
জগতে 'অদ্বৈত', মোহে সে 'দ্বৈত-মায়া'।।'
—চৈঃ ভাঃ মধ্য ২২/১১৪-১১৬

অর্থাৎ পুত্রস্নেহের কারণে শচীমাতা অদ্বৈতকে 'দ্বৈত' বলে কটাক্ষ করলেন। তা কেউ জানতে পারেনি। শুধুমাত্র মহাপ্রভুই অন্তর্য্যামীসূত্রে জানতে পেরেছিলেন।

যখন মহাপ্রভু শ্রীবাস অঙ্গনে সাত প্রহর ব্যাপী ভগবৎ ভাব প্রকাশ করে ভক্তগণকে দর্শন দিয়ে কৃতার্থ করছিলেন, তখন শ্রীবাস বললেন, প্রভু! আপনার এই রূপ একবার শচীমাতাকেও দর্শন দিন। মহাপ্রভু বললেন—আমার মা অদ্বৈত আচার্য্যের চরণে অপরাধ করেছেন। সুতরাং তাঁকে আমি এই রূপ দেখাব না। মাতাকে এইরূপ দেখাতে পারি যদি তিনি শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করেন, আর অদ্বৈত আচার্য্য যদি ক্ষমা করেন তবেই। ভক্তগণের মুখে একথা শোনামাত্রই অদ্বৈত আচার্য্য শচীমাতার গুণগান করতে করতে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে পড়ে গেলেন। সেই সুযোগে শচীমাতা এসে অদ্বৈতের চরণধূলি মস্তকে ধারণ করলেন। তখন করুণাময় গৌরহরি প্রসন্ন হয়ে শচীমাতাকে নিজ রূপ দর্শন করালেন। এখানে আরও একটি শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। বৈষ্ণবের কখনও অভিমান হয় না। অভিমান শূন্য অদ্বৈতাচার্য্য কখনই শচীমায়ের অপরাধ গ্রহণ করেনি। আর শচীমাতা! যিনি স্বয়ং মহাপ্রভুকে গর্ভে ধারণ করেছেন, তিনিও অভিমান শূন্য। তাই বিনা দ্বিধায় অদ্বৈত আচার্য্যের কাছে তিনি ক্ষমা চেয়েছেন।

কাটোয়ায় কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হয়ে বৃন্দাবনের দিকে যাত্রা করলে নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব সন্ন্যাস মূর্ত্তি ভক্তগণকে দেখানোর জন্য ছল করে বৃন্দাবনের পরিবর্তে মহাপ্রভুকে শান্তিপুরে নিয়ে আসেন। সেখানে অদ্বৈত আচার্য্যকে দেখে মহাপ্রভু আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, অদ্বৈত তুমি কি করে জানলে আমি বৃন্দাবনে? অদ্বৈত প্রভু বললেন, প্রভু তুমি যেখানে সেখানেই বৃন্দাবন। মহাপ্রভু বুঝলেন নিত্যানন্দ তাঁকে ছল করে শান্তিপুরে নিয়ে এসেছে। শান্তিপুরে মহাপ্রভুর আগমনের বার্তা শুনে শচীমাতা এবং নবদ্বীপবাসী ভক্তগণ অদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁরা সকলেই মহাপ্রভুর সন্ন্যাসীরূপ দর্শন করে মোহিত হলেন। অদ্বৈত পত্নী সীতাদেবী রন্ধন করলেন। মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ প্রভু ভোজন করলেন। শচীদেবীও মহাপ্রভুর জন্য রন্ধন করেছিলেন, মহাপ্রভু তাও ভোজন করলেন। ভক্তগণের সমাবেশ ও মহোৎসবে শান্তিপুরের অদ্বৈত ভবন বৈকুণ্ঠে পরিণত হল।

'আনন্দে নাচয়ে সবে বলি' হরি হরি।
আচার্য্যমন্দির হৈল শ্রীবৈকুণ্ঠপুরী।।

—চৈঃ চঃ মধ্য ৩/১৫৬

শ্রীমন্মহাপ্রভু শচীমায়ের ইচ্ছায় শান্তিপুরের ভক্তগণের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নীলাচলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য এবং নবদ্বীপবাসী ভক্তগণ মহাপ্রভুর অদর্শনে বিরহে সন্তপ্ত হলেন।

মহাপ্রভু নীলাচলে চলে গেলে, ভক্তগণ প্রতিবছর রথে পুরীতে যেতেন। সেখানে গিয়ে চার মাস মহাপ্রভুর সাথে অবস্থান করতেন। অদ্বৈত আচার্য্যও প্রতিবছর পুরীতে যেতেন এবং সেখানে মহাপ্রভুর সাথে নরেন্দ্র সরোবরে জলকেলি, গুণ্ডিচা মন্দির মার্জন এবং রথের সামনে নৃত্য প্রভৃতি করতেন। অদ্বৈত আচার্য্য সাতটি কীর্তনের সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথম সম্প্রদায়ের প্রধান নর্ত্তক ছিলেন।

একবার গুণ্ডিচা মন্দিরে অদ্বৈতের পুত্র গোপাল মিশ্র মহাপ্রভুর সামনে নৃত্য করতে করতে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। সংজ্ঞাহীন পুত্রকে কোলে নিয়ে অদ্বৈত আচার্য্য নৃসিংহ মন্ত্র জপ করতে লাগলেন। নানা মন্ত্র পাঠ করেও গোপালের সংজ্ঞা না ফিরলে বৈষ্ণবগণ ক্রন্দন করতে শুরু করেন। মহাপ্রভু তখন গোপালের হৃদয় স্পর্শ করে বললেন, উঠ গোপাল! 'হরি হরি বল'। অমনি গোপাল উঠে দাঁড়ালেন এবং হরিবোল বলে নৃত্য শুরু করলেন। ভক্তগণও হরিবোল বলতে লাগলেন।

পুরীতে থাকাকালে একদিন অদ্বৈত আচার্য্য মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করলেন। তাঁর ইচ্ছা মহাপ্রভুকে একাকী মনের মত করে ভোজন করাবেন। ভগবৎ ইচ্ছায় প্রচুর ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়। মহাপ্রভুর সাথে যে সমস্ত সন্ন্যাসীগণ আসতেন তাঁরা আর কেউ আসতে পারলেন না। মহাপ্রভু একাই অদ্বৈত গৃহে উপস্থিত হলেন। অদ্বৈত প্রভু প্রাণ ভরে মহাপ্রভুকে ভোজন করালেন।

পুরী হতে বিদায়ের সময় অদ্বৈত আচার্য্যের প্রতি মহাপ্রভুর যে উক্তি, তাতেই জানা যায় অদ্বৈত আচার্য্য মহাপ্রভুর কত প্রিয়—

'আইলেন আচার্য্য গোসাঞি মোরে কৃপা করি।
প্রেম-ঋণে বদ্ধ আমি, শোধিতে না পারি।।
মোর লাগি স্ত্রী পুত্র-গৃহাদি ছাড়িয়া।
নানা দুর্গম পথ লঙ্ঘি, আইসেন ধাঞা।।
আমি এই নীলাচলে রহি যে বসিয়া।
পরিশ্রম নাহি মোর সবার লাগিয়া।।
সন্ন্যাসী মানুষ মোর নাহি কোন ধন।
কি দিয়া তোমার ঋণ করিমু শোধন।।
দেহ মাত্র ধন তোমায় কৈলু সমর্পন।
তাঁহা বিকাই, যাঁহা বেচিতে তোমার মন।।

—চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ১২/৭০-৭৪

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য পুরী থেকে শান্তিপুরে ফিরে আসেন। কিছুদিন পরে মহাপ্রভু কর্ত্তৃক প্রেরিত শ্রীজগদানন্দের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। জগদানন্দকে পেয়ে অদ্বৈত আচার্য্য পরম আনন্দিত হলেন। জগদানন্দ নদীয়া থেকে নীলাচলে ফেরার সময় অদ্বৈত আচার্য্যের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলে, অদ্বৈত আচার্য্য একখানি প্রহেলিকা বচন (চিঠি) মহাপ্রভুর নিকট প্রেরণ করলেন। সেই তর্জ্জা-প্রহেলীর অর্থ মহাপ্রভু ছাড়া কেউ বুঝতে পারেনি। তর্জ্জা প্রহেলী--

'প্রভুরে কহিহ আমার কোটি নমস্কার।
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার।।
বাউলকে কহিহ-লোক হইল বাউল।
বাউলকে কহিহ হাটে না বিকায় চাউল।।
বাউলকে কহিহ কাযে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিহ ইহা কহিয়াছে বাউল।।'

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৯/১৯-২১

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তরজার (চিঠির) তাৎপর্য অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে লিখেছেন– ''মহাপ্রভুকে কহিও যে, লোক প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছে। আর প্রেমের হাটে প্রেমরূপ চাউল বিক্রয়ের স্থান নাই। মহাপ্রভুকে কহিও যে, আউল অর্থাৎ প্রেমোন্মত্ত বাঞ্ল উল আর সাংসারিক কার্য্যে নাই। মহাপ্রভুকে কহিও যে, প্রেমোন্মত্ত হইয়াই অদ্বৈত একথা কহিয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, প্রভুর আবির্ভাব হইবার যে তাৎপর্য্য ছিল, তাহা সম্পূর্ণ হইল। এখন প্রভুর যাহা ইচ্ছা, তাহাই হউক।"

শ্রীঅদ্বৈত প্রভু একসময় বৃন্দাবনে গিয়ে 'শ্রীমদন গোপালের সেবা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সে সময় বৃন্দাবনে যে বটবৃক্ষের নীচে তিনি অবস্থান করতেন, সেই স্থানটি 'অদ্বৈতবট' নামে প্রসিদ্ধ।

'যে বটবৃক্ষের তলে অদ্বৈতের স্থিতি।
সর্ব্বত্র হইল সে 'অদ্বৈতবট' খ্যাতি।।

–ভক্তিরত্নাকর ৫/২০৯১

একসময় মহাপ্রভু অদ্বৈত আচার্য্যকে বর দিতে চাইলে অদ্বৈত আচার্য্য বললেন--

অদ্বৈত বলয়ে যদি ভক্তি বিলাইবা।
স্ত্রী, শূদ্র আদি যত মূর্খেরে সে দিবা।।

–চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ৬/১৬৭

করুণাময় গৌরহরি ভক্তবাক্য সত্য করার জন্য জগতে দীন, হীন, পাপী ও পাষণ্ডী প্রভৃতিকেও ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম দান করলেন।

জয় জয় অদ্বৈতাচার্য্য দয়াময়।
যাঁর হুঙ্কারে গৌর অবতার হয়।।
প্রেমদাতা সীতানাথ করুণাসাগর।
যাঁর প্রেমরসে আইলা গৌর দয়াময়।।
যাঁহারে করুণা করি কৃপা দিতে চায়।
প্রেমরসে সে জন চৈতন্যগুণ গায়।।
তাঁহার পদেতে যেবা লইল শরণ।
সেজন পাইল গৌর-প্রেম মহাধন।।
এমন দয়ার নিধি কেনে না ভজিলুঁ।
লোচন বলে নিজ মাথে বজর পাড়িলু।।

।। জয় শ্রীশ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভু কি জয়।।



# শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু

শ্রীগৌরসুন্দর মহাবদান্য; কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ যাঁকে আত্মসাৎ করেন নাই, শ্রীগৌরসুন্দর তাঁকে কখনই কৃপা করেন না। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন।

সংসারের পার হই ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে, সে ভজুক নিতাই চাঁদেরে।।
বৈষ্ণব চরণে মোর এই মনস্কাম।
ভজি যেন জন্মে জন্মে প্রভু বলরাম।।

—চৈঃ ভাঃ আঃ ১/৭৭-৭৮

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর নিজ প্রভু শ্রীনিত্যানন্দকে বহু নামে অভিহিত করেছেন। শ্রীনিত্যানন্দ অবধূত, শ্রীনিত্যানন্দ চন্দ্র, নিত্যানন্দ প্রভু, নিত্যানন্দ মহামহেশ্বর, নিত্যানন্দ সিংহ, নিত্যানন্দ মহামল্ল, অবধূত চন্দ্র, অবধূত রায় ও শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের প্রিয় বিগ্রহ ইত্যাদি।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বলদেবাভিন্ন বিগ্রহ। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর এভাবে নিজ ইষ্ট দেবের বন্দনা করেছেন—

ইষ্টদেব বন্দো মোর নিত্যানন্দ রায়।
চৈতন্যের কীর্ত্তি স্ফুরে যাঁহার কৃপায়।।
সহস্র বদন বন্দো প্রভু-বলরাম।
যাঁহার সহস্র মুখে কৃষ্ণযশোধাম।।
মহারত্ন থুই যেন মহাপ্রিয় স্থানে।
যশোরত্ন ভাণ্ডার শ্রীঅনন্ত বদনে।।
অতএব আগে বলরামের স্তবন।
করিলে সে মুখে স্ফুরে চৈতন্য কীর্ত্তন।।
সহস্রেক ফণাধর প্রভু বলরাম।
যতেক করয়ে প্রভু সকল-উদ্দাম।।

—চৈঃ ভাঃ আদিঃ ১/১১-১৫

শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীবৃন্দাবন দাসের শ্রীচরণরেণুস্মরণে এরূপ বর্ণনা করেছেন—

সর্ব্ব-অবতারী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
তাঁহার দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম।।
একই স্বরূপ-দোঁহে, ভিন্ন মাত্র কায়।
আদ্য কায়ব্যূহ, কৃষ্ণ লীলার সহায়।।
সেই কৃষ্ণ-নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র।
সেই বলরাম—সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ।।

—চৈঃ চঃ আদি ৫/৪-৬

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব সম্বন্ধে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর এরূপ বর্ণনা করছেন—

ঈশ্বরের আজ্ঞায় আগে শ্রীঅনন্ত ধাম।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ রাম।।
মাঘ মাসে শুক্লা ত্রয়োদশী শুভদিনে।
পদ্মাবতী গর্ভে একচাকা নাম গ্রামে।।
হাড়াই পণ্ডিত নামে শুদ্ধ বিপ্ররাজ।
মূলে সর্ব্বপিতা তানে করে পিতা ব্যাজ।।

—চৈঃ ভাঃ আদি ২/১২৮-১৩০

রাঢ় দেশ,বীরভূম জেলার অন্তর্গত। একচাকা গ্রাম রাঢ় পরগণার মধ্যে। ঐ গ্রামের নাম শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরচন্দ্রের নামে বীরচন্দ্রপুর নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু একচাকা গ্রামে অবতীর্ণ হন। পিতার নাম শ্রীহাড়াই পণ্ডিত বা শ্রীহাড়ো ওঝাঁ। তিনি মৈথিল ব্রাহ্মণ ছিলেন, উপাধ্যায় কৌলিক উপাধির অপভ্রংশই ওঝাঁ বা ঝাঁ। মাতার নাম শ্রীপদ্মাবতী দেবী। ব্রাহ্মণ দম্পতির নিত্য ভগবদ্ আরাধনা ও বৈষ্ণব সেবার ফলে, আদি বৈষ্ণব ধাম

শ্রীঅনন্ত দেবকে পুত্ররূপে লাভ করেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাবে সমস্ত রাঢ় দেশে সর্ব্ব সুমঙ্গল অভ্যুদয় লক্ষিত হয়েছিল। দ্বাপর যুগে যেমন শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তেমনি কলিযুগেও শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরসুন্দরের বড় ভ্রাতা রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। যখন শ্রীগৌরসুন্দর নবদ্বীপ মায়াপুরে এক বৎসর পরে আবির্ভূত হলেন, তখন অন্তর্য্যামী নিত্যানন্দ প্রভু তাঁর আবির্ভাব জানতে পেরে আনন্দে মহা হুঙ্কার ধ্বনি করে উঠলেন। ঐ হুঙ্কার ধ্বনি শুনে দেশবাসী জনসাধারণ নানাপ্রকার মত প্রকাশ করেছিলেন। কেউ বললেন বজ্রপাত হয়েছে, কেউ বললেন রাঢ় দেশে মৌড়েশ্বর নামক যে শিব আছেন তিনি হুঙ্কার করে উঠেছেন, কেউ বললেন ভগবান্ গর্জ্জন করেছেন, এরূপ অনেক লোক অনেক প্রকার কথা বললেন।

শ্রীল বৃন্দাবন দাস তাঁর ইষ্ট দেব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্ম লীলা, শৈশব লীলা, পৌগণ্ড লীলা, কৈশোর লীলা ও যৌবন লীলাদির দিব্যাতি দিব্য লোকাতীত অলৌকিক স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের যাবতীয় লীলা লৌকিক ভাবের মধ্যে ঈশ্বরীয় ভাবের কথা বলেছেন। এরূপে দুই প্রভুর লীলার মাধুর্য্য তিনি আস্বাদন করেছেন।

শ্রীনিত্যানন্দের শৈশব লীলা অলৌকিক দিব্য ভাবাবেশে শ্রীরামচন্দ্রের ও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মধুর বাল্য লীলাদির অভিনয়ের কথা বর্ণনা করেছেন। জাগতিক শিশুগণের যে ধর্ম– ভোজনার্থে বার বার ক্রন্দন-চঞ্চলতা, ভয়-ভীতি স্বভাব ও বস্তুর অপচয় প্রভৃতি ধর্ম্মের কথা নিত্যানন্দ চরিতে দেখা যায়নি, কিন্তু গৌরসুন্দরের চরিতে বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে।

শ্রীল বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দের অলৌকিক শৈশব লীলা এরূপ বর্ণনা করেছেন–

শিশুগণ সঙ্গে প্রভু যত ক্রীড়া করে।
শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য বিনা আর নাহি স্ফুরে।।
দেব সভা করেন মিলিয়া শিশুগণে।
পৃথিবীর রূপে কেহ করে নিবেদনে।।
তবে পৃথ্বী লৈয়া সবে নদী তীরে যায়।
শিশুগণ মেলি স্তুতি করে ঊর্দ্ধ রায়।।
কোন শিশু লুকাইয়া ঊর্দ্ধ করি বোলে।
জন্মিবাঙ্ গিয়া আমি মথুরা গোকুলে।।
কোনদিন নিশাভাগে শিশুগণ লৈয়া।
বসুদেব দেবকীর করায়েন বিয়া।।
বন্দি ঘর করিয়া অত্যন্ত নিশা ভাগে।
কৃষ্ণ জন্ম করায়েন কেহ নাহি জাগে।।
গোকুল সৃজিয়া তথি আনেন কৃষ্ণেরে।
মহামায়া দিলা লৈয়া ভাণ্ডিলা কংসেরে।।
কোনদিন সাজায়েন পূতনার রূপে।
কেহ স্তন পান করে উঠি তার বুকে।।

আবার রামলীলা অভিনয় করতেন–

কোনদিন নিত্যানন্দ সেতুবন্ধ করে।
বানরের রূপ সব শিশুগণ ধরে।।
ভেরেণ্ডার গাছ কাটী ফেলায়েন জলে।
শিশুগণ মিলি জয় রঘুনাথ, বলে।।
শ্রীলদণ রূপ প্রভু ধরিয়া আপনে।
ধনু ধরি কোপে চলে সুগ্রীবের স্থানে।।
আরেরে বানরা মোর প্রভু দুঃখ পায়।
প্রাণ না লইমু যদি তবে ঝাট আয়।।
মাল্যবান্ পর্ব্বতে মোর প্রভু পায় দুঃখ।
নারীগণ লৈয়া বেটা তুমি কর সুখ।।

কোনদিন ক্রুদ্ধ হৈয়া পরশুরামেরে।
মোর দোষ নাহি বিপ্র পলাহ সত্ত্বরে।।
লদণের ভাবে প্রভু হয় সেইরূপ।
বুঝিতে না পারে শিশু মানয়ে কৌতুক।।

✸ ✸ ✸

ইন্দ্রজিৎ বধ লীলা কোনদিন করে।
কোনদিন আপনে লদণ ভাবে হারে।।
বিভীষণ করিয়া আনেন রাম স্থানে।
লঙ্কেশ্বর অভিষেক করেন তাহানে।।
কোন শিশু বোলে, মুঞি আইলুঁ রাবণ।
শক্তি লেহ হানি এহ সম্বর লক্ষণ।।
এত বলি পদ্ম পুষ্প মারিল ফেলিয়া।
লক্ষ্মণের ভাবে প্রভু পড়িলা ঢলিয়া।।

—চৈঃ ভাঃ

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এভাবে যখন মূর্চ্ছা গেলেন তখন সঙ্গের শিশুগণ তাঁকে জাগানোর চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু যেন তিনি প্রাণ শূন্য ভাবে পড়ে রইলেন, তা দেখে শিশুগণ এবার ভীত হয়ে শীঘ্র নিত্যানন্দের মাতা ও পিতার নিকট এসে এসব কথা জানালেন! তাঁরাও শীঘ্র সেখানে ছুটে গেলেন, দেখলেন সত্য সত্যই যেন প্রাণশূন্য নিত্যানন্দ। কেউ বললেন শিশু ভাবাবিষ্ট হয়েছে, কেউ বললেন অভিনয় করছে, হনুমান ঔষধ দিলে ভাল হবে। তখন কোন শিশু হনুমানের ভাবে শীঘ্র ঔষধ নিয়ে এলেন। এক শিশু বৈদ্য বেশে সেই আনীত বৃক্ষলতার রস নিঙ্গড়িয়ে নিত্যানন্দের নাকে দিলেন। তৎক্ষণাৎ নিত্যানন্দ প্রভু চৈতন্য লাভ করে উঠে বসলেন, সকলে অবাক হয়ে গেলেন, বললেন আমরা কখনও এরকম খেলা দেখিনি। সকলে তখন জিজ্ঞাসা করলেন তুমি এসব খেলা কোথায় শিখলে? নিত্যানন্দ বললেন—আমার এ সকল লীলা। অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ লীলা। কেউই কিন্তু নিত্যানন্দের যথার্থ স্বরূপ জানতে পারলেন না। **"চিনিতে না পারে কেহ বিষ্ণুমায়াবশে"** এরূপ ভাবে নিত্যানন্দ প্রভু শৈশব ও পৌগণ্ড অতিক্রম করে কৈশোর বয়সে পদার্পণ করলেন। তখন তাঁর বয়স বার বছর ।

শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীহাড়াই ও পদ্মাবতীর একমাত্র নয়নমণি ও প্রাণ ছিলেন। মাতা পিতা নিত্যানন্দকে একমুহূর্ত্তও না দেখলে থাকতে পারতেন না। হাড়াই পণ্ডিত নানা কার্য্যের মধ্যে ব্যস্ত থাকলেও প্রাণটি নিত্যানন্দের প্রতি পড়ে থাকত।

একদিন এক বৈষ্ণব সন্ন্যাসী হাড়াই পণ্ডিতের ঘরে অতিথি হলেন। হাড়াই পণ্ডিত সন্ন্যাসীকে সযত্নে সেবা করতে লাগলেন। রাত্রিকালেও সন্ন্যাসী হাড়াই পণ্ডিতের ঘরে অবস্থান করলেন। নিত্যানন্দ প্রভু সন্ন্যাসীকে পেয়ে আনন্দে বিভোর হলেন। সমস্ত রাত্রি সন্ন্যাসীর সঙ্গে কৃষ্ণ কথায় যাপন করলেন। নিত্যানন্দের সর্বাকর্ষণ স্বভাবে সন্ন্যাসী পরমাকৃষ্ট হলেন। নিত্যানন্দের সঙ্গ ত্যাগ করতে আর ইচ্ছা করলেন না। প্রাতঃকালে সন্ন্যাসী বিদায় সময় ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর কাছে নিত্যানন্দকে ভিক্ষা চাইলেন। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী সন্ন্যাসীর কথা শুনে বিনা মেঘে বজ্রপাতের ন্যায় যেন মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হলেন, কি নিদারুণ কথা, একমাত্র প্রাণের প্রাণ-স্বরূপ পুত্র নিত্যানন্দকে ভিক্ষা দিতে হবে। পরিশেষে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক বিচার করলেন, পূর্ব্ব কালে মহারাজ দশরথ যেমন বিশ্বামিত্রের হাতে রাম লদণকে ভিক্ষা দিয়েছিলেন, সেরকম আজ এ সন্ন্যাসীর হাতে নিত্যানন্দকে সমর্পণ করব, নতুবা আমাদের পরম অধর্ম হবে। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী ক্রন্দন করতে করতে নিত্যানন্দকে অর্পণ করলেন। অতীব অনুনয়ের সঙ্গে বললেন আমাদের একমাত্র প্রাণটিকে আপনাকে দিলাম। আপনি সর্ব্বতোভাবে এঁকে রক্ষণাবেক্ষণ

করবেন। সন্ন্যাসীর সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ তীর্থ ভ্রমণে চললেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে নবম অধ্যায়ে নিত্যানন্দের তীর্থ ভ্রমণ কথাটি বিস্তৃত ভাবে আছে।

পশ্চিম ভারতে ভ্রমণ কালে নিত্যানন্দ প্রভুর সাথে অকস্মাৎ শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর সাক্ষাৎ হয়। একে অপরকে দর্শনে উভয়ের হৃদয়ে প্রেম সমুদ্র যেন উথলে উঠল। উভয়ের অপূর্ব্ব প্রেমাবেশ দর্শনে ঈশ্বর পুরী প্রভৃতি শিষ্যগণ বিস্মিত হলেন। নিত্যানন্দ প্রভুকে পেয়ে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ আনন্দে বলতে লাগলেন—

.......... প্রেম না দেখিলুঁ কোথা
সেই মোর সর্ব্ব তীর্থ হেন প্রেম যথা।।
জানিলু কৃষ্ণের কৃপা আছে মোর প্রতি।
নিত্যানন্দ হেন বন্ধু পাইনু সংহতি।।
যে সে স্থানে যদি নিত্যানন্দ সঙ্গ হয়।
সেই স্থান সর্ব্বতীর্থ বৈকুণ্ঠাদিময়।।
নিত্যানন্দ হেন ভক্ত শুনিলে শ্রবণে।
অবশ্য পাইব কৃষ্ণচন্দ্র সেই জনে।।

—চৈঃ ভাঃ আদিঃ ৯/১৮২-১৮৫

কিছুদিন নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর সঙ্গে পরম সুখে কৃষ্ণকথা আলোচনায় অতিবাহিত করলেন। অনন্তর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সেতুবন্ধাদি তীর্থ দর্শনে চললেন। ক্রমে তিনি ধনুস্তীর্থ, বিজয় নগর, অবন্তি দেশ ও গোদাবরী প্রভৃতি দর্শন করে পুরী ধামে এলেন। শ্রীজগন্নাথ দর্শনে অতীব প্রেমাবিষ্ট হয়ে নৃত্য গীতাদি করলেন। কয়েক দিন সেখানে অবস্থানের পর তিনি গঙ্গাসাগর তীর্থে আগমন করলেন। গঙ্গাসাগর হতে শ্রীব্রজমণ্ডলে গমন করলেন। ব্রজ ধামে গমন করে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এক অপূর্ব্ব প্রেমাবস্থা প্রাপ্ত হলেন।

নিরবধি বৃন্দাবনে করেন বসতি।
কৃষ্ণের আবেশে না জানেন দিবারাতি।।
আহার নাহিক কদাচিৎ দুগ্ধ পান।
সেহ যদি অযাচিত কেহ করে দান।।

—চৈঃ ভাঃ আদি ৯/২০৫-২০৬

যখন বৃন্দাবনে শ্রীনিত্যানন্দ এরূপ ভাবাবেশে অবস্থান করছিলেন তখন এদিকে শ্রীগৌরসুন্দর বিদ্যার বিলাসাদি সমাপ্ত করে গয়া ধামে পিতৃ কর্ম সমাপনান্তর শ্রীঈশ্বর পুরীকে সেখানে পেয়ে তাঁর কাছ থেকে মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করলেন। এবার ভাগবত ধর্ম প্রচারের জন্য ও জীব কুলের উদ্ধারের জন্য তিনি আত্মপ্রকাশ করলেন এবং নিরন্তর ভক্তগণ সঙ্গে প্রেম রসাস্বাদন করতে লাগলেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের ভবন হল তাঁর সংকীর্ত্তন সদন।

তিনি ভক্তগণ সঙ্গে প্রেমরসাস্বাদন করছেন। কিন্তু সাধারণ অন্য কোন জীবকে দিচ্ছেন না, যেন কারও প্রতীক্ষায় তিনি আছেন। কে জানে, তাঁর সেই গূঢ় অভিপ্রায়। নিত্যানন্দ হবেন প্রেমধন বিতরণের প্রধান সহায়ক, তাই যেন গৌরসুন্দর তার প্রতীক্ষা করছেন।

এদিকে বৃন্দাবনে নিত্যানন্দ প্রভু কৃষ্ণপ্রেমাবেশে কৃষ্ণানুসন্ধান করছেন, সব মন্দিরের সিংহাসন যেন শূন্য, কৃষ্ণ নাই; কোথায় কৃষ্ণ! কোথায় কৃষ্ণ! বলে সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করতে করতে যেন শেষে দৈব বাণীতে শুনলেন—তিনি এখন নদীয়াতে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং সংকীর্ত্তন বিলাস করছেন। তুমি সেখানে যাও। একথা শুনে নিত্যানন্দ চললেন ব্রজ মণ্ডল থেকে গৌড় মণ্ডল অভিমুখে। কোনদিন অযাচিত ভাবে কোথাও একটু দুগ্ধ পান করেন, কখনও উপবাস করেন। এভাবে শীঘ্রই গৌড়দেশে নবদ্বীপে আগমন করলেন। নবদ্বীপ- মায়াপুরে শ্রীনন্দন আচার্য্য নামক এক পরম মহাভাগবত বাস করতেন গঙ্গাতটে, অকস্মাৎ শ্রীনিত্যানন্দ তাঁর গৃহে উপস্থিত হলেন। শ্রীনন্দন আচার্য্য আজানুলম্বিত

সেই পুরুষ রতনকে দর্শন করে ভক্তি ভরে দণ্ডবন্নতি পূর্ব্বক পূজাদি করলেন এবং ভিক্ষা করিয়ে গৃহেতে রাখলেন।

এদিকে অন্তর্য্যামী শ্রীগৌরসুন্দর তা জানতে পেরে অন্তরে অন্তরে শীঘ্রই তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করলেন এবং সত্বর প্রাতেঃ শ্রীবাস অঙ্গনে আগমন করলেন। ক্রমে ভক্তগণ উপস্থিত হলেন। সকলেই প্রভুর চারিদিকে উপবেশন করলেন, এমন সময় মহাপ্রভু ভঙ্গিপূর্ব্বক বলতে লাগলেন--আমি আজ শেষ রাত্রে এক সুস্বপ্ন দেখেছি, শেষরজনীর স্বপ্ন প্রায় মিথ্যা হয় না। সে কথা শুনে ভক্তগণ অপূর্ব্ব স্বপ্ন কথা শুনতে উৎসুক হলেন। তখন মহাপ্রভু বলতে লাগলেন—''এক তালধ্বজ রথ যেন আমার গৃহ দ্বারে উপনীত হল, সে রথের মধ্যে এক বিশালকায় মহাপুরুষ, তাঁর স্কন্ধে হল ও মূষল আছে। তিনি নীল বসন পরিহিত, তাঁর বাম হাতে বেত্র নির্মিত কমণ্ডলু। তিনি পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করছেন—এ বাড়ী কি নিমাই পণ্ডিতের? এ বাড়ী কি নিমাই পণ্ডিতের? আমি তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন আমি তোমার ভাই। আগামী কাল পরস্পর পরিচয় হবে। তাঁর কথা শুনে আমার বড়ই আনন্দ হল, স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল, নিশা শেষ হল।" এ কথা বলতে বলতে মহাপ্রভু এক দিব্য ভাবে বিভোর হলেন। কিছুক্ষণ ভাবাবিষ্ট থাকার পর বাহ্য দশা প্রাপ্ত হলেন এবং হরিদাস ঠাকুর, শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতি ভক্তগণকে বলতে লাগলেন, আমার মনে হয় এই নবদ্বীপ পুরে নিশ্চয় কোন মহাপুরুষ আগমন করেছেন। আপনারা তাঁকে অনুসন্ধান করুন। প্রভুর এ আজ্ঞা পেয়ে ভক্তগণ স্বপ্ন দৃষ্ট পুরুষের সন্ধানে বের হলেন এবং চতুর্দিকে সন্ধান করতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও সন্ধান পেলেন না, ফিরে এলেন প্রভুর কাছে। প্রভু বললেন স্বপ্ন কথা মিথ্যা নয়, নিশ্চয়ই কোন স্থানে আছে, এবার প্রভু স্বয়ং অনুসন্ধান করতে চললেন। ভক্তগণও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চললেন। মহাপ্রভু সোজাসুজি ঠিক শ্রীনন্দন আচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হলেন। দেখলেন শ্রীনন্দন আচার্য্যের গৃহ-বারান্দায় দিব্য আসনে এক মহাপুরুষ রতন ধ্যানাবিষ্ট ভাবে উপবিষ্ট আছেন। সকলে অবাক। মহাপ্রভু বহুকাল পরে প্রাণের প্রিয়তম জনকে দর্শন করে কিছুক্ষণ অপলক নয়নে দাঁড়িয়ে রইলেন, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও প্রাণের দেবতাকে দীর্ঘকাল পরে দেখে পলকশূন্য ভাবে দেখতে লাগলেন। কি আশ্চর্য্য মিলন! নয়নে নয়নে যেন দুঁহে দুহার রূপ পানে বিভোর। এমন সময় শ্রীবাস পণ্ডিত ভাগবতের একটি শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনাত্মক শ্লোক সুস্বরে গান আরম্ভ করলেন।

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসঃ কনক-কপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্
রন্ধ্রান্ বেণুরধরসুধয়ো পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ
বৃন্দারণ্যং স্বপদরমনং প্রাবিশদ্গীতকীর্ত্তিঃ।।

ভাঃ ১০/২১/৫

নটবরবপু শ্রীকৃষ্ণ চূড়ায় শিখিপুচ্ছভূষণ, কর্ণদ্বয়ে কর্ণিকার পুষ্প, পরিধানে কনকবর্ণ পীত বসন এবং গলে বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করে অধরামৃত দিয়ে বংশীছিদ্র পূরণ করতে করতে শঙ্খচক্র আদি লক্ষণযুক্ত শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ করলেন। তখন গোপগণ তাঁর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করছিলেন। তা শুনে শ্রীনিত্যানন্দ প্রেমে হুঙ্কার করে ধরাতলে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন; তার নয়ন জলে ভূতল সিক্ত হতে লাগল। সেই প্রেম দর্শনে শ্রীগৌরসুন্দর আর স্থির থাকতে পারলেন না; তিনিও কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে প্রেমাশ্রুপাত করতে করতে নিত্যানন্দকে জড়িয়ে ধরলেন এবং কোলে তুলে নিলেন। সে কি মধুর মিলন দৃশ্য, দুঁহার নয়ন জলে দুই জন সিক্ত হচ্ছেন;

ভক্তগণ পরম আনন্দে ঘন ঘন হরি ধ্বনি করতে লাগলেন। আজ শ্রীগৌর নিত্যানন্দের মিলন হল।

তারপর মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দকে নিয়ে ভক্তগণ সঙ্গে মহানন্দে শ্রীবাস অঙ্গনে আগমন করলেন এবং কিছুক্ষণ নৃত্যকীর্ত্তন করার পর মহাপ্রভু নির্দেশ দিলেন; শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীবাস অঙ্গনে অবস্থান করবেন।

### শ্রীবাস অঙ্গনে অবস্থান

শ্রীবাস পণ্ডিত মহাপ্রভুর আজ্ঞায় নিত্যানন্দকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর জ্ঞানে সেবা করতে লাগলেন। শ্রীবাসের পত্নী মালিনী দেবীকে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু জননীর ন্যায় ভাবতেন। মালিনী দেবীও নিত্যানন্দ প্রভুকে পুত্র প্রায় সেবা করতেন। একদিন এক অপূর্ব্ব ঘটনা হল। মালিনী দেবী ভগবদ্ অর্চ্চনের বাসন সমূহ মার্জ্জন করছেন, এমন সময় এক কাক উড়ে এসে ঠাকুরের ঘৃত বাটীটি নিয়ে গেল। মালিনী দেবী হায় হায় করে উঠলেন এবং অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করতে লাগলেন। সে দুঃখ শ্রবণে নিত্যানন্দ প্রভু তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত হলেন এবং সমস্ত কারণ অবগত হলেন। তখন মালিনী দেবীকে বললেন ''মা! তুমি দুঃখ করনা; আমি এক্ষণে ঐ বাটী এনে দেব'' এ কথা বলে তিনি কাককে আহ্বান করে বললেন, ''ওরে কাক! তুই শীঘ্র ঠাকুরের ঘৃত বাটীটি এনে দে।'' নিত্যানন্দ-আদেশে কাকটি শীঘ্রই ঘৃত বাটীটি কোথা হতে এনে দিয়ে উড়ে গেল, সকলে দেখে অবাক। যে নিত্যানন্দ প্রভু ত্রিলোকের অধীশ্বর তাঁর পক্ষে অসম্ভব কি?

### ব্যাসপূজা

একদিন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন হে শ্রীপাদ! কাল পূর্ণিমা তিথি ব্যাসপূজা দিবস, তুমি কোথায় শ্রীব্যাস পূজা করবে? তখন নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতের হাত ধরে বললেন এ বামনের ঘরে। শ্রীবাস পণ্ডিত ব্যাস পূজা মহোৎসবের সব আয়োজন করলেন। অধিবাস দিবসে সুসজ্জিত ব্যাস পূজা মণ্ডপে প্রাতঃকাল থেকেই কীর্ত্তন আরম্ভ হল। নিয়ম করা হল ভক্ত ব্যতীত অঙ্গনে অন্য কোন লোক প্রবেশ করতে পারবে না। আরম্ভ হল গৌর নিত্যানন্দ দুই ভাইয়ের মহা নৃত্য সংকীর্ত্তন। আজ গোলোকের হরি ভূলোকে নেমেছেন যুগধর্ম নাম সংকীর্ত্তন এবং স্বীয় ভক্তিরস মাধুর্য্য আস্বাদনের জন্য। মধ্যাহ্ন কালে বিশ্রাম করলেন, পুনঃ সন্ধ্যাকাল হতে মহাসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হল। প্রায় মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত নৃত্য সংকীর্ত্তন চলল। ভক্তগণ নিজ নিজ ভবনে চলে গেলেন, মহাপ্রভু নিজ ভবনে এলেন। নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবাস অঙ্গনে রয়ে গেলেন। কিছু রাত্র পরে শ্রীনিত্যানন্দ মহাভাবাবেশে হুংকার করে উঠলেন এবং নিজ দণ্ডটি ভেঙ্গে ফেললেন ও কমণ্ডলুটি দূরে ফেললেন। পরদিবস প্রাতেঃ সর্ব্বান্তর্যামী প্রভু শীঘ্র শ্রীবাস অঙ্গনে এলেন এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মহাভাবাবেশের কথা শ্রবণ করলেন, তখন তিনি সেই ভাঙ্গা দণ্ডটি ও কমণ্ডলু নিয়ে গঙ্গামধ্যে বিসর্জ্জন করলেন। মহাপ্রভু ভক্তগণের কাছে জানালেন শ্রীনিত্যানন্দ মহাভাগবত নিত্যসিদ্ধ জন। তাঁর পক্ষে ত্রিগুণাত্মক বেদের নির্মিত বর্ণাশ্রম চিহ্নাদি রক্ষা করার কোন প্রয়োজন হয় না। নিত্যানন্দের সাথে মহাপ্রভু গঙ্গা স্নানাদি করে শ্রীবাস অঙ্গনে ফিরে এলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত দুই প্রভুকে নব বস্ত্রাদি পরিধান করতে দিলেন। আজ ব্যাস পূজা দিবস ভক্তগণ মহা সংকীর্ত্তন আরম্ভ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে মৃদঙ্গ মধুর বাদন হ'তে লাগল। শ্রীবাস অঙ্গনে যেন স্বয়ং আনন্দ মূর্তিমান অবতীর্ণ হয়েছেন, গগন, পবন, দুলোক-- ভূলোক ও গোলোক সেই আনন্দ

সিন্ধুর হিল্লোলে নৃত্য করছে। সকলেই সুখসিন্ধু সাগরে ডুবে গেছেন।

এদিকে শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভুর ইঙ্গিতে একটি দিব্য সুগন্ধি মালা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর হাতে দিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সে মালাটি হাতে নিয়ে আনন্দে বিভোর চিত্তে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন। তারপর মহাপ্রভু বললেন, শ্রীপাদ মালাটি ব্যাসের কণ্ঠে দিয়ে ব্যাস পূজা সুসম্পন্ন করুন। প্রভুর কথা শুনে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু হাস্য করতে করতে মালাটি শ্রীগৌরসুন্দরের কণ্ঠে পরিয়ে দিলেন, তখন চতুর্দিকে ভক্তগণ মহা হরিধ্বনি করে উঠলেন। আকাশ থেকে দেবগণ ও দেবীগণ আনন্দে নৃত্য গীত সহ যেন পুষ্প বৃষ্টি করতে লাগলেন। এবার শ্রীগৌরসুন্দর নিত্যানন্দ প্রভুকে ষড়ভূজ দর্শন করালেন। নিত্যানন্দ প্রভু সে দিব্য স্বরূপ দর্শনে আনন্দে প্রেম মূর্চ্ছা গেলেন। তখন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করে বললেন, শ্রীপাদ তুমি স্থির হও, যে সংকীর্ত্তন প্রচারের জন্য তুমি অবতীর্ণ হয়েছ তা সিদ্ধ হল। তুমি প্রেমভক্তি ধনের ভাণ্ডারী; তা থেকে তুমি যদি লোককে কিছু দাও তবেই তারা প্রেম লাভ করতে পারে। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বাহ্য দশা লাভ করে প্রেমে ক্রন্দন করতে লাগলেন। তখন মহাপ্রভু সকলকে বললেন– আজ ব্যাস পূজা পূর্ণ হল; তোমরা সকলে হরি কীর্ত্তন কর। একথা বলে দুই ভাই নৃত্য করতে লাগলেন, চারিদিকে ভক্তগণ কীর্ত্তন করতে লাগলেন। মালিনীদেবীর সঙ্গে শ্রীশচী মাতা নিভৃতে বসে এসব লীলা দর্শন করতে লাগলেন। সংকীর্ত্তন অন্তে শ্রীব্যাস পূজার প্রসাদ শ্রীবাস পণ্ডিত সমস্ত ভক্তগণকে বিতরণ করলেন।

শ্রীব্যাস পূজার পর একদিন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতা শ্রীরাম পণ্ডিতকে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের নিকট প্রেরণ করলেন। শ্রীরাম পণ্ডিত অদ্বৈত আচার্য্য ভবনে এলেন এবং নিত্যানন্দের আগমন বার্ত্তা বললেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য শীঘ্রই শ্রীগৌরসুন্দর ও নিত্যানন্দের শ্রীচরণ দর্শনে চললেন। শ্রীগৌরসুন্দর অদ্বৈত আচার্য্যের মনোগত যেসব সঙ্কল্প তা বলতে লাগলেন। তা শুনে আনন্দে শ্রীগৌর-পাদপদ্ম-যুগল অর্চ্চন করলেন। অনন্তর মহাপ্রভু ভগবদ্ মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক বিষ্ণু খট্টায় উপবেশন করলেন, নিত্যানন্দ প্রভু শিরে ছত্র ধারণ করলেন, অদ্বৈত প্রভু স্তুতি পাঠ করতে লাগলেন, গদাধর পণ্ডিত তাম্বুল প্রদান ও শ্রীবাস চামর ব্যজন প্রভৃতি এরূপ ভাবে প্রত্যেক ভক্ত কিছু না কিছু প্রভুর সেবা করতে লাগলেন। একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতকে নিত্যানন্দ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন, শ্রীবাস পণ্ডিত বললেন শ্রীনিত্যানন্দ তোমারই দেহ; তোমাদের উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ আমি দেখি না, বরং তোমাকে জানতে হলে নিতাইয়ের কৃপা সাপেক্ষ। গৌরসুন্দর শ্রীবাসের মুখে একথা শুনে আনন্দে বললেন, শ্রীবাস নিত্যানন্দের প্রতি তোমার এতাদৃশ বিশ্বাস, আমি তোমাকে বর দান করছি তোমার গৃহে কোনদিন অন্ন বস্ত্রের অভাব হবে না। তোমার গৃহের সকলেই আমার প্রিয় হবে।

আর একদিন শ্রীশচীমাতা এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দর্শন করলেন--গৌর নিতাই সাক্ষাৎ ব্রজের কানাই বলাই। নিতাই শচীমাতাকে মা বলে আহ্বান করছেন, শচী মাতা রন্ধন করে নিতাইকে ভোজন করাচ্ছেন। প্রাতে এ শুভ-স্বপ্ন কথা শচীমাতা গৌরসুন্দরকে জানালেন, প্রভু বললেন-- "জননী! তবে আজ নিত্যানন্দকে আমন্ত্রণ করে আমাদের ঘরে ভোজন করান হোক," শচীমাতা নিতাইকে আমন্ত্রণ করতে আদেশ দিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর নিতাইকে আমন্ত্রণ করে ঘরে আনলেন, ভৃত্য ঈশান প্রভুদ্বয়ের পাদধৌত করে

দিলেন। তারপর শচীমাতা নিমাই ও নিতাইকে ভোজনে বসালেন, দুই ভাই আনন্দে ভোজন করছেন, তখন শচীমাতা দেখছেন গৌর নিতাই ব্রজের কানাই-বলাই রূপে যেন ভোজন করছেন। কিন্তু এ রহস্য শচীমাতা আর কাউকে বললেন না।

অন্যদিবস মহাপ্রভু শ্রীবাস অঙ্গনে ভক্তগণ সমীপে নিত্যানন্দ তত্ত্ব বলতে লাগলেন--''নিত্যানন্দ আমার প্রকাশ বিগ্রহ স্বরূপ, আমা হতে কিছুমাত্র ভেদ নাই। আমি নিত্যানন্দ দ্বারা বিশ্বে প্রেম ভক্তি দান করব।" এ বলে মহাপ্রভু স্বহস্তে নিত্যানন্দের অঙ্গে গন্ধ লেপন ও কণ্ঠে মাল্য প্রদানাদি পূর্ব্বক স্তুতি করতে লাগলেন। পরিশেষে এক খণ্ড কৌপীন চেয়ে নিয়ে খণ্ড খণ্ড করে ভক্তগণের হস্তে প্রদান করলেন এবং মস্তকে বন্ধন করতে আদেশ করলেন। তখনই ভক্তগণ সানন্দে হরিধ্বনি করতে করতে মস্তকে বন্ধন করলেন। তারপর প্রভুর আদেশে ভক্তগণ নিত্যানন্দের চরণামৃত পান করলেন।

একদিন অকস্মাৎ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে আহ্বান পূর্ব্বক বলতে লাগলেন—হে নিত্যানন্দ, হে হরিদাস! তোমরা আমার আদেশ শ্রবণ কর। উভয়ে বললেন হে দয়াময়! কি আদেশ আমাদের প্রতি কৃপা করে বলুন। প্রভু বললেন আদেশ এই— তোমরা প্রতি ঘরে ঘরে যাও এবং এই ভিক্ষা কর। কি ভিক্ষা ? বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা। মুখে কৃষ্ণ নাম কর, কৃষ্ণের চরণ আরাধনা কর ও ভক্তি সদাচার পালন কর। ও সমস্ত শিক্ষা ছাড়া অন্য কোন শিক্ষার কথা বলবে না। এটাই ভিক্ষা; অন্য কোন ভিক্ষার প্রয়োজন নাই।

শুন শুন নিত্যানন্দ, শুন হরিদাস।
সর্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ।।
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা।।
ইহা বই আর না বলিবা বলাইবা।
দিন অবসানে আসি আমারে কহিবা।।

—চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ১৩/৮/১০

প্রভুর নির্দ্দেশ মত শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাস নদীয়া নগরের ঘরে ঘরে এরূপ ভাবে নাম প্রচার করতে লাগলেন। অনেক লোক নানা প্রকার কটাক্ষ ও কুৎসা করতে লাগলেন। আবার অনেক সজ্জন ব্যক্তি প্রচারটি উত্তম বলে প্রশংসা করতে লাগলেন। সে সময় নদীয়ার কোতয়ালের কার্য্য করত জগাই মাধাই। তারা ভয়ঙ্কর পাপী। মদ্য পানে সর্বদা বিভোর থাকত, ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম তাদের। একদিন গঙ্গা তটে দুই মহাপাপী মদ্যপানে বিভোর হয়ে পড়ে আছে। দয়াল ঠাকুর নিত্যানন্দ মনে মনে বিচার করলেন এ দুই জনকে অবশ্যই উদ্ধার করতে হবে। নিত্যানন্দ তাদের সম্মুখে উপস্থিত হলেন এবং প্রভুর নির্দ্দেশ জ্ঞাপন করলেন ''বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা''। দুই মাতাল নিত্যানন্দের আদেশ শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, আরক্ত নয়নে বলতে লাগল—তোর নাম কি ? নিত্যানন্দ প্রভু জবাব দিলেন নাম অবধূত, জগাই মাধাই বলল—তুই কি বলছিস ? নিত্যানন্দ—আমি হরি নাম করতে বলছি। সেকথা শুনে মাধাই ক্ষিপ্ত ভাবে বলল—শালা ! আমাদের প্রতি আবার উপদেশ; বলে ভাঙ্গা হাঁড়ির টুকরা ছুড়ে মারল নিত্যানন্দের মাথায়। হাঁড়ির টুকরার আঘাতে মাথা দিয়ে দর্ দর্ করে রক্ত পড়তে লাগল, তথাপি নিত্যানন্দ প্রভু অনুনয় করে বলতে লাগলেন, আমায় মেরেছিস্ ত ভালই হয়েছে তোরা একবার হরি হরি বল। হরি হরি বল। মাধাই পুনঃ মারতে উদ্যত হল, তখন জগাই মাধাইয়ের দুখানি হাত চেপে ধরল, বল্ল ভাই ! বিদেশী সন্ন্যাসী মেরে লাভ নেই। এদিকে ভক্তগণ মহাপ্রভুর কাছে এ

সংবাদ জানালেন। প্রভু তৎশ্রবণ মাত্রই ভক্তগণসহ সেখানে উপস্থিত হলেন এবং নিত্যানন্দের ললাটে রক্তের ধারা দেখে ক্রোধাবিষ্ট হয়ে সুদর্শন চক্রকে আহ্বান করলেন। মহা তেজময় সুদর্শন তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত হলেন। দুই পাপী তা দেখে ভয়ে কম্পমান। নিত্যানন্দ প্রভু অমনি প্রভুর করপদ্ম ধরে বলতে লাগলেন—হে দয়াময় প্রভো! ক্রোধ সম্বরণ কর, এ অবতার অস্ত্র ধারণের অবতার নহে, নাম প্রেমে পাপী উদ্ধারের অবতার। আমি অনুনয় করছি তুমি অস্ত্র ধর না, নাম প্রেমে দুই পাপীকে উদ্ধার কর। নিত্যানন্দের এরূপ মহাদয়ালুতার কথা শুনে শ্রীগৌরসুন্দর দ্রবীভূত হলেন। সুদর্শনকে চলে যেতে বললেন। তারপর তিনি যখন শুনলেন মাধাই নিত্যানন্দকে মারলেও জগাই তাঁকে রক্ষা করেছে, তখন করুণাময় প্রভু জগাইকে ডেকে বললেন, জগাই! তুই আমার দিব্য রূপ দর্শন কর এ বলে প্রভু তাঁকে দিব্য চতুর্ভুজ নারায়ণ স্বরূপ দর্শন করালেন। জগাই সে দিব্য রূপ দর্শন করে প্রভুর চরণ তলে লুটিয়ে পড়ল এবং স্তুতি করতে লাগল। কিন্তু মাধাই কিছুই দেখতে পেল না। জগাই বলল তোমরা দুই ভাই আমাকে যেমন দয়া করলে, তেমনি মাধাইকে কর। প্রভু বললেন নিত্যানন্দ আমার প্রাণ, যে নিত্যানন্দকে দ্রোহ করে আমি তাকে কৃপা করি না। মাধাই যদি নিতাইর চরণ ধরে অপরাধ ক্ষমা প্রার্থণা করে তবে সেও প্রেম পাবে। তখন মাধাই নিত্যানন্দের শ্রীচরণ তলে লুটিয়ে পড়লেন, নিত্যানন্দ তাকে বক্ষে তুলে আলিঙ্গন করলেন, তখন ভক্তগণ চারিদিকে মহা হরিধ্বনিতে মুখরিত করতে লাগলেন। এরূপ পতিত পাবন নিত্যানন্দ জগাই মাধাই দুই মহাপাপীকে উদ্ধার করে পতিত পাবন নামের সার্থকতা করলেন।

যখন মহাপ্রভু নদীয়া নগরে যুগধর্ম নাম সংকীর্ত্তন প্রচার করছিলেন, তখন নদীয়ার শাসক সীরাজউদ্দীন মৌলানা ভীষণ বাধা প্রদান করল, ভক্তদের গৃহে প্রবেশ করে মৃদঙ্গ প্রভৃতি ভেঙ্গে দিতে লাগল। সমস্ত কথা ভক্তগণ প্রভুর কাছে নিবেদন করলেন। তা শুনে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে পরামর্শ করে সমস্ত ভক্তগণকে সঙ্গে নিয়ে সন্ধ্যায় এক বিরাট নগর সংকীর্ত্তন বের করলেন। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের অচিন্ত্য শক্তিতে কোথা হতে এত ভক্ত সমাগম হল তা কেউ বুঝতে পারলেন না। তাঁদের দিব্য রূপে যেমন দশদিক আলোকিত হয়ে উঠল, ভক্তগণেরও তদ্রূপ রূপের সঞ্চার হল। মহা সংকীর্ত্তন রোল ত্রিলোক অতিক্রম করে যেন গোলোকে পৌঁছল। পরমানন্দময় শ্রীগৌর নিত্যানন্দ যেন সেই আনন্দ সিন্ধুকে উদ্বেলিত করে নদীয়া নগরীকে নিমজ্জমান করছেন! আবাল বৃদ্ধ বনিতা সেই প্রেম-বন্যায় ডুবে গেল। মহাসংকীর্ত্তনের দল ক্রমে সিরাজউদ্দীন মৌলানা কাজীর গৃহের দিকে চলতে লাগল। এবার কাজী এ সমস্ত বিভূতি দর্শন করে নিস্তব্ধ ভাবে গৃহে বসে রইল। যেন তাঁর শক্তি সংকীর্ত্তনে অপহৃত হয়েছে।

অতঃপর গৌরহরি নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত আচার্য্য প্রভৃতিকে সঙ্গে নিয়ে কাজীর গৃহেতে প্রবেশ করলেন এবং কাজীকে আহ্বান করলেন। বললেন—আজ আপনার নগরে যে মহাসংকীর্ত্তন হচ্ছে তাতে কেন বাধা দিচ্ছেন না। কাজী উত্তর করলেন হে গৌরহরি! আমি যেদিন ভক্তের গৃহে প্রবেশ করে মৃদঙ্গ ভেঙ্গে ছিলাম সেই দিনের রাত্রে এক ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখে ছিলাম। কোন এক ভয়ঙ্কর নৃসিংহ মূর্ত্তি হুঙ্কার করে আমার বক্ষে আরোহণ করে বলেছিলেন, এ মৃদঙ্গ খণ্ডে তোর বক্ষ বিদীর্ণ করব। আমি ভয়ে অনেক স্তব করতে থাকলে, তিনি বললেন তোকে আজ ক্ষমা করে যাচ্ছি। স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল রাত শেষ হল, সে

অবধি আমি আর সংকীর্ত্তনে বাধা দিই না। আমার মনে হয় তুমিই সেই ঈশ্বর।

মহাপ্রভু বললেন আমি সব দোষ ক্ষমা করব তুমি একবার হরিবোল বল, এটি যুগ ধর্ম—যুগের সকলের জন্য। কাজী সাহেব মহাপ্রভুর ও নিত্যানন্দের দর্শন স্পর্শনে ও বাণী শ্রবণে একেবারেই মুগ্ধ আত্মহারা হলেন। প্রভুর সঙ্গে হরিনাম গান করে চললেন। কাজীর উদ্ধার দর্শনে আনন্দে ভক্তগণ হরিধ্বনি করতে লাগলেন। কাজী মহাপ্রভুর একজন পরম ভক্ত হলেন। পরবর্ত্তী কালে তিনি চাঁদ কাজী নামে খ্যাত হলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর যাবতীয় লীলার সহায়ক। প্রভু যখন সমগ্র জীব জগতের উদ্ধারের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন নিত্যানন্দ প্রভু তাঁর সঙ্গী হলেন। প্রভুর সঙ্গে ক্ষেত্র ধামে যাত্রা করলেন। ক্ষেত্র ধামে কিছুদিন মহাপ্রভুর সঙ্গে নিত্যানন্দ রইলেন এবং রথ যাত্রাদি দর্শন করলেন। তখন একদিন শ্রীগৌরসুন্দর নিভৃতে নিত্যানন্দ প্রভুকে ডেকে বলতে লাগলেন—আমরা দুইজন যদি পুরীতে অবস্থান করি তা হলে গৌড় দেশবাসী ভক্তগণের গতি কি হবে? অতএব আপনি শীঘ্র গৌড়দেশে যাত্রা করুন, সেখানকার ভক্তগণকে সুখী করুন। পাপী তাপী জীবগণকে উদ্ধার করুন।

আজ্ঞা পাই নিত্যানন্দচন্দ্র কত ক্ষণে।
চলিলেন গৌড় দেশে লই নিজগণে।।

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৫/২৩০

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু রাম দাস, গদাধর দাস, রঘুনাথ বৈদ্য, কৃষ্ণদাস পণ্ডিত, পরমেশ্বরী দাস ও পুরন্দর পণ্ডিতকে সঙ্গে নিয়ে গৌড় দেশাভিমুখে যাত্রা করলেন।

প্রথমে পাণিহাটী গ্রামে শ্রীরাঘব পণ্ডিতের গৃহে আগমন করলেন। ক্রমে গৌড় দেশবাসী ভক্তগণ সেখানে আগমন করলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু প্রতিদিন সংকীর্ত্তন মহোৎসব করতে লাগলেন। একদিন রাঘব পণ্ডিতকে বললেন আজ কদম্ব ফুলের মালা পরিধান করব। ভক্তগণ বললেন হে প্রভো এখন ত' কদম্ব ফুলের সময় নয়, কোথায় পাব? নিত্যানন্দ প্রভু বললেন—দেখ বাগানে আছে। ভক্তগণ বাগিচায় গেলেন। দেখলেন জম্বীরের গাছে কদম্ব ফুল সকল আছে।

জম্বীরের বৃক্ষে সব কদম্বের ফুল।
ফুটিয়া আছয়ে অতি পরম অতুল।।

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৫/২৮২

এক সময় নিত্যানন্দ প্রভুর অলঙ্কার পরিধান করতে ইচ্ছা হল। তৎক্ষণাৎ অলঙ্কার সকল উপস্থিত হল।

তবে নিত্যানন্দ প্রভুবর কত দিনে।
অলঙ্কার পরিতে হইল ইচ্ছা মনে।।
ইচ্ছামাত্র সর্ব্ব অলঙ্কার সেই ক্ষণে।
উপসন্ন আসিয়া হৈল বিদ্যমানে।।

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৫/৩৩৩-৩৩৪

পাণিহাটী গ্রাম হতে কিছুদিন পরে নিত্যানন্দ প্রভু খড়দহ গ্রামে পুরন্দর পণ্ডিতের গৃহে গমন করলেন। প্রভুর নিজগণও ক্রমে সেখানে উপস্থিত হলেন। সেখানে কিছুদিন কীর্ত্তন বিলাস করবার পর গঙ্গাতটে সপ্ত গ্রামে বণিক শ্রেষ্ঠ শ্রীউদ্ধারণ দত্তের গৃহে শুভ বিজয় করলেন।

বণিক তারিতে নিত্যানন্দ অবতার।
বণিকেরে দিলা প্রেম ভক্তি অধিকার।।

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৫/৪৫৪

শ্রীনিত্যানন্দ কিছুদিন বণিক-কুলকে উদ্ধার করে শ্রীশান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য ভবনে আগমন করলেন।

দেখিয়া অদ্বৈত নিত্যানন্দের শ্রীমুখ।
হেন নাহি জানেন জন্মিল কোন্ সুখ।।

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৫/৪৭০

কয়েক দিন শ্রীনিত্যানন্দ শান্তিপুরে অবস্থানের পর শ্রীনবদ্বীপ মায়াপুরে শ্রীশচীমাতাকে দর্শনের জন্য গমন করলেন।

তবে অদ্বৈতের স্থানে লই অনুমতি।
নিত্যানন্দ আইলেন নবদ্বীপ প্রতি।।
সেই মতে সর্ব্বাদ্যে আইলা আই স্থানে।
আসি নমস্করিলেন আইর চরণে।।
নিত্যানন্দ স্বরূপে দেখি শচী আই।
কি আনন্দ পাইলেন তার অন্ত নাই।।

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৫/৪৯৬-৪৯৮

কিছুদিন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নবদ্বীপ পুরে অবস্থান করে মহা সংকীর্ত্তন বিলাস করতে লাগলেন।

একসময় চোর দস্যু দলপতি এক ব্রাহ্মণ কুমার নিত্যানন্দের অঙ্গে বিবিধ অলংকার দেখে তা হরণ করবার জন্য মনস্থ করল এবং সঙ্গী চোর দস্যুগণকে আহ্বান করল। চোরগণ প্রথম দিনের রজনীতে এসে দেখল নিত্যানন্দের চতুষ্পার্শে বহু ভক্তগণ বসে সংকীর্ত্তন করছেন। দ্বিতীয় দিন পুনঃ এল, নিত্যানন্দের পার্শ্বে কাউকেও না দেখে দস্যুগণ অস্ত্র নিয়ে বাড়ীতে প্রবেশ করল, যখনই প্রবিষ্ট হল তখনই সকলে অন্ধ হয়ে গেল আর ভয়ঙ্কর ঝড় বর্ষা আরম্ভ হল, দস্যুগণ আর কোথায় যাবে? সবে অন্ধ হয়ে গড় খাইয়ের মধ্যে পড়ে মহা কষ্ট দুঃখ ভোগ করতে লাগল। সারা রাত্রি এরূপে কেটে গেল, প্রাতঃকাল হল, ঝড় বর্ষা থেমে গেল। তখন দস্যুগণ বুঝতে পারল এ সব নিত্যানন্দ প্রভুর প্রভাব, সকলে শ্রীনিত্যানন্দ চরণে এসে স্তব করতে লাগল--

রক্ষ রক্ষ নিত্যানন্দ শ্রীবাল গোপাল।
রক্ষা কর প্রভু তুমি সর্ব্ব জীব পাল।।

❖ ❖ ❖

তুমি সে জীবের ক্ষম সব অপরাধ।
পতিত জনেরে তুমি করহ প্রসাদ।।

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৫/৬২৬-৬২৯

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এভাবে দীনহীন পাপী সকলকেই প্রেম ভক্তি দান করেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যখন পাণিহাটী গ্রামে শ্রীরাঘব পণ্ডিত গৃহে অবস্থান করছিলেন সেই সময় শ্রীহিরণ্য গোবর্দ্ধন দাসের পুত্র শ্রীরঘুনাথ দাস শ্রীনিত্যানন্দ চরণে শরণাপন্ন হন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু রঘুনাথ দাসকে নিকটে টেনে এনে স্বীয় কোটি চন্দ্র সুশীতল শ্রীচরণ তাঁর মস্তকে অর্পণ করেন এবং বলেন তুমি আমার ভক্তগণকে চিড়াদধি ভোজন করাও। নিত্যানন্দ প্রভুর নির্দ্দেশে শ্রীরঘুনাথ দাস চিড়াদধি মহোৎসব অনুষ্ঠান করলেন। আজও চিড়াদধি মহোৎসব পাণিহাটীতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অনন্তর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় শ্রীরঘুনাথ দাসের সংসার বন্ধন থেকে উদ্ধার লাভ এবং শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্ম লাভ হয়।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন—

নিত্যানন্দ প্রসাদে সে সকল সংসার।
অদ্যাপিহ গায় শ্রীচৈতন্য অবতার।।

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৫/২২০

একদিন মহাপ্রভু অদ্বৈত আচার্য্যকে বিশ্বরূপ দেখালেন। বিশ্বরূপ দর্শন করে অদ্বৈত প্রভু এবং নিত্যানন্দ প্রভু উভয়ে পরমানন্দিত হয়ে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হলেন। দুজনেই ধূলায় গড়াগড়ি, নৃত্য গীত এবং ঢুলতে ঢুলতে চলতে চলতে গালাগালি আরম্ভ করলেন।

অদ্বৈত প্রভু নিত্যানন্দকে অনেক কিছুই বললেন। অর্থাৎ (ব্যাজস্তুতি—নিন্দাচ্ছলে স্তুতি) করলেন। শেষে নিত্যানন্দ প্রভু বললেন, 'নাড়া

চুপ চাপ বস। তোমার ভয় হচ্ছে না। আমি মহা প্রভুর ভাই, মহাপ্রতাপশালী! আর তুমি বৃদ্ধ। এমন কিলাব না?... বিশেষ করে তুমি সংসারী। আর আমি পরমহংস। আমি মারলে তুমি আমার কিছুই করতে পারবে না।' শুনে অদ্বৈত মহাক্রোধে দিগম্বর হয়ে বলতে লাগলেন—

''মৎস্য খাও, মাংস খাও, কেমত সন্ন্যাসী!
বস্ত্র এড়িলাম আমি, এই দিগ্‌বাসী।।

চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ২৪/৮৯

এই পয়ারটি পড়ে অনেকেই হয়ত ভাবছেন নিত্যানন্দ প্রভু মৎস্য, মাংস ভক্ষণ করেছিলেন। কিন্তু এই কথাটি সত্য নয়।

এই পয়ারের ভাষ্যে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ বলেছেন—''মৎস্য মাংসভোজী দারি-সন্ন্যাসী যেরূপ গৃহস্থের বসন ত্যাগ করিয়া দিগ্‌বসন হইয়াছেন বলিয়া অভিমান করেন, তোমারও সেই জাতীয় ব্যবহার। বৈষ্ণব বিদ্বেষী তান্ত্রিক বিষয়াসক্ত শাক্তেয় মতবাদি সন্ন্যাসীগণ যেরূপ পঞ্চ'ম'- কারের আবাহন করিয়া আপনাদের সন্ন্যাস-প্রসিদ্ধি সংরক্ষণ করিবার যত্ন করে তুমিও সেই জাতীয়। যথেচ্ছাচারিতা কখনও বেদানুগত্য প্রভাবে সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম হইতে পারে না।''

কোথা মাতা পিতা কোন্ দেশে বা বসতি?
কে জানয়ে বলুক দেখি, ইথি।।
তারে বলি সন্ন্যাসী যে কিছু নাহি চায়।
বোলায় সন্ন্যাসী দিনে তিনবার খায়।।
শ্রীনিবাস পণ্ডিতের মূলে জাতি নাই।
কোথাকার অবধূতে আনি দিলা ঠাঞি।।
অবধূত করিল সকল জাতি নাশ।
কোথা হইতে মদ্যপের হৈল প্রকাশ।।
কৃষ্ণপ্রেম সুধা-রসে মত্ত দুই জন।
অন্যোহন্যে কলহ করেন সর্ব্বক্ষণ।।
ইথে এক জনের হইয়া পক্ষ যেই।
অন্য জনের নিন্দা করে ক্ষয় যায় সেই।।
হেন প্রেম কলহের মর্ম্ম না জানিয়া।
একে নিন্দে, আর বন্দে, সে মরে পুড়িয়া।।

চৈঃ ভাঃ মঃ ২৪/৯০-৯৭

'বিষ্ণু' আর 'বৈষ্ণব' সমান দুই হয়।
পাষণ্ডী নিন্দক ইহা বুঝে বিপর্যয়।।
সকল বৈষ্ণব প্রতি অভেদ দেখিয়া।
যে কৃষ্ণচরণ ভজে সে যায় তরিয়া।।

চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৪/১০০-১০১

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলেছেন—

শ্রীচৈতন্য-সেই কৃষ্ণ, নিত্যানন্দ-রাম।
নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম।।
নিত্যানন্দ মহিমা সিন্ধু অনন্ত অপার।
এক কণা স্পর্শি মাত্র, সে কৃপা তাঁহার।।

—চৈঃ চঃ আঃ ৫/১৫৬-১৫৭

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গেয়েছেন—

নিতাই পদ কমল কোটি চন্দ্র সুশীতল,
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়।।
সে সম্বন্ধ নাহি যার বৃথা জন্ম গেল তার,
সেই পশু বড় দুরাচার।
নিতাই না বলিল মুখে মজিল সংসার সুখে,
বিদ্যাকুলে কি করিবে তার।।
অহঙ্কারে মত্ত হঞা নিতাই পদ পাসরিয়া,
অসত্যেরে সত্য করি মানি।
নিতাইয়ের করুণা হবে ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে,
ধর নিতাইয়ের চরণ দু'খানি।।
নিতাইয়ের চরণ সত্য তাঁহার সেবক নিত্য,
নিতাই পদ সদা কর আশ।

নরোত্তম বড় দুঃখী নিতাই মোরে কর সুখী,
রাখ রাঙ্গা চরণের পাশ।।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পার্ষদ যাঁরা ব্রজের সখা বলে উক্ত হয়েছেন তাঁরাই দ্বাদশ গোপাল নামে খ্যাত।

১। অভিরাম ঠাকুর– শ্রীপাট খানাকুল কৃষ্ণনগর।

২। সুন্দরানন্দ ঠাকুর– শ্রীপাট যশোহর জেলার অন্তর্গত মহেশপুর।

৩। কমলাকর পিপ্পলাই-শ্রীপাট মাহেশ।

৪। গৌরীদাস পণ্ডিত– শ্রীপাট অম্বিকা কালনা।

৫। শ্রীপরমেশ্বরী দাস– শ্রীপাট আটপুর।

৬। শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিত– শ্রীপাট কাটোয়ার নিকট শীতল গ্রাম।

৭। মহেশ পণ্ডিত– শ্রীপাট পাল পাড়া, চাকদহ।

৮। পুরুষোত্তম পণ্ডিত– শ্রীপাট সুখসাগর।

৯। শ্রীকালা কৃষ্ণ দাস– শ্রীপাট আকাই হাট গ্রাম।

১০। শ্রীপুরুষোত্তম– শ্রীপাট চাঁন্দুড় গ্রাম।

১১। শ্রীউদ্ধারণ ঠাকুর– শ্রীপাট সপ্ত গ্রাম।

১২। শ্রীধর– শ্রীপাট (অজ্ঞাত)।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শেষ ভৃত্য বলে পরিচিত।

**।। জয় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কি জয়।।**



# শ্রীবিশ্বরূপ

শ্রীবিশ্বরূপ শ্রীবলদেবের প্রকাশ পরব্যোমস্থ সঙ্কর্ষণ তত্ত্ব। বলদেব এবং নিত্যানন্দ অভিন্ন। তিনি মাত্র ১২ বছর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বর্ণন করেছেন মহাপ্রভু শুধুমাত্র বড় ভাই বিশ্বরূপকে দেখলেই নম্র হতেন—

পিতা মাতা কাহারে না করে প্রভূ ভয়।
বিশ্বরূপ অগ্রজ দেখিলে নম্র হয়।।

চৈঃ ভাঃ আদি ৭/৮

বিশ্বরূপ নিমাইর বড় ভাই। আজন্ম বিরক্তি সন্ন্যাসী। অভিন্ন নিত্যানন্দ, সর্বসময় সর্বশাস্ত্রে কৃষ্ণভক্তি ব্যাখ্যা করেন।

শ্রবণে, বদনে, মনে, সর্বেন্দ্রিয়গণে।
কৃষ্ণভক্তি বিনে আর না বোলে না শুনে।।

চৈঃ ভাঃ আদি ৭/১১

বিষয়ী লোকের সাথে মিশলে পরে বিষয় কথা শুনতে হয়, তাই সব সময় অদ্বৈত আচার্য্যের সভায় কৃষ্ণকথা আলাপন করতেন। কারণ তৎকালীন সমাজের অবস্থা ছিল ভয়ঙ্কর। বৈষ্ণব দেখলে লোক উপহাস করতেন।

জগৎ প্রমত্ত ধন পুত্র আশে।
বৈষ্ণব দেখিলে মাত্র সবে উপহাসে।।

চৈঃ ভাঃ আদি ৭/১৭

বৈষ্ণব দেখলে লোকে বিভিন্ন ছন্দ তৈরী করতেন।

আর্যা তর্যা পড়ে সব বৈষ্ণব দেখিয়া।
যতী সতী তপস্বীও যাইবে মরিয়া।।
এত যে গোসাঞি বলি করহ ক্রন্দন।
তবুও দারিদ্র দুঃখ না হয় খণ্ডন।।

চৈঃ ভাঃ আদি ৭/১৮,২০

তারা উচ্চ কীর্তনেও বাধা দিতেন—

ঘন ঘন 'হরি হরি বলি ছাড়' ডাক।
ক্রুদ্ধ হয় গোসাঞি শুনিলে বড় ডাক।।
গীতা, ভাগবত যে যে জনে বা পড়ায়।
কৃষ্ণভক্তি-ব্যাখ্যা কারো না আইসে জিহ্বায়।
কুতর্ক ঘুষিয়া সব অধ্যাপক মরে।
'ভক্তি' হেন নাম নাহি জানয়ে সংসারে।।

চৈঃ ভাঃ আদি ৭/২১-২২

জীবের এহেন দুর্দ্দশা দেখে পরদুঃখে দুঃখী বিশ্বরূপ।

দুঃখে বিশ্বরূপ প্রভু মনে মনে গনে।
না দেখিব লোকমুখ চলে যাও বলে।।

তাই সকাল বেলা স্নান করে অদ্বৈত সভায় এসে সর্বশাস্ত্র কৃষ্ণভক্তি ব্যাখ্যা করতেন। শুনে অদ্বৈত প্রভু পূজা ছেড়ে হুঙ্কার করতে করতে বিশ্বরূপকে জড়িয়ে ধরতেন আর সমস্ত বৈষ্ণবগণ হরিধ্বনি করতেন। তাই –

বিশ্বরূপ ছাড়ি কেহ নাহি যায় ঘরে।
বিশ্বরূপ না আইসেন আপন মন্দিরে।।

তাই শচীমাতা রন্ধন শেষ করে নিমাইকে বলতেন যাও দাদাকে ডেকে নিয়ে আস, দাদাকে ডাকার ছলে নিমাই অদ্বৈত সভায় মিলিত হয়ে নিজ গুণকীর্তন শুনে ভক্তগণের প্রতি শুভদৃষ্টি করতেন। 'দিগম্বর' 'সর্বঅঙ্গ ধুলায়-ধুসর' নিমাই হেসে বলতেন—

ভোজনে আইস, ভাই ডাকয়ে জননী।
অগ্রজ বসন ধরি চলয়ে আপনী।।
দেখি সে মোহন রূপ সর্বভক্তগণ।
স্থগিত হইয়া সবে করে নিরীক্ষণ।।

চৈঃ ভাঃ আদি ৭ ৪০-৪১






প্রভুর এ দৃশ্য দেখে ভক্তগণ নিস্তব্দ জড় প্রায় হয়ে যেতেন।

প্রভু দেখি দাসের মোহ স্বভাবেই হয়।
বিনা অনুভবেও দাসের চিত্ত লয়।।

চৈঃ ভাঃ আদি ৭/৪৩

যদিও ভক্তগণ জানতেন না যে নিমাই ভগবান, তথাপি অনুভব না হলেও দাসের স্বভাব তাই, যেমন শুকদেব গোস্বামী প্রসঙ্গক্রমে পরীক্ষিত মহারাজকে বলেছিলেন– গৌরচন্দ্র যখন গোকুলে জন্মগ্রহণ করে শিশুসঙ্গে খেলা করছিলেন তখন গোপীগণ নিজ পুত্র অপেক্ষাও কৃষ্ণকে অধিক স্নেহ করতেন।

যদ্যপি ঈশ্বর বুদ্ধে না জানে কৃষ্ণেরে।
স্বভাবেই পুত্র হৈতে বড় স্নেহ করে।।

চৈঃ ভাঃ আদি ৭/৪৯

শুনে রাজা পরীক্ষিত শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, গুরুদেব! এমন কথা জীবনে শুনিনি। বল দেখি নিজ পুত্র হৈতে পর তনয় কৃষ্ণেরে গোপীগণ কেন স্নেহ করতেন?

শ্রীশুক কহেন শুন রাজা পরীক্ষিত।
পরমাত্মা সর্বদেহে বল্লভ, বিদিত।।
আত্মা বিনে পুত্র বা কলত্র, বন্ধুগণ।
গৃহ হৈতে বাহির করায় ততক্ষণ।।
অতএব পরমাত্মা সবার জীবন।
সেই পরমাত্মা এই শ্রীনন্দনন্দন।।
অতএব পরমাত্মা স্বভাব কারণে।
কৃষ্ণেতে অধিক স্নেহ করে গোপীগণে।।

চৈঃ ভাঃ আদি ৭/৫৩-৫৬

পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন, গুরুদেব এত শুধু ভক্তের বেলায় কিন্তু কংস, জরাসন্ধ, জোটিলা, কুটিলা এদের পরমাত্মাও কৃষ্ণ; তাহলে তারা কৃষ্ণবহির্মুখ কেন?

কংসাদিহ আত্মা কৃষ্ণে তবে হিংসে কেনে?
পূর্ব্ব অপরাধ আছে তাহার কারণে।।
সহজে শর্করা মিষ্ট-সর্ব্বজনে জানে।
কেহ তিক্ত বাসে, জিহ্বা দোষের কারণে।।
জিহ্বার সে দোষ, শর্করার দোষ নাই।
অতএব সর্ব্বমিষ্ট চৈতন্য গোসাঞি।।

চৈঃ ভাঃ আদি ৭/৫৮-৬০

এদিকে বিশ্বরূপের পিতামাতা বিবাহের উদ্যোগ নিলে তিনি মনে মনে খুব দুঃখ পেলেন। তাই সিদ্ধান্ত নিলেন সংসার ছেড়ে বনে চলে যাবেন।

ঈশ্বরের চিত্ত বৃত্তি ঈশ্বর সে জানে।
বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিলা কত দিনে।।
জগতে বিদিত নাম শ্রীশঙ্করারণ্য।
চলিলা অনন্ত পথে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য।।

পুত্র সন্ন্যাসে চলে গেলে শচী ও জগন্নাথ মূর্চ্ছা গেলেন। ভাইয়ের বিরহে মহাপ্রভুও খুব কান্না করলেন।

সে বিরহ বর্ণিতে বদনে নাহি পারি।
হইল ক্রন্দনময় শ্রীজগন্নাথ পুরী।।

বিশ্বরূপের সন্ন্যাসের কথা শুনে অদ্বৈত আচার্য্য তথা বৈষ্ণবসমাজ ভীষণ দুঃখ পেলেন। নদীয়ায় উত্তম-মধ্যম এমন কেউ নেই যে বিশ্বরূপের সন্ন্যাস শুনে দুঃখ পেলেন না।

জগন্নাথ শচীর বিদীর্ণ হয় বুক।
নিরন্তর ডাকে বিশ্বরূপ বিশ্বরূপ।।

চৈঃ ভাঃ আদি ৭/৭৯

পুত্রশোকে মিশ্র অত্যন্ত ভেঙ্গে পড়লে বন্ধু বান্ধবগণ তাকে সান্ত্বনা দিলেন–

গোষ্ঠীতে পুরুষ যার করয়ে সন্ন্যাস।
ত্রিকোটি কুলের হয় শ্রীবৈকুণ্ঠে বাস।।

হে মিশ্র! গোষ্টিতে যদি এক জনও সন্ন্যাস গ্রহণ

করে তবে তার তিন কোটি কুল উদ্ধার হয়ে যায়। তোমার পুত্র এহেন কার্য করল আর তুমি কাঁদছ। তোমার ত' আনন্দ হওয়া উচিৎ। এই পুত্রই তোমার কুলভূষণ।

ইহা হইতে সর্বদুঃখ ঘুচিবে তোমার।
কোটি পুত্র কি করিবে এপুত্র যার।।

এত সান্ত্বনা বাক্যের পরও মিশ্র দুঃখ করছেন। এ নিমাই যে ঘরে থাকবে তাঁর প্রমাণ কি? শেষে জ্ঞান যোগে সমস্ত কিছু কৃষ্ণ চরণে অর্পণ করে স্থির হলেন।

হেন মতে বিশ্বরূপ হইলা বাহির।
নিত্যানন্দ স্বরূপের অভেদ শরীর।।

যিনি বিশ্বরূপের সন্ন্যাস শ্রবণ করবেন তিনি সমস্ত কর্মবন্ধন ছিন্ন করে পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম লাভ করবেন।

যে শুনয়ে বিশ্বরূপ প্রভুর সন্ন্যাস।
কৃষ্ণভক্তি হয় তাঁর ছিণ্ডে কর্মফাঁস।।

তিনি ১৪৩১ শকাব্দে মহারাষ্ট্রের পাণ্ডরপুরে অপ্রকট হন।

**।। জয় শ্রীবিশ্বরূপ প্রভু কি জয়।।**

# শ্রীবাস ঠাকুর

শ্রীবাসপণ্ডিতো ধীমান্ যঃ পুরা নারদো মুনিঃ।
পর্ব্বতাখ্যো মুনিবরো য আসীন্নারদপ্রিয়ঃ।
স রামপণ্ডিতঃ শ্রীমাংস্তং কনিষ্ঠসহোদরঃ।।

গৌঃ গঃ দীঃ ৯০

শ্রীবাস ঠাকুরের অপর নাম শ্রীনিবাস। শ্রীবাস কৃষ্ণলীলায় নারদ ছিলেন। নারদের বন্ধু পর্ব্বত মুনি শ্রীবাস ঠাকুরের ছোট ভাই শ্রীরাম পণ্ডিত রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। শ্রীবাসের স্ত্রী মালিনী দেবী ব্রজের ধাত্রী স্তন্য দাত্রী 'অম্বিকা'।

শ্রীবাস পণ্ডিতের পূর্ব্ব নিবাস শ্রীহট্ট। তাঁর পিতার নাম শ্রীজলধর পণ্ডিত। জলধর পণ্ডিতের পাঁচ পুত্র। শ্রীনলিন, শ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীপতি, শ্রীনিধি। শ্রীনলিন পণ্ডিতের কন্যা নারায়নী দেবী। যিনি শ্রীচৈতন্য ভাগবতের রচয়িতা শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর চার জায়গায় নিত্য আবির্ভাব–

'শচীর মন্দিরে, আর নিত্যানন্দ নর্ত্তনে।
শ্রীবাস কীর্ত্তনে, আর রাঘব ভবনে।।
এই চারি ঠাঞি প্রভুর সদা 'আবির্ভাব'।
প্রেমাকৃষ্ট হয়--প্রভুর সহজ স্বভাব।।

শ্রীভগবান্ যতক্ষণ নিজেকে না জানান ততক্ষণ তাঁকে কেউ জানতে পারেন না। শ্রীগৌরসুন্দর শৈশব কালে অনেক অলৌকিক লীলা ভক্তগণকে দেখালেও ভগবদ্ মায়ায় তা ভক্তগণ বুঝতে পারতেন না। বাৎসল্যভাবে তাঁদের হৃদয় ভরপুর হয়ে উঠত। শ্রীবাস পণ্ডিত ও মালিনী দেবী, শচী জগন্নাথকে পুত্রের পালন বিষয়ে অনেক উপদেশ দিতেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবাস পণ্ডিত ও মালিনী

দেবীকে জনক-জননীর ন্যায় জানতেন।

বিদ্যা বিলাসে উদ্ধত শ্রীগৌরসুন্দরকে একদিন শ্রীবাস পণ্ডিত উপদেশ দিতে লাগলেন—

পড়ে কেন লোক--কৃষ্ণ-ভক্তি জানিবারে।
সে যদি নহিল তবে বিদ্যায় কি করে।।
এতেকে সর্ব্বদা ব্যর্থ--না গোঙাও কাল।
পড়িলা ত' এবে কৃষ্ণ ভজহ সকাল।।

—চৈঃ ভাঃ আদি ১২/২৫

লোকে পড়ে কেন? শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি জানবার জন্য। যদি পড়ে শুনে সেই কৃষ্ণ-ভক্তি লাভ না হয়, তবে বিদ্যায় কি করবে? তুমিত অনেক পড়াশুনা করলে, এখন কৃষ্ণভজন কর। মহাপ্রভু তা শুনে হাসতে হাসতে বলতেন ''তোমার কৃপায় সেহ হইবে নিশ্চিত।" তোমার কৃপায় আমার নিশ্চয় কৃষ্ণ-ভক্তি হবে।

গয়া থেকে ফিরে এসে মহাপ্রভু প্রেমোন্মত্ত হয়ে নানা প্রকার বিকার প্রদর্শন করলে শচীমাতা ভাবলেন নিমাই বোধহয় বায়ু রোগে আক্রান্ত হয়েছে। শচীমায়ের অনুরোধে একদিন শ্রীবাস ঠাকুর মহাপ্রভুর কাছে গেলে, মহাপ্রভু তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সবাই বলছে আমার নাকি বায়ু রোগ হয়েছে। তুমি বল আমার কি হয়েছে?' সব দেখে শুনে শ্রীবাস ঠাকুর হেসে উত্তর দিলেন—

''হাসি বলে শ্রীবাস পণ্ডিত ভাল কই।
তোমার যেমত বাই, তাহা আমি চাই।।
মহাভক্তিযোগ দেখি তোমার শরীরে।
শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইল তোমারে।।"

—চৈঃ ভাঃ মধ্য ২/১১৩-১১৪

তখন মহাপ্রভু শ্রীবাসকে আলিঙ্গন করে বললেন— ''যদি তুমিও আমাকে বায়ুরোগগ্রস্ত বলতে, তাহলে আমি গঙ্গায় প্রাণ বিসর্জন দিতাম।"

মহাপ্রভু নিজের গৃহে এবং শ্রীবাসের গৃহে উচ্চস্বরে কীর্তন করতেন। এতে পাষণ্ডীগণের ঘুমের ব্যাঘাত হওয়ায় তারা বিভিন্ন ধরণের যুক্তি করত এবং গুজব রটাত যে, রাজা এসে এখনই শাস্তি প্রদান করবে। সরলমতি শ্রীবাস সেকথা বিশ্বাস করে ভীত সঙ্কিত হতেন এবং শ্রীনৃসিংহদেবের পূজা করতেন। ভক্তগণের অভয় দানকারী মহাপ্রভু শ্রীবাসের বাড়িতে যেতেন এবং তাঁর দরজায় লাথি মেরে চিৎকার করে বলতেন, এই শ্রীবাইস্যা--

''কাহারে পূজিস্ করিস্ কার ধ্যান।
যাঁহারে পূজিস্ তাঁরে দেখ বিদ্যমান।।

—চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ২/২৫৮

শ্রীবাস কার পূজা করছিস্? যাঁর পূজা করছিস্ তাঁকে সাক্ষাৎ দর্শন কর। এই কথা বলে মহাপ্রভু শ্রীবাসের বিষ্ণুগৃহে প্রবেশ করলেন এবং বিষ্ণুর আসনে বসে চতুর্ভুজ মুর্ত্তি প্রকট করলেন।

''দেখে বীরাসনে বসি আছে বিশ্বম্ভর।
চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধর।।"

শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীগৌরসুন্দরের সেই দিব্যরূপ দেখে স্বম্ভিত হ'লেন। তখন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবাসকে বলতে লাগলেন—

''তোর উচ্চ সংকীর্ত্তনে নাড়ার হুঙ্কারে।
ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠ আইনু সর্ব্ব পরিকরে।।"

তোমার উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে এবং অদ্বৈত আচার্য্যের হুঙ্কারে আমি বৈকুণ্ঠ ছেড়ে সপরিকরে মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হয়েছি। আমি দুষ্টজনের বিনাশ এবং সাধুজনের ত্রাণ করব। তোমরা নির্ভয়ে আমার সংকীর্ত্তন কর। মহাপ্রভুর এই অভয়বাণী শুনে শ্রীবাস পণ্ডিত ভূতলে দণ্ডবৎ হয়ে এই স্তুতি পাঠ করতে লাগলেন—

বিশ্বম্ভর চরণে আমার নমস্কার।
নব ঘন বর্ণ পীত বসন যাঁহার।।
শচীর নন্দন পায়ে মোর নমস্কার।

নবগুঞ্জা শিখি পুচ্ছ ভূষণ যাঁহার।।
গঙ্গাদাস শিষ্য পায়ে মোর নমস্কার।
কোটি চন্দ্র জিনি রূপ বদন যাঁহার।।
শৃঙ্গ বেত্র বেণু চিহ্ন ভূষণ যাঁহার।
সেই তুমি তোমার চরণে নমস্কার।।
চারি বেদে যারে ঘোষে নন্দের কুমার।
সেই তুমি তোমার চরণে নমস্কার।।

—চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ২/২৭২

আজি মোর জন্মকর্ম সকল সফল।
আজি মোর উদয় সকল সুমঙ্গল।।
আজি মোর পিতৃকুল হইল উদ্ধার।
আজি সে বসতি ধন্য হইল আমার।।
আজি মোর নয়ন-ভাগ্যের নাহি সীমা।
তাঁরে দেখি যাঁর শ্রীচরণ সেবে রমা।।

শ্রীবাস এইরূপে শ্রীগৌরসুন্দরের বিবিধ স্তুতি পাঠ করলে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবাসের প্রতি সদয় হয়ে তাঁর গৃহের যাবতীয় পরিজনকে দর্শন দিলেন। সম্মুখে শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতৃসূতা নারায়ণীকে দেখে প্রভু বললেন—নারায়ণী! কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে কাঁদ—

''চারি বৎসরের সেই উন্মত্ত চরিত।
হা কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদে নাহিক সম্বিত।।
অঙ্গ বহি পড়ে ধারা পৃথিবীর তলে।
পরিপূর্ণ হৈল স্থল নয়নের জলে।।

—চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ২য় অধ্যায়

বালিকা নারায়ণী কৃষ্ণ বলে কেঁদে অস্থির হল। সেই প্রেম ক্রন্দন দেখে শ্রীবাসের পত্নী, দাস-দাসী সকলে প্রেমে কাঁদতে লাগলেন। শ্রীবাস অঙ্গন কৃষ্ণ প্রেমে এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করল।

শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে দুঃখী নামে এক দাসী ছিল। সে প্রতিদিন মহাপ্রভুর স্নানের জল আনত। একদিন গৌরসুন্দর শ্রীবাসকে জিজ্ঞাসা করলেন—জল কে আনে? শ্রীবাস পণ্ডিত বললেন—দুঃখী আনে। শ্রীগৌরসুন্দর বললেন--আজ থেকে ওর নাম সুখী। যাঁরা ভগবানের ও ভক্তের সেবা করে, তাঁরা দুঃখী নহে, সুখী।

শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে শ্রীগৌরসুন্দর বিবিধ লীলা করতে লাগলেন। ক্রমে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হ'লেন। মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে সংকীর্ত্তন বিলাস আরম্ভ করলেন। এই সংকীর্ত্তন-স্থলী হল শ্রীবাসঅঙ্গন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবাস অঙ্গনে অবস্থান করতে লাগলেন। শ্রীমালিনী দেবী তাঁকে পুত্রের ন্যায় সেবা করতে লাগলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সাক্ষাৎ শ্রীবলদেব। তিনি অবধূতের লীলা করতেন। সর্ব্বদা কৃষ্ণ প্রেমে বিভোর হ'য়ে থাকতেন। বেশ ভূষার দিকে তাঁর কোন নজরই থাকত না।

মহাপ্রভু শ্রীবাস অঙ্গনে ব্যাসপূজা করিয়েছিলেন। ব্যাসপূজার আচার্য্য ছিলেন, শ্রীবাস ঠাকুর। শ্রীবাসের নিষ্ঠা দেখে মহাপ্রভু বর দিলেন, তাঁর গৃহে লক্ষ্মী অচলা হয়ে থাকবে এবং তাঁর গৃহের কুকুর বিড়াল প্রভৃতিরও অচলা ভক্তি হবে।

মহাপ্রভুর ইচ্ছায় প্রতিরাতে শ্রীবাসের গৃহে সংকীর্তন হতে লাগল। মহাপ্রভুর সমস্ত অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ সেখানে উপস্থিত থাকতেন। হরি কীর্ত্তন আরম্ভ হলে মহাপ্রভুর বিবিধ প্রেমবিকার প্রকাশ পেত।

''শ্রীহরিবাসরে হরিকীর্ত্তন বিধান।
নৃত্য আরম্ভিলা প্রভু জগতের প্রাণ।।
পুণ্যবন্ত শ্রীবাস অঙ্গনে শুভারম্ভ।
উঠিল কীর্ত্তনধ্বনি 'গোপাল' 'গোবিন্দ'।।''

কীর্ত্তনে কখনো বহির্ম্মুখ ব্যক্তির প্রবেশ অধিকার ছিল না।

একদিন শ্রীবাসের শাশুড়ী মহাপ্রভুর কীর্ত্তন দর্শনের আশায় ঘরের এককোণে লুকিয়ে রইলেন।

মহাপ্রভু তা জানতে পেরে বললেন, আজ আমার নৃত্য-কীর্ত্তনে আনন্দ হচ্ছে না; নিশ্চয়ই এখানে কোন বহির্ম্মুখ ব্যক্তি প্রবেশ করেছে। শ্রীবাস খুব ভীত এবং চিন্তিত হয়ে ঘরের মধ্যে খুজঁতে লাগল, কেউ 'লুকিয়ে আছে কিনা'। খুঁজতে খুঁজতে তার শাশুরীকে দেখতে পেল এবং শাশুড়ীর চুলের মুটি ধরে সেখান থেকে বের করে দিল। মহাপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারও তদীয়লীলা দর্শনের অধিকার নাই।

মহাপ্রভু শ্রীবাস অঙ্গনে একবছর ধরে প্রতি রাতেই দরজা বন্ধ করে দিয়ে কীর্ত্তন করছিলেন। শ্রীবাসের গৃহে প্রবেশ করতে না পেরে গোপালচাপাল নামের একজন দুষ্ট ব্রাহ্মণ শ্রীবাসকে অপমান করার জন্য দেবী পূজার সামগ্রী-জবাফুল, রক্তচন্দন, মদের ভাণ্ড প্রভৃতি শ্রীবাসের ঘরের সামনে রেখে দিয়ে চলে যায়। সকালবেলা কপাট খুলে শ্রীবাস দেবীপূজার সামগ্রী দেখে হাসতে হাসতে বললেন--'দেখ' আমি প্রতিদিন রাতে ভবানীর পূজা করে থাকি। আমি শাক্ত। ভক্তগণ তা দেখে অত্যন্ত দুঃখী হলেন। 'হাড়ি' ডেকে এনে স্থানটি পরিস্কার করে গোবর দিয়ে পরিশুদ্ধ করলেন। সেই বৈষ্ণব অপরাধে গোপাল চাপালের গলিত কুষ্ঠরোগ হয়ে গেল। একদিন মহাপ্রভু গঙ্গাঘাটে গেলে গোপালচাপাল তাঁর চরণে গিয়ে রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা করলেন। মহাপ্রভু ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন–

''আরে পাপি, ভক্তদ্বেষি, তোরে না উদ্ধারিমু।
কোটিজন্ম এই মতো কীড়ায় খাওয়াইমু।।
শ্রীবাসে করাইলি তুই ভবানী-পূজন।
কোটিজন্ম হবে তোর রৌরবে পতন।।''

–চৈঃ চঃ আদি ১৭/৫১-৫২

মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর যখন নীলাচল হতে অপরাধভঞ্জন পাট কুলিয়ায় (বর্তমান নবদ্বীপ শহর) এলেন, গোপালচাপাল পুনরায় মহাপ্রভুর চরণে রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা করলেন। মহাপ্রভুর দয়া হল।

'তবে সেই পাপী প্রভুর লইল শরণ।
হিত উপদেশ কৈল হইয়া করুণ।।
শ্রীবাস পণ্ডিতের স্থানে আছে অপরাধ।
তথা যাহ? তেহো যদি করেন প্রসাদ।।
তবে তোর হবে এই পাপ বিমোচন।।
যদি পুনঃ ঐছে নাহি কর আচরণ।।
তবে বিপ্র আসি' লইল শ্রীবাস শরণ।
তাঁহার কৃপায় হৈল পাপ বিমোচন।।

–চৈঃ চঃ আদি ১৭/৫৬-৫৯

যে ভক্তের চরণে অপরাধ হয়, সেই ভক্তের কাছে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়। তাহলে অপরাধ দূর হয়। গোপালচাপাল শ্রীবাসের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করে পূর্ব অপরাধ হতে মুক্ত হল।

দেবানন্দ পণ্ডিত ভাগবতের মহা অধ্যাপক হয়েও ভাগ্যদোষে ভক্তিহীন ছিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত একসময় শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিতের ভাগবত ব্যাখ্যা শুনতে গিয়েছিলেন। ভাগবত শ্রবণে শ্রীবাসের প্রেম উদয় হয় এবং ক্রন্দন আরম্ভ করেন। শ্রীবাসের ক্রন্দন ধ্বনি শুনে দেবানন্দের পাষণ্ড ছাত্রগণ তাঁকে সভা হতে বের করে দেয়, কিন্তু দেবানন্দ পণ্ডিত ছাত্রগণকে কোন প্রকার বাধা দেননি। তাই তাঁর বৈষ্ণব অপরাধ হয়ে যায়। মহাপ্রভু সেকারণে দেবানন্দ পণ্ডিতকে প্রচুর ভর্ৎসনা করেন।

'কোপে বলে প্রভু-বেটা কি অর্থ বাখানে?
ভাগবত অর্থ কোন জন্মেও না জানে।।
এ বেটার ভাগবতে কোন্ অধিকার?
গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ অবতার।।
সবে পুরুষার্থ, ভক্তি ভাগবতে হয়।
'প্রেমরূপ ভাগবত' চারিবেদ কয়।।

চারিবেদ 'দধি' ভাগবত নবনীত।
মথিলেন শুকে খাইলেন পরীক্ষিত।।
মোর প্রিয় শুক সে জানেন ভাগবত।
ভাগবতে কহে মোর তত্ত্ব অভিমত।।
মুঞি মোর দাস, আর গ্রন্থ ভাগবতে।
যার ভেদ আছে, তার নাশ ভালমতে।।

—চৈঃ ভাঃ মধ্য ২১/১৩-১৮

ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বর বুদ্ধি যার।
সে জানয়ে ভাগবত অর্থ ভক্তিসার।।

—চৈঃ ভাঃ মধ্য ২১/২৫

পরবর্তীতে দেবানন্দ পণ্ডিত বৈষ্ণব অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হলে মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করেন। ইনি ব্রজলীলায় নন্দমহারাজের সভা পণ্ডিত 'ভাগুরি মুনি' ছিলেন।

একদিন কোন একজন নিষ্ঠাবান ব্রহ্মচারী শ্রীবাসকে অনুরোধ করলেন মহাপ্রভুর নৃত্য কীর্ত্তন দর্শন করার জন্য। ব্রহ্মচারী ছিলেন পয়পানকারী অর্থাৎ তিনি শুধুমাত্র দুধ পান করেই জীবন ধারণ করতেন। শ্রীবাস বললেন, জানি তুমি নিষ্ঠাবান ব্রহ্মচারী কিন্তু মহাপ্রভুর অনুমতি নেই। তবে শোন আমি তোমাকে গোপনে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রাখব। তুমি সেখান থেকে গোপনে নৃত্য-কীর্তন দর্শন করবে। যেমন কথা তেমন কাজ। কিন্তু মহাপ্রভু কিছুক্ষণ নৃত্য-কীর্ত্তনের পর বললেন—

'কেহ জানি আসিয়াছে বাড়ীর ভিতরে।
কিছু নাহি বুঝি, সত্য কহ দেখি মোরে।।'

—চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩/৩৬

শ্রীবাস ভয়ে ভয়ে বললেন, প্রভু! এখানে কোন পাষণ্ডী নেই। একজন নিষ্পাপ ব্রহ্মচারী রয়েছে। সে তোমার নৃত্য কীর্ত্তন দর্শন করতে চেয়েছিল। তাই আমিই তাকে লুকিয়ে রেখেছি।

শুনি' ক্রোধাবেশে তবে বলে বিশ্বম্ভর।
''ঝাট ঝাট বাড়ীর বাহির লঞা কর'।।
মোর নৃত্য দেখিতে উহার কোন্ শক্তি।
পয়ঃপান করিলে কি মোতে হয় ভক্তি?''
দুই ভুজ তুলি' প্রভু অঙ্গুলী দেখায়।
''পয়ঃপানে কভু মোরে কেহ নাহি পায়।।
চণ্ডালেও মোহার শরণ যদি লয়।
সেহ মোর, মুঞি তার, জানিহ নিশ্চয়।।
সন্ন্যাসীও মোর যদি না লয় শরণ।
সেহ মোর নহে, সত্য বলিলুঁ বচন।।
গজেন্দ্র-বানর-গোপে কি তপ করিল।
বল দেখি, তারা মোহে কেমতে পাইল।।
অসুরেও তপ করে, কি হয় তাহার।
বিনে মোর শরণ লইলে নাহি নাহি পার।।''

—চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩/৪০-৪৬

মহাপ্রভু বললেন, তুমি শীঘ্রই ঐ ব্রহ্মচারীকে এখান থেকে বের কর। ভয় পেয়ে ব্রহ্মচারী সামান্য নৃত্য-কীর্ত্তন দর্শনেও নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করে বেরিয়ে গেলেন। অন্তর্য্যামী মহাপ্রভু ব্রহ্মচারীর মনের অবস্থা জানতে পেরে পুনঃ তাকে ডেকে এনে নিজের চরণ তাঁর মাথায় অর্পণ করলেন। মহাপ্রভু বললেন—

প্রভু বলে 'তপ' করি না করহ বল।
বিষ্ণুভক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ্য জানহ কেবল।।

শ্রীমন্মহাপ্রভু 'অমানী মানদ' হয়ে সকলকে আলিঙ্গন করে আর্তির সাথে হরিনাম সংকীর্ত্তন করতে বললে সকলে মৃদঙ্গ করতাল সহযোগে উচ্চস্বরে সংকীর্ত্তন করতে লাগলেন। বিষয়িগণ ভাবলেন, এরা অকালে মহামায়ার পূজা আরম্ভ করেছে। এমন সময় দৈবক্রমে জেলা-শাসক কাজী রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি কীর্ত্তনের ধ্বনি শুনে

বিরক্ত এবং ক্রুদ্ধ হয়ে শ্রীবাস অঙ্গনে প্রবেশ করে মৃদঙ্গ ভেঙ্গে দিলেন এবং ভক্তগণকে প্রহার করলেন। কাজী কীর্ত্তন বন্ধের আদেশ দিলে পাষণ্ডীগণ অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। মহাপ্রভু বললেন, হে ভক্তগণ! কীর্ত্তন বন্ধ হবে না। আরও জোড় কীর্ত্তন হবে। তোমরা সকলে কীর্ত্তনে যোগ দাও। মহাপ্রভু আলাদা করে কীর্ত্তনের বিভিন্ন সম্প্রদায় তৈরী করে দিয়ে স্বয়ং নৃত্য কীর্ত্তন করতে লাগলেন। লক্ষ লক্ষ নরনারী স্ত্রী বৃদ্ধ বালক সকলেই গৃহের সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করে মহাপ্রভুর কীর্ত্তনে যোগ দিলেন। লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে আসতে দেখে সিরাজুদ্দীন চাঁদকাজী ভয়ে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে পড়লেন। মহাপ্রভু তার বাড়িতে প্রবেশ করে প্রীতির সাথে তাকে ডেকে পাঠালেন। চাঁদকাজী বাইরে এসে মহাপ্রভুকে বললেন, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর সম্বন্ধে তুমি আমার ভাগিনা হও। শোন ভাগিনা! আমি মৃদঙ্গ ভেঙ্গে কীর্ত্তন নিষেধ করে যেদিন ঘরে ফিরলাম, সেইদিনই রাতে দেখলাম একটি অদ্ভুত ভয়ঙ্কর প্রাণী (নৃসিংহ)। আমার বুকে বসে বলছে, 'ফাঁড়িব, তোমার বুক মৃদঙ্গ বদলে।' আমি ভয় পেলে অভয় দিলেন এবং বললেন, পুনরায় কীর্ত্তনে বাধা না দিলে ক্ষমা করব। এই বলে কাজী তাঁর বুকে নৃসিংহদেবের নখের চিহ্ন দেখালেন। কাজী শপথ করে বললেন, আমার বংশ আমি তালাক দিলাম--কেউ তোমার কীর্ত্তনে বাধা দেবে না। চাঁদকাজী মহাপ্রভুর ভক্ত হলেন। চাঁদকাজী স্বধামপ্রাপ্তি হলে ব্রাহ্মণপুষ্করিণী (বামনপুকুর) গ্রামে তাঁর সমাধি হয়, সেই সমাধিক্ষেত্রে একটি পুরাতন গোলোক চাঁপাবৃক্ষ আজও রয়েছে। কাজীর সমাধিতে হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকলেই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। ধাম মাহাত্ম্যে বর্ণনা আছে, কাজীর সমাধি দর্শন করলে রোগ-ব্যাধি ভাল হয়।

ঐ দেখ ওহে জীব, কাজীর সমাধি।
দেখিলে জীবের নাশ হয় আধি-ব্যাধি।।

নবদ্বীপ ধাম মাহাত্ম্য ৬/৯১

একদিন শ্রীগৌরসুন্দর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে সন্ধ্যাকালে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে সংকীর্ত্তন-নৃত্য প্রভৃতি করছেন। এমন সময় শ্রীবাসের একমাত্র পুত্রটী কোন ব্যাধিতে পরলোক গমন করলো। অন্তঃপুরে স্ত্রীলোকেরা শোকে হাহাকার করে উঠলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত সব বুঝতে পেরে সত্ত্বর অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন।

সত্বরে আইলা গৃহে পণ্ডিত শ্রীবাস।
দেখে পুত্র হইয়াছে পরলোক বাস।।
পরম গম্ভীর ভক্ত মহাতত্ত্বজ্ঞানী।
স্ত্রীগণেরে প্রবোধিতে লাগিলা আপনি।।
তোমরা তো সব জান কৃষ্ণের মহিমা।
সম্বর রোদন সবে চিত্তে দেহ ক্ষমা।।
অন্তকালে সকৃৎ শুনিলে যাঁর নাম।
অতি মহাপাতকীও যায় কৃষ্ণধাম।।
হেন প্রভু আপনে সাক্ষাতে করে নৃত্য।
গুণ গায় যত তাঁর ব্রহ্মাদিক ভৃত্য।।
এহেন সময় যাহার হইল পরলোক।
ইহাতে কি যুয়ায় করিতে আর শোক।।
কোন কালে এ শিশুর ভাগ্য পাই যবে।
'কৃতার্থ' করিয়া আপনারে মানি তবে।।

—চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ২৫/৩০

শ্রীবাস পণ্ডিত নারীগণকে এই ভাবে অনেক তত্ত্বোপদেশ দেওয়ার পর বললেন, তোমরা যদি সংসার ধর্ম সম্বরণ করতে না পার তবে এখন ক্রন্দন না করে পরে ক্রন্দন কর। সাক্ষাৎ গোকুলপতি শ্রীগৌরসুন্দর আমার গৃহে ভক্তসঙ্গে সংকীর্ত্তন করছেন। তোমাদের ক্রন্দনে যদি তাঁর নৃত্য সুখ ভঙ্গ

হয়, আমি তৎক্ষণাৎ গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ ত্যাগ করব।

''কৃষ্ণ ইচ্ছামতে সব ঘটয় ঘটনা।
তাতে সুখ দুঃখ জ্ঞান অবিদ্যা কল্পনা।।
যাহা ইচ্ছা করে কৃষ্ণ তাই জান ভাল।
ত্যজিয়া আপন ইচ্ছা ঘুচাও জঞ্জাল।।
দেয় কৃষ্ণ নেয় কৃষ্ণ পালে কৃষ্ণ সবে।
রাখে কৃষ্ণ মারে কৃষ্ণ ইচ্ছা করে যবে।।
কৃষ্ণ ইচ্ছা বিপরীত যে করে ভাবনা।
তার ইচ্ছা নাহি ফলে সে পায় যাতনা।।
ত্যজিয়া সকল শোক শুন কৃষ্ণ নাম।
পরম আনন্দ পাবে পূর্ণ হবে কাম।।''

—শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতি

এই সমস্ত উপদেশ দিয়ে শ্রীবাস পণ্ডিত বাইরে এলেন এবং মহাপ্রভুর সঙ্গে নৃত্য-গীত করতে লাগলেন। স্ত্রীলোকেরাও মৃত শিশু ফেলে রেখে মহাপ্রভুর কীর্ত্তন শ্রবণ করতে লাগলেন। এইরূপে মহাপ্রভু মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন করলেন। সংকীর্ত্তন ভঙ্গ হল। সকলে বিশ্রাম করতে লাগলেন। এমন সময় মহাপ্রভু বলতে লাগলেন--

প্রভু বলে আজি মোর চিত্ত কেমন করে।
কোন দুঃখ হইয়াছে পণ্ডিতের ঘরে।।
পণ্ডিত বলেন—''প্রভু মোর কোন্ দুঃখ।
যাঁর ঘরে সুপ্রসন্ন তোমার শ্রীমুখ।।''

—চৈঃ ভাঃ ২৫/৪৫

শ্রীবাস! আজ কীর্ত্তনে আনন্দ পাচ্ছি না কেন? তোমার ঘরে কি কোন অমঙ্গল হয়েছে? শ্রীবাস পণ্ডিত বলতে লাগলেন--হে প্রভো! তুমি সর্ব্বমঙ্গলময়। যেখানে তুমি বিরাজমান সেখানে কখনও কি দুঃখ আসতে পারে? অনন্তর ভক্তগণ শ্রীবাসের পুত্রের মৃত্যুর কথা নিবেদন করলেন।

''শুনি গোরা রায় করে হায় হায়,
মরমে পাইনু ব্যথা।''

হায়! হায়! তোমরা এই বিপদ সংবাদ আমাকে দিলে না কেন? তখন শ্রীবাস পণ্ডিত বলতে লাগলেন--

''বলি শুন নাথ! তব রসভঙ্গ, সহিতে না পারি আমি।।
একটি তনয়, মরিয়াছে নাথ, তাহে মোর কিবা দুঃখ।
যদি সব মরে, তোমারে হেরিয়া, তবু ত' পাইব সুখ।।
তব নৃত্যভঙ্গ, হইলে আমার, মরণ হইত হরি।
তাই কু-সংবাদ, না দিল তোমারে, বিপদ আশঙ্কা করি।।

—গীতিমালা

শ্রীগৌরসুন্দর পণ্ডিতের এই প্রগাঢ় নিষ্ঠা দেখে বলতে লাগলেন—

''প্রভু বলে—হেন সঙ্গ ছাড়িব কেমতে।
এত বলি মহাপ্রভু লাগিলা কাঁদিতে।।
পুত্রশোক না জানিল যে মোহার প্রেমে।
হেন সব সঙ্গ মুঞি ছাড়িব কেমনে।।
এত বলি' মহাপ্রভু কান্দেন নির্ভর।
ত্যাগ-বাক্য শুনি' সবে চিন্তেন অন্তর।।''

—চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৫ অধ্যায়

অতঃপর মহাপ্রভু মৃতশিশু স্থানে এলেন এবং তাকে স্পর্শ করে বলতে লাগলেন—হে বালক! তুমি শ্রীবাস পণ্ডিতকে ত্যাগ করে যাচ্ছ কেন? মৃত শিশু প্রভু স্পর্শে প্রাণ লাভ করল এবং প্রভুকে নমস্কার করে বলতে লাগল—হে প্রভো তুমি হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা। তোমার নির্বন্ধেয় অন্যথা কেহ করতে পারে না। যতদিন এখানে থাকবার নির্বন্ধ ছিল, ততদিন রইলাম। নির্বন্ধ শেষ হল তাই চললাম। হে প্রভো! অনেক বার আমার জন্ম ও অনেক বার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু এবার মৃত্যু কালে তোমার শ্রীবদন দর্শন করে সুখে চলে যাচ্ছি।

''এত বলি নীরব হইলা শিশু কায়।
এ মত কৌতুক করে শ্রীগৌরাঙ্গরায়।।''
মৃত পুত্র মুখে শুনি অপূর্ব্ব কথন।
আনন্দ সাগরে ভাসে সর্ব্ব ভক্তগণ।।

শ্রীবাস পণ্ডিত মহাপ্রভুর এইরূপ অদ্ভুত লীলা দর্শন করে সপরিবারে তাঁর শ্রীচরণতলে পড়ে প্রেমে ক্রন্দন করতে লাগলেন। তখন মহাপ্রভু বললেন–

''আমি নিত্যানন্দ দুই নন্দন তোমার।
চিত্তে তুমি ব্যথা কিছু না ভাবিহ আর।।''

–চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৫ অধ্যায়

আমি ও নিত্যানন্দ তোমার দুই পুত্র; অতএব তোমার দুঃখের কি আছে? মহাপ্রভুর এই করুণাপূর্ণ বাণী শ্রবণ করে ভক্তগণ চতুর্দ্দিকে জয় জয় ধ্বনি করতে লাগলেন।

শ্রীবাস পণ্ডিতের প্রেমে ও সেবায় যেন শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ তাঁর কাছে ঋণী। ভক্তের কাছে ভগবান ঋণী–এই তার প্রমাণ।

মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করলে শ্রীবাস পণ্ডিত কুমারহট্টে এসে বসবাস করতেন। তিনি ভ্রাতাদের সঙ্গে প্রতি বৎসর নীলাচলে মহাপ্রভুর দর্শনে যেতেন। শ্রীশচীমাতাকে দেখবার জন্য তিনি প্রায় নবদ্বীপ মায়াপুরে আসতেন এবং গৃহে কিছু দিন বাস করতেন।

শ্রীশচীমাতাও গঙ্গা দর্শন করবার জন্য শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে আসতেন এবং নীলাচল থেকে মহাপ্রভু গৌড়দেশে আগমন করলে কুমারহট্টে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহেও আসতেন।

''কতদিন থাকি' প্রভু অদ্বৈতের ঘরে।
আইলা কুমারহট্ট-শ্রীবাস-মন্দিরে।''

–শ্রীচৈঃ ভাঃ অন্তঃ ৫/৫

মহাপ্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতকে বর দিয়েছিলেন ''তোমার গৃহে কদাপি দারিদ্র হবে না।'' শ্রীবাস পণ্ডিত তিন ভাই সহ সুখে শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা করতেন। শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীনারদের অবতার ছিলেন। তিনি মহাপ্রভুর যাবতীয় লীলার সঙ্গী।

**।। জয় শ্রীবাস ঠাকুর কি জয়।।**



# শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য

শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যের জন্মস্থান শ্রীহট্ট (বর্তমান বাংলাদেশ)। শ্রীমায়াপুরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহের নিকট শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যের ভবন। বর্তমানে সেখানে আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্য মঠ অবস্থিত রয়েছে।

শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যা সর্ব্বজয়া দেবীকে বিবাহ করেন। সেই সূত্রে তিনি মহাপ্রভুর মেসো মশাই। শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য এবং সর্ব্বজয়াদেবী সর্বক্ষণ শচীমায়ের গৃহে আসতেন মহাপ্রভুর সেবা করতেন। শ্রীজগন্নাথ মিশ্র নিত্যলীলায় প্রবেশ করলে শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য শচীমাতার গৃহের সমস্ত রকমের দেখাশোনা করতেন।

মহাপ্রভু গয়া থেকে ফিরে এসে প্রেম-ভক্তি প্রকাশ করতে শুরু করেন। তিনি প্রতিদিন রাতে শ্রীবাস অঙ্গনে, আবার কখনও চন্দ্রশেখর ভবনে কীর্ত্তন করতেন।

'সর্ব্ব বৈষ্ণবের হৈল শুনিয়া উল্লাস।
আরম্ভিলা মহাপ্রভু কীর্ত্তন বিলাস।।
শ্রীবাস-মন্দিরে প্রতি নিশায় কীর্ত্তন।
কোনদিন হয় চন্দ্রশেখর ভবন।।

—চৈঃ ভাঃ মধ্য ৮/১১০-১১১

জগাই-মাধাই পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেও দস্যুবৃত্তি এবং বিভিন্ন অপকর্ম্ম করতেন। মহাপ্রভু কৃপা করে তাদেরকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করে বৈষ্ণবগণের সাথে সংকীর্ত্তনের অধিকার প্রদান করেছিলেন। মহাপ্রভুর অলৌকিক কার্যসমূহ যে সকল পার্ষদগণ দর্শন করেছিলেন। তাদের মধ্যে চন্দ্রশেখর আচার্য্য অন্যতম।

'বক্রেশ্বর পণ্ডিত চন্দ্রশেখর আচার্য্য।
এসব জানেন চৈতন্যের কার্য্য।।'

চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৩/২৪০

একবার চন্দ্রশেখর ভবনে মহাপ্রভু ব্রজলীলার অভিনয় করেছিলেন। তিনি সেখানে রুক্মিনীর বেশে নৃত্য করেছিলেন।

'তবে আচার্য্যের ঘরে কৈল কৃষ্ণলীলা।
রুক্মিন্যাদি-রূপ প্রভু আপনে হইলা।।
কভু দুর্গা, লক্ষ্মী হয়, কভু বা চিচ্ছক্তি।
খাটে বসি ভক্তগণে দিলা চিচ্ছক্তি।।'

—চৈঃ চঃ আদি ১৭/২৪১-২৪২

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে মধ্য খণ্ডে ১৮ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে—

একদিন প্রভু ভক্তগণকে বললেন—আজ আমি অঙ্ক নামক দৃশ্য কাব্যের বিধি অনুসারে নৃত্য করব। সদাশিব ও বুদ্ধিমন্ত খানকে  বললেন তোমরা পোশাক প্রস্তুত কর। গদাধর রুক্মিনীর বেশে নৃত্য করবে। সুপ্রভাত তার সখী এবং ব্রহ্মানন্দ বুড়ী। আর নিত্যানন্দ হবে আমার বড়াই এবং হরিদাস কোতোয়াল। ও শুধু আসর জমিয়ে রাখবে। কেউ যাতে না ঘুমায় সেদিকে খেয়াল রাখবে। শ্রীবাস-নারদ হবে এবং স্নান কারী দ্বিজ হবে শ্রীরাম। শ্রীমান বললেন প্রভু আমি দীপধারী হব। অদ্বৈত বললেন-সাজাবে কে? প্রভু! বললেন-- গোপীনাথ। প্রভু আবারো বুদ্ধিমন্তখানকে বললেন তুমি আর দেরী না করে পোশাক সংগ্রহে চলে যাও। প্রভু আজ্ঞায় বুদ্ধিমন্ত খান মহানন্দে গৃহে গেলেন। নাটকের সমস্ত সামগ্রী চান্দুয়া, শাড়ি, পাটের দাড়ি সবই প্রভুর সামনে উপস্থিত করলেন। প্রভু আনন্দিত হয়ে সমস্ত





বৈষ্ণবদের জানিয়ে দিলেন লক্ষ্মীর বেশে—

প্রকৃতি স্বরূপা নৃত্য হইবে আমার।
দেখিতে যে জিতেন্দ্রিয়, তাঁর অধিকার।।
সেই জন্য যাইব আজি বাড়ির ভীতরে।
যেই জন ইন্দ্রিয় ধরিতে শক্তি ধরে।।

প্রভু লক্ষ্মীবেশে নৃত্য করবেন শুনে বৈষ্ণবগণ প্রথমে উল্লাসিত হলেন কিন্তু পরের উক্তিটি সমস্ত উল্লাস নষ্ট করল। তাই সর্বপ্রথম অদ্বৈত প্রভু মাটিতে ক্রস চিহ্ন (X) দিয়ে বললেন, "তাহলে ও নৃত্য দেখতে আমার অধিকার নেই। কারণ আমি অজিতেন্দ্রিয়।" শ্রীবাস বললেন, "আমিও আপনার দলে যোগ দিলাম।"

শুনে মহাপ্রভু হেসে বললেন-তোমরা যদি না যাও তাহলে আমার নৃত্য কাদের নিয়ে, শুন—

মহাযোগেশ্বর আজি তোমরা হইবা।
দেখিয়া আমারে কেহ মোহ না পাইবা।।

শুনে অদ্বৈত-শ্রীবাসসহ সমস্ত বৈষ্ণবগণ আনন্দিত হলেন, মহাপ্রভু বললেন, "তাহলে আর দেরি কেন? চল সকলে চন্দ্রশেখর ভবনে।" সমস্ত ভক্তগণ চন্দ্রশেখর ভবনে উপস্থিত হলেন। বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিয়ে শচীমাতা এবং সমস্ত বৈষ্ণব পরিবার চন্দ্রশেখর ভবনে উপস্থিত হলেন নাটক দেখার জন্য।

প্রভু বললেন "সকলে পোশাক পরিধান কর।" অদ্বৈত বললেন, "প্রভু আমি কি সাজব?" প্রভু বললেন—তোমার যা ইচ্ছা তাই? শুনে অদ্বৈত মহানন্দে সর্বভাবে নৃত্য আরম্ভ করলেন। চন্দ্রশেখর ভবনে মহা সংকীর্তন ধ্বনি হল। মুকুন্দ প্রধান কীর্তনীয়া।

প্রথমেই হরিদাস মহা-দুই গোঁফ লাগিয়ে কোটালের বেশে হাতে লাঠি নিয়ে প্রবেশ করলেন। বলতে লাগলেন—

আরে ভাই হও সাবধান
নাচিব লক্ষ্মীর বেশে জগতের প্রাণ।।
কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণ সেব, বল কৃষ্ণনাম।
দম্ভ করি হরিদাস করয়ে আহ্বান।।

হরিদাসের এরূপ বেশ এবং এভাবে কথা বলতে শুনে উপস্থিত সকলেই হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন কে তুমি? এখানে কেন এসেছ? হরিদাস বললেন, "আমি বৈকুণ্ঠের কোটাল। কলি নিদ্রাহত জীবকে জাগানোর জন্য প্রভু পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন, কলিহত জীবদের নিরন্তর কৃষ্ণ-নাম-প্রেম বিতরণ করছেন। আজ তিনি লক্ষ্মীবেশে নৃত্য করবেন। আমিও তার সাথে এসেছি। তোমরা সাবধান হও।" এই বলে আবারো দাড়ি মচড়াতে মচড়াতে মুরারি গুপ্তের সাথে প্রস্থান করলেন।

কিছুক্ষণ পর শ্রীবাস নারদের বেশে প্রবেশ করলেন।

মহাদীর্ঘ পাকা দাড়ি, ফোঁটা সর্বগায়।
বীণা কান্ধে কুশ হস্তে চারিদিকে চায়।।

রামাই একটা আসন এনে দিলেন নারদকে বসতে। শ্রীবাসের নারদ বেশ দেখে সভাসদ সকলেই হেসে উঠলেন। অদ্বৈত প্রভু জিজ্ঞাসা করলেন "কে তুমি? কি কারণে এখানে এসেছ।" শ্রীবাস বললেন, "আমার নাম নারদ। আমি নিরন্তর বীণাযন্ত্রে কৃষ্ণগুণগান করে ত্রিভুবণ পরিভ্রমণ করি, আমার ইচ্ছা হল প্রভুকে দর্শন করি।" তাই—

বৈকুণ্ঠে গেলাও কৃষ্ণ দেখিবার তরে।
শুনিলাম কৃষ্ণ গেলা নদীয়া নগরে।।

অর্থাৎ আমি বৈকুণ্ঠে গেলাম কৃষ্ণ দর্শনের জন্য সেখানে গিয়ে দেখি বৈকুণ্ঠ ফাঁকা। শুনলাম তিনি নবদ্বীপে, তাই নবদ্বীপে এলাম, এখানে এসে শুনি—

প্রভু আজি নাচিবেন ধরি লক্ষ্মীবেশ।
অতএব এ সভায় আমার প্রবেশ।।

নারদরূপী শ্রীবাসের মুখে এসব বচন শুনে সকলে মহা হরিধ্বনি করলেন। তবে বিস্ময় কর ব্যাপার হচ্ছে শ্রীবাস যে নারদ সেজেছেন এটা কেউ বুঝতে পারছে না।

অভিন্ন নারদ যেন শ্রীবাস পণ্ডিত।
সেই রূপ, সেই বাক্য, সেই সে চরিত।।

তবে শচীমাতা বোধয় কিছুটা অনুমান করতে পেরেছিলেন, তাই তিনি মালীনিকে জিজ্ঞাসা করলেন, ''আচ্ছা ইনি কি তোমার শ্রীবাস পণ্ডিত। মালিনী বললেন, ''না, না ইনি নারদই''। শ্রীবাস পত্নীর মুখে একথা শুনে আই বিস্মিত হলেন, নারদকে যতই দর্শন করছেন ততই আনন্দ পাচ্ছেন, এভাবে একসময় এমন আনন্দ সমুদ্রে নিমগ্ন হলেন যে সম্পূর্ণ শরীর নিঃস্তব্ধ হল। আইর এ অবস্থা দেখে সকলই ক্রন্দন আরম্ভ করলেন, পতিব্রতা নারীগণ কর্ণমূলে কৃষ্ণ কীর্তন করলেন অমনি আই চেতন হয়ে ছট্‌পট্ করতে লাগলেন। অর্থাৎ এতক্ষণ তিনি যেন এক অপ্রাকৃত রাজ্যে প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু কর্ণমূলে কৃষ্ণকীর্তনের ফলে সেই লীলা ভঙ্গ হয়। এতেই অসহ্য যন্ত্রণায় আই ছট্‌পট্ করছেন জল বিহীন মাছের মত। নারীগণ ধরতে যাচ্ছেন কিন্তু কেউ ধরতে পারছেন না, তাই সকলে বাহ্যশূন্য হয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন–

এদিকে মহাপ্রভু রুক্মীণি বেশে প্রবেশ করলেন। তিনি বেশেও রুক্মিনী ভাবেও রুক্মিনী। এসেই নয়ন জলে প্রাণ প্রভু শ্রীকৃষ্ণের নিকট পত্র লিখছেন, পত্র লিখতে কাগজ কলম প্রয়োজন কিন্তু এখানে তা-নেই বলে (প্রভু) রুক্মিনী পৃথিবীকে কাগজ জ্ঞানে এবং নিজ আঙুলীকে কলম জ্ঞানে পত্র লিখছেন। ভাগবতে সপ্ত শ্লোকে এটি বর্ণিত হয়েছে...

গীতবন্ধে শুন সাত শ্লোকের ব্যাখান।
যে কথা শুনিলে স্বামী হয় ভগবান।।

শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর শৃণ্বতাং তে
নির্বিশ্য কর্ণবিবরৈর্হরতোঙ্গতাপম্।
রূপং দৃশাং দৃশিমতামখিলার্থলাভম্
ত্বয্যচ্যুতাবিশতি চিত্তমপত্রপং মে।।

হে ভুবনসুন্দর অচ্যুত! আপনার কথা শ্রোতৃজনের কর্ণরন্ধ্রপথে অন্তরে প্রবেশ পূর্বক অঙ্গতাপ হরণ করে থাকে। লোকমুখে আপনার গুণরাশি এবং দৃষ্টিসম্পন্ন জনগণের নিখিল বস্তু লাভাত্মক আপনার সৌন্দর্যের কথা শ্রবণ করে আমার নির্লজ্জ চিত্ত আপনার প্রতি আসক্ত হয়েছে।

হে ভুবনসুন্দর প্রভু! তোমার গুণগাথা শ্রবণ করলে জীবের ত্রিবিধ তাপ দূর হয়। এবং যে একবার তোমার রূপ দর্শন করে তার সর্বনিধি লাভ হয়। তাই জগতে কে এমন ধীরমতি আছে যে সুযোগ পেয়েও তোমার ভজন না করে। কারণ--

বিদ্যা, কুল, শীল, ধন, রূপ, বেশ, ধামে।
সকল বিফল হয় তোমার বিহনে।।

তাই বলি হে প্রাণনাথ আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করুন। আমি মন প্রাণ বুদ্ধি সমস্তই তোমার চরণে অর্পণ করলাম।

পত্নীপদ দিয়া মোরে কর নিজ দাসী।
মোর ভাগে শিশুপাল নহুক বিলাসী।।

বনরাজ সিংহ যেমন শৃগালের নিকট থেকে তার খাদ্য ছিনিয়ে নেয় তদ্রূপ জগৎরাজ তুমি শৃগালরূপী শিশুপালের নিকট হতে আমাকে উদ্ধার কর। হে প্রভু সম্ভবত কালই আমার বিবাহ। তাই তুমি দেরি না করে অতিঃসত্বর বিদর্ভপুরে চলে আস, আমাদের কুলপ্রথা রয়েছে বিয়ের পূর্বদিন নববধুগণ ভবানিপূজা করেন, তাই আমি যখন ভবানী পূজা করতে যাব, ঐ সুযোগে তুমি সৈন্য সামন্ত নিয়ে এসে






চৈদ্য, শাল্ব, জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজগণকে বাহুবলে পরাজিত করে আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে। হে প্রভু! তুমি অন্যথা করলে আমি প্রাণ বিসর্জন দিব।

পত্রে এরূপ লিখে ব্রাহ্মণকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন কৃষ্ণস্থানে। প্রভু এভাবে রুক্মিনী বেশে অভিনয় করছেন। আর বৈষ্ণবগণ কেউ হাসছেন, কেউ কাঁদছেন। এভাবে চন্দ্রশেখর ভবনে নানা আনন্দ হচ্ছে। মাঝে মাঝে হরিদাস কতোয়ালের বেশে এসে সকলকে সাবধান করছেন। আর নারদরূপী শ্রীবাস নারায়ণ নারায়ণ গান আর নৃত্য করছেন। এভাবে প্রথম প্রহর শেষ হল।

দ্বিতীয় প্রহর শুরু হল–

রমাবেশে গদাধর নাচে মনোহর।
সময় উচিৎ গীত গায় অনুচর।।

এ নৃত্য দেখে সকলেই বিহ্বল হয়ে ক্রন্দন আরম্ভ করলেন। গদাধরের চোখ দিয়ে যেন প্রেমনদী প্রবাহিত হতে লাগল। প্রকৃত অর্থে গদাধর শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃতি।

গদাধর হৈলা যেন গঙ্গা মূর্তিমতি।
সত্য সত্য গদাধর কৃষ্ণের প্রকৃতি।।
আপনে চৈতন্য বলিয়াছে বার বার।
গদাধর মোর বৈকুণ্ঠের পরিবার।।

গদাধরের নৃত্য, মুকুন্দের কীর্তন এবং বৈষ্ণবগণের মহা হরিধ্বনিতে চন্দ্রশেখর ভবন মুখরিত হয়ে উঠল। এমন সময় মহাপ্রভু আদ্যশক্তির বেশে এবং নিত্যানন্দ বড়াইর বেশে প্রবেশ করলেন। কিন্তু ভক্তগণ কেউই প্রভুকে চিনতে পারলেন না। কেউ ভাবছেন এ বুঝি সমুদ্রকন্যা লক্ষ্মী সমুদ্র থেকে উত্থিত হল। কেউ বলে বোধ হয় রাম পত্নী সীতা ঠাকুরাণী, নাকি মহালক্ষী না.. পার্বতী, না ভাগীরথি না রাধাঠাকুরাণী, নাকি মহেশ মহিনী মোহামায়া। যারা আজন্ম প্রভুর সঙ্গ করছেন তারাও মোহিত হয়ে এসব ধারণা করছেন, অন্যের কথা আর কি শচীমাতাও মোহিত হয়ে বলছে এ বুঝি লক্ষ্মী নৃত্য করছে।

অচিন্ত্য অব্যক্ত কিবা মহাযোগেশ্বরী।
ভক্তির স্বরূপা হৈলা আপনি শ্রীহরি।।

এই মোহিনী রূপ দেখে শঙ্কর মোহিত হয়েছিলেন কিন্তু ভগবদ্ অনুগ্রহে সকল বৈষ্ণবগণেরই প্রভুরপ্রতি (মোহিনীর প্রতি) মাতৃভাবের উদয় হল। বৈষ্ণবগণ ভাবছেন যেন পরলোক হতে জননী ইহলোকে অবতরণ করলেন। তাই সকলেই জননীকে পেয়ে আনন্দে ক্রন্দন করছেন। বিশেষ করে অদ্বৈত কৃষ্ণপ্রেম সিন্ধুমাঝে ভাসছেন। ভক্তগণ কীর্তন গাইছেন আর প্রভু জগৎ- জননীভাবে নৃত্য করছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় মুহুর্ত মধ্যে প্রভুর মধ্যে অন্য আরেক ভাবের উদয় হল। কেউ ঠিক করতে পারছে না, প্রভু কোন ভাবে নৃত্য করছেন? কখনো রুক্মিনীর ভাবে বলছেন–'ব্রাহ্মণ কৃষ্ণ কি এল? যখন নয়ন দিয়ে নিরন্তর অশ্রু প্রবাহিত হয় তখন মনে হয় ও সাক্ষাৎ মূর্তিমতী গঙ্গা, আবার যখন ভাবাবেশে অট্ট অট্ট হাসে, তখন মনে হয় মহাচণ্ডী, যখন ঢুলে ঢুলে নৃত্য করে তখন মনে হয় বলরামপত্নী রেবতী। কখনো গোকুল সুন্দরীর ভাবে বলছেন চলনা বড়াই বৃন্দাবন যাই, কখনো বীরাসনে এমনভাবে বসেন যেন মহাকোটি-যোগেশ্বরী ধ্যান করছেন। এভাবে-

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত নিজ শক্তি আছে।
সকল প্রকাশে প্রভু রুক্মিণীর কাচে।।

এখানে মহাপ্রভু শিক্ষা দিচ্ছেন কেউ যেন আমার শক্তির অবমাননা না করে। কারণ লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা, রুক্মিণী, সত্যভামা, শ্রীরাধা সকলেই আমার শক্তি। তবে শ্রীরাধাই শ্রেষ্ঠ্য।

লৌকিক বৈদিক যত কিছু কৃষ্ণশক্তি।
সবার সম্মানে হয় কৃষ্ণে দৃঢ় ভক্তি।।

দেব দ্রোহ করিলে কৃষ্ণের বড় দুঃখ।
গণসহ কৃষ্ণপূজা করিলে সে সুখ।।

মহাপ্রভু আদ্যাশক্তির বেশে নৃত্য করছেন, আর বৈষ্ণবগণ মনোহর সেই নৃত্য দেখে প্রেমজলে ভাসছেন। আর কম্প-স্বেদ, পুলক প্রভৃতি অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের উদয় হচ্ছে।

শ্রীমান পণ্ডিত দেউটি ধরেছেন, আর হরিদাস মাঝে মাঝে সাবধান করে দিচ্ছেন।

নিত্যানন্দ বড়াই সেজেছেন। প্রভুর নৃত্য দেখে তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন পৃথিবীর ওপর। অমনি বৈষ্ণবগণ ক্রন্দন আরম্ভ করলেন। এ ক্রন্দন বড় অদ্ভুত। কারণ এটা জাগতিক ক্রন্দন নয়, কৃষ্ণপ্রেমের ক্রন্দন। কিছুক্ষণ পরে মহাপ্রভু মহালক্ষ্মী ভাবে বিষ্ণুখট্টার উপরে গোপীনাথকে নিয়ে বসলেন, ভক্তগণ জোড়হস্তে সম্মুখে রয়েছেন। প্রভু বললেন— আমার স্তব কর। অমনি প্রভু আজ্ঞায়—

কেহ পড়ে লক্ষ্মী স্তব কেহ চণ্ডী স্তুতি।
সবে স্তুতি পড়ে যাহার যেন মতি।।
জয় জয় জগতে জননী মহামায়া।
দুঃখিত জীবেরে দেহ রাঙ্গা-পদছায়া।।

হে মাত! তুমিই জগৎ জননী, তুমিই কৃষ্ণ উন্মুখ জনের নিকট যোগমায়া। কিন্তু আমরা স্বভাবতই হরি বিমুখ বলে তুমি আমাদের নিকট মহামায়া। হে মাত! হরি বিমুখ আমরা নানা দুঃখে জর্জ্জড়িত। তুমি কৃপা করে আমাদের পরম সুখময় শ্রীনন্দনন্দনের রাঙা চরণে স্থান করে দাও।

হে মাত! এই জগৎ হরিবিমুখগণের শাস্তির দুর্গ স্বরূপ, আর তুমি এই দুর্গের অধিষ্ঠাত্রী বলে তোমার এক নাম দুর্গা। হে মাত! তুমি অনন্ত কোটি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী। ব্রহ্মা-বিষ্ণু মহেশ্বরও তোমার মহিমা বলতে পারে না, আর আমরা তোমার মহিমা কি বলব!

হে মাত! তুমি সর্বজীবাশ্রয়, তুমি শ্রদ্ধা, তুমিই লজ্জা, তুমিই বিষ্ণুভক্তি।

সাধুজন গৃহে তুমি লক্ষ্মী-মূর্তিমতি।
অসাধুর ঘরে তুমি কালরূপাকৃতি।।

এভাবে সকলেই স্তুতি করছেন, আর আনন্দাশ্রু বিসর্জন করছেন এবং নৃত্য কীর্তন করছেন। এদিকে রাত্রিশেষ। প্রভাত হওয়ায় সূর্যের আলো চন্দ্রশেখর ভবনে প্রবেশ করল। অমনি ভক্তগণ মহাদুঃখে জর্জ্জড়িত হলেন, নিশি শেষ হওয়ায় নৃত্য বন্ধ হল। এই দুঃখে ভক্তগণ বুকে শেল বিদ্ধ হওয়ার ন্যায় যন্ত্রণায় ছটপট্ করতে লাগলেন। তারা এমনি দুঃখ অনুভব করলেন—

কোটি পুত্রশোকেও এতেক দুঃখ নহে।
যে দুঃখ জন্মিল সব-বৈষ্ণব হৃদয়ে।।

ভক্তগণ মহাদুঃখে এমনভাবে সূর্যের দিকে তাকাতে লাগলেন যেন সূর্যদেব ভস্মীভূত হয়ে যাবেন। তারা বিষাদে ক্রন্দন করতে লাগলেন। নারায়ণী শক্তির প্রকাশ বৈষ্ণবগৃহীনিগণ ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। নারীগণ ক্রন্দন করছেন আর শচীদেবীর চরণ ধরছেন। এভাবে চন্দ্রশেখর ভবনে কান্নার রোল পড়ল।

এ ক্রন্দনময় দৃশ্য দেখে মহাপ্রভুর দয়া হল। তিনি মাতৃভাবে সকলকে স্তন পান করাতে লাগলেন।

কমলা, পার্ব্বতী, দয়া মহা নারায়ণী।
আপনে হইলা প্রভু জগৎ জননী।।

আজ যেন তিনি গীতার বাণী স্বার্থক করলেন—

পিতামহস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ ।।
(গীতা ৯/১৭)

আমি এই জগতের পিতা, মাতা, ধারক, পোষক,

এবং পিতামহরূপে অবস্থিত। প্রভু জগৎজননীরূপে সকলকেই স্তন পান করালেন, স্তনপান মাত্রই ভক্তগণের দুঃখ দূর হল। প্রভু মাতৃভাবে দুগ্ধদান লীলা করায় অনেকেই তাকে গোপী বলেন–

ইহা না বুঝিয়া কোন কোন পাপী জনা।
প্রভুরে বলয়ে গোপী খাইয়া আপনা।।

প্রভু চন্দ্রশেখর আচার্যের ভবনে সাতদিন জননীভাবে নৃত্য এবং স্তন দান করে ভক্তদের মনোরথ পূর্ণ করেছিলেন। কিন্তু বহির্মুখ লোকেরা তা কিছুই দেখতে পেলেন না। তারা দেখছেন চন্দ্র-সূর্য-বিদ্যুৎ যেন একত্রই চন্দ্রশেখর ভবনে জ্বলছে। চোখ খুলে তাকানো যাচ্ছে না। তাই–

লোকে বলে–"কি কারণে আচার্যের ঘরে।
দুই চক্ষু মেলিতে ফুটিয়া যেন পড়ে?
শুনিয়া বৈষ্ণবগণ মনে মনে হাসে।
কেহ আর কিছু নাহি করয়ে প্রকাশে।।

এভাবে মহাপ্রভু চন্দ্রশেখর ভবনে লীলা করেছিলেন।

চাঁদকাজী উদ্ধারলীলায় মহাপ্রভু যখন ভক্তগণকে নিয়ে নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা করেছিলেন, সেই সময়ও চন্দ্রশেখর আচার্য্য তাঁর সঙ্গী ছিলেন।

মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের সময়ও শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য মহাপ্রভুর সাথে ছিলেন এবং মহাপ্রভুর নির্দ্দেশে সন্ন্যাসের সমস্ত কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করেছিলেন।

এত বলি ভারতী গোঁসাঞি কাটোয়াতে গেলা।
মহাপ্রভু তাহা যাই সন্ন্যাস করিলা।।
সঙ্গে নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর আচার্য্য।
মুকুন্দ দত্ত-এই তিন কৈল সর্ব্ব কার্য্য।।

চৈঃ চঃ আদি ১৭/২৭২-২৭৩

মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর উন্মত্ত হয়ে বৃন্দাবনের দিকে যাত্রা করলে নিত্যানন্দ প্রভু চালাকী করে তাকে গঙ্গার তটে নিয়ে এসেছিলেন। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের বার্ত্তা শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য শান্তিপুর ও নবদ্বীপবাসী ভক্তগণকে জানিয়েছিলেন।

'শিশুসব গঙ্গাতীর পথ দেখাইল।
সেই পথে আবেশে প্রভু গমন করিল।।
আচার্য্যরত্নেরে কহে নিত্যানন্দ গোসাঞি।
শীঘ্র যাহ তুমি অদ্বৈত আচার্য্যের ঠাঞি।।
প্রভু লয়ে যাব আমি তাঁহার মন্দিরে।
সাবধানে রহেন যেন নৌকা লঞা তীরে।।
তবে নবদ্বীপ তুমি করিহ গমন।
শচীমাতা লঞা আইস, আর ভক্তগণ।।'

চৈঃ চঃ মধ্য ৩/১৯-২২

নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশে–

'প্রভাতে আচার্য্যরত্ন দোলায় চড়াঞা।
ভক্তগণ সঙ্গে আইলা শচীমাতা লঞা।।'

চৈঃ চঃ মধ্য ৩/১৩৭

গৌরগণোদ্দেশদীপিকা অনুসারে চন্দ্রশেখর আচার্য্যকে চন্দ্র অবতার বলা হয়। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ লিখেছেন, শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য শ্রীমান্ নবনিধির অন্যতম অথবা চন্দ্র ।

**।। জয় শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য কি জয়।।**





# শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি

‘‘বৃষভানু-তয়াখ্যাতঃ পুরা যে ব্রজমণ্ডলে।
অধুনা পুণ্ডরীকাক্ষো বিদ্যানিধি মহাশয়ঃ।।

গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা ৫৪

পূর্ব্বে ব্রজমণ্ডলে যিনি বৃষভানু রাজা ছিলেন অধুনা তিনি শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি মহাশয়। তিনি শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের শিষ্য ছিলেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত তাঁকে গুরু পদে বরণ করেছিলেন। তাঁর পিতার নাম বানেশ্বর (মতান্তরে শুক্লাম্বর) ব্রহ্মচারী ও মাতার নাম–গঙ্গাদেবী। তাঁর পত্নীর নাম রত্নাবতী। তাঁর পিতা বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। চট্টগ্রাম শহরের ছয়ক্রোশ উত্তরে হাট হাজারি থানার একক্রোশ পূর্ব্বে মেখলা গ্রামে তাঁর শ্রীপাট ছিল।

শ্রীগৌরসুন্দর পুণ্ডরীককে বাপ ডাকতেন। বিদ্যানিধি মহাশয় প্রেমনিধি বা আচার্য্যনিধি নামেও পরিচিত ছিলেন।

শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির বিশেষ বিবরণ দিয়েছেন–

চাটিগ্রামে জন্ম বিপ্র পরম পণ্ডিত।
পরম-স্বধর্ম সর্ব্ব-লোক-অপেক্ষিত।।
কৃষ্ণভক্তি-সিন্ধু-মাঝে ভাসে নিরন্তর।
অশ্রু-কম্প-পুলক-বেষ্টিত কলেবর।।
গঙ্গাস্নান না করেন পদস্পর্শ ভয়ে।
গঙ্গা দরশন করে নিশার সময়ে।।
গঙ্গায় যে-সব লোক করে অনাচার।
কুল্লোল, দন্তধাবন, কেশ-সংস্কার।।
এ সকল দেখিয়া পায়েন মনে ব্যথা।
এতেক দেখেন গঙ্গা নিশায় সর্বথা।।
বিচিত্র বিশ্বাস আর এক শুন তান।
দেবার্চ্চন-পূর্বে করে গঙ্গাজল পান।।

–চৈঃ ভাঃ মধ্য ৭/২৩-২৮

ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর নবদ্বীপে মহাভাব প্রকাশ ক’রে বিদ্যানিধি নাম নিয়ে ক্রন্দন করেছিলেন–

নৃত্য করি, উঠিয়া বসিলা গৌর-রায়।
‘পুণ্ডরীক বাপ বলি’ কান্দে উভরায়।।
পুণ্ডরীক আরে মোর বাপরে বন্ধুরে।
কবে তোমা দেখিব আরে রে বাপরে।।
হেন চৈতন্যের প্রিয়পাত্র বিদ্যানিধি।
হেন সব ভক্ত প্রকাশিলা গৌরনিধি।।

চৈঃ ভাঃ মধ্য ৭/১২-১৪

শ্রীবিদ্যানিধি মহাশয় বিষয়ীর মত অবস্থান করতেন। শ্রীনবদ্বীপ নগরেও তাঁর এক বসত বাড়ি ছিল। শ্রীমুকুন্দ তাঁর দেশের লোক ছিলেন। তিনি নবদ্বীপ মায়াপুরে এলে শ্রীমুকুন্দ তাঁকে কীর্ত্তন শুনাতেন। একদিন মুকুন্দ শ্রীগদাধর পণ্ডিতকে বললেন,--‘‘আজ তোমাকে বৈষ্ণব দর্শনে নিয়ে যাব।’’ এই বলে শ্রীমুকুন্দ গদাধর পণ্ডিতকে সঙ্গে নিয়ে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির বাড়িতে গিয়েছিলেন। গদাধর পণ্ডিত বিদ্যানিধিকে প্রণাম করলেন। বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁকে বসতে বললেন। বিদ্যানিধি মহাশয় মুকুন্দের নিকট গদাধর পণ্ডিতের পরিচয় পেলেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত দেখতে পেলেন বিদ্যানিধি মহাশয় বাহ্যতঃ রাজপুত্রের ন্যায়। তাঁর মূল্যবান্ খাট। তাতে দিব্য শয্যা ও পট্ট নেতের বালিশ, উপরে দিব্যচন্দ্রাতপ। পাশে জলের ঝারি ও তাম্বুলসজ্জিত পিতলের বাটা। আলবাটীর সম্মুখে

বিশাল আয়না। দুই পাশে দুইজন ভৃত্য ময়ুরের পাখা নিয়ে ব্যজন করছে। ললাটে চন্দনের উর্দ্ধপুণ্ড্র, তার মধ্যে ফাগুবিন্দু শোভা পাচ্ছে। এসব দেখে গদাধর পণ্ডিতের সংশয় হল। তিনি মনে মনে বললেন—

''ভাল ত বৈষ্ণব, সব বিষয়ীর বেশ।
দিব্যভোগ, দিব্যবাস, দিব্যগন্ধ কেশ।।
শুনিয়া ত ভাল ভক্তি আছিল ইহানে।
আছিল যে ভক্তি, সেহ গেল দরশনে।।
চৈঃ ভাঃ মধ্য ৭/৬৯-৭০

গদাধর পণ্ডিত শিশুকাল থেকেই বৈরাগ্যশীল। শ্রীমুকুন্দ বুঝতে পারলেন গদাধরের মনে কোন সংশয় হয়েছে। তখন মুকুন্দ ভাগবতের এক শ্লোক সুস্বরে গান করতে লাগলেন যাতে বিদ্যানিধির স্বরূপ প্রকাশ পায়।

অহো বকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াস্ত্রায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যচিতাং ততোহন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম্।।
—ভাঃ ৩/২/২৩

অহো কি আশ্চর্য্য! বকাসুরের বোন দুষ্টা পূতনা প্রাণবিনাশের জন্য যাঁকে কালকূট মিশ্রিত স্তন পান করিয়েও ধাত্রীপ্রাপ্য গতি লাভ করেছিল, সেই পরম দয়ালু শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কার শরণাপন্ন হব?

পূতনা লোকবালঘ্নী রাক্ষসী রুধিরাশনা।
জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্ত্বাপ সদ্গতিম্।।
—ভাঃ ১০/৬/৩৫

রক্ত পানকারী শিশুঘাতিনী পূতনা হত্যা করার ইচ্ছায় শ্রীকৃষ্ণকে স্তন দান করেও গোলোক গতি লাভ করেছিলেন।

ভক্তিযোগের এই বর্ণন শ্রবণ করে বিদ্যানিধি মহাশয় প্রেমে পাগলপ্রায় হয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন।

নয়নে অপূর্ব বহে শ্রীআনন্দধার।
যেন গঙ্গাদেবীর হইল অবতার।।
অশ্রু, কম্প, স্বেদ, মূর্চ্ছা, পুলক, হুঙ্কার।
এককালে হৈল সবার অবতার।।
'বোল, বোল, বলি' মহা লাগিল গর্জ্জিতে।
স্থির হইতে না পারিলা পড়িলা ভূমিতে।।
—চৈঃ ভাঃ ৭/৭৯-৮১

ভূতলে প'ড়ে বিদ্যানিধি মহাশয় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতে করতে বললেন--মোর প্রাণের ঠাকুর কোথায় গেল? কোথায় কৃষ্ণ? হায়! হায়! আমি বঞ্চিত হ'লাম। তাঁর নয়নের জলে ধরণী সিক্ত হতে লাগল। কি মহাকম্প এক এক বার হচ্ছিল। দশজন সেবকও ধ'রে রাখতে পারছিলেন না। বিদ্যানিধির অত্যদ্ভূত কৃষ্ণ-ভক্তি প্রেম-বিকার সকল দর্শন ক'রে শ্রীগদাধর পণ্ডিত বিস্ময়ান্বিত হলেন। তিনি বললেন—

''হেন মহাশয়ে আমি অবজ্ঞা করিলুঁ।
কোন্ বা অশুভক্ষণে দেখিতে আইলুঁ।।"

গদাধর পণ্ডিত মুকুন্দকে বলতে লাগলেন—

''মুকুন্দ, আমার তুমি কৈলে বন্ধুকার্য্য।
দেখাইলে ভক্ত বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য।।
এমত বৈষ্ণব কিবা আছে ত্রিভুবনে।
ত্রিলোক পবিত্র হয় ভক্তি-দরশনে।।"
—চৈঃ ভাঃ মধ্য ৭/৯৭-৯৮

গদাধর পণ্ডিত বললেন,—মুকুন্দ! আমি যখন এঁনার কাছে অপরাধ করেছি তখন এঁনার থেকে মন্ত্র দীক্ষা নেব। মুকুন্দ বললেন--বেশ ত' ভাল কথা। তারপর মুকুন্দ বিদ্যানিধির কাছে গদাধর পণ্ডিত সম্বন্ধে সমস্ত কথা বললেন। গদাধরের কথা শুনে বিদ্যানিধি পরম সুখী হলেন। তারপর শুক্ল-পক্ষের দ্বাদশীর দিন বিদ্যানিধি গদাধর পণ্ডিতকে মন্ত্রদীক্ষা দিলেন।

একদিন শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি মহাশয় রাত্রে অলক্ষিতে শ্রীগৌরসুন্দরের কাছে এলেন এবং আনন্দে প্রভুর চরণ তলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। অবশেষে ক্রন্দন করে বলতে লাগলেন–হে কৃষ্ণ! হে বাপ! আমি অপরাধী। আমায় আর কত দুঃখ দিবে? তুমি সমস্ত জগতকে উদ্ধার করলে, কেবল আমায় বাদ দিলে। গৌরসুন্দর তৎক্ষণাৎ বিদ্যানিধিকে কোলে তুলে নিলেন। এবার ভক্তগণ বিদ্যানিধিকে চিনতে পারলেন। গৌরসুন্দর বিদ্যানিধিকে বলতে লাগলেন--

''আজি কৃষ্ণ বাঞ্ছা-সিদ্ধি করিলা আমার।
আজ পাইলাম সর্ব-মনোরথ-পার।।

*****

নিদ্রা হৈতে আজি উঠিলাম শুভক্ষণে।
দেখিলাম প্রেমনিধি সাক্ষাৎ নয়নে।।"

–চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ৭/১৩৮,১৪৩

ভক্তগণ আনন্দে 'হরি' 'হরি' ধ্বনি করতে লাগলেন। অতঃপর বিদ্যানিধি মহাশয় অদ্বৈতাদি ভক্তগণের চরণ বন্দনা করলেন। বিদ্যানিধির সঙ্গে সমস্ত ভক্তের মিলন হল।

মহাপাপী জগাই ও মাধাইকে উদ্ধার করে মহাপ্রভু যখন ভক্তসঙ্গে গঙ্গাতে জলকেলি করছিলেন তখন সেখানে বিদ্যানিধিও ছিলেন। প্রভুর নদীয়া সংকীর্ত্তন বিলাসের সময় বিদ্যানিধি প্রধান সহচর ছিলেন। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর যখন পুরীধামে অবস্থান করতেন, প্রতি বৎসর গৌড়ীয় ভক্তগণের সঙ্গে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি মহাশয়ও পুরীধামে যেতেন। পুরীধামে মহাপ্রভুর চন্দন যাত্রার সময় নরেন্দ্র সরোবরে ভক্তসঙ্গে জলকেলি কালে বিদ্যানিধি মহাশয় স্বরূপ-দামোদরের সঙ্গে জলকেলি করতেন।

''দুই সখা–বিদ্যানিধি, স্বরূপদামোদর।
হাসিয়া আনন্দে জল দেন পরস্পর।।"

–চৈঃ ভাঃ অন্তঃ ৮/১২৪

একদিন পুরীধামে শ্রীগদাধর পণ্ডিত মহাপ্রভুকে বললেন, আমার ইষ্টমন্ত্র সুষ্ঠুভাবে উচ্চারিত হচ্ছে না। মনে হয় মন্ত্রটি কারও কাছে প্রকাশ করেছি। মহাপ্রভু বললেন–তোমার গুরু বিদ্যানিধি তিনি অল্পকালের মধ্যে এখানে আসবেন। এ সম্বন্ধে তখন তুমি তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে পারবে। ঠিক সময় বিদ্যানিধি মহাশয় পুরী ধামে এসে হাজির হলেন। তাঁকে পেয়ে ভক্তগণের আনন্দের সীমা রইল না। শ্রীগদাধর পণ্ডিতের ইচ্ছা পূর্ণ হল। বিদ্যানিধি মহাশয়ের থাকবার স্থান হল সমুদ্রতীরে যমেশ্বরে। তিনি স্বরূপ-দামোদর প্রভুর বড় প্রিয় মিত্র ছিলেন। দুইজনে সর্বদা ইষ্টগোষ্ঠী করতেন এবং জগন্নাথ দর্শন করতেন।

এমন সময় শ্রীক্ষেত্রে ওড়ন ষষ্ঠী পর্ব্ব-যাত্রা আরম্ভ হল। জগন্নাথ নববস্ত্রাদি ধারণ করছিলেন। ভগবানের নববস্ত্র হল-- মাণ্ডুয়া বস্ত্র। মাণ্ডুয়া বস্ত্র অশুচি হলেও ভগবানের ইচ্ছানুযায়ী তাঁর সেবকগণ তাঁকে এ বস্ত্র পরিয়ে থাকেন। এইদিন নব মাণ্ডুয়া বস্ত্র ধারণ লীলা উৎসবটি খুব জাকজমকের সঙ্গে হচ্ছিল। শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তগণসহ বস্ত্রধারণ লীলা দর্শন করছিলেন, জগন্নাথদেব শুক্ল-পীত-নীল রঙের বিবিধ পট্টবস্ত্র ধারণ করে পুষ্প মাল্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত হচ্ছিলেন। কত রকমের বাজনা যাত্রাকলে বাজতে ছিল। কিছু রাত পর্য্যন্ত মহাপ্রভুও যাত্রা কৌতুক আনন্দ-চিত্তে দর্শন করলেন। তারপর ভক্তসঙ্গে নিজ স্থানে ফিরে এলেন। এমন সময় দুই বন্ধু স্বরূপ দামোদর প্রভু ও বিদ্যানিধি মহাশয় বিবিধ নর্মালাপ কর্‌তে কর্‌তে মাণ্ডুয়া বস্ত্রের কথা তুললেন। মাণ্ডুয়া বস্ত্র ঈশ্বর পরেন, এতে সন্দেহ-যুক্ত হয়ে বিদ্যানিধি মহাশয় স্বরূপদামোদর প্রভুকে বল্‌তে লাগলেন--এদেশে শ্রুতি ও স্মৃতির প্রভৃত বিচার আছে। তথাপি ঈশ্বর অপবিত্র মাণ্ডুয়া বস্ত্র ধারণ করেন কেন?






স্বরূপদামোদর প্রভু বললেন—ইহাই বোধ হয় এ দেশের আচার। দেশাচার যদি হয়, ইথে দোষ কি? ঈশ্বরের ইচ্ছা না থাকলে রাজা নিষেধ করতেন। বিদ্যানিধি বললেন—ঈশ্বর স্বতন্ত্র। যা ইচ্ছা তিনি করতে পারেন। কিন্তু সেবক পাণ্ডাগণ সে অপবিত্র মাণ্ডুয়া বস্ত্র ধারণ করে কেন? মাণ্ডুয়া বস্ত্র এত অপবিত্র যে স্পর্শ করলেও হাত ধুতে হয়। রাজপাত্রগণ অবুঝ, এর বিচার করেন না। রাজাও দেখি এই দিন মাণ্ডুয়া বস্ত্র শিরে ধারণ করেন। স্বরূপদামোদর প্রভু বললেন—ভাই! বোধ হয় ওড়নষষ্ঠীর দিন এ বস্ত্র সম্বন্ধে কোন দোষ নাই। কারণ সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম জগন্নাথরূপে অবতীর্ণ। তজ্জন্য এখানে বিধি নিষেধের কোন বিচার নাই। বিদ্যানিধি মহাশয় বললেন—জগন্নাথদেব ঈশ্বর—সব কিছু ধারণ করতে পারেন। তাই ব'লে কি বাকীরাও ব্রহ্ম হ'ল? এরাও কি বিধি নিষেধের অতীত হল? এই সব কথা বলে হাস্য করতে করতে দুই মিত্র নিজ নিজ বাসস্থানে এলেন এবং শয়ন করলেন। অনন্তর বিদ্যানিধি মহাশয় স্বপ্ন দেখলেন যে শ্রীজগন্নাথ ও বলরাম দুইজনে ক্রোধে অধীর হয়ে বিদ্যানিধির দুই গালে দুই চড় লাগিয়ে বলতে লাগলেন—

মোর জাতি, মোর সেবকের জাতি নাঞি।
সকল জানিলা তুমি রহি' এই ঠাঞি।।
তবে কেনে রহিয়াছ জাতিনাশা-স্থানে।
জাতি রাখি' চল তুমি আপন-ভবনে।।
আমি যে করিয়া আছি যাত্রার নির্ব্বন্ধ।
তাহাতেও ভাব অনাচারের সম্বন্ধ।।

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ১০/১৩২-১৩৪

শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ক্রন্দন করতে করতে শ্রীজগন্নাথের শ্রীচরণে মাথা রেখে বলতে লগলেন--হে নাথ! যেমন অপরাধ করেছিলাম, তেমনি শাস্তি পেলাম। আজ আমার পরম শুভদিন। তোমার শ্রীহস্ত আমার অঙ্গে লাগল। জানি না কোন জন্মে কি সুকৃতি করেছিলাম। তাই তোমার হস্ত স্পর্শ অনুভব করলাম। ভগবান শ্রীবিদ্যানিধির প্রতি স্বপ্নে এইরূপ কৃপা করে অন্তর্ধান করলেন। বিদ্যানিধি প্রভাতে গাত্রোত্থান করে দেখলেন শ্রীজগন্নাথ ও বলরামের চপেটাঘাতে তাঁর দুই গাল ফুলে গেছে। স্বপ্ন-বিবরণ স্মরণ করে তিনি লজ্জিত হলেন।

প্রতিদিন স্বরূপ-দামোদর প্রভু প্রাতে তাঁর নিকট আগমন করতেন এবং উভয়ে জগন্নাথ মন্দিরে ঠাকুর দর্শন করতে যেতেন। অন্যান্য দিনের মত এদিনও স্বরূপ দামোদর প্রভু বিদ্যানিধির বাসস্থানে এলেন। দেখলেন বিদ্যানিধি তখনও শায়িত আছেন। সেদিন এতক্ষণ পর্যন্ত শয্যায় থাকবার কারণ জানতে চাইলে বিদ্যানিধি মহাশয় স্বরূপ দামোদর প্রভুকে নিকটে ডেকে রাত্রের অলৌকিক স্বপ্ন বিবরণ দিলেন। বিদ্যানিধির মুখে সবকিছু শ্রবণ করে এবং তাঁর দুই গাল ফোলা দেখে স্বরূপদামোদর প্রভু আনন্দ সাগরে ভাসতে লাগলেন। তিনি বললেন—স্বপ্নে এসে ভগবান কাউকে শাস্তি প্রদান করেন এইকথা কখনও শুনি নাই। কিন্তু আজ তা প্রত্যক্ষ করলাম। আপনার সমান ভাগ্যবান্ ত্রিলোকে কে আছে? সাক্ষাৎ ভগবানের স্পর্শ লাভ করেছেন। স্বরূপদামোদর আনন্দভরে শ্রীবিদ্যানিধি প্রভুর প্রশংসা করলেন। সখার সম্পদ দেখে যেমন সখার আনন্দ হয় সেরূপ

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির সৌভাগ্য দেখে দামোদর প্রভু নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে করতে লাগলেন। ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন বিদ্যানিধি মহাশয়। গৌরসুন্দর তাঁকে বাপ ডাকতেন। বিদ্যানিধি প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা-সহচর ছিলেন।

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি-চরিত্র শুনিলে।
অবশ্য তাঁহারে কৃষ্ণ পাদপদ্ম মিলে।।

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ১০/১৮১

**।। জয় শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভু কি জয়।।**

# শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী

শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় বর্ণনা আছে—যিনি ব্রজে শ্রীবৃষভানু কুমারী শ্রীরাধা, তিনি অধুনা শ্রীগদাধর পণ্ডিত নামে খ্যাত। শ্রীস্বরূপ দামোদরকৃত কড়চায়—

''অবধি-সুর বরঃ শ্রীপণ্ডিতাখ্যো যতীন্দ্রঃ
স খলু ভবতি রাধা শ্রীলগৌরাবতারে।''

শ্রীগদাধর পণ্ডিত শিশুকাল থেকেই মহাপ্রভুর সঙ্গী। শ্রীগদাধরের পিতার নাম শ্রীমাধব মিশ্র, মাতার নাম শ্রীরত্নাবতী দেবী। তিনি মায়াপুরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহ সন্নিকটে থাকতেন। রত্নাবতী দেবী শচীদেবীকে বড় ভগিনীর ন্যায় দেখতেন, তাঁর সঙ্গে সর্ব্বদা মেলামেশাদি করতেন। শিশু-লীলার সময় শ্রীগৌরহরি গদাধরকে সঙ্গে নিয়ে কখনও স্বীয় অঙ্গনে কখনও গদাধরের গৃহে বিবিধ ক্রীড়া করতেন। গ্রামের পাঠশালায় উভয়ে একসঙ্গে অধ্যয়ন করতেন। শ্রীগদাধর বয়সে মহাপ্রভুর কয়েক বছরের ছোট। মহাপ্রভু ক্ষণকালও গদাধর ছাড়া থাকতে পারতেন না। গদাধরও মহাপ্রভু ছাড়া একক্ষণ থাকতে পারতেন না।

শ্রীবাসুদেব ঘোষ ঠাকুর লিখেছেন—

আগম অগোচর গোরা।
অখিল ব্রহ্ম পর, দেব উপর,
না জানে পাষণ্ডী মতি ভোরা।।
নিত্য নিত্যানন্দ, চৈতন্য গোবিন্দ,
পণ্ডিত গদাধর রাধে।
চৈতন্য যুগলরূপ, কেবল রসের কূপ,
অবতার সদাশিব সাধে।।
অন্তরে নবঘন, বাহিরে গৌরতনু,
যুগলরূপ পরকাশে।
কহে বাসুদেব ঘোষে, যুগল ভজন বশে,
জনমে জনমে রহু আশে।।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

পণ্ডিতের ভাব মুদ্রা কহন না যায়।
গদাধর প্রাণনাথ নাম হৈল যায়।।
পণ্ডিতের কৃপা প্রসাদ কহন না যায়।
গদাই-গৌরাঙ্গ করি সর্ব্বলোকে গায়।।

শ্রীঈশ্বরপুরী নবদ্বীপ মায়াপুরে শ্রীগোপীনাথ আচার্য্যের গৃহে কয়েক মাস অবস্থান করেন। সে

সময় পুরীপাদ অতি স্নেহ করে গদাধরকে স্বরচিত কৃষ্ণলীলামৃত নামক গ্রন্থ অধ্যয়ন করান।

গদাধর পণ্ডিতেরে আপনার কৃত।
পুঁথি পড়ায়েন নাম কৃষ্ণলীলামৃত।।
—চৈঃ ভাঃ আদিঃ ১১/১০০

শ্রীগদাধর পণ্ডিত শৈশবকাল থেকে ধীর, শান্ত, নির্জ্জনতা-প্রিয় ও বৈরাগ্যবান্ ছিলেন। শৈশবে গৌরসুন্দর খুব চঞ্চলভাব প্রকট করে যাকে তাকে ন্যায়ের ফাঁকি জিজ্ঞাসা করতেন। গদাধরের তা বিশেষ পছন্দ হত না। সেজন্য তিনি তাঁর থেকে কখন কখন দূরে থাকতে চাইতেন। কিন্তু গৌরসুন্দর তাঁকে ছাড়তেন না; বলতেন—গদাধর! কিছুদিন বাদে আমি এমন বৈষ্ণব হব যে আমার দ্বারে ব্রহ্মা শিবাদিও আসবে।

গদাধর পণ্ডিত মুকুন্দ দত্তকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। কোন স্থান থেকে সাধু-সন্ন্যাসী নবদ্বীপে এলে মুকুন্দ সে সংবাদ শ্রীগদাধরকে জানাতেন এবং দুজনে দর্শনে যেতেন। একবার চট্টগ্রাম থেকে শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি নবদ্বীপে এলেন। মুকুন্দ গদাধর পণ্ডিতকে বৈষ্ণব দেখতে যাবার কথা জানালেন। শ্রীগদাধর বৈষ্ণব দর্শনের জন্য কৌতূহলযুক্ত হয়ে মুকুন্দের সঙ্গে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে দর্শন করতে গেলেন। শ্রীগদাধর তাঁর মহাবিষয়ী-প্রায় বেশ-ব্যবহারাদি দেখে যে শ্রদ্ধা নিয়ে গিয়েছিলেন, তা, হারিয়ে ফেললেন; বললেন—বৈষ্ণবের এত বিষয়ীর মত ব্যবহার কেন? মুকুন্দ গদাধরের মন জানতে পেরে একটি কৃষ্ণলীলা শ্লোক সুস্বরে কীর্ত্তন করলেন। মুকুন্দ দত্ত পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির পূর্ব্ব-পরিচিত ছিলেন। মুকুন্দের কণ্ঠধ্বনি অতি মধুর ছিল। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি মুকুন্দের কৃষ্ণলীলা গীত যেই শ্রবণ করলেন, অমনি 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলে রোদন করতে করতে ধরাতলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন।

শুনিলেন মাত্র ভক্তি-যোগের বর্ণন।
বিদ্যানিধি লাগিলেন করিতে ক্রন্দন।।
নয়নে অপূর্ব বহে শ্রীআনন্দ ধার।
যেন গঙ্গাদেবীর হইল অবতার।।
—চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ৭/৭৮-৭৯

শ্রীগদাধর পণ্ডিত এবার মনে মনে নির্ব্বেদযুক্ত হলেন। বললেন—না বুঝে এ হেন মহাভাগবত-পুরুষকে বিষয়ী-জ্ঞান করেছি—অপরাধ হয়েছে। অতএব তাঁর কাছে মন্ত্র গ্রহণ ছাড়া অপরাধ থেকে নিস্তার পাব না।

শ্রীগদাধর পণ্ডিত অনন্তর শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির কাছে মন্ত্র চাইলেন। শ্রীমুকুন্দ শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির নিকট গদাধর পণ্ডিতের সবিশেষ পরিচয় বললেন। তা শুনে বিদ্যানিধি বড়ই হরষিত হলেন।

শুনিয়া হাসেন পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি।
আমারে ত মহারত্ন মিলাইলা বিধি।।
করাইমু ইহাতে সন্দেহ কিছু নাই।
বহু জন্ম ভাগ্যে সে এমত শিষ্য পাই।।
—চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ৭/১১৭-১১৮

অতঃপর শুভদিনে শ্রীগদাধর পণ্ডিত শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি থেকে মন্ত্র গ্রহণ করলেন।

মহাপ্রভু গয়াধামে গিয়ে প্রথম প্রেম প্রকাশ আরম্ভ করলেন। সেখানে শ্রীঈশ্বর পুরীর আশ্রয় লীলা করলেন। গৃহে ফিরে এলেন, এবার এক নূতন জীবন প্রকট করলেন। অহর্নিশী কৃষ্ণপ্রেম সিন্ধুতে ভাসতে লাগলেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত মহাপ্রভুর সে অদ্ভুত কৃষ্ণ-প্রেমাশ্রু দর্শন করে স্বয়ং কৃষ্ণ-প্রেমে ক্রন্দন করতে লাগলেন। তখন থেকে শ্রীগদাধর মহাপ্রভুকে ত্যাগ করে মুহূর্ত্তের জন্যও কোথাও যেতেন না। একদিন গদাধর তাম্বুল নিয়ে প্রভুর নিকট এলে

প্রভু ভাবাবেশে জিজ্ঞাসা করলেন--গদাধর! পীত বসনধারী শ্যামসুন্দর কোথায়? এ বলে ক্রন্দন করতে লাগলেন। গদাধর কি জবাব দেবেন কিছুই বুঝতে পারছেন না। সসম্ভ্রমে বললেন--কৃষ্ণ তোমার হৃদয়ে আছেন। এ কথা শুনে মহাপ্রভু নিজ নখের দ্বারা হৃদয় চিরতে লাগলেন। গদাধর তাড়াতাড়ি মহাপ্রভুর হাত চেপে ধরলেন। প্রভু বললেন—'গদাধর! আমার হাত ছেড়ে দাও। আমি কৃষ্ণ দর্শন বিনা থাকতে পারছি না।' গদাধর বললেন—'তুমি একটু স্থির হও, কৃষ্ণ এখনই আসবেন। এই ত তাঁর আসবার সময় হয়েছে।' গদাধরের বাক্য শুনে প্রভু স্থির হলেন। দূর থেকে শচীমাতা গৌর-গদাধরের এ রঙ্গ দেখে ছুটে এলেন ও তুষ্ট হয়ে বললেন—গদাধর শিশু হলেও অতি বুদ্ধিমান; আমি ভয়ে গৌরের সামনে যেতে পারি না। গদাধর কেমন কৌশলে তাকে শান্ত করল।

মুঞি ভয়ে নাহি পারোঁ সম্মুখ হইতে।
শিশু হই কেমন প্রবোধিলা ভালমতে।।

—চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ২/২১০

শ্রীশচীমাতা বললেন—'গদাধর! তুমি সর্ব্বদা নিমাইয়ের সঙ্গে থেকো। তুমি তার সঙ্গে থাকলে আমি নিশ্চিন্ত হই।' একদিন শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর ঘরে প্রভু কৃষ্ণ-কথা বলবেন—শুনে গদাধরও সেখানে গেলেন ও গৃহের মধ্যে বসলেন। বাইরে বারান্দায় বসে প্রভু কৃষ্ণ কথা আরম্ভ করলেন। কথা বলতে বলতে স্বয়ং প্রেমরসে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ প্রেমরসে ডুবে গেলেন। কিছুক্ষণ এরূপে প্রেম-রসাস্বাদন হল। গদাধরের প্রেম আর ভাঙে না। মাথা নীচু করে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতে লাগলেন। তাঁর করুণ ক্রন্দন-ধ্বনি শুনে প্রভু বললেন— গৃহের মধ্যে কে ক্রন্দন করছে? ব্রহ্মচারী বললেন—তোমার গদাধর। প্রভু বললেন গদাধর? তুমি সুকৃতিমান্। শিশু কাল থেকে কৃষ্ণে তোমার সুদৃঢ় মতি। আমার জন্ম বৃথা গেল, নিজ কর্ম্মদোষে প্রাণনাথ কৃষ্ণকে পেলাম না। প্রভু একথা বলে গদাধরকে প্রেমে আলিঙ্গন করলেন।

প্রভু যখন নবদ্বীপ-পুরে লীলা বিলাস করতে লাগলেন, তখন প্রধান সহায় গদাধর। ব্রজের রাই-কানাই এবার গৌর-গদাধর রূপে গঙ্গাতটে বিহার করছেন। ব্রজের গোপ সখাগণ কীর্ত্তন সহচররূপে প্রভুর সঙ্গে বিহার করছেন। একদিন প্রভু নগর ভ্রমণ করতে করতে গঙ্গাতটে এলেন এবং উপবন মধ্যে বসলেন। তখন ব্রজ লীলার কথা স্মরণ হল। মুকুন্দ দত্ত মধুর স্বরে পূর্ব্বরাগ গাইতে লাগলেন। গদাধর বন থেকে পুষ্প চয়ন করে মালা গেথে প্রভুর কণ্ঠে দিলেন। পূর্ব্বে বৃন্দাবনে শ্রীরাধা যেমন শ্রীকৃষ্ণকে সাজাতেন, গদাধর ঠিক সেইভাবে প্রভুকে সাজাতে লাগলেন। কেউ মধুর গীত গাইতে লাগলেন, কেউ মধুর-ছন্দে নৃত্য করতে লাগলেন। অতঃপর শ্রীগৌরসুন্দর গদাধরকে নিয়ে এক বৃক্ষ-মূলে বেদীর উপর বসলেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য আরতি করতে লাগলেন। প্রভুর দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দ বসলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত ফুলের মালা দিয়ে সাজাতে লাগলেন। নরহরি চামর ব্যজন করতে লাগলেন। শুক্লাম্বর চন্দন লাগাচ্ছেন, মুরারি গুপ্ত জয় জয় ধ্বনি করছেন। মাধব, বাসুদেব, পুরুষোত্তম, বিজয় ও মুকুন্দ প্রভৃতি বিবিধ রাগে গান করতে লাগলেন।

এইরূপে প্রভু নদীয়া-লীলা সাঙ্গ করে যখন সন্ন্যাস-লীলা করলেন এবং জননীর আদেশে নীলাচলে বাস করতে লাগলেন, তখন গদাধরও নীলাচলে গিয়ে বাস করলেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত শ্রীগোপীনাথের সেবা করতেন। মহাপ্রভু প্রিয়-গদাধরের মন্দিরে প্রায়-সময় কৃষ্ণ-কথা রসে ডুবে থাকতেন। প্রভু যখন বৃন্দাবনে যাত্রা করেন,

তখন বিরহ সইতে না পেরে গদাধর মহাপ্রভুর সঙ্গে যাবার জন্য উদ্যত হন। তখন মহাপ্রভু তাঁকে ক্ষেত্র সন্ন্যাস ব্রত ছাড়তে নিষেধ করেন। গদাধর বলেন–

'যাঁহা তুমি সেই নীলাচল।
ক্ষেত্র সন্ন্যাস মোর যাউক রসাতল।।'

মহাপ্রভু বললেন, তোমার গোপীনাথের সেবা ছাড়া উচিৎ নয়, গদাধর বলেন– তোমার পাদপদ্ম দর্শন করলে কোটি গোপীনাথ দর্শন হবে। প্রভু অনেক বুঝিয়ে তাঁকে নীলাচলে রেখে যান।

শ্রীগদাধর পণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করতেন। সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দর বসে শুনতেন।

''গদাধর পণ্ডিত প্রভুর আগে বসি।
পড়ে ভাগবত–সুধা ঢালে রাশি রাশি।।''

–ভঃ রঃ ৩/১০৭

আটচল্লিশ বছর বিচিত্র লীলা করবার পর, শ্রীগদাধর পণ্ডিতের সেবিত শ্রীগোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে শ্রীমহাপ্রভু বিলীন হন।

''ন্যাসী সিরোমণি চেষ্টা বুঝে সাধ্য কার?
অকস্মাৎ পৃথিবী করিলা অন্ধকার।।
প্রবেশিলা এই গোপীনাথের মন্দিরে।
হৈলা অদর্শন,–পুনঃ না আইলা বাহিরে।।''

–ভঃ রঃ ৮/৩৫৬-৩৫৭

স্মর গৌর গদাধর কেলিকলাং
ভব গৌর গদাধর পক্ষচরং।
শৃণুগৌর গদাধর চারুকথাং
ভজ গোদ্রুম-কানন কুঞ্জবিধুম।।

–শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

বৈশাখ অমাবস্যা তিথিতে শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী আবির্ভূত হন। এবং ১৪৫৬ শকাব্দে জ্যৈষ্ঠ অমাবস্যা তিথিতে পুরীধামে অপ্রকট হন।

**।। জয় শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী কি জয়।।**



শ্রীগদাধর পণ্ডিতের সেবিত বিগ্রহ (শ্রীটোটা গোপীনাথ)

# শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত

শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের জন্মস্থান ত্রিবেণীর কাছে গুপ্তিপাড়ায়। শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত নৃত্য ও গীতে বড় নিপুণ ছিলেন; চব্বিশপ্রহর এক ভাবে নৃত্য করতে পারতেন।

বক্রেশ্বর পণ্ডিত—প্রভুর বড় প্রিয়ভৃত্য।
এক-ভাবে চব্বিশ প্রহর যাঁর নৃত্য।।
আপনে মহাপ্রভু গাহেন যাঁর নৃত্যকালে।
প্রভুর চরণ ধরি' বক্রেশ্বর বলে।।
দশসহস্র গন্ধর্ব্ব মোরে দেহ', চন্দ্রমুখ।
তারা গায়, মুঞি নাচি, তবে মোর সুখ।।
প্রভু বলেন,—তুমি মোর পক্ষ এক শাখা।
আকাশে উড়িয়া যাঙ, পাঙ আর পাখা।।

চৈঃ চঃ আদিঃ ১০/১৭-২০

শ্রীমন্মহাপ্রভু নবদ্বীপ লীলার সময়, সন্ন্যাস গ্রহণান্তর পুরী গমনের সময় এবং পুরীতে অবস্থানের সময় শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

মহা-প্রভু যখন প্রথমে নবদ্বীপে মহাসংকীর্ত্তন-লীলা আরম্ভ করেন তখন বক্রেশ্বর পণ্ডিত একজন বড় গায়ক ও নর্ত্তক ছিলেন। মহাপ্রভু যখন রামকেলিতে যান তখন বক্রেশ্বর পণ্ডিত তাঁর সঙ্গে ছিলেন। বক্রেশ্বর পণ্ডিতের কৃপায় দেবানন্দ পণ্ডিত উদ্ধার লাভ করেন।

পূর্ব্বে ভাগবত শাস্ত্রের অদ্বিতীয় অধ্যাপক বলে দেবানন্দ পণ্ডিতের খ্যাতি ছিল। একদিন শ্রীবাস পণ্ডিত তাঁর পাঠ শ্রবণ করতে যান এবং প্রেমে ক্রন্দন করতে থাকেন। সে সময়ে দেবানন্দের কতিপয় অজ্ঞ ছাত্র পাঠ শ্রবণের বিঘ্ন হচ্ছে মনে করে শ্রীবাস পণ্ডিতকে গৃহের বাইরে নিয়ে রেখে দেয়। ভক্ত ভাগবতের প্রতি এইরূপ অবজ্ঞা স্বচক্ষে দেখেও দেবানন্দ পণ্ডিত কোন প্রতিবাদ করেন নাই। তাই মহাভাগবত চরণে তাঁর অপরাধ হয়।

শ্রীমহাপ্রভু আত্মপ্রকাশ ক'রে দেবানন্দের এরূপ মহাভাগবত অবজ্ঞার কথা জানিয়ে, ভাগবত সম্বন্ধে তাকে অনেক উপদেশ দান করেন। তিনি বলেন—যারা গ্রন্থ-ভাগবত পড়ে, কিন্তু ভক্ত ভাগবতকে সমাদর করে না তারা অপরাধী। শত শত কল্পেও ভাগবত পড়ে তারা প্রেম পাবে না। ভক্ত-ভাগবত ও গ্রন্থ ভাগবত অভিন্ন। গ্রন্থ-ভাগবত জানতে হলে অকপটে ভক্ত ভাগবতের সেবা করতে হয়। মহাপ্রভু দেবানন্দকে উপেক্ষা করলেন। কৃষ্ণ-প্রেম প্রদান করলেন না।

একদিন শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত নবদ্বীপের কুলিয়ায় এক ভক্ত গৃহে সন্ধ্যায় নৃত্য-গীত করতে লাগলেন। দেবানন্দ পণ্ডিত খবর পেয়ে সেখানে গেলেন এবং বক্রেশ্বর পণ্ডিতের দিব্য প্রেমাবেশ দেখে মুগ্ধ হলেন। ক্রমে লোকের খুব ভিড় হতে লাগল। শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত তখন একখানি বেত্র হাতে সে ভিড় সামলাতে লাগলেন—যেন শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত ঠাকুরের নৃত্য-কীর্ত্তনে কোন বিঘ্ন না হয়—এ রূপে দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত মহা-নৃত্য গীত করলেন। পরে বক্রেশ্বর পণ্ডিত বসলে দেবানন্দ পণ্ডিত তাঁকে দণ্ডবৎ করলেন। তাঁর ওই সেবায় শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত বড় খুশী হয়ে তাঁকে আশীর্ব্বাদ করলেন। ''কৃষ্ণ ভক্তি হউক''। সে দিন থেকে দেবানন্দ পণ্ডিতের কৃষ্ণ ভক্তি হল। ভক্তের আশীর্ব্বাদে কৃষ্ণে ভক্তি হয়।

শ্রীমহাপ্রভু যখন পুরীধাম থেকে জননী ও গঙ্গা

দর্শনের জন্য কুলিয়ায় এলেন, তিনি দেবানন্দ পণ্ডিতকে এবার কৃপা করলেন।

প্রভু বলে তুমি যে সেবিলা বক্রেশ্বর।
অতএব হৈলা তুমি আমার গোচর।।
বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর পূর্ণ শক্তি।
সেই কৃষ্ণ পায়, যে তাহারে করে ভক্তি।।
বক্রেশ্বর হৃদয়ে কৃষ্ণের নিজ ঘর।
কৃষ্ণ নৃত্য করে নাচিতে বক্রেশ্বর।।
যে তে স্থানে যদি বক্রেশ্বর সঙ্গ হয়।
সেই স্থান সর্ব্বতীর্থ শ্রীবৈকুণ্ঠময়।।

চৈঃ ভাঃ অঃ ৩/৪৯২-৪৯৬

দেবানন্দ পণ্ডিতের অপরাধ ক্ষালন হলে মহাপ্রভু তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন--

'ভাগবত বুঝি' হেন যার আছে জ্ঞান।
সেই না জানয়ে বাগবতের প্রমাণ।।
অজ্ঞ হই' ভাগবতে যে লয় শরণ।
ভাগবত-অর্থ তার হয় দরশন।।
প্রেমময় ভাগবত--শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ।
তাহাতে কহেন যত গোপ্য কৃষ্ণ-রঙ্গ।।
বেদ-শাস্ত্র পুরাণ কহিয়া বেদব্যাস।
তথাপি চিত্তের নাহি পায়েন প্রকাশ।।
যখনে শ্রীভাগবত জিহ্বায় স্ফুরিল।
ততক্ষণে চিত্তবৃত্তি প্রসন্ন হইল।।
চল তুমি যাহ অধ্যাপনা কর গিয়া।
কৃষ্ণ-ভক্তি-অমৃত সবারে বুঝাইয়া।।

চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩/৫১৪-৫১৮, ৫২৩

শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত পূর্ব্বে নবদ্বীপে বাস করতেন। পরবর্ত্তীকালে মহাপ্রভুর সেবার জন্য তিনি পুরীতে থাকতেন।

পরমানন্দ পুরী, আর স্বরূপ দামোদর।
গদাধর, জগদানন্দ শঙ্কর বক্রেশ্বর।।
দামোদর পণ্ডিত ঠাকুর হরিদাস।
রঘুনাথ বৈদ্য আর রঘুনাথ দাস।।
ইত্যাদিক প্রভু সঙ্গী বড় ভক্তগণ।
নীলাচলে রহি প্রভুর করেন সেবন।।

চৈঃ চঃ আদি ১০/১২৫-১২৭

শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত যখন পুরুষোত্তমধামে ছিলেন, তখন টোটাগোপীনাথে শ্রীমহাপ্রভু, অদ্বৈত প্রভু এবং অন্যান্য ভক্তগণের সাথে তিনিও শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর নিকট ভাগবত কথা শুনতেন। ভক্ত ভাগবতের নিকটই গ্রন্থ ভাগবত শ্রবণীয়।

গোপাল গুরু গোস্বামী শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন। গোপালগুরুর পূর্ব নাম ছিল শ্রীমকরধ্বজ পণ্ডিত, তাঁর পিতার নাম মুরারি পণ্ডিত।

পুরীতে রথযাত্রার সময় যখন রথের সামনে সাত সম্প্রদায়ের কীর্ত্তন হত, তাদের মধ্যে চতুর্থ সম্প্রদায়ের মূল কীর্ত্তনীয়া ছিলেন গোবিন্দ ঘোষ, নর্ত্তক ছিলেন শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত।

গৌরগণোদ্দেশ দীপিকার ৭১ শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে–

ব্যূহস্তুর্য্যোঽনিরুদ্ধো যঃ স বক্রেশ্বরপণ্ডিতঃ।
কৃষ্ণাবেশজ নৃত্যেন প্রভোঃ সুখমজীজনৎ।।

চতুর্ব্যূহের অন্তর্গত অনিরুদ্ধই গৌরলীলায় বক্রেশ্বর পণ্ডিত। শ্রীরাধিকার প্রিয় সখী শশিরেখা শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের মধ্যে অন্তপ্রর্বিষ্ঠ আছেন।

আষাঢ়ী কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথি শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের আবির্ভাব দিন। তিনি অপ্রকট লীলাবিষ্কার করেন আষাঢ় শুক্লাষষ্ঠীতে।

উৎকলের কবি শ্রীগোবিন্দ দেব শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের পরিবারভুক্ত, তিনি সপ্তদশ শকের শেষভাগে ''শ্রীশ্রীগৌর কৃষ্ণোদয়" নামে একখানি

কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের আচার্য্যবর নিত্যলীলা প্রবিষ্ট শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ তা প্রকাশ করেন।

পদকর্ত্তা শ্রীবৃন্দাবন দাস মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তন-রাস মহোৎসবে শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের নাম স্মরণ করেছেন।

জীবের ভাগ্যে অবনী আইলা গৌরহরি।
ভুবন মোহন রূপ সোনার পুতলী।।
হরিনামামৃত দিয়া করিলা চেতন।
কলিযুগে ছিল যত জীব অচেতন।।
নিত্যানন্দ অদ্বৈত আচার্য্য গদাধর।
সকল ভকত মাঝে সাজে পহুবর।।
খোল করতাল মন্দিরা ঘন রোল।।
ভাবের আবেশে গোরা বলে হরিবোল।।
ভুজ তুলি নাচে পহু শচীর নন্দন।
রামাই সুন্দর নাচে শ্রীরঘুনন্দন।।
শ্রীনিবাস হরিদাস আর বক্রেশ্বর।
দ্বিজ হরিদাস নাচে পণ্ডিত শঙ্কর।।
জয় জয় জয় ধ্বনি জগতে প্রকাশ।
আনন্দে মগন ভেল বৃন্দাবন দাস।।

**।। জয় শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত কি জয়।।**








# শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত

শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত নবদ্বীপ নিবাসী ছিলেন। তিনি ছিলেন মহাপ্রভুর সহচর। অতি প্রিয়জন।

পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর প্রাণরূপ।
লোকে খ্যাত যেহো সত্যভামার স্বরূপ।।

চৈঃ চঃ আদি ১০/২১

গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় বর্ণনা আছে– ‘‘সত্যভামা প্রকাশোঽপি জগদানন্দ পণ্ডিতঃ।।’’ শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত সত্যভামার প্রকাশ-স্বরূপ। নবদ্বীপে কাজী দলন, জগাই-মাধাই উদ্ধার ও নগর সংকীর্ত্তন প্রভৃতি লীলায় শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত মহাপ্রভুর সঙ্গে ছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করে প্রভু যখন পুরীধামে চলেন তখনও শ্রীজগদানন্দ সঙ্গে ছিলেন।

নিত্যানন্দ গোসাঞি পণ্ডিত জগদানন্দ।
দামোদর পণ্ডিত আর দত্ত মুকুন্দ।।

চৈঃ চঃ মধ্যঃ ৩/২০৯

এই চারজনকে সঙ্গে নিয়ে প্রভু শান্তিপুর থেকে পুরীর দিকে চলতে লাগলেন। উড়িষ্যায় প্রবেশ করে একদিন প্রভু শ্রীজগদানন্দের কাছে দণ্ডটি রেখে ভিক্ষা করতে গেলেন। শ্রীজগদানন্দ দণ্ডখানি পুনঃ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর হাতে দিয়ে কার্য্যান্তরে গেলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু প্রেমাবিষ্ট হয়ে দণ্ডখানি ভেঙ্গে তিন খণ্ড করে ফেলে রাখলেন। তা দেখে প্রভু দুঃখিত হলেন। সেই স্থান থেকে তিনি কোন ভক্ত সঙ্গে না নিয়ে একা পুরী প্রবেশ করলেন। শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীজগদানন্দ, শ্রীদামোদর আদি ভক্তগণ শ্রীসার্ব্বভৌম গৃহে প্রভুর সঙ্গে মিলিত হন।

মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশ ভ্রমণের ইচ্ছা হল। সঙ্গে কাকে নেবেন সে বিষয়ে বিচার হতে লাগল। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে সঙ্গে নেবার কথা ভক্তগণ বললেন। প্রভু স্বীকার করলেন না। জগদানন্দ পণ্ডিতের কথা বলা হয়। তদুত্তরে প্রভু বললেন--জগদানন্দ আমার সন্ন্যাস বৈরাগ্য পছন্দ করে না। সে যা বলে তা আমাকে করতে হয়। যদি না করি সে তিনদিন উপোস করে।

জগদানন্দ চাহে আমা বিষয় ভুঞ্জাইতে।
যেই কহে, সেই ভয়ে চাহিয়ে করিতে।।
কভু যদি ইঁহার বাক্য করিয়ে অন্যথা।
ক্রোধে তিন দিন মোরে নাহি কহে কথা।।

প্রভু পরিশেষে সঙ্গে নিলেন কৃষ্ণদাস নামক এক সরল প্রকৃতির ব্রাহ্মণকে। প্রভু দক্ষিণ দেশ অভিমুখে যখন যাত্রা করলেন বিরহে জগদানন্দ পণ্ডিত অচৈতন্যবৎ ভূতলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। কয়েক মাস প্রভু দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করলেন। শ্রীজগদানন্দ আদি ভক্তগণ তাঁর পুনঃ দর্শন প্রতীক্ষায় পুরীতে অবস্থান করতে লাগলেন। প্রভু দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করে আলালনাথে ফিরে এলেন। ভক্তগণকে সেই সংবাদ দেবার জন্য আলালনাথ থেকে কৃষ্ণদাস পুরীতে এলেন।

জগদানন্দ দামোদর পণ্ডিত মুকুন্দ।
নাচিয়া চলিলা দোঁহে না ধরে আনন্দ।।

চৈঃ চঃ মধ্যঃ ৯/৩৪০

প্রাণের প্রাণ ফিরে এসেছেন, তাই জগদানন্দ আদি ভক্তগণ আনন্দে আলালনাথের দিকে ছুটলেন। তারপর প্রভুর সঙ্গে মিলন হল। ভক্তগণ পরম সুখী হলেন, ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু পুরীতে ফিরে এলেন। ভক্তগণের কাছে প্রভু তীর্থ প্রসঙ্গ বলতে লাগলেন।

দক্ষিণ দেশে ভট্টথারিদিগের কথা বললেন। তারা এক প্রকার বাঁদিয়া জাতি। বিদেশী লোক দেখলে তারা স্ত্রীলোক দেখিয়ে ভুলাবার চেষ্টা করে। সরল ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদাসকে ভট্টথারিগণ নানা প্রকার প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তাদের ঘরে গিয়ে প্রভু কৃষ্ণদাসকে তাঁর কেশে ধরে টেনে বের করে আনেন। ভট্টথারিগণ অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে প্রভুকে মারতে উঠেছিল। পুরীতে এসে ভক্তগণের কাছে এসব কথা বলে প্রভু তাঁকে বিদায় করতে চাইলেন। কৃষ্ণদাস প্রভুর চরণতলে পড়ে কাঁদতে লাগলেন। অবশেষে ভক্তগণ মন্ত্রণা করে তাঁকে গৌড় দেশের ভক্তগণের কাছে প্রভুর আগমন সংবাদ জানানোর জন্য পাঠিয়ে দিলেন।

শ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচা মার্জ্জন উৎসবের দিন মার্জ্জনলীলা সমাপ্ত করে প্রভু ভক্তগণসহ জগন্নাথবল্লভ উদ্যানে বিশ্রাম করতে লাগলেন। এই সময় শ্রীকাশী মিশ্র, তুলসী পড়িছা ও বাণীনাথ প্রচুর প্রসাদ নিয়ে এলেন। প্রভু ভক্তগণ সহ মণ্ডলী করে বসে মহানন্দে প্রসাদ সেবা করতে লাগলেন। শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত, শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভু ও শ্রীগোবিন্দ পরিবেশন করতে লাগলেন। ভক্তগণকে পিঠা মিষ্টান্ন প্রভৃতি দিতে আদেশ দিয়ে মহাপ্রভু স্বয়ং লাফরা ব্যঞ্জন মেগে খেতে লাগলেন। শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত পরিবেশন করতে করতে হঠাৎ প্রভুর পাতে ভাল মিষ্টান্ন প্রসাদ দিয়ে যান। প্রভু ভাল জিনিস খেতেন না। পাতে জগদানন্দ প্রদত্ত মিষ্টান্নের দিকে তাকাতে লাগলেন। যদি না খান জগদানন্দ রাগ করে উপোস করবেন, তাই ভয়ে ভয়ে খেতে লাগলেন।

ভাল ভাল দ্রব্য এনে স্বরূপ-দামোদর মহাপ্রভুকে বলতে থাকেন এটার স্বাদ জগন্নাথদেব কেমন আস্বাদন করেছেন, তুমিও একটু একটু আস্বাদন করে দেখ। প্রভু তা শুনে একটু একটু নিয়ে মুখে দিতে লাগলেন।

দুই জন ভক্তের এই স্নেহ ব্যবহার পরম বিচিত্র। সার্ব্বভৌম পণ্ডিত বসেছিলেন প্রভুর বামে। তিনি ও সব দেখে হাস্য করতে লাগলেন।

শ্রীসনাতন গোস্বামী পুরী ধামে এলেন। তিনি শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে রইলেন। সেখানে গিয়ে মহাপ্রভু ও ভক্তগণ মিলিত হতেন। শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতও প্রায় তাঁদের দর্শনে যেতেন।

একদিন শ্রীসনাতন গোস্বামী খেদ করে শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতের কাছে বলতে লাগলেন—আমি হিতের জন্য এসে অনেক অপরাধ করে গেলাম। প্রভু আমায় ধরে বার বার আলিঙ্গন করেন, আমার অঙ্গের ক্লেদ তাঁর অঙ্গে লাগে। তাতে কত যে অপরাধ হচ্ছে তা কে বলবে? পণ্ডিত! আপনি কিছু সৎ পরামর্শ দিন। শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত বললেন—প্রভু ত' আপনাকে বৃন্দাবন ধামে স্থান দিয়েছেন। রথ যাত্রা দর্শন করে সেখানে চলে যান। জগদানন্দ পণ্ডিত এই সমস্ত উপদেশ দিয়ে নিজ স্থানে চলে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে মহাপ্রভু তথায় এলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুকে দেখে দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন। প্রভু তাড়াতাড়ি গিয়ে শ্রীসনাতন গোস্বামীকে আলিঙ্গন করতে চাইলেন, শ্রীসনাতন গোস্বামী পেছনে সরলেন। তথাপি প্রভু গিয়ে আলিঙ্গন করলেন। তখন শ্রীসনাতন গোস্বামী নির্ব্বিন্ন ভাবে বললেন—আমি হিতের জন্য এসেছিলাম কিন্তু বিপরীত হল। আমি জাতিতে নীচ, অধম। তদুপরি অঙ্গে কণ্ডুরসা। তথাপি জোর করে আপনি আমায় আলিঙ্গন করেন। এই অপরাধে আমার সর্ব্বনাশ হবে। অতএব পুরী ধামে আর থাকবার ইচ্ছা আমার মোটেই নাই। আপনি আজ্ঞা করুন রথযাত্রা দর্শন

করে বৃন্দাবনে চলে যাই। শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করতে তিনিও আমাকে শ্রীবৃন্দাবন ধামে যেতে উপদেশ দিয়েছেন–

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর কথা শুনে মহাপ্রভু ক্রুদ্ধ হয়ে বলতে লাগলেন--

কালিকার পড়ুয়া জগা ঐছে গর্ব্বী হৈল।
তোমা সবারেহ উপদেশ করিতে লাগিল।।
ব্যবহারে-পরমার্থে তুমি–তার গুরু-তুল্য।
তোমারে উপদেশ করে, না জানে আপন-মূল্য?
আমার উপদেষ্টা তুমি–প্রামাণিক আর্য্য।
তোমারেহ উপদেশে বালকা– করে ঐছে কার্য্য।।

চৈঃ চঃ অঃ ৪/১৫৮-১৬০

জগদানন্দ কালকার ছেলে। সে কি জানে? আপনার প্রতি উপদেশ করতে যায়? ব্যবহারে পরমার্থে আপনি তার গুরুতুল্য। আপনাকে উপদেশ দেয় নিজের ওজন বুঝে না। আপনি আমারও উপদেষ্টা।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী উঠে প্রভুর শ্রীচরণ যুগল ধরে বলতে লাগলেন–শ্রীজগদানন্দের যে কত সৌভাগ্য তা আজ প্রত্যক্ষ করলাম। আমি যে কত ভাগ্যহীন তাও বুঝতে পারলাম।

শ্রীজগদানন্দকে আপনি আত্মীয় তা রূপ সুধারস পান করাচ্ছেন, আর আমাকে স্তুতিচ্ছলে নিম্ব নিশিন্দার রস পান করাচ্ছেন।

জগদানন্দে পিয়াও আত্মীয়তা-সুধারস।
মোরে পিয়াও গৌরবস্তুতি-নিম্ব-নিশিন্দা-রস।।

চৈঃ চঃ অঃ৪/১৬৩

এখন পর্য্যন্ত আমার প্রতি আত্মীয়তা ভাব প্রকাশ করছেন না। এই আমার দুর্ভাগ্য। এই বলে শ্রীসনাতন গোস্বামী শির নত করে দুঃখে কাঁদতে লাগলেন। প্রভু বড় লজ্জিত হলেন। বলতে লাগলেন–আপনি দুঃখ করবেন না। আমি কখনও আপনাকে বহিরঙ্গ মনে করি না। আপনার গুণে আকৃষ্ট হয়ে এসব কথা বলেছি। জগদানন্দ কেবল আমার প্রিয় আপন এইরূপ মনে করবেন না। আপনিও আমার পরম প্রিয়। আপনি প্রামাণিক শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি, আমাকে বুদ্ধি দিতে পারেন। আপনাকে উপদেশ দেয় এইরূপ মর্য্যাদা হানিকর ব্যাপার আমি সইতে পারি না। মমতাস্পদ বহু ব্যক্তি থাকলেও পাত্র বিশেষে প্রীতির তারতম্য হয়। আপনাকে কখনও বহিরঙ্গ জ্ঞান করি না। এইভাবে শ্রীসনাতন গোস্বামীকে অনেক বুঝিয়ে প্রভু গম্ভীরায় ফিরে গেলেন।

জননীকে দেখবার জন্য মহাপ্রভু একবার শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতকে নবদ্বীপে যাবার আদেশ করলেন। জননীর জন্য শ্রীজগন্নাথের প্রসাদী বস্ত্র ও মহাপ্রসাদ জগদানন্দের হাতে দিলেন। মায়ের শ্রীচরণে শত শত দণ্ডবৎ জানালেন।

জগদানন্দ পণ্ডিত নবদ্বীপে এলেন এবং প্রভুর দেওয়া সব জিনিস শ্রীশচীমাতার হাতে অর্পণ করলেন। শ্রীশচীমাতা সে সব দেখে আনন্দে অশ্রুপাত করতে লাগলেন। জিনিসগুলো সাক্ষাৎ গৌরসুন্দর জ্ঞান করে জননী স্বহস্তে ধরে কত আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলেন। প্রসাদী বস্ত্র ও মহাপ্রসাদ মস্তকে ঠেকিয়ে সতর্কতার সাথে উত্তম স্থানে রাখলেন। তারপর যাবতীয় সংবাদ শুনতে লাগলেন। কয়েকদিন জগদানন্দ পণ্ডিত শ্রীশচীমাতার কাছে থেকে সর্ব্বক্ষণ প্রভুর কথা শুনিয়ে তাঁকে সুখী করলেন। অনন্তর শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে এলেন। প্রভুর দেওয়া মহাপ্রসাদ-আদি আচার্য্যকে দিলেন। আচার্য্যের আনন্দের সীমা রইল না। তিনি জগদানন্দকে খুব যত্ন করে কয়েকদিন রাখলেন এবং নিয়ত প্রভুর প্রসঙ্গ শুনতে লাগলেন। ক্রমে শ্রীজগদানন্দ অন্যান্য ভক্তদিগের সহিত মিলিত হলেন। এইরূপে






কয়েক মাস গৌড়দেশে অবস্থান করবার পর তিনি পুরীতে ফিরে যাবার উদ্যোগ করলেন। ভক্তগণের থেকে বিদায় নিয়ে পাণিহাটীতে শ্রীশিবানন্দ সেন মহোদয়ের গৃহে এলেন। মহাপ্রভুর জন্য সুগন্ধি চন্দন তৈল সংগ্রহ করে সেখান থেকে পুরী অভিমুখে যাত্রা করলেন। তেলের কলসী মাথায় করে শ্রীজগদানন্দ পুরীধামে এলেন। তারপর মহাপ্রভু ও অন্যান্য ভক্তগণের সাথে মিলিত হলেন। ক্রমে গৌড়বাসী ভক্তগণের কথা সব প্রভুকে বললেন। জগদানন্দ পণ্ডিতকে প্রভু স্নেহে আলিঙ্গন করলেন।

একদিন তেলের কলসীটি জগদানন্দ পণ্ডিত গোবিন্দের হাতে দিয়ে বললেন—এই তেল প্রভু শিরে লাগান যেন। প্রভুর সেবক গোবিন্দ তেলের কলসী যত্ন করে রাখলেন। সময়ান্তরে প্রভুকে গোবিন্দ বলতে লাগলেন—আপনার জন্য পণ্ডিত গৌড়দেশ থেকে মাথায় করে চন্দন তৈল এনেছেন। এ তৈল ব্যবহার করলে পিত্ত বায়ু প্রভৃতি ঠাণ্ডা থাকে। তৈল গ্রহণ না করলে পণ্ডিত দুঃখিত হবেন।

প্রভু বললেন—তা বেশ কথা। কিন্তু সন্ন্যাসীর সুগন্ধি তৈল ব্যবহার করবার বিধি নাই। শ্রীজগদীশের প্রদীপের জন্য এ সুগন্ধ তৈল দিয়ে দাও। জগদানন্দের পরিশ্রম সার্থক হবে।

আর একদিন শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত এসে গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন প্রভু তৈল ব্যবহার করছেন ত? প্রভু যা বলেছিলেন গোবিন্দ তা বললেন। শুনে পণ্ডিত ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে তৈলের কলসী নিয়ে অঙ্গনে ভেঙ্গে নিজ স্থানে চলে এলেন। কুটীরের দরজা বন্ধ করে অনাহারে তিন দিন শুয়ে রইলেন। চতুর্থ দিন প্রাতে এই সংবাদ পেয়ে প্রভু তাড়াতাড়ি পণ্ডিতের কুটীর দ্বারে গেলেন এবং ধীরে ধীরে তাঁকে ডাকতে লাগলেন। প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনে শ্রীজগদানন্দ সত্বর উঠে দরজা খুলে প্রভুকে দণ্ডবৎ করলেন। অতি স্নেহভরে প্রভু বললেন—আজ তোমার হাতে প্রসাদ পেতে চাই। এ কথা বলে প্রভু সমুদ্রে স্নান করতে চলে গেলেন স্বর্গদ্বারে। প্রভুপ্রসাদ পেতে চান। পণ্ডিত তাড়াতাড়ি স্নান করে অনেক প্রকারের শাক ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করলেন। প্রভু মধ্যাহ্নকালে এসে ভোজন করতে বসলেন। পণ্ডিত সুগন্ধি অন্ন ব্যঞ্জনাদি থালিতে সাজিয়ে প্রভুর সামনে এনে দিলেন। প্রভু প্রসাদের প্রশংসা করতে করতে শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতকে ভোজন করতে ডাকলেন। পণ্ডিত বললেন আমার কিছু কৃত্য আছে, তুমি খেয়ে নাও। আমি পরে খাব। খেতে খেতে প্রভু বলতে লাগলেন, ক্রোধ নিয়ে রন্ধন। কি সুন্দর হয়েছে! এমন স্বাদিষ্ট তরকারী কোনদিন খাইনি। কৃষ্ণ স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। এইরূপ অনেক প্রশংসা করতে করতে প্রভু ভোজন সমাপ্ত করলেন। তারপর বললেন—জগদানন্দ! তোমার ভোজন দেখে কুটীরে ফিরে যাব। পণ্ডিত বললেন—তুমি বাসায় গিয়ে বিশ্রাম কর। আমি ভোজন করছি। প্রভু যাবার সময় গোবিন্দকে রেখে গেলেন। শ্রীজগদানন্দ ও গোবিন্দ একত্রে ভোজন করলেন। পণ্ডিতের ভোজন সংবাদ পেয়ে প্রভু বিশ্রাম করলেন। শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতের প্রেম বিবর্ত্ত অত্যদ্ভুত।

মহাপ্রভু কলার শরলাতে শয়ন করতেন, তা দেখে ভক্তগণের বড় দুঃখ হত। জগদানন্দ পণ্ডিত এই দুঃখ আর সইতে পারলেন না। শিমুল তুলা দিয়ে এক বালিশ তৈরী করে গোবিন্দের হাতে দিয়ে বললেন—আমার নাম করে প্রভুকে বলবে, তিনি যেন এই বালিশ মাথায় দিয়ে শয়ন করেন।

শয়নের সময় বালিশ দেখে প্রভু রেগে জিজ্ঞাসা করলেন কে বালিশ করে দিল? গোবিন্দ বললেন—জগদানন্দ পণ্ডিত। প্রভু একটু নরম হলেন। বললেন বালিশ নিয়ে যাও। প্রভু এই বলে






বালিশ সরিয়ে কলার শরলাতে শয়ন করলেন। তা দেখে শ্রীস্বরূপ দামোদর বললেন—বালিশ ব্যবহার না করলে পণ্ডিত বড় দুঃখিত হবেন।

প্রভু বললেন এক খানা খাট নিয়ে আসুন। আমায় জগদানন্দ বিষয় ভোগ করাতে চায়। আমি সন্ন্যাসী। ভূমিতে শয়ন আমার ধর্ম্ম। খাট বালিশ আর মুণ্ডিত মস্তক এ সব দেখলে লোকে পরিহাস করবে।

পরিশেষে নখ দ্বারা শুষ্ক কলা পাতা চিরে শ্রীস্বরূপদামোদর প্রভু এক বস্ত্র মধ্যে পুরে শয্যা তৈরী করে দিলেন। অনেক অনুনয় বিনয় করার পর প্রভু তা ব্যবহার করতে লাগলেন। মহাপ্রভুর বৈরাগ্য দেখে জগদানন্দ পণ্ডিত বড় দুঃখিত হলেন।

অনেক দিন থেকে শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতের বৃন্দাবন ধামে যাবার ইচ্ছা। মহাপ্রভু অনুমতি দেন না বলে যেতে পারেন না। পুনঃ অনুমতি চাইলেন। এবার প্রভু বাধা দিলেন না। বললেন আমার উপর রাগ করে মথুরা যাচ্ছ না কি? আমাকে দোষী করে তুমি ভিখারী সাজবে?

শ্রীজগদানন্দ বললেন। তোমাকে দোষী করব কেন? অনেক দিনের বাসনা মথুরা ধাম দর্শন করব। তোমার আজ্ঞা পাই না বলে যেতে পারি নাই।

প্রভু বললেন তোমার যখন একান্ত ইচ্ছা তুমি যাও। মথুরা যাবার সময় পথে বড় সাবধানে যেয়ো। বারাণসী পর্য্যন্ত পথে কোন ভয় নাই; তারপর যাত্রিগণের সঙ্গে সঙ্গে যেয়ো। রাস্তায় গৌড় দেশের যাত্রী দেখলে বাটপাড়েরা বড় উৎপাত করে। সঙ্গে বহু লোক থাকলে কিছু করতে পারে না। শ্রীমথুরা ধামে পৌঁছিয়ে শ্রীসনাতনের সঙ্গে থাকবে। মথুরাবাসী ভক্তদের চরণ বন্দনা করবে। তাঁদের আচরণ দেখবে না। তাঁদের ব্যবহার হয়ত তোমার পছন্দ হবে না। সনাতনকে সঙ্গে নিয়ে বন ভ্রমণ করবে। সনাতনের সঙ্গ ছাড়বে না। সেখানে বেশী দিন থেকো না। গোবর্দ্ধনে উঠে গোপাল দর্শন করবে না। গোপাল ও গোবর্দ্ধন অভিন্ন। আমি শীঘ্রই আসছি সনাতন ও রূপকে বলবে। এই সব বলে মহাপ্রভু জগদানন্দ পণ্ডিতকে আলিঙ্গন করলেন। পণ্ডিত প্রভুর শ্রীচরণ বন্দনা করলেন। ভক্তগণের নিকট বিদায় নিলেন। অনন্তর শ্রীমথুরার দিকে যাত্রা করলেন। ক্রমে বারাণসী এলেন। চন্দ্রশেখর, তপন মিশ্র ও অন্যান্য ভক্তের সঙ্গে মিলিত হলেন। পণ্ডিত সকলের নিকট প্রভুর সমাচার প্রদান করলেন। ভক্তগণ পণ্ডিতের মুখে প্রভুর সমাচার পেয়ে অতি হর্ষিত হলেন। কয়েক দিন পণ্ডিত বারাণসীতে থাকার পর তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন এবং মথুরার দিকে চলতে লাগলেন। ক্রমে শ্রীমথুরা ধামে এলেন। মথুরায় শ্রীবিশ্রাম ঘাটে লোক মুখে শ্রীসনাতন গোস্বামীর বাস স্থানের ঠিকানা জানতে পারলেন এবং শীঘ্র তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী জগদানন্দ পণ্ডিতকে দেখে আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন। তৎক্ষণাৎ উভয়ে উভয়কে দণ্ডবৎ প্রণাম এবং দৃঢ় আলিঙ্গন করলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী পণ্ডিতের ভোজন প্রভৃতির ব্যবস্থা করে দিলেন। তারপর মহাপ্রভুর কথা শুনতে বসলেন। সেখানে ক্রমে অন্যান্য বৈষ্ণবগণ সমবেত হলেন। সকলে শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতকে দেখে অতি সুখী হলেন। পণ্ডিত প্রভুর নির্দ্দেশ মত শ্রীসনাতন গোস্বামীর নিকট অবস্থান করতে লাগলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীলোকনাথ গোস্বামী, শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী প্রভৃতি ভক্তগণ সকলে শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতের সঙ্গে মিলিত হলেন। প্রভুর প্রিয়তম জনকে পেয়ে তাঁরা যেন সুখ সাগরে ভাসতে লাগলেন। পণ্ডিত সকলের নিকট প্রভুর শুভ সমাচার বার্ত্তা বলতে লাগলেন।

শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতকে নিয়ে দ্বাদশ বন ভ্রমণ করলেন। গোকুলে এসে

কিছু দিন সুখে দুজন অবস্থান করতে লাগলেন। দুজনে কৃষ্ণ-কথা বলতে বলতে এত তন্ময় হতেন যে তাঁদের দিন-রাত্রি জ্ঞান থাকত না। শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত স্ব-হস্তে রন্ধন করে খেতেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী দেবালয়ে প্রসাদ নিতেন।

এক দিন জগদানন্দ পণ্ডিত শ্রীসনাতন গোস্বামীকে ভোজনের জন্য আমন্ত্রণ করলেন। পণ্ডিত আনন্দের সাথে রন্ধন করতে লাগলেন। এমন সময় শ্রীসনাতন গোস্বামী পণ্ডিতের স্থানে এলেন। এক খানা গেরুয়া বস্ত্র শ্রীসনাতন গোস্বামীর মস্তকে বাঁধা ছিল। বস্ত্রখানি মহাপ্রভুর মনে করে জগদানন্দ পণ্ডিতের মনে খুব আনন্দ হল। শ্রীসনাতন গোস্বামীকে সমাদর করে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন এই রাতুল বস্ত্রখানি কোথায় পেলেন?

শ্রীসনাতন গোস্বামী বললেন—মুকুন্দ সরস্বতী নামে এক সন্ন্যাসী এই বস্ত্রখানি আমাকে দিয়েছেন। এই বস্ত্রখানি প্রভুর নয়। যখন শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত এ কথা শুনলেন তখন ক্রোধে অন্নের হাঁড়ি নিয়ে তাঁকে মারতে এলেন। ''ভাতের হাণ্ডি হাতে লঞা মারিতে আইলা।'' শ্রীসনাতন গোস্বামী লজ্জিত হলেন। পণ্ডিতের গৌরাঙ্গ নিষ্ঠা দেখে চমৎকৃত হলেন। তখন উঠে অতি বিনীতভাবে পণ্ডিতকে বলতে লাগলেন—

সনাতন কহে সাধু পণ্ডিত মহাশয়।
তোমা সম চৈতন্যের প্রিয় কেহ নয়।।
যাহা দেখিবারে বস্ত্র মস্তকে বান্ধিলুঁ।
সেই অপূর্ব্ব প্রেম এই প্রত্যক্ষ দেখিলুঁ।।

চৈঃ চঃ

যা দেখতে চেয়েছিলাম তা দেখলাম। মহাশয় আপনি যদি এবম্বিধ শ্রীচৈতন্য-নিষ্ঠা না দেখান আমরা শিখব কেমনে? এই বস্ত্রখানি কোন প্রবাসীকে দিয়ে দিব। রক্ত-বস্ত্র বৈষ্ণবের পরতে নাই।

শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত শেষে লজ্জিত হলেন। রান্না শেষ করে মহাপ্রভুকে ভোগ দিলেন। তারপর দুজন কৃষ্ণ-কথা বলতে বলতে ভোজন করতে লাগলেন। দুজন মহাপ্রেমিক। কৃষ্ণকথায় দুজনার প্রেম উথলে উঠতে লাগল।

দুই মাস শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত বৃন্দাবনে বাস করলেন। তারপর গোস্বামিবৃন্দের থেকে বিদায় নিয়ে পণ্ডিত পুরীর দিকে চলতে উদ্যত হলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী মহাপ্রভুর ও ভক্তগণের জন্য কিছু রাসস্থলীর ধূলি ও প্রসাদ তথা বৃন্দাবনীয় পীলু ফলাদি ভেট দিলেন। খুব যত্ন-সহকারে পণ্ডিত তা নিয়ে যাত্রা করলেন। যে পথে বারাণসী হয়ে মথুরায় গিয়েছিলেন, তিনি সেই পথে পুরীধামে ফিরে এলেন।

অতঃপর মহাপ্রভুর শ্রীচরণ বন্দনা করলেন এবং গোস্বামিগণের দেওয়া ভেট প্রদান করলেন।

মহাপ্রভু শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতকে দৃঢ় আলিঙ্গন করলেন। পণ্ডিত বৃন্দাবনীয় ভক্তগণের দণ্ডবৎ মহাপ্রভুর শ্রীচরণে জানালেন। শ্রীরাসস্থলীর ধূলি প্রভু স্বয়ং রেখে প্রসাদ ও পীলু ফল ভক্তগণকে বেটে দিলেন। পীলু ফল যাঁরা চিবিয়ে খেলেন তাঁদের মুখে ঝাল লাগল। দেখে প্রভু হাসতে লাগলেন। বললেন—''বৃন্দাবনের পীলু খাবার এই এক মজা।''

প্রভু ক্রমে ক্রমে বৃন্দাবনের গোস্বামিদের যাবতীয় বার্ত্তা শুনতে লাগলেন।

প্রভুর যেমন অনন্ত লীলা বিলাস তেমন তাঁর ভক্তগণেরও অনন্ত চরিত।

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য পুরী থেকে শান্তিপুরে ফিরে আসেন। কিছুদিন পরে মহাপ্রভু কর্ত্তৃক প্রেরিত শ্রীজগদানন্দের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। জগদানন্দকে পেয়ে অদ্বৈত আচার্য্য পরম আনন্দিত হলেন। জগদানন্দ নদীয়া থেকে নীলাচলে ফেরার

সময় অদ্বৈত আচার্য্যের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলে, অদ্বৈত আচার্য্য একখানি প্রহেলিকা বচন (চিঠি) মহাপ্রভুর নিকট প্রেরণ করলেন। সেই তর্জ্জা-প্রহেলীর অর্থ মহাপ্রভু ছাড়া কেউ বুঝতে পারেনি। তর্জ্জা প্রহেলী—

‘প্রভুরে কহিহ আমার কোটি নমস্কার।
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার।।
বাউলকে কহিহ-লোক হইল বাউল।
বাউলকে কহিহ হাটে না বিকায় চাউল।।
বাউলকে কহিহ কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিহ ইহা কহিয়াছে বাউল।।’

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৯/১৯-২১

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তরজার (চিঠির) তাৎপর্য অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে লিখেছেন—‘‘মহাপ্রভুকে কহিও যে, লোক প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছে। আর প্রেমের হাটে প্রেমরূপ চাউল বিক্রয়ের স্থান নাই। মহাপ্রভুকে কহিও যে, আউল অর্থাৎ প্রেমোন্মত্ত বাঞ্ছ উল আর সাংসারিক কার্য্যে নাই। মহাপ্রভুকে কহিও যে, প্রেমোন্মত্ত হইয়াই অদ্বৈত একথা কহিয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, প্রভুর আবির্ভাব হইবার যে তাৎপর্য্য ছিল, তাহা সম্পূর্ণ হইল। এখন প্রভুর যাহা ইচ্ছা, তাহাই হউক।’’

**।। জয় শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত কি জয়।।**

# শ্রীনন্দন আচার্য্য

শ্রীনন্দন আচার্য্য ভবনকে বলা হয় গৌর নিত্যানন্দের মিলন স্থান। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্য ভাগবতের বর্ণনা অনুযায়ী জানা যায় শ্রীনন্দন আচার্য্যের পিতা শ্রীচতুর্ভুজ পণ্ডিত এবং তারা তিন ভাই বিষ্ণুদাস, নন্দন ও গঙ্গাদাস।

'চতুর্ভূজ পণ্ডিত নন্দন গঙ্গাদাস।
পূর্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বিলাস।।

চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫/৭৪

'বিষ্ণুদাস, নন্দন, গঙ্গাদাস তিনভাই।
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে ছিল ঠাকুর নিতাই।।

চৈঃ চঃ আদি ১১/৪৩

ইনারা নবদ্বীপবাসী ভট্টাচার্য্য ছিলেন। বিষ্ণুদাস ও গঙ্গাদাস নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন।

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে শ্রীনন্দন আচার্য্যের পিতৃপরিচয় ও বংশপরিচয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। তাতে লেখা আছে ''শ্রীনন্দন আচার্য্য গ্রহবিপ্র, পিতার নাম শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ। লক্ষ্মীনারায়ণের দুই পুত্র—শ্রীনন্দন ও শ্রীভগবান্ অধিকারী সার্ব্বভৌম। নারায়ণ পণ্ডিত জ্যোতিষ শাস্ত্রে অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি মহাপ্রভুর জন্মলীলা দর্শন করেছিলেন। শ্রীনন্দন আচার্য্য চৈতন্য শাখার অন্তর্গত। তিনি খঞ্জ ছিলেন। মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের পর পুরীতে ফিরে এলে ভক্তগণ আনন্দিত হয়েছিলেন। নন্দন আচার্য্য খোঁড়া হলেও উৎফুল্ল হয়ে সবার আগে মহাপ্রভুর পূজা করেছিলেন।

'নন্দন আচার্য্য আসে গাঢ় অনুরাগে।
খোঁড়া বটে তবুও আসে সকলের আগে।।'

শ্রীনন্দন আচার্য্যের পূর্ব্ব পুরুষ শাকদ্বীপী পরাশরাত্মজ শান্তিমুনি বংশোদ্ভব, বাৎস্যগোত্র রাঢ়ীয় ভরত শাখার বংশ। তিনি তারকেশ্বরের নিকট বহির্খণ্ড গ্রামে কিছুদিন বাস করার পর নবদ্বীপের শ্রীহট্টিয়া বা দক্ষিণ পাড়ায় এসে গৃহ নির্মান করেছিলেন।"

নিত্যানন্দ প্রভু গৃহ ছেড়ে অত্যন্ত বিরহ ব্যাকুল হৃদয়ে অবধূত বেশে বিভিন্ন তীর্থে ভ্রমণ করতে করতে এক সময় বৃন্দাবনে পৌঁছালে জানতে পারেন, শ্রীকৃষ্ণ নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরে গৌরহরি রূপে প্রকাশিত হয়েছেন। তাই তিনি মায়াপুরে এসে নন্দন আচার্য্যের গৃহে গোপনে অবস্থান করতে লাগলেন।

এক দিন মহাপ্রভু তাড়াতাড়ি বিষ্ণুপূজা সমাপ্ত করে বৈষ্ণবগণের স্থানে এসে বললেন আজ আমি এক অপরূপ স্বপ্ন দেখেছি।

তাল-ধ্বজ এক রথ-সংসারের সার।
আসিয়া রহিল রথ আমার দুয়ার।।

প্রভু স্বপ্নের কথা বর্ণন করছেন। শ্রীবলদেব প্রভু তালধ্বজ রথে চড়ে দ্বারে এলেন। ঐ তালধ্বজ রথ সংসারের অসারতা হতে গমনশীল হয়ে সার প্রদানে নিযুক্ত। তাঁকে পেলে সংসার যাতনা দূর হবে। তাঁর প্রকাণ্ড শরীর, পরিধানে নীলবস্ত্র, বাম কর্ণে কুণ্ডল। তাঁকে দেখে আমি বুঝলাম তিনি বলরাম। তিনি আমাকে প্রায় ১০-২০ বার জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই বাড়ি কি নিমাই পণ্ডিতের'? তিনি হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। কারণ এতদিন বৃন্দাবনে ছিলেন। সেখান থেকে হিন্দি শিখে এসে স্থানীয় লোকজনকে জিজ্ঞাসা করছেন—






এ মোকাম নিমাই পণ্ডিতকা হ্যা ক্যা?

আমি সম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করলাম আপনি কে? তিনি উত্তরে বললেন–

ম্যা তেরা ভাই হু!

আগামীকাল আমাদের পরস্পর পরিচয় হবে, তাঁর, কথা শুনে আমার আনন্দ আর ধরে না। মনে হয় আমিই যেন তিনি। এরূপে বর্ণন করতে করতে মহাপ্রভু 'মদ আন' 'মদ আন' বলে চিৎকার করতে লাগলেন। শুনে যেন সকলের কর্ণ বিদির্ণ হল।

শ্রীবাস বলছেন–শুন গোসাঞি, তুমি পান করবার জন্য যে মদ প্রার্থনা করছ, তা অন্যত্র কোথাও পাওয়া যাবে না। তার একমাত্র মালিক তুমি, তুমি যাকে কৃপা করে তা প্রদান কর তিনিই তা পায়, তাছাড়া কেউ পায় না।

এভাবে তর্জা গর্জা করে প্রভু শান্ত হয়ে বললেন আমার মনে হয় নবদ্বীপে কোন মহাপুরুষ এসেছে। নইলে অমন স্বপ্ন দেখব কেন? যাও শ্রীবাস-হরিদাস খুঁজে দেখ কোথাও কোন মহাপুরুষের সন্ধান পাও কিনা? প্রভুর আদেশে দুই ভাগবত মহানন্দে সর্ব নবদ্বীপ তন্নতন্ন করে ৩ প্রহর কাটালেন। কিন্তু কোন সন্ধান পেলেন না। অবশেষে বিফল মনোরথে প্রভুকে এসে বললেন–কি বৈষ্ণব, কি সন্ন্যাসী, গৃহস্থ-পাষণ্ডী সর্ব নবদ্বীপ খুঁজেও পেলাম না কোন মহাপুরুষের সন্ধান। দুজনের কথা শুনে প্রভু হাসলেন। তিনি যেন বুঝিয়ে দিলেন নিত্যানন্দ অনেক গূঢ় বস্তু। অর্থাৎ গৌরচন্দ্র কৃপাছাড়া সৎগুরু রূপী নিত্যানন্দ পাওয়া যায় না।

বড় গুঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে।<br>
চৈতন্য দেখায় যারে সে দেখিতে পারে।।

তাইতো শ্রীবাস- হরিদাসও তাঁর দেখা পেল না। এবার প্রভু বললেন-- চল আমার সাথে তোমাদের নিত্যানন্দ দর্শন করাব, গৌর আগে যাচ্ছেন আর সমস্ত ভক্তগণ জয় শ্রীকৃষ্ণ বলে পেছনে ধাবিত হচ্ছেন। প্রভু সোজা গিয়ে নন্দনাচার্য্যের গৃহে উঠলেন। দেখেন, কোটি সূর্য সম এক মহাপুরুষ বসে আছেন। তিনি ধ্যানসুখে মগ্ন, ভক্তিযোগে তুষ্ট। তাই প্রভু নিত্যানন্দের নিকট গণসহ মাথানত করলেন। এভাবে গৌরনিত্যানন্দের মিলন হল।

একদিন মহাপ্রভু ঈশ্বর আবেশে রামাইকে বললেন যাও রামাই অদ্বৈত গৃহে। তাকে বল যার জন্য বিস্তর ক্রন্দন, আরাধনা, উপবাস করেছ তিনি আজ প্রকাশিত হয়েছেন।

ভক্তিযোগ বিলাইতে তাঁর আগমন।<br>
আপনে আসিয়া ঝাট কর বিবর্তন।।

তিনি যেন আমার পূজার সমস্ত উপকরণ নিয়ে স্ত্রীসহ শীঘ্রই উপস্থিত হন। শ্রীবাস অনুজ রামাই প্রভু আজ্ঞা শিরে ধারণ করে ছুটলেন অদ্বৈত গৃহে। তিনি আনন্দে বিহ্বল হওয়ায় কোন পথে যাচ্ছেন নিজেও জানেন না। কিন্তু প্রভুর কৃপায় অদ্বৈত গৃহে উপস্থিত। আচার্য্যকে নমস্কার করলেন কিন্তু কিছুই বলতে পারছেন না, কারণ তার প্রেমানন্দে পূর্ণিত কলেবর। অদ্বৈত আচার্য্য ভক্তিযোগ প্রভাবে সর্বজ্ঞ। রামাইকে দেখেই হেসে বললেন বোধ হয় আমাকে নেওয়ার জন্য প্রভুর আজ্ঞা হয়েছে। রামাই বললেন তাহলে সকল জেনে এখানে আছ কেন? তাড়াতাড়ি চল। অদ্বৈতের লীলা সাধারণের অবোধ্য। তিনি ভগবৎ সেবানন্দে এত বেশী মগ্ন যে তাঁর দেহ কোথায় আছে নিজেও জানে না।

মোর ভক্তি, বৈরাগ্য, অধ্যাত্ম-জ্ঞান মোর।<br>
সকল জানে শ্রীনিবাস ভাই তোর।।

রামাই অদ্বৈতের চরিত্র ভাল করেই জানে, তাই কোন উত্তর না করে মনে মনে হাসছেন।

এইমত অদ্বৈতের চরিত্র অগাধ।<br>
সুকৃতির ভাল দুস্কৃতির কার্যবাধ।।

অর্থাৎ যারা সুকৃতিবান জীব তারাই জানেন অদ্বৈতকে। অদ্বৈত প্রভু শিব। তিনি সুকৃতি। জীবের হৃদয়ে অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তের হৃদয়ে প্রকাশিত হন। আর যারা দুস্কৃতি- কৃষ্ণভজন করে না তারা অদ্বৈতকে জানতে পারে না।

অদ্বৈত পুনঃ রামাইকে জিজ্ঞাস করলেন কিহেতু আগমন তব? রামাই বুঝলেন অদ্বৈত শান্ত হয়েছেন। তাই বলতে আরম্ভ করলেন—

যাঁর লাগি করিয়াছ বিস্তর ক্রন্দন।
যাঁর লাগি করিলা বিস্তর আরাধন।।
যাঁর লাগি করিলা বিস্তর উপবাস।
সে প্রভু তোমার আসি হইলা প্রকাশ।।
ভক্তিযোগ বিলাইতে তাঁর আগমন।
তোমারে সে আজ্ঞা করিবারে বিবর্তন।।
ষড়ঙ্গ পূজার বিধি-যোগ্য সজ্জ লঞা।
প্রভুর আজ্ঞায় চল সস্ত্রীক হইয়া।।

এখানে ষড়ঙ্গ বলতে-জল, আসন, বস্ত্র, দীপ, অন্ন ও তাম্বুল অর্চনমার্গীয় ষড়ঙ্গ। গোময়, গোমূত্র, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত ও গোরোচনা মাঙ্গলিক ষড়ঙ্গ। প্রণিপাত, স্তুতি, সর্ব কর্মার্পণ, পরিচর্যা, চরণ স্মরণ ও কথা শ্রবণ ভজন মার্গীয় ষড়ঙ্গ।

রামাই আরো বললেন শুধু প্রভু একা নন; প্রভুর দ্বিতীয় দেহ, তোমার প্রাণস্বরূপ নিত্যানন্দও সেখানে উপস্থিত রয়েছেন। তুমি শীঘ্র চল। একথা শুনে অদ্বৈত দু'বাহু তুলে ক্রন্দন আরম্ভ করলেন। তিনি প্রেমানন্দে মুর্চ্ছিত হলে সকলে বিস্মিত হলেন। কিছুক্ষণ পর বাহ্য পেয়ে হুঙ্কার করতে লাগলেন। আনিলু, আনিলু বলে—

মোর লাগি, প্রভু আইলা বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া।
এত বলি কান্দে পুনঃ ভুমিতে পড়িয়া।।

প্রভুর প্রকাশ শুনে অদ্বৈত পত্নী পতিব্রতা জগন্মাতা সীতা ঠাকুরাণী ক্রন্দন আরম্ভ করলেন, অদ্বৈত পুত্র অচ্যুতানন্দও অবিরাম ক্রন্দন করছেন। অদ্বৈতের যত অনুচর সকলে ক্রন্দন আরম্ভ করলেন। কৃষ্ণপ্রেমময় ক্রন্দনে অদ্বৈত গৃহ কৃষ্ণপ্রেমময় হয়ে গেল। অদ্বৈত স্থির হতে চাচ্ছেন কিন্তু পারছেন না শেষে আবারো—

রামাইরে বলে প্রভু কি বলিলা মোরে?
রামাই বলে ঝাটি চলিবার তরে।।

অদ্বৈত আবার রামাইকে তার লালসার কথা জানাচ্ছেন, রামাই আমার প্রভু যদি আমার মস্তকে পা রেখে তার সমস্ত ঐশ্বর্য্য আমাকে দেখান তবেই বুঝব তিনি আমার প্রাণনাথ। এ আমি সত্যি করে বলছি। রামাই বললেন আমি আর কি বলব। যদি ভাগ্য হয় তবে এ লীলা দর্শন করব। আর তোমার যে ইচ্ছা প্রভুরও তা। তাইতো তিনি তোমার ইচ্ছাতে অবতীর্ণ হয়েছেন। রামাইর কথায় তুষ্ট হয়ে অদ্বৈত প্রভু মহাপ্রভুর সমীপে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলেন। পত্নীকে বললেন পূজার সমস্ত সজ্জ নিয়ে তাড়াতাড়ি চল, পতিব্রতা সীতা চৈতন্যের সমস্ত তত্ত্ব জানেন। তিনিও এদিনটির অপেক্ষায় ছিলেন। পতি আজ্ঞা পেয়ে গন্ধ, মালা, ধূপ, বস্ত্র, ক্ষীর, দধি, স্বর, ননী, তাম্বুল যত সম্ভব নিয়ে চললেন পতিসাথে মহাপ্রভুর সমীপে।

অদ্বৈত এবার এক অভিনব লীলা করলেন, তিনি রামাইকে বললেন আমি প্রভুর নিকট আসছি একথা বলবে না। আমি নন্দন আচার্য্য গৃহে লুকিয়ে থাকছি। তুমি গিয়ে বলবে আচার্য্য এল না।

এদিকে প্রভু হুঙ্কার করে বিষ্ণু খট্টায় উঠলেন। আর বলতে লাগলেন নাড়া আমার অন্তর্যামিত্ব পরীক্ষা করতে চায়। আমি তার চালাকি বুঝতে পারি কি না এ বিষয়ে তার সন্দেহ আছে। অথবা আমাকে বহির্জগতে বিস্তার করবার জন্য কপটতা বিস্তার। তাকে দেখাচ্ছি! প্রভুর ইঙ্গিত বুঝে নিত্যানন্দ ছত্র

ধরলেন, গদাধর তাম্বুল দিচ্ছেন। কেউ স্তুতি করতে লাগলেন। এমন সময় রামাই এলেন। রামাই কিছু না বলতেই প্রভু বলে ফেললেন, আমাকে পরীক্ষা করার জন্য নাড়া তোমাকে পাঠলো তাই না? ও নন্দন আচার্য্য গৃহে রয়েছে, যাও শীঘ্রই তাকে নিয়ে আস। রামাই আনন্দে নন্দন আচার্য্য গৃহে এসে অদ্বৈতকে সব বললেন। শুনে অদ্বৈত আনন্দ সাগড়ে ভাসতে ভাসতে ছুটে এলেন শ্রীবাস গৃহে। সস্ত্রীক দূর হতে স্তুতি করতে করতে সামনে এগোতে লাগলেন--

পাইয়া নির্ভয় পদ আইলা সম্মুখে।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে অপরূপ বেশ দেখে।।

মহাপ্রভুর কোটি কন্দর্প সুন্দর লাবণ্যমণ্ডিত জ্যাতির্ময় কলেবর, প্রসন্ন বদন। যেন অদ্বৈতের প্রতি সদয় হয়ে আছেন, প্রভুর দু'বাহু স্বর্ণস্তম্ভের ন্যায়। সেই ভুজদ্বয়ে দিব্য অলঙ্কার সমূহ স্বর্ণস্তম্ভে খচিত মনিগণের ন্যায় শোভা পাচ্ছিল। তাঁর বক্ষদেশে শ্রীবৎস ও কৌস্তুভমণি বিরাজিত, কর্ণে মকর কুণ্ডল, গলদেশে বৈজয়ন্তী মালা, কোটি সূর্যসমতেজ তাঁর শরীর থেকে নির্গত হচ্ছে, লক্ষ্মী পাদপদ্মে, অনন্তদেব ছত্র ধরেছেন। তাঁর নখগুলো মণির মত মনে হচ্ছিল। তিনি ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম হয়ে বাঁশি বাঁজাচ্ছেন। ব্রহ্মা শিব ষড়মুখ কার্তিকেয় প্রভুর চরণে পড়ে আছে। নারদ-শুকদেব মহাভয়ে স্তুতি করছেন। গঙ্গার ন্যায় এক অপূর্ব নারী মকর লাঞ্ছিত রথে দণ্ডবৎ প্রণতি বিধান করছেন। অনন্তদেব স্তুতি করছেন। এসব দেখে অদ্বৈত সম্ভ্রমে দণ্ডবৎ প্রণাম সেড়ে উঠলেন। দেখেন শত ফণাধর মহানাগগণ উর্ধ্ববাহু করে স্তুতি করছেন। অন্তরীক্ষে দেখেন গজ হংস, অশ্ব প্রভৃতি দেবগণের বাহন সমূহে পথ বন্ধ। কোটি কোটি নাগবধুগণ সজল নয়নে কৃষ্ণস্তুতি করছেন। যেন কালীয় পত্নীগণ আবার এসেছেন। দেখেন ঋষিগণও স্তুতি করছেন। আকাশ পথ সড়ক পথ সব বন্ধ হয়ে গেছে। শ্রীগৌর সুন্দরের এ হেন মহা ঐশ্বর্য্য দর্শনে সপত্নীক অদ্বৈত আচার্য্য নির্বাক ও স্তব্ধ প্রায় হলেন। অদ্বৈতের এ হেন অবস্থা দেখে পরম দয়ালু গৌরহরি অদ্বৈতের প্রতি সদয় হয়ে বলতে লাগলেন, ''অদ্বৈত আমি ক্ষীর সাগরে শয়ন করেছিলাম, তোমার হুঙ্কারে আমার নিদ্রাভঙ্গ হয়। তোমার সংকল্প এবং বিস্তর আরাধনাতে তুষ্ট হয়েই আমি জীব উদ্ধার নিমিত্ত অবতরণ করেছি। কারণ জীবের দুঃখ আমি সইতে পারি না। আর তুমিও আমাকে জীব উদ্ধার নিমিত্ত অবতরণ করালে, এই যে এতক্ষণ আমার চতুর্দিকে যা দেখলে এরা সবাই আমার নিজ জন। তোমার কারণেই এরা আমার আদেশে বিভিন্ন স্থানে বৈষ্ণব রূপে জন্ম নিয়েছে।" তাই--

যে বৈষ্ণব দেখিতে ব্রহ্মাদি ভাবে মনে।
তোমা হৈতে তাহা দেখিবেক সর্বজনে।।

প্রভুর এহেন বাক্য শুনে অদ্বৈত ক্রন্দন আরম্ভ করলেন এবং বাহু তুলে বলতে লাগলেন, আজ আমার সফল দিন। আজ আমার অভিলাষ সফল, কারণ সাক্ষাৎ তোমার চরণ যুগল দর্শন করলাম।

ঘোষে মাত্র চারিবেদে, যারে নাহি দেখে।
হেন তুমি মোর লাগি হইলা পরতেকে।।

চারিবেদ যাঁর দর্শন না পেয়ে শুধুমাত্র বাক্য দ্বারা বর্ণন করে, সেই বস্তু আমি আজ স্বচক্ষে দর্শন করলাম। প্রভু এ আমার শক্তি নয় সব তোমার করুণা। তুমি ছাড়া জীব উদ্ধারের আর কেউ নেই। অদ্বৈত এসব বলছেন আর প্রেমে ভাসছেন। মহাপ্রভু বললেন অদ্বৈত আমার পূজার কার্য কর। প্রভুর আজ্ঞা পেয়ে অদ্বৈত পরম আনন্দে প্রভুর চরণ পূজা করতে লাগলেন, প্রথমে সুবাসিত জলে চরণ ধৌত করলেন, পরে গন্ধ মিশ্রিত জল পাদপদ্মে ঢেলে দিলেন। তুলসী মঞ্জরীর সহিত চন্দন এবং

অর্ঘ চরণে নিবেদন করলেন। গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ পঞ্চ উপাচারে চোখের জলে বক্ষ ভাসিয়ে পূজা করতে লাগলেন। পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়ে পুনঃ বন্দনা করলেন। এভাবে ষোড়শ উপাচারে পূজা শেষ করে ভগবানকে বস্ত্র এবং মাল্য প্রদান করলেন। ষোড়শ উপাচার হচ্ছে– আসন, স্বাগত, অর্ঘ্য, পাদ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, আচমন, স্নান, বসন, আভরণ, সুগন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও বন্দনা। শেষে প্রণাম করলেন–

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।

বিষ্ণুপুরাণ ১/১৯/৬৫

হে ব্রহ্মণ্যদেব গো-ব্রাহ্মণ হিতকারীন্ আপনাকে নমস্কার, হে কৃষ্ণ, হে গোবিন্দ আপনাকে পুনঃ পুনঃনমস্কার।

পূজা শেষে অদ্বৈত এবার মহাপ্রভুর স্তুতি শুরু করলেন। হে সর্বপ্রাণনাথ গৌরসুন্দর! হে বিশ্বম্ভর! হে করুণাসাগর! তোমার জয় হউক।

জয় জয় ভক্তবচন-সত্য কারী।
জয় জয় মহাপ্রভু মহা অবতারী।।
জয় জয় হরে কৃষ্ণ মন্ত্রের প্রকাশ।
জয় জয় নিজ ভক্তি গ্রহণ বিলাস।।

হে প্রভু তুমি স্বয়ং মহামন্ত্র। কলিযুগের একমাত্র সাধ্যবস্তু এই মহামন্ত্র। এই মন্ত্র হতে তুমি অভিন্ন। তুমি স্বয়ং কৃষ্ণ হয়েও নিজভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য নিজেই ভগবদ্ভক্তি গ্রহণ বা আচরণের বিলাস বা লীলা করছ। তোমার ভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য তুমি স্বয়ং ভক্তভাব অঙ্গিকার করে ভক্তরূপে লীলা করছ; তোমার জয় হোক। হে প্রভু তুমিই অনন্ত, এবং সর্বজীবের শরণ। হে প্রভু তুমি স্বয়ং অবতারী সনাতন পুরুষ। মৎস, কুর্ম, বরাহ, বামন তোমার অংশ। যুগে যুগে অবতার রূপ পরিগ্রহ করে তুমি বেদ রক্ষা কর। তুমিই সীতাপতি রাম--যে রাক্ষসকুল ধ্বংস করেছিলে। তুমি গুহক বরদাতা, চণ্ডালকুল থেকে আবির্ভূত গুহককে যিনি বর দান করেছিলেন। তুমি অহল্যার শাপ মোচনকারী, তুমি নরসিংহ রূপ ধারণ করে প্রহ্লাদকে রক্ষা করেছিলে--হিরণ্যক শিপুকে বধ করেছিলে। তুমিই নীলাচলে জগন্নাথ রূপে বিরাজ করছ। তোমাকে চারিবেদ সর্বক্ষণ অন্বেষণ করে কিন্তু কোন রূপেরই সন্ধান বেদ পায় না অথচ তুমি নবদ্বীপে এসে লুকিয়ে রয়েছ। তুমি লুকানোর ক্ষেত্রে মহাবীর কিন্তু ভক্তগণ তোমাকে খুঁজে বের করে।।

সংকীর্তন আরম্ভে তোমার অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তোমা বই নাহি আর।।

হে প্রভু! তোমার দুই চরণ কমলের জন্য শিব-পার্বতী বিহ্বল হয়ে থাকে। লক্ষ্মী দেবী একমনে ঐ চরণ সেবা করে, অনন্তদেব ঐ চরণের যশকীর্তন করে। ঐ চরণ একবার সত্যলোক আক্রমণ করেছিল, যে আক্রমণে বলি মহারাজ ধন্য হয়েছিলেন। ঐ চরণ হতে গঙ্গার উৎপত্তি।

এভাবে কোটি বৃহঃস্পতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অদ্বৈত মহাশয় প্রভুর চরণকমলে স্তুতি করছেন এবং নয়ন জলে বুক ভাসাচ্ছেন।

সর্বভূত অন্তর্যামী শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
চরণ তুলিয়া দিলা অদ্বৈত মাথায়।।

মহাপ্রভু অন্তর্যামি। তিনি অদ্বৈতের স্তুতিতেই বুঝেছেন সে চরণ চাইছে। তাই মহাপ্রভু অদ্বৈতের মাথায় চরণ তুলে দিলেন। অমনি মহাজয় জয় ধ্বনি হল। ভক্তগণ অবাক হলেন। অদ্বৈত বৃদ্ধ লোক। তার মস্তকে প্রভু চরণ দিলেন আর অদ্বৈত বিজ্ঞ হয়েও তাঁর চরণে লুটাচ্ছেন। নিমাই নিশ্চই ভগবান।

কিছুদিন পরে মহাপ্রভু পাষণ্ডগণের পাষণ্ডত্ব নাশের জন্য কীর্ত্তন শুরু করলেন। একদিন তিনি

কীর্ত্তনে আনন্দ পাচ্ছেন না বললেন। প্রেমোন্মত্ত অদ্বৈত প্রভু বললেন, মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে প্রেমের ভাণ্ডারী করেছেন, আমাকে ও শ্রীবাসকে প্রেম থেকে বঞ্চিত করেছেন কিন্তু তিনি মালী তেলীকেও পর্য্যন্ত প্রেম দিয়েছেন। এজন্য আমি মহাপ্রভুর সমস্ত প্রেম শোষণ করেছি, একথা শুনে মহাপ্রভু ভাবলেন, ‘‘যেহেতু অদ্বৈত আচার্য্য সমস্ত প্রেম শোষণ করেছে, তাহলে প্রেমশূন্য নিস্ফল শরীর ত্যাগ করাই ভাল,’’ এই বলে তিনি গঙ্গায় ঝাঁপ দিলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এবং হরিদাস ঠাকুর মহাপ্রভুকে গঙ্গা থেকে তুললেন। মহাপ্রভু বললেন, আমি নন্দন আচার্য্যের ঘরে লুকিয়ে থাকব, তোমরা একথা কাউকে বলবে না।

ভক্তগণ মহাপ্রভুকে কোথাও খুঁজে না পেয়ে তীব্র বিরহে ক্রন্দন করতে লাগলেন। নন্দন আচার্য্য মহাপ্রভুকে পেয়ে পরম আনন্দে সেবা করতে লাগলেন। মহাপ্রভু বললেন, নন্দন! আমি যে তোমার এখানে রয়েছি তুমি একথা কাউকে বলো না যেন। শুনে নন্দন আচার্য্য বললেন, প্রভু! আপনি ভক্তের হৃদয়ের ধন, ভক্তগণই আপনাকে প্রকাশ করেন, কি করে আপনি ভক্তগণকে ছেড়ে লুকিয়ে থাকবেন? মহাপ্রভু ভক্তবৎসল। তাই ভক্তগণের বিরহ ব্যাকুল আর্ত্তিতে স্থির থাকতে না পেরে বললেন, যাও নন্দন শ্রীবাসকে ডেকে নিয়ে আস। নন্দন আচার্য্য শ্রীবাসকে আনতে গেলেন। শ্রীবাস এসে বললেন, প্রভু তোমাকে না পেয়ে ভক্তগণ বিরহ সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়েছেন, বিশেষ করে অদ্বৈত আচার্য্য না খেয়ে অচেতন প্রায় হয়ে আছেন। একথা শোনামাত্র মহাপ্রভু অদ্বৈত আচার্য্যের নিকট উপস্থিত হয়ে নিজেকে অপরাধী জ্ঞান করলেন। অদ্বৈত আচার্য্যও নিজের কুমতির জন্য বারম্বার মহাপ্রভুর চরণ ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন।

কাটোয়ায় সন্ন্যাস গ্রহণের পর নিত্যানন্দের ছলনায় মহাপ্রভু শান্তিপুরে অদ্বৈত প্রভুর গৃহে এলে, শচীমাতা ও অন্যান্য যে সমস্ত নবদ্বীপবাসী ভক্তগণ মহাপ্রভুর দর্শনে গিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে নন্দন আচার্য্য অন্যতম ছিলেন।

চাতুর্ম্মাস্যে মহাপ্রভুর সেবার জন্য রাখব পণ্ডিত ঝালি নিয়ে এবং অন্যান্য ভক্তগণ বিভিন্ন দ্রব্য নিয়ে পুরীতে গেলে মহাপ্রভু তাঁদের দ্রব্য ভোজন করতেন। সে সময় নন্দন আচার্যও মহাপ্রভুর জন্য বিভিন্ন দ্রব্য নিয়ে যেতেন এবং মহাপ্রভু তা গ্রহণ করতেন।

পুরীতে যে সমস্ত ভক্তবৃন্দের গৃহে মহাপ্রভু নিমন্ত্রণ স্বীকার করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে শ্রীনন্দন আচার্য্য অন্যতম।

শ্রীনন্দন আচার্য্য শ্রীবাস অঙ্গনে ও কাজী দমনে মহাপ্রভুর কীর্ত্তনসঙ্গী এবং শ্রীধর অঙ্গনে, শ্রীপুরুষোত্তম ধামে শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির মার্জনলীলায়, শ্রীনৃসিংহ মন্দির মার্জনলীলায়, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে স্নান-লীলায়, আইটোটা উপবনে মহাপ্রসাদ ভোজন লীলায় এবং শ্রী রথযাত্রায় মহাপ্রভুর সঙ্গী ছিলেন।

শ্রীনন্দন আচার্য্যের আবির্ভাব ও তিরোভাব তিথি অজ্ঞাত।

বর্তমানে শ্রীনন্দন আচার্য্য ভবনে ১০৮ শ্রীল ভক্তি সারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে মঠ স্থাপন করেছেন।

।। জয় শ্রীনন্দন আচার্য্য কি জয়।।

# শ্রীমুরারী গুপ্ত

শ্রীরামলীলায় যিনি হনুমান, তিনি গৌরলীলায় মুরারীগুপ্তরূপে প্রকটিত হয়েছেন। গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় বর্ণিত হয়েছে—

মুরারিগুপ্তো হনুমানঙ্গদঃ শ্রীপুরন্দরঃ।
যঃ শ্রীসুগ্রীবনামাসীদ্ গোবিন্দানন্দ এব সঃ।।

গৌঃ গঃ দীঃ ৯১

''মুরারি বৈসয়ে গুপ্তে ইঁহার হৃদয়ে।
এতেকে মুরারিগুপ্ত নাম যোগ্য হয়ে।।

চৈঃ ভাঃ মধ্য ১০/৩১

মুরারিগুপ্তের হৃদয়ে ভগবান 'মুরারি' গুপ্তভাবে বাস করেন বলেই তিনি মুরারিগুপ্ত নামে অভিহিত।

মুরারিগুপ্ত শ্রীহট্টে বৈদ্যবংশে (কবিরাজ) জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শ্রীহট্ট বর্তমান বাংলাদেশের একটি জেলা (সিলেট)। তাঁর পিতামাতার নাম অজ্ঞাত। শ্রীহট্ট থেকে এসে তিনি মায়াপুরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহস্থের নিকটে গৃহ নির্মান করেন। তিনি মহাপ্রভুর থেকে বয়সে বড় ছিলেন।

শ্রীমুরারি গুপ্ত, শ্রীকমলাকান্ত, শ্রীকৃষ্ণানন্দ প্রভৃতি মহাপ্রভুর সঙ্গে অধ্যয়ন করতেন। ন্যায়ের ফাঁকিতে শ্রীগৌরসুন্দর সকলকে পরাস্ত করতেন। ব্যাকরণ ও ন্যায়ের ফাঁকি প্রভৃতি নিয়ে তিনি পড়ুয়াদের সঙ্গে খুব তর্ক-বিতর্ক করতেন, কেউ তাঁর সঙ্গে পেরে উঠতেন না। শেষ পর্য্যন্ত মারা-মারি, কাদা ছোড়া-ছুড়ি, ধাক্কা-ধাক্কি প্রভৃতি হ'ত। গঙ্গার ঘাটে এত হুড়াহুড়ি হত যে সমস্ত জল বালু-কাদাময় হয়ে যেত, মহিলারা জল নিতে পারতেন না। ব্রাহ্মণেরা স্নান করতে পারতেন না। এভাবে গঙ্গার ঘাটে শ্রীগৌরসুন্দর জলকেলি করে বেড়াতেন।

তবে হয় মারামারি যে যারে পারে।
কর্দ্দম ফেলিয়া কারো গায়ে কেহ মারে।।
এত হুড়াহুড়ি করে পড়ুয়া সকল।
বালি কাদাময় হয় সব গঙ্গাজল।।

—শ্রীচৈতন্য ভাগবত

কয়েক বছরের মধ্যে শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের পাঠশালায় শ্রীগৌরসুন্দর প্রথম স্থান অধিকার করলেন। তখন তাঁর কাছে ছাত্রবৃন্দের নতি স্বীকার করতে হল। মুরারি কিন্তু পরাজয় স্বীকার করতেন না বা পাঠ সম্বন্ধে কোন আলাপ-আলোচনা করতেন না। এজন্য শ্রীগৌরসুন্দরের মনে ক্রোধ হত। তিনি মুরারি গুপ্তকে ডেকে বলতেন—

প্রভু বলে,—''বৈদ্য, তুমি ইহা কেনে পড় ?
লতা-পাতা নিয়া গিয়া রোগী কর দঢ়।।
ব্যাকরণ-শাস্ত্র এই—বিষমের অবধি।
কফ-পিত্ত, অজীর্ণ-ব্যবস্থা নাহি ইথি।।

চৈঃ ভাঃ আদি ১০/২১-২২

এসব কথা শুনে মুরারি যদিও মনে মনে রুষ্ট হতেন বাইরে রোষ প্রকাশ করতেন না। শুধু মহাপ্রভুর দিকে শান্তভাবে তাকিয়ে থাকতেন। প্রভুর দিব্য প্রশান্ত-মূর্ত্তি দর্শনে ও তাঁর সুকোমল করতল স্পর্শে কারও কিছু বলবার থাকত না; সকলে শান্ত হত।

বৈষ্ণবের ভূষণ-দৈন্যতা। মুরারির দৈন্যতা দেখে মহাপ্রভুর হৃদয় দ্রবীভূত হত।

'শ্রীমুরারিগুপ্তশাখা প্রেমের ভাণ্ডার।
প্রভুর হৃদয় দ্রবে শুনি দৈন্য যাঁর।।

চৈঃ চঃ আদি ১০/৪৯

তখন শ্রীগৌরসুন্দর ব্যাকরণ শাস্ত্রের আলোচনা মাত্র আরম্ভ করেছেন। মুরারি গুপ্ত তাঁর সাথে, অলঙ্কার শাস্ত্রের বিচার আরম্ভ করতেন; কিন্তু তাঁকে পরাস্ত করতে পারতেন না। আশ্চর্য্য হয়ে মনে মনে বলতেন—এমন পাণ্ডিত্য কোন সাধারণ মানুষের থাকতে পারে না। নিমাই নিশ্চয়ই কোন মহাপুরুষ হবেন। নবদ্বীপের কোন ছাত্র তাঁর সঙ্গে তর্কে পেরে উঠতেন না। মুরারি বৈদ্যের সঙ্গে মাঝে মাঝে এরূপ তর্ক বিতর্ক হত, আবার মিত্রভাবে দুজন গঙ্গা স্নানে যেতেন।

মহাপ্রভু গয়াধাম থেকে এসে যখন প্রেম প্রকাশ করতে লাগলেন, মুরারি গুপ্ত প্রভুর পরম ভক্ত হলেন। শুক্লাম্বর পণ্ডিতের গৃহে মহাপ্রভুকে দিব্যভাবে ক্রন্দন করতে দেখে মুরারি গুপ্ত আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন।

শ্রীমুরারি গুপ্ত শ্রীরাম-সীতার উপাসনা করতেন। একদিন মহাপ্রভু হঠাৎ তাঁর গৃহে উপস্থিত হয়ে বরাহভাবে গর্জন করতে করতে একটি জলপাত্র দন্তে ধারণ করে উঠালেন! অবাক মুরারি গুপ্ত দিব্য বরাহরূপী শ্রীগৌরসুন্দরকে দণ্ডবৎ করলেন। তখন শ্রীগৌরসুন্দর বললেন—''মুরারি! তুমি আমার স্তুতি কর।" মুরারি গুপ্ত স্তুতি করতে লাগলেন। স্তুতি শুনে মহাপ্রভু খুব সুখী হয়ে বললেন—''মুরারি! তোমার নিকট আমি সত্য করে বলছি, আমি সকল দেবের সার এবং সংকীর্ত্তন প্রচার করতে ও করাতে আমি অবতীর্ণ হয়েছি, ভক্ত-দ্রোহ আমি সইতে পারি না, ভক্ত-দ্রোহী যদি পুত্রও হয় তথাপি তার মস্তক ছেদন করি, তার প্রমাণ নরকাসুর।" মুরারিকে প্রভু অনেক নিগূঢ় আত্মকথা বলে নিজ গৃহে এলেন।

অন্য একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাস অঙ্গনে সাত প্রহরিয়া ভাব প্রকট করে ভক্তগণকে আহ্বান করে ইষ্টবর দিতে লাগলেন, শ্রীমুরারি গুপ্তকে ডেকে বললেন—মুরারি! তুই এতদিনেও জানিস না আমি কে? আমার স্বরূপ দেখ।

...... মোর রূপ দেখ।  
মুরারি দেখয়ে রঘুনাথ পরতেক।।  
দূর্ব্বাদল শ্যাম দেখে সেই বিশ্বম্ভর।  
বীরাসনে বসিয়াছে মহাধনুর্দ্ধর।।  
জানকী-লক্ষণ দেখে বামেতে দক্ষিণে।  
চৌদিকে করয়ে স্তুতি বানরেন্দ্রগণে।।  
আপন প্রকৃতি বাসে যে হেন বানর।  
সকৃৎ দেখিয়া মূর্চ্ছা পাইল বৈদ্যবর।।

—চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ১০/৮-১০

মুরারি গুপ্ত তখন দেখতে পেলেন নবদূর্ব্বাদলশ্যাম ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র ধনুর্বাণ হাতে রত্নাসনে বসে আছেন, বামে বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিতা সীতা এবং দক্ষিণে ধনুর্বাণ হাতে লক্ষ্মণ শোভা পাচ্ছেন, সামনে বড় বড় বানর বীরগণ স্তুতি করছেন, মুরারি নিজেকেও সে বানরগণের মধ্যে দেখতে পেলেন। মাত্র একবার এ দিব্য রূপ দেখে মুরারি গুপ্ত মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। মহাপ্রভু তখন মুরারিকে ডেকে বললেন--মুরারি! ওঠ! আমার দিব্যরূপ দেখ। তুই কি ভুলে গিয়েছিস, সীতা-হরণকারী রাবণের লঙ্কা দগ্ধকারী হনুমান তুই। ওঠ, তোর জীবন-স্বরূপ লক্ষ্মণকে দর্শন কর। যার দুঃখে তুই কত কেঁদেছিলি, সে সীতাকে প্রণাম কর। মহাপ্রভুর বাক্যে মুরারি চৈতন্য লাভ করলেন এবং দিব্যরূপ দেখে বারবার তাঁকে দণ্ডবৎ করতে করতে কাঁদতে লাগলেন। মুরারির প্রতি প্রভুর কৃপা দেখে ভক্তগণ আনন্দে 'হরি' 'হরি' ধ্বনি করে উঠলেন।

একদিন সন্ধ্যার সময় মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবাস অঙ্গনে বসে আছেন। এমন সময় সেখানে শ্রীমুরারি গুপ্ত এলেন। প্রথমে মহাপ্রভুকে ও পরে নিত্যানন্দ প্রভুকে বন্দনা করলেন।

প্রভু বললেন—মুরারি! ব্যতিক্রম হল। মুরারি বললেন—তুমি যেমন প্রেরণা দিলে তেমনি করলাম। প্রভু বললেন—ঘরে যাও সব কিছু পরে জানতে পারবে। মুরারি গুপ্ত গৃহে ফিরে ভোজনাদি করে শয়ন করলেন। তারপর স্বপ্ন দেখলেন—

স্বপ্নে দেখে মহাভাগবতের প্রধান।
মল্লবেশে নিত্যানন্দ চলে আগুয়ান।।
নিত্যানন্দ-শিরে দেখে মহা-নাগ-ফণা।
করে দেখে শ্রীহল, মুষল তান বানা।।
নিত্যানন্দ মূর্ত্তি দেখে যেন হলধর।
শিরে পাখা ধরি পাচ্ছে যায় বিশ্বম্ভর।।

চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ২০/১৪-১৬

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সাক্ষাৎ হলধর—অনন্তদেব, মহাভাগবত-স্বরূপ। তাঁর শ্রীহস্তে হল মুষল শোভা পাচ্ছে। তিনি আগে আগে চলছেন, পিছনে আছেন শিরে ময়ুর পাখাধারী বিশ্বম্ভর। মুরারি বুঝতে পারলেন, কে বড়। প্রভু হাসতে হাসতে বললেন--মুরারি; এখন বুঝতে পারলে ত? তুমি ব্যতিক্রম করলে কি ভাবে চলবে? মুরারি গুপ্ত স্বপ্ন-ঘোরে 'নিত্যানন্দ" "নিত্যানন্দ" বলে ক্রন্দন করে উঠলেন। পতিব্রতা পত্নী 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলে তাঁকে জাগালেন। মুরারি গুপ্ত বুঝতে পারলেন নিত্যানন্দ বড় মহাভাগবত। শ্রীগৌরকে তিনিই প্রকাশ করেন। তাঁর কৃপা না হলে গৌরসুন্দরের কৃপা লাভ করা যায় না।

অন্য একদিন মুরারি গুপ্ত শ্রীবাস-অঙ্গনে এসে দেখলেন মহাপ্রভু দিব্য ভাবে দিব্য আসনে বসে আছেন। ভক্তগণ নিজ নিজ সেবা করছেন। শ্রীগদাধর মহাপ্রভুকে তাম্বুল দিচ্ছেন, প্রভু আনন্দে তাম্বুল চর্ব্বণ করছেন, নরহরি চামর ব্যজন করছেন। মুরারি গুপ্ত নমস্কার করলেন, প্রভু মুরারির হাতে চর্ব্বিত তাম্বুল দিলেন। চর্ব্বিত তাম্বুল মুখে দিয়ে মুরারি মাথায় হাত মুছলেন দেখে প্রভু বললেন—মুরারি! আমার উচ্ছিষ্ট তোমার অঙ্গে লাগল। মুরারি বললেন—আজ আমার সর্ব্ব অঙ্গ পবিত্র হল। প্রসাদ অপ্রাকৃত। ভগবানের নাম ও প্রসাদ অভিন্ন, উচ্ছিষ্ট বুদ্ধি করলে অপরাধ হয়। প্রভুর চর্ব্বিত তাম্বুল খেয়ে মুরারি কৃষ্ণ প্রেমে পাগল হয়ে গৃহে এলেন, পতিব্রতা পত্নী আসন দিয়ে তাঁকে বসালেন ও সামনে অন্নের থালা এনে দিলেন। মুরারি ভাবাবিষ্ট হয়ে সে অন্ন মুষ্টি মুষ্টি খাও খাও বলে ভূমিতে ফেলতে লাগলেন; পত্নী এসব রহস্য জানতেন। তাই তিনি বললেন "স্বামিন্! আর দিতে হবে না, এখন আপনি ভোজন করুন।" ভাবাবেশে মুরারি কিছু ভোজন করলেন তারপর শয়ন করলেন।

সকাল বেলা মহাপ্রভু মুরারি গুপ্তের গৃহে এসে তাঁকে বার বার ডাকতে লাগলেন। মুরারি 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলে তাড়াতাড়ি উঠে প্রভুকে নমস্কার করে এত প্রত্যুষে আসবার কারণ জিজ্ঞাসা করলে প্রভু বললেন—মুরারি! তোর কি মনে নাই? খাও—খাও—বলে কত ঘৃত মাখা অন্ন তুই আমায় কাল রাত্রে খাইয়েছিস? তুই দিলে আমি কি না খেয়ে থাকতে পারি? ঘৃত মাখা অন্ন খেয়ে অজীর্ণ হয়েছে, আমায় এর ঔষধ দে। একথা শুনে মুরারি বড় খেদ করতে লাগলেন। অতঃপর প্রভু বললেন—মুরারি! "তোর অন্নে অজীর্ণ, ঔষধ তোর জল।" (চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ২০/৬৯) এই বলে ঘটের জল পান করতে লাগলেন। মুরারি গুপ্ত তা দেখে হাহাকার করে বললেন—প্রভো! আমি অধম, নীচ, আমার গৃহের জল আপনার পানের যোগ্য নয়।

ভগবান্ ভক্তবৎসল। ভক্তের গৃহে তিনি ভোজন করেন। ভক্ত তাঁকে যেভাবে রাখেন, তিনি ঠিক সেভাবে থাকেন। যা খাওয়ান তা খান। ভক্তের

রুচিই তাঁর রুচি। এভাবে প্রভু নিত্যপ্রিয় হনুমান বা গরুড়ের অবতার শ্রীমুরারি গুপ্তকে নিয়ে কত লীলা করতে লাগলেন।

একদিন শ্রীমুরারি গুপ্ত চিন্তা করলেন–প্রভুর আগে যদি দেহত্যাগ করতে পারি ভাল হয়। তাই আত্মহত্যা করার জন্য তিনি একটি ছোরা তৈরী করলেন এবং তা ঘরে লুকিয়ে রাখলেন। অন্তর্য্যামী প্রভু সব জানতে পেরে তাড়াতাড়ি তাঁর ঘরে গিয়ে বলতে লাগলেন–মুরারি! আমার যত বিলাস সব তোমায় নিয়ে; তুমি যদি চলে যাও, আমার কি করে চলবে? আমি সব জানি। মুরারি প্রভুর চরণ ধরে কাঁদতে লাগলেন, তারপর প্রভু তাঁকে অনেক বুঝিয়ে গৃহে ফিরে এলেন। নদীয়া নগরে প্রভু যে বিলাস করেছেন, সে বিলাসের নিত্য সহচর ছিলেন শ্রীমুরারি গুপ্ত।

প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করে পুরী ধামে চলে গেলে, প্রতি বছর রথযাত্রার সময় মুরারি গুপ্ত তাঁর জন্য বহুবিধ ভোজ্যসহ সপত্নীক গৌড়-ভক্তদের সঙ্গে পুরী যেতেন। সেবক গোবিন্দ সে ভোজ্য দ্রব্যের প্রত্যেকটির নাম উল্লেখ করে মহাপ্রভুকে ভোজন করাতেন।

বাসুদেব দত্তের মুরারি গুপ্তের আর।
বুদ্ধিমান খাঁনের এই বিবিধ প্রকার।।

চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ১০/১২১

'বরাহ আবেশ হৈলা মুরারি ভবনে।
তাঁর স্কন্ধে চড়ি' প্রভু নাচিলা অঙ্গনে।।

চৈঃ চঃ আদি ১৭/১৯

মহাপ্রভু মুরারি গুপ্তকে দিয়ে ইষ্ট নিষ্ঠা শিক্ষা দিয়েছেন। আরাধ্যদেবের প্রতি নিষ্ঠা না থাকলে প্রেম বৃদ্ধি পায় না। হনুমানের অবতার মুরারী গুপ্ত মহাপ্রভুকে রামরূপে দর্শন করতেন। মহাপ্রভু তাঁর ইষ্টনিষ্ঠা পরীক্ষার জন্য একদিন বললেন, 'মুরারি! ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণের ভজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণের সমস্ত লীলাই মধুর। শ্রীকৃষ্ণের আরাধনায় যে আনন্দ, তা অন্য কোন ভগবৎ স্বরূপের আরাধনায় লাভ হয় না। অতএব তুমি শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা কর।' মুরারি মহাপ্রভুর কথা শুনে বচন দিলেন, 'হ্যাঁ প্রভু আমি শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করব।' কিন্তু ঘরে ফিরে এসে মুরারি অস্থির হয়ে গেলেন। সারারাত ঘুমাতে পারলেন না। পরদিন সকালে কাঁদতে কাঁদতে মহাপ্রভুর চরণে এসে বললেন–

'রঘুনাথের পায় মুঞি বেচিয়াছোঁ মাথা।
কাড়িতে না পারি মাথা, মনে পাই ব্যথা।।
শ্রীরঘুনাথ-চরণ ছাড়ান না যায়।
তব আজ্ঞা ভঙ্গ হয়, কি করি উপায়।।
তাতে মোরে এই কৃপা কর, দয়াময়।
তোমার আগে মৃত্যু হউক, যাউক সংশয়।।

চৈঃ চঃ মধ্য ১৫/১৪৯-১৫১

'শ্রীনাথে জানকীনাথে চাভেদে পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ।।

মহাপ্রভু মুরারিগুপ্তের ইষ্টনিষ্ঠাযুক্ত বাক্য শুনে সন্তোষ লাভ করে বললেন–

সাক্ষাৎ হনুমান তুমি শ্রীরাম কিঙ্কর।
তুমি কেনে ছাড়িবে তাঁর চরণ-কমল।।

চৈঃ চঃ মধ্য ১৫/১৫৬

সেই ভক্ত ধন্য, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ।
সেই প্রভু ধন্য, যে না ছাড়ে নিজজন।।

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪/৪৬

শ্রীকৃষ্ণের শারদীয় রাসযাত্রা পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীমুরারি গুপ্ত তিরোধান লীলা করেছিলেন।

**।। জয় শ্রীমুরারি গুপ্ত ঠাকুর কি জয়।।**

# শ্রীগদাধর দাস

পূর্ব্বে যিনি শ্রীরাধিকার ভূষণস্বরূপা চন্দ্রকান্তি ছিলেন, গৌরলীলায় তিনি গদাধর দাস।

ব্রজে যিনি বলরামের প্রিয়তমা 'পূর্ণানন্দা' ছিলেন। তিনি কার্য্যবশতঃ গদাধরের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছেন।

রাধাবিভূতিরূপা যা চন্দ্রকান্তিঃ পুরা স্থিতা।
সাদ্য গৌরাঙ্গনিকটে দাসবংশ-গদাধরঃ।।
পূর্ণানন্দা ব্রজে যাসীদ্বলদেবপ্রিয়াগ্রণীঃ।
সাপি কার্যবশাদেব প্রাবিশত্তং গদাধরম্।।

গৌরঃ গঃ ১৫৪-১৫৫

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ গদাধর দাসের স্বরূপ সম্বন্ধে এরূপ লিখেছেন--

"ইনি শ্রীরাধার কান্তি, শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী যেমন শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীরূপা, শ্রীল গদাধর দাসও তেমনি শ্রীমতীর অঙ্গশোভা। রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত গৌরের তিনি দ্যুতিস্বরূপ। গৌরগণোদ্দেশে তিনি বৃষভানুনন্দিনীর বিভূতিরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। তিনি গৌর ও নিত্যানন্দ উভয়ের গণেই গণিত হন। গৌরগণ ব্রজের মধুর রসের রসিক। নিত্যানন্দগণ-শুদ্ধভক্তিপ্রধান সখ্যাদি রসের রসিক। শ্রীদাস গদাধর নিত্যানন্দগণ হইলেও সখ্য ভাবময় গোপাল নহেন। তিনি মধুর রসিক ছিলেন। কাটোয়ায় তাহার গৌরার্চ্চা ছিল।"

কলকাতা থেকে ৮ মাইল উত্তরে গঙ্গাতীরে এঁড়িয়াদহ গ্রামে গদাধর দাসের শ্রীপাট। তিনি মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের পর নবদ্বীপ থেকে কাটোয়ায় চলে আসেন। কাটোয়া থেকে পরবর্তীতে আবার এঁড়িয়াদহে চলে যান। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে লিখিত আছে--গদাধর দাস নবদ্বীপে অবস্থানকালে শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর দেখাশোনা করতেন। পরে তাঁরা অন্তর্দ্ধান করলে তিনি কাটোয়ায় গিয়ে গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে কাটোয়াতে যে স্থানটি মহাপ্রভুর বাটী বলে প্রসিদ্ধ সেটি গদাধর দাসেরই দেবালয়।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু গৌড়দেশে এসে গঙ্গার উভয় পার্শ্বের গ্রামে গ্রামে পর্য্যটন করতে করতে একদিন গদাধর দাসের গৃহে এসে দেখলেন, গদাধর দাস গোপীভাবে বিভাবিত হয়ে মাথায় গঙ্গাজলের কলস নিয়ে 'দুধ নেবেগো, দুধ, বলে নিরন্তর ডাকছেন। গদাধরের ভাব দেখে মন্দিরে অবস্থিত বাল গোপাল মূর্ত্তিকে বুকে নিয়ে নিত্যানন্দ প্রভু নৃত্য শুরু করেন।

'গোপীভাবে বাহ্য নাহি গদাধর দাসে।
নিরবধি আপনাকে গোপী হেন বাসে।।

চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫/২৮১

শ্রীমহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে যখন গৌড়দেশে নাম-প্রেম প্রচার করতে আদেশ করেন, তখন সঙ্গে শ্রীরামদাস ও শ্রীগদাধর দাসকেও প্রেরণ করেন।

শ্রীরাম দাস আর গদাধর দাস।
চৈতন্য-গোসাঞির ভক্ত রহে তাঁর পাশ।।
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যবে গৌড়ে যাইতে।
মহাপ্রভু এই দুই দিল তাঁর সাথে।।

চৈঃ চঃ আদিঃ ১১/১৩-১৪

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় শ্রীগদাধর দাস ঠাকুরের মহিমা এভাবে বর্ণন করেছেন–

নিত্যানন্দ অধিষ্ঠান যাঁহার শরীরে।।
হেনমতে গদাধর দাসের মহিমা।
চৈতন্য পার্ষদ মধ্যে যাঁহার বর্ণনা।।

যে কাজীর বাতাস না লয় সাধুজনে।
পাইলেই মাত্র জাতি লয় সেইক্ষণে।।
হেন কাজী দুর্ব্বার দেখিলে জাতি লয়।
হেন জনে কৃপাদৃষ্টি কৈলা মহাশয়।।

চৈঃ ভাঃ

এঁড়িয়াদহ গ্রামে একজন প্রবল পরাক্রমশালী ধর্ম বিরোধী কাজী বাস করতেন।

শ্রীগদাধর দাস ঠাকুর একদিন প্রেমোন্মত্ত-চিত্তে হরিসংকীর্ত্তন করতে করতে কাজীর গৃহে এলেন এবং কাজীকে ডাকতে লাগলেন, কাজী ক্রোধভরে ঘরের ভিতর থেকে বাহিরে এলেন; কিন্তু শ্রীগদাধর দাস ঠাকুরের দিব্য-মূর্ত্তি ও দিব্য-ভাব দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কাজীর বদনমণ্ডল সখ্য ভাব ধারণ করল, ক্রোধও প্রশমিত হল। কাজী বললেন—ঠাকুর! তুমি এখন এলে কেন?

শ্রীগদাধর দাস বললেন—তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে।

কাজী—আমার সঙ্গে কি কথা আছে বল।

শ্রীগদাধর—শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে আপামর জন-সাধারণকে হরিনাম দিয়েছে। সে মধুর হরিনাম তুমি নিচ্ছ না কেন?

কাজী—কাল হরিনাম নেব।

গদাধর—কাল কেন আজই নাও। আমি এসেছি তোমাকে হরিনাম দিয়ে উদ্ধার করবার জন্য। তুমি পরম মঙ্গলময় শ্রীহরিনাম নাও। অদ্যই তোমার সমস্ত পাপ-তাপ থেকে তোমায় আমি উদ্ধার করব।

কাজী শ্রীগদাধর দাস ঠাকুরের বাণী শুনে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হলেন;তারপর হাসতে হাসতে বললেন—কাল হরি বলব, শ্রীগদাধর দাস ঠাকুর কাজীর মুখে 'হরি' শব্দ শুনে প্রেমসুখে মত্ত হয়ে বললেন আর কাল কেন? এই ত তুমি 'হরি' শব্দ বললে। তোমার সমস্ত পাপ তাপ দূর হল, তুমি পরম শুদ্ধ হলে। এ বলে শ্রীগদাধর দাস ঠাকুর প্রেমে নৃত্য করতে লাগলেন। কাজী পরম শুদ্ধ হলেন এবং গদাধর দাস ঠাকুরের শ্রীচরণে শরণ নিলেন।

এভাবে শ্রীগদাধর দাস ঠাকুর কত পাপী যবনাদিকে নাম দিয়ে উদ্ধার করেছিলেন। শ্রীগদাধর দাস ঠাকুর কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমী তিথিতে অপ্রকট হন।

কি বলিব কার্ত্তিকের কৃষ্ণাষ্টমী দিনে।
মোর প্রভু অদর্শন হৈলা এইখানে।।

ভক্তি রত্নাকর ৯/৩৮২

শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর অধ্যক্ষতায়, সেই সময়ের শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবগণের উপস্থিতিতে গদাধর দাসের তিরোভাব মহোৎসব বৃহৎভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবটি খেতুরী মহোৎসবের ন্যায় বৈষ্ণব সমাজে প্রসিদ্ধ।

কাটোয়ায় মহাপ্রভুর বাটীতে কেশব ভারতীর সমাধির নিকটেই গদাধর দাসের সমাধিস্থান।

**।। জয় শ্রীগদাধর দাস প্রভু কি জয়।।**

# শ্রীশিবানন্দ সেন

শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে মহাপ্রভুর শাখা বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন—

শিবানন্দ সেন প্রভুর ভৃত্য অন্তরঙ্গ।
প্রভু স্থানে যাইতে সবে লয়েন যার সঙ্গ।।
প্রতিবর্ষে প্রভুগণে সঙ্গেতে লইয়া।
নীলাচলে চলেন পথে পালন করিয়া।।

চৈঃ চঃ আদি ১০/৫৪-৫৫

ঐশ্বর্য্য বিত্ত প্রভৃতির সদ্ব্যবহার শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবার দ্বারা হয়। শ্রীশিবানন্দ সেন মহোদয়ের ভূ-সম্পত্তির ব্যবহার এইভাবে হয়েছিল। তিনি যথাসর্ব্বস্ব শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁর ভক্তগণের সেবার জন্য দিয়েছিলেন। তাঁর যাবতীয় পরিকর, পুত্র ও ভৃত্য সকলে শ্রীচৈতন্যের ভক্ত ছিলেন। শ্রীশিবানন্দ সেনের তিন পুত্র (১) শ্রীচৈতন্য দাস, (২) শ্রীরাম দাস ও (৩) কর্ণপুর, মহাপ্রভুর পরম ভক্ত ছিলেন। তাঁর ভাগিনা শ্রীবল্লভ সেন ও শ্রীকান্ত সেনও বড় ভক্ত ছিলেন।

শ্রীশিবানন্দ সেন বাস করতেন কুমারহট্টে বা হালি শহরে। তাঁর সেবিত গৌর-গোপাল বিগ্রহ বর্ত্তমান হালি শহর থেকে দেড় মাইল দূরে কাঁচড়া পাড়ায় সেবিত হচ্ছেন।

শ্রীকবি কর্ণপুর গৌরগণোদ্দেশ দীপিকাতে (১৭৬ নং শ্লোকে) লিখেছেন—

পুরা বৃন্দাবনে বীরাদূতী সর্ব্বাশ্চ গোপিকাঃ
নিনায় কৃষ্ণ নিকটং সেদানীং জনকো মম,
ব্রজে বিন্দুমতী যাসীদস্য সা জননী মম।

যিনি দ্বাপর যুগে বৃন্দাবনে 'বীরা' নামে শ্রীরাধার দূতী গোপী ছিলেন তিনিই এখন শ্রীশিবানন্দ সেন হয়েছেন। ব্রজের বিন্দুমতী এখন আমার মাতা হয়েছেন।

প্রতি বছর শ্রীশিবানন্দ সেন গৌড়ীয় ভক্তগণকে নিজ তত্ত্বাবধানে পুরীধামে নিয়ে যেতেন।

রথযাত্রার এক মাস আগে ভক্তগণের পুরীযাত্রা আরম্ভ হত। এক মাস পায়ে চলে সকলে পুরী পৌঁছতেন।

একবার শুভদিন দেখে ভক্তগণ যাত্রা আরম্ভ করলেন। সর্ব্বপ্রথমে সকলে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের ঘরে এলেন। সেখানে একদিন উৎসব করে, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য তাঁর পত্নী ও পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে ভক্তগণ এলেন নবদ্বীপ মায়াপুরে—প্রভুর জননী শ্রীশচীদেবীকে দর্শন করতে। প্রভুর বিরহে শচীমাতা বড় ব্যথিত চিত্তে দিন যাপন করছেন। ভক্তগণকে শচীমাতা নমস্কার করলেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য ও সীতা ঠাকুরাণীর শ্রীচরণ বন্দনা করে শ্রীগৌরসুন্দরের স্মরণ পূর্ব্বক ক্রন্দন করতে লাগলেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য ও সীতা ঠাকুরাণী শচীমাতাকে অনেক কথা বুঝিয়ে ভক্তগণের সঙ্গে যাত্রা করলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে মহাপ্রভু গৌড়দেশে থেকে নাম-প্রেম প্রচার করতে নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন। তথাপি তিনিও ভক্তগণের সঙ্গে মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য যাত্রা করলেন।

ভক্তদের মধ্যে ছিলেন—শ্রীআচার্য্যরত্ন, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীবাস পণ্ডিত, তাঁর ভ্রাতৃবর্গ ও পত্নী, বাসুদেব ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, মুরারি গুপ্ত ওঝা, শ্রীরাঘব পণ্ডিত ও শ্রীখণ্ডবাসী নরহরি,

গুণরাজ খাঁন প্রভৃতি। শ্রীশিবানন্দ সেনের সঙ্গে ছিলেন পত্নী ও তিন পুত্র। ভক্তগণের মধ্যে অনেকে সপত্নীক চলেছেন। ঠাকুরাণীগণ মহাপ্রভুর রুচি অনুযায়ী নানা প্রকার দ্রব্য তৈরী করে নিচ্ছেন। ভক্তগণের ভোজনের ব্যবস্থা এবং ঘাটের পয়সা কড়ি চুকাবার ব্যবস্থা শ্রীশিবানন্দ সেন নিজে করছেন। যে জায়গায় ভক্তগণ রাত্রে অবস্থান করতেন সেখানে সংকীর্ত্তন নৃত্য প্রভৃতি হত।

শ্রীশিবানন্দ সেন উড়িষ্যার গ্রাম্য পথের সন্ধান জানতেন। একদিন তিনি এক ঘাটির পয়সা কড়ির হিসাব নিকাশ করবার জন্য ঘাটে রয়ে গেলেন। ভক্তগণ এগুতে লাগলেন। কিছু দূর গিয়ে এক গাছের তলায় সকলে বসলেন। শিবানন্দ সেন না এলে ভোজনের ব্যবস্থা হয় না। পথ শ্রমে ভক্তগণ বড় ক্ষুধার্ত। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ক্রোধে অস্থির হয়ে শিবানন্দকে গালি ও অভিশাপ দিতে লাগলেন—“কোথায় শিবা? ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ যায়; এখনও সে এল না, ভোজনের ব্যবস্থা করল না? মরুক শিবার পুত্রগণ।” ঠিক এমন সময় শ্রীশিবানন্দ এলেন। তাঁর পত্নী কাঁদতে কাঁদতে বললেন—তুমি এখন পর্য্যন্ত ভক্তগণের ভোজনের ব্যবস্থা কর নাই। তাই নিত্যানন্দ প্রভু রেগে অস্থির, তোমার পুত্রগণ মরুক বলে অভিশাপ দিয়েছেন। শ্রীশিবানন্দ বললেন—পাগলামি কর না; বৃথা ক্রন্দন কর না, শান্ত হও। পত্নীকে এই সব বলে তিনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর স্থানে এলেন এবং দণ্ডবৎ করলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ক্রোধে তাঁকে পাদ দ্বারা প্রহার করলেন। শিবানন্দ সেন প্রভুর পাদ প্রহার পেয়ে আনন্দিত মনে শীঘ্রই এক গৌড়ীয়ার ঘরে গিয়ে ভক্তগণের ভোজনের ও বাসা ঘরের ব্যবস্থা করলেন ও শীঘ্রই নিত্যানন্দ প্রভুকে তথায় নিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ও ভক্তগণের ভোজনাদি হল।

অনন্তর শ্রীশিবানন্দ সেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণে নমস্কার করে বলতে লাগলেন—

আজি মোরে ভৃত্য করি অঙ্গীকার কৈলা।
যেমন অপরাধ ভৃত্যের যোগ্য ফল দিলা।।
শাস্তি ছলে কৃপা কর ও তোমার করুণা।
ত্রিজগতে তোমার চরিত্র বুঝে কোন জনা।।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ তোমার শ্রীচরণ রেণু।
হেন চরণ স্পর্শ পাইল মোর অধম তনু।।
আজি মোর সফল হৈল জন্ম কুলধর্ম।
আজি পাইনু কৃষ্ণ ভক্তি অর্থ কাম ধর্ম।।
শুনি নিত্যানন্দ প্রভুর আনন্দিত মন।
উঠি শিবানন্দে কৈলা প্রেম আলিঙ্গন।।

চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ১২/৩১

পুরী যাত্রাকালে একটি কুকুরের ঘটনা রয়েছে। কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের মঠের ‘ভাগবতধর্ম্ম’ পত্রিকার সম্পাদক আদি গোপাল ব্রহ্মচারী ১৭শ বর্ষ প্রথম সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ‘কে শ্রেষ্ঠ আমি না কুকুর?’ সেটি এখানে তুলে ধরা হল—

**“শিবানন্দ সেন নামে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর একজন প্রিয় ভক্ত ছিলেন। তিনি একবার শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আনুগত্যে বহু ভক্তকে নিয়ে নীলাচলে (পুরীতে) যাচ্ছিলেন শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রা এবং মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য। পথে একটি কুকুরও তাঁদের যাত্রার সঙ্গী হয়। নদী পার হওয়ার সময় মাঝি কুকুরটিকে নৌকায় উঠতে না দিলে সমস্ত ভক্তগণ পার হয়ে গেলেও কুকুরটি এপারে রয়ে গেল দেখে শিবানন্দ সেন মাঝিকে দশ পণ কড়ি দিয়ে কুকুরটিকে পার করে নিলেন। পথে যখন ভক্তগণ প্রসাদ পেতেন, সেই কুকুরটিকেও প্রসাদ দেওয়া হত। একদিন সেবক কুকুরকে খেতে দিতে ভুলে গেলেন। রাতে শিবানন্দ যখন প্রসাদ পাবার জন্য বসলেন তখন সেবককে জিজ্ঞাসা**





করলেন "তুমি কি কুকুরকে খেতে দিয়েছো? সেবক বললেন, ভুলে গিয়েছিলাম। এখন দিচ্ছি।" কিন্তু চারদিকে খুঁজে দেখলেন কুকুরটি কোথাও নেই। এটা শুনে শিবানন্দ দশ জন ভক্তকে পাঠালেন কুকুরকে খোঁজার জন্য। কিন্তু কুকুরটিকে কোথাও পাওয়া গেল না। দুঃখী হয়ে শিবানন্দ সেন সেই রাতে কোন কিছু না খেয়ে উপবাস করলেন। পরে ভক্তগণ যখন মহাপ্রভুর কাছে পৌঁছলেন, দেখলেন কুকুরটি মহাপ্রভুর পাশে বসে আছে। মহাপ্রভু হাসতে হাসতে কুকুরটিকে নারিকেল প্রসাদ দিচ্ছেন আর বলছেন। বল! 'রাম' 'কৃষ্ণ' 'হরি' আর কুকুরটিও বলতে লাগলেন।

শস্য খায় কুক্কুর, 'কৃষ্ণ' কহে বার বার।
দেখিয়া লোকের মনে হৈল চমৎকার।।

শিবানন্দ সেন কুকুরটিকে দেখে দণ্ডবৎ প্রণাম করে নিজের অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। পরের দিন কুকুরটিকে আর দেখা গেল না। কারণ; কুকুরটি সিদ্ধ দেহ লাভ করে বৈকুণ্ঠে গমন করেছেন।

আর দিন কেহ তার দেখা না পাইলা।
সিদ্ধ দেহ পাঞা কুক্কুর বৈকুণ্ঠেতে গেলা।।
ঐছে দিব্যলীলা করে শচীর নন্দন।
কুক্কুরকে 'কৃষ্ণ' কহাঞা করিলা মোচন।।

এখন পাঠকগণ হয়তো ভাববেন, আমি কুকুরের প্রসঙ্গ তুললাম কেন? কারণ; কুকুরটি মহাপ্রভুর আদেশে হরিনাম করেছেন। অনেকেই ভাববেন এ এমন কি আশ্চর্য্যের ব্যাপার। ভগবান সব কিছুই করতে পারেন। বোবাকে বাঁচালের মত কথা বলাতে পারেন, পঙ্গুকে দিয়ে গিরি লঙ্ঘন করাতে পারেন। কুকুরকেও হরিনাম করাতে পারেন। কিন্তু আমার প্রশ্নটা হচ্ছে, আমরা করছি না কেন? মহাপ্রভুর আদেশে কুকুর হরিনাম করল, কিন্তু আমরা করছি না কেন? মহাপ্রভু তো আদেশ করেছেন--

কি ভোজনে কি শয়নে কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে।।

আমরা মহাপ্রভুর আদেশ পালন করছি কোথায়? তাহলে কে শ্রেষ্ঠ? যে পিতার আদেশ মান্য করে সে শ্রেষ্ঠ। গৌর পিতা বলেছেন হরিনাম করতে, কুকুর পুত্র তা করেছেন কিন্তু আমরা মানুষরূপী পুত্র তা করতে পারছি না। অতএব মহাপ্রভুর আদেশ লঙ্ঘন কারী মানুষের থেকে কুকুরটিই শ্রেষ্ঠ।

সাধারণভাবে বিচার করলেও দেখা যায় কুকুরের মধ্যে কিছু ভাল গুণ রয়েছে, যেগুলো মানুষের মধ্যে খুব কম দেখা যায়। কুকুরের যেটি মহৎ গুণ সেটি হচ্ছে, কুকুর প্রভুভক্ত হয়। কুকুর কখনোই তাঁর অন্নদাতা মালিক বা প্রভুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে না। সে সর্বদা আপদে বিপদে প্রভুর সাথেই থাকে এবং প্রভুর বিপদ হলে প্রাণ দিয়ে হলেও তাকে রক্ষার চেষ্টা করে। এজন্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'কুকুর' বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। "তুমিত ঠাকুর তোমার কুকুর বলিয়া জানহ মোরে।" কিন্তু মানুষ কখনো প্রভুভক্ত হয় না। মানুষের 'স্বার্থ' ফুরিয়ে গেলে সে আর প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখায় না। অনেকেই আবার প্রভুকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই প্রভু হওয়ার জন্য চেষ্টা করে। বর্তমান সমাজে পোষা কুকুরকে সহজে বিশ্বাস করা যায় কিন্তু মানুষকে করা যায় না। মানুষ যখন তখন ক্ষতি করে দেবে কিন্তু কুকুর তা করবে না।

সুতরাং দাসত্বের বিচারে মানুষের থেকে কুকুরই শ্রেষ্ঠ। কুকুর তার প্রভুর বিশ্বস্ত দাস হয়। বর্তমান সময়ে আবার কিছু পশুপ্রেমী সংগঠনের

কুকুরের প্রতি খুব প্রেম জেগেছে। কুকুর মারলে নাকি তাদের হৃদয় কাঁদে। তারা প্রতিবাদ করলে কুকুর হন্তাকে জেলে যেতে হয়।

এতে আমাদের কোন দুঃখ নেই । বরং এটা আনন্দেরই বিষয়। কিন্তু পশুপ্রেমীগণের কাছে বিনীত প্রশ্ন– তাদের প্রেম শুধু কুকুরের প্রতি কেন ? যখন রাস্তা ঘাটে কসাই খানায় গরু, ছাগল মুরগীগুলোকে হত্যা করা হয়, তখন তাদের হৃদয় কাঁদে না কেন ? কেউ কুকুর মারলে প্রতিবাদ করব, আবার নিজেই ছাগল, গরুর মাংস খাব। এ কেমন পশুপ্রেম ? শুধু কি কুকুরটাই পশু। বাকি ছাগল, গরু, মাছ মুরগীগুলো কি পশু নয়? ভগবানের সৃষ্ট প্রত্যেকটি প্রাণী ও উদ্ভিদের প্রতি সমান দৃষ্টিই প্রকৃত মানবতা। তা না হতে পারলে পশু প্রেমের নামে অভিনয় হবে মাত্র।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশ–

জীবে দয়া, নামে রুচি বৈষ্ণব সেবন........ অর্থাৎ শুধু কুকুর নয়, প্রত্যেকটি জীবকে যথাযথ সম্মান দিয়ে, বৈষ্ণবগণের আশির্বাদ নিয়ে নিরপরাধে হরিনাম করতে হবে। তবেই মানুষ জন্মের স্বার্থকতা।”

এক বছর শ্রীশিবানন্দ সেন তাঁর প্রথম পুত্র চৈতন্যদাসকে নিয়ে পুরীতে গিয়েছিলেন। একদিন মহাপ্রভু শিশুটিকে জিজ্ঞাসা করলেন–তোর নাম কি? শিশুটি বললেন–চৈতন্যদাস। মহাপ্রভু শিবানন্দ সেনকে বললেন–এ কি রকম নাম রেখে ছ? শিবানন্দ সেন বললেন হৃদয়ে যেমন প্রেরণা পেয়েছি তেমনি রেখেছি।

একদিন শিবানন্দ সেন পুত্রকে শিখিয়ে দিলেন, মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ কর। চৈতন্যদাস প্রভুকে স্বীয় বাসগৃহে ভোজনের আমন্ত্রণ করলেন, শিশুর আদরের আমন্ত্রণ মহাপ্রভু স্বীকার করলেন। স-পত্নীক শিবানন্দ সেন অতি হর্ষিত চিত্তে অনেক কিছু রন্ধন করলেন। যথা সময় মহাপ্রভু শিবানন্দের বাসগৃহে এলেন। শিবানন্দ দণ্ডবন্নতি পূর্ব্বক প্রভুকে নিয়ে পাদ ধৌতাদি করিয়ে ভোজনে বসালেন। প্রভু বললেন আজকার আমন্ত্রণ চৈতন্যদাসের। চৈতন্যদাস প্রভুর সামনে দই, লেবু, আদা, ফুলবড়া, লবণ প্রভৃতি পাত্রে পাত্রে এনে সুন্দরভাবে রাখতে লাগল। মহাপ্রভু তা দেখে প্রসন্ন হয়ে বললেন–

............ এ বালক আমার মত জানে।
সন্তুষ্ট হইলাম আমি ইহার নিমন্ত্রণে।।

চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ১০/১৫০

এই বলে মহাপ্রভু আনন্দে ভোজন করতে লাগলেন। ভোজন অন্তে অবশেষ পাত্রটি চৈতন্যদাসকে ডেকে প্রভু দিলেন।

চার মাস কাল প্রভু স্থানে গৌড়ীয় ভক্তগণ থাকার পর বিদায় নিচ্ছেন। প্রভু শিবানন্দ সেনকে ডেকে বললেন–এবার তোমার যে পুত্র হবে তার নাম হবে পুরীদাস। শিবানন্দ সেন প্রভুর আশীর্ব্বাদ পেয়ে আনন্দে গৌড় দেশে ফিরে এলেন। কয়েক মাস পরে এক পুত্র হল। জ্যোতিষী বিচার করে নামকরণ করলেন–পরমানন্দদাস বলে।

অন্যান্য বছরের ন্যায় পরের বছরও শ্রীশিবানন্দ ভক্তগণসহ পুরী ধামে গেলেন। মহাপ্রভু সকলের যথাযথ বাসা ঘরের ব্যবস্থা করলেন। প্রভুর শ্রীচরণ দর্শনে ভক্তগণের আনন্দ-সীমা রইল না। শ্রীজগন্নাথদেবের রথাগ্রে প্রভু ভক্তগণ সঙ্গে বহু নৃত্যগীতাদি করলেন এবং ভক্তগণকেও নৃত্যাদি করালেন।

একদিন সপত্নীক শিবানন্দ মহাপ্রভুর কাছে এলেন এবং বালকটিকে নিয়ে মহাপ্রভুর শ্রীচরণে দণ্ডবৎ করিয়ে শ্রীচরণ অগ্রে ছেড়ে দিলেন। বালকটি মহাপ্রভুর অরুণ বর্ণ চরণের দিকে তাকিয়ে রইল।

প্রভু হাস্য করতে করতে শ্রীচরণ অঙ্গুষ্ঠ বালকের সামনে ধরলেন। বালক তা আনন্দ ভরে দু হাত দিয়ে ধরে চুষতে লাগলেন, ভক্তগণ তা দেখে আনন্দে 'হরি হরি' ধ্বনি করতে লাগল। এই বালকই পরবর্তীকালে হয়েছিলেন কবি কর্ণপুর গোস্বামী।

রথযাত্রা উপলক্ষে শিবানন্দ সেন তাঁর পত্নী এবং ছোটপুত্র পুরীদাসকে নিয়ে মহাপ্রভুর কাছে এলে, মহাপ্রভু পুরীদাসকে 'কৃষ্ণ কহ' 'কৃষ্ণ কহ' এভাবে বললেও পুরীদাস কিছুতেই কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করল না। শিবানন্দ সেনও অনেক চেষ্টা করলেন কিন্তু কাজ হল না। মহাপ্রভু বললেন আমি জগতের সকলকে এমনকি পশুদেরকেও কৃষ্ণনাম করিয়েছি। কিন্তু এই শিশুটিকে কৃষ্ণনাম করাতে পারলাম না, এর কারণ কি? স্বরূপ দামোদর কারণ নির্দেশ করে বললেন—

''তুমি কৃষ্ণনাম মন্ত্র কৈলা উপদেশে।
মন্ত্র পাঞা কার আগে না করে প্রকাশে।।
মনে মনে জপে, মুখে না করে আখ্যান।
এই ইহার মনঃকথা করি অনুমান।।

চৈঃ চঃ

শ্রীল প্রভুপাদ অনুভাষ্যে লিখেছেন--

**"শ্রীগুরুদেবের নিকট প্রাপ্ত মন্ত্র অন্যের নিকট প্রকাশ করিলে মন্ত্রের বীর্য্য থাকে না।"**

এক বছর শ্রীশিবানন্দ সেনের ভাগিনা শ্রীকান্ত রথযাত্রার পূর্ব্বে পুরীধামে গিয়েছিলেন। দুইমাস মহাপ্রভুর কাছে ছিলেন। গৌড়দেশে ফিরে যাবার সময় মহাপ্রভু শ্রীকান্তকে বললেন--এ বছর আমি গৌড়দেশে গিয়ে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যাদি ভক্তগণের সহিত মিলিত হব। অতএব এবছর পুরীতে আমার সঙ্গে মিলবার জন্য যেন কেউ না আসে। তুমি শিবানন্দকে বলবে—আমি এই পৌষমাসে তাঁর গৃহে আগমন করব ও তাঁর সহিত মিলিত হব।

মহাপ্রভুর আদেশ নিয়ে শ্রীকান্ত গৌড়দেশে ফিরে এলেন। তিনি সর্ব্বত্র প্রচার করলেন এ বছর মহাপ্রভু স্বয়ং গৌড়দেশে আসবেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যাদি ভক্তগণ পুরী যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। শ্রীকান্তের কথা শুনে যাত্রা স্থগিত রাখলেন।

শ্রীশিবানন্দ সেন, শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত মহাপ্রভুর পথ চেয়ে রইলেন। পৌষমাস এল। আনন্দে বহু জিনিস সংগ্রহ করে আজ আসবেন কাল আসবেন ভেবে ভেবে সারা পৌষ মাস কেটে গেল। কিন্তু তিনি এলেন না। অকস্মাৎ সেখানে শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী এলেন। এই ব্রহ্মচারী পূর্ব্ব নাম শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী; মহাপ্রভু নাম দিয়েছিলেন শ্রীনৃসিংহানন্দ। শ্রীশিবানন্দ ও জগাদানন্দের দুঃখ দেখে তিনি বললেন—আমি ধ্যানে বসে মহাপ্রভুকে নিয়ে আসব।

দুইদিন ধ্যান করার পর ব্রহ্মচারী শিবানন্দ সেনকে বললেন—প্রভুকে পানিহাটি গ্রাম পর্য্যন্ত এনেছি। কাল মধ্যাহ্নে এখানে আসবেন। রান্না করবার সমস্ত সামগ্রী আমায় এনে দাও রান্না করে তাঁকে খাওয়াব।

শ্রীশিবানন্দ সেন তৎক্ষণাৎ যাবতীয় বন্ধন-সামগ্রী যোগাড় করতে লাগলেন। শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সকাল থেকে রান্না আরম্ভ করলেন। বহু প্রকার ব্যঞ্জন, মিষ্টান্ন ও পিঠা তৈরী করলেন। শ্রীজগন্নাথদেবের জন্য, ইষ্টদেব শ্রীনৃসিংহদেবের জন্য এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্য ভিন্ন ভিন্ন নৈবেদ্য পাত্র ব্রহ্মচারী সাজালেন। সমস্ত জিনিস সমান তিন ভাগ করে পাত্রে পাত্রে রাখলেন, বসবার তিনখানা আসন পেতে দিলেন। তিন পাত্রে জলও সামনে সাজিয়ে রাখলেন। তারপর নিবেদন করে মন্দিরের বাইরে ধ্যান করতে লাগলেন। দেখলেন মহাপ্রভু এসে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং সানন্দে আসনে বসে তিনজনের জিনিস খেতে আরম্ভ করলেন। তখন ব্রহ্মচারী হা হা করে উঠলেন। শ্রীজগন্নাথদেব ও আমার ইষ্ট-শ্রীনৃসিংহদেব কি

খাবেন--তাঁদের উপবাস?

"তিন ভোগ খাইল কিছু অবশিষ্ট নাই।।"

চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ২/৬২

শ্রীশিবানন্দ সেন বললেন—আপনি হাহাকার করছেন কেন?

ব্রহ্মচারী—এই দেখুন মহাপ্রভুর কি ব্যবহার।

শিবানন্দ-মহাপ্রভু কি করছেন?

ব্রহ্মচারী--শিবানন্দ! কি বলব মহাপ্রভু তিনজনের নৈবেদ্য একা খেয়ে হাসতে হাসতে পানিহাটি চলে গেলেন। এখন জগন্নাথ ও নৃসিংহদেব উপবাসী রইলেন।

ব্রহ্মচারীর কথা শুনে শিবানন্দ সেন ও জগদানন্দ পণ্ডিত মন্দিরের মধ্যে দেখলেন নৈবেদ্যের কিছু মাত্র নাই। সকলে অবাক এবং হর্ষান্বিত হলেন। শিবানন্দ সেন বললেন—আপনি খেদ্ করবেন না। আমি এখনি পুনঃ সামগ্রী এনে দিচ্ছি, রান্না করে দুই ঠাকুরকে ভোগ লাগান। ব্রহ্মচারী পুনঃ রান্না করে দুই ঠাকুরকে ভোগ দিলেন। শ্রীশিবানন্দ সেন সুখী হলেন বটে কিন্তু সাক্ষাৎভাবে প্রভুকে দেখলেন না বলে মনে মনে খেদ করতে লাগলেন। অতঃপর পর বছর সমস্ত গৌড়ীয় ভক্ত নিয়ে শিবানন্দ সেন পুরী ধামে গেলেন। রথযাত্রাদি দর্শন করলেন। মহাপ্রভুর জন্য শ্রীসীতা ঠাকুরাণী, শ্রীমালিনী দেবী ও শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যের পত্নী প্রভৃতি যে সমস্ত জিনিস নিয়েছিলেন তা সকলে এক এক দিন আমন্ত্রণ করে তাঁকে ভোজন করালেন। সর্ব্বান্তর্য্যামী প্রভু একদিন শিবানন্দ সেনকে হঠাৎ বললেন--তোমার মনে আছে আমি পৌষ মাসে তোমার গৃহে ভোজন করেছিলাম। এই কথা শুনে শিবানন্দ সেন আনন্দে বিহ্বল হলেন। প্রভু আরও বললেন নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী দুই বার রন্ধন করেছিল। তুমি আমার সাক্ষাৎ দর্শন পাও নাই বলে খেদ করেছিলে। এবার শিবানন্দ সেন ও জগদানন্দ পণ্ডিতের সমস্ত কথা মনে পড়ল।

যবনরাজগণের রাজত্বকালে বর্দ্ধমান জেলায় অম্বিকা কালনায় একটি মুলুক অর্থাৎ তহশিল কাছারি ছিল। চলিত ভাষায় সবাই সেটিকে 'আম্বুয়া মুলুক' বলত। বর্তমানে তা প্যারীগঞ্জ নামে প্রসিদ্ধ। সেস্থানে নকুল ব্রহ্মচারী নামে একজন পরম বৈষ্ণব অবস্থান করতেন। গৌড়দেশের অধিবাসীগণকে উদ্ধারের জন্য মহাপ্রভু নকুলের হৃদয়ে আবিষ্ট হলে নকুল ব্রহ্মচারী প্রেমাবিষ্ট হয়ে গ্রহগ্রস্তের ন্যায় হুঙ্কার, গর্জ্জন, ক্রন্দন এবং নৃত্য শুরু করলেন। তাঁর গায়ের রঙ মহাপ্রভুর ন্যায় গৌর হয়ে গেল। তাঁর ভাব বচনভঙ্গি সবকিছুই মহাপ্রভুর ন্যায় হয়ে গেল। এই অদ্ভুত ঘটনার কথা শুনে চতুর্দ্দিক থেকে ভক্তগণ তাঁকে দেখতে আসতে লাগলেন। নকুল মহাপ্রভুর ভাবে সকলকে 'কৃষ্ণ' নাম করতে বললেন, তাকে দেখে সকলের মধ্যে কৃষ্ণপ্রেমের উদ্গম হল। শিবানন্দ সেন উক্ত ঘটনার কথা শুনে বিশ্বাস করতে না পেরে সন্দেহযুক্ত হয়ে পরীক্ষা করতে এলেন। তিনি বিচার করলেন, 'আমি দূরে থাকব, যদি নকুলের মধ্যে সত্যিই মহাপ্রভুর আবেশ হয়ে থাকে, তাহলে তিনি আমাকে নিজেই ডাকবেন এবং আমার ইষ্টমন্ত্র কি তা বলে দেবেন।' যেমন কথা তেমন কাজ। অসংখ্য ভক্তের মাঝে নকুল ব্রহ্মচারী 'শিবানন্দ', 'শিবানন্দ' বলে ডাকতে লাগলেন। ভক্তগণ শিবানন্দকে খুঁজে বের করে নকুল ব্রহ্মচারীর কাছে নিয়ে এলেন। ব্রহ্মচারী বললেন—

'ব্রহ্মচারী বলে তুমি করিলা সংশয়।
এক-মনা হঞা তাহা শুনহ নিশ্চয়।।
'গৌরগোপালমন্ত্র' তোমার চারি অক্ষর।
অবিশ্বাস ছাড়, যেই কৈরাছ অন্তর।।

চৈঃ চঃ অন্ত্য ২/৩০-৩১

শিবানন্দ সেনের সংশয় দূর হল। তিনি নকুল

ব্রহ্মচারীকে দণ্ডবৎ প্রণতির দ্বারা বহু শ্রদ্ধাভক্তি নিবেদন করলেন। এই ঘটনাটি মহাপ্রভুর অচিন্ত্য শক্তির একটি নিদর্শন।

মহাপ্রভুর প্রিয় চট্টগ্রামনিবাসী অত্যন্ত উদারস্বভাব বাসুদেব দত্ত ঠাকুর ব্যয়বহুল স্বভাবের ছিল। তা দেখে মহাপ্রভু শিবানন্দ সেনকে বলেছিলেন—

শিবানন্দ সেনে কহে করিয়া সম্মান।
বাসুদেব দত্তের তুমি করিহ সমাধান।।
পরম উদার ইঁহো, যে দিন যে আইসে।
সেই দিনে ব্যয় করে, নাহি রাখে শেষে।।
'গৃহস্থ' হয়েন ইঁহো, চাহিয়ে সঞ্চয়।
সঞ্চয় না কৈলে কুটুম্ব-ভরণ নাহি হয়।।
ইহার ঘরের আয়-ব্যয়, সব—তোমার স্থানে।
'সরখেল' হঞা তুমি করিহ সমাধানে।।

চৈঃ চঃ মধ্য ১৫/৯৩-৯৬

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী গুরু যদুনন্দন আচার্য্যের আজ্ঞার ছলনা করে পালিয়ে গেলে পিতা শ্রীগোবর্দ্ধন মজুমদার রঘুনাথকে ফেরৎ পাঠানোর অনুরোধ জানিয়ে পত্রসহ দশজনকে শিবানন্দ সেনের নিকট প্রেরণ করলেন। সেখানে রঘুনাথের সন্ধান না পেয়ে দশজন ফিরে গেলেন। চাতুর্ম্মাস্য শেষে শিবানন্দ সেন দেশে ফিরে এলে, গোবর্দ্ধন মজুমদার জানতে পারলেন রঘুনাথ দাস সিংহদ্বারে ভিক্ষা করে জীবন পরিচালনা করছেন। ভক্তগণ পরের বছর পুনরায় পুরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে, রঘুনাথের পিতামাতা দুঃখিত হয়ে রঘুনাথের সেবার জন্য চারশত মুদ্রা, দুই ভৃত্য এবং একজন ব্রাহ্মণ শিবানন্দ সেনের সাথে পুরীতে পাঠালেন। কিন্তু রঘুনাথ দাস গোস্বামী তা অঙ্গিকার করলেন না। শিবানন্দ সেনের পুত্র কবিকর্ণপুর শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে এই প্রস্তাবে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর মহিমা বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু কুমার হট্টে শ্রীবাসের গৃহে শুভ পদার্পন করলে সেসময় অন্যান্য ভক্তগণের সাথে শিবানন্দ সেনও মহাপ্রভুর সাথে মিলিত হয়েছিলেন।

''বাসুদেব দত্ত আইলেন সেইক্ষণে।
শিবানন্দ সেন আদি আপ্তবর্গসনে।।

চৈঃ ভাঃ অন্ত ৫/১৮

শ্রীশিবানন্দ সেনের আবির্ভাব ও তিরোভাবের সঠিক সময় এবং পিতামাতা ও পত্নীর নাম জানা যায় না।

শ্রীশিবানন্দ সেন রচিত গীত ঃ—

দয়াময় গৌরহরি, নদে-লীলা সাঙ্গ করি,
হায় হায় কি কপাল মন্দ।
গেলা নাথ নীলাচলে, এ-দাসেরে একা ফেলে,
না ঘুচিল মোর ভববন্ধ।।
আদেশ করিল যাহা, নিশ্চয় পালিব তাহা,
কিন্তু একা কিরূপে রহিব।
পুত্র পরিবার যত, লাগিবে বিষের মত,
তোমা বিনা কেমতে গোঙাব।।
গৌড়ীয় যাত্রিক সনে, বৎসরান্তে দরশনে,
কহিলা যাইতে নীলাচলে।
কিরূপে সহিয়া রব, সম্বৎসর কাটাইব,
যুগশত জ্ঞান করি তিলে।।
হও প্রভু কৃপাবান, কর অনুমতি দান,
নিতিনিতি হেরি পদদ্বন্দ্ব।
যদি না আদেশ কর, ওহে প্রভু বিশ্বম্ভর,
মৃতসম হবে শিবানন্দ।।

---

সোণার বরণ গোরা প্রেম বিনোদিয়া।
প্রেম জলে ভাসাওল নগর নদীয়া।।
পরিসর বুক বহি পড়ে প্রেমধারা।
নাহি জানে দিবানিশি প্রেমে মাতোয়ারা।।
গোবিন্দের অঙ্গে প্রভু অঙ্গ হেলাইয়া।
বৃন্দাবন গুণ শুনে মগন হইয়া।।
রাধা রাধা বলি পহুঁ পড়ে মূরছিয়া।
শিবানন্দ কান্দে পহুঁর ভাব না বুঝিয়া।।

পদকল্পতরু ২১২৭ গীত

জয় জয় পণ্ডিত গোসাঞি।
যাঁর কৃপা বলে সে চৈতন্য-গুণ গাই।।
হেন সে গৌরাঙ্গ চন্দ্রে যাহার পীরিতি।
গদাধর প্রাণনাথ যাহে নাম খ্যাতি।।
গৌরগত প্রাণ প্রেম কে বুঝিতে পারে।
ক্ষেত্রবাস কৃষ্ণ সেবা যার লাগি ছাড়ে।।
গদাইর গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গের গদাধর।
শ্রীরাম-জানকী যেন এক কলেবর।।
যেন এক প্রাণ রাধা বৃন্দাবনচন্দ্র।
তেন গৌর-গদাধর প্রেমের তরঙ্গ।।
কহে শিবানন্দ পবু যাঁর অনুরাগে।
শ্যাম তনু গৌর হইয়া প্রেম মাগে।।

পদ কল্পতরু ২৩৫৫

পদকর্ত্তা শিবানন্দ ও শিবাই দাস সম্বন্ধে– পদকল্পতরু ভূমিকায় শ্রীযুত সতীশ চন্দ্র রায় এম, এ, মহোদয় বলেছেন– ‘‘বলা বাহুল্য যে ইহা শ্রীমহাপ্রভুর বর্ণিত প্রেমার্ত্তির সাক্ষাৎ দ্রষ্টা শিবানন্দ সেনের রচনা ছাড়া অন্য কোন শিবানন্দের রচনা হইতে পারে না। মহাপ্রভুর সমসাময়িক অন্যান্য ভক্ত কুলীন গ্রামবাসী প্রসিদ্ধ শিবানন্দ সেন ব্যতীত আর কোন শিবানন্দ বৈষ্ণব সাহিত্যে উল্লিখিত হইয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। সুতরাং তাঁহাকেই শিবানন্দ ও শিবাই দাস ভনিতার পদাবলীর রচয়িতা বলিয়া জানা যাইতেছে।’’ (পদকল্পতরু ভূমিকা পৃষ্ঠা ২১৩)।

স্বর্গে দুন্দুভি বাজে নাচে দেবগণ।
হরি হরি হরি ধ্বনি ভরিল ভুবন।।
ব্রহ্মা নাচে শিব নাচে আর নাচে ইন্দ্র।
গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়া গোবিন্দ।।
নন্দের মন্দিরে গোয়ালা আইল ধাইঞা।
হাতে লড়ি কান্ধে ভার নাচে থৈয়া থৈয়া।।
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল অঙ্গনে ঢালিয়া।
নাচেরে নাচেরে নন্দ গোবিন্দ পাইয়া।।
আনন্দ হইল বড় আনন্দ হইল।
এ-দাস শিবাইর মন ভুলিয়া রহিল।।

(পদকল্পতরু গীত ১১৩৩)

যোগমায়া ভগবতী দেবী পৌর্ণমাসী।
দেখিয়া যশোদা পুত্র নন্দগৃহে আসি।।
সবে সাবধান করি যশোদারে কহে।
বহু পুণ্যে এ হেন বালক মিলে তোহে।।
বহু আশীর্ব্বাদ কৈলা হরষিত হৈয়া।
রূপ নিরখয়ে সুখে একদিকে চাইয়া।।
এ দাস শিবা বলে অপরূপ হেরি।
দেখিয়া বালক ঠাম যাঙ বলিহারি।।

(পদকল্পতরু গীত ১১৩৫)

শিবানন্দ সেন ছাড়াও শিবানন্দ আচার্য্য চক্রবর্ত্তী নামে আর একজন পদকর্ত্তা আছেন। শিবানন্দ আচার্য্য চক্রবর্ত্তী গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন, তিনি পদে শ্রীগদাধর পণ্ডিতের বন্দনা করেছেন। শিবানন্দ সেনের আর কয়েকটি পদ নিচে লিখিত হ'ল।

অখিল ভুবন ভরি, হরি রস বাদর,
বরিষয়ে চৈতন্য মেঘে।
ভকত চাতক যত, পিবি পিবি অবিরত,
অনুক্ষণ প্রেমজল মাগে।।

ফাল্গুন পূর্ণিমা তিথি, মেঘের জনম তথি,
সেই মেঘে করল বাদর।
উচ নিচ যত ছিল, প্রেমজলে ভাসাওল,
গোরা বড় দয়ার সাগর।।
জীবের করিয়া যন্ত্র, হরিনাম মহামন্ত্র,
হাতে হাতে প্রেমের অঞ্জলি।
অধম দুঃখিত যত, তারা হৈল ভাগবত,
বাঢ়িল গৌরাঙ্গ ঠাকুরালি।।
জগাই মাধাই ছিল, তারা প্রেমে উদ্ধারিল,
হেন জীবে বিলাওল দয়া।
দাস শিবানন্দ বলে, কেন রৈনু মায়া ভোলে,
প্রভু মোরে দেহ পদছায়া।।

———

সোনার বরণ গোরা প্রেম বিনোদিয়া।
প্রেমজলে ভাসাওল নগর নদীয়া।।
পরিসর বুক বাহি পড়ে প্রেমধার।
নাহি জানে দিবানিশি প্রেমে মাতোয়ার।।
গোবিন্দের অঙ্গে পহুঁ অঙ্গ হেলাইয়া।
রাধা রাধা বলি পহুঁ পড়ে মুরছিয়া।।
শিবানন্দ কান্দে পহুর ভাব না বুঝিয়া।

———

শিবানন্দ সেনের শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ যাত্রার একটি সুন্দর গীত।

নন্দরাণি গো মনে না ভাবিহ কিছু ভয়।
বেলি অবসান কালে, গোপাল আনিয়া দিব,
তোর আগে কহিনু নিশ্চয়।।
সোপি দেহ মোর হাতে, আমি লৈয়া যাব সাথে,
যাচিয়া খাওয়াব ক্ষীর ননী।
আমার জীবন হৈতে, অধিক জানিয়ে গো,
জীবনের জীবন নীলমণি।।
সকালে আনিব ধেনু, বাজাইয়া শিঙ্গা বেণু,
গোচারণ শিখাইব ভাইয়েরে।
গোপকুলে উতপতি, গোধন চারণ বৃত্তি,
বসি থাকিতে নাই ঘরে।।
শুনিয়া বলাই'র কথা, মরমে পাইয়া ব্যথা,
ধারা বহে অরুণ নয়ানে।
এ দাস শিবাই বোলে, রাণী ভাসে প্রেমজলে,
হেরইতে কানাইর বয়ানে।।

**।। জয় শ্রীশিবানন্দ সেন কি জয়।।**




# শ্রীপরমানন্দ পুরী

ত্রিহুত দেশে বিপ্রকুলে শ্রীপরমানন্দ পুরী জন্মগ্রহণ করেন। বর্ত্তমান মজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্গা ও ছাপরা প্রভৃতি জেলাগুলি ত্রিহুতের অন্তর্গত। শ্রীপরমানন্দ পুরী শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামীর প্রিয় শিষ্য ছিলেন।

ত্রিহুতে পরমানন্দ পুরীর প্রকাশ।
নীলাচলে যাঁর সঙ্গে একত্র বিলাস।।

—চৈঃ ভাঃ আদি ২/৪৩

''মাধব পুরীর প্রিয় শিষ্য মহাশয়।
শ্রীপরমানন্দ পুরী প্রেমরসময়।।''

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৩/১৭৮

মহাপ্রভু যখন দক্ষিণে ঋষভ পর্ব্বতে গমন করেন, সে সময় সেখানে তাঁর সঙ্গে সর্ব্বপ্রথম শ্রীপরমানন্দ পুরীর মিলন হয়।

ঋষভ পর্ব্বতে চলি আইলা গৌরহরি।
নারায়ণ দেখিলা তাঁহা নতি স্তুতি করি।।
পরমানন্দ পুরী তাহা রহে চতুর্মাস।
শুনি মহাপ্রভু গেলা পুরী গোসাঞির পাশ।।
পুরী গোসাঞির প্রভু কৈল চরণ বন্দন।
প্রেমে পুরী গোসাঞি তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।।
তিন দিন প্রেমে দোঁহে কৃষ্ণ-কথা রঙ্গে।
সেই বিপ্র ঘরে দোঁহে রহে এক সঙ্গে।।
পুরী গোসাঞি বলে—আমি যাব পুরুষোত্তমে।
পুরুষোত্তম দেখি গৌড়ে যাব গঙ্গাস্নানে।।
প্রভু কহে—তুমি পুনঃ আইস নীলাচলে।
আমি সেতুবন্ধ হৈতে আসিব অল্পকালে।।
তোমার নিকটে রহি—হেন বাঞ্ছা হয়।
নীলাচলে আসিবে মোরে হঞা সদয়।।
এত বলি তাঁর ঠাঞি আজ্ঞা লঞা।
দক্ষিণে চলিলা প্রভু হরষিত হঞা।।
পরমানন্দ পুরী তবে চলিলা নীলাচলে।
মহাপ্রভু চলি তবে আইলা শ্রীশৈলে।।

চৈঃ চঃ মধ্যঃ ৯/১৬৭-১৭৫

শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় ১১৮ শ্লোকে—''পুরী শ্রীপরমানন্দো য আসীদুদ্ধবঃ পুরা।'' যিনি পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণাবতারে উদ্ধব ছিলেন অধুনা তিনি শ্রীপরমানন্দ পুরী।

''পরমানন্দ পুরী আর কেশব ভারতী।
ব্রহ্মানন্দ পুরী আর ব্রহ্মানন্দ ভারতী।।''

চৈঃ চঃ আদি ৯/১৩

ভক্তি কল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী। পরমানন্দ পুরী ও কেশব ভারতী আদি নয় জন ভক্তিকল্পতরুর নয়টি মূল স্বরূপ।

শ্রীপরমানন্দ পুরী ঋষভ পর্ব্বতে মহাপ্রভুর নিকট থেকে নীলাচলে চলে এলেন এবং কয়েকদিন সেখানে থাকার পর তিনি গৌড় দেশে গঙ্গা-তীর্থে স্নানের জন্য শ্রীনবদ্বীপে আগমন করলেন।

আইর মন্দিরে সুখে করিলা বিশ্রাম।
আই তাঁরে ভিক্ষা দিলা করিয়া সন্মান।।

—চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১০/৯২

নবদ্বীপে পরমানন্দ পুরী মহাপ্রভুর গৃহে এলেন। তাঁকে শ্রীশচীমাতা বহু যত্ন করে ভোজন করালেন। শ্রীপরমানন্দ পুরী একদিন সেখানে রইলেন।

পুরী গোস্বামী গৌড়দেশে এসে যখন শুনলেন প্রভু নীলাচলে আগমন করেছেন। তা শুনে পুরী গোস্বামী আর কাল বিলম্ব না করে পুনঃ নীলাচলের

দিকে দ্বিজ কমলাকান্তকে সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করলেন। পুরী নীলাচলে পৌঁছিলে প্রভুর সঙ্গে মিলন হল। মহাপ্রভু তাঁর চরণ বন্দনা করলে পুরী তাঁকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করলেন। উভয়ে পরমানন্দিত হলেন। মহাপ্রভু পুরীকে নীলাচলে থাকবার জন্য প্রার্থনা করলেন। পুরী বললেন–

''তোমা সঙ্গে রহিতে বাঞ্ছা করি।
গৌড় হৈতে চলি আইলাঙ নীলাচলপুরী।।''

–চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১০/৯৮

তোমার সঙ্গে থাকবার জন্য শীঘ্র গৌড় দেশ থেকে এলাম। তারপর পুরী গোস্বামী গৌড়বাসী ভক্তগণের ও শচীমাতার কুশল বার্ত্তা বললেন। তিনি আরও বললেন–গৌড় দেশের ভক্তগণ তোমাকে দেখবার জন্য শীঘ্র নীলাচলে আসছেন।

মহাপ্রভু কাশী মিশ্রের ভবনে একটি নির্জ্জন গৃহে পুরীর থাকবার ব্যবস্থা করলেন। তাঁর সেবার জন্য একজন ভৃত্যেরও ব্যবস্থা করলেন। পুরী গোস্বামী প্রভুকে বাৎসল্যভাবে স্নেহ করতেন। প্রভুও পুরীর প্রতি পরমপূজ্য গুরুভাব রাখতেন। তাঁর যেখানে আমন্ত্রণ হত সেখানে পুরী গোস্বামীকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন।

ছোট হরিদাস প্রকৃতিসম্ভাষণ করেছিলেন বলে শ্রীমহাপ্রভু তাকে পরিত্যাগ করেছিলেন এবং নিজগৃহে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছিলেন। এজন্য হরিদাস দুঃখী হয়ে তিনদিন উপবাসী ছিলেন। স্বরূপ দামোদর এবং অন্যান্য ভক্তগণ হরিদাসের প্রতি সদয় হওয়ার জন্য বারম্বার নিবেদন করলেও মহাপ্রভু তাঁর আদেশকে প্রত্যাহার করেন নি। বরং ভর্ৎসনা করেছিলেন। মহাপ্রভুর দর্শন না পেলে ছোট হরিদাস প্রাণত্যাগ করবে, এই সঙ্কল্পের কথা জানতে পেরে শ্রীপরমানন্দ পুরী মহাপ্রভুর নিকট নিবেদন করলেন। শ্রীমহাপ্রভু শ্রীলগুরুদেবের গুরুভ্রাতারূপে পরমানন্দ পুরীকে গুরুবৎ পূজ্য মনে করতেন। তাই তাঁর বাক্যকে অমর্যাদা না করে হরিদাসকে গৃহে প্রবেশের আদেশ দিয়ে নিজে স্বয়ং আলালনাথে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। মহাপ্রভু চলে যাচ্ছেন দেখে পরমানন্দ পুরী অপ্রস্তুত হয়ে মহাপ্রভুকে বারম্বার বুঝিয়ে আলালনাথে গমন নিবৃত্ত করলেন এবং বললেন ''ঈশ্বর স্বতন্ত্র, তাঁর ইচ্ছার প্রতিবন্ধকতা করা ঠিক নয়।''

গুরুদেবের গুরুভ্রাতা গুরুবৎ পূজ্য, মহাপ্রভু আচরণমুখে জগজ্জীবকে এই শিক্ষাটি দিলেন। গুরুবর্গের অমর্য্যাদা করা অত্যন্ত ভক্তিপ্রতিকূল। মর্যাদা লঙ্ঘন আমি না পারো সহিতে।' চৈঃ চঃ আঃ ৪/১৬৬।

পূর্ব্বে পুরী গোস্বামী কাশীমিশ্র ভবনে থাকতেন, পরে শ্রীমন্দিরের পশ্চিমে একটি মঠে থাকতেন। একদিন গদাধর পণ্ডিতকে সঙ্গে করে মহাপ্রভু পুরী গোস্বামীর মঠে এলেন। পুরী এক কূপ খনন করেছিলেন, কিন্তু তার জল ভাল হয় নি। তার জন্য তিনি বড় দুঃখী ছিলেন। অন্তর্য্যামী প্রভু তা জানতে পেরে ভঙ্গি করে পুরীকে জিজ্ঞাসা করলেন--কূপের জল কেমন হয়েছে? পুরী বললেন--

''পুরীবলে–সেহ বড় আভাগিয়া কূপ।
জল হৈল যেন ঘোর কর্দ্দমের রূপ।।''

–চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৩/২৩৭

প্রভু এ কথা শুনে দুঃখী হলেন। উঠে বাহুযুগল ঊর্দ্ধ করে শ্রীজগন্নাথদেবের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন–

''জগন্নাথ মহাপ্রভু এই মোর বর।
গঙ্গা প্রবেশুক এই কূপের ভিতর।।''

–চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৩/২৪২

এই প্রার্থনা করে মহাপ্রভু নিজের কুটীরে এলেন। প্রভুর সে প্রার্থনায় ভোগবতী গঙ্গা অলক্ষ্যে সেই

কূপে প্রবেশ করলেন। প্রাতঃকালে ভক্তগণ দেখলেন কূপ নির্মল জলে পরিপূর্ণ।

''সেই ক্ষণে গঙ্গাদেবী আজ্ঞা করি শিরে।
পূর্ণ হই প্রবেশিলা কূপের ভিতরে।।''

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৩/২৪৬

ভক্তগণ বুঝতে পারলেন প্রভুর প্রার্থনায় গঙ্গাদেবী আগমন করেছেন। কূপটীকে ভক্তগণ নমস্কার প্রদক্ষিণ করলেন। এ কথা শুনে প্রভু শীঘ্র সেখানে গেলেন, কূপের নির্মল জল দেখে বলতে লাগলেন—

''শুনহ সকল ভক্তগণ।
এ কূপের জলে যে করিবে স্নান পান।
সত্য সত্য হৈব তার গঙ্গা-স্নান ফল।
কৃষ্ণ ভক্তি হৈব তার পরম নির্মল।।''

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৩/২৫২

পুরী গোস্বামী যেমন প্রভুপ্রাণ ছিলেন, তেমনি শ্রীগৌরসুন্দরের প্রাণ পুরী গোঁসাঞি ছিলেন। পুরী গোস্বামী প্রতিদিন সর্ব্বপ্রথম মহাপ্রভুর দর্শনে যেতেন, তারপর অন্য কৃত্যাদি করতেন। প্রভুও সর্ব্বক্ষণ পুরী গোঁসাঞিয়ের তত্ত্বাবধান করতেন। প্রভু বলতেন—

''আমি যে আছিয়ে পৃথিবীতে।
জানিহ কেবল পুরী গোসাঞির প্রীতে।।
পুরী গোসাঞির আমি—নাহিক অন্যথা।
পুরী বেচিলেও আমি বিকাই সর্ব্বথা।।
সকৃৎ যে দেখে পুরী গোসাঞির মাত্র।
সেহ হইবেক শ্রীকৃষ্ণের প্রেম পাত্র।।''

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৩/২৫৫-২৫৬

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে লিখিত আছে—শ্রীপরমানন্দ পুরী 'গোবিন্দবিজয়' নামক গ্রন্থ রচনা করেছেন।

**।। জয় শ্রীপরমান্দ পুরী কি জয়।।**

# শ্রীমুকুন্দ দত্ত ঠাকুর

শ্রীমুকুন্দ দত্ত শাখা প্রভুর সমাধ্যায়ী।
যাঁহার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য-নিতাই।।
চৈঃ চঃ আদি ১০/৪০

শ্রীমুকুন্দ দত্ত ঠাকুর প্রভুর সহপাঠী মিত্র ছিলেন। চট্টগ্রামের পটিয়া থানার অন্তর্গত ছান্‌হরা গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামী লিখেছেন—

ব্রজে স্থিতৌ গায়কৌ যৌ মধুকণ্ঠ-মধুব্রতৌ।
মুকুন্দ বাসুদেবৌ তৌ দত্তৌ গৌরাঙ্গগায়কৌ।।

পূর্ব্বে ব্রজে যাঁরা মধুকণ্ঠ ও মধুব্রত নামক গায়ক ছিলেন, তাঁরা মুকুন্দ ও বাসুদেব নামে দত্তকুলে জন্মগ্রহণ ক'রে শ্রীগৌরাঙ্গের গায়ক হয়েছেন।

শ্রীবাসুদেব ও মুকুন্দ দত্ত ঠাকুরের কীর্ত্তনে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ স্বয়ং নৃত্য করতেন। মুকুন্দ মহাপ্রভুর অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। মহাপ্রভু ও মুকুন্দ সমবয়স্ক ছিলেন। একসঙ্গে পাঠশালায় অধ্যয়ন করতেন এবং বিবিধ ক্রীড়াদি করতেন। শ্রীমুকুন্দ শিশুকাল থেকে একান্ত কৃষ্ণ-নিষ্ঠ ছিলেন। কৃষ্ণ-কীর্ত্তন ছাড়া অন্য কোন গীত পছন্দ করতেন না। ইতর কথা বলতেও বেশী পছন্দ করতেন না। প্রভু মুকুন্দের সঙ্গে কৌতুক করবার জন্য তাঁকে দেখলেই দু'হাতে ধরতেন এবং বলতেন—আমার ন্যায়ের সূত্রের জবাব না দিয়ে যেতে পারবে না। মুকুন্দও ন্যায় পড়তেন। প্রভু ফাঁকি জিজ্ঞাসা করে কেবল বাদানুবাদ করতেন, মুকুন্দের তা পছন্দ হত না। মুকুন্দ সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন, অলঙ্কার জিজ্ঞাসা করে প্রভুকে পরাভূত করতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে পেরে উঠতেন না। মুকুন্দ বৃথা বাদানুবাদের ভয়ে প্রভুকে দেখলে অন্য পথ দিয়ে যেতেন। প্রভু তা বুঝতে পারতেন—"আমার সম্ভাষে নাহি কৃষ্ণের কথন। অতএব আমা দেখি করে পলায়ন।।" (চৈঃ ভাঃ) বেটা পালিয়ে যা, দেখি কতদিন থাক্‌তে পারিস? দেখব আমার পথ কেমনে এড়াস? আমি এমন বৈষ্ণব হব আমার দ্বারে সকলকেই আসতে হবে।

আর একদিন প্রভুর মুকুন্দের সঙ্গে দেখা হল। প্রভু তাঁর দুখানি হাত ধরে বললেন--আজ তোমাকে কিছুতেই ছাড়ব না। মুকুন্দ বড় মুস্কিলে পড়ে বললেন ব্যাকরণ শিশুরা পড়ে। তোমার সঙ্গে অলঙ্কার শাস্ত্রের আলোচনা করব। প্রভু বললেন--তুমি জিজ্ঞাসা কর। আমি সমস্ত কথার জবাব দিব। মুকুন্দ প্রভুকে পরাভূত করার জন্য অলঙ্কারের কঠিন কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। সর্ব্বশক্তিমান্ প্রভু তার ঠিক ঠিক জবাব দিতে লাগলেন। কখনও সেই অলঙ্কার তিনি খণ্ডন করতে লাগলেন, কখনও তা পুনঃ স্থাপন করতে লাগলেন। প্রভু মুকুন্দকে তাঁর সিদ্ধান্ত খণ্ডন ও স্থাপন করতে বললেন, মুকুন্দ তা খণ্ডন ও স্থাপন করতে পারলেন না। মুকুন্দ চিন্তা করতে লাগলেন কেমনে এঁর হাত থেকে নিস্তার পাব। অন্তর্য্যামী প্রভু তা' বুঝতে পেরে বললেন—মুকুন্দ! আজ ঘরে যাও, কাল আবার বিচার হবে। মুকুন্দ নিস্তার পেয়ে বললেন আচ্ছা তাই হোক। কাল আবার বিচার হবে। এ বলে মুকুন্দ দত্ত প্রভুর শ্রীচরণ ধূলি নিয়ে চললেন এবং চিন্তা করতে লাগলেন—

মনুষ্যের এমন পাণ্ডিত্য আছে কোথা।
হেন শাস্ত্র নাহিক অভ্যাস নাহি যথা।।






এমত সুবুদ্ধি কৃষ্ণভক্ত হয় যবে।
তিলেকো ইহান সঙ্গ না ছাড়িয়ে তবে।।
—চৈঃ ভাঃ আদি ১২/১৮-১৯

মনুষ্যের এমন পাণ্ডিত্য বুদ্ধি হতে পারে না। এমন বুদ্ধিমান্ পুরুষ যদি কৃষ্ণ-ভক্ত হয়, তবে তিলার্দ্ধ কালও এঁর সঙ্গ ত্যাগ করব না।

মুকুন্দ গ্রাম্যকথা শুনতে পছন্দ করতেন না। তাই রাস্তা-ঘাটে নিমাইকে দেখলে লুকিয়ে পড়তেন। মহাপ্রভু একদিন হেসে বললেন—"মুকুন্দ আমার নিকট হতে পালিয়ে গেলেও বেশীদিন থাকতে পারবে না। আমি এমন বৈষ্ণব হব যে ব্রহ্মা-শিব পর্য্যন্ত আমার দ্বারে এসে গড়াগড়ি দেবে।"

হাসি' বোলে প্রভু,—"আগে পড়োঁ কতদিন।
তবে সে দেখিবা মোর বৈষ্ণবের চিন।।
এইমত বৈষ্ণব মুঞি হইমু সংসারে।
অজ-ভব আসিবেক আমার দুয়ারে।।
শুন, ভাই সব, এই আমার বচন।
বৈষ্ণব হইমু মুঞি সর্ব্ব-বিলক্ষণ।।
আমারে দেখিয়া এবে যে-সব পলায়।
তাহারাও যেন মোর গুণ-কীর্ত্তি গায়।।
চৈঃ ভাঃ আ ১১/৪৬-৪৯

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য, শ্রীবাস পণ্ডিত ও অন্যান্য বৈষ্ণবগণ মুকুন্দের কীর্ত্তন শুনতে বড় ভালবাসতেন। শ্রীমুকুন্দ অদ্বৈত সভায় প্রতিদিন যেতেন এবং কীর্ত্তন করতেন। মুকুন্দের ভক্তিরসময় কীর্ত্তন শুনে বৈষ্ণবগণ প্রেমে গড়াগড়ি দিতেন। অদ্বৈত আচার্য্য মুকুন্দকে ক্রোড়ে নিয়ে প্রেমাশ্রু-সিক্ত করতেন। শ্রীঈশ্বর পুরীপাদ যখন নবদ্বীপে আগমন করেন শ্রীমুকুন্দ দত্তের গান শুনে তিনিও অতিশয় প্রেমাবিষ্ট হয়ে পড়েন। তখনই সকলে চিনতে পারলেন, ইনি শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য শ্রীঈশ্বর পুরী।

মহাপ্রভু প্রথমে গয়াধামে প্রেম প্রকাশ আরম্ভ করেন। গৃহে ফিরে এলেন এবার নূতন ভাব নিয়ে—নিরন্তর কৃষ্ণাবেশ। ব্যাকরণ বা ন্যায় শাস্ত্রের আলোচনা একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন। ব্যাকরণের সমস্ত সূত্রে বা ধাতুতে কেবল কৃষ্ণ-নাম। বৈষ্ণবগণ তা'শুনে প্রভুকে দেখতে এলেন। প্রভু 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলে কেঁদে তাঁদের গলা জড়িয়ে ধরলেন। সকলে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন প্রভুর দিকে, কিন্তু প্রভুর নয়নে কৃষ্ণপ্রেমের অশ্রুধারা দেখে তাঁরাও 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। সন্ধ্যায় প্রভু নিজ গৃহে কীর্ত্তন সমারোহ করলেন। সমস্ত বৈষ্ণব এলেন। প্রথমে শ্রীমুকুন্দ দত্ত কীর্ত্তন ধরলেন। শ্রীগৌরসুন্দর শুনেই প্রেমাবিষ্ট হয়ে ভূতলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। আর ভক্তগণের যে প্রেমাবস্থা হল তা'কে বর্ণন করতে পারে? কিছু রাত্র এইরূপ কৃষ্ণ প্রেমানন্দে কেটে গেল।

অতঃপর প্রভু মুকুন্দের কণ্ঠ জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন— "মুকুন্দ! তুমি ধন্য, আমি মিথ্যা বিদ্যারসে সময় অতিবাহিত করেছি। কৃষ্ণ না পেয়ে আমার জন্ম বৃথা গেল।"

একদিন শ্রীগদাধর পণ্ডিতকে শ্রীমুকুন্দ দত্ত বললেন—বৈষ্ণব দর্শন করবে? গদাধর পণ্ডিত বললেন "হাঁ বৈষ্ণব দর্শন করব"। মুকুন্দ বললেন—তবে আমার সঙ্গে এস। তোমাকে অদ্ভুত বৈষ্ণব দেখাব। গদাধর পণ্ডিত চললেন বৈষ্ণব দর্শন করতে। মুকুন্দ তাঁকে নিয়ে গেলেন শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির সন্নিধানে। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ও মুকুন্দ এক স্থানে চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন। মুকুন্দ বললেন—গদাধর এঁনার মত বৈষ্ণব পৃথিবীতে দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ। শ্রীগদাধর দেখলেন-- শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি দুগ্ধফেননিভ শয্যার উপর বসে তাম্বুল চর্ব্বণ করছেন। ভৃত্যগণ চামর পাখা ব্যজন করছে। যেন রাজকুমার বিজয় করছেন। গদাধর

পণ্ডিত দেখে অবাক, এ আবার কেমনতর বৈষ্ণব? মহা বিলাসিদের ন্যায় অবস্থান করছেন? শ্রীগদাধর পণ্ডিত আজন্ম বৈরাগ্যশীল। মুকুন্দ গদাধরের ভাব গতিক বুঝতে পারলেন--তখন তিনি ভাগবতের একটি শ্লোক গীতাকারে মধুর রাগিনী যোগে গান আরম্ভ করলেন। ''অহো বকী যং স্তনকালকূটং'' ভাঃ ৩/২/২৩। মুকুন্দের সে মধুর গীত শ্রবণ করেই শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রেমাবিষ্ট হয়ে 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলে প্রেমাশ্রু বর্ষণ করতে লাগলেন, বিদ্যানিধির অঙ্গে যুগপৎ অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার প্রকাশিত হল। কখনও উচ্চ রোদন করতে লাগলেন, কখনও ভূ তলে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। তখন কোথায় সে দিব্য শয্যা? কোথায় দিব্য বেশ? সমগ্র শরীর ধূলিময় হল। শ্রীগদাধর পণ্ডিত নির্ব্বাক ও স্তম্ভিত হলেন। বিস্ফারিত নেত্রে চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়িয়ে কেবল দেখতে লাগলেন।

শ্রীগদাধর পণ্ডিত মনে মনে বলতে লাগলেন—মুকুন্দ ত' ঠিকই বলেছিল; এমন বৈষ্ণব ত' পূর্ব্বে কোনদিন দেখি নি, কিম্বা এমন বৈষ্ণবের কথা কারও মুখে শুনি নি। আমি কি শুভক্ষণে এনাকে দেখতে এসেছি। এনাকে দর্শনের আগে তাঁর সম্বন্ধে অন্য রকম মনে করে অপরাধ করেছি। মুকুন্দ! তুমি বন্ধুর কার্য্য করেছ। এমন বৈষ্ণব ত্রিলোকে আছে তা' জানতাম না। ওনার দর্শনে আমি পবিত্র হলাম। আমি তাঁকে বিষয়ীর পরিচ্ছদে দেখে বিষয়ী বলে মনে করেছিলাম। কিন্তু তুমি মহাপরাধ থেকে আমাকে রক্ষা করলে। আমার অপরাধ হয়েছে, আমি যাতে তাঁর চরণ আশ্রয় করে সে অপরাধ থেকে মুক্তি পাই তুমি তার ব্যবস্থা কর।

শ্রীগৌর- নিত্যানন্দের যাবতীয় বিলাস, নৃত্য, কীর্ত্তন—শ্রীমুকুন্দ দত্ত সমস্ত জায়গায় প্রসিদ্ধ গায়ক। একদিন শ্রীগৌরসুন্দর সাত প্রহর কাল পর্য্যন্ত মহাভাব প্রকাশ করলেন। এদিন ভক্তগণকে ডেকে ডেকে তাঁর পূর্ব্ব বিবরণ বলে তাঁদের কৃপা করতে লাগলেন। এরূপে ভক্তগণ মহাপ্রভুর কৃপা পাচ্ছেন ও অভীষ্ট বর গ্রহণ করছেন। প্রায় সমস্ত ভক্তকে ডাকলেন, কিন্তু মুকুন্দকে ডাকলেন না। মুকুন্দ গৃহের বাইরে বসে প্রভুর ডাকের অপেক্ষা করছেন। শ্রীবাসাদি ভক্তগণ দেখলেন প্রভু মুকুন্দকে ডাকছেন না; তাঁর অভীষ্ট বর দিচ্ছেন না। মুকুন্দ প্রভুর কৃপা পাবার জন্য অস্থির চিত্তে অবস্থান করছেন। শ্রীবাসের হৃদয় তাঁর জন্য আকুল, তিনি সইতে না পেরে কাছে গিয়ে জানালেন—তুমি দীন-হীন সকলকে কৃপা করছ। মুকুন্দকে ডাকছ না কেন? অভীষ্ট বর দিচ্ছ না কেন?

প্রভু বললেন—ও বেটার কথা আমায় বল না।

শ্রীবাস—ও কি অপরাধ করেছে?

শ্রীগৌরসুন্দর—ও বেটা খড় জাঠিয়া—আমার কৃপা পাবে না। কখনও দন্তে তৃণ ধারণ করে, কখনও বা জাঠি মারে।

শ্রীবাস—প্রভো! সে কি অন্যায় করেছে তা বুঝতে পারলাম না।

শ্রীগৌরসুন্দর—ও যখন নির্ব্বিশেষ জ্ঞানীর সভায় যায় তখন তাদের সমর্থন করে। আবার যখন ভক্ত সমাজে যায় তখন প্রেম দেখিয়ে কেঁদে গড়াগড়ি দেয়। যারা আমার স্বরূপ অবজ্ঞা করে তারা আমাকে জাঠি মারে। যারা আমার স্বরূপের প্রতি ভক্তি দেখায় তারা আমাকে সুখী করে। যারা কখনও নিন্দা করে, কখনও স্তুতি করে, তারা 'খড় জাঠিয়া'; আমার কৃপা পায় না।

শ্রীমুকুন্দ দত্ত প্রভুর এ কথা শুনে অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে বললেন—এ শরীর আর রাখব না। অপরাধী শরীর ধারণ করে কি হবে? শ্রীবাস পণ্ডিত আবার প্রভুর কাছে এলেন এবং মুকুন্দের

দুঃখের কথা জানালেন। প্রভু বললেন—মুকুন্দ কোটি জন্মের পর দর্শন ও কৃপা পাবে। কোটি জন্ম পরে প্রভুর দর্শন কৃপা পাবেন। মুকুন্দ শুনে আনন্দে নৃত্য করে গাইতে লাগলেন—"কোটি জন্ম পরে হে, কোটি জন্ম পরে হে, দরশন হবে রে, দরশন হবে রে।।" অঙ্গনে নৃত্য করতে করতে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। ভক্তবৎসল শ্রীগৌরহরি আর স্থির থাকতে পারলেন না। ভক্তের প্রেমে চঞ্চল হয়ে উঠলেন, শ্রীবাসকে বললেন—মুকুন্দকে শীঘ্রই আমার কাছে নিয়ে এস, ওর কোটি জন্ম হয়ে গেছে, দর্শন করুক। শ্রীবাস বললেন—মুকুন্দ! তুমি স্থির হও, প্রভু তোমাকে ডাকছেন; মুকুন্দ প্রেমে আত্মহারা, কেবল বলছেন—দরশন পাব হে, কোটি জন্মে দরশন হবে রে। দু'নয়ন জলে বক্ষস্থল সিক্ত হচ্ছে। শ্রীবাস পণ্ডিত দেখলেন মুকুন্দ প্রেমে আত্মহারা। তাঁর বাহ্য স্মৃতি নাই। অঙ্গে হস্ত দিয়ে তাই ডাকতে লাগলেন—মুকুন্দ! মুকুন্দ! স্থির হও—স্থির হও, প্রভু তোমাকে ডাকছেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের স্পর্শে এবার মুকুন্দের চৈতন্য ফিরে এল। বললেন—পণ্ডিত! কি বলছেন? 'প্রভু তোমাকে ডাকছেন।' আমি পাপ দেহ নিয়ে প্রভুর কাছে যাব না, কেঁদে কেঁদে কোটি জন্ম কাটাব। অন্তর্য্যামী প্রভু সব বুঝতে পারলেন। তখন স্বয়ং ডাকতে লাগলেন মুকুন্দ! মুকুন্দ! এস—এস—আমার দিব্যরূপ দেখ। শ্রীবাস পণ্ডিত মুকুন্দকে ধরে প্রভুর শ্রীচরণে নিয়ে এলেন। মুকুন্দ অশ্রু-নীরে ভাসতে ভাসতে বললেন, "হে প্রভো, আমি মহাপরাধী" বলে ধরাতলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন এবং গড়াগড়ি দিয়ে বলতে লাগলেন—

ভক্তি না মানিলুঁ মুঞি এই ছার মুখে।
দেখিলেই ভক্তি-শূন্য কি পাইব সুখে।।
বিশ্বরূপ তোমার দেখিল দুর্য্যোধন।
যাহা দেখিবারে বেদে করে অন্বেষণ।।
দেখিয়াও সবংশে মরিল দুর্য্যোধন।
না পাইল সুখ ভক্তি শূন্যের কারণ।।

চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ১০/২১৫-২১৭

এ সব কথা বলে মুকুন্দ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করতে লাগলেন। তখন প্রভু তাঁকে ভূমি থেকে উঠিয়ে আলিঙ্গন করে বললেন— মুকুন্দ! কোটি জন্ম পরে তুমি আমার দর্শন পাবে বলেছিলাম, কিন্তু তোমার দৃঢ় বিশ্বাস, অকপট শ্রদ্ধা হেতু কোটি জন্ম তিলার্দ্ধেকের মধ্যেই কেটে গেছে। তুমি আমার নিত্য প্রিয়পাত্র। তোমার কোন অপরাধ নাই। জগতকে শিক্ষা দেবার জন্য ঐ লীলা করেছি। বস্তুতঃ তোমার শরীর ভক্তিময়। তুমি আমার নিত্য দাস, তোমার জিহ্বায় আমার নিত্য বসতি।

"আমার যেমন তুমি বল্লভ একান্ত।
এই মত হউ তোরে সকল মহান্ত।।
যেখানে যেখানে হয় মোর অবতার।
তথায় গায়ন তুমি হইবে আমার।।"

চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ১০/২৫৯-২৬০

শ্রীমুকুন্দের প্রতি প্রভু যখন এ-বর দিলেন তখন বৈষ্ণবগণ মহা 'হরি' 'হরি' ধ্বনি করে উঠলেন।

মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের সময় মুকুন্দ কীর্ত্তন করেন। "করিলেন মাত্র প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ। মুকুন্দেরে আজ্ঞা হৈল করিতে কীর্ত্তন।। 'বোল' 'বোল' বলি' প্রভু আরম্ভিলা নৃত্য। চতুর্দ্দিকে গাইতে লাগিলা সব ভৃত্য।।" (চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ১/৮-৯)।

মহাপ্রভু যখন নীলাচলে অবস্থান করতেন তখনও শ্রীমুকুন্দ দত্ত তাঁর সঙ্গে থাকতেন এবং তাঁকে কীর্ত্তন শোনাতেন। রথ যাত্রাকালে বাসুদেব দত্ত, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীমুরারি ও শ্রীমুকুন্দ প্রমুখ ভক্তদের এক কীর্ত্তন দল গঠিত হত। নীলাচলে জগন্নাথদেবের রথযাত্রার সময় শ্রীজগন্নাথের অগ্রে যে সাত সম্প্রদায়ের সংকীর্ত্তন হত, তার তৃতীয়

সম্প্রদায়ের মূল কীর্ত্তনীয়া ছিলেন মুকুন্দ, নর্ত্তক হরিদাস ঠাকুর। মুকুন্দ ও কাশীশ্বর পণ্ডিত দু'জন মহা শক্তিমান্ পুরুষ ছিলেন। তারা রথ যাত্রার সময় লোকের ভিড় ঠেলে মহাপ্রভুকে শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শনের ব্যবস্থা করে দিতেন।

মহাপ্রভুর প্রতি মুকুন্দের যে কি রকম গাঢ় প্রীতি তা মহাপ্রভুর উক্তিতেই জানা যায়—

মুকুন্দ হয়েন দুঃখী দেখি' সন্ন্যাস-ধর্ম্ম।
তিনবারে শীতে স্নান, ভূমিতে শয়ন।।
অন্তরে দুঃখী মুকুন্দ, নাহি কহে মুখে।
ইহার দুঃখ দেখি' মোর দ্বিগুণ হয়ে দুঃখে।।

চৈঃ চঃ মঃ ৭/২৩-২৪

জ্যৈষ্ঠী-পূর্ণিমা শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা তিথিতে শ্রীমুকুন্দ দত্ত ঠাকুরের তিরোভাব হয়।

**।। জয় শ্রীমুকুন্দ দত্ত ঠাকুর কি জয়।।**

# শ্রীবাসুদেব বিপ্র

শ্রীবাসুদেব বিপ্র দক্ষিণ দেশ নিবাসী মহাপ্রভুর পরম ভক্ত ছিলেন।

''তবে ত' করিলা প্রভু দক্ষিণ গমন।
কূর্ম্মক্ষেত্রে কৈল বাসুদেব বিমোচন।।"

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ 'কূর্ম্মক্ষেত্র' বা 'কূর্ম্মস্থান' সম্বন্ধে এরূপ লিখেছেন—''বি-এন্-আর্ লাইনে গঞ্জাম জেলায় চিকাকেলি রোড ষ্টেশন হইতে ৮ মাইল পূর্ব্বে কূর্ম্মাচলম্ বা 'শ্রীকূর্ম্মম্'। ইহা তেলেগু ভাষীগণের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ্য তীর্থ। তথায় কূর্ম্মমূর্ত্তি বিরাজমান। শ্রীরামানুজ যেকালে একাদশ শকশতাব্দীতে কূর্ম্মাচলে শ্রীজগন্নাথদেব কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হন, তখন কূর্ম্মমূর্ত্তিকে তিনি শিবমূর্ত্তি জ্ঞান করায় উপবাস করেন। পরে তাঁহাকে বিষ্ণুমূর্ত্তি জানিয়া কূর্ম্মদেবের সেবা প্রকাশ করেন।"

গঞ্জাম জেলা ওড়িষ্যার অন্তর্গত। বর্তমানে চিকাকোল রোডের পরিবর্তে ষ্টেশনের নাম 'শ্রীবাকুলাম রোড' হয়েছে। এটি অন্ধ্রপ্রদেশের অন্তর্ভূক্ত বি-এন্-আর্ এর পরিবর্তে 'দক্ষিণ পূর্ব্বরেল' (South Eastern Railway) এই নাম হয়েছে।

মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশে ভ্রমণকালে 'কূর্ম্ম' নামক বিপ্রকে ধন্য করেছিলেন। মহাপ্রভু কূর্ম্ম বিপ্রের গৃহে অবস্থান করছেন জেনে বাসুদেব বিপ্র সেখানে উপস্থিত হলেন। তাঁর সর্ব অঙ্গে গলিত কুষ্ঠ। যখন শুনলেন যে মহাপ্রভু 'কূর্ম্ম' বিপ্রের গৃহে নেই, তিনি অন্যত্র গমন করেছেন, অমনি তিনি অতীব দুঃখী হয়ে ভূমিতে মূর্চ্ছিত হলেন। ভক্তবৎসল পরম করুণাময় সর্ব্বান্তর্য্যামী মহাপ্রভু অনেক দূর পথ অতিক্রম করলেও সেখান থেকে ফিরে এসে বাসুদেব বিপ্রকে

দর্শন দিয়ে আলিঙ্গন করলেন। মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গের স্পর্শে বিপ্রের কুষ্ঠব্যাধি দূর হল, তিনি পরমসুন্দর সুপুরুষ হলেন।

ভগবান সর্বত্রই বিরাজ করেন। তাঁর জন্য ব্যাকুলতা থাকলেই তাঁকে পাওয়া যায়। তিনি শুধুমাত্র ভক্তির দ্বারা বশীভূত হন। পার্থিব কোন যোগ্যতা বা গুণ তিনি দেখেন না। বাসুদেব বিপ্রের ভীষণ গলিত কুষ্ঠব্যাধিকে অগ্রাহ্য করে তিনি তাঁকে আলিঙ্গন করলেন।

বাসুদেব বিপ্রের অদ্ভুত চরিত্র। তাঁর সর্ব অঙ্গে গলিত কুষ্ঠ, শরীরের মধ্যে পোকা ভর্ত্তি, পোকাগুলি পূজরক্ত খেতে খেতে পড়ে গেলে তিনি সেগুলিকে আবার উঠিয়ে যথাস্থানে রাখতেন। তাঁকে দেখলে দুর্গন্ধে লোক দূর থেকে পলায়ন করতেন। কিন্তু স্বতন্ত্র ঈশ্বর মহাপ্রভু কৃপাবিষ্ট হয়ে তাঁকে শুধু স্পর্শ নয় আলিঙ্গন পর্য্যন্ত করলেন।

বাসুদেব গলৎকুষ্ঠী, তাতে অঙ্গ কীড়াময়।
তারে আলিঙ্গন কৈলা হঞা সদয়।।
আলিঙ্গিয়া কৈলা তার কন্দর্প-সম অঙ্গ।
বুঝিতে না পারি তোমার কৃপার তরঙ্গ।।

চৈঃ চঃ

বাসুদেব বিপ্র সুন্দর শরীর লাভ করে ভীত হলেন, যদি অভিমান এসে তাঁর পতন ঘটায়; এই আশঙ্কায়। অভিমানী ব্যক্তি কৃষ্ণকৃপা হতে বঞ্চিত হয়। অভিমানদৃপ্ত ব্যক্তি কৃষ্ণকীর্ত্তনে অনধিকারী। চৈঃ চঃ মঃ ৭/১৪৪-১৪৬

মহাপ্রভু বাসুদেব বিপ্রকে শ্রেষ্ঠ অধিকারী বিবেচনা করে তাঁকেই জীব-উদ্ধারের জন্য আচার্য্যের কার্য্য করতে আদেশ করলেন—

"প্রভু কহে,—কভু তোমার না হবে অভিমান।
নিরন্তর কহ তুমি 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' নাম।।
কৃষ্ণ উপদেশি কর জীবের নিস্তার।
অচিরাত কৃষ্ণ তোমা করিবেন অঙ্গিকার।।

........................

যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ' উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ।।

চৈঃ চঃ মঃ ৭/১২৮

ধন্যং তং নৌমি চৈতন্যং বাসুদেবং দয়ার্দ্রধীঃ।
নষ্টকুষ্ঠং রূপপুষ্টং ভক্তিতুষ্টং চকার যঃ।।

যিনি দয়ার্দ্রবুদ্ধি হয়ে 'বাসুদেব' নামক বিপ্রকে কুষ্ঠরোগ হতে মুক্ত করে সুন্দররূপে পুষ্ট করে ভক্তিতুষ্ঠ করেছিলেন, সেই ধন্য চৈতন্যদেবকে আমি নমস্কার করি।

**।। জয় শ্রীবাসুদেব বিপ্র কি জয়।।**

# শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর

শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় লিখিত আছে—ব্রজে যাঁরা মধুকণ্ঠ ও মধুব্রত নামে গায়ক ছিলেন, এখন সেই দু'জন মুকুন্দ ও বাসুদেব দত্ত নামে শ্রীগৌরাঙ্গের গায়ক হয়েছেন।

ব্রজে স্থিতৌ গায়কৌ যৌ মধুকণ্ঠ মধুব্রতৌ।
মুকুন্দ বাসুদেবৌ তৌ দত্তৌ গৌরাঙ্গ-গায়কৌ।।

গৌঃ গঃ দীঃ ১৪০

বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের জন্ম হয়েছিল পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার অন্তর্গত ছন্হরা গ্রামে। 'ছন্হরা' গ্রাম থেকে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির শ্রীপাট 'মেঘলাগ্রাম' দশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। শ্রীমুকুন্দ দত্ত ও বাসুদেব দত্ত দুই ভাই। প্রেমবিলাসমতে ইনি অম্বষ্ঠকুলোদ্ভুত এবং মুকুন্দ দত্তের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন।

'চট্টগ্রামদেশে চক্রশালা গ্রাম হয়।
সম্ভ্রান্ত দত্ত অম্বষ্ঠ তাহে খ্যাত হয়।।
সেই বংশে জনমিলা দুই ভাগবত।
শ্রীমুকুন্দ দত্ত আর বাসুদেব দত্ত।।
বাসুদেব জ্যেষ্ঠ, মুকুন্দ কনিষ্ঠ হন।
দুই আসি বাস নবদ্বীপে করিলেন।।

সুকণ্ঠগায়ক ও সঙ্গীতশাস্ত্র বিশারদ শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুর মহাপ্রভুর কীর্ত্তনবিলাসে ও নগর সংকীর্ত্তনে যোগদানকারী প্রধান পার্ষদগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। বাসুদেব দত্তের বৈষ্ণবোচিত গুণে আকৃষ্ট হয়ে মহাপ্রভু তাঁর সঙ্গ প্রার্থনা করতেন। মহাপ্রভু বলতেন—

'যদ্যপি মুকুন্দ আমা সঙ্গে শিশু হইতে।
তাহা হইতে অধিক সুখ তোমারে দেখিতে।।

চৈঃ চঃ মধ্য ১১/১৩৮

শ্রীবাসপণ্ডিত ও শিবানন্দ সেনের সাথে বাসুদেব দত্তের বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল। ইনি কিছুদিন তাদের সাথে কুমারহট্টে (কাঁচড়াপাড়ায়) বাস করেছিলেন। বাসুদেব দত্ত অত্যন্ত উদারচেতা ছিলেন। তিনি সর্বদা নিজের জন্য চিন্তারহিত থাকতেন। উদারহস্তে ব্যয় করতেন। কখনো সঞ্চয় করতেন না। তাই শ্রীমহাপ্রভু শিবানন্দ সেনকে তাঁর 'সরখেল' অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক রূপে নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি একদিন মহাপ্রভুকে বলেছিলেন,—"প্রভু জীবের দুঃখ দূর্দ্দশা দেখে আমার ভাল লাগে না। তুমি সকল জীবকে উদ্ধার কর। তাদের হয়ে আমি অনন্তকাল নরকে থাকতে প্রস্তুত আছি।

জগৎ তারিতে প্রভু তোমার অবতার।
মোর নিবেদন এক করহ অঙ্গীকার।।
করিতে সমর্থ, তুমি হও দয়াময়।
তুমি মন কর, তবে অনায়াসে হয়।।
জীবের দুঃখ দেখি' মোর হৃদয় বিদরে।
সর্ব্বজীবের পাপ প্রভু দেহ' মোর শিরে।।
জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরক ভোগ।
সকল জীবের, প্রভু, ঘুচাহ ভবরোগ।।

—চৈঃ চঃ মঃ ১৫/১৬০-১৬৩

"জগতে যতেক জীব, তার পাপ লঞা।
নরক ভুঞ্জিতে চাহে জীব ছাড়াইয়া।।"

চৈঃ চঃ আঃ ১০/৪২

বাসুদেব দত্তের অদ্ভুত জীবদুঃখকাতর কথা শুনে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হয়ে বলেছিলেন—

ব্রহ্মাণ্ড-জীবের তুমি বাঞ্ছিলে নিস্তার।
বিনা পাপ-ভোগে হবে সবার উদ্ধার।।

অসমর্থ নহে কৃষ্ণ, ধরে সর্ব্ব বল।
তোমাকে বা কেনে ভুঞ্জাইবে পাপ-ফল?

চৈঃ চঃ মঃ ১৫/১৬৭-১৬৮

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অনুভাষ্যে লিখেছেন– 'পাশ্চাত্ত্যরাজ্যে খৃষ্ট ভক্তগণের মধ্যে বিশ্বাস যে, তাঁহাদের গুরু একমাত্র মহামতি যীশুখৃষ্টই জীবের সর্ব্বপাপভার গ্রহণে প্রস্তুত হইয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; কিন্তু গৌরপার্ষদগণমধ্যে শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর শ্রীহরিদাসের ন্যায় তদপেক্ষা অনন্ত কোটীগুণে অধিকতর উন্নত ও উদার সার্ব্বজনীন বিশ্ববৈষ্ণবপ্রেম ভাব জগজ্জীবকে শিক্ষা দিলেন।'

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর দীক্ষাগুরু শ্রীযদুনন্দন আচার্য্য বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়ে কৃতার্থ হয়েছিলেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবত রচয়িতা শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের আবির্ভাবস্থলী মামগাছিতে শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীমদনগোপাল বিগ্রহ আজও সম্পূজিত হচ্ছেন।

শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কত প্রিয় ছিলেন, তা কুমারহট্টে (বর্ত্তমান হালিশহরে) শ্রীবাসগৃহে অবস্থানকালে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উক্তি হতে জানা যায়–

আপনে শ্রীগৌরচন্দ্র বলে বার বার।
''এ শরীর বাসুদেব দত্তের আমার।।
দত্ত আমা' যথা বেচে, তথায় বিকাই।
সত্য সত্য ইহাতে অন্যথা কিছু নাই।।
বাসুদেব দত্তের বাতাস যার গায়।
লাগিয়াছে, তাঁরে কৃষ্ণ রক্ষিবে সদায়।।''

চৈঃ ভাঃ অঃ ৫/২৭-৩০

**।। জয় গৌরপ্রিয় শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর কি জয়।।**

# শ্রীল হরিদাস ঠাকুর

গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় বর্ণনা আছে–ঋচীক মুনির পুত্র মহাতপা ব্রহ্মা প্রহ্লাদের সহিত মিলিত হয়ে কলিযুগে হরিদাস রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন।

ঋচীকস্য মুনেঃ পুত্রো নাম্না ব্রহ্মা মহাতপাঃ।
প্রহ্লাদেন সমং জাতো হরিদাসাখ্যকোঽপি সন্।।
গৌঃ গঃ ৯৩

মুরারীগুপ্তের রচিত চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণনা আছে–কোন এক মুনিকুমার তুলসীপত্র চয়ন করে না ধূয়েই ভগবৎ সেবার নিমিত্ত পিতাকে অর্পণ করলে পিতা তাকে অভিশাপ প্রদান করেন। পিতার অভিশাপগ্রস্ত সেই মুনিকুমার এখন হরিদাস রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। (গৌঃ গঃ ৯৪,৯৫)

শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (৫/১২৬-১৩৬) গ্রন্থে লিখেছেন--

গোবৎস গোপাল সব করিয়া হরণ।
ছলিল করিয়া মায়া গোবিন্দের মন।।
নিজ মায়া-পরাজয় দেখি' চতুর্মুখ।
নিজ-কার্যদোষে বড় পাইল অসুখ।।
বহু স্তব করি' কৃষ্ণে করিল মিনতি।
ক্ষমিল তাহার দোষ বৃন্দাবনপতি।।

ব্রহ্মার তপস্যা করার কারণ –

তবু ব্রহ্মা মনে মনে করিল বিচার।
ব্রহ্মবুদ্ধি মোর হয় অতিশয় ছার।।
এই বুদ্ধি-দোষে কৃষ্ণপ্রেমেতে রহিত।
ব্রজলীলা-রসভোগে হইনু বঞ্চিত।।
গোপাল হইয়া জন্ম পাইতাম আমি।
সেবিতাম অনায়াসে গোপিকার স্বামী।।
সে লীলারসেতে মোর না হইল গতি।
এবে শ্রীগৌরাঙ্গে মোর না হয় কুমতি।।
এই বলি' বহুকাল অন্তর্দ্বীপ-স্থানে।
তপস্যা করিল ব্রহ্মা, রহিল ধেয়ানে।।

ব্রহ্মার গৌরদর্শন –

কতদিনে গৌরচন্দ্র করুণা করিয়া।
চতুর্মুখ-সন্নিধানে কহেন আসিয়া।।
ওহে ব্রহ্মা, তব তপে তুষ্ট হ'য়ে আমি।
আসিলাম দিতে যাহা আশা কর তুমি।।
নয়ন মেলিয়া ব্রহ্মা দেখি' গৌররায়।
অজ্ঞান হইয়া ভূমি পড়িল তথায়।।

ব্রহ্মা নানাভাবে মহাপ্রভুর স্তবস্তুতি করলেন। প্রার্থনা জানালেন–'হে প্রভু! যেন ব্রহ্মবুদ্ধি দূর করে তোমার গৌরলীলার সহায়ক হতে পারি। তখন মহাপ্রভু বললেন–

ব্রহ্মার প্রার্থনা শুনি' গৌর ভগবান্।
'তথাস্তু' বলিয়া বর করিলেন দান।।
যে সময়ে মম লীলা প্রকট হইবে।
যবনের গৃহে তুমি জনম লভিবে।।
আপনাকে হীন বলি' হইবে গেয়ান।
হরিদাস হ'বে তুমি শূন্য-অভিমান।।
তিন লক্ষ হরিনাম জিহ্বাগ্রে নাচিবে।
নির্যাণ-সময়ে তুমি আমাকে দেখিবে।।
নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৫/১৪৫-১৪৮

শ্রীহরিদাস ঠাকুর নিত্যসিদ্ধ ভগবদ্-পার্ষদ। তিনি যশোর জেলায় বুঢ়ন গ্রামে যবন কুলে আবির্ভূত হন। খুলনা জেলার মধ্যে সাতক্ষীরা মহকুমায় বুঢ়ন নামে একটি পরগনা আছে। বুঢ়ন গ্রামটি কোথায় এটি

সুনিশ্চিতভাবে নির্ণয় করা যায় না। কারও মতে বুঢ়ন গ্রামটি ২৪ পরগনা জেলায়। কারও মতে যশোহর জেলায় অবস্থিত ছিল। বর্তমানে এটি বাংলাদেশে অবস্থিত। ''কারও মতে হরিদাস ঠাকুর ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হয়েছিলেন। পিতার নাম সুমতি এবং মাতার নাম গৌরী। শৈশবে মাতা-পিতাকে হারিয়ে বুঢ়ন গ্রাম হতে ২ ক্রোশ দূরে সালাই নদীর অপরপারে হালিমপুর গ্রামে খাঁ সাহেবদের গৃহে তিনি লালিত পালিত হন।" শ্রীঅদ্বৈতবিলাস গ্রন্থ মতে –''শ্রীল হরিদাস ঠাকুর ১৩৭২ শকে অগ্রহায়ন মাসে খানাউল্লা কাজীর গৃহে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। শৈশবেই তাঁর পিতা-মাতা মারা যায়।"

অদ্বৈতবিলাস গ্রন্থ মতে হরিদাস ঠাকুরের আবির্ভাবকাল ১৩৭২ শকাব্দ আর মহাপ্রভুর আবির্ভাব ১৪০৭ শকাব্দ। অতএব হরিদাস ঠাকুর মহাপ্রভুর থেকে বয়সে ৩৫ বছর বড় ছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর থেকে বয়সে ১২ বছর বড় ছিলেন। অতএব হরিদাস ঠাকুর নিত্যানন্দ প্রভুর থেকে বয়সে ২৩ বছরের বড় ছিলেন। অনুমান করা হয় যখন শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের বয়স পঞ্চাশ বছর, তখন তিনি মহাপ্রভুর সঙ্গী হয়েছিলেন।

ভগবান্ বা তাঁর পার্ষদগণ যে কুলেই অবতীর্ণ হন, তাঁরা নিত্য পূজ্য। যেমন গরুড় পক্ষীকুলে, হনুমান কপিকুলে তেমনি শ্রীহরিদাস যবন কুলে অবতীর্ণ হয়েছেন। জন্ম থেকে শ্রীহরিদাসের শ্রীকৃষ্ণ-নামের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তিনি কিছু দিন পরে গঙ্গাতীরবর্তী ফুলিয়ায় এসে ভজন করতে লাগলেন। তাঁর সঙ্গ পেয়ে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য অতিশয় সুখী হলেন। গোবিন্দ-প্রেমরসে দুই জন ভাসতে লাগলেন। ফুলিয়াবাসী ব্রাহ্মণগণ শ্রীহরিদাসের নাম ভজন দেখে বড়ই সুখী হলেন। তাঁর দর্শনের জন্য প্রতিদিন তাঁরা আসতে লাগলেন।

ক্রমে ক্রমে শ্রীহরিদাসের মহিমা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এসব দেখে সেখানকার শাসক কাজী হিংসানলে জ্বলে উঠল এবং শ্রীহরিদাসকে শায়েস্তা করার জন্য মুলুকের পতি যবন রাজের কাছে গিয়ে সব কিছু জানাল।

''যবন হৈয়া করে হিন্দুর আচার।
ভালমতে তারে আনি' করহ বিচার।।
পাপীমতির বচন শুনি' সেই পাপ মতি।
ধরি' আনাইল তানে অতি শীঘ্রগতি।।"
–চৈঃ ভাঃ আদি ১৬/৩৭-৩৮

কাজী বললেন–হরিদাস যবন হয়ে হিন্দুর আচার করছে। অতএব তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া দরকার। পাপীর বচনে পাপমতি যবনরাজ তৎক্ষণাৎ শ্রীহরিদাসকে ধরে কারাগারে বন্দি করলেন। কারাগারের বন্দীগণ আগে থেকেই হরিদাসের মহিমা জানতেন। তারা মনে করলেন হরিদাস ঠাকুরের ন্যায় মহাপুরুষের দর্শনে তাদের কারামুক্তি হবে। তাই সকলে হরিদাসকে প্রণাম করে আশির্বাদ প্রার্থনা করলেন। হরিদাস ঠাকুর বললেন–'থাক থাক এখন আছহ যেন রূপে।'

একথা শুনে বন্দীগণ দুঃখী হলেন। তাদের মনের ভাব বুঝতে পেরে হরিদাস ঠাকুর বললেন। শোন! আমি তোমাদের মন্দ আশির্বাদ করিনি।

এবে কৃষ্ণপ্রতি তোমা সবাকার মন।
যেন আছে এমতি থাকু সর্বক্ষণ।।

এখানে হিংসা নেই, বিদ্বেষ নেই। তোমরা সর্বক্ষণ মুক্তির জন্য মনে মনে শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করছ। কিন্তু যখনই মুক্তি পেয়ে যাবে, তখনই দুষ্ট লোকের সঙ্গ হবে, বিষয় চিন্তা মাথায় প্রবেশ করবে। আর–

''বিষয় থাকিতে কৃষ্ণপ্রেম নাহি হয়।
বিষয়ীর দূরে কৃষ্ণ জানিহ নিশ্চয়।।

বিষয়ে আবিষ্ঠ মন বড়ই জঞ্জাল।
স্ত্রী-পুত্র-মায়াজাল এই সব কাল।।
দৈবে কোন ভাগ্যবান সাধুসঙ্গ পায়।
বিষয়ে আবেশ ছাড়ি কৃষ্ণেরে ভজয়।।
বন্দিথাক হেন আশির্বাদ নাহি করি।
বিষয় পাসর অহর্নিশ বল হরি হরি।।

চৈঃ ভাঃ

অতএব চিন্তা করো না। আগামী ২-৩ দিনের মধ্যে তোমাদের মুক্তি হবে। তবে মুক্তির পরেও তোমরা নিরন্তর কৃষ্ণনাম করবে।

যবনরাজ হরিদাসকে বললেন–তুমি হরিনাম ত্যাগ করে কলমা উচ্চারণ কর। শ্রীহরিদাস ঠাকুর বললেন–''ঈশ্বর এক, নাম মাত্র ভেদ। হিন্দুর শাস্ত্র পুরাণ ও মুসলমানের শাস্ত্র কোরাণ। সেই প্রভু যাঁরে যেমন মতি দেন, তিনি তেমনি কর্ম্ম করেন।"

''এতেকে আমারে সে ঈশ্বর যেহেন।
লওয়াইছেন চিত্তে করি আমি তেন।।"

অতএব সেই পরমেশ্বর আমাকে যেমন করাচ্ছেন, আমি তেমনি করছি। কেউ হিন্দু হয়ে যবন হয়, কেউ আবার যবন হয়ে ঈশ্বর ভজন করে। হরিদাস ঠাকুরের এই কথা শুনে কাজী বলতে লাগলেন একে উচিত শাস্তি দেওয়া দরকার। নতুবা সমস্ত যবন জাতি হিন্দু হয়ে যাবে। কাজীর কথাশুনে মুলুকপতি শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে বলতে লাগলেন–ভাই! তুমি হরিনাম ত্যাগ করে নিজ ধর্মকথা বল। তা হলে তোমার কোন চিন্তা নাই। অন্যথা তোমাকে শাস্তি প্রদান করা হবে। তদুত্তরে শ্রীহরিদাস বললেন–

''খণ্ড খণ্ড হই দেহ যায় যদি প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়িব হরিনাম।।"

–চৈঃ ভাঃ আঃ ৬/৯৪

শ্রীহরিদাস ঠাকুরের এই দৃঢ়বাক্য শুনে কাজী বলতে লাগলেন–একে বাইশ বাজারে পিটিয়ে পিটিয়ে মারতে হবে। বাইশবাজারে মারলেও যদি না মরে, তবে বুঝব জ্ঞানীরা সত্য কথা বলে। দুষ্ট কাজীর পরামর্শে পাপমতি মুলুকপতি হরিদাস ঠাকুরকে বাইশবাজারে মারতে আদেশ দিলেন। অমনি যবনগণ হরিদাস ঠাকুরকে ধরে নিয়ে বাজারে বাজারে মারতে লাগল।

''কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্মরণ করেন হরিদাস।
নামানন্দে দেহ-দুঃখ না হয় প্রকাশ।।"

চৈঃ ভাঃ আদি ১৬/১০২

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজকে বধ করবার জন্য অসুরগণ অনেক চেষ্টা করেও যেমন অকৃতকার্য্য হয়েছিল ঠিক সেইভাবে যবনগণও হরিদাস ঠাকুরকে মারবার অনেক চেষ্টা করেও কিছু করতে পারল না। হরিদাস ঠাকুর নামানন্দে ডুবে আছেন। যবনগণ বুঝতে পারল শ্রীহরিদাস সাধারণ কোন ব্যক্তি নয়। তারা অনুনয় করে বলতে লাগল–''হরিদাস! আমরা বুঝতে পেরেছি, তুমি যথার্থ সাধু পুরুষ। তোমাকে কেউ কিছু করতে পারবে না। কিন্তু মুলুকপতি একথা বুঝবে না। তিনি আমাদের প্রাণ নাশ করবেন।"

শ্রীহরিদাস ঠাকুর যবনগণের কথা শুনে তখনই ধ্যানস্থ হলেন। তখন যবনগণ হরিদাসকে কাঁধে নিয়ে মুলুকপতির কাছে এল। মুলুকপতি মনে করলেন হরিদাস মরে গেছেন। তাই তিনি হরিদাসকে গঙ্গায় ফেলে দিতে বললেন। যবনগণ হরিদাসকে গঙ্গায় ফেলে দিল। হরিদাস ঠাকুর ভাসতে ভাসতে পুনঃ ফুলিয়া-ঘাটে এলেন এবং তটে উঠে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করতে লাগলেন। শ্রীহরিদাসের মহিমা দেখে মুলুকপতি যবনের মনে ভয় হল। যবনগণের সঙ্গে তিনি সেখানে গেলেন এবং তাঁর অপরাধের জন্য হরিদাস ঠাকুরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন।

''পীর জ্ঞান করি সবে কৈল নমস্কার।
সকল যবনগণ পাইল নিস্তার।।

—শ্রীচৈতন্য ভাগবত

শ্রীহরিদাস ঠাকুর যবনগণকে কৃপা করে ফুলিয়া-নগরে এলেন। এবার ভক্তগণের আনন্দের সীমা রইল না।

ফুলিয়ায় যে কুটীরে বসে তিনি হরিনাম করতেন তাঁর ভিটার গর্ত্তে এক বিষধর সর্প বাস করত। তার বিষের জ্বালায় ভক্তগণ বেশীক্ষণ সেখানে বসতে পারতেন না। একদিন ভক্তগণ হরিদাস ঠাকুরকে নাগের কথা বললেন। হরিদাস ঠাকুর ভক্তগণের দুঃখ দেখে নাগকে আহ্বান করে বললেন—

''সত্য যদি ইহাতে থাকেন মহাশয়।
তেঁহো যদি কালি না ছাড়েন এ আলয়।।
তবে আমি কালি ছাড়ি যাইমু সর্ব্বথা।''

—শ্রীচৈতন্যভাগবত

নাগরাজ হরিদাস ঠাকুরের এই আদেশ শুনে তৎক্ষণাৎ গর্ত্ত থেকে বের হয়ে তাঁকে নমস্কার করে অন্যত্র চলে গেলেন। এই অদ্ভুত ঘটনা দর্শন করে ভক্তগণ অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হলেন। হরিদাস ঠাকুরের এই সমস্ত মহিমা দেখে ভক্ত ব্রাহ্মণগণের তাঁর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি জন্মাল।

যশোহর জেলায় হরিনদী নামে একটি গ্রামে শ্রীহরিদাস ঠাকুর শুভবিজয় করলেন। গ্রামটিতে ব্রাহ্মণের বসবাস বেশী। একদিন এক পাণ্ডিত্যাভিমানী পাষণ্ডী ব্রাহ্মণ সভামধ্যে শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে ডেকে বলতে লাগল—ওহে হরিদাস! তুমি হরিনাম উচ্চৈঃস্বরে কর কেন? শাস্ত্রে ত' মনে মনে করতে বলা হয়েছে। শ্রীহরিদাস ঠাকুর তদুত্তরে বললেন—

''পশু-পক্ষী-কীট আদি বলিতে না পারে।
শুনিলেই হরিনাম তারা সবে তরে।।
জপিলে শ্রীকৃষ্ণনাম আপনে সে তরে।
উচ্চ-সংকীর্তনে পর উপকার করে।।
অতএব উচ্চ করি কীর্ত্তন করিলে।
শত গুণ ফল হয় সর্ব্ব শাস্ত্রে বলে।।''

—চৈঃ ভাঃ আদি ১৬/২৮০-২৮২

শ্রীহরিদাস ঠাকুরের শ্রীমুখ থেকে এ সমস্ত বাস্তব সিদ্ধান্ত শ্রবণ করে সেই পাপমতি ব্রাহ্মণ অসহিষ্ণু হয়ে হরিদাসকে দেখিয়ে বলতে লাগল—কলিতে শূদ্রগণ বেদ পাঠ করবে, এখন ত' তাই দেখছি। শ্রীহরিদাস ঠাকুর এই সমস্ত কথা শ্রবণ করে নীরবে সভা ত্যাগ করলেন। কয়েকদিন পরে সেই দুষ্ট ব্রাহ্মণটির গলিত কুষ্ঠ হল। বৈষ্ণব অপরাধের ফল হাতে হাতে পেল।

''কলি যুগে রাক্ষস-সকল বিপ্র-ঘরে।
জন্মিবেক সুজনের হিংসা করিবারে।।''

চৈঃ ভাঃ আদি ১৬/৩০০

শ্রীহরিদাস বৈষ্ণব দর্শন ইচ্ছা করে নবদ্বীপে এলেন। তাঁকে দেখে বৈষ্ণবগণ আনন্দে আপ্লুত হলেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য হরিদাসকে প্রাণের সমান ভালবাসতেন। কোন সময় আচার্য্য পিতৃশ্রাদ্ধ-বাসরে সর্বাগ্রে বৈষ্ণব শ্রীহরিদাসকে ভোজন করালেন। হরিদাস অদ্বৈতাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করলেন,--মহান পণ্ডিত সমাজ থাকতে তুমি আমাকে অন্ন দান করছ কেন? উত্তরে আচার্য্য বলেন—

তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন।
এত বলি শ্রাদ্ধ পাত্র করাইলা ভোজন।।

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩/২২০

শ্রীহরিদাস ঠাকুর যশোহর জেলার অন্তর্গত বেনাপোল গ্রামে অবস্থান করতেন। তিনি দিবারাত্র তিন লক্ষ হরিনাম গ্রহণ করতেন। সেই জায়গায় অধ্যক্ষ ছিল রামচন্দ্র খাঁন। রামচন্দ্র খাঁন বড় পাষণ্ড প্রকৃতির লোক ছিল। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের প্রতিষ্ঠার কথা শুনে মাৎসর্য্যে তার চিত্ত জ্বলতে লাগল। কি

করে হরিদাসের মহিমা হ্রাস করা যায় চিন্তা করতে লাগল। খাঁনের অনেকগুলি বেশ্যা ছিল। খাঁন চিন্তা করল কোন বেশ্যাকে হরিদাসের কাছে পাঠিয়ে তাঁর পতন ঘটাতে হবে। পরমা সুন্দরী এক বেশ্যাকে নিযুক্ত করা হল। একরাত্রে বেশ্যাটি শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কুটীরে এল এবং তুলসী ও হরিদাসকে নমস্কার করে সামনে বসে বলতে লাগল–

''ঠাকুর, তুমি–পরমসুন্দর, প্রথম যৌবন।
তোমা দেখি' কোন্ নারী ধরিতে পারে মন।।
তোমার সঙ্গম লাগি, লুব্ধ মোর মন।
তোমা না পাইলে প্রাণ না যায় ধারণ।।"

চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৩/১১৩

ঠাকুর! তোমার সুন্দর যৌবন দেখে কোন্ নারী ধৈর্য্য ধারণ করতে পারে? তোমার সঙ্গ কামনা করে আমি এসেছি। একবার সঙ্গ দাও; নতুবা আমি প্রাণ ধারণ করতে পারব না।

হরিদাস কহে,–''তোমা করিমু অঙ্গীকার।
সংখ্যা-নাম-সমাপ্তি যাবৎ না হয় আমার।।
তাবৎ তুমি বসি' শুন নাম-সংকীর্ত্তন।
নাম সমাপ্তি হৈলে করিমু যে তোমার মন।।

শ্রীচৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৩/১১৪

শ্রীহরিদাস ঠাকুর সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন। সব কিছুই জানতে পারলেন। তিনি মহাভাগবত। এটি যে কৃষ্ণের পরীক্ষা তা বুঝতে তাঁর বাকী রইল না। তিনি বেশ্যাকে সুমধুর বাক্যে বললেন–তোমার বাসনা আমি পূর্ণ করব। আমার সংখ্যা নাম পূর্ণ হতে দাও। ততক্ষণ তুমি বসে নাম সংকীর্ত্তন শ্রবণ কর। শ্রীহরিদাস ঠাকুর বেশ্যাকে পাপী জ্ঞানে অনাদর করলেন না। কৃষ্ণের প্রেরণায় সে এসেছে, এই জ্ঞানে তিনি তাকে সমাদর করলেন। ভক্তগণ কখনও কোন জীবকে অনাদর করেন না।

''কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান সর্বজীবে জানি' সদা।
করবি সম্মান সবে আদরে সর্ব্বদা।।"

গীতাবলী

শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কথা অনুযায়ী বেশ্যা বসে বসে নাম কীর্ত্তন শুনতে লাগল। কীর্ত্তনে রাত শেষ হল। ভোর হয়েছে দেখে বেশ্যা ঘরে চলে গেলে, রামচন্দ্র খাঁনকে সব কথা বলল।

পরদিন রাত্রে বেশ্যা শ্রীহরিদাসের কুটীরে এসে তাঁকে নমস্কার করে বসল, তখন হরিদাস ঠাকুর বলতে লাগলেন--

''কালি দুঃখ পাইলা অপরাধ না লইবা মোর।
অবশ্য করিমু আমি তোমায় অঙ্গীকার।।
তাবৎ ইঁহা বসি, শুন নাম-সংকীর্ত্তন।
নাম পূর্ণ হৈলে, পূর্ণ হবে তোমার মন।।"

চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৩/১২০

কাল তুমি দুঃখ পেয়েছ। সেজন্য আমার কোন অপরাধ নিও না। আমি তোমার সঙ্গ অবশ্যই করব। যে পর্য্যন্ত আমার নাম সংখ্যা পূর্ণ না হয়, সে পর্য্যন্ত বসে বসে নাম-সংকীর্ত্তন শুন। বেশ্যা নাম-কীর্ত্তন শুনতে শুনতে হৃদয়ে এক পরম আনন্দ অনুভব করতে লাগল। রাত্রি শেষ হল। কিন্তু ঠাকুরের নাম শেষ হল না। ঠাকুর বললেন–আমি মাসে কোটি নাম গ্রহণ করবার ব্রত নিয়েছি। ব্রত শেষ হয়ে এল ভেবেছিলাম কিন্তু সমস্ত রাত্রি জপেও পূর্ণ করতে পারলাম না; মনে হয় কাল সমাপ্ত হবে। তখন তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে। বেশ্যা গৃহে ফিরে এল। পুনঃ সন্ধ্যাকালে সে হরিদাস ঠাকুরের কুটীরে গিয়ে বসল এবং নামকীর্ত্তন শুনতে লাগল।

শ্রীহরিদাস ঠাকুরের শ্রীমুখে হরিনাম শুনতে শুনতে বেশ্যার মন শুদ্ধ হল। সেও মাঝে মাঝে 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলতে লাগল। বেশ্যা মনে





মনে চিন্তা করতে লাগল—আমি কি মহাপাপ করবার জন্য এখানে এসেছি। এই মহাভাগবত সাধুর চরণে আমি মহা অপরাধ করতে বসেছি। এই অপরাধ ফলে কত কাল যে আমাকে ঘোরতর নরকে বাস করতে হবে জানি না। রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর। বেশ্যা অতি নির্বেদযুক্ত হ'য়ে সজল নয়নে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের চরণে দণ্ডবৎ হয়ে পড়ল এবং বহু অনুনয় বিনয় করতে লাগল। শ্রীহরিদাস ঠাকুর বলতে লাগলেন—তুমি গাত্রোত্থান কর। শ্রীহরি তোমাকে কৃপা করবেন। বেশ্যা গাত্রোত্থান করে সজল নয়নে রামচন্দ্র খাঁনের কথা বলল।

''ঠাকুর কহে—খাঁনের কথা সব আমি জানি।
অজ্ঞ মূর্খ সেই, তারে দুঃখ নাহি মানি।''

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত

আমি রামচন্দ্র খাঁনের কথা সব জানি। আমি সেই দিন চলে যেতাম। কেবল তোমার জন্য তিন দিন রইলাম। শ্রীহরিদাসের করুণাময় উক্তি শ্রবণে বেশ্যার দুনয়ন দিয়ে অশ্রুধারা বইতে লাগল। শ্রীহরিদাস ঠাকুর তারপর বললেন—ঘরের সমস্ত দ্রব্য ব্রাহ্মণগণকে দান করে এই কুটীরে এসে বাস কর। নিরন্তর হরিনাম কর ও তুলসী সেবা কর। তুমি অচিরাৎ শ্রীকৃষ্ণের চরণ পাবে।

শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কথামত বেশ্যা নিজগৃহের জিনিস পত্র সব ব্রাহ্মণকে দান করল। মাথা মুণ্ডন করে এক বস্ত্রে সেই কুটীরে বসে হরিনাম এবং তুলসী সেবা করতে লাগল।

''তুলসী সেবন করে, চর্ব্বণ, উপবাস।
ইন্দ্রিয়-দমন হৈল, প্রেমের প্রকাশ।।''

—চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ৩/১৪০

শ্রীহরিদাস ঠাকুর বেশ্যাকে কৃপা করে অন্যত্র চলে গেলেন। বেশ্যার পরম শুদ্ধ চরিত্র দেখে সকলে চমৎকৃত হলেন এবং শ্রীহরিদাস ঠাকুরের মহিমা গান করতে লাগলেন।

''প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হৈল পরম মহান্তী।
বড় বড় বৈষ্ণব তাঁরে দর্শনেতে যান্তি।।''

চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৩/১৪১

হরিদাস ঠাকুর পরম আনন্দে নাম সংকীর্ত্তন করছেন। তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য স্বয়ং মায়াদেবী পরমসুন্দরী নারীর বেশে উপস্থিত হলেন। তিনি সুমধুর বচন এবং বিভিন্ন কামোদ্দিপক ভাবের দ্বারা হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গ প্রার্থনা করলেন। তিনদিন অতিবাহিত হল। কিন্তু হরিদাসের মন বিচলিত হল না। অবশেষে পরাজয় স্বীকার করে বললেন--আমি ব্রহ্মাদি দেবগণের চিত্ত হরণ করেছি। কিন্তু তোমার মন হরণ করতে পারলাম না। তুমি মহাভাগবত। তোমার দর্শনে এবং শ্রীমুখ থেকে কৃষ্ণনাম শ্রবণ করে আমার চিত্ত শুদ্ধ হয়েছে। আমি পূর্বে শিবের থেকে রামনাম পেয়েছি। এবার তুমি আমাকে কৃষ্ণনাম দাও।

পূর্ব্বে আমি রাম-নাম পাঞাছি 'শিব' হৈতে।
তোমার সঙ্গে লোভ হৈল কৃষ্ণনাম লৈতে।।
মুক্তি-হেতু তারকব্রহ্ম হয় 'রামনাম'।
'কৃষ্ণ-নাম' পারক হঞা করে প্রেমদান।।
'কৃষ্ণনাম' দেহ' তুমি মোরে কর ধন্যা।
আমারে ভাসাও তৈছে এই প্রেমবন্যা।।

চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৩/২৫৪-২৫৬

শ্রীহরিদাস ঠাকুর এক সময় সপ্তগ্রাম চাঁদপুরে এসে হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন মজুমদারদের পুরোহিত শ্রীবলরাম আচার্য্যের নিকট রইলেন। মজুমদারদের পুত্র শ্রীরঘুনাথ দাস এই সময় শ্রীবলরাম আচার্য্যের গৃহে রোজ অধ্যয়ন করবার জন্য আসতেন এবং শ্রীহরিদাস ঠাকুরের দর্শন পেতেন ও তাঁর মুখে

হরিকথা শুনতেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুর মাঝে মাঝে মজুমদারদের আমন্ত্রণে তাঁদের সভাগৃহে আসতেন এবং হরিকথা বলতেন। কোন সময় মজুমদারের জমিদারী-সেরেস্তার পত্র ও রাজকর-বাহক পেয়াদা গোপাল চক্রবর্ত্তী শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে মুক্তি সম্বন্ধে তর্ক আরম্ভ করে। শ্রীহরিদাস ঠাকুর বললেন, নামাভাসেই মুক্তি হয়। পূর্ণ নামোদয়ে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমভক্তি লাভ হয়। এ কথা শুনে গোপাল চক্রবর্ত্তী ক্রুদ্ধ হয়ে বলল—কোটি জন্মে তপস্যা করেও যোগী যে মুক্তি পায় না, নামাভাসেই সেই মুক্তি হয়? এ-সমস্ত ভাবুকের সিদ্ধান্ত। পাপমতি গোপাল শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে উপহাস করতে লাগল। শ্রীহরিদাস ঠাকুর সভা ত্যাগ করে চলে গেলেন। মজুমদার মহাশয় গোপাল চক্রবর্ত্তীকে ধিক্কার দিয়ে সভা থেকে বের করে দিলেন। তাকে তাঁদের গৃহে আসতে নিষেধ করলেন। মহৎ চরণে অপরাধের ফলে গোপাল চক্রবর্ত্তীর সর্ব্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ হল। মহৎ চরণে অপরাধের ফল হাতে হাতে পেল।

যদ্যপি হরিদাস বিপ্রের দোষ না লইলা।
তথাপি ঈশ্বর তারে ফল ভুঞ্জাইলা।।
ভক্ত-স্বভাব,—অজ্ঞ-দোষ ক্ষমা করে।
কৃষ্ণ-স্বভাব,—ভক্ত-নিন্দা সহিতে না পারে।।

চৈঃ চঃ অন্তঃ ৩/২১০-২১১

শ্রীহরিদাস কখনও নবদ্বীপে কখনও শান্তিপুরে ভক্তগণের নিকট যাতায়াত করতেন। ভক্তগণ হরিদাসকে পেলে পরম আনন্দ লাভ করতেন। যেদিন শ্রীগৌরসুন্দর ফাল্গুন পূর্ণিমার চন্দ্র গ্রহণ সন্ধ্যাকালে মিশ্রগৃহে অবতীর্ণ হলেন, সেইদিন তিনি শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর সঙ্গে কৃষ্ণ কথারসে অবস্থান করছিলেন। অকস্মাৎ শ্রীহরিধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত দেখে অনুমানে বুঝতে পারলেন, শ্রীভগবান অবতীর্ণ হয়েছেন।

"সেই কালে নিজালয়, উঠিয়া অদ্বৈত রায়,
নৃত্য করে আনন্দিত-মনে।
হরিদাসে লঞা সঙ্গে, হুঙ্কার-কীর্ত্তন-রঙ্গে,
কেনে নাচে কেহ নাহি জানে।।"

❖ ❖ ❖

"জগৎ আনন্দময়, দেখি, মনে সবিস্ময়,
ঠারে ঠোরে কহে হরিদাস।
তোমার ঐছন রঙ্গ, মোর মন পরসন্ন,
দেখি--কিছু কার্য্যে আছে ভাস।।"

শ্রীচৈঃ চঃ আদি ১৩/১০১

ভক্তের কাছে ভগবান্ কোন লীলা গোপন করতে পারেন না। অদ্বৈত আচার্য্য ও হরিদাস ঠাকুর সব কিছু বুঝতে পারলেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুর মাঝে মাঝে নবদ্বীপ নগরে ভক্তগৃহে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীগৌরসুন্দরের বাল্যলীলা, পৌগণ্ড-লীলা কৈশোর-লীলাদি দর্শন করতেন। অতঃপর যখন মহাপ্রভু যৌবন-লীলায় হরি-সংকীর্ত্তন আরম্ভ করলেন, তখন হরিদাস ঠাকুর নিয়তই নবদ্বীপ মায়াপুরে অবস্থানপূর্ব্বক প্রেমরস আস্বাদন করতে লাগলেন। একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাস অঙ্গনে মহাপ্রকাশ-লীলা করে শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে আহ্বান করলেন এবং তার পূর্ব্ব চরিত সকল বলতে লাগলেন। হরিদাস! যবনগণ যখন তোমাকে নগরে নগরে প্রহার করতে আরম্ভ করেছিল, তখনই আমি তাদের সুদর্শন অস্ত্রে ধ্বংস করতাম। কিন্তু তুমি তাদের মঙ্গল কামনা করেছিলে, তাই কিছুই করতে পারিনি।

"তুমি ভাল চিন্তিলে না করোঁ মুঞি বল।
মোর চক্র তোমা লাগি, হইল বিফল।"

শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ১০/৪২



ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর এই সমস্ত কথা বলে' বললেন–

"তোহার মারণ নিজ অঙ্গে করি লঙ।
এই তার চিহ্ন আছে নাহি মিছা কঙ।।"

চৈঃ ভাঃ

আমি মিথ্যা বলছি না। এই দেখ, এখনও তার চিহ্ন আছে। এই বলে মহপ্রভু নিজ পৃষ্ঠে মারণের চিহ্ন দেখালেন। হরিদাস ঠাকুর মহাপ্রভুর এই করুণ লীলা দেখে তখনই প্রেমে মুর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। তারপর স্তুতি করে' বলতে লাগলেন–

"বাপ বিশ্বম্ভর প্রভু জগতের নাথ।
পাতকীরে কর কৃপা পড়িল তোমাত।।
নির্গুণ অধম সর্বজাতি বহিষ্কৃত ।
মুঞি কি বলিব প্রভু তোমার চরিত।।"

চৈঃ ভাঃ

মহাপ্রভুর যাবতীয় নদীয়া লীলাতে শ্রীহরিদাস প্রায় তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তারপর যখন মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ লীলা করে পুরীধামে যান, তখন শ্রীহরিদাস প্রভুর সঙ্গে সেখানে যান এবং স্থায়ীভাবে বাস করেন। মহাপ্রভু প্রতিদিন শ্রীজগন্নাথ দেবের মঙ্গল আরতি দর্শন করার পর শ্রীহরিদাসের নিকটে আসতেন এবং তাঁকে জগন্নাথের শীতল ভোগ প্রসাদ প্রদান করতেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে মহাপ্রভু নামাচার্য্য আখ্যা দেন। বৃন্দাবনধাম হতে শ্রীরূপ-সনাতন পুরীধামে এলে, তাঁরা শ্রীহরিদাসের সঙ্গে থাকতেন। শ্রীহরিদাস দূর হতে শ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরের চূড়া দর্শন করে প্রণাম করতেন। মর্য্যাদা রক্ষা করে শ্রীমন্দির সন্নিধানে যেতেন না। শ্রীহরিদাস ঠাকুর অতি বৃদ্ধ হলেও প্রতিদিন তিন লক্ষ হরিনাম করতেন।

একদিন গোবিন্দ হরিদাস ঠাকুরকে মহাপ্রসাদ দিতে গেলেন। দেখলেন হরিদাস শায়িত অবস্থায় ধীরে ধীরে সংখ্যা মালা জপ করছেন। গোবিন্দ বললেন, হরিদাস! উঠ, ভোজন কর। হরিদাস বললেন–

সংখ্যা-কীর্ত্তন পুরে নাহি, কেমতে খাইমু?
মহাপ্রসাদ আনিয়াছ, কেমতে উপেক্ষিমু?
এত বলি মহাপ্রসাদ করিলা বন্দন।
এক রঞ্চ লঞা তার করিলা ভক্ষণ।।

চৈঃ চঃ অঃ ১১/১৯-২০

এই লীলার দ্বারা হরিদাস ঠাকুর মহাপ্রসাদ সম্মান ও বিধিপূর্বক সংখ্যা নাম জপের মধ্যে কোনটিই যে উপেক্ষণীয় নয়, সেই শিক্ষা দিয়েছেন।

একদিন মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরের নিকটে এলেন। হরিদাস মহাপ্রভুকে প্রণাম করলেন। প্রভু হরিদাসের কুশল-আদি জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে হরিদাস অনেক দৈন্যপূর্ণ কথা বলে পরিশেষে প্রার্থনা জানালেন–

এক বাঞ্ছা হয় মোর বহু দিন হৈতে।
লীলা সম্বরিবে তুমি,–লয় মোর চিত্তে।।
সেই লীলা প্রভু মোরে কভু না দেখাইবা।
আপনার আগে মোর শরীর পাড়িবা।।
হৃদয়ে ধরিমু তোমার কমল চরণ।
নয়নে দেখিমু তোমার চাঁদ বদন।।
জিহায় উচ্চারিমু তোমার 'কৃষ্ণচৈতন্য' নাম।
এইমত মোর ইচ্ছা, ছাড়িমু পরাণ।।

চৈঃ চঃ অঃ ১১/৩১-৩৪

অতঃপর শ্রীহরিদাস ঠাকুরের অন্তিম সময় এসেছে জানতে পেরে শ্রীগৌরসুন্দর সপার্ষদ তাঁর সন্নিধানে উপস্থিত হলেন এবং ভক্তগণ সঙ্গে মহাসংকীর্ত্তন নৃত্য করতে লাগলেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুর ভক্তগণকে বন্দনা করে মহাপ্রভুকে সামনে বসালেন।

''হরিদাস নিজাগ্রেতে প্রভুরে বসাইলা।
নিজ-নেত্র--দুই ভৃঙ্গ—মুখপদ্মে দিলা।।

❖ ❖ ❖

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু' বলেন বার বার।
প্রভুমুখ-মাধুরী পিয়ে, নেত্রে জলধার।।
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' শব্দ করিতে উচ্চারণ।
নামের সহিত প্রাণ করিলা উৎক্রমণ।।

চৈঃ চঃ

শ্রীহরিদাস মহাপ্রভুর নাম নিতে নিতে অন্তর্ধান করলেন। মহাযোগেশ্বর প্রতিম শ্রীহরিদাসের অপ্রকটলীলা দেখে ভক্তগণ 'হরিকৃষ্ণ' শব্দ উচ্চারণ করে প্রেমানন্দে মহানৃত্যগীত করতে লাগলেন। তারপর মহাপ্রভু শ্রীহরিদাস ঠাকুরের অপ্রাকৃত দেহ কোলে নিয়ে প্রেমে ক্রন্দন করতে লাগলেন এবং ভক্তগণের কাছে তাঁর মহিমা বর্ণন করতে লাগলেন। অতঃপর সমুদ্রতটে নিয়ে মহাপ্রভু স্বহস্তে তাঁর সমাধি দিলেন। অবশেষে শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে এসে প্রসাদ ভিক্ষা করে তাঁর নির্য্যাণ-মহোৎসব সম্পাদন করলেন। ভগবান্ স্বয়ং এইরূপে ভক্তের মর্য্যাদা জগতে স্থাপন করলেন।

হরিদাসের বিজয়োৎসব যে কৈল দর্শন।
যে ইঁহা নৃত্য কৈল, যে কৈল কীর্ত্তন।।
যে তাঁরে বালুকা দিতে করিল গমন।
তার মধ্যে মহোৎসবে যে কৈল ভোজন।।
অচিরে সবাকার হইবে 'কৃষ্ণপ্রাপ্তি'।
হরিদাস-দরশনের হয় ঐছে 'শক্তি'।।

চৈঃ চঃ অঃ ১১/৯১-৯৩

হরিদাস আছিলা পৃথিবীর 'শিরোমণি'।
তাঁহা বিনা রত্নশূন্যা হইল মেদিনী।
'জয় জয় হরিদাস' বলি' কর হরিধ্বনি।
এত বলি, মহাপ্রভু নাচেন আপনি।।
সবে গায়,—''জয় জয় জয় হরিদাস।
নামের মহিমা যেন করিলা প্রকাশ।।''
তবে মহাপ্রভু সব ভক্তে বিদায় দিলা।
হর্ষ বিষাদে প্রভু বিশ্রাম করিলা।।
এই ত কহিলুঁ, হরিদাসের বিজয়।
যাহার শ্রবণে কৃষ্ণে দৃঢ়ভক্তি হয়।।
শ্রীচৈঃ চঃ অন্ত্যলীলা একাদশ পরিচ্ছেদ

ভাদ্র শুক্লা চতুর্দ্দশী তিথিতে হরিদাস ঠাকুর তিরোধান লীলা করেন।

নমামি হরিদাসং তং চৈতন্যং তঞ্চ তৎপ্রভুম্।
সংস্থিতামপি যন্মূর্ত্তিং স্বাঙ্কে কৃত্বা ননর্ত্ত যঃ।।

**।। জয় নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর কি জয়।।**



# শ্রীল কাশীশ্বর পণ্ডিত

শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিত ছিলেন শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের শিষ্য। পিতার নাম শ্রীবাসুদেব ভট্টাচার্য্য। তাঁরা কাঞ্জিলাল কানুবংশোদ্ভূত বাৎস্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। তাঁদের রাজ-উপাধি চৌধুরী।

শ্রীরামপুর ষ্টেশন থেকে এক মাইল দূরে চাতরা গ্রামে শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিত শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত আদি লীলা ৮ম পরিচ্ছেদ ৬৬ শ্লোক অনুভাষ্য।)

ঈশ্বরপুরীর শিষ্য—ব্রহ্মচারী কাশীশ্বর।
শ্রীগোবিন্দ নাম তাঁর প্রিয় অনুচর।।
তাঁর সিদ্ধি-কালে দোঁহে তাঁর আজ্ঞা পাঞা।
নীলাচলে প্রভুস্থানে মিলিল আসিয়া।।
গুরুর সম্বন্ধে মান্য কৈল দুহাকারে।
তাঁর আজ্ঞা মানি সেবা দিলেন দোহারে।।
অঙ্গসেবা গোবিন্দের দিলেন ঈশ্বর।
জগন্নাথ দেখিতে আগে চলে কাশীশ্বর।।
অপরশ যায় গোসাঞি মনুষ্য-গহনে।
মনুষ্য ঠেলি পথ করে কাশী বলবানে।।

চৈঃ চঃ আদি ১০/১৩৮-১৪২

ব্রহ্মচারী শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিত ও শ্রীগোবিন্দ—দু'জন শ্রীঈশ্বর পুরীর প্রিয় শিষ্য ছিলেন। অন্তর্ধান কালে ঈশ্বরপুরী দু'জনকে শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর সেবা করার আদেশ দিয়ে যান। শ্রীঈশ্বর পুরী অপ্রকট হ'লে দু'জন নীলাচলে মহাপ্রভুর সন্নিধানে আগমন করেন। গুরুর প্রিয় শিষ্য ছিলেন তাঁরা; তাই সম্মানার্হ। তথাপি শ্রীগুরুর আজ্ঞা জেনে মহাপ্রভু তাঁদের সেবা গ্রহণ করলেন। শ্রীগোবিন্দের উপর পড়ল মহাপ্রভুর অঙ্গ-সেবার ভার। শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতের উপর পড়ল শ্রীজগন্নাথ দর্শন-কালে লোকের ভিড় ঠেলে সাবধানে মহাপ্রভুকে মন্দিরে নিয়ে যাওয়ার ভার।

শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিত খুব বলবান ছিলেন। শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামী লিখেছেন—

পুরা বৃন্দাবনে চেটৌ স্থিতো ভৃঙ্গার-ভঙ্গুরৌ।
শ্রীকাশীশ্বর-গোবিন্দৌ তৌ জাতৌ প্রভু সেবকৌ।।

শ্রীগৌর-গণোদ্দেশ দীপিকা-১৩৭

পূর্ব্বে ব্রজে যাঁরা ভৃঙ্গার ও ভঙ্গুর নামে শ্রীকৃষ্ণের চেট সেবক (জল আনয়নকারী সেবক) ছিলেন, অধুনা তাঁরা কাশীশ্বর ও গোবিন্দ নামে মহাপ্রভুর সেবক হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন।

শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিত পুরী ধামে মহাপ্রভুর সাথে বহুকাল অবস্থান করেছিলেন। কীর্ত্তনান্তে ভক্তগণের মধ্যে তিনি প্রসাদ বিতরণ করতেন।

চাতরাগ্রামে তাঁর সেবিত যে বিগ্রহগণ আছেন তাঁদের পরবর্ত্তী সেবক হন—শ্রীশিবচন্দ্র চৌধুরী। তিনি শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিত গোস্বামীর ভ্রাতৃবংশীয়। পূর্ব্বে নয় সের চালের ভোগ হ'ত। বর্ত্তমানে ভোগের কোন ভাল ব্যবস্থা নাই।

কাশীশ্বর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য শ্রীগোবিন্দ গোসাঞি। তিনি শ্রীগোবিন্দদেবের শ্রেষ্ঠ সেবক ছিলেন।

শ্রীরূপগোস্বামী বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দদেবের সেবা প্রবর্ত্তন করেছিলেন—শুনে সুখী হয়ে মহাপ্রভু পুরী থেকে শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতকে শীঘ্র বৃন্দাবন যাবার আদেশ দিলেন। কিন্তু শ্রীকাশীশ্বর শ্রীগৌরসুন্দরকে ত্যাগ ক'রে যেতে চাইলেন না। অন্তর্য্যামী শ্রীগৌরসুন্দর তখন একটি স্ব-রূপ শ্রীবিগ্রহ তাঁকে দিলেন ও সে বিগ্রহের সঙ্গে ভোজন

করলেন, তখন কাশীশ্বরের বিশ্বাস হল। এই সম্বন্ধে শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বর্ণন করছেন—

কাশীশ্বর কহে প্রভু তোমারে ছাড়িতে।
বিদরে হৃদয়, যে উচিত কর ইথে।।
কাশীশ্বর হৃদয় বুঝিয়া গৌরহরি।
দিলেন নিজ স্বরূপ-বিগ্রহ যত্ন করি।।
প্রভু সে বিগ্রহসহ অন্নাদি ভুঞ্জিল।
দেখি কাশীশ্বরের পরমানন্দ হৈল।।
গৌর-গোবিন্দ নাম প্রভু জানাইলা।
তারে লৈয়া কাশীশ্বর বৃন্দাবনে আইলা।।
শ্রীগোবিন্দ দক্ষিণে প্রভুরে বসাইয়া।
করেন অদ্ভুত সেবা প্রেমাবিষ্ট হইয়া।।

ভঃ রঃ ২য় তরঙ্গ

মহাপ্রভু বললেন এই বিগ্রহের নাম হবে গৌর-গোবিন্দ। কাশীশ্বর পণ্ডিত বিগ্রহ নিয়ে বৃন্দাবন গেলেন এবং শ্রীগোবিন্দ-দেবের দক্ষিণ পাশে সে বিগ্রহ স্থাপন করে প্রেমভরে সেবা করতে লাগলেন।

শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিত গোস্বামীর মহিমা অনন্ত ও অপার। তাঁর তিরোভাব তিথি উৎসব আশ্বিন পূর্ণিমার শ্রীরাধা গোবিন্দের মহারাস মহোৎসবের দিন।

কাশীশ্বর পণ্ডিত যে মহাপ্রভুর কত প্রিয় ছিলেন তা শ্রীচৈতন্য ভাগবত গ্রন্থ পাঠ করলে জানা যায়।

জয় জগদানন্দ প্রিয় অতিশয়।
জয় বক্রেশ্বর কাশীশ্বরের হৃদয়।।

চৈঃ ভাঃ মঃ ১/৬

জয় জয় শ্রীজগদানন্দ জীবন।
জয় হরিদাস কাশীশ্বর প্রাণধন।।

চৈঃ ভাঃ মঃ ২৪/৩

**।। জয় শ্রীল কাশীশ্বর পণ্ডিত কি জয়।।**

# শ্রীল শ্রীধর পণ্ডিত

শ্রীকৃষ্ণলীলায় যিনি দ্বাদশ গোপালের অন্যতম কুসুমাসব গোপাল, তিনিই গৌরলীলায় শ্রীধর পণ্ডিতরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন।

'খোলাবেচাতয়া খ্যাতঃ পণ্ডিতঃ শ্রীধরেণ দ্বিজঃ।
আসীদ্‌ব্রজে হাস্যকরো যো নাম্না কুসুমাসবঃ।।

গৌঃ গঃ- ১৩৩

জয় জয় শ্রীধরঠাকুর দয়াময়।
যাঁর কলা মূলা খায় গৌরাঙ্গরায়।।

শ্রীধর ঠাকুর শ্রীমায়াপুর গ্রামের শেষ সীমায় বাস করতেন। তিনি যৎসামান্য কলা-মূলা বিক্রি করে জীবন-যাপন করতেন। রাতভোর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করতেন। ভক্তি বহির্মুখ পাষণ্ড হিন্দুগণ তা সইতে পারত না। অকথ্য ভাষায় তাঁকে নানাপ্রকার গালি দিত—

মহাচাষা-বেটা ভাতে পেট নাহি ভরে।
ক্ষুধায় ব্যাকুল হঞা রাত্রি জাগি-মরে।।

চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ৯/১৪৮

চাষা বেটার ভাতে পেট ভরে না। ক্ষুধার জ্বালায় রাত্রে চিৎকার করে পাষণ্ডিগণ এরূপ অনেক কথা বলত; কিন্তু শ্রীধর কারও কথায় কর্ণপাত করতেন না। আনন্দে নিজের কাজ করে যেতেন। বামন পুকুরের বাজারে ছিল তাঁর দোকান। তিনি খুব সত্যবাদী লোক ছিলেন। এক কথায় বেচা-কেনা করতেন। নিরন্তর শ্রীনাম স্মরণ করতেন। বেশী কথা বলতে ভাল বাসতেন না। খরিদ্দারেরা যথার্থ দাম রেখে কলা-মূলাদি নিয়ে যেতেন।

থোড় কলা-মূলা বিক্রি করে শ্রীধর যে পয়সা পেতেন, তার অর্দ্ধেক দিয়ে শ্রীগঙ্গাদেবীর পূজার ফুল মিষ্টি প্রভৃতি খরিদ করতেন, আর অর্দ্ধেকে তাঁর সংসার নির্ব্বাহ হ'ত।

কোন কোন দিন জননীর আদেশে কলা-মূলা-শাক প্রভৃতি কিনতে শ্রীগৌরসুন্দর বাজারে যেতেন। তিনি শ্রীধরের দোকান থেকে জিনিস কিনতেন। মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর কোন কোন দিন বড় রহস্য করতেন।

শ্রীধর এক দরে বিক্রি করতেন। শ্রীগৌরসুন্দর তার অর্দ্ধেক দাম বলতেন। শ্রীধর উঠে শ্রীগৌরসুন্দরের হাত থেকে কলা-মূলাটী কেড়ে নেবার চেষ্টা করতেন। গৌরসুন্দর ছেড়ে দিতেন না। পরিশেষে দুইজনের মধ্যে দ্রব্য নিয়ে টানাটানি হ'ত। তামাসা দেখবার জন্য অনেক লোক জড় হ'ত।

একদিন মহাপ্রভু একটা মোচা নিয়ে দর কষাকষি করছিলেন শ্রীধরের সঙ্গে। শ্রীধর মোচাটা কেড়ে নিতে চাইলে মহাপ্রভু বললেন—

প্রভু—''কেনে ভাই শ্রীধর তপস্বী।
অনেক তোমার অর্থ আছে হেন বাসি।।
আমার হাতের দ্রব্য লহ যে কাড়িয়া।
এতদিন কে আমি, না জানিস্ ইহা।।"

❖ ❖ ❖

যে গঙ্গা পূজহ তুমি, আমি তার পিতা।
সত্য সত্য তোমারে কহিল এই কথা।।

চৈঃ ভাঃ মধ্য ৯/১৭৩

মহাপ্রভু-- শ্রীধর! তোমার একি ব্যবহার? আমি ব্রাহ্মণের ছেলে। আমার হাত থেকে তুমি জিনিস কেড়ে নিচ্ছ? তুমি একজন তপস্বী। তোমার ত অনেক পয়সা-কড়ি আছে। আমায় কিছু দিলে ক্ষতি

কি? শ্রীধর! এতদিন তুমি কি জান না আমি কে? তুমি প্রতিদিন যে গঙ্গার পূজা কর, আমি তাঁর পিতা।

কর্ণে হস্ত দেই, শ্রীধর 'বিষ্ণু', 'বিষ্ণু' বলে।
উদ্ধত দেখিয়ে তারে দেই পাত খোলে।।

চৈঃ ভাঃ মধ্য ৯/১৮০

প্রভুর কথা শুনে শ্রীধর 'বিষ্ণু' 'বিষ্ণু' বলে কানে আঙ্গুল দিলেন। ভাবলেন শিশু পাগল হয়েছে। শ্রীধর শ্রীগৌরসুন্দরকে ভালভাবে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন–

মদনমোহনরূপ গৌরাঙ্গসুন্দর।
ললাটে তিলক শোভে উর্দ্ধ মনোহর।।
ত্রিকচ্ছ বসন শোভে কুটিল কুন্তল।
প্রকৃতি, নয়ন—দুই পরম চঞ্চল।।
শুক্ল যজ্ঞ-সূত্র শোভে বেড়িয়া শরীরে।
সূক্ষ্মরূপে অনন্ত যে-হেন কলেবরে।।
অধরে তাম্বুল হাসে, শ্রীধরে চাহিয়া।
আরবার খোলা লয় আপনে তুলিয়া।।

—চৈঃ ভাঃ মধ্য ৯/১৬৯-১৭২

কি অপূর্ব্ব মদনমোহন রূপ। ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক, পরিধানে ত্রিকচ্ছ বসন, শিরে কুঞ্চিত কেশদাম, গলদেশে শুভ্র যজ্ঞোপবীত ও নয়ন যুগলের সুষমা বর্ণন করা যায় না। অধর তাম্বুল রাগে রঞ্জিত।

এভাবে দুইজনের মধ্যে যখন কথোপকথন হচ্ছিল তখন শ্রীগৌরসুন্দর মোচাটি ভূমিতে রেখে দিয়েছিলেন। হাস্য করতে করতে তিনি আবার মোচাটি হাতে নিলেন।

শ্রীধর বললেন—শুন ঠাকুর! আমি তোমার কুকুর, তুমি আমায় ক্ষমা কর, মূল্য দিতে হ'বে না। তুমি এমনি নিয়ে যাও।

মহাপ্রভু বললেন—শ্রীধর! তুমি বড় চতুর লোক। তোমার কলা বেচা অনেক অর্থ আছে। আমাকে কিছু জিনিস বিনা পয়সায় দিলে তোমার কি এমন ক্ষতি হবে?

শ্রীধর– ঠাকুর এই বাজারে আর কি দোকান নাই?

মহাপ্রভু– অনেক দোকান আছে, তাতে আমার কি? তুমি আমার যোগানদার, তোমাকে ছাড়ব কেন?

শ্রীধর– ঠাকুর, বেশ কথা, তোমার পায়ে পড়ি। তোমার কাছে আমি পরাজিত। আজ থেকে বিনা কড়িতে তোমায় জিনিস দিব।

মহাপ্রভু – যত খারাপ জিনিস তাই দিবে ত?

শ্রীধর– ব্রাহ্মণ ঠাকুর! খারাপ জিনিস দিব কেন?

মহাপ্রভু– আচ্ছা ভাল, ভাল, তাই হউক।

কিছুক্ষণ এভাবে কলহ করে মহাপ্রভু চল্‌লেন। শ্রীধর তাকিয়ে রইলেন। এ শিশু একদিন কোন মহাপুরুষ হ'বেন। কি মধুময় ভাষা! কিরূপ চাহনি! এত চঞ্চলতা করলেও মনে কোন দুঃখ হয় না। বাজারে আর কোথাও যায় না। শুধু আমার কাছে আসে। আমার কত ভাগ্য।

শ্রীগৌরসুন্দর প্রতিদিন শ্রীধরের থোড় মোচার তরকারী তাঁর কলার খোলায় ভোজন করতেন।

ভক্তের পদার্থ প্রভু হেনমতে খায়।
কোটি হৈলেও অভক্তের উলটি' না চায়।।

চৈঃ ভাঃ ৯/১৮৫

ভগবান ভক্তের দ্রব্য কেড়ে কেড়ে খান, অভক্তের কোটি দ্রব্যের প্রতিও দৃষ্টিপাত করেন না।

শ্রীগৌরসুন্দর প্রতিদিন শিষ্যগণসহ নগর ভ্রমণ করতেন। একদিন ভ্রমণ কর্‌তে কর্‌তে শ্রীধরের ঘরে এলেন। শ্রীধর তাঁকে ভালভাবে চিনতেন। তাঁর সঙ্গে প্রভু দু'চার দণ্ড পরিহাসাদি না করে ছাড়লেন না।

শ্রীধর শ্রীগৌরসুন্দরকে বসবার আসন দিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর বসে বলতে লাগলেন–

শ্রীধর! তুমি সারাদিন 'হরি' 'হরি' কর ও লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা কর, কিন্তু তোমার অন্ন-বস্ত্রের এত দুঃখ কেন?

শ্রীধর-- ঠাকুর! উপবাস ত' করি না। ছোট হউক, বড় হউক কাপড় ত' পরি।

মহাপ্রভু-- শ্রীধর! বস্ত্রত' পরিধান কর, কিন্তু দেখছি দশ জায়গায় সেলাই রয়েছে। ঘর আছ, কিন্তু ঘরের ছাউনিতে ত' খড় নাই। দেখ, এ নবদ্বীপে চণ্ডী-দুর্গার পূজা করে লোক কত সুখে আছে।

শ্রীধর--ঠাকুর! তুমি ঠিক বলেছ। কিন্তু দিন সকলের সমান যাচ্ছে।

রত্ন ঘরে থাকে, রাজা দিব্য খায় পরে।
পক্ষিগণ থাকে, দেখ, বৃক্ষের উপরে।।
কাল পুনঃ সবার সমান হই' যায়।
সবে নিজ-কর্ম ভুঞ্জে ঈশ্বর-ইচ্ছায়।।

চৈঃ ভাঃ আদি ১২/১৮৯-১৯০

মহাপ্রভু-- শ্রীধর! তোমার অনেক ধন আছে। তুমি লুকিয়ে রেখেছ। আমি জগতে প্রচার করব। দেখি তুমি কেমন করে লোককে বঞ্চনা কর।

শ্রীধর--ঠাকুর! তুমি এখন ঘরে যাও। তোমার সঙ্গে আমি দ্বন্দ্ব করতে চাই না।

মহাপ্রভু--শ্রীধর! তুমি আমায় কি দিবে দাও। তোমার থেকে কিছু না নিয়ে কেমনে যাই?

শ্রীধর--পণ্ডিত! আমি গরীব মানুষ। থোড় কলা বেচে খাই। ইথে তোমায় দেওয়ার মত কিছু ত' দেখ ছি না।

মহাপ্রভু--শ্রীধর! তোমার যে পোতা ধন আছে, এখন তা থাকুক। বর্ত্তমানে বিনা দামে থোড়, কলা ও মোচা ত' দাও।

শ্রীধর চিন্তা করতে লাগলেন–এ-বিপ্রশিশু ত' পাগল মনে হয়। বেশী কিছু বললে মারতেও পারে। ব্রাহ্মণের ছেলে মারলেও কিছু করতে পারব না। আবার রোজ বিনা পয়সায় দিতেও পারি না। তবে সে যে ছলে-বলে নেয় না, সেও আমার ভাগ্য।

শ্রীধর--ঠাকুর! তোমাকে পয়সা-কড়ি দিতে হবে না, এ থোড় কলা মোচা নিয়ে যাও। আমার সঙ্গে আর ঝগড়া কর না।

মহাপ্রভু--শ্রীধর! ভালয় ভালয় দিলে কেইবা ঝগড়া করে? তবে ভাল জিনিস দিও। বামনকে কানা গরু দান কর না।

কতক্ষণ শ্রীধরের সঙ্গে এরূপ বাক্যালাপ করে শ্রীগৌরসুন্দর শিষ্যগণসহ গৃহাভিমুখে ফিরে যেতে উদ্যত হলেন। এমন সময় পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন–শ্রীধর, তুমি আমায় কি মনে কর তা' বললেই আমি চলে যাব।

তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে। বিষ্ণুর অংশ।

মহাপ্রভু--শ্রীধর! তুমি আমায় জানতে পারলে না। আমি গোপ। তোমার যে গঙ্গার মহিমা, তাও আমার কারণে।

শ্রীধর--পণ্ডিত! তোমার গঙ্গারও ভয় হয় না। লোকের যত বয়স হয়, তত শান্ত দান্ত হয়। তোমার যত বয়স হচ্ছে ততই চঞ্চলতা বাড়ছে। এখন ঘরে যাও। আমার সঙ্গে আর কলহ কর না।

শ্রীধরের কথা শুনে শ্রীগৌরসুন্দর হাস্য করতে করতে গৃহাভিমুখে চললেন।

ভগবান যতক্ষণ নিজের পরিচয় না দেন, ততক্ষণ কেউ তাঁকে জানতে পারে না।

শ্রীগৌরসুন্দর কিছুদিন বিদ্যার বিলাস করলেন। তারপর গয়াধামে গেলেন। সেখান থেকে দিব্যভাব

প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন। যখন গৃহে ফিরলেন তখন তাঁর সম্পূর্ণ নতুন ভাব। নিরন্তর ভাবাবেশ। শ্রীবাস অঙ্গনই ঐ বিলাসের প্রধান কেন্দ্র হল। দিনের পর দিন কত দিব্য ভাব প্রকট করতে লাগলেন তা' বর্ণন করা যায় না।

একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাস মন্দিরে বিষ্ণু-খট্টার উপর বসে মহাভাবাবেশে ভক্তগণকে আদেশ করলেন,—শ্রীধরকে নিয়ে এস সে আমার স্বরূপ দর্শন করুক। আমাকে দেখবার জন্য সে কত সাধন করেছে, কত দুঃখ সহ্য করেছে। রাত্রিকালে ভক্তগণ শ্রীধরকে আনতে গেলেন। দূর থেকে ভক্তগণ শুনতে পেলেন শ্রীধর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করছেন।

ভক্তগণ শ্রীধরের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে 'শ্রীধর', 'শ্রীধর' বলে ডাকতে লাগলেন। শ্রীধর এত জোরে হরিনাম করে যাচ্ছিলেন যে ভক্তদের ডাকাডাকি প্রথম শুনতেই পেলেন না। আর কিছুক্ষণ ডাকহাঁক দিবার পর শ্রীধর বাইরে এসে চন্দ্রালোকে ভক্তদের দেখে অবাক হলেন এবং এত রাত্রে কেন এসেছেন জিজ্ঞাসা করলেন। ভক্তগণ বললেন—শ্রীধরঃ! আর কাল বিলম্ব কর না। প্রভু তোমাকে ডেকেছেন। তোমাকে নেবার জন্য আমরা এসেছি "শুনিয়া প্রভুর নাম শ্রীধর মূর্চ্ছিত। আনন্দে বিহ্বল হই' পড়িলা ভূমিত।।" (চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ৯/১৫৪) প্রভুর নাম শুনে শ্রীধর ভূতলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। ভক্তগণ ধরাধরি করে তাঁকে মহাপ্রভুর কাছে আনলেন। মহাপ্রভু আনন্দ-ভরে বলতে লাগলেন—শ্রীধর! এস এস, আমাকে দেখবার জন্য তুমি বহু জন্ম সাধন করেছ। এ জন্মেও আমার অনেক সেবা করেছ। তোমার থোর, কলা ও মোচার তরকারী আমি বড় প্রীতিতে ভোজন করেছি এবং কলার খোলায় অন্ন খেয়েছি। শ্রীধর! তুমি কি এ সব ভুলে গেছ? শ্রীধর! তুমি উঠ--আমার দিব্যরূপ দর্শন কর। এরূপ শ্রুতিগণও দর্শন করতে পারেন না। ধীরে ধীরে ভূমি থেকে উঠে শ্রীধর প্রভুর দিব্যরূপ দেখতে লাগলেন—

তমাল শ্যামল দেখে সেই বিশ্বম্ভর।।
হাতে মোহন বাঁশী দক্ষিণে বলরাম।
মহাজ্যোতির্ম্ময় সব দেখে বিদ্যমান।।
কমলা তাম্বুল দেই হাতের উপরে।
চতুর্ম্মুখ পঞ্চমুখ আগে স্তুতি করে।।

চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ৯/১৯০-১৯৩

শ্রীশ্যামসুন্দররূপে গৌরসুন্দরকে দেখে শ্রীধর পুনরায় ধরাতলে প্রেম-মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হলেন। মহাপ্রভু শ্রীধরকে স্পর্শ করে তাঁর চৈতন্য ফিরালেন এবং তাঁকে স্তুতি করতে বললেন।

শ্রীধর বললেন—ঠাকুর! আমি ত' কিছুই জানি না।

মহাপ্রভু বললেন—শ্রীধর! তোমার বাক্যই আমার স্তুতি।

আমি বর প্রদান করছি, তোমার জিহ্বায় শুদ্ধা সরস্বতীর অধিষ্ঠান হউক।

শ্রীধর স্তব করতে লাগলেন—

জয় জয় মহাপ্রভু জয় বিশ্বম্ভর।
জয় জয় জয় নবদ্বীপ পুরসুন্দর।।
জয় জয় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটিনাথ।
জয় জয় শচী পুণ্যবতী গর্ভজাত।।
জয় জয় বেদগোপ্য জয় দ্বিজরাজ।
যুগে যুগে ধর্ম পাল করি নানা সাজ।।

চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ৯/২০০-২০২

এভাবে শ্রীধর প্রায় অর্দ্ধপ্রহর কাল কত স্তুতি করলেন। প্রভু তাতে সুখী হয়ে বল্লেন—শ্রীধর! তুমি বর গ্রহণ কর। তুমি যা চাইবে তাই পাবে।

শ্রীধর বললেন—ঠাকুর! আমি কোন বর চাই না। যদি বর দাও ত এ বর দাও—

যে ব্রাহ্মণ কাড়ি নিল মোর খোলাপাত।
সে ব্রাহ্মণ হউক মোর জন্ম জন্ম নাথ।।
যে ব্রাহ্মণ মোর সঙ্গে করিল কোন্দল।
মোর প্রভু হউক তাঁর চরণ যুগল।।

চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ৯/২২৪-২২৫

শ্রীধর উচ্চৈঃস্বরে রোদন করতে লাগলেন। শ্রীধরের সে-প্রেমক্রন্দন শুনে বৈষ্ণবগণও প্রেমে ক্রন্দন করতে লাগলেন।

মহাপ্রভু শ্রীধরকে বললেন—শ্রীধর! জন্মে জন্মে তুমি আমার দাস। আমি তোমায় অনেক পরীক্ষা করেছি। তোমার আচরণে আমি বড় তুষ্ট হয়েছি। তোমার সেবা ও প্রেমে তোমার কাছে আমি ঋণী। মহাপ্রভুর কথা শুনে, চতুর্দ্দিকে বৈষ্ণবগণ 'হরি' 'হরি' ধ্বনি করে উঠলেন।

ধন নাহি জন নাহি নাহিক পাণ্ডিত্য।
কে চিনিবে এ সকল চৈতন্যের ভৃত্য।।
কি করিবে বিদ্যাধন, রূপ, যশ, কুলে।
অহঙ্কার বাড়ি সব পড়য়ে নির্ম্মূলে।।
কলা মূলা বেচিয়া শ্রীধর পাইল যাহা।
কোটি কল্পে কোটীশ্বর না দেখিবে তাহা।।

—চৈঃ ভাঃ ৯/২৩৩-২৩৫

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ বলেছেন—

**"আধ্যক্ষিক-জ্ঞানে অর্থাৎ বাহ্য পরিচয়ে বৈষ্ণবের স্বরূপ চিহ্নিত করা অসম্ভব। অধিক ধন থাকিলেই যে তাহার অধিক বৈষ্ণবতা হইবে, এরূপ নহে। বহু লোক সংগ্রহ করিতে পারিলেই যে তিনি অধিক বৈষ্ণব হইবেন, এরূপ নহে। শাস্ত্রাদিতে অধিক পাণ্ডিত্য থাকিলেই যে তিনি বিষ্ণুভক্ত হইবেন, এরূপও নহে। শ্রীচৈতন্যের দাসগণের অধিক ধনের পরিচয় না থাকিতে পারে, অধিক লোক সংগ্রহের পরিচয় না থাকিতে পারে, অধিক তর্কবিতর্কাত্মক পাণ্ডিত্যের অধিকার না থাকিতে পারে, কিন্তু সেই সকল বিষয়ে তাঁহারা কেন উদাসীন, তাহা বুঝিবার অধিকার সাধারণের নাই। শ্রীচৈতন্য-সেবাকেই তাঁহারা ধন, জন পাণ্ডিত্যাপেক্ষা বহুমানন করেন; সুতরাং তাঁহাদের গৌরব, মহিমা ও শ্রেষ্ঠতা লোকনয়নের গোচরীভূত হইবার সম্ভাবনা নাই।"**

শচীনন্দন শ্রীগৌরহরি নদীয়া নগরে ভক্তগণসহ কত বিচিত্র লীলাবিলাস করতে করতে সমগ্র জীব উদ্ধারের জন্য সন্ন্যাস লীলাভিনয় করতে ইচ্ছা করলেন। সন্ন্যাসে যাবার দিন ভক্তগণকে নিয়ে মহাপ্রভু নগরে নগরে বহু নৃত্য কীর্ত্তন করলেন। সন্ধ্যার সময় নিজ গৃহে বসে আছেন। ভক্তগণ সেখানে সমবেত হতে লাগলেন। আজ প্রভুর কি অপূর্ব্ব দিব্য বেশ। হাসতে হাসতে ভক্তগণকে নিজ কণ্ঠের মাল্য দান করছেন। চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ আনন্দ সাগরে ভাসছেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য এলেন, শ্রীবাস পণ্ডিত এলেন, শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত এলেন। এমন সময় শ্রীধর একটি লাউ হাতে করে এলেন এবং প্রভুকে ভেট দিলেন। মহাপ্রভু স্বহস্তে লাউটি নিয়ে হাসতে লাগলেন। মনে মনে চিন্তা করলেন—শ্রীধরের লাউ না খেয়ে সন্ন্যাসে যাব—তা হতেই পারে না—ভক্তের জিনিস উপেক্ষা করতে পারি না। শচীমাতাকে ডেকে বললেন—আই! শ্রীধর কষ্ট করে লাউ এনেছে। এ লাউ এখনি শ্রীকৃষ্ণের ভোগে লাগাও। এমন সময় আর একজন ভক্ত দুধ নিয়ে এলেন। শচীমাতা তখনি দুধ লাউ দিয়ে পায়েশ তৈরী করলেন ও ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে শ্রীগৌরসুন্দরের হাতে এনে দিলেন।

সে প্রসাদ গৌরসুন্দর স্বহস্তে ভক্তগণকে খাইয়ে নিজে খেলেন। তিনি শ্রীধরকে বললেন--শ্রীধর! তোমার দ্রব্য কি আমি না খেয়ে পারি? শ্রীধর! তুমি কি আমার কথা রাখবে? ঠাকুর! কি কথা বল কেন রাখব না? শ্রীধর! এ ভাবে তুমি রোজ আমার বাড়ী এসে দেখা দিও।

মহাপ্রভু ভক্তগণের সঙ্গে কত রকমের হাস্য পরিহাস করবার পর সকলকে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন করবার আদেশ করে বিদায় করলেন। অতঃপর তিনি অন্ত-নিশায় সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য যাত্রা করলেন।

সন্ন্যাস গ্রহণান্তর মহাপ্রভু যখন পুরীতে অবস্থান করতেন তখন গৌড়ীয় ভক্তগণের সঙ্গে প্রভুর দর্শনে শ্রীধর প্রতিবর্ষ যেতেন।

**।। জয় শ্রীধর ঠাকুর কি জয়।।**

# শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত

ভক্তের দ্রব্য প্রভু কাড়ি' কাড়ি' খায়।<br>
অভক্তের দ্রব্য পানে উলটি না চায়।।

শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের সাথে মহাপ্রভুর এমনই এক অদ্ভুত লীলা সংঘটিত হয়েছিল।

শ্রীজগদীশ পণ্ডিত হয় জগৎ পাবন।<br>
কৃষ্ণপ্রেমামৃত বর্ষে যেন বর্ষা ঘন।।

—চৈঃ চঃ আদি ১১/৩০

শ্রীজগদীশ ভট্ট পূর্ব্বদেশে গোহাটী অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম--শ্রীকমলাক্ষ ভট্ট। ইনি গয়ঘর বন্দ্যঘাটার ভট্টনারায়ণের সন্তান। জগদীশের পিতা ও মাতা উভয়েই পরম বিষ্ণুভক্ত গৃহস্থ ছিলেন। মা বাপের অপ্রকটের পর জগদীশ স্বীয় ভার্যাসহ গঙ্গাতীরে আগমন করেন। তাঁর পত্নীর নাম দুঃখিনী দেবী। জগদীশের ছোট ভ্রাতা মহেশও ভাইয়ের অনুগমনে গঙ্গা তীরে আসলেন। এনারা গঙ্গাতটে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহ সন্নিধানে বসবাস করতেন।

শ্রীগৌরসুন্দর জগদীশকে হরিনাম প্রচারের জন্য নীলাচলে যেতে আদেশ করেন।

শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীজগন্নাথ ও গৌরহরি একই তত্ত্ব। নীলাচলে জগন্নাথ দর্শন করে শ্রীজগদীশ পণ্ডিত প্রভু প্রেমে আপ্লুত হয়ে গেলেন। নীলাচল হতে ফেরার সময় শ্রীজগন্নাথ বিরহে ব্যাকুল হলেন। পুরীর লক্ষ লক্ষ লোক জগন্নাথ দর্শনে যায়, কিন্তু ফেরার সময় ক জনের মধ্যেই বা বিরহ ব্যাকুলতা দেখা যায়? কখনও কোন ভাগ্যবান জীবের মধ্যে হয়ত সে ভাবের উদয় হয়। যাঁর হৃদয়ে বিরহব্যাকুলতা আসে, তাঁর প্রতিই শ্রীজগন্নাথের যথার্থ কৃপা বর্ষিত হয়েছে প্রমাণিত হয়। শ্রীজগদীশ পণ্ডিত প্রভু বিরহ-ব্যাকুল হয়ে ক্রন্দন করতে থাকলে শ্রীজগন্নাথদেব কৃপাপরবশ হয়ে তাঁকে স্বপ্নাদেশ করলেন—''জগদীশ! তুমি দুঃখ কর না, তুমি সঙ্গে করে আমার বিগ্রহ নিয়ে যাও এবং সেবা কর।" তৎসঙ্গে রাজাকেও স্বপ্নাদেশ করলেন—''হে রাজা! নবকলেবরের সময়ে আমার সমাধিস্থ বিগ্রহ তুমি জগদীশকে দিয়ে দাও।" রাজা বললেন—''হে প্রভু!

তোমার অত ভারী বিগ্রহ জগদীশ পণ্ডিত কিভাবে বহন করে নিয়ে যাবে।" জগন্নাথ বললেন—"তুমি চিন্তা করো না। আমি শোলার ন্যায় হাল্কা হয়ে যাবো। নতুন বস্ত্রের দ্বারা আবৃত একটি যষ্টির সাহায্যে আমাকে স্কন্ধে বহন করে নিয়ে যেতে হবে। তবে মনে রাখবে, আমাকে যেখানে স্থাপন করার ইচ্ছা সেখানেই রাখতে হবে। অন্যত্র স্কন্ধ থেকে নামালে আমি সেখানেই থেকে যাব। একথা তুমি জগদীশকে বলে দেবে।"

জগদীশ পণ্ডিত তাঁর সঙ্গী ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে শ্রীমূর্ত্তি বহন করে পশ্চিমবঙ্গে চক্রদহের অন্তর্গত গঙ্গার তটবর্ত্তী যশড়া শ্রীপাটে এসে উপস্থিত হলেন। শ্রীজগদীশ পণ্ডিত প্রভু একজন ব্রাহ্মণ সেবকের স্কন্ধে জগন্নাথকে রেখে গঙ্গায় স্নান তর্পণের জন্য গেলে অকস্মাৎ শ্রীজগন্নাথদেব অত্যন্ত ভারী হতে লাগলেন। নিরুপায় হয়ে সেবক স্কন্ধে রাখতে না পেরে জগন্নাথদেবকে মাটিতে নামিয়ে রাখলেন। শ্রীজগদীশ পণ্ডিত প্রভু স্নান ও তর্পণ সমাপ্ত করে ফিরে এসে দেখলেন শ্রীজগন্নাথদেব অবতরণ করেছেন। তিনি বুঝলেন শ্রীজগন্নাথদেবের এখানেই অবস্থান করার ইচ্ছা রয়েছে। সেই থেকে শ্রীজগন্নাথদেব চক্রদহেই অবস্থান করছেন। চক্রদহ একটি ঐতিহাসিক পবিত্র স্থান। পৌরাণিক যুগে এই স্থানটি 'রথবর্ম্ম' নামে খ্যাত ছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শ্রীপ্রদ্যুম্ন এই স্থানে সম্বরাসুরকে নিধন করেছিলেন। তারপরে সেই স্থানটি 'প্রদ্যুম্ন নগর' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। পরবর্ত্তীকালে সগর বংশ উদ্ধারের জন্য শ্রীভগীরথ কর্ত্তৃক গঙ্গা আনয়নকালে উক্ত স্থানে তাঁর রথচক্র প্রোথিত হওয়ায় 'প্রদ্যুম্ন নগর' 'চক্রদহ' নামে প্রচারিত হয়। বর্তমানে এই স্থানটি 'চাকদহ' নামে খ্যাত হয়েছে।

"অদ্যাপি একটি যষ্টি (বাঁক) জগদীশ পণ্ডিতের জগন্নাথ বিগ্রহ—আনা যষ্টি ব'লে যশোড়ার সেবায়েতগণ-কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হয়ে থাকে।" —চৈঃ চঃ আদি ১১/৩০ শ্লোকের অনুভাষ্য।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মাঝে মাঝে যশোড়া গ্রামে গমন করতেন এবং সংকীর্ত্তন মহোৎসব করতেন। শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের পুত্রের নাম শ্রীরামভদ্র গোস্বামী। যশোড়া মন্দিরে শ্রীজগন্নাথ দেব, শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ জীউ ও গৌর গোপাল মূর্ত্তি আছেন। প্রবাদ আছে, গৌর গোপাল মূর্ত্তি—শ্রীদুঃখিনী দেবীর স্থাপিত। এ গৌর গোপাল মূর্ত্তিটি পীতবর্ণ। মহাপ্রভু জগদীশ পণ্ডিতের ঘরে কয়েক দিন মহোৎসব করবার পর নীলাচলে যেতে উদ্যত হলে জগদীশ পত্নী শ্রীদুঃখিনী দেবী গৌর বিরহে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েন। তখন মহাপ্রভু ঐ মূর্ত্তি দিয়ে বলেন—আমি নিত্য বিগ্রহরূপে তোমার ঘরে রইলাম। তদবধি ঐ গৌর গোপাল মূর্ত্তি সেবিত হচ্ছেন।

শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকায়—

অপরে যজ্ঞপত্নৌ শ্রীজগদীশ হিরণ্যকৌ।<br>
একাদশ্যাং যয়োরন্নং প্রার্থয়িত্বাহযসৎ প্রভুঃ।।

কেউ কেউ বলেন—পূর্ব্বে যাঁরা যজ্ঞপত্নী ছিলেন, এবার তাঁরা জগদীশ হিরণ্য নামে খ্যাত হয়েছেন। আবার কেউ কেউ বলেন—যিনি পূর্ব্বে চন্দ্রহাস নামে ব্রজের নর্ত্তক ছিলেন, অধুনা তিনি নৃত্য বিনোদী জগদীশ পণ্ডিত নামে খ্যাত।

মহাপ্রভু শিশুকালে এক একাদশী তিথিতে জগদীশ পণ্ডিত ও শ্রীহিরণ্য পণ্ডিতের ঘরের অন্ন মেগে খেয়েছিলেন।

প্রভু বোলে—যদি মোর প্রাণ রক্ষা চাহ।<br>
তবে ঝাট দুই ব্রাহ্মণের ঘরে যাহ।।<br>
জগদীশ পণ্ডিত হিরণ্য ভাগবত।<br>
এই দুই স্থানে আমার আছে অভিমত।।

একাদশী উপবাস আজি সে দোঁহার।
বিষ্ণু লাগি করিয়াছে যত উপহার।।
সে সব নৈবেদ্য যদি খাইবারে পাঙ।
তবে মুঞি সুস্থ হই হাঁটিয়া বেড়াও।।

চৈঃ ভাঃ আদিঃ ৬/২০-২৩

একদিন শিশু গৌরহরির ক্রন্দন আর থামে না। সকলে বলতে লাগলেন—বাপ! তুমি কি চাও? যা চাইবে তা পাবে। বালক বললেন—আজ একাদশীতে জগদীশ ও হিরণ্য পণ্ডিতের ঘরে বিষ্ণুর জন্য অনেক নৈবেদ্য হয়েছে। সে সব যদি খেতে পারি তবে আমি সুস্থ হব। বালকের এরূপ অসম্ভব কথা শুনে শ্রীশচীমাতা শিরে হাত দিয়ে খেদ করতে লাগলেন। প্রতিবেশীগণ বালকের বাক্য শুনে আশ্চর্য্য হয়ে হাসতে লাগলেন। আজ একাদশী এটুকু শিশু তা কি করে জানল? নারীগণ বললেন—বাপ নিমাই! তুমি কান্না বন্ধ কর, তোমাকে তাই দিব।

''শুনিয়া শিশুর বাক্য দুই বিপ্রবর।
সন্তোষে পূর্ণিত হৈল সর্ব্ব কলেবর।।"

চৈঃ ভাঃ আদিঃ ৬/২৭

জগদীশ ও হিরণ্য দুই জন শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের পরম মিত্র ছিলেন। নিমাইয়ের কান্নার খবর তাঁরা লোক মুখে শ্রবণ করলেন। তাঁরা পূর্ব্বে জানতে পেরেছিলেন জগন্নাথমিশ্রের ঘরে শ্রীহরি জন্মগ্রহণ করেছেন। তাই তাঁরা শ্রীহরির জন্য যা কিছু করেছিলেন, সবকিছু নিয়ে শ্রীগৌরসুন্দরের সম্মুখে রেখে দিলেন ও বললেন—

''দুই বিপ্র বোলে বাপ খাও উপহার।
সকল কৃষ্ণের স্বার্থ হইল আমার।।"

চৈঃ ভাঃ আদি ৬/৩৩

বাপ বিশ্বম্ভর! সুখে এ সমস্ত জিনিষ খাও। আজ আমাদের কৃষ্ণ পূজা সার্থক হল। ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর শিশুগণের সঙ্গে সে অন্ন আনন্দে ভোজন করতে করতে জগদীশ ও হিরণ্য পণ্ডিতকে দিব্য বালগোপাল-স্বরূপ দর্শন করিয়েছিলেন।

অনেকশিশুমণ্ডলী বিহিতমণ্ডলান্তস্থিতং
স্ফুরন্নব-ঘন প্রভং শিখিশিখণ্ডচূড়োজ্জ্বলম্।
মুদাশ্নদতিসুন্দরং প্রকটিতং শচীসূনুনা।
হিরণ্যজগদীশয়োর্নয়নবর্ত্ম ভেজে বপুঃ।।

গৌরাঙ্গ চম্পু ৯/২০

নবমেঘসম কান্তিতে উদ্ভাসিত ময়ূর-পুচ্ছে চূড়ায় অতিশয় সমুজ্জল অনেক শিশুমণ্ডলীর মধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক আনন্দের সহিত ভোজনরত, এরূপ সুন্দর বিগ্রহ শচীনন্দন কর্ত্তৃক প্রকটিত হয়ে জগদীশের ও হিরণ্যের নয়ন পথে দৃষ্ট হলেন।

জগদীশ ও হিরণ্য সে দিব্য রূপ দেখে আনন্দে 'হরি' 'হরি' ধ্বনি করতে লাগলেন।

মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর বোধ হয় শ্রীজগদীশ পণ্ডিত যশোড়াতে এসে বাস করতেন। প্রতি বছর গৌড়ীয় ভক্তদের সঙ্গে মহাপ্রভুর দর্শনে পুরীতে যেতেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু পাণিহাটিতে যে চিড়াদধি মহোৎসব করেছিলেন, তাতে শ্রীজগদীশ পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন।

বর্তমানে শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাটের সেবা পরিচালনা করছেন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ। শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকায় ২য় বর্ষ ৯ম সংখ্যায় বর্ণিত হয়েছে--

**''ভক্তপ্রেমবশ্য ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহার ভক্তের সেবা গ্রহণ করিবার জন্য কতই না ছল অবলম্বন করেন। লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমান গোবিন্দেরও যেন সেবকের অভাব হইয়া যায়, সেবাতে যেন বিঘ্ন উপস্থিত হয়। অভীপ্সিত সেবককে সেবা দিবার জন্য লীলাময় শ্রীহরি কতই না লীলাভঙ্গী প্রকট করেন। শ্রীগোবর্দ্ধনধারী গোপাল তাঁহার প্রিয় ভক্ত শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের**

সেবা স্বীকারের জন্য কতই না ভঙ্গী উত্থাপন করিলেন। পূর্ব্ব-সেবককে ম্লেচ্ছভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক তৎস্কন্ধারোহণে শ্রীগোবর্দ্ধন পর্ব্বতোপরি জঙ্গলাভ্যন্তরে আগমন এবং পুরীপাদের সেবা-প্রতীক্ষায় তথায় অবস্থান-- 'বহুদিন তোমার পথ করি নিরীক্ষণ। কবে আসি মাধব আমা করিবে সেবন।।"--লীলাময়ের এইরূপ কতই না লীলাভঙ্গী! শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের ও তাঁহার ভক্তিমতী ভার্য্যা দুঃখিনী মায়ের স্বহস্ত সেবিত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব ও শ্রীগৌরগোপাল বিগ্রহও তদ্রূপ এক অপূর্ব্ব লীলাভঙ্গী করিয়া ভক্তরাজ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের সেবা অযাচিত ভাবে অঙ্গীকার করিলেন।"

শ্রীজগদীশ পণ্ডিত প্রভুর বংশপরম্পরায় অধস্তনগণ শ্রীবিশ্বনাথ গোস্বামী, শ্রীশম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায় মহোদয়গণ আর্থিক অবস্থাবৈগুণ্যক্রমে শ্রীবিগ্রহগণের যথারীতি দৈনন্দিন ও নিত্যনৈমিত্তিক সেবা পরিচালন এবং বার্ষিক উৎসবাদি অনুষ্ঠানবিষয়ে এবং জীর্ণ মন্দিরের সংস্কার সাধনে অসামর্থ্য হেতু যশড়া শ্রীপাটের শ্রীপাঁচু ঠাকুর মহাশয়ের ও রাণাঘাটের শ্রীসন্তোষ কুমার মল্লিকের প্রেরণায় বিগত ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে যশড়া শ্রীপাটের সেবাটী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের শ্রীহস্তে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা সেবা-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমন্দিরের জীর্ণোদ্ধার ও নূতন গৃহাদি নির্ম্মাণের এবং মঠের বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থাদির জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা যশড়া শ্রীপাটের সেবাপ্রাপ্তির পর প্রথম বার্ষিক মহোৎসবে ময়দানে বসাইয়া সহস্র সহস্র নরনারীকে মহাপ্রসাদের দ্বারা যে ভাবে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন এবং তাহাতে যে আনন্দের প্লাবন আসিয়াছিল, তাহা আজও স্মরণ করিয়া সকলে পুলকিত হন।

পৌষ শুক্লতৃতীয়া শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের তিরোভাব তিথি।

।। জয় শ্রীজগদীশ পণ্ডিত কি জয়।।

# শ্রীমহেশ পণ্ডিত

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—

মহেশ পণ্ডিত ব্রজের উদার গোপাল।
ঢক্কা বাদ্যে নৃত্য করে প্রেমে মাতোয়াল।।

চৈঃ চঃ আদি ১১/৩২

ব্রজের দ্বাদশ গোপালের অন্যতম, উদার গোপাল ছিলেন মহেশ পণ্ডিত। তিনি শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে মত্ত মাতালের ন্যায় নৃত্য করতেন। শ্রীগৌর গণোদ্দেশ দীপিকায়--''মহেশ পণ্ডিতঃ শ্রীমন্মহাবাহুব্রজে সখা।।'' মতান্তরে মহেশ পণ্ডিত মহাবাহু নামে সখা ছিলেন। ইনি শ্রীনিত্যানন্দ সহচর ছিলেন। পাণিহাটিতে চিড়া-দধি মহোৎসবে ইনি উপস্থিত ছিলেন। এনার শ্রীপাট বর্ত্তমান চাকদহে আছে।

মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট প্রথমে জিরাটের পূর্বপার মসিপুরে ছিল। গঙ্গার ভাঙ্গনের ফলে মসিপুর জলমগ্ন হলে সেখান থেকে শ্রীপাট সুখসাগরের নিকটবর্তী বেলেডাঙ্গায় স্থানান্তরিত হয়। পরবর্তীতে গঙ্গার ভাঙ্গনে বেলেডাঙ্গার শ্রীপাটও গঙ্গাগর্ভে প্রবেশ করলে ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে শ্রীপাট পালপাড়ায় অবস্থিত হয়। পালপাড়া পাঁচনগর পরগনার অন্তর্গত। সবশেষে শ্রীপাটটি চাকদহের কাঁঠালপুলিতে স্থানান্তরিত হয়।

(শ্রীল প্রভুপাদের অনুভাষ্য চৈঃ চঃ আদি ১১/৩২)

শ্রীল মহেশ পণ্ডিত শ্রীচৈতন্যশাখা ও শ্রীনিত্যানন্দশাখা এই উভয় শাখায় গণিত হন। কেউ কেউ বলেন মহেশ পণ্ডিত যশড়া শ্রীপাটের শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের ছোট ভাই। এনারা তিন ভাই জগদীশ, হিরণ্য ও মহেশ।

তবে এই বিষয়ে কোন প্রমাণিক উক্তি না থাকায় সন্দেহ আছে।" (চৈঃ চঃ আদি ১১/৩২ অনুভাষ্য)

ভক্তি রত্নাকরের অষ্টম তরঙ্গে দেখা যায়, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর যখন খড়দহে আগমন করেন, তখন তিনি শ্রীমহেশ পণ্ডিতের শ্রীচরণ দর্শন করেছিলেন।

''মহেশ পণ্ডিত অতি পরম মহান্ত।।''

চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৫/৭৪৪

শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহেশ পণ্ডিতকে পরম মহান্ত নিত্যানন্দের পরম প্রিয়জন বলে বলেছেন। পৌষ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী তিথিতে শ্রীমহেশ পণ্ডিত অপ্রকট হন।

**।। জয় শ্রীল মহেশ পণ্ডিত কি জয়।।**

# শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত

বর্ধমান জেলার অন্তর্গত অম্বিকা কালনা শ্রীগৌর নিত্যানন্দের জীবন্ত বিগ্রহের লীলার গোপন স্থান। অম্বিকা কালনা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের তীর্থস্থানের পুরাতন সম্পদ। এ শহরে শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত বাস করতেন। বর্তমানে শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের গৃহে শ্রীগৌর নিত্যানন্দের শ্রীমূর্ত্তি বিরাজ করছেন। শ্রীমন্দিরে মহাপ্রভুর শ্রীহস্ত-লিখিত গীতা পুঁথি আছে। প্রবাদ আছে শ্রীমহাপ্রভু নৌকাযোগে গঙ্গা পার হয়ে বৈঠাখানি শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের কাছে এই বলে রেখে যান—এ বৈঠা দিয়ে তুমি জীবদের ভব-নদীর পর-পারে নিয়ে যেও। মন্দিরে আজও এ বৈঠা আছে। গৌরীদাস পণ্ডিতের বড় ভাই সূর্য্যদাস সরখেল। তাঁর দুই কন্যা—শ্রীবসুধা ও জাহ্নবা দেবী। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এ দুই কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু নবদ্বীপে বিবিধ লীলা বিলাস করবার পর যখন সন্ন্যাস লীলা করতে ইচ্ছা করেন এবং কালনায় শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের নিকট বিদায় চাইতে আসেন, তখন শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত অত্যন্ত বিরহকাতর হয়ে পড়লেন।

গৌরীদাস অত্যন্ত বিরহ ব্যাকুল হয়ে ক্রন্দন করতে করতে গৌর নিত্যানন্দের পদতলে পড়ে বললেন—''হে প্রভু! যদি তোমরা আমাকে ছেড়ে চলে যাও, তাহলে আমি আর প্রাণে বাঁচব না। তোমরা এখানেই অবস্থান কর। আমার প্রতি দয়া কর।''

গৌরীদাসের ক্রন্দন শুনে, গৌর নিত্যানন্দ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—''গৌরীদাস! তুমি দুঃখ করো না। তুমি আমাদের মূর্ত্তির সেবা কর। আমরা বিগ্রহের মধ্যে সর্বদা অবস্থান করি। এতে তুমি কোন সন্দেহ করো না।''

গৌরীদাস আবারো কাঁদতে কাঁদতে বললেন, ''প্রভু! শ্রীমূর্তি এবং তোমাদের মধ্যে কোন ভেদ নাই জানি। কিন্তু আমার একান্ত ইচ্ছা তোমরা স্বয়ং এখানে অবস্থান কর।''

গৌরীদাসের আর্ত্তি দেখে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ প্রভু বললেন ''গৌরীদাস! আমরা কথা দিচ্ছি, আজ থেকে আমরা দু'ভাই তোমার ঘরেই থেকে যাব।'' এই বলে গৌর-নিত্যানন্দ প্রভু তাঁদের দুই প্রতিমূর্ত্তি নিয়ে গৌরীদাসের সামনে উপস্থিত হলেন। এবার দুই-দুই গৌর-নিতাই হয়ে গেল। তাঁদের দর্শন করে গৌরীদাস প্রেমানন্দে বিহ্বল হয়ে গেলেন। কোনটি আসল গৌর-নিতাই আর কোনটি বিগ্রহ তা তিনি গুলিয়েই ফেললেন।

মহাপ্রভু বললেন, ''গৌরীদাস! আমাদের চার জনের মধ্যে যে কোন দু'জনকে রেখে দাও। তুমি ভাববে না যে আমরা তোমাকে ফাঁকি দেব। তোমার রন্ধনকৃত দ্রব্য আমরা নিত্য ভোজন করব।''

গৌরীদাস রন্ধন করলেন। চারজন গৌর-নিতাই ভোজন করলেন। দু'জন গৌর-নিতাই কালনায় থেকে গেলেন আর দু'জন জগৎ উদ্ধারের জন্য বেড়িয়ে গেলেন।

শ্রীগৌরীদাসের প্রেমাধীন হয়ে শ্রীগৌর নিত্যানন্দ 'শ্রীমূর্ত্তি' ধারণ করে বিহার করতে লাগলেন। একদিন শ্রীগৌর নিত্যানন্দ মৃদু হাস্য করতে করতে গৌরীদাসকে বললেন—''হে গৌরীদাস! তুমি পূর্ব্বে সুবলসখা ছিলে। এ সব কি তোমার মনে

নাই? যমুনা পুলিনে আমরা কত বিলাস করেছি।” শ্রীগৌর নিত্যানন্দ এরূপ মধুর আলাপ করতে করতে কৃষ্ণ বলরাম মূর্ত্তি ধারণ করলেন। সেই গোপবেশ, হস্তে শিঙ্গা, বেত্র ও বেণু; শিরে শিখি-পুচ্ছ, গলে বনমালা, চরণে নূপুর দাম। শ্রীগৌরীদাসও পূর্ব্বভাব ধারণ করলেন। এ ভাবে কিছুক্ষণ বিলাস করলেন। অতঃপর প্রভুর ইচ্ছায় শ্রীগৌরীদাস স্থির হলেন। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ সিংহাসনে উপবেশন করলেন।

প্রতিদিন বহুবিধ ব্যঞ্জন রন্ধন করে শ্রীগৌরীদাস শ্রীগৌর নিত্যানন্দকে ভোগ দিতেন। সর্ব্বদা সেবায় তন্ময়। নিজের শারীরিক ক্লেশাদির অনুভূতি নাই। পণ্ডিত ক্রমে বার্দ্ধক্য দশায় উপনীত হলেন। তথাপি ঐরূপ রন্ধন করে ভোগ দেওয়া বন্ধ করলেন না। তার রন্ধন-শ্রম দেখে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ একদিন বাইরে রোষ-ভাব দেখিয়ে অভুক্ত অবস্থায় থাকলেন। তখন পণ্ডিত প্রণয়-ক্ষোভ করে বলতে লাগলেন—

বিনা ভক্ষণেতে যদি সুখ পাও মনে।
তবে মোরে রন্ধন করাহ কি কারণে।।
এত কহি গৌরীদাস রহে মৌন ধরি।
হাসি প্রভু পণ্ডিতে কহয়ে ধীরি ধীরি।।
অল্পে সমাধান নহে তোমার রন্ধন।
অন্নাদি করহ বহু প্রকার ব্যঞ্জন।।
নিষেধ না মান শ্রম দেখিতে না পারি।
অনায়াসে যে হয় তাহাই সর্ব্বোপরি।।

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের উক্তি শুনে শ্রীগৌরীদাস বললেন—আজ ত ভোজন কর; বহু পদ করে তোমাদের আর ভোজন করাব না। শাক-মাত্র রন্ধন করে তোমাদের পাতে দিব। পণ্ডিতের কথা শুনে দুই ভাই হাসতে হাসতে ভোজন করতে লাগলেন।

কোন সময় পণ্ডিতের ইচ্ছা হল শ্রীগৌর-নিত্যানন্দকে অলঙ্কার পরাবেন। তাঁর এ ইচ্ছা জানতে পেরে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ বিবিধ অলঙ্কার পড়ে সিংহাসনে বিরাজ করতে লাগলেন। পণ্ডিত মন্দিরে প্রবেশ করে অবাক্ হলেন। এত অলঙ্কার কোথা থেকে এল? শ্রীগৌরীদাস আনন্দে বিহ্বল হলেন। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ এ-রূপে বহু লীলা বিলাস করে শ্রীগৌরীদাসের ঘরে বিরাজ করতে লাগলেন।

শ্রীগৌরীদাসের প্রিয় শিষ্য ছিলেন শ্রীহৃদয়চৈতন্য। একবার শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মতিথি উপলক্ষে শ্রীগৌরীদাস শিষ্যগৃহে গেলেন। যাবার সময় শ্রীহৃদয়চৈতন্যকে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের সেবাভার দিয়ে গেলেন। হৃদয়চৈতন্য খুব প্রেমভরে সেবা করতে লাগলেন। গৌর-জন্মোৎসব নিকটবর্ত্তী হল। মাত্র তিন দিন সময় আছে। এখন পর্য্যন্ত শ্রীগৌরীদাস ফিরে এলেন না। হৃদয়চৈতন্য খুব চিন্তা করতে লাগলেন। অতঃপর স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে উৎসবের নিমন্ত্রণ পত্রাদি লিখে শিষ্য-ভক্তদের কাছে প্রেরণ করলেন। ঠিক এ-সময় শ্রীগৌরীদাস ফিরে এলেন, হৃদয়চৈতন্য শ্রীগুরুদেবের কাছে পত্রাদি লিখে তিনি যে শিষ্য-ভক্তদের আমন্ত্রণ করেছেন, তা জানালেন। গৌরীদাস অন্তরে অন্তরে যদিও সুখী হলেন, তথাপি বাইরে ক্রোধ দেখিয়ে বলতে লাগলেন—

মোর বিদ্যমানে কৈলা স্বতন্ত্রাচরণ।।
নিমন্ত্রণ পত্রী পাঠাইলা যথা তথা।
যে কৈলা সে কৈলা এবে না রহিবা এথা।।
ঐছে শুনি প্রণমিয়া চরণ-যুগলে।
গঙ্গা-তীরে গিয়া রহিলেন বৃক্ষতলে।।

শ্রীহৃদয়চৈতন্য শ্রীগুরুচরণে প্রণাম করে গঙ্গাতীরে এলেন এবং এক বৃক্ষতলে অবস্থান করতে লাগলেন। এমন সময় একজন ধনী ব্যক্তি নৌকায় বহুধন নিয়ে হৃদয়চৈতন্যের নিকট এলেন। হৃদয়চৈতন্য সেই ধন সম্পদ গুরু গৌরীদাসের

নিকট পাঠিয়ে দিলেন। সেই ধন দিয়ে শ্রীগৌরীদাস হৃদয়চৈতন্যকে গঙ্গাতীরে উৎসব করতে বললেন। শ্রীগুরুদেবের আদেশ পেয়ে শ্রীহৃদয়চৈতন্য গঙ্গাতীরে উৎসব আরম্ভ করলেন। ক্রমে ক্রমে বৈষ্ণবগণ সেখানে সমবেত হতে লাগলেন। হৃদয়চৈতন্য ভক্ত মহান্তগণকে নিয়ে উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। তাঁদের মধ্যে স্বয়ং শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ নৃত্য গীত করলেন; হৃদয়চৈতন্য স্বচক্ষে তা দেখতে পেলেন। এদিকে শ্রীগৌরীদাস উৎসব করছেন; পূজারী গঙ্গাদাস মন্দিরে প্রবেশ করে দেখেন সিংহাসনে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ নাই। এ-ব্যাপার তিনি শীঘ্র শ্রীগৌরীদাসকে জানালেন। পণ্ডিত বুঝতে পারলেন--হৃদয়চৈতন্যের প্রেমে বশ হয়ে দুই ভাই তাঁর কীর্ত্তনে যোগদান করেছেন। তখন শ্রীগৌরীদাস মৃদু হাসতে হাসতে একখানি লাঠি হাতে নিয়ে গঙ্গাতটে যেখানে কীর্তন হচ্ছিল সেখানে এলেন।

চলিলেন গঙ্গাতটে যথা সংকীর্তন।
দেখে দুই ভাই তথা করয়ে নর্তন।।
দুই ভাই দেখি পণ্ডিতের ক্রোধাবেশ
অলক্ষিতে গিয়া কৈল মন্দিরে প্রবেশ।।

শ্রীগৌরীদাস দেখলেন গৌর-নিত্যানন্দ শ্রীহৃদয়- চৈতন্যের হৃদয়মন্দিরে প্রবেশ করছেন। তা দেখে আনন্দে শ্রীগৌরীদাস নয়নাশ্রু সম্বরণ করতে পারলেন না। বাহ্যতঃ যে ক্রোধ ছিল তা ভুলে গেলেন ও দুই ভুজ উত্তোলন করে ধেয়ে জড়িয়ে ধরলেন শ্রীহৃদয়কে, বললেন—তুমি ধন্য! আজ হতে তোমার নাম ‘‘হৃদয়চৈতন্য’’ হল। নয়ন জলে হৃদয়চৈতন্যকে সিক্ত করতে লাগলেন। হৃদয়চৈতন্য প্রেমে লুটিয়ে পড়লেন শ্রীগৌরীদাসের শ্রীচরণ-তলে। অতঃপর পণ্ডিত হৃদয়চৈতন্যকে নিয়ে স্বগৃহে এলেন এবং প্রাঙ্গণে মহাসংকীর্ত্তন নৃত্য আরম্ভ করলেন। বৈষ্ণবগণ মহানন্দে ‘হরি’ ‘হরি’ ধ্বনিতে দশদিক্ মুখরিত করতে লাগলেন। এইরূপে শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মোৎসব শেষ হল। অতঃপর শ্রীগৌরীদাস শ্রীহৃদয়চৈতন্যকে সেবার অধিকার প্রদান করলেন।

শ্রাবণ শুক্লা ত্রয়োদশীতে শ্রীগৌরীদাসের তিরোভাব হয়। শ্রীগৌরীদাসের শিষ্য শ্রীহৃদয়চৈতন্য ও শ্রীহৃদয়চৈতন্যের শিষ্য শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু। শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে সপ্তম তরঙ্গে শ্রীগৌরীদাসের মহিমা বর্ণন করেছেন।

**।। জয় শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত কি জয়।।**

# শ্রীজাহ্নবা দেবী

''নবদ্বীপ হইতে অল্পদূর শালিগ্রাম।
তথা বৈসে পণ্ডিত সূর্যদাস নাম।।
গৌড়ে রাজা যবনের কার্য্যে সুসমর্থ।
'সরখেল' খ্যাতি, উপার্জিল বহু অর্থ।।
সূর্যদাস চারিভ্রাতা অতি শুদ্ধাচার।
সর্বত্র বিদিত তাহা কহিব কি আর।।
শ্রীসূর্যদাসের গুণ কহিলে না হয়।
বসুধা, জাহ্নবা নামে তাঁর কন্যাদ্বয়।।"

—ভক্তিরত্নাকর ১২শ তরঙ্গ ৩৮৭৫-৩৮৭৮

শ্রীসূর্যদাস সরখেল শালি গ্রামে বাস করতেন। দামোদর, জগন্নাথ, গৌরীদাস, কৃষ্ণদাস ও নৃসিংহচৈতন্য—শ্রীসূর্যদাসের এই পাঁচজন ভাই ছিলেন। পিতার নাম শ্রীকংসারি মিশ্র। মাতার নাম শ্রীকমলা দেবী। সূর্যদাস গৌড়ের রাজার পয়সাকড়ির হিসাব রক্ষকের কার্য্য করতেন বলে তাঁকে সরখেল উপাধি দেওয়া হয়।

সূর্যদাস সরখেলের দুটি কন্যা ছিল। বড় জনের নাম শ্রীবসুধা ও ছোটজনের নাম শ্রীজাহ্নবা। গৌর গণোদ্দেশ দীপিকাতে বলেছেন—

শ্রীবারুণী-রেবতবংশসম্ভবে
তস্য প্রিয়ে দ্বে বসুধা চ জাহ্নবী।
শ্রীসূর্য্যদাসস্য মহাত্মনঃ সুতে
ককুদ্মিরূপস্য চ সূর্য্যতেজসঃ।।

শ্রীবলদেবের পত্নী 'বারুণীদেবী' এবং রেবতবংশে উৎপন্ন 'রেবতীদেবী' এখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পত্নী 'বসুধা' ও 'জাহ্নবা'। এরা দুজনই সূর্যের ন্যায় তেজস্বী মহাত্মা সূর্যদাস সরখেলের কন্যা। এই 'সূর্যদাস' পূর্ব্বে রেবতীর পিতা 'ককুদ্মী' ছিলেন।।

কেচিৎ শ্রীবসুধাদেবীং কলাবপি বিবৃণ্বতে।
অনঙ্গমঞ্জরীং কেচিজ্জাহ্নবীঞ্চ প্রচক্ষতে।
উভয়ন্তু সমীচীনং পূর্ব্বন্যায়াৎ সতাং মতম্।।

কলিযুগে কেউ শ্রীবসুধাদেবীকে আবার কেউ শ্রীজাহ্নবা দেবীকে 'অনঙ্গমঞ্জরী' বলে থাকেন। সাধুদের মতে দুটি বিচারই সঠিক।।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রিয়াদ্বয় শ্রীবসুধা ও জাহ্নবা দেবী, বারুণী এবং রেবতীর অংশে জন্ম। শ্রীসূর্য্যদাস পণ্ডিত সূর্য্যের ন্যায় কান্তি বিশিষ্ট রৈবতরাজ ককুদ্মির অংশ-সম্ভূত ছিলেন। সূর্য্যদাস সরখেল শ্রীনিত্যানন্দের ও শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয় পাত্র ছিলেন। তিনি কন্যাদ্বয়ের যৌবন দশা দেখে তাঁদের বিবাহের কথা চিন্তা করতে লাগলেন।

সূর্যদাস পণ্ডিত চিন্তিয়া মনে মনে।
করিতে শয়ন নিদ্রা হইল সেইক্ষণে।।
স্বপ্নচ্ছলে দেখে মহামনের আনন্দে।
দুই কন্যা সম্প্রদান করে নিত্যানন্দে।।

(শ্রীভক্তি রত্নাকর দ্বাদশ তরঙ্গ)

অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন করে সূর্য্যদাস পণ্ডিত আনন্দ-সাগরে ভাসতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর নিদ্রা ভঙ্গ হল। প্রাতঃকালে একজন মিত্র ব্রাহ্মণের নিকট স্বপ্ন-কথা বলতে লাগলেন—আমি দেখছি নিত্যানন্দ প্রভু সাক্ষাৎ বলরাম। তাঁর অপূর্ব্ব অঙ্গকান্তিতে দশদিক আলোকিত। নানা রত্নালঙ্কারে অঙ্গ সুশোভিত। আমার কন্যা দুটি দুই পার্শ্বে বারুণী ও রেবতী রূপে শোভা পাচ্ছে। অতএব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণে আমি কন্যা দান করব। তা না করা পর্য্যন্ত আমার চিত্তে কোন শান্তি নাই।

এরূপ অনেক কথা বলে শ্রীসূর্য্যদাস সরখেল মিত্র ব্রাহ্মণটিকে নবদ্বীপে শ্রীবাস পণ্ডিতের নিকট প্রেরণ করলেন। অতি দ্রুত ব্রাহ্মণটি শ্রীবাস পণ্ডিত গৃহে এলেন। তখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবাসের গৃহে অবস্থান করছিলেন। ব্রাহ্মণটি সূর্য্যদাস সরখেলের নিবেদন শ্রীবাস পণ্ডিতকে সব জানালে, শ্রীবাস পণ্ডিত শুনে সুখী হলেন ও সেই কথা সময়মত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণে নিবেদন করলেন। করুণাময় শ্রীনিত্যানন্দ সূর্য্যদাস পণ্ডিতের অভিপ্রায় পূর্ণ করবেন বলে ব্রাহ্মণকে আশ্বাস দিলেন। এ কথা শ্রবণে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যও পরম সুখী হলেন। শীঘ্র এই কার্য্য হোক এরূপ বললেন। ব্রাহ্মণ শালিগ্রামে ফিরে এসে সূর্য্যদাস পণ্ডিতকে শুভ সমাচার দিলেন। সমাচার শুনে সূর্য্যদাসের আনন্দের সীমা রইল না।

বড়গাছি গ্রাম-নিবাসী রাজা হরি হোড়ের পুত্র—শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর একান্ত প্রিয় ভক্ত। তিনি এ বিবাহের যাবতীয় ব্যয় বহন করবেন এবং তার গৃহেই এ সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হবে—সংকল্প করে শীঘ্র শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে প্রার্থনা করে বড়গাছি গ্রামে আনলেন ও বিবাহের উদ্যোগ আরম্ভ করলেন। শ্রীবাস, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীচন্দ্রশেখর ও শ্রীমুরারি গুপ্ত প্রভৃতি যাবতীয় গৌরভক্তবৃন্দ সমবেত হয়ে সংকীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। শ্রীসূর্য্যদাস পণ্ডিতের ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণদাস শীঘ্র বড়গাছি গ্রামে এলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সমস্ত বৈষ্ণবগণকে নিয়ে শালিগ্রামে এলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে ও যাবতীয় ভক্তগণকে দর্শন করে সূর্য্যদাস পণ্ডিত পরমানন্দে কিছু পথ অগ্রসর হয়ে অভিনন্দন পূর্ব্বক স্বীয় গৃহে আনলেন এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন।

লোটাইয়া পড়ে নিত্যানন্দ পদতলে।
সূর্য্যদাস ভাসে দুই নয়নের জলে।।
দুই হাতে ধরি' চরণ দু'খানি।
কহিতে চাহয়ে কিছু না স্ফুরয়ে বাণী।।
মন্দ মন্দ হাসি' নিত্যানন্দ প্রেমাবেশে।
কৃপা করি' কৈলা আলিঙ্গন সূর্য্যদাসে।।
সূর্য্যদাস আনন্দে বিহ্বল নিরন্তর।
কে বুঝিতে পারে সূর্য্যদাসের অন্তর।।
দেখিয়া ভ্রাতার প্রেম চেষ্টা গৌরীদাস।
না ধরে ধৈর্য, অতি অন্তরে উল্লাস।।

ভক্তিরত্নাকর দ্বাদশ তরঙ্গে

অতঃপর শ্রীসূর্য্যদাস পণ্ডিত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীপাদ-পদ্মযুগল পূজা করে শ্রীবসুধা ও শ্রীজাহ্নবা দেবীকে তাঁর হাতে সমর্পণ করলেন।

লোক-শাস্ত্রমতে সূর্য্যদাস ভাগ্যবান্।
নিত্যানন্দ চন্দ্রে দুই কন্যা কৈল দান।।

ভঃ রঃ ১২/৩৯৮৩

এবারে শুভ পরিণয় হবার পর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কয়েক দিন শালিগ্রামে অবস্থান করে পত্নীদ্বয় সঙ্গে বড়গাছি শ্রীকৃষ্ণ দাসের গৃহে এলেন। সেখানে কয়েক দিন অবস্থান করার পর শ্রীনবদ্বীপে এলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু দুই প্রিয়াসহ শ্রীশচী মাতার গৃহে এসে শ্রীশচী মাতাকে নমস্কার করলেন। বসুধা জাহ্নবা দেবীকে দেখে শ্রীশচীমাতা অতিশয় হর্ষিত হলেন এবং স্নেহ করে কোলে নিয়ে বার বার তাঁদের চিবুক স্পর্শ করতে লাগলেন। ''শ্রীবসু, জাহ্নবা দোঁহে দেখি' এথা আই। করিল যতেক স্নেহ—কহি সাধ্য নাই''।। —ভঃ রঃ ১২/৪০১০

বৈষ্ণব-গৃহিণীগণ বধূদ্বয়কে পরম স্নেহ করতে লাগলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অতঃপর শ্রীশচীমাতার আজ্ঞা নিয়ে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে এলেন। শ্রীসীতা ঠাকুরাণী বসুধা জাহ্নবাকে দর্শন করে আনন্দ-সাগরে ভাসতে লাগলেন, কোলে নিয়ে কত স্নেহ করলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কিছুদিন

অদ্বৈতাচার্য্যের ভবনে অবস্থান করে শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের বিশেষ প্রার্থনায় সপ্তগ্রামে তাঁর ভবনে এলেন। সেখানে কয়েকদিন সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসব সমাপনান্তে খড়দহ গ্রামে আগমন করলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ভক্তগণ সঙ্গে অনন্তর সংকীর্ত্তন-রঙ্গে সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করতে বাহির হলেন।

শ্রীবসুধা দেবীর গর্ভে শ্রীগঙ্গা নাম্নী কন্যা ও বীরচন্দ্র (বীরভদ্র) নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীজাহ্নবা দেবীর কোন পুত্র সন্তান হয় নাই।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীবাস পণ্ডিত ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এবং অন্যান্য গৌরপার্ষদগণের অপ্রকটের পর পুনঃ সংকীর্ত্তন-বন্যা প্রবাহিত করেন শ্রীগৌরসুন্দরের করুণা শক্তিত্রয় শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম ঠাকুর তথা শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু। আচার্য্যত্রয় যে লোক-বিশ্রুত মহামহোৎসব করেছিলেন খেতরি গ্রামে রাজা সন্তোষ দত্তের গৃহে, সে-উৎসবে শ্রীনিত্যানন্দ শক্তি শ্রীজাহ্নবা মাতা আচার্য্যবৃন্দের বিশেষ প্রার্থনায় শুভাগমন করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন শ্রীকৃষ্ণদাস মিশ্র (শ্রীজাহ্নবা দেবীর কাকা) মীনকেতন রামদাস, মুরারি চৈতন্য, জ্ঞানদাস, শ্রীপরমেশ্বরী দাস, বলরাম দাস ও শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর প্রভৃতি শ্রীনিত্যানন্দের প্রিয়তম ভক্তগণ। শ্রীজাহ্নবা মাতা প্রথমে ভক্তগণের সাথে অম্বিকা কালনায় তাঁর কাকা শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের গৃহে এলেন, শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীহৃদয় চৈতন্য দাস অতি সাদরে ঈশ্বরী শ্রীজাহ্নবা মাতাকে ও যাবতীয় ভক্তবৃন্দকে অভ্যর্থনা করলেন। শ্রীজাহ্নবা মাতা সেখানে স্বহস্তে রন্ধন করে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দকে ভোগ লাগান। একরাত্র সেখানে মহোৎসব করে শ্রীনবদ্বীপে এলেন। মহাপ্রভুর গৃহে এসে এবার শ্রীশচীমাতার দর্শন না পেয়ে, তাঁর বিরহে শ্রীজাহ্নবা দেবী বহু খেদ করলেন। শ্রীপতি ও শ্রীনিধি এসে শ্রীঈশ্বরীকে অতি আদর করে নিজ গৃহে নিয়ে গেলেন। শ্রীঈশ্বরী শ্রীবাস পণ্ডিত ও শ্রীমালিনী দেবীর চরণ দর্শন না পেয়ে অতিশয় কাতর হৃদয়ে কত ক্রন্দন করেন। একদিন সেখানে অবস্থান পূর্ব্বক শান্তিপুরে আগমন করেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য ও শ্রীসীতা ঠাকুরাণীর অপ্রকটে শ্রীজাহ্নবা মাতা বহু খেদ করলেন। আচার্য্যের পুত্রদ্বয় শ্রীঅচ্যুতানন্দ ও শ্রীগোপাল বহু আদর পূর্ব্বক শ্রীজাহ্নবা মাতাকে ও তাঁর সঙ্গী সমস্ত বৈষ্ণবগণকে সৎকার করেন। অনন্তর শ্রীজাহ্নবা মাতা ভক্তগণ সঙ্গে কন্টক নগর হয়ে তেলিয়াবুধরি গ্রামে এলে, শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের ভ্রাতা শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ শ্রীঈশ্বরীকে বহু সম্মান পুরঃসর পূজা এবং সৎকার করেন। একরাত্র সেখানে অবস্থান করে খেতরি গ্রাম অভিমুখে রওনা হলেন। রাজা সন্তোষ দত্ত পদ্মানদী পারের ব্যবস্থা এবং পালকী করে সেখান থেকে খেতরি গ্রাম পর্য্যন্ত যাবার ব্যবস্থা সুন্দরভাবে করে রেখেছিলেন। রাজা সন্তোষ দত্ত মার্গের বহু দূর এসে শ্রীজাহ্নবা মাতাকে ও সমস্ত বৈষ্ণবগণকে পুষ্প মাল্যাদি দিয়ে স্বাগত জানান। বৈষ্ণবগণ মহাসংকীর্ত্তন মুখে খেতরি গ্রামে প্রবেশ করেন। এ সময় শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু অগ্রসর হয়ে তাঁদের স্বাগত জানান এবং ভূমিষ্ঠ হয়ে দণ্ডবন্নতি করেন। বৈষ্ণবগণ পরস্পর প্রেমে আলিঙ্গন করতে লাগলেন। চতুর্দ্দিকে মহা আনন্দ-কোলাহলে মুখরিত হল।

রাজা সন্তোষ দত্ত শ্রীজাহ্নবা মাতার জন্য ও বৈষ্ণবগণের জন্য নবনির্ম্মিত সুন্দর গৃহ এবং দুটী করে ভৃত্য ও যাবতীয় সেবা-সম্ভার আগে থেকেই প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। শ্রীজাহ্নবা মাতা ও

বৈষ্ণবগণ নিজ নিজ ভবনে প্রবিষ্ট হলেন এবং প্রসাদ গ্রহণ অন্তে বিশ্রাম করলেন। রাজা সন্তোষ দত্তের সেবা পরিপাটী দেখে সকলে পরম সুখী হলেন।

পরদিবস শ্রীগৌরসুন্দরের শুভ আবির্ভাব তিথি। নবনির্মিত মন্দিরে ছয়টি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হবে, তাই বিপুল আয়োজন হতে লাগল। সন্ধ্যায় অধিবাস সংকীর্ত্তন। শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন ঠাকুর মঙ্গল অধিবাস কীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। খেতরি গ্রাম লোকে লোকে পূর্ণ হল। সভা মধ্যে শ্রীনিত্যানন্দ শক্তি শ্রীজাহ্নবা মাতা অতিশয় শোভা পেতে লাগলেন। তাঁকে দর্শন করে এবং বৈষ্ণবগণের দর্শন পেয়ে ও কীর্ত্তন শ্রবণ করে পাপী-পাষণ্ডিগণও পরম শুদ্ধ হলেন। সকলে গৃহ কার্য্যাদি পরিত্যাগ করে বৈষ্ণব দর্শন ও মধুর কীর্ত্তন শ্রবণে মগ্ন হলেন। সকলে আনন্দ-সমুদ্রে ভাসতে লাগলেন। বৈকুণ্ঠানন্দে সকলে নিমগ্ন। মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত অধিবাস-কীর্ত্তন মহোৎসব হল।

দ্বিতীয় দিবসে মহাসমারোহে শ্রীনিবাস আচার্য্য স্বয়ং ছয়টি বিগ্রহের অভিষেক কার্য্যাদি করলেন। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বৈষ্ণবগণের ও শ্রীজাহ্নবা মাতার আদেশে কীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। সেই কীর্ত্তনে স্বয়ং স্বপার্ষদ শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ আবির্ভূত হলেন। এ দিনে যে কি সুখ-সিন্ধু খেতরি গ্রামে উদ্বেলিত হয়েছিল তা কে বর্ণন করতে পারে? সে উৎসব এক স্মরণীয় ঘটনা বলে খ্যাতি লাভ করল।

তৃতীয় দিবসে মহামহোৎসব। শ্রীবিগ্রহগণের জন্য স্বয়ং শ্রীজাহ্নবা মাতা ভোগ রন্ধন করলেন।

শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী পরম হর্ষ হৈয়া।
প্রাতঃকালে করিলেন স্নানাহ্নিক ক্রিয়া।।
পরম উৎসাহে কৈল অপূর্ব্ব রন্ধন।
অন্ন ব্যঞ্জনাদি যত না হয় বর্ণন।।

(ভক্তি রত্নাকর দশম তরঙ্গে)

মহামহোৎসবের প্রসাদ মহান্তগণকে স্বয়ং শ্রীজাহ্নবা মাতা পরিবেশন করলেন। সবশেষে শ্রীজাহ্নবা মাতা প্রসাদ গ্রহণ করলেন। শ্রীজাহ্নবা মাতার চরিত্রে বৈষ্ণব মহান্তগণ পরম মুগ্ধ হলেন।

শ্রীজাহ্নবা মাতা খেতরির উৎসব শেষ করে ভক্তবৃন্দ সাথে শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করলেন। পথে প্রয়াগ, কাশী হয়ে মথুরায় এলেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি দর্শন, আদি কেশব ও বিশ্রাম ঘাটে স্নানাদি করে বৃন্দাবনে গমন করলেন। শ্রীজাহ্নবা মাতাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য বৃন্দাবন থেকে বৈষ্ণবগণ মথুরায় এসেছিলেন। শ্রীপরমেশ্বরী দাস বৈষ্ণবগণের পরিচয় শ্রীজাহ্নবা মাতার নিকট বলতে লাগলেন—

ইঁহ শ্রীগোপাল ভট্ট গৌর-প্রেমময়।
এই ভূগর্ভ, লোকনাথ গুণালয়।।
কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, এ শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত।
শ্রীমধু পণ্ডিত, ইঁহ শ্রীজীব বিদিত।।
ঐছে সকলের নাম ক্রিয়া জানাইল।
শুনি ঈশ্বরীর মহা আনন্দ বাড়িল।।

(ভক্তি রত্নাকর এগার তরঙ্গে)

শ্রীগোস্বামিগণ শ্রীঈশ্বরীর নিকট এসে তাঁকে প্রণাম করতেই তিনিও তাঁদের প্রতি প্রণাম করলেন। শ্রীজাহ্নবা মাতা, গোস্বামিগণের প্রেম চেষ্টা নিরীক্ষণ করে বড় আনন্দিত হলেন। অনন্তর শ্রীগোবিন্দদেব, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীমদনমোহন ও শ্রীরাধারমণ প্রভৃতি বিগ্রহ দর্শন করলেন। গোস্বামিগণ শ্রীঈশ্বরীর থাকবার উত্তম ব্যবস্থা করেছিলেন। কয়েকদিন তিনি শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান করবার পর গোবর্দ্ধন, শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড প্রভৃতি দর্শনের জন্য বহির্গত হলেন। শ্রীভগবানের লীলাস্থলী সকল দর্শনে শ্রীঈশ্বরীর যে সমস্ত দিব্য ভাব সকল উদয় হয়েছিল তা বর্ণনাতীত। কিছুদিন সুখে শ্রীবৃন্দাবন ধাম ভ্রমণ করবার পর তিনি গৌড়দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

গৌড়মণ্ডলে পৌঁছে শ্রীঈশ্বরী প্রথমে খেতরি

গ্রামে এলেন। শ্রীনরোত্তম, রামচন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ অগ্রসর হয়ে তাঁকে স্বাগত অভ্যর্থনা জানালেন। কয়েকদিন তিনি সেখানে অবস্থান করবার পর বুধরি গ্রামে এলেন। বুধরি গ্রামে শ্রীবংশী-দাসের ভ্রাতা শ্রীশ্যামদাস চক্রবর্ত্তী বাস করতেন। তাঁর কন্যা শ্রীহেমলতাকে বড় গঙ্গাদাসের সঙ্গে ঈশ্বরী বিবাহের প্রস্তাব করলে শ্রীশ্যামদাস ঈশ্বরীর আদেশমত বড় গঙ্গাদাসকে কন্যা দান করলেন। বিবাহের পর ঈশ্বরী বড় গঙ্গাদাসকে শ্যামসুন্দর জীউর সেবা ভার দিলেন। কয়েকদিন শ্রীজাহ্নবা মাতা বুধরি গ্রামে থাকবার পর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মস্থান দর্শনের জন্য একচক্রা গ্রামে গেলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মস্থান দর্শন, পিতা হাড়াই পণ্ডিতের ও মাতা পদ্মাবতী দেবীর কথা শ্রবণ করতেই শ্রীজাহ্নবা মাতা শ্বশুর-শাশুড়ীর কথা স্মরণ পূর্ব্বক অশ্রুসিক্ত নয়নে ক্রন্দন করতে লাগলেন। স্থানীয় কোন ব্রাহ্মণ নিত্যানন্দ প্রভুর বাল্যলীলা স্থান সকল দর্শনাদি করালেন।

যদ্যপি ভবন শূন্য ভগ্ন অতিশয়।  
তথাপি কার না চিত্ত আকর্ষয়?  
নিত্যানন্দ লীলাস্থলী করিয়া দর্শন।  
হৈলা প্রেমাবিষ্ট যৈছে না হয় বর্ণন।।  
সে দিবস ভগ্ন ভবনেতে বাস কৈলা।  
শ্রীনাম-কীর্ত্তনে কথো রাত্রি গোঙাইলা।।

(শ্রীভক্তিরত্নাকর দশম তরঙ্গে)

একরাত্র একচক্রপুরে থাকবার পর কণ্টক নগরে এলেন। প্রভুর সন্ন্যাস স্থান দর্শন করে ঈশ্বরী ক্রন্দন করতে লাগলেন। সেখান থেকে যাজীগ্রামে শ্রীনিবাস আচার্য্য গৃহে প্রবেশ করলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য বৈষ্ণবগণসহ বহু ভক্তি পুরঃসর শ্রীঈশ্বরীকে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক স্বীয় গৃহে নিলেন এবং তাঁর পূজাদি করলেন। আচার্য্য ভার্য্যাদ্বয় শ্রীঈশ্বরীর সেবায় নিমগ্ন হলেন। কয়েকদিন যাজীগ্রামে অবস্থান করে শ্রীঈশ্বরী শ্রীনবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মস্থান দর্শনে এলেন। এ সময়ে শ্রীগৌরগৃহে একমাত্র বৃদ্ধ শ্রীঈশান ঠাকুর ছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের ভবনে প্রবেশ করতেই শ্রীঈশ্বরী প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। ভক্তগণ তাঁর প্রেমাবেশ দেখে প্রেমে ক্রন্দন করতে লাগলেন। মহাপ্রভুর ভবন থেকে শ্রীঈশ্বরী শ্রীবাস অঙ্গনে এসে রাত্রিবাস করলেন। রাত্রিকালে শ্রীবাস অঙ্গনে ভক্তগণ মহাসংকীর্ত্তন নৃত্যাদি করলেন। শ্রীঈশ্বরী রাত্রে স্বপ্নে শ্রীগৌরসুন্দরের ভক্তগণসহ বিচিত্র লীলা বিলাসাদির দর্শন পেলেন। পরদিন বার বার নবদ্বীপ ধামকে বন্দনা করে অম্বিকা কালনা অভিমুখে যাত্রা করলেন।

পুনঃ শ্রীজাহ্নবা মাতার শুভাগমনে অম্বিকাবাসী ভক্তগণ আনন্দে আত্মহারা হলেন। শ্রীঈশ্বরী শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতকে স্মরণ পূর্ব্বক ক্রন্দন করতে করতে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের শ্রীপাদপদ্মযুগল বন্দনা করলেন। ভক্তগণ সংকীর্ত্তন আরম্ভ করলে সে মহাসংকীর্ত্তনে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের আবির্ভাব হল। রাত্রে ঈশ্বরী রন্ধনপূর্ব্বক শ্রীগৌর-নিত্যানন্দকে ভোগ অর্পণ করলেন। সেই প্রসাদ ভক্তগণকে পরিবেশন করে স্বয়ং গ্রহণ করলেন। রাত্রে বিশ্রামকালে, স্বপ্নে শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ও শ্রীগৌরনিত্যানন্দের দর্শন পেলেন। সকলেই শ্রীজাহ্নবা মাতাকে আশীর্ব্বাদ করলেন।

পরদিবস শ্রীজাহ্নবা মাতা ভক্তদের থেকে বিদায় নিয়ে শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের গৃহে এলেন। সেখানে একরাত্র মহোৎসব করবার পর নৌকা যোগে স্বীয় গৃহে খড়দহ গ্রামে পৌঁছালেন। খড়দহবাসী ভক্তগণের আনন্দের সীমা রইল না। অতি উল্লাসের সাথে সকলেই শ্রীজাহ্নবা মাতাকে দর্শন করবার জন্য অগ্রসর হলেন। ভক্তগণ সংকীর্ত্তনসহ শ্রীঈশ্বরীকে অভ্যর্থনা করলেন। পুত্র শ্রীবীরচন্দ্র

ও কন্যা শ্রীগঙ্গা শ্রীঈশ্বরীর চরণ বন্দনা করতেই তিনি তাঁদের কোলে তুলে নিয়ে আনন্দে চিবুক ঘ্রাণ নিতে লাগলেন। ঈশ্বরী বসুধাদেবীকে প্রণাম করতেই উভয়ের প্রেমোচ্ছ্বাস হল। অতঃপর ঈশ্বরী ভক্তগণের ব্রজমণ্ডলের ও গৌড়মণ্ডলের যাবতীয় ভ্রমণ বৃত্তান্ত বলতে লাগলেন। শ্রীপরমেশ্বরী দাস শ্রীঈশ্বরীর সেবায় রইলেন। অন্যান্য বৈষ্ণবগণ বিদায় গ্রহণ করলেন।

শ্রীজাহ্নবা মাতা গৌড়মণ্ডল ও ব্রজমণ্ডল ভ্রমণ করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি রেখে গেছেন। শ্রীজাহ্নবা মাতা প্রেমভক্তির আধার এবং অভিন্ন নিত্যানন্দ-স্বরূপিণী। বহু পাপী পাষণ্ডীকে তিনি উদ্ধার করেছেন। তাঁর দিব্য ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যে সকলেই আকৃষ্ট হয়েছেন।

বৈশাখ শুক্লাষ্টমীতে নিত্যানন্দ শক্তি শ্রীজাহ্নবা মাতা আবির্ভূত হন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীজাহ্নবা মাতার শ্রীচরণে এইরূপ প্রার্থনা করেছেন—

ভবার্ণবে প'ড়ে মোরে আকুল পরাণ।
কিসে কূল পা'ব তা'র না পাই সন্ধান।।
না আছে করম-বল, নাহি জ্ঞান-বল।
যাগ-যোগ-তপোধর্ম্ম—না আছে সম্বল।।
নিতান্ত দুর্ব্বল আমি, না জানি সাঁতার।
এ বিপদে কে আমারে করিবে উদ্ধার।।
বিষয়-কুম্ভীর তাহে ভীষণ-দর্শন।
কামের তরঙ্গ সদা করে' উত্তেজন।।
প্রাক্তন-বায়ুর বেগ সহিতে না পারি।
কাঁদিয়া অস্থির মন, না দেখি কাণ্ডারী।।
ওগো শ্রীজাহ্নবা দেবি! এ দাসে করুণা।
কর' আজি নিজ গুণে, ঘুচাও যন্ত্রণা।।
তোমার চরণ-তরী করিয়া আশ্রয়।
ভবার্ণব পার হ'ব করেছি নিশ্চয়।।
তুমি নিত্যানন্দ-শক্তি কৃষ্ণভক্তি-গুরু।
এ দাসে করহ দান পদকল্পতরু।।
কত কত পামরেরে ক'রেছ উদ্ধার।
তোমার চরণে আজ এ কাঙ্গাল ছার।।

(কল্যাণকল্পতরু)

**।। জয় নিত্যানন্দ শক্তি শ্রীজাহ্নবা দেবী কি জয়।।**






# শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী

নবদ্বীপে শ্রীবল্লভ আচার্য্য নামে একজন ধার্মিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাস করতেন। লক্ষ্মী নামে তাঁর এক সুশীলা সুন্দরী কন্যা ছিল। শ্রীবল্লভ আচার্য্য কন্যার জন্য একটা ভাল বরের কথা ভাবতে লাগলেন, ঘটক নিযুক্ত করলেন বনমালী আচার্য্যকে। শ্রীনিমাই পণ্ডিতকে যোগ্য-পাত্র মনে করে বনমালী আচার্য্য তাঁর বাড়ী এলেন এবং জননী শ্রীশচী দেবীকে বলতে লাগলেন--

''পুত্র বিবাহের কেনে না চিন্তহ কার্য্য।।
বল্লভ আচার্য্য কুলে-শীলে-সদাচারে।
নির্দ্দোষে বৈসেন নবদ্বীপের ভিতরে।।
তা'ন কন্যা-লক্ষ্মী প্রায় রূপে-শীলে মানে।
সে সম্বন্ধ কর যদি ইচ্ছা হয় মনে।।''

চৈঃ ভাঃ আদি ১০/৫৪-৫৬

পুত্রের বিবাহ দিবার সময় হয়েছে, কিন্তু আপনি কোন চিন্তাই করছেন না দেখছি। কুলে-শীলে উত্তম এবং সদাচার সম্পন্ন এক ব্রাহ্মণ আছেন। নাম শ্রীবল্লভ আচার্য্য, নবদ্বীপে বাস। লক্ষ্মী নামে তাঁর এক পরমা সুন্দরী কন্যা আছে। আপনার ইচ্ছে হলে, সে কন্যার সম্বন্ধ আপনার পুত্রের সঙ্গে হতে পারে।

শ্রীশচীদেবী বললেন–পিতৃহীন বালক আমার, বড় হউক পড়াশুনা করুক; তারপর এ-সব চিন্তা করব। বনমালী ঘটক শ্রীশচী মাতার কথায় প্রীত হলেন না। বিমর্ষ হয়ে গৃহ অভিমুখে চললেন। দৈবযোগে পথে শ্রীনিমাই পণ্ডিতের সাথে তার সাক্ষাৎ হল। শ্রীনিমাই পণ্ডিত বললেন–আচার্য্য মহাশয় কোথায় গিয়েছিলেন? বনমালী আচার্য্য বললেন–তোমাদের বাড়ী, তোমার মার সঙ্গে কিছু কথা ছিল। বিষয় এই, বল্লভ আচার্য্যের লক্ষ্মী নামে অতি সুন্দরী কন্যা আছে। সে তোমার উপযুক্ত বিবেচনা করে; তোমার সঙ্গে তার বিবাহের প্রস্তাব করলাম। কিন্তু এ-বিষয়ে তোমার জননীর কোন উৎসাহ দেখলাম না। তাই ফিরে যাচ্ছি। শ্রীনিমাই পণ্ডিত এসব কথা শুনে একটু হাসলেন। তারপর ব্রাহ্মণকে বিদায় দিয়ে নিজগৃহে এলেন এবং মৌনভাবে রইলেন। শ্রীশচী মাতা পুত্রের মৌনাবস্থা দেখে বললেন–নিমাই! তুই আজ এত গম্ভীর মৌনী হলি কেন?

শ্রীনিমাই বললেন তুমি ঘটক বনমালী আচার্য্যকে ভাল সম্ভাষণ করলে না কেন?

শচী মাতা ইঙ্গিতে বুঝলেন নিমাইয়ের বিবাহ করার ইচ্ছা আছে। শ্রীশচীমাতা তৎক্ষণাৎ লোক পাঠিয়ে বনমালী ঘটককে তাঁর গৃহে আনালেন। শ্রীশচী মাতা বলতে লাগলেন–

শচী বলে–''বিপ্র, কালি যে কহিলা তুমি।
শীঘ্র তাহা করাহ, কহিনু এই আমি।।''

চৈঃ ভাঃ আদি ১০/৬৫

আমার পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধে কাল আপনি যে প্রস্তাব দিয়ে ছিলেন, তাতে আমার সম্পূর্ণ মত আছে। শ্রীশচী মাতার এই কথা শুনে ঘটক বনমালী আচার্য্য তৎক্ষণাৎ বল্লভ আচার্য্য ভবনে চললেন। বনমালী ঘটকের প্রসন্ন বদন দেখে বল্লভ আচার্য্য অনুমান করলেন কার্য্যসিদ্ধি হয়েছে। শ্রীবল্লভের মন আনন্দে ভরে উঠল। খুব সম্মান প্রদর্শন করে ঘটক বনমালীকে বল্লভ আচার্য্য আসনে বসালেন এবং সমাচার জিজ্ঞাসা করলেন।

ঘটক বললেন--সমাচার শুভ, শ্রীনিমাই পণ্ডিতের সঙ্গে কন্যার বিবাহের আয়োজন করুন। এ রকম পুত্রকে কন্যাদান করা পরম সৌভাগ্য। একথা শুনে শ্রীবল্লভের পরিবারের আনন্দের সীমা রইল না। শ্রীবল্লভ বললেন--

কৃষ্ণ যদি সুপ্রসন্ন হয়েন আমারে।
অথবা কমলা গৌরী সন্তুষ্ট কন্যারে।।
তবে সে সেহেন আসি মিলিবে জামাতা।
অবিলম্বে তুমি ইহা করহ সর্ব্বথা।।

(চৈঃ ভাঃ আদি ১০/৭২-৭৩)

বনমালী ভাই! আমার প্রতি যদি কৃষ্ণের দয়া থাকে, আর কন্যার প্রতি যদি গৌরী সন্তুষ্ট থাকেন, তবে এমন সুন্দর জামাতা পাবো। তুমি শীঘ্র সব ঠিক কর। তবে যৌতুকাদি দিবার সামর্থ্য আমার নাই। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ।

কন্যা-মাত্র দিব পঞ্চ-হরিতকী দিয়া।
সবে এই আজ্ঞা তুমি আনিবে মাগিয়া।।

(চৈঃ ভাঃ আদি ১০/৭৬)

বল্লভাচার্য্য জানাতে চাইলেন যে জামাতা ও কন্যাকে বেশী কিছু দিতে পারবেন না। শ্রীবনমালী শ্রীশচীদেবীর কাছে এলেন এবং শ্রীবল্লভাচার্য্যের দেওয়া-থোওয়া সম্বন্ধে বললেন। শ্রীশচী দেবী বললেন—কন্যা যখন ভাল, আমাদের কোন দাবী-দাওয়া নাই। তিনি যা দিবেন তাতেই আমরা সন্তুষ্ট থাকব। শ্রীশচীর মত জেনে, বনমালী বল্লভাচার্য্যের কাছে ফিরে এসে কার্য্য সিদ্ধির কথা বললেন। শুনে শ্রীআচার্য্যের আত্মীয়-স্বজনগণের সুখের সীমা রইল না। এদিকে শ্রীশচীদেবী, শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীঅদ্বৈত আদি ভক্তগণকে পুত্রের বিবাহ-কথা জ্ঞাপন করলেন। শুনে সকলে বড় আনন্দিত হলেন। শ্রীশচীদেবীকে শীঘ্রই এ কার্য্য সম্পন্ন করতে নির্দ্দেশ দিলেন। শ্রীশচীমাতা ভট্টাচার্য্য-গণকে ডেকে বিবাহ লগ্ন নির্ণয় করতে লাগলেন। শ্রীবল্লভ আচার্য্যও তদ্রূপ করলেন। তারপর উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনা হয়ে বিবাহের দিন ঠিক হল।

শুভ-অধিবাস উৎসবের নিমন্ত্রণ করবার জন্য শ্রীশচী ঠাকুরাণী অতি হর্ষিত মনে নগরের সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের কাছে লোক পাঠালেন। শ্রীনিমাই পণ্ডিতের বিবাহ হচ্ছে শুনে স্বজনগণের আনন্দের সীমা রইল না। অধিবাসের দিন প্রাতঃকাল থেকে নট ও বাদকগণ নৃত্য-গীত ও বিবিধ বাজনা আরম্ভ করল। অধিবাস মণ্ডপ তৈরী করা হল। তাতে কদলী-বৃক্ষ, আম্রসার, আলিপনা, বন্দনামাল্য প্রভৃতি শোভা পাচ্ছিল। ভট্টাচার্য্যগণ বেদ-মন্ত্র ধ্বনি করতে লাগলেন। নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ প্রভৃতি যথাবিধানে সম্পন্ন হতে লাগল। অতঃপর শুভ অধিবাস কার্য্য আরম্ভ হল। জামাতা বরণের জন্য শ্রীবল্লভাচার্য্য বহু দ্রব্য সম্ভারসহ এলেন এবং যথাবিধি বরণ কার্য্য করলেন। অধিবাসের যাবতীয় কার্য্য হল। অধিবাস মুহূর্ত্তে বাদ্যকারগণের বাদ্যঘটায় আকাশ-বাতাস পূর্ণ হল। শ্রীনিমাই পণ্ডিতের শুভ বিবাহ হচ্ছে দেখতে বহু লোক সমাগম হল। শ্রীশচী ঠাকুরাণী সকলকে প্রচুর মিষ্টি, বাটা-বাটা তাম্বুল প্রভৃতি দিয়ে সৎকার করলেন। এইরূপ আনন্দ উৎসবে অধিবাস দিবস সমাপ্ত হল। পরদিন বিবাহ মহোৎসবের আয়োজন পুরাদমে চলতে লাগল। শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের যাবতীয় কুটুম্ব আগমন করতে লাগলেন। শ্রীশচীদেবী আত্মীয়-বধূগণের শিরে তৈলাদি দিয়ে স্নান করাতে লাগলেন। তাঁদের কেশ বিন্যাসাদি করে ললাটে সিন্দুর বিন্দু দিলেন। বস্ত্রাভরণ আদি দিয়ে খই, কলা, মিষ্টি প্রভৃতি দ্বারা সকলকে সুখী করলেন।

শ্রীশচী মাতার আপ্যায়নে সকলে সুখ-সিন্ধুতে যেন ভাসতে লাগলেন। ঈশ্বরের বিবাহ দর্শন করবার

এবং সে উপলক্ষ্যে পান ভোজন করবার অধিকার শুধু ভাগ্যবান্‌দের আছে। এঁরা শ্রীভগবানের নিত্য পরিকর।

বিবাহের দিন প্রাতঃকালে শ্রীগৌরসুন্দর গঙ্গা স্নান করে নিত্য শ্রীবিষ্ণু-পূজাদি সমাপ্ত করলেন। তারপর পিতৃগণের পূজাদি করলেন। চতুর্দ্দিকে মঙ্গল ধ্বনি হতে লাগল। নৃত্য, গীত, বিবিধ বাদ্য ধ্বনিতে গগন পবন পূর্ণ হল। চারিদিকে শুধু লেহ লেহ দেহ দেহ শব্দই শোনা যাচ্ছিল। ঈশ্বর-বিবাহ দেখবার জন্য দেবগণ, দেববধূগণ নর-নারীরূপ ধারণ করে যোগদান করেছেন।

শ্রীবল্লভাচার্য্য বিধি অনুসারে কন্যার অধিবাস ক্রিয়া সমাপ্ত করলেন এবং পিতৃগণের পূজাদি করলেন। চতুর্দ্দিকে মঙ্গলবাদ্য ধ্বনি হতে লাগল।

অতঃপর শ্রীগৌরসুন্দর গোধূলি-লগ্নে বিবাহ করতে যাত্রা করলেন। সঙ্গে বহু মিত্র লোকগণ ও বাদ্যকারগণ বিবিধ বাজনা নৃত্য-গীতাদি করতে করতে চললেন। যাত্রা করবার আগে লোক-শিক্ষক শ্রীগৌরসুন্দর জননী ও গুরুজনের চরণ-বন্দনা ও আশীর্ব্বাদ আদি নিয়ে যাত্রা করেন। তারপর বাহির হয়ে গঙ্গাতটে আসেন এবং দোলা থেকে নেমে শ্রীগঙ্গাদেবীকে প্রণাম করেন। তারপর গঙ্গাতট দিয়ে চলতে থাকেন। ক্রমে শ্রীবল্লভ মিশ্রের গৃহ সন্নিকটবর্ত্তী হলেন। শ্রীবল্লভ মিশ্র হর্ষিত হৃদয়ে জামাতাকে যথাবিধি স্বাগত জানালেন। অতি সমাদর করে নিয়ে বিবাহ বেদীতে বসালেন। অতঃপর কন্যাকে বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করে শ্রীনিমাই পণ্ডিতের সন্নিধানে আনয়ন করা হয়। কুলবধূরা উলু-ধ্বনি করতে লাগলেন এবং বাদ্যকারগণ বিবিধ বাদ্যধ্বনি করতে লাগল। তারপর লক্ষ্মীকে এক পিঁড়িতে বসিয়ে পিঁড়িসহ উঠিয়ে শ্রীগৌরসুন্দরকে সাত বার প্রদক্ষিণ করান হল। শ্রীলক্ষ্মীদেবী প্রভুর শ্রীচরণে জল প্রদানপূর্ব্বক প্রণাম করলেন। তারপর শ্রীগৌরসুন্দর ও লক্ষ্মীদেবী পরস্পরের গলায় পুষ্পমাল্য প্রদান করে বিবিধ কৌতুক করলেন। লক্ষ্মীদেবী প্রভুর গলায় মালা দিতেই প্রভু নিজ গলার মালা লক্ষ্মীর গলায় দিয়ে তাঁকে গ্রহণ করলেন। এইরূপে লক্ষ্মী-নারায়ণের মিলন হলে চতুর্দ্দিক মহা জয় জয় ধ্বনি ও বাদ্য ধ্বনিতে মুখরিত হল। মুখচন্দ্রিকা করবার পর প্রভু লক্ষ্মীকে বাম পাশে বসালেন।

প্রথম বয়স প্রভু জিনিঞা মদন।
বাম পাশে লক্ষ্মী বসিলেন সেইক্ষণ।।
কি শোভা, কি সুখ সে হইল মিশ্র-ঘরে।
কোন্ জন তাহা বর্ণিবারে শক্তি ধরে।।

(চৈঃ ভাঃ আদি ১০/১০২)

যথাবিধি কন্যাদান করে শ্রীবল্লভ মিশ্র সুখ সাগরে যেন ভাসতে লাগলেন। বধূগণ কুলাচার লোকাচার প্রভৃতি করতে লাগলেন। এ ধরণের বিবিধ আনন্দে রাত্রি প্রায় শেষ হল। অনন্তর ভগবান্ লক্ষ্মীসহ পুষ্প শয্যায় নিদ্রিত হলেন।

প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করে যথাবিধি প্রাতঃকৃত্যাদি করতে লাগলেন। দিবসভরে শ্রীবল্লভ মিশ্র গৃহে শ্রীগৌরসুন্দর অবস্থান করার পর গোধূলি লগ্নে লক্ষ্মীর সহিত গৃহাভিমুখে যাত্রা করলেন। কন্যা ও জামাতাকে বিদায় দিবার সময় বল্লভ মিশ্র স্বজনসহ বিহ্বল হয়ে পড়লেন। গন্ধ, মাল্য, অলঙ্কার, মুকুট, চন্দন, কজ্জ্বলসহ বরবধূ দোলা মধ্যে পরম শোভা পেতে লাগলেন। দর্শকেরা কত সুখ অনুভব করতে লাগলেন।

‘‘কতকাল এই কন্যা হর-গৌরী সেবা করেছিল তাই এমন সুন্দর বর পেয়েছে’’—নারীগণ পরস্পরের মধ্যে এইরূপ কথোপকথন করতে লাগল। বিবিধ বাদ্য ও আনন্দ কোলাহলের মধ্যে শ্রীগৌরসুন্দর



নিজগৃহে প্রবেশ করলেন। ''নিজগৃহে প্রভু আইলেন সন্ধ্যাকালে।।'' তখন শ্রীশচীদেবী বিপ্র পত্নীগণসহ পুত্রবধূকে বরণ করে ঘরে আনলেন। শ্রীশচী মাতার গৃহে আনন্দের সীমা রইল না। গীত বাদ্য ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠল।

এই ভাবে শ্রীগৌরসুন্দরের শুভ বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হল। জগৎ আনন্দময় হল। শ্রীগৌরসুন্দর নাট, ভাট, বাদক, ব্রাহ্মণ ও অতিথিগণকে যথাবিধি অর্থ, বস্ত্র, অন্নাদি দিয়ে সৎকার ও বিদায় করলেন। শ্রীশচীদেবীর বাসনা পূর্ণ হল। সর্ব্বদা আনন্দ-সিন্ধুতে যেন ভাসতে লাগলেন। শ্রীলক্ষ্মীর অঙ্গ-জ্যোতিতে গৃহ সর্ব্বদা যেন আলোকিত এবং পদ্মগন্ধময় হয়েছিল। তাতে অনুমানে শ্রীশচীমাতা বুঝলেন এই কন্যাতে সাক্ষাৎ কমলার অধিষ্ঠান আছে। বধূ লক্ষ্মীকে তিনি প্রাণের প্রাণ স্বরূপ স্নেহ করতে লাগলেন। লক্ষ্মীদেবী অতিশয় সুচরিতা ছিলেন। ইঙ্গিতেই সমস্ত কার্য্য করতেন। ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশচী মাতাকে সুখী করবার আশায় কোন কোন দিন লক্ষ্মীকে নিয়ে তাঁর কাছে বসতেন।

লক্ষ্মীদেবী প্রাতঃকালে শ্রীবিষ্ণুগৃহ মার্জ্জন, আলপনা, পুষ্প-তুলসী চয়ন প্রভৃতি কার্য্য করতেন। অনন্তর রন্ধন করতেন। মহাপ্রভু প্রতিদিন বৈষ্ণব অতিথি ডেকে গৃহে সেবা করাতেন।

গৃহস্থেরে মহাপ্রভু শিখায়েন ধর্ম্ম।
অতিথির সেবা--গৃহস্থের মূলকর্ম।।
গৃহস্থ হইয়া অতিথি-সেবা না করে।
পশু-পক্ষী হইতে 'অধম' বলি তা'রে।।
যা'র বা না থাকে কিছু পূর্ব্বাদৃষ্ট-দোষে।
সেই তৃণ, জল, ভূমি দিবেক সন্তোষে।।

(চৈঃ ভাঃ আদি ১৪/২১-২৩)

ভগবান্ ধর্ম্ম শিক্ষা দেবার জন্যই অবতীর্ণ হন। তিনি ভক্তবৎসল। ভক্তের সুখের জন্য কত বিচিত্র লীলা করেন। তিনি যেমন লীলা করেন লক্ষ্মী তদ্রূপ আচরণ করে থাকেন।

নিরবধি তুলসীর করেন সেবন।
ততোধিক শচীর সেবায় তাঁ'র মন।।
লক্ষ্মীর চরিত্র শুনি শ্রীগৌরসুন্দর।
মুখে কিছু না বলেন, সন্তোষ অন্তর।।

(চৈঃ ভাঃ আদি ১৪/৪৩-৪৪)

গৃহস্থ হবার পর, গৃহস্থের অর্থ উপার্জ্জন, গুরুসজ্জন-পালন করা একটি ধর্ম্ম। তাই যেন শ্রীগৌরসুন্দর কিছুদিন বঙ্গদেশে গিয়ে অধ্যাপক রূপে বিদ্যাদানাদি করতে ইচ্ছা করলেন। জননীর চরণে নিবেদন জানালেন কিছুদিন তিনি বঙ্গদেশে প্রবাসে যাবেন। পত্নীর প্রতি বললেন—''তুমি এই সময় আইর উত্তম রূপে সেবা কর।'' তারপর শ্রীনিমাই পণ্ডিত শুভদিন দেখে কতিপয় শিষ্যসহ

বঙ্গদেশে যাত্রা করলেন। প্রভুর শ্রীচরণরেণুতে বঙ্গদেশ ধন্য হল। ক্রমে প্রভু পদ্মাবতী নদীর তটে এলেন। মহাপ্রভুর শুভ আগমন বার্ত্তা সমগ্র বঙ্গদেশে প্রচারিত হল। কোন মহান্ সৌভাগ্যবানের গৃহে প্রভু অবস্থান করে। অধ্যাপনার কার্য্য করতে লাগলেন। সহস্র সহস্র ছাত্র প্রভুর কাছে পড়বার জন্য আসতে লাগল। মহাপ্রভুর দিব্য-মূর্ত্তি দর্শনে বঙ্গবাসী ধন্যাতিধন্য হলেন। সে ভাগ্যে বঙ্গদেশে শ্রীহরিকীর্ত্তন অদ্যাপি বিদ্যমান।

মহাবিদ্যাগোষ্ঠী প্রভু করিলেন বঙ্গে।<br>
পদ্মাবতী দেখি প্রভু বুঝিলেন রঙ্গে।।

❖ ❖ ❖

বঙ্গদেশে গৌরচন্দ্র করিলা প্রবেশ।<br>
অদ্যাপিহ সেই ভাগ্যে ধন্য বঙ্গদেশ।।<br>
সেই ভাগ্যে অদ্যাপিহ সর্ব্ব বঙ্গদেশে।<br>
শ্রীচৈতন্য সংকীর্ত্তন করে স্ত্রী-পুরুষে।।

(চৈঃ ভাঃ আদি ১৪/৮১)

এই মতে বিদ্যা-রসে বৈকুণ্ঠের পতি।<br>
বিদ্যা-রসে বঙ্গদেশে করিলেন স্থিতি।।

(চৈঃ ভাঃ আদি ১৪/৯৮)

এদিকে নবদ্বীপে, যেদিন মহাপ্রভু বঙ্গদেশ অভিমুখে যাত্রা করলেন, সেদিন থেকে তাঁর বিরহে লক্ষ্মীদেবী আহার-নিদ্রা ত্যাগ করলেন। স্বজন বন্ধুগণ তাঁকে কত বুঝাতে লাগলেন। তিনি কিন্তু কিছুতেই সুস্থ হলেন না। নামে মাত্র দু এক গ্রাস অন্ন মুখে দিতেন। সমস্ত রাত্রি বসে বসে ক্রন্দন করতেন। ঈশ্বরের বিচ্ছেদ সইতে পারলেন না।

নিজ-প্রতিকৃতি-দেহ থুই' পৃথিবীতে।<br>
চলিলেন প্রভু-পার্শ্বে অতি অলক্ষিতে।।

(চৈঃ ভাঃ আদি ১৪/১০৪)

তিনি মহালক্ষ্মী অনন্ত বিভূতি সম্পন্না। অতএব তাঁর পক্ষে অসাধ্য কিছুই নাই। নিজ প্রতিকৃতি একটি দেহ ধরাতলে রেখে দিব্য দেহে নিজ প্রভুর নিকট গমন করলেন। তাঁর দেহ ত্যাগ প্রাকৃত লোকের ন্যায় নয়। তিনি বৈকুণ্ঠের ঈশ্বরী মহালক্ষ্মী। প্রভুর বিরহ তাঁর পক্ষে অসহনীয়, মহাবিষতুল্য। অতএব বিরহ যেন সর্পতুল্য হয়ে তাঁকে দংশন করল এবং বেদনারূপী বিষে তিনি প্রাণ ত্যাগ করলেন।

প্রভুর বিরহ সর্প লক্ষ্মীরে দংশিল।<br>
বিরহ সর্পবিষে তাঁর পরলোক হল।।

(চৈঃ চঃ আদি ১৬/২১)

বাস্তবিক পক্ষে প্রপঞ্চ জীবের ন্যায় লক্ষ্মীদেবীর দেহ ত্যাগ হয় নি।

এইভাবে শ্রীগৌরসুন্দরের বিরহে শ্রীলক্ষ্মীদেবী দেহত্যাগ করলেন। লক্ষ্মীর দেহত্যাগে স্বজন-বন্ধু-বান্ধবগণের শোকের সীমা রইল না। শ্রীশচীমাতা শোক সমুদ্রে ডুবে গেলেন। অন্তর্য্যামী প্রভু সব জানতে পারলেন। বহু শিষ্য ও দ্রব্যাদি সঙ্গে তিনি শীঘ্রই নবদ্বীপে ফিরে এলেন এবং দেখলেন বধূ পরলোক যাত্রা করেছেন। ভগবান্ লোকানুকরণে কিছুক্ষণ শোক প্রকাশ করতঃ জননীকে বিবিধ তত্ত্ব উপদেশ করতে লাগলেন।

জননী শ্রীশচী অনেক কষ্টে দুঃখ সম্বরণ করলেন।

**।। জয় শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী কি জয়।।**

# শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী

'শ্রী', 'ভূ', 'নীলা' নামে ভগবানের তিনটি শক্তি আছে; শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া হলেন 'ভূ' শক্তি-স্বরূপিণী। তিনি 'সত্যভামা' বলেও কথিত হন। শ্রীগৌর-অবতারে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী শ্রীনাম প্রচারের সহায়রূপে অবতীর্ণা হয়েছিলেন।

শ্রীনবদ্বীপ ধামে সনাতন মিশ্র নামে এক পরম বিষ্ণু-ভক্ত ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তিনি বহু লোকের ভরণ-পোষণ করতেন। রাজ-পণ্ডিত বলে সর্ব্বত্র তাঁর খ্যাতি ছিল। তিনি দ্বাপরে সত্রাজিত রাজা ছিলেন। বিপ্রশ্রেষ্ঠ সনাতন মিশ্র বিষ্ণু আরাধনার ফলে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া নামে সদ্‌গুণ সম্পন্না এক পরমা সুন্দরী কন্যারত্ন লাভ করেন। অতি শিশুকাল থেকে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দিনে দুই তিন বার গঙ্গাস্নান করতেন এবং বড়দের অনুশরণ করে যাবতীয় পূজা, অর্চ্চনা, তুলসী সেবা, ব্রত প্রভৃতি করতেন। গঙ্গাঘাটে যখন শ্রীশচীমাতাকে দেখতেন অতি নম্রভাবে তাঁকে নমস্কার করতেন। শচীমাতাও 'যোগ্য পতি হউক' বলে আশীর্ব্বাদ করতেন। শচীমাতা মনে মনে বিষ্ণুপ্রিয়াকে পত্রবধূরূপে কামনা করতেন।

এদিকে শ্রীগৌরসুন্দরের লক্ষ্মীপ্রিয়া নাম্নী প্রথমা পত্নী পরলোক গমন করেন। মা শচীর হৃদয়ে বড় দুঃখ হল। কিছুদিন কেটে গেল। পুনর্ব্বার পুত্রের বিবাহ দিবার জন্য মা শচীদেবী বড় উদ্‌গ্রীব হলেন। আত্মীয়-স্বজনগণও শীঘ্র একার্য্য সম্পন্ন করতে বললেন। গৌরসুন্দর জননীর মতের বিরোধিতা করলেন না। বিবাহ করতে সম্মত হলেন। শচীমাতা এক ভৃত্যকে ঘটক কাশীনাথ পণ্ডিতের বাড়ী পাঠালেন। মা শচীর আহ্বান পাওয়া-মাত্র পণ্ডিত তাঁর গৃহে এলেন। শচীমাতা গৌরসুন্দরের বিবাহের কথা উত্থাপন করলেন। কাশীনাথ পণ্ডিত বললেন এটা তো উত্তম প্রস্তাব, এ কার্য্য শীঘ্র হউক। পাত্রীর কথা উত্থাপন করে শচীমাতা সনাতন মিশ্রের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার নাম বললেন। ঘটক সহাস্য বদনে বললেন—''ঠাকুরাণী! আমিও ঐ কন্যার নাম উল্লেখ করব ভাবছিলাম।" শচীমাতা বললেন—''আমি ত গরীব, সনাতন মিশ্র আমার ঘরে কন্যা দিবে কি? আপনি এ-বিষয় নিয়ে শীঘ্র আলাপ করুন। কাশীনাথ পণ্ডিত বললেন—''ঠাকুরাণী, আপনার নিমাইয়ের ন্যায় এত সুন্দর পুত্রকে সনাতন যদি কন্যা না দেয়, কাকে দিবে?" এ কথা বলে পণ্ডিত সনাতন মিশ্রের গৃহ অভিমুখে চললেন।

কন্যার বয়স দেখে সনাতন মিশ্রও একটি উপযুক্ত পাত্র অনুসন্ধান করছিলেন। নদীয়াতে উত্তম পাত্র বলতে একমাত্র নিমাই পণ্ডিত। রূপে-গুণে অতুলনীয়, বয়সও কম। এমন পাত্রকে কন্যা দেওয়া বড় ভাগ্যের কথা। এসব কথা কাউকে বলতেও সনাতনের লজ্জা বোধ হচ্ছিল। মনে মনে শুধু ভগবানের কাছে জানাতেন, হে হরি! পূর্ব্ব জন্মে যদি সুকৃতি করে থাকি আমার কন্যার জন্য যেন নিমাই পণ্ডিতকে বররূপে পাই।

ঐ দিন ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী বসে কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে আলাপ করছেন, ঠিক এমন সময় ঘটক কাশীনাথ পণ্ডিত উপস্থিত হলেন। সনাতন মিশ্র ব্যস্তসমস্ত হয়ে পণ্ডিতকে স্বাগত জানিয়ে বসতে আসন দিলেন। মিষ্টি জল দিয়ে সৎকার করলেন। সনাতন মিশ্র ভাবলেন উত্তম পাত্রের সংবাদ নিশ্চয় এসেছে।

মিশ্র জিজ্ঞাসা করলেন—‘‘পণ্ডিত! খবর কি?’’ পণ্ডিত হাস্য করতে করতে বললেন—

‘‘বিশ্বম্ভর-পণ্ডিতেরে তোমার দুহিতা।
দান কর’—এ সম্বন্ধ উচিত সর্ব্বথা।।
তোমার কন্যার যোগ্য সেই দিব্য পতি।
তাহার উচিত এই কন্যা মহা-সতী।।
যেন কৃষ্ণ রুক্মিণীকে অন্যোন্য-উচিত।
সেইমত বিষ্ণুপ্রিয়া-নিমাঞি পণ্ডিত।।’’

চৈঃ ভাঃ আদি ১৫/৫৭-৫৯

ঘটক কাশীনাথের এই প্রস্তাব শুনে সনাতন মিশ্র ও তাঁর পত্নী আনন্দে আত্মহারা হলেন। অন্তর্য্যামী ভগবান ভাবনানুরূপ ফল মিলিয়ে দিয়েছেন। সনাতন মিশ্র বললেন—‘‘কাশীনাথ, এ বিষয়ে আর কি বলব? যদি আমার গোষ্ঠীর সৌভাগ্য থাকে এ হেন জামাতা পাব।’’ অন্যান্য স্বজনগণ বলতে লাগলেন—‘‘সৌভাগ্য ছাড়া এরকম ছেলে পাওয়া যায় না। তোমার কন্যার ভাগ্যে থাকলে উত্তম বর পাবেই।’’ তারপর কাশীনাথ পণ্ডিতের সঙ্গে আবশ্যকীয় অন্যান্য বিষয় মিশ্র মহোদয় আলোচনা করলেন। এরূপে কাশীনাথ পণ্ডিত সব ঠিক করে শচীমাতার ঘরে ফিরে এলেন এবং তাঁকে সব কথা জানালেন। শচী বললেন—‘‘আমার তো আর কেউ নাই, একমাত্র হরিই আছেন।’’

শ্রীনিমাই পণ্ডিতের বিবাহ হবে শুনে সকলে বড় আনন্দিত হলেন। শিষ্যগণ বলতে লাগলেন—‘‘পণ্ডিতের বিবাহে আমরা যথাসাধ্য কিছু কিছু দান করব।’’ ধনাঢ্য বুদ্ধিমন্ত খান বললেন—‘‘সমস্ত খরচ আমি বহন করব।’’ মিত্র মুকুন্দ-সঞ্জয় বললেন—‘‘ভাই, খরচের ভার কিছুটা আমাদের উপর দাও। এবিবাহের আয়োজন এমন করতে হবে যা কোন রাজকুমারের বিবাহেও হয় নাই।’’

প্রাকৃত স্ত্রী পুরুষের বিবাহ বন্ধনের কারণ হয়। মনুষ্যলীলার অনুকরণে শ্রীভগবানের এবং তাঁর শক্তির মিলনজনিত বিবাহ অপ্রাকৃত ব্যাপারবিশেষ। ভগবানের সাথে তাঁর শক্তির পরিণয়লীলা শ্রবণকীর্ত্তনের দ্বারা সংসার মুক্তি হয়।

যে শুনয়ে প্রভুর বিবাহ পূণ্যকথা।
তাহার সংসার বন্ধ না হয় সর্ব্বথা।।

সমস্ত নবদ্বীপে সাড়া পড়ে গেল, নিমাই পণ্ডিতের বিবাহ। বিবাহের আয়োজন হতে লাগল। বিবাহ মণ্ডপের উপর বড় বড় চন্দ্রাতপ খাটান হল। ভূমিতে আলিপনা দেওয়া হল এবং স্থানটি কদলীবৃক্ষ, পূর্ণঘট, আম্রসার, দীপ, ধান্য, দধি প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি দ্বারা সজ্জিত করা হল। নবদ্বীপে তখন যত বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ সজ্জন বাস করতেন সকলে অধিবাস উৎসবে যোগদানের জন্য আমন্ত্রিত হলেন। সন্ধ্যায় অধিবাসের সময় বাদ্যকারগণ আনন্দে নানাবিধ বাদ্য বাজাতে লাগল। শচীর অঙ্গন ক্রমে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবে পূর্ণ হতে লাগল। ভগবদ্-পূজা, আরাত্রিক, ভোগরাগ মহা সমারোহের সহিত হল এবং গৌরসুন্দরের অধিবাস-ক্রিয়া সুসম্পন্ন হল। অন্দর মহলে নারীগণ আনন্দভরে ঘন ঘন উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি করছিলেন। বৈষ্ণবগণ হরিধ্বনি করতে লাগলেন। ঈশ্বরের বিবাহে চতুর্দ্দিকে সুখসিন্ধু যেন উথলে উঠল। অধিবাসে মিষ্টি পান ও সুপারির আয়োজন করা হয়েছিল। যে যত চায়, পানের বিটীকা দেওয়া হচ্ছিল। যত ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব এসেছিলেন তাঁদের গলায় গৌরসুন্দর চন্দন ও সুগন্ধ ফুলের মালা পরিয়ে দিলেন। প্রফুল্ল মনে সকলে শুভাশীষ অর্পণ করলেন। এমন সুন্দর সুখময় বিবাহ-অধিবাস কেউ কখনও দেখেনি। নদীয়া-পুরী সুখসিন্ধু মাঝে ভাসতে লাগল।

পরদিন বিবাহ উৎসবের বিপুল আয়োজন হল।

অপরাহ্নে গৌরসুন্দর বরোচিত পোষাক-পরিচ্ছদ পরে জননী এবং গুরুজনের চরণ বন্দনা করে এক সুসজ্জিত দোলায় আরোহণ করলেন। প্রথমে গঙ্গাতটে এলেন, শ্রীগৌরসুন্দর দোলা থেকে নেমে গঙ্গাদেবীকে নমস্কার করে আবার দোলায় আরোহণ করলেন। 'জয় জয়' মঙ্গল ধ্বনি ও বিবিধ বাদ্যধ্বনির দ্বারা চতুর্দ্দিক মুখরিত করে গঙ্গাতট দিয়ে বরযাত্রা আরম্ভ হল। সহস্র সহস্র দীপ জ্বলছিল, নানা রকম বাজী পোড়ান হচ্ছিল, নৃত্যগীত হচ্ছিল। গোধূলি লগ্নে বর ও বরযাত্রীরা শ্রীসনাতন মিশ্রের গৃহে প্রবেশ করলেন। শ্রীসনাতন মিশ্র ও তাঁর পত্নী জামাতাকে বরণ ও আশীর্ব্বাদ করলেন।

অতঃপর বিষ্ণুপ্রিয়াকে নানা আভরণে ভূষিত করে বিবাহস্থানে আনয়ন করা হল। মহালক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া স্বীয় নিত্যকান্ত গৌর-নারায়ণকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে তাঁর শ্রীচরণে আত্মনিবেদন করলেন। অনন্তর পরস্পরের গলায় পুষ্পমাল্য প্রদান করলেন।

আগে লক্ষ্মী জগন্মাতা প্রভুর চরণে।
মালা দিয়া করিলেন আত্মসমর্পণে।।
তবে গৌরচন্দ্র প্রভু ঈষৎ হাসিয়া।
লক্ষ্মীর গলায় মালা দিলেন তুলিয়া।।
তবে লক্ষ্মী-নারায়ণে পুষ্প ফেলাফেলি।
করিতে লাগিলা হই মহা কুতুহলী।।

চৈঃ ভাঃ আদি ১৫/১৭৬-১৭৮

শ্রীসনাতন মিশ্র শ্রীগৌরসুন্দরকে বহু যৌতুকের সহিত কন্যা সম্প্রদান করলেন। তিনি গৌর-নারায়ণকে কন্যাদান করে কৃত-কৃত্য হলেন। জনক রাজা যেমন রামচন্দ্রকে সীতা সম্প্রদান করেছিলেন, ভীষ্মক রাজা যেমন কৃষ্ণকে রুক্মিণী সম্প্রদান করেছিলেন, সনাতন মিশ্রও সেরূপ গৌরসুন্দরকে বিষ্ণুপ্রিয়া সম্প্রদান করলেন। বিবাহের পর শুভ রাত্রিতে গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া পুষ্পশয্যায় অবস্থান করলেন। শ্রীসনাতন মিশ্রের গৃহে বৈকুণ্ঠানন্দ অবতরণ করল।

প্রায় সমস্ত রাত্রি সনাতন মিশ্রের গৃহ নৃত্য-গীত ও বাদ্য-ধ্বনিতে মুখরিত হল। প্রাতে গৌরসুন্দর পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া সহ শয্যা ত্যাগ করলেন। হস্ত-মুখ প্রক্ষালন করবার পর নিত্য কৃত্য জপাদি সমাপ্ত করলেন। সনাতন মিশ্র মহোৎসবের আয়োজন করেছিলেন। তাঁর স্বজনবর্গ গৌর-নারায়ণকে দর্শন করে কৃতার্থ হলেন।

সনাতন পণ্ডিতের গোষ্ঠীর সহিতে।
যে সুখ হইল তাহা কে পারে সহিতে।।

চৈঃ ভাঃ আদি ১৫/১৯৪

অপরাহ্নে শ্রীগৌরসুন্দর নব বধূকে নিয়ে নৃত্য-গীত-বাদ্যসহ স্বীয় গৃহাভিমুখে যাত্রা করলেন। নগর পরিক্রমা করে গঙ্গাতট দিয়ে যখন বরযাত্রীরা চলছিলেন তখন নগরবাসীগণ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও গৌরসুন্দরের অপূর্ব্ব নয়নাভিরাম দিব্য রূপ দর্শন করে আনন্দভরে বলাবলি করতে লাগলেন—

................................ এই ভাগ্যবতী।
কত জন্ম সেবিলেন কমলা পার্ব্বতী।।
কেহ বলে,—"এই হেন বুঝি হরগৌরী।"
কেহ বলে,—"হেন বুঝি কমলা-শ্রীহরি।।"
কেহ বলে,—"এই দুই কামদেব রতি।"
কেহ বলে,—"ইন্দ্র শচী লয় মোর মতি।।"
কেহ বলে,—"হেন বুঝি রামচন্দ্র-সীতা।"
এই মত বলে যত সুকৃতি-বনিতা।।

চৈঃ ভাঃ আদি ১৫/২০৫-২০৮

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও শ্রীগৌরসুন্দরের শুভ দৃষ্টিপাতে সমস্ত নবদ্বীপ সুখময় হয়ে উঠল। নৃত্য-গীত-বাদ্য ও পুষ্পবৃষ্টিসহ পরম আনন্দ কোলাহলের মধ্যে সর্ব্ব শুভক্ষণে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে নিয়ে গৃহে প্রবেশ করলেন। শচীমাতা অন্যান্য কুলবধূসহ

প্রসন্ন বদনে পুত্রবধূকে বরণ করলেন। নবদম্পতি দোলা থেকে অবতরণ করে প্রথমে শ্রীশচীর শ্রীচরণ বন্দনা করলেন। পরে যত পূজ্যস্পদ ব্যক্তি ছিলেন তাঁদের চরণ বন্দনা করলেন। স্নেহভরে সকলে বর-বধূর চিবুক ঘ্রাণ ও আশীর্ব্বাদ করলেন এবং বিবিধ যৌতুক প্রদান করলেন।

গৃহে আসি বসিলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ।
জয়ধ্বনিময় হইল সকল ভুবন।।
কি আনন্দ হইল সে অকথ্য কথন।
সে মহিমা কোন জনে করিবে বর্ণন।।

তারপর বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় ভগবানের বিবাহ দর্শনের মহিমা বর্ণন করেছেন--

যাঁহার মূর্ত্তির বিভা দেখিলে নয়নে।
পাপমুক্ত হই যায় বৈকুণ্ঠ ভুবনে।।
সে প্রভুর বিভা লোক দেখয়ে সাক্ষাৎ।
তেঞি তান নাম 'দয়াময়' দীননাথ।।

চৈঃ ভাঃ আদি ১৫/২১৬-২১৭

ভগবানের এই দিব্য লীলা বহু সাধন করেও যোগিগণ পর্য্যন্ত দর্শন করতে পারেন না। কিন্তু সে লীলা নবদ্বীপবাসী আপামর জনসাধারণ দেখতে পেল। দয়াময় ভগবানের অশেষ কৃপা– তাই তাঁর এক নাম দীননাথ।

বিবাহে যত নট, ভাট, ভিক্ষুক এসেছিল শ্রীগৌরসুন্দর তাদের অর্থ ও বস্ত্র দিয়ে তুষ্ট করলেন। ব্রাহ্মণ ও আত্মীয় স্বজনকে মূল্যবান্ বস্ত্র দান করলেন। বুদ্ধিমন্ত খানকে প্রেমে আলিঙ্গন করলেন। তিনিই বিবাহের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেছিলেন।

শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর আর বিশেষ বর্ণনা দেন নাই। কোন প্রসঙ্গে কদাচিৎ নাম উল্লেখমাত্র করেছেন। গয়াধাম হতে গৃহে এলে–

''লক্ষ্মীর জনক কুলে আনন্দ উঠিল।
পতি-মুখ দেখিয়া লক্ষ্মীর দুঃখ দূরে গেল।।"

–চৈঃ ভাঃ মঃ ১/১৯

মহাপ্রভু গয়াধাম থেকে গৃহে ফিরে এলেন এবং অনন্তর কৃষ্ণ প্রেম প্রকাশ করতে লাগলেন। প্রভুর দিব্যভাব-সকল দেখে শচী মাতা ভাবতেন বোধহয় পুত্রের কোন কঠিন রোগ হয়েছে? পুত্রের মঙ্গল কামনায় গঙ্গা-বিষ্ণুর পূজা দিতেন এবং–

''লক্ষ্মীরে আনিয়া পুত্র সমীপে বসায়।
দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভু নাহি চায়।।"

–চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ১/১৩৭

প্রভু বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখেও দেখেন না।

''কৃষ্ণ–কৃষ্ণ" বলে নিয়ত রোদন করেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদী-অন্নের থালা পুত্রের সম্মুখে দিয়ে শচীমাতা সেখানে বসলেন। ''ঘরের ভিতর দেখে লক্ষ্মী পতিব্রতা।" –বিষ্ণুপ্রিয়া গৃহের ভিতর থেকে সব দেখতে লাগলেন। প্রভু সব সময় কৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হয়ে থাকেন। কোনদিন পাষণ্ডগণের অত্যাচারের কথা শুনে ''আমি সংহার করব, সংহার করব' বলে হুঙ্কার দেন। শচীমাতা কিছুই বুঝতে পারেন না। বিষ্ণুপ্রিয়াকে প্রভুর কাছে গিয়ে বসতে বলেন। ''লক্ষ্মীরে দেখিয়া ক্ষণে মারিবারে যায়।।" (শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ২/৮৭) বাহ্যদশা শূন্য প্রভু বিষ্ণুপ্রিয়াকেই প্রহার করবার জন্য উদ্যত হন। পুনঃ বাহ্যদশা ফিরে এলে লজ্জিত হন। একদিন শচীমাতা ও গৌরসুন্দর গৃহমধ্যে বসে আলাপ করছিলেন। কপাটের আড়ালে বসে বিষ্ণুপ্রিয়া শুনছিলেন। শচীমাতা বললেন–''আজ রাত্রি শেষে স্বপ্ন দেখেছি আমাদের ঘরে যে রাম ও কৃষ্ণ মূর্ত্তি আছেন, তাঁদের সঙ্গে তুমি ও নিত্যানন্দ খেলছ। তাঁদের সঙ্গে খেলতে খেলতে মারামারি করছ। এরূপ আরও কত রঙ্গ করছ।"





গৌরসুন্দর বললেন—''বড় ভাল স্বপ্ন, মা! কাউকেও বল না। আমাদের গৃহে সাক্ষাৎ রাম-কৃষ্ণ বিরাজ করছেন। অনেকদিন দেখি পূজার নৈবেদ্য কে খেয়ে যায়। আমার সন্দেহ হত তোমার পুত্রবধূ খায়। কিন্তু আজ আমার সে সন্দেহ ঘুচল।''

''তোমার বধূরে মোর সন্দেহ আছিল।
আজি সে আমার মনে সন্দেহ ঘুচিল।।''

চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ৮/৪৯

শচীমাতা বললেন, ''বাবা, অমন কথা বলতে নাই।'' স্বামীর নর্মালাপ শুনে বিষ্ণুপ্রিয়া হাসতে লাগলেন।

''একদিন নিজ গৃহে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বসি আছে লক্ষ্মী সঙ্গে পরম সুন্দর।।
যোগায় তাম্বুল লক্ষ্মী পরম হরিষে।
প্রভুর আনন্দে না জানয়ে রাত্রি দিশে।।
যখন থাকয়ে লক্ষ্মী সনে বিশ্বম্ভর।
শচীর চিত্তেতে হয় আনন্দ বিস্তর।।''

চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ১১/৬৫-৬৭

শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিষ্ণুপ্রিয়া সহ গৌরসুন্দরের মধুর বিহারের কথা বর্ণনা করছেন। এ হচ্ছে গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার নিত্য বিলাস। ভগবান্ গৌর-নারায়ণ রূপে লক্ষ্মীসহ নবদ্বীপে নিত্য বিহার করছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী মহাপ্রভুকে তাম্বুল দিচ্ছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রদত্ত তাম্বুল চর্ব্বণ করতে করতে মহাপ্রভু আনন্দ প্রকট করছেন। মহাপ্রভুর আনন্দ দর্শনে বিষ্ণুপ্রিয়ারও আনন্দে দিবানিশি জ্ঞান নাই। ''যোগায় তাম্বুল লক্ষ্মী''—এই হচ্ছে গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার নিত্য উপাসক ভক্তের ধ্যানের বিষয়।

জননী-বৎসল প্রভু জননীকে সুখী করবার জন্য বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে বসে থাকতেন।

''মায়ের চিত্তের সুখ ঠাকুর জানিয়া।
লক্ষ্মীর সঙ্গেতে প্রভু থাকেন বসিয়া।।''

চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ১১/৬৮

চন্দ্রশেখর-ভবনে যখন মহাপ্রভু রুক্মিণীভাবে নৃত্যাভিনয় করেছিলেন বিষ্ণুপ্রিয়াও শচীমাতার সঙ্গে সে অভিনয় দর্শন করতে গিয়েছিলেন—''আই চলিলেন নিজ বধূ সহিতে।।'' (শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ১৮/২৯)

এর পর গৌরসুন্দর যে সন্ন্যাস-লীলা করেছেন তা বর্ণন করতে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর কোন স্থানে বিষ্ণুপ্রিয়ার নাম উল্লেখ করেন নাই। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী আদি পঞ্চদশ অধ্যায়ে কেবল বিবাহ-লীলা বর্ণন করেছেন।

যেদিন মহাপ্রভু সন্ন্যাসে গিয়েছিলেন সেদিন রাত্রে বিষ্ণুপ্রিয়াকে যে তত্ত্বোপদেশ দিয়েছিলেন তার এরূপ বর্ণনা শ্রীলোচন দাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্য-মঙ্গলে আছে—

জগতে যতেক দেখ মিছা করি সব লেখ
সত্য এক সবে ভগবান।
সত্য আর বৈষ্ণব তা বিনে যতেক সব
মিছা করি করহ গেয়ান।।

চৈঃ মঃ মধ্যঃ

''পুত্র, পতি, সখা, স্বজন-সম্বন্ধ সব মিথ্যা। পরিণামে কেউ কারও নয়। শ্রীকৃষ্ণের চরণ ছাড়া আমাদের অন্য গতি নাই। কৃষ্ণ সকলের পতি, আর সব কিছু শক্তি—এ কথা কেউ বুঝে না। তোমার নাম বিষ্ণুপ্রিয়া, তুমি বিষ্ণু ভজন করে তোমার নাম সার্থক কর। মিথ্যা শোক কর না, আমি তোমায় এই যথার্থ কথা বলে যাচ্ছি। তুমি কৃষ্ণ চরণে মনোনিবেশ কর।''

বিষ্ণুপ্রিয়া বললেন—''তুমি ঈশ্বর, তুমি নিজ মায়া

দূর কর। তাহলে বিষ্ণুপ্রিয়া প্রসন্ন হবে।” বিষ্ণুপ্রিয়ার দুঃখ শোক দূর হল। আনন্দে হৃদয় ভরে উঠল। ‘‘চতুর্ভুজ দেখে আচম্বিত”– এমন সময় বিষ্ণুপ্রিয়া মহাপ্রভুর চতুর্ভুজ--মূর্ত্তি দর্শন করলেন। কিন্তু তাঁর পতি-বুদ্ধি গেল না, অতঃপর বিষ্ণুপ্রিয়া মহাপ্রভুর চরণ তলে প্রণত হয়ে বললেন–

‘এক নিবেদন শুন প্রভু।
মো অতি অধম ছার, জনমিল ও সংসার,
তুমি মোর প্রিয় প্রাণ পতি।
এ হেন সম্পদ মোর, দাসী হৈয়াছিলুঁ তোর,
কি লাগিয়া ভেল অধোগতি।।”

তখন শ্রীগৌরসুন্দর নিত্য প্রিয়া বিষ্ণুপ্রিয়াকে বলতে লাগলেন–

শুন দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া এ তোর কহিল হিয়া
যখনে যে তুমি মনে কর।
আমি যথা তথা যাই আছিয়ে তোমার ঠাঁই
সত্য সত্য কহিলাম দৃঢ়।।

অনন্তর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া বললেন–

কৃষ্ণ আজ্ঞা বাণী শুনি বিষ্ণুপ্রিয়া মনে গুণি
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি প্রভু।
নিজ সুখে কর কাজ কে দিবে তাহাতে বাধ
প্রত্যুত্তর না দিলেক তবু।।

চৈঃ মঃ মধ্যঃ

অতঃপর রাত্রিকালে নিদ্রিত বিষ্ণুপ্রিয়াকে ত্যাগ করে মহাপ্রভু জননী শচীদেবীর দ্বারে এসে তাঁকে বন্দনা করলেন। কিছু ঐশ্বর্য্য প্রকট পূর্ব্বক কথোপকথনে শচীমাতাকে মোহিত করে নিদয়ার ঘাটে সাঁতার দিয়ে গঙ্গা পার হয়ে কাটোয়ার দিকে যাত্রা করলেন।

নিশান্তে বিষ্ণুপ্রিয়া ও শচীমাতা জেগে উঠে কি করলেন তার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন বাসু ঘোষ ঠাকুর। নিশান্তে নিদ্রাভঙ্গ হলে বিষ্ণুপ্রিয়া খাটের উপর মহাপ্রভু শয়ন করে আছেন মনে করে হাত দিয়ে দেখলেন খাট শূন্য পড়ে আছে, প্রভু নাই।

‘‘শূন্য খাটে দিল হাত, বজ্র পড়িল মাথাত,
বুঝি বিধি মোরে বিড়ম্বিল।
করুণা করিয়া কান্দে, কেশ বেশ নাহি বান্ধে,
শচীর মন্দির কাছে গেল।।”

মহাপ্রভুর বিয়োগে অসহ্য বেদনায় বিষ্ণুপ্রিয়া যে করুণ ক্রন্দন করেছিলেন তার কিছু বর্ণনা শ্রীলোচনদাস চৈতন্য মঙ্গলে দিয়েছেন–

বিষ্ণুপ্রিয়া কান্দনেতে পৃথিবী বিদরে।
পশু পক্ষী লতা তরু এ পাষাণ ঝুরে।।
পাপিষ্ঠ শরীর মোর প্রাণ নাহি যায়।
ভুমিতে লোটাঞা দেবী করে হায় হায়।।
বিরহ অনল শ্বাস বহে অনিবার।
অধর শুকায়–কম্প হয় কলেবর।।

চৈঃ মঃ মধ্য

মহাপ্রভুর গৃহত্যাগের পর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী কিভাবে দিনযাপন ও নিত্যকৃত্যাদি করতেন ভক্তি রত্নাকরে শ্রীঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তী তার অপূর্ব্ব বর্ণনা দিয়েছেন–

প্রভুর বিচ্ছেদে নিদ্রা ত্যজিল নেত্রেতে।
কদাচিৎ নিদ্রা হইলে শয়ন ভূমিতে।।
কনক জিনিয়া অঙ্গ সে অতি মলিন।
কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর শশীর প্রায় ক্ষীণ।।
হরিনাম সংখ্যা পূর্ণ তণ্ডুলে করয়।
সে তণ্ডুল পাক করি প্রভুকে অর্পয়।।
তাহারই কিঞ্চিন্মাত্র করয়ে ভক্ষণ।।
কেহ না জানয়ে কেনে রাখয়ে জীবন।।

ভঃ রঃ ৪/৪৮-৫১

শ্রীমুরারি গুপ্তের কড়চায় আছে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী সর্ব্ব-প্রথম শ্রীগৌরমূর্ত্তি প্রকাশ ও পূজা করেন।




প্রকাশরূপেণ নিজপ্রিয়ায়াঃ
সমীপমাসাদ্য নিজাং হি মূর্ত্তিম্।
বিধায় তস্যাং স্থিত এষঃ কৃষ্ণঃ
সা লক্ষ্মীরূপা চ নিষেবতে প্রভুম্।।

(৪র্থ প্রঃ; ১৪শ সঃ ৮ম শ্লোক)

'প্রকাশরূপেণ নিজাং হি মূর্ত্তিম্ বিধায়'--নিজেই নিজের প্রকাশরূপী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়ে 'সমীপমাসাদ্য নিজপ্রিয়ায়াঃ'-- নিজপ্রিয়া লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়ার সমীপে অবস্থান কালে (তাঁকে বলেছিলেন) 'স্থিত এষঃ কৃষ্ণঃ'--ইহাতে কৃষ্ণ অবস্থান করেন। 'সা লক্ষ্মীরূপা চ নিষেবতে প্রভুম্' (মহাপ্রভুর বাক্য অনুসারে) লক্ষ্মীরূপা বিষ্ণুপ্রিয়া মহাপ্রভুর সে মূর্ত্তিটির সেবা করতে থাকেন।

মহাপ্রভু গৃহত্যাগ করে যাবার পর ভৃত্য ঈশান ঠাকুর শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে দেখাশুনা করতেন। শ্রীবংশীবদন ঠাকুর শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার সন্নিধানে সর্ব্বদা অবস্থান করতেন। তিনি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর কৃপাভাজন হয়েছিলেন। পদকর্ত্তা বংশীবদন একটি গৌর-বিরহ গীত লিখেছেন—

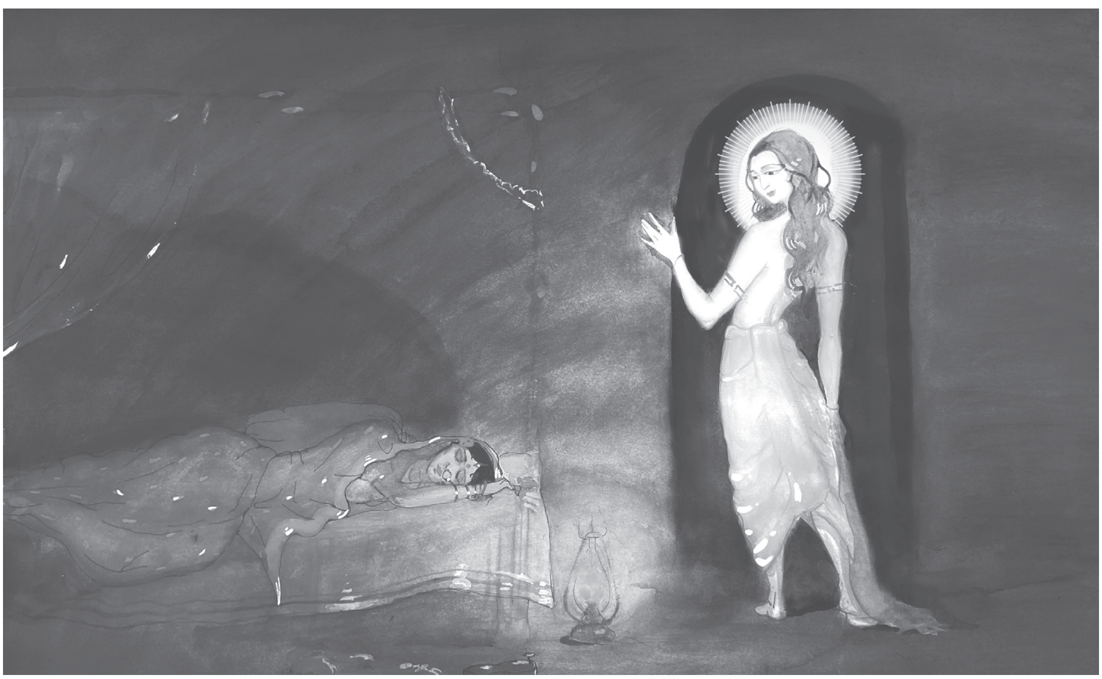
"আর না হেরিব ও চাঁদ কপালে নয়ন খঞ্জর নাচ"—

ইত্যাদি—(পদকল্পতরু)

শ্রীনিবাস আচার্য্য যখন মায়াপুরে এসেছিলেন বৃদ্ধ ঈশান ঠাকুর ও বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। বংশীবদন ঠাকুর তাঁকে বহু কৃপা করেছিলেন।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী সাক্ষাৎ ভূ-শক্তি-স্বরূপিণী। (সাপ্তাহিক গৌড়ীয় ২০শ খণ্ড ২৬/২৭ সংখ্যা)

**।। জয় গৌরপ্রিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী কি জয়।।**



# শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত

পুরাণানানামর্থবেত্তা শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিতঃ।
পুরাসীন্নন্দপরিষৎ পণ্ডিতো ভাগুরিমুনিঃ।।

গৌঃ গঃ ১০৬

‘‘যিনি পূর্বে নন্দ মহারাজের সভাপণ্ডিত ভাগুরিমুনি ছিলেন, তিনিই এখন পুরাণ সমূহের অর্থবেত্তা শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত হয়েছেন।

শ্রীনবদ্বীপের কুলিয়ায় শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত বাস করতেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ (চৈঃ ভাঃ মঃ ৯/৯৮) গৌড়ীয় ভাষ্যে উল্লেখ করেছেন—‘‘নবদ্বীপের উপকণ্ঠে গঙ্গার পশ্চিমতটে অবস্থিত উপনগরী হল কুলিয়া। গঙ্গার পূর্ব্বপারে শ্রীমায়াপুরে তৎকালে শ্রীনবদ্বীপনগর অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমান শহর নবদ্বীপই প্রাচীন কুলিয়া। উহাই অপরাধ ভঞ্জনের পাট। আমাদ-কোল কোলেরদহ, কোলেরগঞ্জ, গদখালির কোল প্রভৃতি প্রাচীন কুলিয়ার নামসমূহ আজও বর্ত্তমান শহরের স্থানে স্থানে সেই নিদর্শন রক্ষা করিতেছে।”

শ্রীমহাপ্রভু তাঁর দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের মহিমা জগতে প্রকাশ করেছেন। দেবানন্দ পণ্ডিত ভাগবত বক্তা হলেও কখনও ভক্তি ব্যাখ্যা করতেন না। তবে ভাগবত শাস্ত্রের বক্তা হিসাবে দেবানন্দ পণ্ডিতের খুব খ্যাতি ছিল। অনেকে তাঁর কাছে ভাগবত পড়তেন।

একদিন শ্রীবাস পণ্ডিত দেবানন্দের কাছে ভাগবত শুনতে গেলেন। দেবানন্দ ভাগবত পাঠ আরম্ভ করলেন। চারিদিকে ছাত্রগণ পাঠ শুনছে, কেউ বা সঙ্গে সঙ্গে পুঁথি দেখছে। শ্রীবাস পরম রসিক ভক্ত। শ্রীমদ্ভাগবতের মধুর শ্লোকাবলী শুনতেই প্রেমার্দ্র হয়ে পড়লেন। প্রেমে ক্রন্দন করতে করতে ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। এ সব দেখে দেবানন্দের ছাত্রগণ মনে করল,—লোকটি পাগল। আমাদের পাঠ শুনতে দিচ্ছে না। চল, একে ধরে বাইরে রেখে দেই। জ্ঞানহীন ছাত্রগণ শ্রীবাস পণ্ডিতকে বাইরে রেখে এল। এ সব দেবানন্দ পণ্ডিত দেখলেন, কিন্তু ছাত্রদের বাধা দিলেন না। গুরু যেমন অজ্ঞমতি, ছাত্রগণও তেমনি পাপমতি। শ্রীবাস পণ্ডিত কাউকেও কিছু না বলে দুঃখ পেয়ে গৃহে ফিরে এলেন। এ সব ঘটনা শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবের পূর্ব্বে হয়েছিল।

অতঃপর মহাপ্রভুর আবির্ভাব। তিনি শৈশব লীলায় বিদ্যাধ্যয়ন, যৌবনে অধ্যাপকরূপে বিদ্যা-বিলাস এবং অনন্তর আত্মপ্রকাশ করলেন। এ সময় একদিন শ্রীবাস মন্দিরে মহাভাব প্রকাশ করে ভক্তগণের অতীত কাহিনী বলতে বলতে শ্রীবাস পণ্ডিতকে বললেন—শ্রীবাস! তোমার কি মনে আছে তুমি একদিন দেবানন্দের গৃহে ভাগবত শুনতে গিয়েছিলে? ভাগবতের মধুর শ্লোকাবলী শুনে প্রেম মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিলে, দেবানন্দের অজ্ঞ ছাত্রগণ তোমাকে গৃহের বাইরে রেখে ছিল; তুমি দুঃখ পেয়ে গৃহে ফিরে এসেছিলে। এ সব কথা শুনে শ্রীবাস মহাপ্রভুর শ্রীচরণে লুটিয়ে পড়লেন।

একদিন মহাপ্রভু নগর ভ্রমণ করতে করতে সার্ব্বভৌমের পিতা মহেশ্বর বিশারদ পণ্ডিতের জাঙ্গালে এলেন। সেখানে দেবানন্দ পণ্ডিত বাস করতেন। তখন দেবানন্দ গৃহে ভাগবত পাঠ করছিলেন। মহাপ্রভু দূর থেকে তা শুনতে পেলেন। তাঁর পাঠ শ্রবণে প্রভুর ক্রোধ হল—

কোপে বলে প্রভু—বেটা কি অর্থ বাখানে।
ভাগবত অর্থ কোন জন্মেও না জানে।।
গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ অবতার।

❖ ❖ ❖

সবে পুরুষার্থ ভক্তি ভাগবতে হয়।
প্রেমরূপ ভাগবত চারিবেদে কয়।।
চারি বেদ দধি, ভাগবত নবনীত।
মথিলেন শুকে, খাইলেন পরীক্ষিত।।
মোর প্রিয় শুক জানেন ভাগবত।
ভাগবতে কহে মোর তত্ত্ব অভিমত।।
মুঞি মোর দাস আর গ্রন্থ ভাগবতে।
যার ভেদ আছে তার নাশ ভাল মতে।।

চৈঃ ভাঃ মধ্য ২১/১৩-১৮

মহাপ্রভু বললেন—ভক্তি ছাড়া ভাগবতের যারা অন্য অর্থ করে সে অধার্মিক ভাগবতের কিছুই জানে না। মহাপ্রভু ক্রোধ ভরে এই সমস্ত বলতে বলতে তাঁর গৃহাভিমুখে ধাবিত হলেন। ভক্তগণ মহাপ্রভুকে ধরলেন ও অনুনয় করতে লাগলেন। প্রভু পুনরায় বলতে লাগলেন—

মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রে গায়।
ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা তপ প্রতিষ্ঠায়।।
ভাগবত বুঝি হেন যার আছে জ্ঞান।
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ।।
ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বর বুদ্ধি যার।
সে জানয়ে ভাগবত অর্থ—ভক্তি সার।।

চৈঃ ভাঃ মঃ ২১/১৩-১৫

যিনি ভাগবতকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বুদ্ধি করেন তিনিই ভাগবত জানতে পারেন। ভাগবতের অর্থ একমাত্র প্রেম ভক্তি দ্বারা বুঝা যায়। ভাগবতের অর্থ বুঝতে হলে ভক্ত-ভাগবতের সেবা করতে হয়। মহাপ্রভু এ-রূপ অনেক তত্ত্ব কথা বলে নগর ভ্রমণ করে গৃহে ফিরে এলেন। দেবানন্দ দূর থেকে এসব কথা শুনতে পেলেন। কিন্তু কিছু মনে করলেন না।

কিছুদিন বাদে মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করে পুরী ধামে চলে গেলেন। তখন দেবানন্দের মনে নির্ব্বেদ হতে লাগল। এমন পুরুষের কাছে আমি একদিন গেলাম না? এমন মহাপ্রেমিক পুরুষকে চিনিতে পারলাম না?

একদিন কুলিয়াতে শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত এক ভক্তের গৃহে এলেন; তিনি রাত্রিকালে সেখানে কীর্ত্তন ও নৃত্য করবেন—এ সংবাদ চারিদিকে ঘোষণা করা হল। সন্ধ্যা হতেই ভক্তগণ আসতে লাগলেন। সেই কথা শুনে দেবানন্দ স্থির থাকতে পারলেন না। তিনিও কীর্ত্তনের স্থানে উপস্থিত হলেন। শ্রীবক্রেশ্বরের তেজোময় মূর্ত্তি দেখে এবং মধুর কীর্ত্তন শুনে দেবানন্দ স্তম্ভিত হলেন। তিনি এক পার্শ্বে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন। যত রাত্রি হতে লাগল তত লোকের ভিড় বাড়তে লাগল। দেবানন্দ পণ্ডিত তখন একখানি বেত্র হাতে নিয়ে ভিড় সামলাতে লাগলেন। 'বক্রেশ্বর পণ্ডিত নাচেন যতক্ষণ। বেত্র হস্তে আপনে বুলেন ততক্ষণ।।"—(চৈঃ ভাঃ অন্তঃ ৩/৪৭৭) নৃত্য করতে করতে বক্রেশ্বর পণ্ডিত যখন প্রেমে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন তখন দেবানন্দ সাবধানে তাঁকে কোলে তুলে নেন। অঙ্গের ধূলা স্বীয় উড়নী দ্বারা ঝেড়ে দেন ও সে ধূলি অঙ্গে লেপন করেন। এভাবে সেদিন দেবানন্দের ভক্ত সেবা হল। তার কিছুদিন পর মহাপ্রভু কুলিয়ায় এলেন।

"কুলিয়ায় আইলেন বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর।"

(চৈঃ ভাঃ অন্তঃ ৩/৩৪৫)

নীলাচল হতে কুলিয়া নগরে মহাপ্রভুর শুভাগমনে ভক্তগণের আনন্দের সীমা রইল না। মহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শনের জন্য সকলে আসতে লাগলেন। পূর্ব্বে যাঁরা প্রভুর চরণে অপরাধ করেছিলেন তাঁরাও প্রভুর কাছে এসে ক্ষমা প্রার্থনা

করতে লাগলেন। মহাপ্রভু সকলকে ক্ষমা করে সদুপদেশ দিতে লাগলেন। এমন সময় দেবানন্দ পণ্ডিত মহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শনে এলেন।

"দণ্ডবৎ দেবানন্দ পণ্ডিত করিয়া।
রহিলেন এক ভিতে সঙ্কোচিত হৈয়া।।"

–(চৈঃ ভাঃ অন্তঃ ৩/৪৯০)

মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ করে দেবানন্দ পণ্ডিত সঙ্কোচিত হয়ে একপাশে দাঁড়ায়ে রইলেন। প্রভু তখন তাঁকে বলতে লাগলেন–তুমি যে আমার প্রিয় বক্রেশ্বরের সেবা করেছ তাতেই আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। সেই সেবার ফলে তুমি আমার কাছে আসতে পেরেছ। বক্রেশ্বর কৃষ্ণের পূর্ণ শক্তি। যে তাঁকে সেবা করে সে কৃষ্ণ-কৃপা লাভ করে। মহাপ্রভুর এ কথা শুনে ভক্তি গদ্‌গদ্ চিত্তে দেবানন্দ বলতে লাগলেন–তুমি ঈশ্বর; জীব উদ্ধারের জন্য নবদ্বীপে অবতীর্ণ হয়েছ। আমি পাপী দৈব দোষে তোমার শ্রীচরণ সেবা করিনি। তোমার অহৈতুকী কৃপা থেকে এতদিন বঞ্চিত ছিলাম। হে সর্বভূতাত্মা অন্তর্য্যামী প্রভো! তুমি পরম দয়ালু। তুমি দয়া করে আমায় দর্শন দিয়েছ তাই দর্শন পেয়েছি! হে করুণাময়, আমাকে কিছু সদুপদেশ প্রদান কর ও ভাগবতের কি ব্যাখ্যা করব–কৃপা করে আমায় বলে দাও। দেবানন্দ পণ্ডিতের বাক্য শুনে মহাপ্রভু বলতে লাগলেন–

শুন বিপ্র! ভাগবতে এই বাখানিবা।
ভক্তি বিনা আর কিছু মুখে না আনিবা।।
আদি মধ্য অন্তে ভাগবত এই কয়।
বিষ্ণু ভক্তি নিত্য সিদ্ধ অক্ষয় অব্যয়।।
যেন রূপ মৎস্য কূর্ম আদি অবতার।
আবির্ভাব তিরোভাব যেন তা সবার।।
এই মত ভাগবত কারো কৃত নয়।
আবির্ভাব তিরোভাব আপনেই হয়।।
ভক্তি যোগে ভাগবত ব্যাসের জিহ্বায়।
স্ফুর্ত্তি যে হইল মাত্র কৃষ্ণের কৃপায়।।
ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন বুঝনে না যায়।
এই মত ভাগবত সর্বশাস্ত্রে গায়।।
ভাগবত বুঝি হেন যার আছে জ্ঞান।
সেই না জানয়ে ভাগবতের প্রমাণ।।
অজ্ঞ হই ভাগবতে যে লয় শরণ।
ভাগবত অর্থ তার হয় দরশন।।
প্রেমময় ভাগবত–শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ।
তাহাতে কহেন যত গোপ্য কৃষ্ণ রঙ্গ।।

চৈঃ ভাঃ অন্তঃ ৩/৫০৫-৫১৬

হে বিপ্র! পূর্বে তুমি যে শ্রীবাস পণ্ডিতের চরণে অপরাধ করেছিলে, তাঁর চরণ ধরে ক্ষমা প্রার্থনা কর। গ্রন্থ-ভাগবত ও ভক্ত-ভাগবত দুই সমান। ভক্ত ভাগবতের কৃপা হলে গ্রন্থ ভাগবত স্ফুর্ত্তি হবে। দেবানন্দ তৎক্ষণাৎ শ্রীবাস পণ্ডিতের চরণে লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা চাইলেন। শ্রীবাস দেবানন্দকে আলিঙ্গন করলেন। দেবানন্দের অপরাধ দূর হল। চতুর্দ্দিকে ভাগবতগণ 'হরি হরি' ধ্বনি করতে লাগলেন। সে দিন থেকে শ্রীদেবানন্দ শ্রীমহাপ্রভুর ভক্তগণের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ভক্ত হলেন।

পৌষ কৃষ্ণৈকাদশী তিথি শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিতের তিরোভাব দিবস।

❖ ❖ ❖

**।। জয় শ্রীল দেবানন্দ পণ্ডিত কি জয়।।**

# শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী

'লোকনাথাখ্য-গোস্বামী শ্রীলীলামঞ্জরী পুরা'

গৌঃ গঃ ১৮৭

'শ্রীকৃষ্ণলীলায় যিনি লীলামঞ্জরী সখী ছিলেন, তিনিই গৌরলীলায় শ্রীলোকনাথ গোস্বামীরূপে প্রকটিত হয়েছেন।'

শ্রীমদ্রাধাবিনোদৈকসেবাসম্পৎসমন্বিতম্।
পদ্মনাভাত্মজং শ্রীমল্লোকনাথ প্রভুং ভজে।।

শ্রীশ্রীরাধাবিনোদের ঐকান্তিক সেবাসম্পত্তি বিশিষ্ট শ্রীপদ্মনাভ-তনয় শ্রীল লোকনাথ প্রভুকে আমি ভজনা করি।

যশোহরের অন্তর্গত তালখড়ি গ্রামে, শ্রীপদ্মনাভ ও শ্রীসীতা দেবীর গৃহে শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী আবির্ভূত হন। শ্রীলোকনাথের ছোট ভাইয়ের নাম শ্রীপ্রগল্‌ভ ভট্টাচার্য্য। শ্রীপ্রগল্‌ভ ভট্টাচার্য্যের বংশধর অদ্যাপি তালখড়ি গ্রামে বসবাস করছেন।

শৈশবকাল থেকে শ্রীলোকনাথ সংসারের প্রতি উদাসীন ছিলেন। পিতা-মাতা ও গৃহত্যাগ করে তিনি নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণ দর্শনের জন্য উপস্থিত হন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীলোকনাথকে প্রণয়ভরে আলিঙ্গন করে শীঘ্র শ্রীবৃন্দাবনধামে যেতে আদেশ করেন। কিন্তু শ্রীলোকনাথ অনুমানে বুঝতে পারলেন মহাপ্রভু দুই তিন দিনের মধ্যে গৃহ ত্যাগ করবেন। তাই তিনি বড় কাতর হ'য়ে পড়লেন।

মহাপ্রভু শ্রীলোকনাথের মনোভাব বুঝতে পেরে তাঁকে অনেক প্রবোধ দিলেন এবং বললেন—শ্রীবৃন্দাবন ধামেই আমাদের পুনর্মিলন হ'বে।

এ সম্বন্ধে শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ভক্তি-রত্নাকরের প্রথম তরঙ্গে লিখেছেন—

''কাঁদিতে কাঁদিতে প্রভুপদে প্রণমিল।।
অন্তর্য্যামী প্রভু লোকনাথে আলিঙ্গিয়া।
করিলেন বিদায় গোপনে প্রবোধিয়া।।
লোকনাথ প্রভুপদে আত্ম-সমর্পিল।
প্রভুগণে প্রণমিয়া গমন করিল।।''

শ্রীল লোকনাথ আর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন না। বিরহ বিধুর হয়ে তীর্থ-ভ্রমণ করতে লাগলেন।

দুঃখী হৈয়া কৈল বহু তীর্থ-পর্য্যটন।
কতদিন পরেতে গেলেন বৃন্দাবন।।

কিছুদিন তীর্থ-পর্য্যটন করে লোকনাথ গোস্বামী বৃন্দাবনে গেলেন।

এদিকে ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীনীলাচলে গেলেন। কিছুদিন নীলাচলে অবস্থান করে জীবোদ্ধার মানসে দক্ষিণে তীর্থ ভ্রমণ করতে লাগলেন। মহাপ্রভুর দক্ষিণে যাত্রার কথা শুনে শ্রীলোকনাথও দক্ষিণ-তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হ'লেন।

মহাপ্রভু দক্ষিণ ভ্রমণ করে বৃন্দাবনে এলেন। একথা শুনে শ্রীলোকনাথ প্রভুও শীঘ্র বৃন্দাবনে গেলেন। ইতিমধ্যে মহাপ্রভু বৃন্দাবন হয়ে প্রয়াগ-ধামে গেলেন। শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী মহাপ্রভুর দর্শন পেলেন না, তাই তিনি বড় বিষণ্ণ হলেন। ঠিক করলেন পরদিন প্রভাতে প্রয়াগ-ধাম অভিমুখে যাত্রা করবেন।

''স্বপ্নে প্রভু প্রবোধি রাখিলা বৃন্দাবনে।।
লোকনাথ প্রভু আজ্ঞা লঙ্ঘিতে নারিল।
অজ্ঞাত রূপেতে ব্রজবনে বাস কৈল।।''

(ভক্তি রত্নাকর)





মহাপ্রভু স্বপ্নযোগে শ্রীলোকনাথ প্রভুকে প্রবোধ দিয়ে বৃন্দাবনে থাকতে আদেশ করলেন।

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী অজ্ঞাতভাবে ব্রজে বাস করতে লাগলেন।

কিছুদিন পরে মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয়জন--শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীগোপালভট্ট, শ্রীভূগর্ভ প্রভৃতির সঙ্গে শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর মিলন হল। পরস্পরের প্রতি তাঁদের কি অদ্ভূত স্নেহ! সকলে যেন অভিন্নাত্মা ছিলেন।

গোস্বামিগণের মধ্যে শ্রীমদ্ লোকনাথ গোস্বামী অতি প্রবীণ। তিনি সব সময় প্রেমে বিহ্বল থাকতেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীলোকনাথ গোস্বামীকে বন্দনা করেছেন--

বৃন্দাবন্ প্রিয়ান্ বন্দে শ্রীগোবিন্দ পদাশ্রিতান্।
শ্রীমৎকাশীশ্বরং লোকনাথং শ্রীকৃষ্ণদাসকম্।।

শ্রীবৃন্দাবনপ্রিয় শ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীপাদপদ্মাশ্রিত শ্রীমদ্ কাশীশ্বর, শ্রীমদ্ লোকনাথ ও শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজকে আমি বন্দনা করি।

বৃন্দাবনের বনে বনে শ্রীকৃষ্ণ-লীলাস্থলী সকল দর্শন করে লোকনাথ গোস্বামী আনন্দে ভ্রমণ করতেন। ছত্র বনের পাশে 'উমরাও' নামক গ্রামে কিশোরী-কুণ্ড-তীরে কিছুদিন বাস করেন। শ্রীবিগ্রহ সেবা করবার তাঁর বড় ইচ্ছা হয়। অন্তর্য্যামী প্রভু তা' জানতে পেরে স্বয়ং একটি বিগ্রহ তাঁর হাতে অর্পণ করে বললেন একে তুমি পূজা কর! এ বিগ্রহের নাম 'রাধাবিনোদ'। বিগ্রহদাতা অকস্মাৎ কোথায় যেন অন্তর্ধান হ'লেন। শ্রীলোকনাথ গোস্বামী আর তাঁকে দেখতে পেলেন না। তিনি খুব চিন্তা করতে লাগলেন।

শ্রীল লোকনাথকে এরূপ চিন্তা মগ্ন দেখে শ্রীরাধাবিনোদ হাস্য করে বলতে লাগলেন--আমাকে কে আনবে এখানে? আমি স্বয়ং এসেছি। আমি এ উমরাও গ্রামের বনে থাকি। এই যে কিশোরীকুণ্ড দেখছ, তা আমার বাসস্থান। তুমি শীঘ্র আমায় কিছু ভোজন করতে দাও।

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর আনন্দের সীমা রইল না। প্রেম-নীরে ভাসতে ভাসতে তখনই কিছু নৈবেদ্য তৈরী করে ঠাকুরের ভোগ লাগালেন। তারপর পুষ্প-শয্যা করে ঠাকুরকে শয়ন করালেন।

পল্লবে বাতাস করিলেন কতক্ষণ।
মনের আনন্দে কৈল পাদ-সম্বাহন।।
তনুমনঃ প্রাণ প্রভুপদে সমর্পিলা।
সে রূপ-মাধুর্য্যামৃত পানে মগ্ন হৈলা।।

(ভক্তি রত্নাকর)

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী অনিকেত ছিলেন। গ্রামবাসী গোপগণ তাঁর ভজন কুটীর তৈরী করে দিতে চাইলেও তিনি তাতে রাজি হ'তেন না। শ্রীরাধাবিনোদের থাকবার জন্য একটি ঝুলি তৈরী করেন, সেটা সব সময় কণ্ঠদেশে ঝুলিয়ে রাখতেন। শ্রীরাধাবিনোদ তাঁর কণ্ঠমণি-স্বরূপ ছিলেন। ঝুলিটিই মন্দির স্বরূপ। তাঁর আচরণে চরম বৈরাগ্যের পরিচয় পাওয়া যেত। গোস্বামিগণ অনেক যত্ন করে তাঁকে সঙ্গে রাখতেন। তাঁর সেবিত শ্রীরাধাবিনোদ জিউ বিগ্রহ বর্তমানে শ্রীগোকুলানন্দ মন্দিরে সেবিত হচ্ছেন।

শ্রীমহাপ্রভুর পরমপ্রিয় লোকনাথের চরিত্র বিশ্লেষণ করা বড় কঠিন। যখন মহাপ্রভু ও তাঁর প্রিয় শ্রীরূপ-শ্রীসনাতনাদি অন্তর্দ্ধান-লীলা আবিষ্কার করলেন, তখন শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর বিরহ যাতনা অসহনীয় হল। তখন তিনি একমাত্র মহাপ্রভুর ইচ্ছায় যেন প্রকট ছিলেন।

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী শ্রীনরোত্তম দাসকে দীক্ষামন্ত্র প্রদান করেন। তাঁর অন্য কোন শিষ্যের উল্লেখ কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

শ্রীনরোত্তম দাস যেভাবে গুরু শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর সেবা করতেন তা' অবর্ণনীয়। রাত্রি প্রভাতের আগে শ্রীগুরুদেবের মল-মূত্রাদি পরিষ্কার করে রাখতেন।

শ্রাবণ পূর্ণিমায় শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর লোকনাথ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী দীর্ঘ বয়স পর্যন্ত খদির-বনে ভজন করতে করতে নিত্য লীলায় প্রবেশ করেন। এস্থানে শ্রীযুগল-কুণ্ড নামে একটি দীঘি আছে। তারই তীরে শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর সমাধি।

কথিত আছে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত রচনা করবার সংকল্প নিয়ে শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর নিকট আশীর্ব্বাদ, অনুমতি ও উপকরণাদি প্রার্থনা করলে শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী নিজ নাম বা চরিতাদি সম্বন্ধে কিছু বর্ণন করতে নিষেধ করেন। শ্রীমদ্ লোকনাথ গোস্বামিপাদের আজ্ঞা ভঙ্গ হয়, এ ভয়ে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে তাঁর সম্বন্ধে কিছু লিখেন নাই।

শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয় শ্রীগুরু-পাদপদ্মে এ প্রার্থনা করেছেন—

''হা হা প্রভু লোকনাথ রাখ পদদ্বন্দ্বে।
কৃপাদৃষ্টে চাহ যদি হইয়া আনন্দে।।
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি তবে হঙ পূর্ণ তৃষ্ণ।
যেথায় চৈতন্য মিলে সেথা রাধাকৃষ্ণ।।
তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আর।
মনের বাসনা পূর্ণ কর এইবার।।
এ তিন সংসারে মোর আর কেহ নাই।
কৃপা করি নিজ পদতলে দেহ ঠাঁই।।
রাধাকৃষ্ণ লীলাগুণ গাঙ রাত্রি দিনে।
নরোত্তম বাঞ্ছা পূর্ণ নহে তুয়া বিনে।।"

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী আনুমানিক ১৫১০ শকে আষাঢ়ী কৃষ্ণ-অষ্টমী তিথিতে তিরোধান লীলা করেন।

**।। জয় শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী কি জয়।।**

# শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামী

সাধনদীপিকায় শ্রীভূগর্ভ গোস্বামীকে শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর পিতৃব্যরূপে নির্দ্দেশ করা হয়েছে।

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর চরিত সম্বন্ধে যেমন বৈষ্ণব সাহিত্যে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না, তেমন তাঁর সুহৃৎ শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামীর চরিত সম্বন্ধেও না।

শ্রীলোকনাথ ও শ্রীভূগর্ভ দুইজনে অভিন্ন হৃদয় ছিলেন। মহাপ্রভুর আদেশে তাঁরা ব্রজধামে বাস করতেন। শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন। শ্রীভূগর্ভ গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন শ্রীগোবিন্দদেবের পূজারী—শ্রীচৈতন্যদাস, শ্রীমুকুন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী, প্রেমী কৃষ্ণদাস প্রভৃতি।

শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী ও শ্রীল ভাগবত দাস প্রভু একসঙ্গে বৃন্দাবনে বাস করতেন।

ভূগর্ভ গোসাঞি আর ভাগবত দাস।
যেই দুই আসি কৈল বৃন্দাবনে বাস।।

চৈঃ চঃ আ ১২/৮১

শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামী লিখেছেন—

"ভূগর্ভ ঠক্কুরস্যাসীৎ পূর্ব্বখ্যা প্রেমমঞ্জরী।"

(শ্রীগৌর গণোদ্দেশ দীপিকা)

যিনি ব্রজে প্রেমমঞ্জরী ছিলেন গৌর-লীলায় তিনি ভূগর্ভ ঠাকুররূপে অবতীর্ণ হয়েছেন।

শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামী কার্ত্তিক শুক্লা চতুর্দ্দশীর দিন ব্রজধামে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন।

শ্রীলোকনাথ গোস্বামী ও শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী অভিন্নাত্মরূপে ব্রজে বাস করতেন। শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বর্ণন করেছেন--

ভূগর্ভেতে স্নেহ যৈছে জগতে প্রচার।
লোকনাথ সহ দেহ ভিন্ন মাত্র তাঁর।।

(ভক্তি রত্নাকর ১ম তরঙ্গ)

বৃন্দাবন ধামে সর্বপ্রথমে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী ও শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামী।

রূপানুগবর শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গোস্বামিপাদের সঙ্গে শ্রীভূগর্ভ গোস্বামীরও স্মরণ করেছেন—

হরি হরি! কি মোর করমগতি মন্দ।
ব্রজে রাধা কৃষ্ণ পদ না ভজিনু তিল আধ,
না বুঝিনু রাগের সম্বন্ধ।।
স্বরূপ, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ,
ভূগর্ভ, শ্রীজীব লোকনাথ।
ইঁহা সবার পাদপদ্ম না সেবিনু তিল আধ
আর কিসে পূরিবেক সাধ।।
কৃষ্ণদাস কবিরাজ রসিক ভকত মাঝ,
যেহোঁ কৈল চৈতন্য চরিত।
গৌর-গোবিন্দ-লীলা শুনিতে গলয়ে শিলা
তাহাতে না হৈল মোর চিত।।
সে সব ভকত সঙ্গ যে করিল তার সঙ্গ,
তার সঙ্গে কেনে নহিল বাস।
কি মোর দুঃখের কথা জনম গোঙানু বৃথা
ধিক্ ধিক্ নরোত্তম দাস।।

**।। জয় শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামী কি জয়।।**




# শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর

''পুরা মধুমতী প্রাণসখী বৃন্দাবনে স্থিতা।
অধুনা নরহর্য্যাখ্যঃ সরকারঃ প্রভোঃ প্রিয়ঃ।।''
গৌঃ গঃ ১৭৭

পূর্বে বৃন্দাবনে যিনি 'মধুমতী' নামক প্রাণসখী ছিলেন, তিনি এখন মহাপ্রভুর প্রিয় 'শ্রীনরহরি সরকার' হয়েছেন।

কাটোয়া থেকে প্রায় চার মাইল পশ্চিমে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত শ্রীখণ্ডে শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের জন্মস্থান। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে লিখিত আছে– শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের আবির্ভাব ১৪০১ শকাব্দ। মতান্তরে ১৪০২ শকাব্দ। তাঁর পিতার নাম শ্রীনারায়ণ দাস, মাতার নাম শ্রীগোয়ী। শ্রীগোয়ী মুরারী সেনের কন্যা ছিলেন। শ্রীমুকুন্দ দাস, শ্রীমাধব দাস ও শ্রীনরহরি দাস তিন ভাই। শ্রীমুকুন্দ দাসের পুত্র শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীখণ্ডবাসী ভক্তগণকে প্রেমকল্পতরুর মহাশাখা বলে বর্ণন করেছেন।

খণ্ডবাসী মুকুন্দদাস, শ্রীরঘুনন্দন।
নরহরিদাস, চিরঞ্জীব সুলোচন।।
এই সব মহাশাখা চৈতন্য, কৃপাধাম।
প্রেম-ফল-ফুল করে যাহাঁ তাঁহা দান।।
(চৈঃ চঃ আদি ১০/৭৮-৭৯)

মহাপ্রভুর যাবতীয় লীলায় শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর যোগদান করেছিলেন। শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী শ্রীভক্তিরত্নাকরে লিখেছেন–

শ্রীসরকার ঠাকুর অদ্ভুত মহিমা।
ব্রজের মধুমতী যে গুণের নাহি সীমা।।

শ্রীলোচনদাস ঠাকুর শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের প্রিয় শিষ্য ছিলেন। তিনি শ্রীচৈতন্যমঙ্গল নামক গ্রন্থে স্বীয় গুরুদেবের পরিচয় সম্বন্ধে লিখেছেন--

শ্রীনরহরি দাস ঠাকুর আমার।
বৈদ্যকুলে মহাকুল-প্রভাব যাঁহার।।
অনর্গল কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণময় তনু।
অনুগত জনে না বুঝান প্রেম বিনু।।

❖ ❖ ❖

বৃন্দাবনে মধুমতী নাম ছিল যাঁর।
রাধা প্রিয় সখী তিহোঁ মধুর ভাণ্ডার।।
এবে কলিকালে গৌরসঙ্গে নরহরি।
রাধা-কৃষ্ণ প্রেমের ভাণ্ডারে অধিকারী।।
(শ্রীচৈতন্য মঙ্গল সূত্র খণ্ড)

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীগৌরসুন্দরের আরতি-কীর্ত্তনে গেয়েছেন–

নরহরি আদি করি চামর ঢুলায়।
সঞ্জয় মুকুন্দ বাসুঘোষ আদি গায়।।

একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীখণ্ডে নরহরি সরকার ঠাকুরের শ্রীপাটে গিয়ে তাঁর নিকট মধু পান করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে, তিনি তাঁর গৃহের নিকটে অবস্থিত একটি পুষ্করিণীর জলকে নিজশক্তি প্রভাবে মধুরূপে পরিণত করেছিলেন। ঐ পুষ্করিণীর জল দিয়ে তিনি মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর পিপাসা নিবারণ করেছিলেন। সেই থেকে ঐ পুকুরটি মধু পুষ্করিণী নামে পরিচিত হয়।

শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর যেমন গায়ক ছিলেন তেমনি কবি ছিলেন। তিনি শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের লীলা সম্বন্ধে বহু গীত লিখেছেন। তিনি ''শ্রীভজনামৃত'' নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থও লিখেছেন দেখা যায়। শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের

নামে আরোপিত গৌর-বিরহ গীত পদকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়।

আওল গৌর, পুনহি নদীয়া পুর,
হোয়ত মনহি উল্লাস।
ঐছে আনন্দ কন্দ, কিয়ে হেরব,
করবহি কীর্ত্তন-বিলাস।।
হরি হরি কব হাম হেরব সো মুখ চাঁদ।
বিরহ পয়োধি কবহু, দিন পঙ রব,
টুটব হৃদয়কে বাঁধ।।
কুন্দন কনক পাঁতি, কব হেরব,
যজ্ঞ কি সূত্র বিরাজ।
বাহু যুগল তুমি, 'হরি' 'হরি' বোলব,
নটন ভকতগণ মাঝ।।
এত কহি নয়ন মুদি, রহু সব জন,
গৌর প্রেম ভেল ভোর।
নরহরি দাস আশ, কব পূরব,
হেরব গৌরকিশোর।।

মহাপ্রভুর নীলাচলে অবস্থানকালে বঙ্গদেশ থেকে যে সমস্ত ভক্তগণ প্রতিবছর তাঁর দর্শনে যেতেন তাঁদের মধ্যে খণ্ডবাসীগণও ছিলেন।

'মুকুন্দ, নরহরি, রঘুনন্দন খণ্ড হৈতে।
আচার্য্যের ঠাঞি আইলা নীলাচল যাইতে।।
চৈঃ চঃ মঃ ১০/৯০

শ্রীপুরুষোত্তম ধামে জগন্নাথদেবের রথের অগ্রে গৌড়দেশীয় ভক্তগণ যে সাত সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে নৃত্য করতেন, তাঁদের মধ্যে সপ্তম সম্প্রদায়ে খণ্ডবাসী ভক্তগণ ছিলেন।

''খণ্ডের সম্প্রদায় করে অন্যত্র কীর্ত্তন।
নরহরি নাচে তাঁহা শ্রীরঘুনন্দন।।''
চৈঃ চঃ মঃ ১৩/৪৬

শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের গীতগুলি প্রায় ভক্তিরত্নাকর রচয়িতা শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী পাদের সাথে মিলে যায়।

অনেকে ভুলবশতঃ 'ভক্তিরত্নাকর' রচয়িতা নরহরি চক্রবর্ত্তীর সাথে নরহরি সরকার ঠাকুরকে এক করে ফেলেন। শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী, যিনি ঘনশ্যাম দাস নামে প্রসিদ্ধ পৃথক ব্যক্তি। তাঁর জন্ম মুর্শিদাবাদ জেলায়। তাঁর পিতা শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্ত্তী শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদের শিষ্য ছিলেন। তিনি গোবিন্দজীর আদেশে রন্ধন সেবায় নিযুক্ত হয়েছিলেন বলে 'রসুইয়া পূজারী' নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন।

শ্রীলোচন দাস ঠাকুর লিখেছেন–

''গৌরাঙ্গ জন্মের আগে, বিবিধ রাগিণী রাগে,
ব্রজরস করিলেন গান।''

নরহরি সরকার ঠাকুর গৌর পদ গীতি লিখবার আগে বহু কৃষ্ণ-লীলা-পদ গীতি রচনা করেছিলেন।

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর আনুমানিক ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে অগ্রহায়ণ মাসে কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে অপ্রকট হন। সেই সময় শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু নরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব উৎসব সুষ্ঠুরূপে পালন করেন। নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরভদ্র গোস্বামী এবং তৎকালীন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবগণ ঐ উৎসবে যোগদান করেছিলেন।

''কেহো কহে, ''ওহে ভাই! শীঘ্র না যাইব।
শ্রীখণ্ডেতে প্রেমের সমুদ্র উথলিব।।
অগ্রহায়ণে কৃষ্ণা একাদশী সর্ব্বোপরি।
যা'তে অদর্শন শ্রীঠাকুর নরহরি।।
সেই একাদশীকে আছয়ে দিন চারি।
হবে যে উৎসব তা দেখিবা নেত্র ভরি।।''
ভক্তিরত্নাকর ৯/৫১২-৫১৪

**।। জয় শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর কি জয়।।**




# শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর

শ্রীমুকুন্দ দাস, শ্রীমাধব দাস ও শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর তিন ভাই তাঁরা শ্রীখণ্ডে বাস করতেন। শ্রীমুকুন্দ দাস ঠাকুরের পুত্র শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর।

শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় বর্ণিত আছে--

ব্যহস্তৃতীয় প্রদ্যুম্নঃ প্রিয়নর্ম্ম সখোঽভবৎ।।
চক্রে লীলাসহায়ং যো রাধামাধবয়োর্ব্রজে।
শ্রীচৈতন্যাদ্বৈততনুঃ স এব রঘুনন্দনঃ।।

গৌঃ গঃ৭০

ব্রজে যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়নর্ম্ম সখা হয়ে শ্রীরাধা মাধবের লীলায় সহায়তা করেছিলেন, যিনি চতুর্ব্যূহের তৃতীয় ব্যূহ 'শ্রীপ্রদ্যুম্ন', তিনিই এখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অভিন্ন দেহ-স্বরূপ 'শ্রীরঘুনন্দন' হয়েছেন।

শ্রীমুকুন্দ দাস ঠাকুর রাজবৈদ্য ছিলেন। তিনি নিরন্তর কৃষ্ণাবেশে কাজ করতেন।

বাহ্যে রাজবৈদ্য ইহা করে রাজ সেবা।
অন্তরে প্রেম ইহার জানিবেক কেবা।।

চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৫/১২০

একদিন শ্রীমুকুন্দ দাস বাদশাকে চিকিৎসা করবার জন্য রাজভবনে গমন করলেন। বাদশা উচ্চ আসনে বসে আছেন। শ্রীমুকুন্দ দাস পাশে বসে চিকিৎসার কথা জিজ্ঞাসা করছেন। সে-সময় এক ভৃত্য ময়ুরের পুচ্ছের বৃহৎ পাখা নিয়ে বাদশাকে হাওয়া করতে লাগল। ময়ুরের পুচ্ছ দেখে শ্রীমুকুন্দ দাসের কৃষ্ণ-স্মৃতির উদ্দীপনা হল। অমনি বিবশ হয়ে ভূমিতে পড়লেন। বাদশা শ্রীমুকুন্দ দাসকে অচৈতন্য দেখে মনে করলেন—তিনি হয়ত প্রাণত্যাগ করলেন। তাড়াতাড়ি নীচে নেমে তাঁকে ধরে উঠালেন। জিজ্ঞাসা করলেন—কোন ব্যথা পেয়েছেন কি না? শ্রীমুকুন্দ দাস বললেন— কোন ব্যথা পাই নি। বাদশা পড়বার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। মৃগী ব্যাধি আছে বলে বাদশার কাছে গোপন করলেন। মহাসিদ্ধ পুরুষ বলে বাদশা অনুমানে বুঝতে পারলেন। বহু সম্মান সহ তাঁকে গৃহে পাঠিয়ে দিলেন।

শ্রীমুকুন্দ দাস, শ্রীমাধব দাস ও শ্রীনরহরি সরকার— প্রতি বছর নীলাচলে গিয়ে মহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শন ও রথযাত্রায় নৃত্যকীর্ত্তনাদি করতেন। শ্রীমুকুন্দ দাসকে প্রভু এক দিবস স্নেহভরে জিজ্ঞাসা করলেন, মুকুন্দ! তুমি ও রঘুনন্দন দুজনের মধ্যে কে পিতা? কে পুত্র বল? শ্রীমুকুন্দ বললেন—রঘুনন্দনই আমার পিতা। যাঁর থেকে কৃষ্ণ-ভক্তি পাওয়া যায় তিনিই প্রকৃত পক্ষে পিতা। প্রভু বললেন—তোমার বিচারই ঠিক।

''যাঁহা হৈতে কৃষ্ণ ভক্তি সেই গুরু হয়।।''

চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৫/১১৭

প্রভু শ্রীরঘুনন্দনকে বিগ্রহ সেবা করতে আদেশ দিলেন।

''রঘুনন্দনের কার্য্য কৃষ্ণের সেবন।
কৃষ্ণ সেবা বিনা ইহার অন্যে নাহি মন।।''

চৈঃ চঃ মধ্য ১৫/১৩১

শিশুকালে শ্রীরঘুনন্দন শ্রীমূর্ত্তিকে লাড়ু খাইয়ে ছিলেন। পদকর্ত্তা শ্রীউদ্ধব দাস অতি সুন্দরভাবে এ বিষয় বর্ণন করেছেন।

প্রকট শ্রীখণ্ডবাস, নাম শ্রীমুকুন্দ দাস,
ঘরে সেবা গোপীনাথ জানি।
গেলা কোন কার্য্যান্তরে, সেবা করিবার তরে,

শ্রীরঘুনন্দনে ডাকি আনি।।
ঘরে আছে কৃষ্ণ-সেবা, যত্ন করে খাওয়াইবা,
এত বলি মুকুন্দ চলিলা।
পিতার আদেশ পাঞা, সেবার সামগ্রী লৈয়া,
গোপীনাথের সম্মুখে আইলা।।
শ্রীরঘুনন্দন অতি, বয়ঃক্রম শিশুমতি,
খাও বলে কান্দিতে কান্দিতে।
কৃষ্ণ সে প্রেমের বশে, না রাখিয়া অবশেষে,
সকল খাইয়া অলক্ষিতে।।
আসিয়া মুকুন্দ দাস, কহে বালকের পাশ,
প্রসাদ নৈবেদ্য আন দেখি।
শিশু কহে বাপ শুন, সকলি খাইল পুনঃ,
অবশেষ কিছুই না রাখি।।
শুনি অপরূপ হেন, বিস্মিত হৃদয়ে পুনঃ,
আর দিনে বালকে কহিয়া।
সেবা অনুমতি দিয়া, বাড়ীর বাহির হৈয়া,
পুনঃ আসি রহে লুকাইয়া।।
শ্রীরঘুনন্দন অতি, হইয়া হরিষ মতি,
গোপীনাথে লাড়ু দিয়া করে।
খাও খাও বলে ঘন, অর্দ্ধেক খাইতে হেন,
সময়ে মুকুন্দ দেখি দ্বারে।।
যে খাইল রহে হেন, আর না খাইলা পুনঃ,
দেখিয়া মুকুন্দ প্রেমে ভোর।
নন্দন করিয়া কোলে, গদ্‌গদ্ স্বরে বলে–
নয়নে বরিষে ঘন লোর।।
অদ্যাপি শ্রীখণ্ডপুরে, অর্দ্ধ লাড়ু আছে করে,
দেখে যত ভাগ্যবন্ত জনে।
অভিন্ন মদন যেই, শ্রীরঘুনন্দন সেই,
এ উদ্ধব দাস রস ভনে।।
শ্রীরঘুনন্দন যাঁরে লাড়ু খাওয়াইল।
তাঁরে দেখি মনে মহাকৌতুহল বাড়িল।।

ভক্তিরত্নাকর ৯/৫৫

শ্রীনরোত্তম ও শ্রীনিবাস আচার্য্য খেতরি গ্রামে যে মহোৎসব করেছিলেন সে উৎসবে শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর গিয়েছিলেন এবং কীর্ত্তন করেছিলেন।

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে একটি অলৌকিক ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে–

"শ্রীঅভিরাম ঠাকুর কোনও একসময় শ্রীখণ্ডে এসে রঘুনন্দনকে প্রণাম করলে রঘুনন্দন তাঁকে আলিঙ্গন করে প্রেমে আপ্লুত হয়েছিলেন। সেই সময় রঘুনন্দন বড়জাঙ্গায় উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন করতে থাকলে তাঁর চরণের নুপুর খুলে দুই ক্রোশ দূরে আকাইহাটে তাঁর শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদাসের বাড়িতে গিয়ে পরে। পরবর্ত্তীতে ঐ স্থানের স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য একটি কুণ্ড নির্মাণ করা হলে উক্ত কুণ্ডটি নুপুরকুণ্ড নামে প্রসিদ্ধ হয়।

শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর চাতুর্মাস্যকালে গৌড়দেশের ভক্তগণের সাথে পুরীতে যেতেন। সেসময় শ্রীজগন্নাথের রথের অগ্রে সাত সম্প্রদায়ের যে নৃত্যকীর্ত্তন হত, তার মধ্যে খণ্ডবাসী ভক্তগণের সপ্তম সম্প্রদায়ের নর্ত্তক ছিলেন শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর ও শ্রীরঘুনন্দন।

শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুর শ্রীনিবাস আচার্য্যকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তিনি তিরোধানের পূর্বে বৈষ্ণব ধর্মের ভবিষ্যত আশাপ্রদ নহে, এরূপ বলে আশ্বাস দিয়ে শ্রীনিবাস আচার্য্যকে আশির্বাদ প্রদান করেছিলেন।

"আইসে সময় ইথে বিষম হইব।
সবাকার মনে নানা সন্দেহ জন্মিব।।
কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রেন নিত্যানন্দের সংহৃতে।
অবতারে কলাবস্মিন্ বৈষ্ণবাঃ সর্ব্ব এব হি।।
ভবিষ্যন্তি সাদাদ্বিগ্রাঃ কালে কালে দিনে দিনে।
প্রায় সন্দিগ্ধ হৃদয়া উত্তমেতরমধ্যমাঃ।।"

শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু তাঁদের লীলা সঙ্গোপন করলে পর এই কলিতে সকল বৈষ্ণবগণই সর্ব্বদা উদ্বিগ্নচিত্ত হবেন। উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ সকলেই কালক্রমে দিন দিন সন্দিগ্ধচিত্ত হয়ে পড়বেন। নিজপুত্র শ্রীকানাই ঠাকুরকে গৌর গোপাল চরণে সমর্পন করে শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুর শ্রাবণমাসের শুক্লা চতুর্থী তিথিবাসরে অপ্রকট হন।

‘‘শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম লৈয়া বার বার।
হৈলা সঙ্গোপন দেখি লোকে চমৎকার।।
ধন্য সে শ্রাবণ শুক্লা চতুর্থী দিবস।
কেবা নাহি গায় রঘুনন্দনের যশ।।

ভক্তিরত্নাকর ১৩/১৮৩-১৮৪

**।। জয় শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুর কি জয়।।**

# শ্রীগোবিন্দ ঘোষ, শ্রীমাধব ঘোষ ও শ্রীবাসুঘোষ

শ্রীগোবিন্দ ঘোষ, শ্রীবাসুদেব ঘোষ ও শ্রীমাধব ঘোষ ঠাকুর তিন ভাই সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন। তিন ভাইয়ের গানের তালে তালে স্বয়ং নিত্যানন্দ প্রভু নৃত্য করতেন।

‘‘মাধব, গোবিন্দ, বাসুদেব তিন ভাই।
গাইতে লাগিলা নাচে ঈশ্বর নিতাই।।

–(চৈঃ ভাঃ অন্তঃ ৫/১৫৯)

কেউ কেউ বলেন– তাঁদের মাতুলালয় শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত বুড়ন বা বুরঙ্গী গ্রামে ছিল। কোন কারণে শ্রীবাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের পিতা কুমারহট্টে এসে বাস করেন। পরবর্ত্তী কালে বাসু ঘোষ, মাধব ঘোষ ও গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর নবদ্বীপে এসে বাস করেন। তাঁরা উত্তম-রাঢ়ীয় কায়স্থ-কুলে আবির্ভূত হন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীগৌরসুন্দরের তাঁরা অন্তরঙ্গ পার্ষদ। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ বলেছেন এঁনারা তিন ভাই ব্রজের মধুর রসের আশ্রয় বিগ্রহের (শ্রীরাধিকার) কায়ব্যূহ ছিলেন।

শ্রীবাসু ঘোষ ঠাকুর মহাপ্রভুর শৈশব লীলার পদ অধিকভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর রচিত একটি অপূর্ব্ব শৈশব লীলাবর্ণন– যথা ঃ-

শচীর আঙ্গিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়।
হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকায়।।
বয়ানে বসন দিয়া বলে লুকাইনু।
শচী বলে--বিশ্বম্ভর আমি না দেখিনু।।
মায়ের অঞ্চল ধরি চঞ্চল চরণে।
নাচিয়া নাচিয়া যায় খঞ্জন গমনে।।
বাসুদেব ঘোষ কহে অপরূপ শোভা।
শিশুরূপ দেখি হয় জগমনো লোভা।।

শ্রীগৌরাঙ্গই শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ এ সম্বন্ধে বাসু ঘোষ ঠাকুর সুন্দর গীত লিখেছেন–

জয় জয় জগন্নাথ শচীর নন্দন।
ত্রিভুবন করে যাঁর চরণ বন্দন।।
নীলাচলে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ধর।
নদীয়া নগরে দণ্ড কমণ্ডলু কর।।

কেহ বলে পুরবেতে রাবণ বধিলা।
গোলোকের বৈভব লীলা প্রকাশ করিলা।।
শ্রীরাধার ভাবে এবে গোরা অবতার।
"হরে কৃষ্ণ" নাম গৌর করিলা প্রচার।।
বাসুদেব ঘোষ বলে করি যোড় হাত।
যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ।।

—

কি কহিব শত শত তুয়া অবতার।
একলা গৌরাঙ্গ চাঁদ পরাণ আমার।।
বিষ্ণু অবতারে তুমি প্রেমের ভিখারী।
শিব, শুক, নারদ লইয়া জনা চারি।।
সেতু বন্ধ কৈলা তুমি রাম অবতারে।
এবে সে তোমার যশ ঘুষিবে সংসারে।।
কলিযুগে কীর্ত্তন করিয়া সেতু বন্ধ।
সুখে পার হউক যত পঙ্গু জড় অন্ধ।।
কিবা গুণে পুরুষ নাচে কিবা গুণে নারী।
গোরা গুণে মাতিল ভুবন দশ চারী।।
না জানিয়ে জপ তপ এ-বেদ বিচার।
কহে বাসু গৌরাঙ্গ মোরে কর পার।।

শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস বর্ণন—গীত

সুধা খাটে দিল হাত, বজ্র পড়িল মাথাত,
বুঝি বিধি মোরে বিড়ম্বিল।
করুণা করিয়া কান্দে, কেশ বেশ নাহি বান্ধে,
শচীর মন্দির কাছে গেল।।
শচীর মন্দিরে আসি, দুয়ারের কাছে বসি,
ধীরে ধীরে কহে বিষ্ণুপ্রিয়া।
শয়ন মন্দিরে ছিল, নিশা অন্তে কোথা গেল,
মোর মুণ্ডে বজর পাড়িয়া।।
গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে, নিন্দ্রা নাহি দু'নয়নে,
শুনি উঠিল শচীমাতা।
আলু থালু কেশে যায়, বসন না রহে গায়,
শুনিয়া বধূর মুখে কথা।।
তুরিতে জ্বালিয়া বাতি, দেখিলেন ইতি উতি,
কোন ঠাঁই উদ্দেশ না পাইয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ সাথে, কান্দিয়া কান্দিয়া পথে,
ডাকে শচী নিমাই বলিয়া।।
তা' শুনি নদীয়ার লোকে, কান্দে উচ্চৈঃস্বরে শোকে,
যারে তারে পুছেন বারতা।
একজনে পথে ধায়, দশজনে পুছে তায়,
গৌরাঙ্গ দেখেছ যেতে কোথা।।
সে বলে দেখেছি যেতে, আর কেহ নাহি সাথে,
কাঞ্চন-নগরের পথে ধায়।
বাসু কহে--আহা-মরি, আমার শ্রীগৌরহরি,
পাছে জানি মস্তক মুড়ায়।।

—

শ্রীনিত্যানন্দের রূপ গুণাদি বর্ণন--

নিতাই কেবল পতিত জনার বন্ধু।
জীবের চির পুণ্য ফলে, বিধি আনি মিলাইলে,
রঙ্ক মাঝে রতনের সিন্ধু।। ধ্রুঃ।।
দিগ্ নেহারিয়া যায়, ডাকে পহু গোরা রায়,
ধরণীতে পড়ে মুরছিয়া।
প্রিয় সহচর মেলে, নিতাইরে করি কোলে,
কান্দে চাঁদ বদন হেরিয়া।।
নব কাঞ্জারুণ আখি, প্রেমে ছল্ ছল্ দেখি,
সুমেরু বহিয়া মন্দাকিনী।
মেঘ গভীর স্বরে, ভাই ভাই রব করে,
পদ ভরে কম্পিত মেদিনী।।
নিতাই করুণাময়, জীবে দিল প্রেমাশ্রয়,
হেন দয়া জগতে বিদিত।
নিজ-নাম সংকীর্ত্তনে, উদ্ধারিলা জগজনে,
বাসু কেনে হইল বঞ্চিত।।

শ্রীগোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর ও মহাপ্রভুর বিভিন্ন সময়ের লীলাবলী অতি সুন্দর বর্ণনা করেছেন।

প্রাণের মুকুন্দ হে! কি আজি শুনিলু আচম্বিত।
কহিতে পরাণ যায়, মুখে নাহি বাহিরায়,
শ্রীগৌরাঙ্গ ছাড়িবে নবদ্বীপ।।
ইহাতো না জানি মোরা, সকালে মিলিলুঁ গোরা,
অবনত মাথে আছে বসি।
নিঝরে নয়ন ঝরে, বুক বহি ধারা পড়ে,
মলিন হৈয়াছে মুখ শশী।।
দেখিতে তখন প্রাণ, সদা করে আন ছান,
সুধাইতে নাই অবসর।
ক্ষণেকে সম্বিত হৈল, তবে মুই নিবেদিল,
শুনিয়া দিলেন এ উত্তর।।
আমি ত বিবশ হৈয়া, তাঁরে কিছু না কহিয়া,
ধাইয়া আইলুঁ তুয়া পাশ।
এই ত কহিলুঁ আমি, যে করিতে পার তুমি,
মোর নাহি জীবনের আশ।।
শুনিয়া মুকুন্দ কান্দে, হিয়া থির নাহি বান্ধে,
গদাধরের বদন হেরিয়া।
এ গোবিন্দঘোষ কয়, ইহা যেন নাহি হয়,
তবে মুঞি যাইমু মরিয়া।।

—

হেদে রে নদীয়া-বাসী কার মুখ চাও।
বাহু পসারিয়া গোরাচাঁদে ফিরাও।।
তো সবারে কে আর করিবে নিজ কোরে।
কে যাচিয়া দিবে প্রেম দেখিয়া কাতরে।।
কি শেল, হিয়ায় হায় কি শেল হিয়ায়।
পরাণ পুতলী নবদ্বীপ ছাড়ি যায়।।
আর না যাইব মোরা গৌরাঙ্গের পাশ।
আর না করিব মোরা কীর্ত্তন বিলাস।।
কাঁদয়ে ভকতগণ বুক বিদরিয়া।
পাষাণ গোবিন্দ ঘোষ না যায় মিলিয়া।।

শ্রীমাধব ঘোষ ঠাকুরও বিশেষ সংগীত রচয়িতা ছিলেন। তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের বাল্য-লীলা, নদীয়া সংকীর্ত্তন বিলাস ও সন্ন্যাস-লীলা প্রভৃতির সুন্দর বর্ণন করেছেন। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর তাঁর সংকীর্ত্তন-বিলাসের একটি রূপের বর্ণন--

নাচে পহু কলধৌত গোরা।
অবিরত পূর্ণ কল, মুখ বিধু মণ্ডল,
নিরবধি প্রেমরসে ভোরা।।
অরুণ কমল পাখী, জিনি রাঙ্গা দুটি আঁখি,
ভ্রমর ফুল দুটি তারা।
সোনার ভূধরে যৈছে, সুরনদী বহে ঐছে,
বুক বহি পড়ে প্রেমধারা।।
কেশরীর কটি জিনি, তাহাতে কৌপীন খিনি,
অরুণ বরণ বহির্বাস।
গলায় দোলয়ে মালা, ভূষণ করিয়া আলা,
নাসা তিল-কুসুম বিলাস।।
কনক মৃণাল যুগ, সুবলিত দুটি ভুজ,
কর-যুগ কঞ্জের বিলাস।
রাতা উৎপল ফুল পদ নহে সমতুল
পরশনে মহীর উল্লাস।।
আপাদ-মস্তক গায়, পুলকে পুরিত তায়,
যৈছে নীপ ফুল অতি-শোভা।
প্রভাতে কদলী-জনু, সঘনে কম্পিত তনু,
মাধব ঘোষের মন লোভা।।

—

শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়--শ্রীগোবিন্দ, শ্রীমাধব ও শ্রীবাসুদেব ঘোষ ঠাকুরকে যথাক্রমে ব্রজের কলাবতী, রসোল্লাসা ও গুণতুঙ্গা সখী বলে উল্লেখ করেছেন। মহাপ্রভুর পুরীতে অবস্থান কালে তিন ভাই প্রতি বছর পুরীতে যেতেন এবং রথ যাত্রায় কীর্ত্তনাদি করতেন। পরবর্ত্তী কালে তিন ভাই তিন

জায়গায় বসবাস করতে থাকেন। শ্রীগোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর অগ্রদ্বীপে, শ্রীমাধব ঘোষ ঠাকুর দাঞীহাটায় ও শ্রীবাসুদেব ঘোষ ঠাকুর তমলুকে গিয়ে বাস করেন।

কিংবদন্তী আছে যে শ্রীগোবিন্দ ঘোষ কিছুদিন মহাপ্রভুর সেবা করেছিলেন। একদিন মহাপ্রভু গোবিন্দকে মুখশুদ্ধি আনতে বললে গোবিন্দ জঙ্গলে গিয়ে বহু সন্ধান করে মহাপ্রভুকে একটি হরিতকি দেন। পরদিনও মহাপ্রভু একইভাবে মুখশুদ্ধি চাইলে গোবিন্দ তৎক্ষণাৎ একটি হরিতকী প্রদান করলেন। মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করলেন, গোবিন্দ গতকাল যখন তোমাকে মুখশুদ্ধির কথা বলি, তুমি অনেক দেরীতে দিয়েছিলো, কিন্তু আজ শীঘ্রই দিলে, এর কারণ কি? উত্তরে গোবিন্দ বললেন,– প্রভু! গতকাল আমি অনুসন্ধান করে অনেকগুলি হরিতকী এনে রেখেছি, যাতে তুমি চাইলে সাথে সাথে দিতে পারি। তাই আজ দিতে দেরী হয় নি। তখন মহাপ্রভু বললেন, ত্যাগীর সঞ্চয় বৃত্তি থাকা ঠিক নয়। তুমি হরিতকী নিয়ে এসেছ, অথচ আমাকে না দিয়ে তোমার কাছে গচ্ছিত রেখেছ। এতো সংসারী লোকের বৃত্তি। অতএব তুমি সংসারে প্রবেশ কর। গোবিন্দ অনেক অনুনয় বিনয় করলেন, কিন্তু মহাপ্রভু কোন কথাই শুনলেন না। নিরুপায় হয়ে গোবিন্দ ঘোষ অগ্রদ্বীপে এসে সংসার করলেন। কিছুদিন পরে একটি পুত্রের জন্ম হল।

একদিন গোবিন্দ গঙ্গাস্নান করে ফিরছেন, এমন সময় একটি কাঠ তার পদ স্পর্শ করে। বারবার স্পর্শ করে। পরে ঐ কাঠ থেকে শ্রীগোপীনাথ প্রকট হন। গোবিন্দ মনের আনন্দে শ্রীগোপীনাথের সেবা করতে থাকেন। হঠাৎ একদিন তাঁর পত্নী মারা যান। তিনি খুব দুঃখ পান। কিছুদিন পরে পুত্রটিও মারা যান। এবার গোবিন্দ অসহায় হয়ে দিনরাত ক্রন্দন আরম্ভ করেন। তিনদিন অনাহারে অনিদ্রায় ক্রন্দন করলেন। শ্রীগোপীনাথ আর সহ্য করতে না পেরে বললেন,–গোবিন্দ! আর কেঁদনা। তোমার দুঃখ আমার আর সহ্য হচ্ছে না। রান্না কর। আমাকে খেতে দাও, তুমিও খাও। গোবিন্দ অশ্রুসিক্ত নয়নে বললেন,–ঠাকুর! আমি আর তোমার সেবা করতে পারব না। যেখানে খুশী তুমি চলে যাও।

গোপীনাথ–তুমি ছাড়া আমার চলবে কি করে?

গোবিন্দ–তোমার সেবা করে কি পেলাম আমি। পত্নীহারা, পুত্রহারা যেন সর্বহারা হলাম।

গোপীনাথ–তুমি সর্বহারা হও নি। আমি তো আছি। চিন্তা কিসের।

গোবিন্দ–চিন্তা তো আছে। আমি গৃহস্থ মানুষ। উদ্ধার হব কি করে? মরে গেলে আমার পিণ্ড কে দেবে?

গোপীনাথ–তুমি দুঃখ করো না। আজ থেকে আমি তোমার পুত্র হলাম। তুমি মরে গেলে আমি পিণ্ড দিব।

শ্রীগোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর অপ্রকট হলে, পর দিবসে শ্রীগোপীনাথ পিণ্ড প্রদান করলেন। আজও গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরের অপ্রকট তিথিতে শ্রীগোপীনাথ পিণ্ড প্রদান করেন। শ্রীবাসুদেব ঘোষ ঠাকুর কার্ত্তিক শুক্ল দ্বিতীয়াতে অপ্রকট হন।

**।। জয় শ্রীগোবিন্দ ঘোষ, শ্রীমাধব ঘোষ ও শ্রীবাসুদেব ঘোষ ঠাকুর কি জয়।।**




# শ্রীস্বরূপদামোদর গোস্বামী

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সাড়ে তিন জন অন্তরঙ্গ ভক্তের মধ্যে শ্রীস্বরূপ দামোদর অন্যতম ছিলেন।

''প্রভু লেখা করে যাঁরে রাধিকার 'গণ'।
জগতের মধ্যে 'পাত্র' সাড়ে তিন জন।।
স্বরূপগোসাঞি, আর রায় রামানন্দ।
শিখিমাহিতি তিন, তাঁর ভগিনী অর্দ্ধজন।।''

চৈঃ চঃ অ ২/১০৫-১০৬

আবার তাঁকে সর্বপ্রধান বলা হয়েছে।

''সবার অধ্যক্ষ প্রভুর মর্ম্ম দুইজন।
পরমানন্দ পুরী আর স্বরূপ দামোদর।।''

চৈঃ চঃ আদি ১০/১২৪-১২৫

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামী। মহাপ্রভুর অবতরণের গূঢ় কারণ-সমূহ তিনি জানতেন এবং তাঁর মাধ্যমেই মহাপ্রভুর গূঢ় লীলা রহস্যাদি প্রচারিত হয়েছে। ব্রজলীলায় তিনি ললিতা সখী। অবশ্য গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় তাঁকে বিশাখা সখী রূপে নির্দ্দেশ করা হয়েছে। (গৌঃ গঃ ১৬০)।

শ্রীমন্মহাপ্রভু পুরীতে শেষ ১২ বছর নিরন্তর রাধাভাবে বিভাবিত থেকে শুধুমাত্র শ্রীস্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দের সঙ্গে রস আস্বাদন করতেন।

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি,     রায়ের নাটক-গীতি,
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ-রামানন্দ-সনে,     মহাপ্রভু রাত্রি দিনে,
গায় শুনে-পরম আনন্দ।

(চৈঃ চঃ মঃ ২/৭৭)

শ্রীস্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দ যে মহাপ্রভুর কত প্রিয় ছিলেন, তা কবিরাজ গোস্বামী বর্ণনা করেছেন–

''এত কহি গৌরহরি,     দুইজনার কণ্ঠ ধরি,
কহে শুন, স্বরূপ রামরায়।
কাঁহা কঁরো, কাঁহা যাঙ,     কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ,
দুঁহে মোরে কহ সে উপায়।।

—

এইমত গৌরপ্রভু প্রতি দিনে দিনে।
বিলাপ করেন স্বরূপ রামানন্দ সনে।।
সেই দুইজন প্রভুরে করে আশ্বাসন।
স্বরূপ গায়, রায় করে শ্লোক পঠন।।

এ সম্বন্ধে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর লিখেছেন–

দামোদরস্বরূপের উচ্চ-সংকীর্ত্তন।
শুনিলে না থাকে বাহ্য, পড়ে সেইক্ষণ।।
সন্ন্যাসি-পার্ষদ যত ঈশ্বরের হয়।
দামোদরস্বরূপ-সমান কেহো নয়।।
যত প্রীতি ঈশ্বরের পুরীগোসাঞিরে।
দামোদরস্বরূপেরে তত প্রীতি করে।।
দামোদরস্বরূপ--সঙ্গীত-রসময়।
যাঁর ধ্বনি-শ্রবণে প্রভুর নৃত্য হয়।।

চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ১০/৪০-৪৩

শ্রীস্বরূপ দামোদরের পূর্বনাম ছিল পুরুষোত্তম আচার্য্য বা পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে বর্ণনা আছে–তাঁর পিতা শ্রীপদ্মগর্ভাচার্য্য। মাতার নাম উল্লেখ নেই। তবে মাতামহের নাম উল্লেখ আছে শ্রীজয়রাম চক্রবর্ত্তী। আদি নিবাস ছিল ভিটাদিয়ায় (পূর্ব্ববঙ্গে ব্রহ্মপুত্র নদের তটবর্ত্তী)

শ্রীস্বরূপ দামোদর মহাপ্রভুর নিত্য সঙ্গী। তিনি

নবদ্বীপে বাস করতেন। সর্ব্বদা প্রভুর সঙ্গে অবস্থান করতেন। প্রভু যখন সন্ন্যাস লীলা প্রকট করলেন, তিনি তখন পাগলের মত হন। বারাণসী গিয়ে চৈতন্যানন্দ নামক সন্ন্যাসীর থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি আদেশ দিয়েছিলেন—নিজে বেদান্ত পড়ে লোককে বেদান্ত পড়াও।

শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্য যোগ-পট্ট গ্রহণ করলেন না। শুধু শিখা-সূত্র ত্যাগ করলেন। তাই তাঁর নাম হল স্বরূপ। তারপর তিনি গুরু চৈতন্যানন্দ স্বামীর আদেশ নিয়ে শ্রীনীলাচলে এলেন। পুনর্ব্বার মহাপ্রভুর সাথে মিলন হল।

আর দিনে আইলা স্বরূপ দামোদর।
প্রভুর অত্যন্ত মর্ম্মী, রসের সাগর।।
'পুরুষোত্তম আচার্য্য' তাঁর নাম পূর্বাশ্রমে।
নবদ্বীপে ছিল তেঁহ প্রভুর চরণে।।
প্রভুর সন্ন্যাস দেখি উন্মত্ত হঞা।
সন্ন্যাস গ্রহণ কৈল বারাণসী গিয়া।।

(চৈঃ চঃ মধ্য ১০/১০২-১০৪)

তাঁর সম্বন্ধে শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী আরও লিখেছেন—

পাণ্ডিত্যের অবধি, বাক্য নাহি কারো সনে।
নির্জ্জনে রহয়ে, লোক সব নাহি জানে।।
কৃষ্ণরস-তত্ত্ব-বেত্তা, দেহ—প্রেমরূপ।
সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ।।
গ্রন্থ, শ্লোক, গীত কেহ প্রভু-পাশে আনে।
স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে, প্রভু তাহা শুনে।।
ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ, আর রসাভাস।
শুনিলে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস।।
অতএব স্বরূপ-গোসাঞী করে পরীক্ষণ।
শুদ্ধ হয় যদি, প্রভুরে করা'ন শ্রবণ।।
বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীতে করা'ন প্রভুর আনন্দ।।
সঙ্গীতে—গন্ধর্ব-সম, শাস্ত্রে বৃহস্পতি।
দামোদর-সম আর নাহি মহামতি।।
অদ্বৈত-নিত্যানন্দের পরম প্রিয়তম।
শ্রীবাসাদি ভক্তগণের হয় প্রাণ-সম।।

(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্য দশম পরিচ্ছেদ)

শ্রীস্বরূপ দামোদর মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ; সঙ্গীতে গন্ধর্ব-সম ও শাস্ত্রে বৃহস্পতি। কেউ কোন শ্লোক গীত প্রভৃতি রচনা করে আনলে প্রথমে শ্রীস্বরূপ দামোদর পরীক্ষা করতেন। তারপর প্রভুকে শোনাতেন।

কাশীক্ষেত্র থেকে এসে শ্রীস্বরূপ-দামোদর শ্রীমহাপ্রভুকে এই শ্লোক বলে বন্দনা করলেন—

হেলোদ্ধূলিত খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্র বিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্য্যমর্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া।।

(শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক)

হে দয়ানিধে শ্রীচৈতন্য! যা হেলায় সমস্ত খেদ দূর করে, যাতে সম্পূর্ণ নির্মলতা আছে, যাতে পরমানন্দ প্রকাশিত হয়, যার উদয়ে শাস্ত্র বিবাদ দূর হয়, যা রস বর্ষণ দ্বারা চিত্তের উন্মত্ততা বিধান করে, অতি বিস্তারিণী তোমার সে শুভদাদয়া মাধুর্য্য-মর্য্যাদা দ্বারা আমার প্রতি উদিত হোক।

শ্রীস্বরূপ-দামোদর দণ্ডবৎ করলে প্রভু তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন—আমি আজ স্বপ্ন দেখেছি, তুমি এসেছ। ভালই হল। অন্ধ যেমন নেত্র পেলে আনন্দ পায়, আমিও তোমায় পেয়ে আনন্দ পাচ্ছি।

শ্রীস্বরূপ গোস্বামী বললেন—প্রভো! আমায় ক্ষমা করবেন। আপনাকে ফেলে অন্যত্র গিয়ে ভুল করেছিলাম।

তোমার চরণে মোর নাহি প্রেম লেশ।
তোমা ছাড়ি পাপী মুঞি গেনু অন্যদেশ।।






মুঞি তোমা ছাড়িল, তুমি মোরে না ছাড়িলা।
কৃপা পাশ গলায় বান্ধি চরণে আনিলা।।

—চৈঃ চঃ মধ্য ১০

শ্রীস্বরূপের দৈন্য উক্তি শুনে প্রভু পুনঃ তাঁকে আলিঙ্গন করলেন এবং বললেন--শ্রীকৃষ্ণ বড় দয়াময়। দয়া করে তোমায় আবার মিলিয়ে দিয়েছেন।

শ্রীনীলাচলে শ্রীনরেন্দ্রসরোবরে চন্দনযাত্রার সময় এবং ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে স্বরূপ দামোদর শ্রীমন্মহাপ্রভুর জলকেলী লীলার সঙ্গী ছিলেন। সেসময় স্বরূপ দামোদর ও পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির মধ্যে জলক্ষেপন লীলা হয়েছিল।

''দুই সখা বিদ্যানিধি, স্বরূপ দামোদর।
হাসিয়া আনন্দে জল দেন পরস্পর।।

চৈঃ ভাঃ অন্ত্য৮/১২৪

শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী যখন টোটা গোপীনাথে প্রেমাবিষ্ট হয়ে ভাগবত পাঠ করতেন, তখন তাঁর শ্রোতা ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু, অদ্বৈতাচার্য্য এবং স্বরূপ দামোদর প্রভৃতি।

''গদাধর প্রাণনাথ প্রভু গৌরহরি।
এথা বসি শুনিত সে ব্যাখ্যার মাধুরী।।
এইখানে বৈসে প্রভু নিত্যানন্দ রায়।
শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু বসিতো এথায়।।
এথা স্বরূপ দামোদর, বক্রেশ্বর।
শ্রীমুরারিগুপ্ত, এথা দাস গদাধর।।

—ভক্তিরত্নাকর৮/২৭৮-২৮০

শ্রীমন্মহাপ্রভু গদাধর পণ্ডিতের কাছে শ্রীমদ্ভাগবত থেকে ১০০ বার ধ্রুব চরিত্র ও প্রহ্লাদ চরিত্র শ্রবণ করেছিলেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর ভাগবত পাঠ ও শ্রীস্বরূপ দামোদরের কীর্ত্তন শুনে মহাপ্রভুর অষ্টসাত্ত্বিক বিকার হত।

ভাগবত-পাঠে গদাধর মহাশয়।
দামোদরস্বরূপের কীর্ত্তন বিষয়।।
একেশ্বর দামোদরস্বরূপ গুণ গায়।
বিহ্বল হইয়া নাচে শ্রীগৌরাঙ্গরায়।।
অশ্রু, কম্প, হাস্য, মূর্চ্ছা, পুলক, হুঙ্কার।
যত কিছু আছে প্রেমভক্তির বিকার।।
মূর্ত্তিমন্ত সবে থাকে ঈশ্বরের স্থানে।
নাচেন চৈতন্যচন্দ্র ইঁহা-সবা'-সনে।।
দামোদরস্বরূপের উচ্চ-সংকীর্ত্তন।
শুনিলে না থাকে বাহ্য, পড়ে সেইক্ষণ।।
সন্ন্যাসি-পার্ষদ যত ঈশ্বরের হয়।
দামোদরস্বরূপ-সমান কেহো নয়।।
যত প্রীতি ঈশ্বরের পুরীগোসাঞিরে।
দামোদরস্বরূপেরে তত প্রীতি করে।।
দামোদরস্বরূপ--সঙ্গীত-রসময়।
যাঁর ধ্বনি-শ্রবণে প্রভুর নৃত্য হয়।।

চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ১০/৩৬-৪৩

ওড়নষষ্ঠী যাত্রাকালে সেবকগণ শ্রীজগন্নাথকে মাড়যুক্ত বস্ত্র পরান। সদাচারনিষ্ঠ শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি জগন্নাথের সেবকগণের ঐ ধরণের আচরণ দেখে ভর্ৎসনা করলেন। তিনি এ বিষয়ে স্বরূপ দামোদরের অভিমত জানতে চাইলে, স্বরূপ দামোদর বলেন, ঈশ্বর স্বতন্ত্র। উত্তরে বিদ্যানিধি বললেন, যে মাড়যুক্ত বস্ত্র স্পর্শ করলে হাত ধুতে হয়, সেই বস্ত্র সেবকরা জগন্নাথকে কি রূপে পরিধান করিয়েছেন। সেবকগণকে কটাক্ষ করায় জগন্নাথ বলরাম রাত্রে স্বপ্নের মধ্যে এসে পুণ্ডরিক বিদ্যানিধির দুই গালে চপেটাঘাত করেন এতে তাঁর গাল ফুলে লাল হয়ে যায়।

... স্বপ্নে আসি জগন্নাথ বলরাম।
দুই দণ্ড চড়ায়েন নাহিক বিশ্রাম।।

চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ১০/১৬৭

শ্রীজগন্নাথদেব এই লীলার দ্বারা শিক্ষা দিলেন যে, তাঁর সেবকগণের দোষ দর্শন করতে নেই।

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি শ্রীজগন্নাথ বলরামের হস্ত স্পর্শ লাভ করে পরম আনন্দিত হলেন। স্বরূপ দামোদর সখা পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির ঐ প্রকার সৌভাগ্য দেখে আনন্দিত হলেন।

''দামোদর স্বরূপ বলেন, 'শুন ভাই।
এমত অদ্ভুত দণ্ড দেখি শুনি নাই।।
স্বপ্নে আসি শাস্তি করে আপনে সাক্ষাতে।
আর শুনি নাই, সবে দেখিলু তোমাতে।।'
হেনমতে দুই সখা ভাসেন সন্তোষে।
রাত্রিদিন না জানেন কৃষ্ণকথা রসে।।

চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ১০/১৭৫-১৭৭

শ্রীপুরুষোত্তম ধামে রথযাত্রার আগের দিন শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তদের নিয়ে যে গুণ্ডিচা মন্দির মার্জ্জন লীলা করেছিলেন, ঐ লীলায় মুখ্যপার্ষদরূপে উপস্থিত ছিলেন শ্রীল স্বরূপ দামোদর প্রভু। গুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জনের সময় একজন সরল গৌড়ীয় বৈষ্ণব অকস্মাৎ মন্দিরের ভিতরেই মহাপ্রভুর চরণে জল ঢেলে সেই জল পান করেন। মহাপ্রভু ভগবান, তাই তাঁর পাদধৌত জল মন্দিরের ভেতরে পান করলে পরমার্থ বিচারে কোন দোষ হয় না। তথাপি লোক শিক্ষক মহাপ্রভু অসন্তোষ প্রকাশ করলেন, যাতে অন্য কেউ অনুকরণ না করে। স্বরূপ দামোদর একথা জানতে পারলে সেই ভক্তকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে মন্দির থেকে বের করে দিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আবার মহাপ্রভুর নিকট এসে সরল বৈষ্ণবকে ক্ষমা করতে প্রার্থনা করলেন। এর দ্বারা তিনি শিক্ষা দিলেন, বৈষ্ণবগণ বাহ্যত কঠোর ব্যবহার প্রদর্শন করলেও হৃদয়ের অভ্যন্তরে সর্বদা সর্বজীবের প্রতি করুণাদ্রচিত্ত থাকেন।

রথযাত্রার সময় নৃত্যকীর্ত্তন করার জন্য মহাপ্রভু যে সাতটি সম্প্রদায়ে ভক্তগণকে বন্টন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রথম সম্প্রদায়ের কীর্ত্তনীয়া ছিলেন স্বরূপ দামোদর এবং নর্ত্তক ছিলেন শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য। সাত সম্প্রদায়ের কীর্ত্তন আরম্ভ হলে মহাপ্রভু অলৌকিক শক্তি প্রকাশ করেছিলেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ভক্তরা ভাবতেন মহাপ্রভু তাঁদের সাথে রয়েছেন। ভক্তগণ উচ্চ সংকীর্ত্তনে প্রমত্ত হলে মহাপ্রভুর ভাবের উদয় হত। তখন শ্রীস্বরূপ দামোদর গান ধরতেন–

সেইত পরাণনাথ পাইনু।
যাহা লাগি মদন দহনে ধুরি গেনু।।

এই স্থানে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখেছেন–

''তাণ্ডব নৃত্য ছাড়িয়া মহাপ্রভুর হৃদয়ে কুরুক্ষেত্র মিলনে শ্রীরাধার ভাব উদিত হইল। বহুদিন বিচ্ছেদের পর, এই গানটি স্বভাবতই আসিয়া উপস্থিত হইল।"

বিচ্ছেদের পর মিলনের ভাব যখন উদিত হল, তখন মহাপ্রভু উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করতে লাগলেন--

''যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে।।"

– কাব্যপ্রকাশ

**"যিনি কৌমারকালে রেবানদীতীরে আমার চিত্ত হরণ করিয়াছিলেন, তিনিই আমার এখন পতি হইয়াছেন। সেই মধুমাসের রাত্রিও উপস্থিত, উন্মীলিত মালতীপুষ্পের সৌগন্ধও আছে। কদম্বকানন হইতে বায়ুও মধুররূপে বহিতেছে; সুরতব্যাপারলীলাকার্য্যে আমি সেই নায়িকাও উপস্থিত, তথাপি আমার চিত্ত ও অবস্থায় সন্তুষ্ট না হইয়া রেবাতটস্থ বেতসীতরুতলের জন্য নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে। এই শ্লোকটী নিতান্ত হেয় নায়ক নায়িকা সম্বন্ধে বিরচিত।**

**মহাপ্রভু ইহা যে এত আদরে পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার গূঢ় তাৎপর্য্য স্বরূপ দামোদর ব্যতীত আর কেহই জানিতেন না।"**

–ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

''এই শ্লোক মহাপ্রভু পড়ে বার বার।
স্বরূপ বিনা অর্থ কেহ না জানে ইহার।।"

–চৈঃ চঃ ম ১৩/১২২

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ থেকে 'যঃ কৌমারহরঃ' শ্লোকটি শুনে শ্রীরূপ গোস্বামী ঐ শ্লোকের গূঢ় অর্থ তালপত্রে লিখে ঘরের চালে গুঁজে রাখেন। দৈবক্রমে মহাপ্রভু ঐ তালপত্রটি দেখে ফেলেন।

''দৈবে আসি' প্রভু যবে উর্দ্ধেতে চাহিল।
চালে গোঁজা তালপত্রে সেই শ্লোক পাইল।।
শ্লোক পড়ি' আছে প্রভু আবিষ্ট হইয়া।
রূপ গোসাঞি আসি' পড়ে দণ্ডবৎ হঞা।।
উঠি মহাপ্রভু তাঁরে চাপড় মারিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু কোলেতে করিয়া।।
মোর শ্লোকের অভিপ্রায় না জানে কোন জনে।
মোর মনের কথা তুঞি জানিলি কেমনে?
এত বলি তাঁরে বহু প্রসাদ করিয়া।
স্বরূপ গোসাঞিরে শ্লোক দেখাইল লঞা।।
স্বরূপে পুছেন প্রভু হইয়া বিস্মিতে।
মোর মনের কথা রূপ জানিল কেমতে।।
স্বরূপ কহে–যাতে জানিল তোমার মন।
তাতে জানি–হয় তোমার কৃপার ভাজন।।"

–চৈঃ চঃ ম ১৩/৬৬-৭২

শ্রীরূপ গোস্বামীকৃত শ্লোক ঃ-

''প্রিয় সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলী-পঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি।।"

**" হে সহচরি, আমার সেই অতিপ্রিয় কৃষ্ণ অদ্য কুরুক্ষেত্রে মিলিত হইলেন, আমিও সেই রাধা; আবার আমাদের উভয়ের মিলনসুখও তাই বটে; তথাপি এই কৃষ্ণের বনমধ্যে ক্রীড়াশীল মুরলীর পঞ্চমসুরে আনন্দপ্লাবিত কালিন্দীপুলিনগত বনের জন্য আমার চিত্ত স্পৃহা করিতেছে।"**

**–ঠাকুর ভক্তিবিনোদ**

শ্রীজগন্নাথ দ্বারকায় বিহার করেন। বছরে একবার তাঁর বৃন্দাবনে যেতে ইচ্ছা হয়। এজন্য জগন্নাথের রথ শ্রীজগন্নাথ মন্দির (দ্বারকা) হতে গুণ্ডিচা মন্দির (বৃন্দাবন) যায়। বৃন্দাবনে তিনি লক্ষ্মীকে নিয়ে যান না। কারণ লক্ষ্মীদেবীর বৃন্দাবন লীলায় অধিকার নাই। অধিকার আছে গোপীগণের এবং গোপীশ্রেষ্ঠ রাধার। শ্রীজগন্নাথ লক্ষ্মীকে কালই ফিরে আসব বলে রথযাত্রায় বেরিয়ে যান কিন্তু আর আসেন না। এতে লক্ষ্মীর ক্রোধ হয়। তিনি জগন্নাথের উপর আক্রমন করেন। তাঁর পরিচারিকাগণ জগন্নাথের পরিচারিকাগণকে বেঁধে লক্ষ্মীর চরণে এনে ফেলেন। এই প্রকার অদ্ভুত মান ত্রিজগতে কোথাও শোনা যায় না। লক্ষ্মীর মান অপেক্ষা গোপীগণের মান শ্রেষ্ঠ। তদপেক্ষা রাধার মান সর্বোত্তম। স্বরূপ দামোদরের মুখ থেকে এসব কথা শুনে মহাপ্রভু পরম আনন্দ লাভ করতেন।

একবার বঙ্গদেশীয় একজন বিপ্র কবি একটি নাটক লিখে ভগবান আচার্য্যকে শুনালে তিনি তার সম্বন্ধে স্বরূপ দামোদরকে অনুরোধ করেন সেটি মহাপ্রভুকে শোনানোর জন্য। কারণ স্বরূপদামোদরের অনুমতি না হলে মহাপ্রভুকে শোনানো সম্ভব হত না। ভগবান আচার্য্যের বারম্বার প্রার্থনায় স্বরূপ দামোদর শুনতে রাজি হলেন। কিন্তু নাটকের নান্দী শ্লোকেই স্বরূপ দামোদর ভক্তিসিদ্ধান্ত বিরোধী দোষ প্রদর্শন

করলেন। শুনে সকলে চমৎকৃত হলেন। বৈষ্ণব হলেও ভক্তিসিদ্ধান্তবোধ সকলের হয় না। স্বরূপ দামোদর সেই বিপ্র কবির দুঃখ দেখে তার প্রতি সদয় হয়ে উপদেশ করলেন–

''যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় করে চৈতন্যচরণে।।
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর 'সঙ্গ'।
তবে ত' জানিবা সিদ্ধান্তসমুদ্র-তরঙ্গ।।''

চৈঃ চঃ অ ৫/১৩১-১৩২

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী গৃহ থেকে পালিয়ে নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকটে চলে এলে, মহাপ্রভু তাঁকে স্বরূপ দামোদরের হাতে সমর্পন করেন। সেই থেকে তিনি 'স্বরূপের রঘু' নামে খ্যাতি লাভ করেন।

''রঘুনাথের ক্ষীণতা-মালিন্য দেখিয়া।
স্বরূপেরে কহেন প্রভু কৃপার্দ্রচিত্ত হঞা।।
'এই রঘুনাথে আমি সঁপিলু তোমারে।
পুত্র ভৃত্যরূপে তুমি কর অঙ্গীকারে।।
তিন রঘুনাথ নাম হয় মোর স্থানে।
'স্বরূপের রঘু'--আজি হৈতে ইহার নামে।।'
এত কহি রঘুনাথের হস্ত ধরিলা।
স্বরূপের হস্তে তাঁরে সমর্পণ কৈলা।।''

–চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩/২০১-২০৪

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী সাক্ষাদ্ভাবে মহাপ্রভুর নিকট কিছু নিবেদন করতেন না। কোন কিছু নিবেদন থাকলে তিনি স্বরূপ দামোদর বা গোবিন্দের মাধ্যমে জানাতেন। একবার তাঁর ইচ্ছা হয় মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশ বাণী শ্রবণ করার। তিনি একথা স্বরূপ দামোদরকে জানালে, স্বরূপ দামোদর তা মহাপ্রভুকে নিবেদন করেন। তখন মহাপ্রভু বলেন--

''হাসি' মহাপ্রভু রঘুনাথেরে কহিল।
তোমার উপদেষ্টা করি' স্বরূপেরে দিল।।
সাধ্য-সাধন তত্ত্ব শিখ ইঁহার স্থানে।
আমি তত নাহি জানি, ইঁহো যত জানে।।
তথাপি আমার আজ্ঞায় শ্রদ্ধা যদি হয়।
আমার এই বাক্যে তুমি করিহ নিশ্চয়।।
গ্রাম্য কথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে।।
অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে।।
এই ত' সংক্ষেপে আমি কৈলুঁ উপদেশ।
স্বরূপের ঠাঞি ইহার পাবে সবিশেষ।।''

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬/২৩৩-২৩৮

কাশীমিশ্রভবনে একসময় মহাপ্রভু কঠোর বৈরাগ্যভাব প্রকট করলেন। শ্রীকৃষ্ণ বিরহে 'হা কৃষ্ণ'! 'হা কৃষ্ণ' বলে কাঁদতে কাঁদতে দিন দিন তাঁর শরীর ক্ষীণ হতে লাগল। তীব্র বৈরাগ্যে তিনি কলার বল্কলে শুতেন। শ্রীজগদানন্দ তা সহ্য করতে না পেরে সুক্ষ্মবস্ত্র গেরুয়া রং করে শিমুল তুলা দিয়ে সুন্দর তোষক তৈরী করে স্বরপ দামোদরকে দিলেন মহাপ্রভুর শয্যা রচনার জন্য। মহাপ্রভু সুন্দর শয্যা দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন।' 'কে এই শয্যা তৈরী করেছে?' গোবিন্দের নিকট জগদানন্দের নাম শুনে মহাপ্রভুর ভয় হল। কারণ জগদানন্দ সত্যভামার অবতার, ভয়ঙ্কর অভিমানী। তবুও মহাপ্রভু গোবিন্দের দ্বারা তোষক সরিয়ে কলার বল্কলে শুলেন। স্বরূপ দামোদর জগদানন্দকে একথা জানালে জগদানন্দ অনেক দুঃখ পেলেন। সেবাতে অত্যন্ত কুশল স্বরূপ দামোদর কলার শুকনো পাতা দিয়ে বালিশ ও তোষক তৈরী করলেন, অনিচ্ছা সত্ত্বেও মহাপ্রভু তা গ্রহণ করলেন। ভক্তগণ মহা আনন্দিত হলেন।

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু দিব্য উন্মাদ অবস্থায় গম্ভীরায় শয়ন করেছেন। গম্ভীরায় তিনটি দ্বার ছিল।

সেদিন তিনটি দ্বারই বন্ধ ছিল। হঠাৎ স্বরূপ দামোদর ও গোবিন্দ দেখেন তিনটি দ্বারই বন্ধ, কিন্তু মহাপ্রভু নেই। তাঁরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও ব্যাকুল হয়ে মহাপ্রভুকে সব জায়গায় অন্বেষণ করতে লাগলেন। দেখলেন মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বারের উত্তর দিকে অচেতন অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। তাঁর অস্থি সন্ধি শিথিল, কুর্ম্ম আকৃতি বিশিষ্ঠ মহাদীর্ঘ শরীর। স্বরূপ দামোদর ভক্তগণসহ মহাপ্রভুর কানের কাছে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম করলে মহাপ্রভু 'হরিবোল' বলে গর্জ্জন করে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শরীর পূর্ব্বের অবস্থায় ফিরে এল।

একদিন মহাপ্রভু চটক পর্ব্বতকে গোবর্দ্ধন ভেবে ছুটে চললেন। স্বরূপ দামোদর ও জগদানন্দ পেছন পেছন ছুটলেন। অষ্টসাত্ত্বিক বিকার প্রাপ্ত হয়ে মহাপ্রভু মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। তা দেখে ভক্তগণ কাঁদতে লাগলেন। ভক্তগণের উচ্চ সংকীর্ত্তনে মহাপ্রভুর জ্ঞান ফিরলে তিনি অর্দ্ধবাহ্য-দশায় প্রলাপ করতে লাগলেন–' আমি গোবর্দ্ধনে ছিলাম, কৃষ্ণ গাভী চড়াচ্ছিল। তাঁর বংশীধ্বনি শুনে গোপীগণকে সাথে নিয়ে রাধারাণী সেখানে এলেন। রাধারাণীকে সাথে নিয়ে কৃষ্ণ গোবর্দ্ধনের কুঞ্জে প্রবেশ করলেন। এমন সময় তোমরা আমাকে এখানে নিয়ে এলে। কে নিয়ে এলে দুঃখ দিতে। এই বলে মহাপ্রভু ক্রন্দন করতে থাকলে ভক্তগণও কাঁদতে লাগলেন।

একদিন মহাপ্রভু দিব্য-উন্মাদ অবস্থায় স্বরূপ-দামোদর ও রায় রামানন্দের সাথে কৃষ্ণকথারঙ্গে অর্দ্ধরাত্রি অতিবাহিত করলেন। অনেক কষ্টে মহাপ্রভুকে শয়ন করিয়ে স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দ নিজ নিজ স্থানে গেলেন। গোবিন্দ গম্ভীরার ঘরেই শয়ন করলেন। মধ্যরাত্রে মহাপ্রভু উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করতে করতে হঠাৎ ভাবাবেশে গম্ভীরা থেকে বাইরে চলে গেলেন। অথচ তিন জায়গায় কপাট বন্ধ। গোবিন্দ মহাপ্রভুর কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে, মহাপ্রভুকে দেখতে না পেয়ে স্বরূপ দামোদরকে খবর দিলেন। স্বরূপ দামোদর অন্যান্য ভক্তগণের সাথে দীপ নিয়ে মহাপ্রভুকে অন্বেষণ করতে লাগলেন। অনেক অনুসন্ধানের পরে দেখতে পেলেন মহাপ্রভু সিংহদ্বারে গাভীগণের সাথে ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়ে রয়েছেন। অনেক কষ্টে ভক্তগণ তাঁকে গম্ভীরায় নিয়ে গেলেন। বহু সময় ধরে কানের কাছে উচ্চস্বরে কীর্ত্তন করলে মহাপ্রভু স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন। তিনি আবিষ্ট হয়ে স্বরূপ দামোদরকে জিজ্ঞাসা করলেন– 'তুমি আমাকে কোথা হতে নিয়ে এলে? বংশীধ্বনি শুনে আমি বৃন্দাবনে গিয়েছিলাম, ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে বেণু বাজাচ্ছেন, সঙ্কেত বুঝে রাধারাণী কুঞ্জকুটীরে এসেছেন। আমি তাঁর পেছন পেছন যাচ্ছিলাম। আর তোমরা আমাকে এখানে নিয়ে এলে। আমি আর সেই মুরলীধ্বনি শুনতে পাচ্ছি না। তখন স্বরূপ দামোদর মহাপ্রভুর ভাব বুঝে মধুর কণ্ঠে ভাগবতের এই শ্লোকটি পাঠ করলেন–

''কাস্ত্র্যঙ্গ' তে কলপদায়তবেণুগীত-
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেৎ ত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্য-সৌভাগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্ গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্।।''

--ভাঃ ১০/২৯/৪০

**"হে কৃষ্ণ, তোমার কলপদামৃত বেণুগীতদ্বারা সম্মোহিত হইয়া ত্রৈলোক্যের মধ্যে কোন্ স্ত্রী আর্য্যরচিত (ধর্ম্ম) হইতে বিচলিত না হয়? ত্রৈলোক্যের সৌভাগ্যস্বরূপ তোমার এই রূপ দেখিয়া গোসকল, পক্ষীসকল, দ্রুমসকল ও মৃগসকল পুলক ধারণ করিয়া থাকে।।"**

**--ঠাকুর ভক্তিবিনোদ**

শ্রীনাম সংকীর্ত্তন যে কৃষ্ণপ্রেম লাভের সর্ব্বোত্তম উপায়, একথা মহাপ্রভু স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দের মাধ্যমে সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ়রূপে জানিয়েছেন—

"হর্ষে প্রভু কহেন,—শুন স্বরূপ রামরায়।
নামসংকীর্ত্তন—কলৌ পরম উপায়।।
সংকীর্ত্তনযজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ আরাধন।
সেই ত' সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ।।
নামসংকীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ নাশ।
সর্ব্ব শুভোদয়, কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস।"
—চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০/৮, ৯,১১

মহাপ্রভু দিবাভাগে সাধারণ ভক্তদের সাথে নাম সংকীর্ত্তন করে কাটাতেন। রাত্রে শ্রীস্বরূপ দামোদর ও শ্রীরামানন্দ রায়ের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ লীলা-রস তত্ত্ব আস্বাদন করতেন। ললিতা ও বিশাখা যেমন রাধা ঠাকুরাণীর একান্ত অন্তরঙ্গ ছিলেন, তদ্রূপ স্বরূপ দামোদর ও রামানন্দ রায় প্রভুর অন্তরঙ্গ ছিলেন।

শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা তিথিতে শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী প্রভু অপ্রকট হয়েছেন।

**।। জয় শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামী কি জয়।।**





# শ্রীরায় রামানন্দ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা গম্ভীর। তাঁর কৃপা ছাড়া কেউ তা বুঝতে পারে না। তিনি কুলের গর্বকে নাশ করে নীচশূদ্র কুলোদ্ভুত ভক্তদের দিয়ে ধর্ম্মের প্রকাশ করেছেন।

সন্ন্যাসী পণ্ডিতগণের করিতে গর্ব্বনাশ।
নীচশূদ্র দ্বারা করে ধর্ম্মের প্রকাশ।।
ভক্তিতত্ত্ব প্রেম কহে রায়ে করি বক্তা।
আপনি প্রদ্যুম্নমিশ্র সহ হয় শ্রোতা।।

শ্রীল রায় রামানন্দ শূদ্র কুলোদ্ভুত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর পিতার নাম রায় ভবানন্দ। তিনি পূর্ব লীলায় পাণ্ডুরাজা ছিলেন। পুরী থেকে ৬ ক্রোশ দূরে ব্রহ্মগিরি বা আলালনাথে ভবানন্দের নিবাস ছিল।

শ্রীগৌর গণোদ্দেশ দীপিকায় (১২০-১২৪) রায় রামানন্দকে প্রিয়নর্ম্মসখা অর্জ্জুন, পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন এবং অর্জ্জুনীয়া গোপী বলা হয়েছে। পদ্মপুরাণে বর্ণনা আছে অর্জ্জুন গোপীদেহ লাভ করে অর্জ্জুনীয়া নাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেন ললিতা সখীই রায় রামানন্দ রূপে এসেছেন। আর কেউ বলেন বিশাখা সখীই রায় রামানন্দ। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর চৈঃ চঃ মঃ ৮/২৩ পয়ারের ভাষ্যে লিখেছেন— **"রাধাকৃষ্ণের বিশাখা সখীর প্রতি ও বিশাখা সখীর রাধাকৃষ্ণের প্রতি যে স্বাভাবিক প্রেম, তাহাই উদিত হইল।"** অর্থাৎ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রায় রামানন্দকে অভিন্ন 'বিশাখা' স্বরূপে দর্শন করতেন। মহাপ্রভুর সাড়ে তিনজন অন্তরঙ্গ ভক্তের মধ্যে রায় রামানন্দ অত্যতম ছিলেন।

"প্রভু লেখা করে যারে—রাধিকার গণ।
জগতের মধ্যে পাত্র সাড়ে তিন জন।।
স্বরূপ গোসাঞি আর রায় রামানন্দ।
শিখি মাহিতি—তিন, তাঁর ভগিনী অর্দ্ধজন।।"

চৈঃ চঃ অন্ত্য ২/১০৫-১০৬

রাজা শ্রীপ্রতাপরুদ্রের অধীন পূর্ব্ব ও পশ্চিম গোদাবরীর বিশ্বস্ত শাসন কর্ত্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন শ্রীরামানন্দ রায়। মহাপ্রভু যখন দক্ষিণ দেশে যাত্রা করেন, শ্রীসার্ব্বভৌম পণ্ডিত তাঁকে বিশেষ অনুরোধ করেন তিনি যেন শ্রীরামানন্দ রায়ের সঙ্গে মিলিত হন।

'তোমার সঙ্গে যোগ্য তেঁহো একজন।
পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তার সম।।"

চৈঃ চঃ মধ্যঃ ৭/৬৪

হে প্রভো! পৃথিবী তলে আপনার সঙ্গ যোগ্য এক শ্রীরামানন্দ রায় ছাড়া আর কাউকেও দেখছি না। আমার বিশেষ অনুরোধ আপনি তাঁর সঙ্গে মিলিত হবেন। তাঁকে বিষয়ী শূদ্র বলে যেন উপেক্ষা না করেন। পাণ্ডিত্য ও ভক্তিরস দু'টীরই তিনি প্রকৃত অধিকারী, তাঁকে সম্ভাষণ করলেই আমার কথা উপলব্ধি করতে পারবেন।

শ্রীমহাপ্রভু দক্ষিণ দেশ অভিমুখে যাত্রা করে নাম প্রেম বিতরণ করতে করতে এলেন পশ্চিম গোদাবরীর তীরে। পণ্ডিত সার্ব্বভৌমের অনুরোধ অনুযায়ী শ্রীরামানন্দ রায়ের সঙ্গে মিলিত হবার ইচ্ছা মহাপ্রভুর মনে জাগড়িত ছিল।

শ্রীমহাপ্রভু গোদাবরীর মনোহর তটে এক বৃক্ষমূলে বসে আছেন। তাঁর অঙ্গ কান্তিতে চতুর্দ্দিক যেন আলোকিত হচ্ছিল। এমন সময় অনতিদূরে রাজপথ দিয়ে স্নান করতে যাচ্ছেন শ্রীরামানন্দ রায়।

সঙ্গে বৈদিক ব্রাহ্মণগণ ও বিবিধ বাজনা। শ্রীরামানন্দ রায় দূর থেকে বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট দিব্য কান্তিযুক্ত সন্ন্যাসীবরকে একদৃষ্টে দর্শন করতে লাগলেন। বৈদিক বিধানে গোদাবরীতে স্নানাদি সেরে, শ্রীরামানন্দ রায় এলেন সন্ন্যাসীর শ্রীচরণ-দর্শনে। দিব্য সন্ন্যাসী দর্শনে শ্রীরামানন্দের মনে যে ভাবোদয় হচ্ছিল তা বলে শেষ করা যায় না। মহাপ্রভুও তাঁকে অপলক নেত্রে দেখতে লাগলেন। নয়নে নয়নে হল মিলন। তারপর শ্রীরামানন্দ রায় পালকি থেকে নেমে শ্রীমহাপ্রভুর চরণে দণ্ডবৎ করলেন। মহাপ্রভু তাঁকে আলিঙ্গন করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হলেন; কিন্তু বহিরঙ্গ লোক দেখে ধৈর্য্য ধারণ করলেন। মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে ভূমি থেকে তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, ''তুমি রাম রায়?''

''হাঁ প্রভু! সেই শূদ্রাধম।''

মহাপ্রভু গাঢ় আলিঙ্গন করলেন। বললেন—আমার এতদূরে আসবার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল।

''হাঁ প্রভু! এ অধম শূদ্রের প্রতি এত দয়া কেন?''

''পুরীতে পণ্ডিত সার্ব্বভৌমের নিকট তোমার মহিমা শুনেছি। তোমার মত রসিক ভক্ত দ্বিতীয় নাই, সার্ব্বভৌম বলেছেন।''

''সার্ব্বভৌম পণ্ডিত আমায় এত কৃপা করলেন কেন? বোধ হয় আপনি তাঁকে কুতর্ক গর্ত্ত থেকে উদ্ধার করে প্রেমরস সুধা পান করিয়েছেন। বাহ্যতঃ তিনি আমাকে ঘৃণা করেন, কিন্তু অন্তরে স্নেহশীল। এ আপনার কৃপার নিদর্শন।'' রামানন্দ রায় আবার প্রভুর চরণ ধারণ করলেন, প্রভু আলিঙ্গন করলেন। দুজনার ভাবের অবধি নাই, উভয়ের অঙ্গে অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার সমূহ প্রকাশ পেতে লাগল। বৈদিক ব্রাহ্মণগণ অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। শূদ্র রাজাকে স্পর্শ করে এ সন্ন্যাসী এত প্রেম যুক্ত হয়ে পড়লেন কেন? বাহ্যতঃ শ্রীরামানন্দ রায়কে কেউ চিনতে পারত না। ব্রাহ্মণগণের মন জেনে মহাপ্রভু ধৈর্য্য ধারণ করলেন। রামানন্দ রায় বললেন—হে করুণাময় প্রভো! যদি অধমকে কৃপা করবার জন্য আগমন করে থাকেন, আট দশ দিন এখানে অবস্থান করে এ দীনকে উদ্ধার করুন। মহাপ্রভু বললেন—সার্ব্বভৌম বিশেষ করে তোমার সঙ্গ করবার জন্য বলেছিলেন। তোমাকে দেখে আমার যাবতীয় আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হল। এমন সময় একজন ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুকে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে পুনর্ব্বার মিলবার জন্য বলে ব্রাহ্মণের গৃহে এলেন।

শ্রীমহাপ্রভু অপরাহ্ণ স্নানাদি সেরে গোদাবরী তটে সে বৃক্ষমূলে যখন উপবেশন করলেন, শ্রীরামানন্দ রায় এক ভৃত্য সঙ্গে মহাপ্রভুর শ্রীচরণ সন্নিধানে এলেন। রামানন্দ রায় দণ্ডবৎ করতেই মহাপ্রভু উঠে তাঁকে গাঢ় আলিঙ্গন করলেন ও ধরে বসালেন। অনন্তর দুজনে প্রেমানন্দে মত্ত হয়ে কৃষ্ণকথা আলাপ করতে লাগলেন। মহাপ্রভু প্রশ্ন করতে লাগলেন, শ্রীরামানন্দ রায় উত্তর দিতে লাগলেন।

শ্রীরামানন্দ রায় সাধ্য তত্ত্বের উত্তরে—প্রথমতঃ বর্ণাশ্রম ধর্ম উল্লেখ করে, পরপর কর্মার্পণ, নিষ্কাম কর্ম, জ্ঞানমিশ্রা, জ্ঞানশূন্যা ও শুদ্ধাভক্তির কথা বললেন। মহাপ্রভু পূর্ব্বোক্ত কোনটিকেই সাধ্যসার বলে স্বীকার করলেন না। অতঃপর শ্রীরামানন্দ রায় শুদ্ধ কৃষ্ণরতি দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রতির কথা বললেন। মহাপ্রভু বললেন—আরও বল। শ্রীরামানন্দ রায় মধুর রতিতে ব্রজগোপীদের কথা বলে তাঁদের মধ্যে শ্রীরাধা ঠাকুরাণীর অসাধারণ ভাবের কথা বললেন। তখন মহাপ্রভু বললেন— ইহা সাধ্যসার। আর কিছু বল,—শ্রীরামানন্দ রায় বলতে লাগলেন—শ্রীরাধাই কৃষ্ণপ্রেম- কল্পলতিকাস্বরূপিণী এবং সখীগণ সে লতার পল্লব পুষ্প পত্রাদি স্বরূপ।






শ্রীকৃষ্ণ রসরাজ, শ্রীরাধা মহাভাব-স্বরূপিণী। বোধ হয় রসরাজ ও মহাভাব মিলিত অবতার যিনি; তিনি আমাকে ছলপূর্ব্বক নাচাচ্ছেন। মহাপ্রভু উঠে রামানন্দের মুখে হস্ত চাপা দিয়ে আর বলতে নিষেধ করলেন। বললেন যথেষ্ট, আর বলতে হবে না। ঐ রাত্রির মত কথোপকথন শেষ করে দু'জন শয়ন করতে গেলেন।

পরদিবস সন্ধ্যাকালে পুনঃ শ্রীরামানন্দ রায় শ্রীমহাপ্রভুর চরণ-প্রান্তে এলেন ও দণ্ডবৎ করলেন। মহাপ্রভু উঠে গাঢ় প্রণয়সহ আলিঙ্গন করলেন। তারপর কথা আরম্ভ করলেন। মহাপ্রভু প্রশ্ন করতে লাগলেন এবং রামানন্দ রায় তার উত্তর দিতে লাগলেন।

প্রভু কহে, – কোন বিদ্যা বিদ্যা-মধ্যে সার?
রায় কহে, –কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর।।
কীর্ত্তিগণ-মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি?
কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাঁহার হয় খ্যাতি।।
সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি?
রাধাকৃষ্ণে প্রেম যাঁর, সেই বড় ধনী।।
দুঃখ-মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর?
কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর।।
মুক্ত-মধ্যে কোন্ জীব মুক্ত করি' মানি?
কৃষ্ণপ্রেম যাঁর, সেই মুক্ত শিরোমণি।।
গান-মধ্যে কোন্ গান–জীবের নিজ-ধর্ম্ম?
রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি–যেই গীতের মর্ম্ম।।
শ্রেয়ো-মধ্যে কোন্ শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার?
কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর।।
কাঁহার স্মরণ জীব করিবে অনুক্ষণ?
কৃষ্ণ-নাম-গুণ-লীলা–প্রধান স্মরণ।।
ধ্যেয়-মধ্যে জীবের কর্ত্তব্য কোন্ ধ্যান?
রাধাকৃষ্ণপদাম্বুজ-ধ্যান–প্রধান।।
সর্ব্ব ত্যজি' জীবের কর্ত্তব্য কাঁহা বাস?
শ্রীবৃন্দাবনভূমি–যাঁহা নিত্য-লীলারাস।।
শ্রবণমধ্যে জীবের কোন্ শ্রেষ্ঠ শ্রবণ?
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা কর্ণ-রসায়ন।।
উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান?
শ্রেষ্ঠ-উপাস্য–যুগল 'রাধা-কৃষ্ণ' নাম।।
মুক্তি ভুক্তি, বাঞ্ছে যেই, কাঁহা দুঁহার গতি?
স্থাবরদেহ, দেবদেহ, যৈছে অবস্থিতি।।
অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র-মুকুলে।।
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্ক জ্ঞান।
কৃষ্ণ-প্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্।।

চৈঃ চঃ মঃ ৮/২৪৪-২৫৮

মহাপ্রভু রায়ের নিকট নিজেকে লুকানোর জন্য অনেক চেষ্টা করেও ভক্তের নিকট ধরা পড়লেন। রামানন্দ রায় বললেন,–"প্রভু প্রথমে আপনাকে সন্ন্যাসীরূপে দেখলাম, যেন সোনার প্রতিমা। এখন দেখি শ্যামগোপরূপ বংশীবদন। আপনার সম্মুখে কাঞ্চন পঞ্চালিকা শ্রীমতী রাধারাণী, তাঁর অঙ্গকান্তিতে আপনার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত।"

"পহিলে দেখিলুঁ তোমার সন্ন্যাসী-স্বরূপ।
এবে তোমা দেখি' মুঞি শ্যাম-গোপরূপ।।
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন-পঞ্চালিকা।
তাঁর গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব্ব অঙ্গ ঢাকা।।"

মহাপ্রভু বললেন–"আপনি তো মহাভাগবত, তাই সর্ব্বত্রই আপনার শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ দর্শন হয়।" রায় বললেন "আমার কাছ আপনার লুকোচুরি খাটবে না।" তখন মহাপ্রভু রায়কে দর্শন দিলেন–

তবে হাসি' তাঁরে প্রভু দেখাইল স্বরূপ।
'রসরাজঃ 'মহাভাব' দুই একরূপ।।

চৈঃ চঃ মঃ ৮/২৮১

দিব্যরূপ দর্শন করে রামানন্দ রায় মূর্চ্ছিত হয়ে গেলেন। মহাপ্রভুর হস্তস্পর্শে পুনরায় চেতন ফিরে






পেলেন। মহাপ্রভু বললেন--''যে রূপ দেখলে তা গোপন রাখবে। শীঘ্র রাজকার্য্য পরিত্যাগ করে পুরীধামে চলে এস। সেখানে আমরা একসাথে কৃষ্ণকথা আলোচনা করব।''

দক্ষিণভারতে মহাপ্রভুর সাথে মিলনের কিছুদিন পরে রায় রামানন্দ নীলাচলে মহাপ্রভুর সান্নিধ্যে চলে আসেন। সে সময় রাজা প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুকে দর্শন করার জন্য ব্যাকুল হয়ে গেলে শ্রীরায় রামানন্দ প্রতাপরুদ্রের হয়ে মহাপ্রভুকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন, প্রতাপরুদ্রকে দর্শন দেওয়ার জন্য। মহাপ্রভু রামানন্দের অনুরোধকে উপেক্ষা করতে পারলেন না। তিনি বললেন, ''প্রতাপরুদ্রের সবই ঠিক আছে, কিন্তু তার নামের শেষে রাজা শব্দটিই আপত্তিজনক। তবে তোমার আগ্রহে আমি তার পুত্রকে দর্শন দিতে পারি।

যদ্যপি প্রতাপরুদ্র—সর্ব্ব-গুণবান্।
তাঁহারে মলিন কৈল এক 'রাজা'-নাম।।
তথাপি তোমার যদি মহাগ্রহ হয়।
তবে আনি' মিলাহ তুমি তাঁহার তনয়।।
'আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ—এই শাস্ত্রবাণী।
পুত্রের মিলনে যেন মিলিবে আপনি।।
তবে রায় যাই' সব রাজারে কহিলা।
প্রভুর আজ্ঞায় তাঁর পুত্র লঞা আইলা।।

চৈঃ চঃ মঃ ১২/৫৪-৫৭

একদিন ওড়িষ্যানিবাসী শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র কৃষ্ণকথা শোনার জন্য মহাপ্রভুর নিকট গেলে, মহাপ্রভু বললেন, ''আমি কৃষ্ণকথা কিছুই জানি না। যদি তুমি কৃষ্ণকথা শুনতে চাও, তাহলে রায় রামানন্দের কাছে যাও। আমিও তাঁর কাছে কৃষ্ণকথা শুনি।''

মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র রায় রামানন্দের কাছে কৃষ্ণকথা শোনার জন্য গেলেন। রামানন্দের সেবক তাঁকে বাইরে বসতে দিয়ে বললেন, অপেক্ষা করুন, রায় রামানন্দ এখন সেবা কার্য্যে ব্যস্ত আছেন। প্রদ্যুম্ন মিশ্র জিজ্ঞাসা করলেন-- কি সেবা? সেবক বললেন, জগন্নাথদেবের নিকট অভিনয় করানোর জন্য রামানন্দ দুজন দেবদাসীকে নৃত্য-গীত শিক্ষা দিচ্ছেন। তিনি নিজ হস্তে দেবদাসীগণকে স্নান করান এবং শৃঙ্গারও করিয়ে দেন। যতক্ষণ উনি এই সেবায় নিয়যিত থাকেন, ততক্ষণ কেউ ভিতরে প্রবেশ করতে পারেন না। অতএব আপনি অপেক্ষা করুন।'' প্রদ্যুম্ন মিশ্র অপেক্ষা করতে লাগলেন। সেবা সমাপ্ত হলে রায় প্রদ্যুম্ন মিশ্রের আগমন জানতে পেরে তাঁর দেখা করলেন এবং বিনয়ের সাথে বিলম্ভ হওয়ার জন্য ক্ষমা চাইলেন। অধিক সময় অতিবাহিত হওয়ায় প্রদ্যুম্ন মিশ্র নিজগৃহে ফিরে আসেন। পুনঃরায় একদিন মহাপ্রভুর সাথে সাক্ষাদ্ হলে মহাপ্রভু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ''মিশ্র! রামানন্দের সাথে কৃষ্ণকথা কেমন আলোচনা হল।'' প্রদ্যুম্ন মিশ্র বললেন, ''প্রভু আপনি এমন একজনের কাছে কৃষ্ণকথা শুনতে পাঠালেন, যিনি কিনা দেবদাসীদের সাথে নিভৃত ঘরে অবস্থান করেন। সেবকরা বলেন, তিনি নৃত্য-গীত শিক্ষা দেন। কিন্তু.....? প্রদ্যুম্ন মিশ্রের সন্দেহ যুক্ত কথা শুনে তার সংশয় দূর করার জন্য মহাপ্রভু রায় রামানন্দের অলৌকিক চরিত্রের কথা বলতে লাগলেন—

''আমি ত' সন্নাসী, আপনারে বিরক্ত করি' মানি।
দর্শন রহু দূরে, 'প্রকৃতি'র নাম যদি শুনি।।
তবহিঁ বিকার পায় মোর তনু-মন।
প্রকৃতি দর্শনে স্থির হয় কোন্ জন?
রামানন্দ-রায়ের কথা শুন সর্ব্বজন।
কহিবার নহে, যাহা আশ্চর্য্য-কথন।।
একে দেবদাসী, আর সুন্দরী তরুণী।
তাহাদের সব সেবা করেন আপনি।।
স্নানাদি করায়, পরায় বাস-বিভূষণ।

গুহ্য অঙ্গ যত, তার দর্শন-স্পর্শন।।
তবু নির্ব্বিকার রায় রামানন্দের মন।
নানাভাবোদ্‌গম তারে করায় শিক্ষণ।।
নির্ব্বিকার দেহ-মন—কাষ্ঠ-পাষাণ-সম।
আশ্চর্য্য,—তরুণী-স্পর্শে নির্ব্বিকার মন।।
এক রামানন্দের হয় এই অধিকার।
তাতে জানি অপ্রাকৃত-দেহ তাঁহার।।"

—চৈঃ চঃ অ ৫/৩৫-৪২

গম্ভীরায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিব্য-উন্মাদ অবস্থায় শ্রীরায় রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদর তাঁর সঙ্গী ছিলেন।

"রামানন্দের কৃষ্ণকথা, স্বরূপের গান।
বিরহ-বেদনায় প্রভুর রাখয়ে পরাণ।।"

"এত কহি' গৌরহরি দুইজনার কণ্ঠ ধরি',
কহে--'শুন স্বরূপ-রামরায়।
কাঁহা করোঁ, কাঁহা যাঙ, কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ,
দুঁহে মোরে কহ সে উপায়।।
এইমত গৌর প্রভু প্রতি দিনে-দিনে।
বিলাপ করেন স্বরূপ-রামানন্দ-সনে।।
সেই দুইজন প্রভুরে করে আশ্বাসন।
স্বরূপ গায়, রায় করে শ্লোক পঠন।।
কর্ণামৃত, বিদ্যাপতি, শ্রীগীতগোবিন্দ।
ইহার শ্লোক-গীতে প্রভুর করায় আনন্দ।।"

—চৈঃ চঃ অ ১৫/২৪-২৭

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি,
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোীবিন্দ।
স্বরূপ-রামানন্দ-সনে, মহাপ্রভুর রাত্রি-দিনে,
গায়, শুনে—পরম আনন্দ।।"

—চৈঃ চঃ মঃ ২/৭৭

রায় রামানন্দের ভজনস্থান 'শ্রীজগন্নাথ-বল্লভ-উদ্যান' মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। জগন্নাথ-বল্লভ উদ্যানে প্রবেশ করে মহাপ্রভু মহাভাবাবিশিষ্ট হয়ে পড়তেন। একদিন মহাপ্রভু জগন্নাথ-বল্লভ-উদ্যানে অশোক বৃক্ষের তলে কৃষ্ণদর্শন ও তৎপরে কৃষ্ণ অদর্শনহেতু মূর্চ্ছিত হওয়ার লীলা করেছিলেন।

"'জগন্নাথবল্লভ' নাম উদ্যান প্রধানে।
প্রবেশ করিলা প্রভু লঞা ভক্তগণে।।
প্রফুল্লিত বৃক্ষ-বল্লী—যেন বৃন্দাবন।
শুক, শারী, পিক, ভৃঙ্গ করে আলাপন।।"

—চৈঃ চঃ অ ১৯/৭৯-৮০

"প্রতিবৃক্ষবল্লী ঐছে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
অশোকের তলে কৃষ্ণে দেখেন আচম্বিতে।।
কৃষ্ণ দেখি' মহাপ্রভু ধাঞা চলিলা।
আগে দেখি' হাসি' কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান হইলা।।
আগে পাইলা কৃষ্ণে, তাঁরে পুনঃ হারাঞা।
ভূমেতে পড়িলা প্রভু মূর্চ্ছিত হঞা।।"

—চৈঃ চঃ অ ১৯/৮৫-৮৭

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বরূপদামোদর ও রায় রামানন্দের মাধ্যমেই সহর্ষে জানিয়েছিলেন কলিযুগে কৃষ্ণপ্রেমলাভের শ্রেষ্ঠ উপায় শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন।

'হর্ষে প্রভু কহেন—"শুন স্বরূপ-রামরায়!
নামসংকীর্ত্তন-কলৌ পরম উপায়।।'

—চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ২০/৮

রায় রামানন্দ রাঘবেন্দ্র পুরীর শিষ্য এবং রাঘবেন্দ্র পুরী মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য এইরূপ উক্তি 'ভজন-নির্ণয়' গ্রন্থে পাওয়া যায়।

জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণা-পঞ্চমী তিথিতে (মতান্তরে, বৈশাখী কৃষ্ণা-পঞ্চমী তিথিতে) শ্রীরায় রামানন্দের তিরোধান লীলা হয়।

**।। জয় শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভু কি জয়।।**

# শ্রীশিখি মাহিতি

মহাপ্রভুর সাড়ে তিন জন অন্তরঙ্গ ভক্তের মধ্যে শিখিমাহিতি একজন।

"প্রভু লেখা করে যারে—রাধিকার গণ।
জগতের মধ্যে পাত্র সাড়ে তিনজন।।
স্বরূপ গোস্বাঞি, আর রায় রামানন্দ।
শিখি মাহিতি—তিন, তাঁর ভগিণী অর্দ্ধজন।।

—চৈঃ চঃ অ ২/১০৫-১০৬

গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় ১৮৯ সংখ্যায় বর্ণনা রয়েছে—

"রাগলেখা কলাকেল্যৌ রাধাদাস্যৌ পুরা স্থিতে।
তে জ্ঞেয়ে শিখিমাহাতী তৎস্বসা মাধবীক্রমাৎ।।

রাগলেখা ও কলাকেলী নামে শ্রীরাধার যে দুজন দাসী ছিলেন, তারা এই কলিযুগে শিখিমাহিতি এবং তাঁর বোন মাধবী হয়েছেন।

"শ্রীশিখি মাহিতি আর মুরারি মাহিতি।।
মাধবী দেবী শিখি মাহিতির ভগিনী।
শ্রীরাধার দাসী মধ্যে যাঁর নাম গণি"।।

চৈঃ চঃ আঃ ১০/১৩৭

শিখি মাহিতি উৎকলে বাস করতেন। তিনি জগন্নাথের সেবক এবং মন্দিরের লেখনকারী (দেউলকরন) ছিলেন।

শ্রীমুরারি মাহিতি ও শ্রীমাধবী দেবী উভয়ে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি স্বাভাবিক ভাবে অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু শিখি মাহিতি শ্রীজগন্নাথের প্রতি যেরূপ প্রগাঢ় ভক্তি প্রকাশ করতেন, তদ্রূপ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি করতেন না। মুরারি ও মাধবী তাঁকে অনেক বুঝাতেন। কিন্তু তিনি রাজি হতেন না। একদিন অনুজগণের কথা চিন্তা করতে করতে শিখি মাহিতি নিদ্রিত হলেন, রাত্রি শেষে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখতে লাগলেন—কখনও মহাপ্রভু জগন্নাথে প্রবেশ করে এক হচ্ছেন, আবার দুই মূর্ত্তি প্রকট করছেন। কখনও দেখছেন মহাপ্রভু হাত তুলে তাঁকে ডাকছেন, আবার দেখছেন—তাঁকে স্নেহে আলিঙ্গন করছেন।

এমন মধুর স্বপ্ন দেখে শিখি মাহিতির শরীরে পুলক ও নয়ন দিয়ে প্রেম-অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। প্রভাতে নিদ্রা ভাঙল, কিন্তু প্রেমাবেশ ভাঙল না। ঠিক এমন সময় মুরারি ও মাধবী সেখানে এলেন। শিখি মাহিতি দু'জনকে প্রেমে আলিঙ্গন করলেন। তারপর বলতে লাগলেন—আজ আমি এক মধুর স্বপ্ন দেখেছি। তার বিবরণ তোমরা শ্রবণ কর। শ্রীগৌরসুন্দরের মহিমা অদ্ভুত। অদ্যই আমার তা বিশ্বাস হল। দেখলাম শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচল চন্দ্রকে দর্শন করে, ক্ষণে ক্ষণে তাঁর মধ্যে প্রবেশ করছেন ও বহির্গত হচ্ছেন। আমি জগন্নাথের নিকটে গেলে, গৌরসুন্দর তাঁর দীর্ঘ বাহু উন্নত করে আমায় ডাকছেন ও আলিঙ্গন করছেন। সে আলিঙ্গনে আমি যেন প্রেম-সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছি। হায়! সে অসীম কৃপাসিন্ধু শ্রীগৌরসুন্দরে আমার আজও রতি-মতি হল না— এই বলে শিখি মাহিতি মুরারিকে জড়িয়ে ধরে এবং ভগিনী মাধবীর হাতে ধরে প্রেমে ক্রন্দন করতে লাগলেন।

শিখি মাহিতি গৌরসুন্দরের কৃপা প্রাপ্ত হয়েছেন জানতে পেরে মুরারি মাহিতি ও মাধবী প্রেমাশ্রুপাত করতে লাগলেন। তারপর সকলে মিলে জগন্নাথ দর্শন করতে চললেন। তিন জনে মন্দিরে প্রবেশ করে জগমোহনে মহাপ্রভুকে দর্শন পেলেন। স্বপ্নে যেমনটি দেখেছিলেন ঠিক তেমন শিখি মাহিতি দেখতে লাগলেন। শ্রীগৌরসুন্দর কখনও জগন্নাথে

লীন হচ্ছেন আবার প্রকট হচ্ছেন। একেবারেই স্তম্ভিত পুলকিত ও বিস্মিত শিখি মাহিতি দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর শ্রীগৌরসুন্দর শিখি মাহিতির নিকটবর্ত্তী হয়ে ভুজ যুগল তাঁর স্কন্ধে ধারণ করে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কি মুরারির বড় ভাই শিখি মাহিতি? শ্রীগৌরসুন্দরের সেই স্নেহময় উক্তি শ্রবণ করে এবং তাঁর ভুজস্পর্শ পেয়ে শিখি মাহিতি আনন্দভরে প্রভুর চরণতলে লুটিয়ে পড়ে বললেন—"এ সে অধম"। প্রভু তাঁকে উঠিয়ে আলিঙ্গন করে বললেন—"তুমি আমার প্রিয়তম জন।" সে দিন থেকে শিখি মাহিতি প্রভু-পরিকরগণের অন্যতম বলে প্রসিদ্ধ হলেন।

শিখি মাহিতি যে মহাপ্রভুর কত প্রিয় তা নিচের পয়ারগুলি থেকে বোঝা যায়—

"দামোদরস্বরূপ-মিলনে পরম আনন্দ।
শিখি মাহিতি-মিলন, রায় ভবানন্দ।।"

—চৈঃ চঃ ম ১/১৩০

"আনন্দিত ভক্তগণ আসিয়া মিলিলা।
প্রেম-আলিঙ্গন প্রভু সবারে করিলা।।
কাশীমিশ্র, রামানন্দ, প্রদ্যুম্ন, সার্ব্বভৌম।
বাণীনাথ, শিখি-আদি যত ভক্তগণ।।"

—চৈঃ চঃ ম ১৬/২৫৩-২৫৪

"অদ্বৈতের জ্যেষ্ঠ পুত্র—শ্রীঅচ্যুতানন্দ।
বাণীনাথ, শিখিমাহাতি আদি ভক্তবৃন্দ।।"

—চৈঃ ভাঃ অ ৮/৬০

"শ্রীশিখি মাহিতি আদি গোপীনাথে কয়।
শ্রীজগন্নাথের হৈল দর্শন-সময়।।"

—ভক্তিরত্নাকর ৮/২৩৭

**।। জয় শ্রীশিখি মাহিতি কি জয়।।**

# শ্রীমাধবী দেবী

শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় আছে পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় মাধবী দেবী 'কলাকেলী' নাম্নী শ্রীরাধার কিঙ্করী ছিলেন।

উৎকলবাসী দেউলকরণ শ্রীশিখি মাইতির কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমাধবী দেবী। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন--

মাধবীদেবী—শিখিমাইতির ভগিনী।
শ্রীরাধার দাসী-মধ্যে যাঁর নাম গণি।।

চৈঃ চঃ আদি ১০/১৩৭

শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামী লিখেছেন—শ্রীমাধবী দেবী অতিশয় শুদ্ধ-বুদ্ধি সম্পন্না ছিলেন। তাঁরই কৃপায় গুণে শ্রীশিখি মাইতি ও শ্রীমুরারি শ্রীগৌরকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

শ্রীমাধবী দেবী গৌর-ভক্তগণের মধ্যে কিরূপ পরম ভাগ্যবতী ছিলেন, তা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—

মাহিতির ভগিনীর নাম—মাধবী দেবী।
বৃদ্ধা তপস্বিনী—আর পরমা বৈষ্ণবী।।
প্রভু লেখা করে যারে রাধিকার গণ।
জগতের মধ্যে 'পাত্র'—সাড়ে তিন জন।।
স্বরূপ গোসাঞি, আর রায় রামানন্দ।
শিখিমাহিতি—তিন, তাঁর ভগিনী—অর্দ্ধজন।।

চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ২/১০৪-১০৬

আলালনাথের নিকট বেণ্টপুর গ্রামে শ্রীভবানন্দ

রায়ের গৃহ-সন্নিকটে শ্রীমাধবী দেবী শ্রীগোপীনাথের সেবা প্রকট করেছিলেন। আজও সেখানে–সেই মূর্তি সেবিত হচ্ছেন। ভবানন্দ রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র হলেন শ্রীশিখি মাহিতি। শুনা যায়–শ্রীমাধবী দেবী 'শ্রীপুরুষোত্তম দেব' নামে একখানি নাটক রচনা করেছিলেন। কেউ কেউ বলেন–শ্রীমাধবী দেবী মহারাজ প্রতাপ রুদ্র কর্ত্তৃক শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের পাঞ্জিয়া অর্থাৎ মাদলা পাঞ্জীর লেখিকা নিযুক্তা হয়েছিলেন।

শ্রীছোট হরিদাস মহাপ্রভুর সেবার জন্য শ্রীমাধবী দেবীর নিকট থেকে সরু চাল চেয়ে এনেছিলেন। ঘটনাটি এই গ্রন্থের ৩৫৯ পৃষ্ঠায় ছোট হরিদাসের জীবনীতে বর্ণিত হয়েছে।

**।। জয় শ্রীমাধবী দেবী কি জয়।।**

# শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র

যে যে পার্ষদের জন্ম উৎকলে হইলা।
তাহারাও অল্পে অল্পে আসিয়া মিলিলা।।
মিলিলা প্রদ্যুম্ন মিশ্র–প্রেমের শরীর।
পরমানন্দ, রামানন্দ-দুই মহাধীর।।

চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৩/১৮৩

নীলাচলে জন্মিলা যতেক অনুচর।
সবে চিনিলেন নিজ প্রাণের ঈশ্বর
প্রদ্যুম্ন মিশ্র–কৃষ্ণ-প্রেমের সাগর।
আত্মপদ যাঁরে দিলা শ্রীগৌরসুন্দর।।

চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৫/২১০-২১১

শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র উৎকলবাসী ভক্ত ব্রাহ্মণ। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-অভিধানে লিখিত আছে--ইনি প্রথমে শ্রীহট্টবাসী ছিলেন, পরে উড়িষ্যাবাসী হয়েছেন।

''শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র ইঁহ বৈষ্ণবপ্রধান।
জগন্নাথের 'মহাসোয়ার' ইঁহ দাস নাম।।''

চৈঃ চঃ মঃ ১০/৪৩

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর চৈতন্যভাগবতে আদিলীলার ১৪/২ পয়ারে গৌড়ীয় ভাষ্যে লিখেছেন– ''উৎকলদেশে বিপ্রকুলে প্রদ্যুম্ন মিশ্রের জন্ম।'' প্রভুর অতি কৃপা পাত্র।

আবির্ভাবো গৌরহরের্নকুলব্রহ্মচারিনি।
আবেশশ্চ তথা জ্ঞেয়ো মিশ্রে প্রদ্যুম্নসঙ্গকে।।

গৌঃ গঃ ৭৩-৭৪

শ্রীনকুল ব্রহ্মচারীর মধ্যে গৌরহরির আবির্ভাব এবং প্রদ্যুম্ন মিশ্রের মধ্যে গৌরহরির আবেশ জানতে হবে।

প্রদ্যুম্ন মিশ্র একদিন প্রভুর কাছে কৃষ্ণ-কথা শুনতে চাইলেন। প্রভু বললেন–আমি কৃষ্ণ-কথা জানি না। রামানন্দ রায় জানেন। আমি তাঁর মুখে শুনি। আপনি তাঁর কাছে যান। আপনার কৃষ্ণ কথা শ্রবণে যে রুচি হয়েছে তা বড় ভাগ্যের কথা।

মিশ্র কৃষ্ণ-কথা শুনতে রামানন্দের স্থানে এলেন। সেবক তাঁকে যত্ন করে বসালেন। মিশ্র জিজ্ঞাসা করলেন–রায় কোথায়? সেবক বললেন–এখন তাঁর দর্শন পাবেন না। তিনি দু'জন দেবদাসীকে






স্ব-রচিত নাটক অভিনয় শিক্ষা দিচ্ছেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। মিশ্র অপেক্ষা করতে লাগলেন। দেবদাসীদের কিছুক্ষণ শিক্ষা দেবার পর তাদের বিদায় দিয়ে রামানন্দ রায় বাইরে এলেন। দেখলেন প্রদ্যুম্ন মিশ্র বসে আছেন। রায় নমস্কার করতেই মিশ্র উঠে নমস্কার করলেন। রায় বললেন—এসেছেন বোধ হয় অনেকক্ষণ হল। কেউ ত আমায় বলে নি। আপনার চরণে অপরাধ হল। আপনার আগমনে আমার গৃহ পবিত্র হয়েছে। কি সেবা করব বলুন? মিশ্র বললেন—আজ অনেক বেলা হয়েছে, আপনার কাছে কৃষ্ণকথা শুনতে এসেছিলাম। শ্রীরামানন্দ রায় বললেন—কৃপা পূর্ব্বক অন্য একদিন আসুন।

একদিন মহাপ্রভুর সাথে প্রদ্যুম্ন মিশ্রের সাক্ষাদ্ হলে, মহাপ্রভু তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ''কৃষ্ণকথা কেমন শুনলে!'' উত্তরে মিশ্র বললেন ''আপনি এমন একজনের নিকট কৃষ্ণকথা শুনতে পাঠিয়েছেন, যিনি কিনা নিভৃত ঘরে দেবদাসীদের নৃত্যগীত শিক্ষা দেন....। প্রদ্যুম্ন মিশ্রের সন্দেহযুক্ত কথা শুনে মহাপ্রভু বললেন, শ্রীরায় রামানন্দ মহাভাগবত। তিনি নির্ব্বিকার। তুমি অবশ্যই তাঁর কাছে কৃষ্ণকথা শুনতে যাবে। মহাপ্রভুর আদেশে প্রদ্যুম্ন অন্য একদিন রায় রামানন্দের গৃহে উপস্থিত হলেন। রামানন্দ রায় উঠে মিশ্রকে নমস্কার পূর্ব্বক গৃহের মধ্যে নিলেন এবং উভয়ে উপবেশন করলেন।

রামানন্দ রায় বললেন—গতদিন ত' কিছু কথা হয় নি! বলুন কি আদেশ। মিশ্র বললেন—আপনার কাছে কৃষ্ণ-কথা শুনতে এসেছি। রায় বললেন—আমি কৃষ্ণ-কথা জানি, কে বললেন? মিশ্র--স্বয়ং মহাপ্রভু বলেছেন। রামানন্দরায় বললেন—আপনি তাঁর মুখে কৃষ্ণ-কথা শুনতে চাইলেন না কেন? মিশ্র—আমি তাঁর কাছে শুনতে চেয়েছিলাম। তিনি বললেন আমি কৃষ্ণ-কথা জানি না। রামানন্দ জানে। তাঁর কাছ থেকে আমিও শুনি। আপনি তাঁর কাছে যান। রায় বললেন—প্রভু আপনাকে বঞ্চনা করেছেন। আমি অধম কৃষ্ণ কথার কি জানি? আচ্ছা বলুন কি কথা শুনতে চান। মিশ্র—বিদ্যানগরে প্রভুকে যে সমস্ত কথা শুনিয়েছিলেন, সে সব কথা কিছু বলুন। শ্রীরামানন্দ রায় কৃষ্ণ কথা বলতে আরম্ভ করলেন। কৃষ্ণ-কথায় প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত হল। সেবক এসে রায় রামানন্দকে অপরাহ্ণ কালের সূচনার কথা জানালেন। তখন রায় কথা বন্ধ করলেন। মিশ্র বললেন—রায়! আমাকে কৃতার্থ করেছেন। এমন মধুর কৃষ্ণ-কথা শুনে আমার জীবন ধন্য হল। রায় বললেন—আমি কিছুই বলিনি। মহাপ্রভু যেমন বলালেন তেমনি বললাম। তিনি সূত্রধর। যেমন নাচান, তেমনি নাচি। মিশ্রজী বিদায় নিয়ে গৃহে এলেন এবং সন্ধ্যাকালে মহাপ্রভুর কাছে এলেন। প্রভু জিজ্ঞাসা করলে সব কথা বললেন।

অতঃপর প্রভু বলতে লাগলেন—রামানন্দরায় নিত্য সিদ্ধ। রাগানুগ মার্গে গোপীভাবের অনুসরণে কৃষ্ণ-ভজন করেন। তাঁর মনের ভাব তিনি মাত্র জানেন। দেবদাসী স্পর্শেও তাঁর মন কাষ্ঠপাষাণের মত বিকার শূন্য। দেবদাসীগণকে রাধার সখী মনে করেন এবং নিজেকে তাঁদের সেবিকা মনে করে সেব্য বুদ্ধিতে তাঁদের সেবা করেন।

সেব্য বুদ্ধি আরোপিয়া করেন সেবন।
স্বাভাবিক দাসী ভাব করেন আরোপণ।।

—চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৫/২০

শ্রীগৌরসুন্দর রামানন্দ রায় সম্বন্ধে এ-সমস্ত কথা বলে শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্রকে বিদায় দিলেন।

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীহরিদাস ঠাকুরের দ্বারা শ্রীহরি নামের মহিমা ও শ্রীরামানন্দের দ্বারা প্রেমভক্তি মহিমা জগতে প্রচার করেছেন।

**।। জয় শ্রীল প্রদ্যুম্ন মিশ্র কি জয়।।**

# শ্রীরূপ গোস্বামী



শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
সোঽয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্।।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় 'শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'র মঙ্গলাচরণে এই শ্লোকটির দ্বারা সংক্ষেপে শ্রীল রূপ গোস্বামীর পরিচয় প্রদান করেছেন।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রিয়তম জন যড়-গোস্বামীর অন্যতম শ্রীরূপ গোস্বামী। মহাপ্রভু শ্রীরূপ ও সনাতনের দ্বারা পৃথিবী তলে স্বীয় অভীষ্ট শিক্ষা ও সিদ্ধান্ত প্রচার করেছেন। ভক্তগণ এ দুইজনকে সেনাপতি বলেছেন।

শ্রীরূপ গোস্বামীর বংশ পরিচয় শ্রীল জীব গোস্বামী লঘু বৈষ্ণব তোষণীতে দিয়েছেন।

উদ্যচ্চারুপদক্রমাশ্রিতবতী যস্যামৃতস্রাবিনী
জিহ্বা কল্পলতাত্রয়ী মধুকরী ভূয়োনরীনৃত্যতে।
রেজে রাজসভা সভাজিত পদঃ কর্ণাটভূমিপতিঃ
শ্রীসর্ব্বজ্ঞ জগদ্‌গুরুর্ভূবি ভরদ্বাজান্বয়গ্রামণীঃ।।

শ্রীসর্ব্বজ্ঞ জগদ্‌গুরু নামে কর্ণাট দেশাধিপতি পৃথিবীর মধ্যে একজন বিখ্যাত নৃপতিরূপে বিরাজিত ছিলেন। তাঁর উৎকৃষ্ট শব্দবিন্যাসময়ী অমৃত নিঃস্যন্দিনী এবং বেদত্রয়রূপ কল্পতলায় মধুকরী তুল্যা জিহ্বা নিরন্তর নৃত্য করত। তাঁর পাদপদ্মযুগল রাজমণ্ডলী কর্তৃক পূজিত হত এবং তিনি ভরদ্বাজ গোত্রের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। এই কর্ণাট-ভূপতি জগদ্‌গুরু শ্রীসর্ব্বজ্ঞের অভ্যুদয়কাল–দ্বাদশ শক শতাব্দীতে। শ্রীসর্ব্বজ্ঞের আত্মসম পুত্র শ্রীঅনিরুদ্ধ দেব। শ্রীঅনিরুদ্ধের দুই পুত্র শ্রীরূপেশ্বর ও হরিহর। রূপেশ্বর ছিলেন শাস্ত্রে বিচক্ষণ এবং হরিহর ছিলেন অস্ত্রে বিচক্ষণ। পিতার অন্তর্ধানের পর রূপেশ্বর ছোট ভাই হরিহর দ্বারা রাজ্য থেকে বিতাড়িত হন। তৎকালে তিনি আটটি অশ্বসহ পৌলস্ত্য দেশে আগমন করেন এবং পৌলস্ত্যের রাজা শ্রীশিখরেশ্বরের সঙ্গে তার মৈত্রীভাব হয়। রূপেশ্বরের পরম সুন্দর এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ঐ পুত্রের নাম শ্রীপদ্মনাভ দেব। শ্রীপদ্মনাভ গঙ্গাতটে বাস অভিপ্রায়ে নৈহাটি নামক গ্রামে আসেন এবং সেখানে সাধ্বী পত্নীসহ সুখে বাস করতে থাকেন। তিনি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রতি পরম অনুরাগী ছিলেন, নিত্য শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমূর্ত্তি পূজা করতেন। শ্রীপদ্মনাভ দেবের আঠারটি কন্যা এবং পাঁচটি পুত্র হয়। পুরুষোত্তম, জগন্নাথ, নারায়ণ, মুরারি ও মুকুন্দ পাঁচটি পুত্রের নাম।

শ্রীমুকুন্দ দেবের পুত্র শ্রীকুমারদেব, ইনি পরম সদাচারী ও বিপ্রকুলের রত্নসদৃশ ছিলেন এবং নিরন্তর যাগ-যজ্ঞাদি পরায়ণ ছিলেন। পরবর্ত্তীকালে স্বজনগণের দ্বারা তিনি পীড়িত হয়ে নৈহাটি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বঙ্গদেশে 'বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপ' গ্রামে এসে বসবাস করতে থাকেন। সেখানকার সজ্জনগণ

কর্ত্তৃক তিনি পরম আদৃত হন। কুমারদেব যশোরে ফতেয়াবাদ নামক গ্রামেও একখানি বসতবাটী করেছিলেন। শ্রীকুমারদেবের অনেকগুলি সন্তান ছিলেন তাঁর মধ্যে তিনটি পুত্র ছিলেন পরম বৈষ্ণব।

কুমার দেবের হৈল অনেক সন্তান।
তার মধ্যে তিন পুত্র বৈষ্ণবের প্রাণ।।
সনাতন, রূপ, শ্রীবল্লভ এই ত্রয়।
সগোত্র অন্যত্র যে অর্চ্চিত অতিশয়।।

—ভঃ রঃ ১/৫৬৭-৫৬৮

শ্রীরূপ গোস্বামীর বড় ভাই হলেন শ্রীসনাতন গোস্বামী এবং ছোট ভাই হলেন শ্রীবল্লভ বা অনুপম। শ্রীঅনুপমের পুত্র হলেন শ্রীজীব গোস্বামী।

শ্রীল কবি কর্ণপুর গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় বর্ণনা করেছেন—

শ্রীরূপমঞ্জরীখ্যাতা যাসীদ্ বৃন্দাবনে পুরা।
সাদ্য রূপাখ্য গোস্বামী ভূত্বা প্রকটতা মিয়াৎ।।

যিনি পূর্ব্বে ব্রজলীলায় ''শ্রীরূপমঞ্জরী'' নামে খ্যাতা ছিলেন, তিনি অধুনা শ্রীরূপ গোস্বামী নামে প্রকটিত হয়েছেন।

শ্রীরূপ সনাতন ছিলেন এক প্রাণ। তাঁরা এক সঙ্গে অধ্যয়নাদি করেছেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী ''দশম টিপ্পনীর'' বন্দনাতে যাঁদের নিকট বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যায়ন করেছিলেন তাদের বন্দনা করেছেন—

ভট্টাচার্য্যং সার্ব্বভৌমং বিদ্যাবাচস্পতীন্ গুরূন্।
বন্দে বিদ্যাভূষণঞ্চ গৌড়দেশ বিভূষণম্।।
বন্দে শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্যং রসপ্রিয়ং।
রামভদ্রং তথা বাণীবিলাসং চোপদেশকম্।।

আমি অধ্যাপক সার্ব্ববৌম ভট্টাচার্য্য, গৌড়দেশ বিভূষণ বিদ্যাভূষণ, বিদ্যা বাচস্পতি, রসপ্রিয় পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য এবং বাক্‌চতুর অধ্যাপক রাম ভদ্রাদিকে বন্দনা করি।

এ শ্লোকে শ্রীরূপ গোস্বামী যাঁদের নিকট বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন তাঁদের নাম পাওয়া যায়। শ্রীরূপ সনাতন অল্প বয়সে নিখিল বেদশাস্ত্র অধ্যয়নাদি করে পরম বিদ্বান হয়েছিলেন। তাঁরা কিভাবে তৎকালে গৌড়েশ্বর হুসেন সাহ বাদশাহের মন্ত্রিত্ব লাভ করেন। সেই সম্বন্ধে কিছু প্রবাদ আছে--

বাদশাহের যে গুরু মৌলবী ছিলেন তিনি বেশ সাধক পুরুষ ছিলেন, ভূত ভবিষ্যতের কথা বলতে পারতেন। কোন সময় বাদশাহ তাঁর কাছে অভ্যুদয়ের কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন তোমার এ মহানগরীতে পরম বিদ্বান সর্ব্বসদ্‌গুণসম্পন্ন দুইটি ব্রাহ্মণ সন্তান বাস করছেন, তাঁদের নাম 'রূপ' ও 'সনাতন'। তাঁদের মন্ত্রীপদ দিলে তোমার বহু বৈভব রাজ্যাদি সম্পদ লাভ হবে। বাদশাহ গুরুর কথানুসারে শ্রীরূপ সনাতনকে মন্ত্রিপদ দান করেন।

শ্রীরূপ গোস্বামীর জন্ম খৃষ্টাব্দ ১৪৯৩, শকাব্দ ১৪১৫। তিনি রাজধানী গৌড়ের নিকটে সাকুর্মা নামক এক পল্লীতে মাতুল গৃহে থেকে পড়াশুনা করেন।

গৌড়ের বাদশাহ হুসেনসাহ জোর পূর্ব্বক শ্রীরূপ ও সনাতনকে এনে রাজ মন্ত্রিত্ব পদ দেন। তারা অনিচ্ছুক হলেও যবনরাজের ভয়ে রাজকার্য্য করতে থাকেন। বাদশা তাঁদেরকে প্রচুর অর্থ ও সম্পত্তি দান করেন। শ্রীরূপ ও সনাতন তখন থেকে গৌড় রাজধানী রামকেলিতে বসবাস করতে লাগলেন। দেশ বিদেশ থেকে বড় বড় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তাঁদের গৃহে আগমন ও বিবিধ শাস্ত্র চর্চ্চাদি করতেন। কর্ণাটক থেকে ব্রাহ্মণগণ এলে বহু যত্ন পূর্ব্বক তাঁদের বাসস্থান প্রদান করতেন। গঙ্গার তটে তাঁদের বসত বাটী স্থাপিত হওয়ায় অদ্যাপি ঐ গ্রাম ভট্টবাটী নামে খ্যাত।

যে সময় শ্রীরূপ ও সনাতন রামকেলিতে

বাদশাহের মন্ত্রির কার্য্য করছিলেন ঠিক সেই সময় নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তগণকে নিয়ে মহাসংকীর্ত্তন বিলাস ও পাপীতাপী উদ্ধার লীলা করছিলেন। শ্রীরূপ ও সনাতন নিয়ত মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের সেই মহাবদান্যতার ও কৃপালুতার কথা শুনেছিলেন। নিত্যারাধ্য দেব শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শনের জন্য তাঁদের হৃদয়ে পরম উৎকণ্ঠা জেগেছিল। শ্রীরূপ গোস্বামী কোন সময়ে শ্রীগৌরসুন্দরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন–তাঁর শ্রীচরণ দর্শনের জন্য। শ্রীরূপের সেই পত্রোত্তরে মহাপ্রভু জানিয়েছিলেন–"পর পুরুষ অনুরক্তা রমণী যেমন বাহ্য স্বামীর সেবায় অনুরক্ততা দেখায়; তদ্রূপ তোমরা চিত্তটি শ্রীকৃষ্ণপদে রেখে বাহ্যে রাজকার্য্যে অনুরাগ দেখাও। অচিরাৎ শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের প্রতি কৃপা করবেন।"

শ্রীরূপ গোস্বামী তৎকালে শ্রীনবদ্বীপ নগরে যেতে পারেননি। তথাপি তিনি নবদ্বীপ নিবাসী জনগণের প্রতি অতিশয় প্রীতি দেখাতেন। এ সম্বন্ধে শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ভক্তিরত্নাকরে সুন্দর বর্ণনা করেছেন–

নবদ্বীপ হৈতে আইসে বিপ্রগণ যত।
কহিতে না পারি তা সবারে ভক্তি কত।।

–ভঃ রঃ ১/৫৯৭

শ্রীরামকেলি গ্রামে শ্রীরূপ ও সনাতন কিরূপ ঐশ্বর্য্য সমন্বিত ছিলেন তা ভক্তিরত্নাকরে বর্ণনা করেছেন–

গৌড়ে রামকেলি গ্রামে করিলেন বাস।
ঐশ্বর্য্যের সীমা অতি অদ্ভুত বিলাস।।
ইন্দ্রসম সনাতন রূপের সভাতে।
আইসে শাস্ত্রজ্ঞগণ নানা দেশ হৈতে।।
গায়ক বাদক নর্ত্তকাদি কবিগণ।
সর্ব্বদেশী সকলে নিযুক্ত সর্ব্বক্ষণ।।
নিরন্তর করেন অনেক অর্থ-ব্যয়।
কোনরূপে কার অসম্মান নাহি হয়।।
সদা সর্ব্বশাস্ত্রে চর্চ্চা করে দুইজন।
অনায়াসে করে দোঁহে খণ্ডন স্থাপন।।

✧ ✧ ✧

বাড়ীর নিকট অতি নিভৃত স্থানেতে।
কদম্ব কানন, রাধাশ্যাম কুণ্ড তা'তে।।
বৃন্দাবন লীলা তথা করয়ে চিন্তন।
না ধরে ধৈরজ নেত্রে ধারা অনুক্ষণ।।
শ্রীবিগ্রহ মদনমোহন সেবায় রত।
সদাখেদ উক্তি তাহা কহিব বা কত।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র বিহরে নদীয়া।
সদা উৎকণ্ঠিত তাঁর দর্শন লাগিয়া।।

ভঃ রঃ ১/৫৮৫-৬০৭

অতঃপর শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন এবং নদীয়া ছেড়ে চললেন শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে। এ কথা শুনে শ্রীরূপ পরম ব্যাকুল হয়ে উঠলেন, জীবনে আর শ্রীগৌরসুন্দরের রাতুল শ্রীচরণ যুগল দর্শন হবে না, বলে প্রাণটি বিদীর্ণ হতে লাগল, অন্তরে অন্তরে অন্তর্য্যামী শ্রীগৌরহরির অভয় পদে দারুণ বেদনার কথা নিবেদন করতে লাগলেন। ভক্তবৎসল প্রভু ভক্তের আহ্বানে আর স্থির থাকতে পারলেন না, ভক্তকে দেখা দিতেই হবে ভেবে, শ্রীগৌরসুন্দর কিছুদিন পুরীধামে থেকে পুনঃ গৌড় দেশাভিমুখে যাত্রা করলেন। ভক্তের আকর্ষণে ভগবান চঞ্চল হয়ে উঠেন। গৌড়দেশে শ্রীগৌরসুন্দর বিদ্যানগরে সার্ব্বভৌম পণ্ডিতের ভ্রাতা বিদ্যা বাচস্পতির ভবনে শুভবিজয় করলেন। তখন ভক্তগণের যেন হৃদয়ের অপহৃত মহাধনের পুনঃ প্রাপ্তি ঘটল, আনন্দের অবধি রইল না।

মহাপ্রভু কয়েকদিন বিদ্যানগরে অবস্থানের পর কুলিয়া নগরে শুভবিজয় করলেন।

কুলিয়া গ্রামেতে প্রভুর শুনিয়া আগমন।
কোটি কোটি লোক আসি কৈল দরশন।।
কুলিয়া গ্রামে কৈল দেবানন্দেরে প্রসাদ।
গোপাল বিপ্রের ক্ষমাইল শ্রীবাসাপরাধ।।
পাষণ্ডী নিন্দুক আসি' পড়িলা চরণে।
অপরাধ ক্ষমি তারে দিল কৃষ্ণ প্রেমে।।

চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১/১৫২-২৫৪

মহাপ্রভু কুলিয়া নগরে কয়েকদিন থেকে বহু পাপী তাপী জীবের উদ্ধার পূর্ব্বক প্রেমদান করলেন এবং সেখান থেকে শ্রীবৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করলেন, সঙ্গে সহস্র সহস্র লোক চলতে লাগলেন। অকস্মাৎ ভক্ত বৎসল প্রভুর মনে কি ভাবের উদয় হল, তিনি গৌড় রাজধানী রামকেলি গ্রামাভিমুখে চলতে লাগলেন—

ঐছে চলি আইলা প্রভু রামকেলি গ্রাম।
গৌড়ের নিকট গ্রাম অতি অনুপম।।
যাঁহা নৃত্য করে প্রভু প্রেমে অচেতন।
কোটি কোটি লোক আইসে দেখিতে চরণ।।

চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১/১৬৬-১৬৭

গৌড়াধ্যক্ষ বাদশাহ মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব প্রভাব শ্রবণ করে বিস্মিত হয়ে কর্ম্মচারীগণের প্রতি বলতে লাগলেন--বিনা দানে যার পিছে এত লোক চলেন, তিনি নিশ্চয় ঈশ্বর জানতে হবে। অতএব তাঁকে যদি কেহ কোন প্রকার হিংসাদি করে তবে তার উচিত শাস্তি প্রদান করা হবে। সেই মহাপুরুষ ইচ্ছামত ভ্রমণ করুক।

বাদশাহ শ্রীরূপের নাম দিয়েছিলেন দবির খাস। বাদশাহ পরিশেষে মহাপ্রভুর সম্বন্ধে দবির খাসকে জিজ্ঞাসা করলেন। শ্রীরূপ (দবির খাস) বলেন—

যে তোমার রাজ্য দিল যে তোমার গোসাঞা।
তোমার দেশে তোমার ভাগ্যে জন্মিলা আসিঞা।।
তোমার মঙ্গল বাঞ্ছে বাক্য সিদ্ধি হয়।
ইহার আশীর্ব্বাদে তোমার সর্ব্বত্রই জয়।।

—চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১/১৭৬-১৭৭

রাজা! তুমি তোমার মনকে জিজ্ঞাসা কর। তুমি নরাধিপ বিষ্ণু অংশ তুল্য। তোমার মনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সম্বন্ধে যে জ্ঞান হয় তাই প্রমাণ।

বাদশাহ বললেন—আমার মনে হয় শ্রীচৈতন্য সাক্ষাৎ ঈশ্বর এতে কোন সংশয় নাই। বাদশাহ এ কথা বলে দরবার গৃহ ত্যাগ পূর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। শ্রীরূপ (দবির খাস) নিজ গৃহে এলেন। শ্রীরূপ ও সনাতন দেখলেন বিধাতা যেন অকস্মাৎ সদয় হয়ে অসাধনে গৌর চিন্তামণি মিলিয়ে দিয়েছেন। মহাপ্রভু গঙ্গাতটে এক বকুল বৃক্ষের মূলে অবস্থান করলেন, মহাসংকীর্ত্তনের রোল দিক্ দিগন্তে মুখরিত হচ্ছিল, সন্ধ্যাগমনে তা বিরাম লাভ করল, ভক্তগণ মহাপ্রভুর চারিদিকে অবস্থান করছেন, এমন সময় সেই প্রাণের দেবতা শ্রীগৌরসুন্দরের অভয় পাদপদ্ম যুগল দর্শন বাসনায় ছদ্মবেশে সামান্য মাত্র বস্ত্র পরিধান করে শ্রীরূপ ও সনাতন দুই গুচ্ছ তৃণ মুখে ধরে প্রেম পুলকিত প্রেমাশ্রু স্মরণ নেত্রে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীচরণ যুগল মূলে। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর নিকট দুই ভাইয়ের কথা নিবেদন করে দুই ভাইকে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণে সমর্পণ করলেন। দুই ভাই মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম তলে পড়ে অতি দৈন্য ভরে স্তুতিপূর্ব্বক রোদন করতে লাগলেন।

''জগাই-মাধাই হৈতে কোটী কোটী গুণ।
অধম পতিত পাপী আমি দুইজন।।
ম্লেচ্ছজাতি, ম্লেচ্ছসঙ্গী, করি ম্লেচ্ছকর্ম্ম।
গো-ব্রাহ্মণ-দ্রোহি সঙ্গে আমার সঙ্গম।।
মোর কর্ম্ম মোর হাতে গলায় বান্ধিয়া।
কুবিষয় বিষ্ঠা-গর্ত্তে দিয়াছে ফেলিয়া।।"

তখন শ্রীগৌরসুন্দর তাঁদের ভূমি হতে উঠিয়ে বলতে লাগলেন—

—মহাপ্রভু কহে—শুন দবির খাস।
তুমি দুই ভাই—মোর পুরাতন দাস।।
আজি হৈতে দুহার নাম রূপ সনাতন।
দৈন্য ছাড় তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন।।
দৈন্য পত্রী লিখি মোরে পাঠালে বার বার।
সেই পত্রী দ্বারে জানি তোমার ব্যবহার।।
তোমার হৃদয় আমি জানি পত্র দ্বারে।
তোমা শিখাইতে শ্লোক কহিল বারে বারে।।

✧ ✧ ✧

গৌড় নিকটে আসিতে নাহি মোর প্রয়োজন।
তোমা দুঁহা দেখিতে মোর ইহাঁ আগমন।।
এই মোর মন কথা কেহ নাহি জানে।
সবে বলে কেনে আইলা রামকেলি গ্রামে।।
ভাল হৈল দুই ভাই আইলা মোর স্থানে।
ঘরে যাহ ভয় কিছু না করিহ মনে।।
জন্মে জন্মে তুমি দুই আমার কিঙ্কর।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার।।

—চৈঃ চঃ মধ্য ১/২০৭-২১৫

মহাপ্রভু দবির খাস (শ্রীরূপ) ও সাকর মল্লিককে (সনাতন) বিবিধ উপদেশ এবং প্রবোধ দিয়ে বিদায় করলেন। তাঁরা যাবার সময় বার বার মহাপ্রভুর শ্রীচরণ যুগল শিরে ধারণ ও প্রার্থনা করতে করতে সমস্ত গৌর ভক্ত অদ্বৈত আচার্য্য, শ্রীহরিদাস ও শ্রীগদাধর প্রভৃতির আশীর্ব্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক বিদায় হলেন, সকলে হরিধ্বনি পূর্ব্বক বললেন—তোমাদের কোন ভয় নাই মহাপ্রভুর কৃপা হয়েছে। অতঃপর ভক্তগণসহ শ্রীগৌরহরি কানাইর নাটশালাভিমুখে যাত্রা করলেন।

শ্রীরূপ ও সনাতন দুইজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বরণ পূর্ব্বক কৃষ্ণমন্ত্রে দুইটি পুরশ্চরণ করলেন, অচিরাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরণ আশ্রয় পাবার জন্য।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ পুরশ্চরণ সম্বন্ধে বলেছেন— "প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন—এই ত্রিকালে নিত্য পূজা, নিত্য জপ, নিত্য তর্পন, নিত্য হোম ও নিত্য ব্রাহ্মণভোজন—এই পঞ্চাঙ্গকে পুরশ্চরণ বলে। মন্ত্রসিদ্ধির জন্যই পুরশ্চরণের ব্যবস্থা, শ্রীনাম মহামন্ত্রের তাদৃশ পুরশ্চরণ বিধির অপেক্ষা করিতে হয় না। একবার নামের উচ্চারণফলেই যখন পুরশ্চর্য্যার প্রাপ্য সর্ব্বফল লাভ করে, তজ্জন্য শ্রীনামের পুরশ্চরণের অপেক্ষা নাই।"

শ্রীরূপ গোস্বামী রাজকার্য্য পরিত্যাগ করে যশোহরে ফতেয়াবাদে (মতান্তরে-- বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপে) নিজ গৃহে নৌকাতে করে বহুধন নিয়ে এলেন। সেই থেকে অর্দ্ধেক ধন ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবগণকে প্রদান করলেন। এক চতুর্থাংশ কুটুম্ব ভরণ পোষণের এবং এক চতুর্থাংশ ভবিষ্য কোন আপৎ কালাদির জন্য বিশ্বস্থ ব্রাহ্মণের কাছে রেখে দিলেন। গৌড় রামকেলিতে সনাতনের বন্ধন মোচনের জন্য দশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা মুদি ঘরে রেখে দিলেন।

অতঃপর শ্রীরূপ যখন শুনলেন শ্রীমহাপ্রভু বৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করছেন, তখন কাল বিলম্ব না করে ছোট ভাই অনুপমের সাথে তিনি বেড়িয়ে পড়লেন। শীঘ্র চলতে চলতে শ্রীরূপ অনুপমের সাথে প্রয়াগে পৌঁছালেন। প্রভুর দর্শন পেলেন। প্রভু চলেছেন শ্রীবিন্দুমাধব দর্শনে। লক্ষ লক্ষ লোক প্রভুর দর্শনের জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হচ্ছেন। দুই ভাই দূর থেকে প্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন।

অনন্তর এক দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ গৃহে আমন্ত্রিত হয়ে প্রভু সেখানে ভোজন করতে গেলেন, সেই সময় রূপ ও অনুপম প্রভুর সঙ্গে ঐ ব্রাহ্মণ গৃহে সাক্ষাৎভাবে মিলিত হলেন। দুই ভাই মহাপ্রভুর

শ্রীচরণ বন্দনা করতেই প্রভু রূপকে ভূমি হতে উঠিয়ে দৃঢ় আলিঙ্গন করলেন এবং শ্রীসনাতনের সমাচার জিজ্ঞাসা করলেন, শ্রীরূপ শ্রীসনাতনের যাবতীয় সমাচার প্রদান করলেন। তা শুনে মহাপ্রভু বললেন—সনাতনের শীঘ্রই বন্ধন মোচন হবে।

শুদ্ধাদ্বৈতবাদী পোষ্টী মার্গের আচার্য্য শ্রীবল্লভ ভট্ট তখন প্রয়াগে আড়াইল গ্রামে বসবাস করতেন, তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শনের জন্য দাক্ষিণাত্য বিপ্রগৃহে আগমন করলেন। বল্লভ ভট্ট দণ্ডবৎ করতেই প্রভু তাঁকে ধরে আলিঙ্গন করলেন। অতঃপর দুইজন কৃষ্ণকথা আলাপন করতে লাগলেন, কৃষ্ণকথায় মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হলেন কিন্তু ভট্টের সঙ্কোচে প্রভু প্রেম সম্বরণ করলেন। তারপর মহাপ্রভু বল্লভ ভট্টের নিকট শ্রীরূপের ও অনুপমের পরিচয় বললেন, তা শুনে বল্লভাচার্য্য রূপকে আলিঙ্গন করতে উঠলেন, রূপ অনুপম দুই ভাই দূরে পলায়ন করলেন এবং বললেন আমরা অস্পৃশ্য, ছুবেন না। এ কথা শ্রবণে বল্লভ ভট্ট বিস্ময়ান্বিত হলেন। মহাপ্রভুও পরীক্ষার জন্য বল্লভ ভট্টকে বললেন আপনি কুলীন বৈদিক ব্রাহ্মণ এদের ছুবেন না। বল্লভাচার্য্য বললেন এ দুয়ের মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম বিরাজমান, এরা অধম নয় সর্ব্বোত্তম।

দুঁহার মুখে কৃষ্ণনাম করিছে নর্ত্তন।
এই দুই অধম নহে হয় সর্ব্বোত্তম।।

—চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৯/৭১

বল্লভাচার্য্য অনন্তর মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করে নিজ গৃহে আড়াইল গ্রামে নৌকা করে নিয়ে এলেন, সঙ্গে শ্রীরূপ ও অনুপম ছিলেন। সেখানে ভোজনের অবশেষ রূপ ও অনুপমকে দিলেন। পুনঃ মহাপ্রভু রূপ ও অনুপমের সঙ্গে প্রয়াগে ফিরে এলেন। প্রভুর দর্শনের জন্য বহু লোকের ভিড় হ'তে লাগল। তা দেখে মহাপ্রভু রূপ ও অনুপমকে সঙ্গে নিয়ে নির্জ্জনে দশাশ্বমেধ ঘাটে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে বসে কৃষ্ণকথা বলতে লাগলেন।

কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্ব প্রান্ত।
সব শিখাইল প্রভু ভাগবত সিদ্ধান্ত।।

—চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৯/১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপকে প্রয়াগে শ্রীদশাশ্বমেধ ঘাটে শক্তিসঞ্চারপূর্ব্বক দশদিন অভিধেয় ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা দিয়েছেন। সেই শিক্ষাকে অবলম্বন করে শ্রীরূপগোস্বামিপাদ 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু' রচনা করেছেন। শুধু ভক্তিতত্ত্ব নয়—

''কৃষ্ণ-তত্ত্ব, ভক্তি-তত্ত্ব, রস-তত্ত্ব শাস্ত্র।
সব শিখাইল প্রভু ভাগবত-সিদ্ধান্ত।।"

চৈঃ চঃ

### শ্রীরূপ শিক্ষা

কালের প্রভাবে বৃন্দাবন রসকেলি বার্তা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সেই লীলা বিশেষরূপে বিস্তার করার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপ ও সনাতনকে কৃপামৃতের দ্বারা অভিষিক্ত করেছেন।

''প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে প্রেমস্বরূপে সহজাভিরূপে।
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে, তাতানুরূপে স্ববিলাসরূপে।।"

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক

—নিজের প্রিয়স্বরূপ, দয়িতস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, স্বাভাবিক মনোজ্ঞরূপ বিশিষ্ট এবং নিজের অনুরূপ—এরকম নিজের বিলাসরূপ শ্রীরূপগোস্বামীতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তিরসশাস্ত্র বিস্তার করেছিলেন।

''জলজা নবলক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ।
কৃময়ো রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষকম্।
ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবশ্চতুর্লক্ষাণি মানুষাঃ।।"

বিষ্ণুপুরাণ

—জলজন্তু ৯ লক্ষ, বৃক্ষ-প্রস্তরাদি স্থাবর ২০ লক্ষ, কৃমিসমূহ ১১ লক্ষ, পক্ষিসমূহ ১০ লক্ষ, পশুসমূহ

৩০ লক্ষ এবং মনুষ্যগণ ৪ লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করে থাকে। অর্থাৎ বিশ্বের অনন্তজীবগণকে ৮৪ লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করতে হয়।

কেশের অগ্রভাগকে শতভাগ করে তার শতাংশ সদৃশ স্বরূপই জীবের সূক্ষ্মস্বরূপ; জীব-চিৎকণ ও সংখ্যাতীত।

জীব দুই প্রকার—নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধ। নিত্যবদ্ধগণ আবার স্থাবর-জঙ্গম ভেদে দুই প্রকার। বৃক্ষ-প্রস্তরাদি অচল জীবসমূহ স্থাবর এবং পশুপক্ষি মনুষ্য আদি সকল জীবগণ জঙ্গম। জঙ্গমগণ তিনপ্রকার—তির্যক-পক্ষিগণ, জলচর ও স্থলচর প্রাণিসমূহ। স্থলচরগণের মধ্যে মানুষ অত্যন্ত অল্প-সংখ্যক। সেই অতি অল্প মানবগণের মধ্যে পশু প্রায় স্বভাব-বিশিষ্ট ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, শবর ও নাস্তিক বৌদ্ধদের বাদ দিলে বেদনিষ্ঠ মানুষ অবশিষ্ট থাকে। বেদনিষ্ঠ দুই প্রকার-ধর্মাচারী ও অধর্মাচারী। ধর্মাচারীদের মধ্যে অনেকেই কর্মনিষ্ঠ, কেউ বা জ্ঞাননিষ্ঠ। কোটি-জ্ঞাননিষ্ঠ মধ্যে বস্তুতঃ একজন মুক্ত; যাঁরা জড়বুদ্ধির কবল হতে নিষ্কৃতি পেয়েছেন, তাদেরকেই এখানে 'মুক্ত' বলা হয়েছে। সেই মুক্তগণের মধ্যে যিনি শ্রদ্ধালু হয়ে কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত তিনিই কৃষ্ণভক্ত। মুক্ত পর্যন্ত সকলেরই কামনা আছে, কিন্তু কৃষ্ণভক্তের কামনা নাই।

''কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী-সকলি অশান্ত।।''

চৈঃ চঃ

জীব আপন আপন কর্মসূত্রে ব্রহ্মাণ্ডে নানা-যোনিতে ভ্রমণ করছেন। তাদের মধ্যে যাঁর সুকৃতিরূপ ভাগ্যোদয় হয়, তিনি গুরু কৃষ্ণের কৃপায় ভক্তি-লতার বীজ যে 'শ্রদ্ধা' তা লাভ করেন এবং সেই বীজ পাওয়ামাত্র মালিস্বরূপ হয়ে নিজ হৃদয়ক্ষেত্রে তা রোপণ করেন। বীজ রোপিত হয়ে অঙ্কুরিত হতে হতে ভগবৎকথা ও ভক্তকথার শ্রবণ-কীর্তনরূপ জলে সেই ক্ষেত্রের সেচন করেন।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ।।
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন।।
উপজিয়া বাড়ে লতা 'ব্রহ্মাণ্ড' ভেদি' যায়।
'বিরজা', 'ব্রহ্মলোক' ভেদি' 'পরব্যোম' পায়।।
তবে যায় তদুপরি 'গোলক-বৃন্দাবন'।
'কৃষ্ণচরণ'-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ।।
তাঁহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেম-ফল।
ইঁহা মালী সেচে নিত্য শ্রবণকীর্ত্তনাদি-জল।।
যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতী মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তার শুখি' যায় পাতা।।
তাতে মালী যত্ন করি' করে আবরণ।
অপরাধ হস্তীর যৈছে না হয় উদগম।।
কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে 'উপশাখা'।
ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা, যত অসংখ্য তার লেখা।।
'নিষিদ্ধাচার', 'কুটীনাটী', 'জীবহিংসন'।
'লাভ', 'পূজা, 'প্রতিষ্ঠাদি' যত উপশাখাগণ।।
সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি' যায়।
স্তব্ধ হঞা মূলশাখা বাড়িতে না পায়।।
প্রথমেই উপশাখার করয়ে ছেদন।
তবে মূলশাখা বাড়ি' যায় বৃন্দাবন।।
'প্রেমফল' পাকি' পড়ে, মালী আস্বাদয়।
লতা অবলম্বি' মালী 'কল্পবৃক্ষ' পায়।।
তাঁহা সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন।
সুখে প্রেমফল-রস করে আস্বাদন।।
এই ত' পরম-ফল 'পরম-পুরুষার্থ'।
যাঁর আগে তৃণ-তুল্য চারি পুরুষার্থ।।

চৈঃ চঃ মঃ ১৯/১৫১-১৬৪

যে পর্যন্ত কৃষ্ণবশীকরণ সিদ্ধ ঔষধীরূপ দাস্যাদি

প্রেমের লেশমাত্র অন্তঃকরণপথের পথিক না হয়, সে পর্যন্ত সমৃদ্ধিশালিনী সিদ্ধি, সত্যাদি ধর্মমূলক সমাধিরূপ উৎকৃষ্ট ব্রহ্মানন্দ নিজ নিজ চাক্‌চিক্যে জীবকে চমৎকৃত করে।

তত্ত্বের আভাসে প্রেমের উৎপত্তি হয় না; শুদ্ধভক্তি হতেই প্রেমের উৎপত্তি হয়। শুদ্ধভক্তির সংজ্ঞা,—

''অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।।''

শুদ্ধভক্তির লক্ষণ এই,—শুদ্ধভক্তিতে শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী সেবার জন্য নিজ উন্নতিযাবতীয় অন্য কোন বাঞ্ছা থাকতে পারে না। কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন সেব্য ব্রহ্মপরমাত্মাদি স্বরূপের পূজা থাকতে পারে না। এই সমস্ত হতে বিমুক্ত হয়ে জীবনযাত্রায় যা ভক্তির অনুকূল, কেবলমাত্র তাই গ্রহণপূর্বক সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা কৃষ্ণানুশীলন করার নাম 'শুদ্ধভক্তি'।

সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা হৃষীকেশ-সেবনের নাম 'ভক্তি'। এই স্বরূপ লক্ষণময়ী ভক্তির দুইটি 'তটস্থ' লক্ষণ যেমন—ঐ শুদ্ধভক্তি সকল উপাধি হতেও মুক্ত থাকবে এবং কেবল কৃষ্ণপরা হয়ে স্বয়ং নির্মলা থাকবে এরূপ ভক্তিকেই 'আত্যন্তিক ভক্তিযোগ' বলা যায়। সেই ভক্তিযোগদ্বারা জীব গুণময়ী মায়াকে অতিক্রম করে শ্রীকৃষ্ণের বিমল প্রেমলাভ করেন।

ভুক্তিস্পৃহা, মুক্তিস্পৃহা—এই দুইটি পিশাচী, যে পর্যন্ত এরা কোন ব্যক্তির হৃদয়ে অবস্থান করে সে পর্যন্ত তার হৃদয়ে ভক্তিসুখের অভ্যুদয় হতে পারে না।

ভক্তির তিনটি অবস্থা—সাধনাবস্থা, ভাবাবস্থা ও প্রেমাবস্থা। শ্রবণ কীর্তনাদি নববিধ অঙ্গ প্রথমে সাধনভক্তিতেই ক্রিয়মাণ হয়। শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ-কীর্তন করতে করতে পূর্বোক্ত অনর্থসকল যত কমতে থাকে, ততই-শ্রদ্ধা-বৃত্তি ক্রমশঃ উচ্চভাব ধারণ করে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব বা রতি,—এই সকল নামে পরিচিত হয়। সাধন ভক্তি হতেই রতির উদয় হয়, শ্রবণ কীর্তনাদির অনুশীলনে সেই রতি যত গাঢ় হতে থাকে, ততই 'প্রেমাদি-নাম ধারণ করে; প্রেম ক্রমশঃ বৃদ্ধিক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব পর্যন্ত উন্নত হয়। উদাহরণ হচ্ছে—ইক্ষুরস-যেন রতিস্থানীয় বীজস্বরূপ তা যত গাঢ় হয়, ততই প্রথমে গুড়ত্ব, পরে খণ্ডসারত্ব, শর্করাত্ব, সিতামিছ্‌রীত্ব ও উত্তম মিছ্‌রীত্ব এই সকল অবস্থা লাভ করে। রতি হতে মহাভাব পর্যন্ত সমস্তই কৃষ্ণভক্তিরসে স্থায়িভাব বলে পরিচিত; রতিকেই সর্বত্র 'স্থায়িভাব' বলে থাকেন।

সেই স্থায়িভাবে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যাভিচারী--এই চারটি সামগ্রী মিলিত হলেই রসোদয় হয়। কৃষ্ণভক্তি-ব্যাপারে স্থায়িভাবে ঐ সকল সামগ্রী সংযুক্ত হলে 'কৃষ্ণভক্তিরস' হয়। স্থায়িভাবই রসোদ্দীপন কার্যে মুখ্য আধার। তার সাথে বিভাবাদি চারটি সামগ্রী সংযোজিত হয়। অতএব স্থায়িভাবই রসের 'মূল' বিভাবই রসের 'হেতু', অনুভাবই রসের 'কার্য', সাত্ত্বিকভাবও রসের 'কার্যবিশেষ' এবং সঞ্চারী বা ব্যভিচারী-ভাবসকলই রসের 'সহায়'।

রস মুখ্য গৌণ-ভেদে দুই প্রকার। মুখ্য রস ৫ প্রকার—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। গৌণ রস ৭ প্রকার--হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস। পাঁচ প্রকার মুখ্য রস স্থায়িভাবেই ভক্তের হৃদয়ে থাকে; সাত প্রকার গৌণ রস কারণ উপস্থিত হলে ভক্তের হৃদয়ে আগন্তুক ভাবে উদিত হয়।

যাঁর স্বরূপে যে রসের সেবা, তাঁর নিকট সেই রস সর্বোত্তম বলে বিবেচিত হয়; কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে রসসমূহের মধ্যে

তর-তমতা আছে। ‘তৃষ্ণা’ অর্থাৎ নিজসুখপর কর্মাগ্রহিতা এবং জ্ঞানিগণের কাম্য ব্রহ্মসাযুজ্য ও যোগিগণকাম্য ঈশ্বরসাযুজ্যমুক্তি কোন রসেই স্থান পায় না। শান্ত-রসে কৃষ্ণনিষ্ঠ’; দাস্যরসে নিষ্ঠা ও মমতা, সখ্যরসে নিষ্ঠা, মমতা ও বিশ্রম্ভভাব; বাৎসল্যে নিষ্ঠা, মমতা বিশ্রম্ভ ও স্নেহ এবং মধুর রসে বাৎসল্যের এই গুণচতুষ্টয়কে ক্রোড়ীভূত করে সর্বাঙ্গদ্বারা সর্বোতভাবে নিঃসঙ্কোচ-সেবা বিদ্যমান। সুতরাং মধুর-রস সর্বোত্তম; এটি আদি বা শৃঙ্গার-রস-নামেও খ্যাত।

কৃষ্ণরতি দুই প্রকার—ঐশ্বর্যজ্ঞানমিশ্রা ও কেবলা বা ঐশ্বর্যজ্ঞান হীনা। দ্বারকা ও মথুরায় এবং বৈকুণ্ঠসমূহে ঐশ্বর্য়জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি; সেকারণে সেখানে প্রেম সঙ্কুচিত; কিন্তু গোকুলে কৃষ্ণরতি—কেবলা, সেখানে গোপগোপীগণ কৃষ্ণের ঐশ্বর্য দর্শন করলেও তা মানতে চান না। শ্রীকৃষ্ণ এই কেবলা রতিরই বশীভূত।

-------

অতঃপর মহাপ্রভু শ্রীরূপকে বৃন্দাবনে যাবার আদেশ করে পরে পুরীধামে মিলিত হবার আদেশ করলেন। দুই ভাই বৃন্দাবনাভিমুখে চললেন। মহাপ্রভু বারাণসীর দিকে যাত্রা করলেন।

মহাপ্রভু যখন বারাণসীতে তপন মিশ্রের গৃহে অবস্থান-করছিলেন, সে সময় শ্রীসনাতন গৌড় থেকে পালিয়ে বন পথে বহু কষ্টে বারাণসীতে শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে উপস্থিত হলেন। মহাপ্রভু সনাতনকে দেখে পরম সুখী হলেন এবং দুই মাস কাশীতে থেকে শ্রীসনাতনকে শিক্ষা দিলেন। সনাতনকে মহাপ্রভু বৃন্দাবনে যাবার আদেশ দিয়ে নিজে পুরীধামের দিকে চললেন।

যখন সনাতন বৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করলেন, তখন শ্রীরূপ বৃন্দাবন থেকে গৌড়দেশ হয়ে পুরীর দিকে যাত্রা করলেন। শ্রীরূপ ক্রমে চলে এলেন কাশীতে। সেখানে তপন মিশ্র, চন্দ্রশেখর ও মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ তথা অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে ক্রমে রূপের ও অনুপমের মিলন হল। তপন মিশ্র শ্রীরূপের কাছে শ্রীসনাতনের মিলন বার্তা ও প্রকাশানন্দ সরস্বতীর উদ্ধার প্রভৃতির কথা বললেন, তা শ্রবণে শ্রীরূপ খুব আনন্দিত হলেন। দশ দিন শ্রীরূপ কাশীতে থেকে গৌড় দেশাভিমুখে যাত্রা করলেন।

শ্রীরূপ অনুপমের সঙ্গে গৌড়দেশে গঙ্গাতটে আগমন করতেই অকস্মাৎ অনুপম গঙ্গা প্রাপ্তি হলেন। শ্রীরূপ গৌড়দেশে কয়েক দিন অবস্থান করবার পর নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করলেন।

শ্রীবল্লভ (অনুপম) অপ্রকট হৈলা গঙ্গাতীরে।
নীলাচলে গেলা রূপ কিছুদিন পরে।।

—ভঃ রঃ ১/৬৬৯

শ্রীরূপ গোস্বামী বৃন্দাবন ধাম থেকেই একখানি কৃষ্ণলীলা নাটক রচনা আরম্ভ করেন। পথে চলতে চলতে কড়চা আকারে ঘটনাগুলি লিখতে লাগলেন। পথে গঙ্গাতটে ভ্রাতা অনুপমের গঙ্গা প্রাপ্তি হল, অনন্তর তিনি গৌড়দেশে এসে কয়েক দিন পরে নীলাচলে যাত্রা করলেন। চলতে চলতে উড়িষ্যার সত্যভামাপুর নামক গ্রামে এলেন, একরাত্র সে গ্রামে শ্রীরূপ অবস্থান করলেন। সেখানে রাত্রে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন স্বয়ং সত্যভামাদেবী এসে বলছেন—‘‘আমার নাটক পৃথকভাবে রচনা কর, আমার কৃপায় নাটক সুন্দর হবে।’’ এ স্বপ্ন দেখে শ্রীরূপ বুঝতে পারলেন সত্যভামাদেবী তার নাটক পৃথকভাবে বর্ণনা করতে আদেশ করছেন।

শ্রীরূপ নীলাচলে এলেন এবং শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কুটীরে পৌঁছালেন। শ্রীরূপ শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে দণ্ডবৎ করতেই তিনি বললেন—মহাপ্রভু

তোমার আগমন বার্ত্তা আমাকে বলেছিলেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুর শ্রীরূপকে অতিশয় আদরের সঙ্গে নিজের কুটীরে রাখলেন। মহাপ্রভুর প্রতিদিনের নিয়ম ছিল, তিনি শ্রীজগন্নাথদেবের উপল ভোগ দর্শন করে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কুটীরে আগমন করা। মহাপ্রভু হরিদাসের কুটীরে আজও এলেন। শ্রীরূপ মহাপ্রভুকে সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করলে হরিদাস ঠাকুর মহাপ্রভুকে বললেন--শ্রীরূপ আপনাকে দণ্ডবৎ করছেন। মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হবার পর শ্রীরূপকে আলিঙ্গন করলেন। শ্রীরূপ অতিশয় দৈন্য প্রকট করতে লাগলেন। অতঃপর মহাপ্রভু তাঁকে নিয়ে উপবেশন এবং কুশল প্রশ্ন ইষ্টগোষ্ঠাদি করবার পর শ্রীসনাতনের বার্তা জিজ্ঞাসা করলেন। শ্রীরূপ বললেন সনাতনের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি। আমি গঙ্গা পথে এসেছি, তিনি রাজপথে চলে গেছেন। প্রয়াগে শুনলাম তিনি বৃন্দাবনে গেছেন। তারপর আমি গৌড়দেশে ছোট ভ্রাতা অনুপমের সঙ্গে আসতেই গঙ্গাতটে অনুপমের অকস্মাৎ গঙ্গা প্রাপ্তি ঘটে। মহাপ্রভু অনুপমের গঙ্গা প্রাপ্তি শুনে বললেন—''অনুপমের শ্রীরাম নিষ্ঠা অতুলনীয়'' শ্রীরূপকে মহাপ্রভু শ্রীহরিদাসের সন্নিকটে থাকবার আদেশ করে স্বীয় বাসভবন গম্ভীরার দিকে চললেন।

অপর দিবস মহাপ্রভু সর্ব্ব ভক্তগণ সঙ্গে হরিদাস ঠাকুরের কুটীরে আগমন করলেন, শ্রীহরিদাস ও শ্রীরূপ মহাপ্রভুকে সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করলেন। শ্রীনিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য্যকে মহাপ্রভু বললেন তোমরা শ্রীরূপকে কৃপা কর। যাতে শ্রীরূপ ব্রজ রসতত্ত্ব বর্ণনা করতে পারে। মহাপ্রভু প্রতিদিন শ্রীহরিদাসের জন্য মন্দিরে প্রাপ্ত প্রসাদ নিয়ে দিতেন। শ্রীরূপের সঙ্গে শ্রীহরিদাস প্রভুর দেওয়া প্রসাদ অতিশয় আনন্দ ভরে গ্রহণ করতেন। তারপর ভক্তসঙ্গে মহাপ্রভু ইষ্টগোষ্ঠী করতে লাগলেন। স্বরূপ দামোদরের প্রতি লক্ষ্য করে মহাপ্রভু রূপের কথা বলতে লাগলেন-পূর্ব্বে রথযাত্রা কালে আমি ভাবাবিষ্ট ভাবে যে শ্লোক বলেছিলাম আজ সমুদ্রে স্নান করে রূপের কুটীরে এলে ঐ শ্লোকের প্রত্যুত্ত রজনক একটি শ্লোক চালে গোঁজা পেলাম।

''প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দী পুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি।।''

—পদ্যাবলীতে শ্রীল রূপগোস্বামী-কৃত শ্লোক

'হে সহচরি! আমার সেই অতিপ্রিয় কৃষ্ণ আজ কুরুক্ষেত্রে মিলিত হলেন, আমিও সেই রাধা; আবার আমাদের উভয়ের মিলন-সুখও তাই বটে; তথাপি এই কৃষ্ণের বনমধ্যে ক্রীড়াশীল মুরলীর পঞ্চমসুরে আনন্দপ্লাবিত যমুনার তীরবর্ত্তী বনের জন্য আমার চিত্ত স্পৃহা করছে।'

শ্লোক পড়ে আমি অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হলাম শ্রীরূপ আমার মনের খবর কি করে পেল। তদুত্তরে স্বরূপ দামোদর বললেন—

''যাতে এই শ্লোক দেখিলু।
তুমি কৈরাছ কৃপা তবঁহি জানিল।।

—চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ১/৯০

শ্রীরূপের লিখিত বিদগ্ধ মাধব নাটকের একটি পত্র হাতে নিয়ে প্রভু পড়ে অতিশয় ভাবাবিষ্ট হয়ে শ্রীরূপের হস্তাক্ষরকে স্তুতি করতে লাগলেন—

শ্রীরূপের অক্ষর যেন মুকুতার পাঁতি।
প্রীত হঞা করেন প্রভু অক্ষরের স্তুতি।।

—চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ১/৯৭

ভাবাবিষ্ট হৃদয়ে মহাপ্রভু শ্লোকটি পড়ছিলেন—
''তুণ্ডে তাণ্ডবিনীরতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলী লব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম।

চেতঃ প্রাঙ্গনসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়ানাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী।।"
—বিগদ্ধমাধব

'কৃষ্ণ' এই বর্ণ দুটি যে কত অমৃতময় তা বর্ণনার অতীত। দেখ, যখন (নটীর ন্যায়) তা তুণ্ডে (মুখে) নৃত্য করে, তখন বহু তুণ্ড (মুখ) পাবার জন্য রতি বিস্তার (আসক্তি বৃদ্ধি) করে, যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করে (অঙ্কুরিত হয়) তখন অর্বুদ (দশ কোটি) কর্ণের জন্য স্পৃহা জন্মায়। যখন চিত্তপ্রাঙ্গনে (সঙ্গিনীরূপে) উদয় হয়, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে বিজয় করে।

শ্রীহরিদাস তা শ্রবণ করে নৃত্য করতে করতে বলতে লাগলেন—আমি পূর্ব্বে শাস্ত্র ও সাধু মুখে অনেক নামের মহিমা শুনেছি কিন্তু শ্রীরূপের বর্ণনার সমান নাম মহিমা কোথাও শুনি নাই।

কৃষ্ণনামের মহিমা শাস্ত্র সাধু মুখে জানি।
নামের মহিমা ঐছে কাঁহা নাহি শুনি।।
—চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ১/১০১

আর একদিন মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, শ্রীস্বরূপ দামোদর, শ্রীরামানন্দ রায়, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগদাধর পণ্ডিত প্রভৃতির সঙ্গে শ্রীহরিদাসের কুটীরে এলেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুর শ্রীরূপের সাথে সকলকে বন্দনা করলেন। তারপর মহাপ্রভু সকলকে নিয়ে বসে ইষ্টগোষ্ঠী করতে করতে শ্রীরূপের বিদগ্ধমাধব নাটক ও ললিত মাধব নাটকের কথা উত্থাপন করলেন। হরিদাস সকলের কাছে ঐ দুই নাটকের ভূরী ভূরী প্রশংসা করতে লাগলেন। তা শুনে সার্ব্বভৌম পণ্ডিত ও রামানন্দ রায় নাটক-দ্বয়ের ভূমিকা প্রভৃতি শুনতে চাইলেন। শ্রীরূপ অতিশয় লজ্জা বশতঃ অবনত শিরে বসে রইলেন। মহাপ্রভু বললেন—লজ্জা কিসের? বৈষ্ণবগণ আদর করে শুনতে চাচ্ছেন যখন, তখন তুমি পাঠ করে শুনাও। প্রভুর আদেশে শ্রীরূপ গ্রন্থের নান্দী শ্লোক প্রভৃতি (বিদগ্ধমাধবের প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় শ্লোক) পাঠ করলেন।

"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ।।"

'সুবর্ণকান্তি সমূহ দ্বারা দীপ্যমান শচীনন্দন হরি তোমাদের হৃদয়ে স্ফুর্ত্তিলাভ করুন। তিনি যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উজ্জ্বলরস জগৎকে কখনও দান করেন নাই, সেই স্বভক্তি সম্পত্তি দান করবার জন্য কলিকালে অবতীর্ণ হয়েছেন।' তা শুনে ভক্তগণ বলতে লাগলেন—

কবিত্ব না হয় এই অমৃতের ধার।
নাটক লক্ষণ সর্ব্ব সিদ্ধান্তের সার।।
প্রেম পরিপাটী এই অদ্ভুত বর্ণন।
শুনি চিত্ত কর্ণের হয় আনন্দ ঘূর্ণন।।
—চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ১/১৯৩-১৯৪

এ ত কবিত্ব নয় যেন অমৃতের ধারা, নাটক লক্ষণ সব সিদ্ধান্তের সারস্বরূপ। এত প্রেম পরিপাটিযুক্ত বর্ণনা, যা শুনলে শ্রোতার কর্ণ মনের আনন্দ বর্দ্ধন করে। কালিদাসের কাব্যের মহিমা ততদিনই ছিল, যতদিন রূপগোস্বামীর অপ্রাকৃত রসযুক্ত কাব্যের প্রকাশ হয় নি।

মহাপ্রভু বললেন তোমরা সকলে রূপকে কৃপা কর। যাতে ব্রজলীলা প্রেমরস বর্ণনা করতে পারে। শ্রীরূপ সমস্ত গৌরভক্তগণের পাদপদ্ম বন্দনা ও কৃপা প্রার্থনা করলেন। সকলেই শ্রীরূপের প্রতি কৃপা আশীর্ব্বাদ দিলেন। এভাবে নীলাচলে ভক্ত সঙ্গে শ্রীরূপ দোলযাত্রা পর্য্যন্ত অবস্থান করবার পর মহাপ্রভু ও ভক্তগণ থেকে বিদায় নিয়ে গৌড় দেশাভিমুখে যাত্রা করলেন।






শ্রীরূপ গৌড়দেশে নিজ গৃহে কিছু আবশ্যকীয় কার্য্য পূর্ণ করে শীঘ্র বৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করলেন। শ্রীরূপের বৃন্দাবনে পৌঁছানোর পূর্ব্বেই শ্রীসনাতন নীলাচলের দিকে যাত্রা করলেন।

**শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের প্রকট**

শ্রীরূপ মহাপ্রভুর আজ্ঞা পালনার্থে বৃন্দাবনে গমন করলেন। মহাপ্রভুর নির্দ্দেশে লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার ও শ্রীবিগ্রহ সেবা প্রকাশ হচ্ছে না দেখে তিনি বড়ই চিন্তিত হলেন। বিগ্রহ গোবিন্দ কোথায় আছেন বনে বনে গৃহে গৃহে খোঁজ করতে লাগলেন কিন্তু কোথাও পেলেন না। একদিন যমুনার তটে বসে বিষণ্ণ হৃদয়ে ঐ চিন্তায় বিভোর হয়ে আছেন। এমন সময় একজন ব্রজবাসী শ্রীরূপের সন্নিকটে এলেন, ব্রজবাসী অল্পবয়স্ক সুন্দর মূর্ত্তিধারী, হাসতে হাসতে বললেন—হে স্বামিন্! আপনি এত দুঃখিত কেন? শ্রীরূপ গোপকুমারের মধুর সম্ভাষণ শুনে প্রাণে বড়ই সন্তোষ লাভ করলেন; তারপর শ্রীরূপ ব্রজবাসীর নিকট মহাপ্রভুর আদেশের কথা বললেন। গোপকুমার বললেন স্বামিন্! আমার সঙ্গে চলুন। শ্রীরূপ বললেন—হে গোপকুমার কোথায় যাব। স্বামিন্! যে বিগ্রহ সেবা প্রকাশের জন্য আপনি এত চিন্তাযুক্ত সে বাসনা পূর্ণ হবে। হে গোপকুমার! আমার আশা পূর্ণ হবে? নিশ্চয় হবে। আসুন আমার সঙ্গে। গোপকুমার শ্রীরূপকে নিয়ে গেলেন গোমাটিলায়। বললেন স্বামিন্! এ টিলাটিকে প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্নে এক গাভী এসে দুগ্ধ ধারায় স্নান করিয়ে যান। আপনি আগামী দিন পূর্ব্বাহ্নে এখানে এলে সাক্ষাৎ দর্শন পাবেন। এ গোমাটিলাতেই বিগ্রহ আছেন। এখন যা উচিত তা করুন আমি চললাম। শ্রীরূপ গোমাটিলাটির দিকে দৃষ্টিপাত করছিলেন পিছে ফিরে দেখলেন গোপকুমার অদৃশ্য। ভাবতে লাগলেন--কে এই গোপকুমার? মনে হয় প্রাণের আরাধ্য শ্রীগোবিন্দ। প্রেমে পুলকিত হয়ে শ্রীরূপ সেই গোমাটিলাটি উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। তারপর শ্রীরূপ নিজস্থানে ফিরে এলেন, পরদিবস প্রাতে সেই গোমাটিলা দর্শনে গেলেন, দেখলেন, এক অপূর্ব্ব সুরভী সেখানে আগমন করে স্খরিত দুগ্ধ-ধারায় টিলাটি স্নান করিয়ে চলে গেলেন। শ্রীরূপের সম্পূর্ণ বিশ্বাস হল, ঠাকুর এখানে আছেন। অতঃপর তিনি গোপপল্লীতে গিয়ে শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ গোপগণকে একত্রিত করে এ আখ্যান বললেন। গোপগণ বিস্ময়ান্বিত হয়ে কোদাল কুড়ুলাদি নিয়ে শীঘ্রই গোমাটিলায় এলেন; শ্রীরূপও এলেন। টিলার মাটি সামান্য মাত্র অপসারিত করতেই, কোটি মদন বিনিন্দিত শ্রীগোবিন্দ মূর্ত্তি দর্শন পেলেন। সকলের আর আনন্দের সীমা রইল না, মহানন্দে হরি হরি ধ্বনিতে দশদিক মুখরিত করে তুললেন। পুনঃ শ্রীগোবিন্দ প্রকট হ'লেন। শ্রীরূপ প্রেমাশ্রু নেত্রে শ্রীগোবিন্দ পাদমূলে দণ্ডবৎ করে বহু স্তব স্তুতি করতে লাগলেন। শীঘ্র এ বার্তা ব্রজের সমস্ত গোস্বামিদিগের কাছে জানালেন, গোস্বামিগণ আনন্দ সিন্ধুতে ভাসতে ভাসতে শ্রীগোবিন্দ পাদপদ্মে উপস্থিত হলেন।

শ্রীগোবিন্দদেবের প্রকট ধ্বনি হৈতে।
উল্লাসে অসংখ্য লোক যায় চারিভিতে।।
মিশাইয়া মনুষ্যে ব্রহ্মাদি দেবগণ।
পরম উল্লাসে করে গোবিন্দ দর্শন।।
তিলার্দ্ধেক লোক ভিড় নিবৃত্ত না হয়।
কোথা হৈতে আইসে কেহ লখিতে না পায়।।
গোবিন্দ প্রকট মাত্র শ্রীরূপ গোসাঞি।
ক্ষেত্রে পত্রী পাঠাইলা মহাপ্রভু ঠাই।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু পার্ষদ সহিতে।
পত্রী পড়ি আনন্দে না পারে স্থির হৈতে।।

—ভঃ রঃ ২/৪৩৩-৪৩৭

নীলাচলে শ্রীগৌরসুন্দর এ শুভ সংবাদ শ্রবণ মাত্রই গোবিন্দের সেবকরূপে শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতকে বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দিলেন।

গোবিন্দদেবের পুনঃ প্রাকট্যের পর প্রথমে পর্ণকুটীরে সেবিত হচ্ছিলেন। পরে শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর শিষ্য গোবিন্দের মন্দির নির্মান করিয়েছিলেন। ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে অম্বরাধিপতি রাজা মানসিংহ লাল পাথর দিয়ে অদ্ভুত কারুকার্য্য খচিত মন্দির প্রকাশ করেন। এটি হিন্দু স্থাপত্যের একটি অতুলনীয় নিদর্শন। গ্রৌজ সাহেব 'মথুরা' গ্রন্থে গোবিন্দজীউর মন্দির সম্বন্ধে লিখেছেন-- The temple of Gobinda Dev is not only the finest of this particular seres, but is the most impressive religious edifice that Hindu art has ever produced, at best in upper India.

মন্দিরটি সাত তলার সমান উচু ছিল। ঔরঙ্গদেব আগ্রা থেকে মন্দিরের চুড়া দেখতে পেয়ে কয়েকটি তলা ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। বর্তমানে শ্রীগোবিন্দজিউর মূল বিগ্রহ জয়পুরে অবস্থান করছেন।

যে সময় শ্রীরূপ ও সনাতন ব্রজধামে বাস করছিলেন, সে সময় ব্রজে ভারতের বিভিন্ন দেশ হতে প্রসিদ্ধ নামাচার্য্য, ভক্তগণ ও সন্ন্যাসিগণ ব্রজধামে বসবাস করেছিলেন, গুজরাট দেশের প্রসিদ্ধ ছিলেন বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমদ্ বল্লভাচার্য্য। সে সময় তিনিও ব্রজধামে বসবাস করছিলেন। দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী ব্রজ ধামে বাস করছিলেন, বঙ্গদেশের প্রসিদ্ধনামা ভূতপূর্ব্ব গৌড়ীয়েশ্বর শ্রীসুবুদ্ধি রায় তিনিও ব্রজধামে বাস করছিলেন। সেকালে ভারতের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও সন্ন্যাসিগণ ব্রজধামে আগমন করতেন।

শ্রীরূপ সনাতন ব্রজবাসিগণকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ পরিকর জ্ঞান করতেন; তাদের সঙ্গে সেইরূপ ব্যবহার করতেন। ব্রজবাসিগণ শ্রীরূপের ব্যবহারে একেবারেই বিমুগ্ধ। ব্রজবাসিগণ সকলেই শ্রীরূপ সনাতনকে আপন বুদ্ধি করতেন। গৃহের সুখ -দুঃখজনক যাবতীয় ব্যবহারিক কথা তাদের কাছে বলতেন ও সদুপদেশ চাইতেন। ব্রজগোপীগণ তাঁদের পুত্র প্রায় বোধ করতেন।

শ্রীরূপ ও সনাতন ব্রজের বিভিন্ন স্থানে থাকতেন। দুই ভাই একসঙ্গেও থাকতেন না। শ্রীসনাতন গোকুল মহাবনে; শ্রীরূপ মথুরায় বা বৃন্দাবনে নন্দঘাটাদিতে থাকতেন। তাদের সঙ্গী ছিলেন শ্রীলোকনাথ গোস্বামী, শ্রীভট্ট গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী ও শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভৃতি।

যেমন শ্রীরূপের কাছে গোবিন্দ দেব প্রকট হলেন, তেমনি শ্রীসনাতনের কাছে মদনমোহন প্রকট হলেন। শ্রীগোপাল ভট্টের কাছে শ্রীরাধারমণ ও শ্রীমধু পণ্ডিতের কাছে শ্রীগোপীনাথ প্রকটিত হলেন। যুগপৎ বহু ঠাকুর প্রকটিত হলেন। কৃষ্ণ পুনঃ ব্রজে নিত্য বিহার লীলা করতে লাগলেন।

**শ্রীজীবকে শাসন**

মহাপ্রভুর নির্দ্দেশমত শ্রীরূপ সনাতন গ্রন্থ লিখন কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। শ্রীরূপ বিদগ্ধ মাধব নাটক, ললিত মাধব নাটক ও অন্যান্য গ্রন্থ লেখার পর শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থ আরম্ভ করলেন। এই সময় একদিন শ্রীবল্লভাচার্য্য শ্রীরূপের সন্নিধানে আগমন করলেন, শ্রীরূপ তাঁকে দণ্ডবৎ প্রভৃতি করে বসতে আসন দিলেন। দুইজনে কিছুক্ষণ ইষ্টগোষ্ঠী করলেন। তারপর শ্রীরূপ ভক্তিরসামৃতের প্রথম বন্দনা শ্লোকটি বল্লভাচার্য্যের হাতে দিলেন, তিনি অনেক সময় দেখার পর বললেন— কোন কোন স্থানে কিছু অশুদ্ধি আছে। এ সময় শ্রীরূপের ছোট

ভাই শ্রীঅনুপমের পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী অল্পদিন হল বঙ্গ দেশ থেকে এসেছেন। তিনি শ্রীরূপের অঙ্গে বাতাস করছিলেন। তিনি ন্যায় বেদান্তাদি শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত ছিলেন। শ্রীবল্লভাচার্য্যের কথায় তিনি সুখী হলেন না। শ্রীবল্লভাচার্য্য যখন যমুনায় স্নান করতে এলেন তখন শ্রীজীব যমুনার জল আহরণ ছলে সে ঘাটে এলেন এবং শ্লোকে কোথায় অশুদ্ধি আছে জিজ্ঞাসা করলেন। বল্লভাচার্য্য ভুল প্রতিষ্ঠা করলে শ্রীজীব তা খণ্ডন করলেন। শ্রীজীবের পাণ্ডিত্য প্রতিভা দেখে বল্লভাচার্য্য আশ্চর্য্যান্বিত হলেন এবং পরাজয় স্বীকার করলেন। কিছুক্ষণ শ্রীজীব বল্লভাচার্য্যের সঙ্গে শ্লোক বিচারের পর জল নিয়ে কুটীরে ফিরে গেলেন। অল্পক্ষণ পরে শ্রীবল্লভাচার্য্য এসে শ্রীরূপকে সমস্ত ঘটনা বললেন এবং শ্রীজীবের বিদ্যা প্রতিভার প্রশংসা করলেন। শ্রীবল্লভাচার্য্য নিজ স্থানে চলে যাবার পর শ্রীজীবকে শ্রীরূপ গোস্বামী আহ্বান করলেন এবং বললেন—আমরা যাঁদের গুরু জ্ঞান করে দণ্ডবৎ প্রণামাদি করি তাঁদের তুমি দোষ বিচার করতে চাও? এটি অশিষ্টাচার। আমার হিতের জন্য তিনি আমাকে এমন কথা বলেছিলেন—তুমি তা সহ্য করতে পারলে না।

''এত অতি অল্প বাক্য সহিতে নারিলা''
তাহে পূর্ব্ব দেশ শীঘ্র করহ গমন।
মন স্থির হইলে আসিবা বৃন্দাবন।।

ভঃ রঃ ৫/১৬৪৩

একথা বলে শ্রীরূপ জীবকে গৃহে যাবার আদেশ দিলেন। শ্রীরূপের আজ্ঞায় শ্রীজীব পূর্ব্বদিকে চলতে মনস্থ করলেন, শ্রীরূপের কুটীর থেকে বাহির হলেন এবং শ্রীনন্দ রাজের কোন এক জীর্ণ মন্দিরে নিরাহারে পড়ে রইলেন এবং দুঃখে ক্রন্দন করতে লাগলেন। গ্রামের লোকজন ঐ সুন্দর বালককে নিরাহারে খেদ করতে দেখে সকলেই চিন্তান্বিত হলেন, এমন সময় সেখানে শ্রীসনাতন গোস্বামী এলেন, তার কাছে সকলে ঐ বালকের কথা বললেন। তিনি দেখলেন শ্রীজীব পড়ে আছে, নিরাহারে শরীর শুকিয়ে গেছে, তাকে এমত অবস্থায় দেখে অত্যন্ত করুণার্দ্র হৃদয়ে ভূমি থেকে উঠিয়ে স্নেহ করতে লাগলেন এবং সব কথা জিজ্ঞাসা করলেন, শ্রীজীব সব কথা বললেন। শ্রীসনাতন জীবকে অনেক প্রবোধ বাক্য বলে শ্রীরূপের কাছে গেলেন। শ্রীরূপ কথা প্রসঙ্গে জীবের কথা উঠালেন, তখন শ্রীসনাতন জীবের কথা বললেন। তা শুনে শ্রীরূপ শীঘ্রই জীবকে নিয়ে এলেন।

শ্রীজীবের দশা দেখি শ্রীরূপ গোসাই।
করিলেন শুশ্রূষা কৃপার সীমা নাই।।

ভঃ রঃ ৫/১৬৬৩

শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীজীবকে অতিশয় আদর পূর্ব্বক শুশ্রূষাদি করতে লাগলেন, শ্রীজীব সুস্থ হলে এবার তাঁর লিখিত সমস্ত গ্রন্থের সংশোধন করবার ভার দিলেন।

শ্রীরূপ যেমন শিশু শ্রীজীবকে কঠোর শাসন করেছেন, আবার তেমনি অতিশয় স্নেহ করেছেন। সদ্‌শিষ্যের ও সদ্‌গুরুর আদর্শ তারা জগতে প্রদর্শন করলেন।

### শ্রীবৃন্দাদেবীর আত্মপ্রকাশ

শ্রীগোবিন্দ, শ্রীমদনগোপাল ও যোগ-পীঠের পুনঃ আবির্ভাবের পর শ্রীরূপ গোস্বামী বৃন্দাদেবীর কথা চিন্তা করতে লাগলেন। এক রাত্রিতে বৃন্দাদেবী এসে শ্রীরূপকে বলছেন আমি ব্রহ্মকুণ্ডের তীরে আছি, তুমি সেখানে আমার দর্শন পাবে। শ্রীরূপ প্রাতঃকালে যমুনায় স্নান করে ভজন পূজনাদি সমাপ্ত করলেন। অনন্তর স্বপ্নের কথা চিন্তা করতে করতে ব্রহ্মকুণ্ডের তীরে এসে চারিদিকে দেখতে লাগলেন। হঠাৎ দেখলেন তীর দেশে সুবর্ণকান্তি-নিন্দিত এক

দিব্য নারী! তাঁর অঙ্গচ্ছটায় দশদিক আলোকিত এবং মাধুর্য্যে দশদিক্ স্নিগ্ধ। শ্রীরূপ গোস্বামী বুঝতে পেরে সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করে স্তুতি করতে লাগলেন--হে গোবিন্দ-সেবা সহায়িনী! গোবিন্দ বাঞ্ছা-পূর্ত্তিকারিণী! তোমাকে বারবার বন্দনা করি। এ ভাবে শ্রীবৃন্দাদেবীও পুনঃ প্রকট হলেন।

**শ্রীরাধারাণীর কৃপা**

শ্রীরূপ গোস্বামী সনাতন গোস্বামীকে এক সময় পরমান্ন ভোজন করানোর ইচ্ছা করলেন। দুধ ও শর্করা কোথায় পাবেন কোন ঠিক নাই। শ্রীরূপের কুটীরে একদিন শ্রীসনাতন গোস্বামী এলেন, শ্রীরূপ চিন্তা করছেন আজ শ্রীগোস্বামী এলেন কিন্তু খেতে দিব? ঠিক এমন সময় এক গোপবালিকা ঘৃত, দুগ্ধ, তণ্ডুল ও শর্করা নিয়ে শ্রীরূপকে ডাকতে লাগলেন--বাবা! বাবা! সিধা রাখুন। শ্রীরূপ শীঘ্র কুটীরের বাইরে এলেন, বালিকার হাত থেকে সিধাটি নিয়ে নিলেন। সিধা পাত্রটি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোপ বালিকা অন্তর্দ্ধান হলেন, তাঁকে আর না দেখে শ্রীরূপ বিস্ময়ান্বিত হলেন। তাঁর দ্রব্য দিয়ে পরমান্ন রন্ধন করে গিরিধারীর ভোগ দিয়ে সেই পরমান্ন শ্রীসনাতনকে দিলেন। তা খেয়ে শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রেমাবিষ্ট হলেন এবং শ্রীরূপকে কোথায় এসব সামগ্রী পেলে জিজ্ঞাসা করলেন। শ্রীরূপ সব কথা বললেন। তা শুনে শ্রীসনাতন বললেন "ঐছে ভক্ষ্য দ্রব্য চেষ্টা না করিহ আর" (ভঃ রঃ ৫/১৩২২) শ্রীরূপও খেদ যুক্ত হলেন, হায় হায় আমি শ্রীরাধারাণীকে দুঃখ দিলাম। স্বপ্নে শ্রীরাধারাণী রূপকে দেখা দিয়ে প্রবোধ দিলেন।

ভগবান্ ভক্তের জন্য সব কিছু করে থাকেন। তিনি ভক্ত বৎসল। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরূপ সনাতনের দ্বারা পুনঃ ব্রজধাম ও ব্রজ লীলা যেন জগতে প্রচার করলেন। শ্রীরূপ ও সনাতন মহাপ্রভুর পুত্রসম; নিজ হৃদয়ের কথা তাঁদের কাছে ব্যক্ত করে তাঁদের দ্বারা নিজাভীষ্ট পূর্ণ করলেন।

শ্রীরূপ গোস্বামীকে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বন্দনা করেছেন—

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
সোঽয়ং রূপ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্।।

যিনি পৃথিবীতে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মনোভীষ্ট পূর্ণ করেছেন, কবে সেই শ্রীরূপ গোস্বামী আমাকে নিজ পদান্তিকে স্থান প্রদান করবেন।

শ্রীরূপমঞ্জরী-পদ, সেই মোর সুসম্পদ,
সেই মোর ভজন-পূজন।
সেই মোর প্রাণ-ধন, সেই মোর আভরণ,
সেই মোর জীবনের জীবন।।
সেই মোর রসনিধি, সেই মোর বাঞ্ছাসিদ্ধি,
সেই মোর বেদের ধরম।
সেই ব্রত, সেই তপ, সেই মোর মন্ত্র জপ,
সেই মোর ধরম করম।।
অনুকূল হবে বিধি, সে পদে হইবে সিদ্ধি,
নিরখিব এ দুই নয়নে।
সে রূপমাধুরীরাশি, প্রাণ-কুবলয়-শশী,
প্রফুল্লিত হবে নিশিদিনে।।
তুয়া-অদর্শন-অহি, গরলে জারল দেহি,
চিরদিন তাপিত জীবন।
হা হা প্রভু! কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
নরোত্তম লইল শরণ।।

শ্রীরূপ ললিত মাধব নাটক রচনার পর তা শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীকে আস্বাদন করতে দিলেন। ললিত মাধব নাটকখানি বিপ্রলম্ভ রসাত্মক অর্থাৎ প্রবাস বর্ণন। গ্রন্থ পাঠ করে দাস গোস্বামী দিবারাত্র কৃষ্ণ বিরহে ক্রন্দন করতে লাগলেন।

গ্রন্থ পাঠে রঘুনাথ দিবানিশি কান্দে।
হইল উন্মাদ দুঃখে ধৈর্য্য নাহি বান্ধে।।

—ভঃ রঃ ৫/৭৬৮

সে সংবাদ শ্রবণে শ্রীরূপ গোস্বামী চিন্তান্বিত হলেন এবং দানকেলি কৌমুদী নামক এক খণ্ড কাব্য রচনা করে শ্রীরঘুনাথ দাসকে দিলেন এবং ললিত মাধব নাটকখানি সংশোধন করবার নাম করে নিয়ে নিলেন। শ্রীদাস গোস্বামী দানকেলি পড়ে অতিশয় সুখ লাভ করলেন।

শ্রীরূপ গোস্বামী কৃত গ্রন্থাবলী--শ্রীহংসদূত কাব্য, শ্রীউদ্ধব সন্দেশ, শ্রীকৃষ্ণ জন্ম তিথির বিধি, শ্রীবৃহৎ গণোদ্দেশ দীপিকা, শ্রীলঘু গণোদ্দেশ দীপিকা, স্তবমালা, বিদগ্ধমাধব, ললিত মাধব, দানকেলি কৌমুদী, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু, উজ্জ্বল নীলমণি, প্রযুক্তাখ্যাত চন্দ্রিকা, মথুরা মহিমা, পদ্যাবলী, নাটকচন্দ্রিকা ও লঘুভাগবতামৃত প্রভৃতি।

শ্রীরূপ গোস্বামিপাদের অপ্রকট তিথি শ্রাবণী শুক্লাদ্বাদশী শকাব্দ ১৪৮৬, খৃষ্টাব্দ ১৫৬৪, গৃহবাস ২২ বছর, ব্রজেবাস ৫১ বছর, প্রকট স্থিতি ৭৩ বছর মতান্তরে ৭৫ বছর।

**।। জয় শ্রীল রূপ গোস্বামী কি জয়।।**



# শ্রীসনাতন গোস্বামী

শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামী গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় লিখেছেন–

যা রূপমঞ্জরীপ্রেষ্ঠা পুরাসীদ্রতিমঞ্জরী।
সোচ্যতে নামভেদেন লবঙ্গমঞ্জরী বুধৈঃ।।
সাদ্য গৌরাভিন্নতনুঃ সর্ব্বারাধ্যঃ সনাতনঃ।
তমেব প্রাবিশৎ কার্য্যান্মুনিরত্নঃ সনাতনঃ।।

পূর্ব্বে যিনি রূপমঞ্জরীর প্রিয় 'রতিমঞ্জরী' ছিলেন, পণ্ডিতগণ যাঁকে 'লবঙ্গমঞ্জরীও' বলে থাকেন, তিনি এখন শ্রীগৌরাঙ্গের অভিন্নতনু, সকলের আরাধ্য 'শ্রীসনাতন গোস্বামী' হয়েছেন। মুনিরত্ন সনাতনও কোন কারণবশতঃ তাঁর মধ্যে প্রবেশ করেছেন।।

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে লিখিত আছে–শ্রীল সনাতন গোস্বামী আনুমানিক ১৪১০ শকাব্দে ১৫৪৪ সম্বৎ, ১৪৮৮ খৃষ্টাব্দ) আবির্ভূত হয়েছিলেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামীর বংশপরিচয় এই গ্রন্থেই শ্রীরূপ গোস্বামীর জীবনীতে ১৯৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী অল্পবয়সে অধ্যাপক শিরোমণি বিদ্যাবাচস্পতির নিকট সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন।

''শ্রীসনাতনের গুরু বিদ্যাবাচস্পতি।
মধ্যে মধ্যে রামকেলি গ্রামে তাঁর স্থিতি।।
সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যাঁর ঠাঁঞি।
যৈছে গুরুভক্তি কহি ঐছে সাধ্য নাঞি।।"

–ভক্তি রত্নাকর ১/৫৯৮-৫৯৯

'শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে' শ্রীল সনাতন গোস্বামীর পিতামহ মুকুন্দ কিভাবে মুসলমান বাদশাহের রাজকার্য্যে নিয়োজিত হয়েছিলেন এবং তাঁর অধস্তন ক্রমে শ্রীল সনাতন গোস্বামী এসেছিলেন তাঁর বর্ণনা পাওয়া যায়।–**"সুলতান বারবকশাহের রাজত্বকালে (১৪৬০-১৪৭০ খৃঃ) শ্রীল সনাতনের পিতামহ মুকুন্দ গৌড়ে রাজসরকারে প্রবেশ করেছিলেন। বারবকশাহ রাজ রক্ষার জন্য আবিসিনীয়া হতে বহু ক্রীতদাস ও খোজাকে এনে চাকুরী দিয়েছিলেন–এদেরকে 'হাবসী' বলে। বারবকশাহেব মৃত্যুর পর তার পুত্র ইউসুফ, ইউসুফের মৃত্যুর পর ফতেশাহ রাজা হন।**

**ফতেশাহের আমলে হাবসিরা চক্রান্ত করে তাকে হত্যা করে পাঁচ-ছয় বছর রাজত্ব করেন। শেষ হাবসিরাজার উজীর বা মন্ত্রী ছিলেন হুসেনশাহ। তিনিই পরে গৌড়ের বাদশাহ হন। ফতেশাহের সময়ে মুকুন্দ স্বধাম প্রাপ্ত হলে তাঁর জায়গায় সনাতন নিযুক্ত হন। হাবসীদের অনেক অত্যাচার সহ্য করে সনাতন হুসেন শাহের আমলে নিজের যোগ্যতায় উচ্চ রাজপদবী লাভ করেন। ক্রমশঃ তিনি প্রধান মন্ত্রী হন। শ্রীরূপ গোস্বামী উপমন্ত্রী বা অর্থমন্ত্রী হন। মুসলীম শাসক সনাতনের নাম দেন 'সাকর মল্লিক' এবং শ্রীরূপের নাম দেন 'দবীরখাস'।"**

শ্রীরূপ সনাতন গৌড়ের রাজধানী রামকেলিতে বাস করতে লাগলেন। দেশ-বিদেশ থেকে বড় বড় পণ্ডিত ব্রাহ্মণ তাঁদের গৃহে আগমন করতেন। কর্ণাটক থেকে ব্রাহ্মণগণ এলে তাঁদের থাকার বিশেষ ব্যবস্থা তাঁরা করতেন। গঙ্গার নিকট তাঁদের বসতবাটী স্থাপিত হওয়ায় আজও ঐ গ্রাম ভট্টবাটী নামে খ্যাত। নবদ্বীপ থেকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ রামকেলিতে এলে শ্রীরূপ সনাতন তাঁদের বিশেষ সেবা করতেন।

শ্রীরূপ সনাতনের অধ্যাপক ছিলেন–গৌড়ের



অলঙ্কার-স্বরূপ শ্রীবিদ্যাভূষণ পাদ। তাঁদের দর্শন-শাস্ত্রের গুরু—নবদ্বীপের সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি। এ ছাড়া তাঁদের শিক্ষক ছিলেন—শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্য, শ্রীরামপদ ভদ্রপাদ প্রভৃতি। ভাগবতে দশম-টিপ্পনীতে তাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম তিন ভাই শৈশব কাল থেকে ভগবদ্-ভক্তিভাব সম্পন্ন ছিলেন। তাঁরা গৃহ সন্নিকটে বৃন্দাবন-স্মৃতিতে সুরম্য তমাল, কদম্ব, যুথিকা ও তুলসী কানন তৈরী করেছিলেন ও তার মধ্যে রাধাকুণ্ড এবং শ্যামকুণ্ড নামক সরোবর খনন করে নিত্য শ্রীমদনমোহনদেবের সেবায় নিমগ্ন থাকতেন। তাঁরা লোক-পরম্পরায় শ্রীগৌরসুন্দরের চরিতাবলী শুনে তাঁর দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত হতেন। কিন্তু অন্তরে কে যেন বলত—তোরা ধৈর্য্য ধারণ কর। এখানেই সেই পতিতপাবন ঠাকুরের দর্শন পাবি।

শ্রীসনাতন গোস্বামীর বয়স তখন অল্প। একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখছেন—এক ব্রাহ্মণ তাঁকে একখানি শ্রীমদ্ভাগবত প্রদান করছেন। শ্রীসনাতন ভাগবত পেয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, স্বপ্ন ভঙ্গ হল। তিনি কাউকেও দেখতে পেলেন না; বড় দুঃখিত হলেন। সকাল বেলা স্নান পূজাদি সমাপ্ত করে তিনি বসেছেন। এমন সময় এক ব্রাহ্মণ একখানি ভাগবত নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন এবং বললেন—তুমি এই ভাগবত খানি নাও ও নিত্য অধ্যয়ন কর; সর্ব্বসিদ্ধি হবে। এ কথা বলে ব্রাহ্মণ তাকে ভাগবত দিয়ে চলে গেলেন। যথার্থ ভাগবত-প্রাপ্তিতে শ্রীসনাতনের আনন্দের সীমা রইল না। সে দিন থেকে শ্রীসনাতন শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রই একমাত্র সর্ব্বশাস্ত্র-সার জ্ঞানে অধ্যয়ন করতে লাগলেন।

মদেকবন্ধো মৎসঙ্গিন মদ্গুরো মন্মহাধন।।
মন্নিস্তারক মদ্ভাগ্য মদানন্দ নমোস্তুতে।।

— শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তব

শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের বন্দনা করে বলছেন —আমার একমাত্র সঙ্গী, একমাত্র বন্ধু, গুরু, মহাধন, আমার নিস্তারকারী, আমার ভাগ্যস্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার।

নদীয়ার প্রাণধন-শ্রীগৌরহরি সন্ন্যাসী হয়ে পুরী ধামে গেছেন এ সংবাদ শুনে শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ মূর্চ্ছিত হলেন। এ জীবনে আর তাঁর দর্শন পাবেন না বলে দুই ভাই কত খেদ করতে লাগলেন। এমন সময় দৈববাণী হল—''তোমরা দুঃখ ক'র না। করুণাময় গৌরহরি শীঘ্র আসছেন।'' দৈববাণী শুনে তাঁরা আশ্বস্ত হলেন।

পাঁচ বছর সুখে পুরীতে অবস্থান করে জননী ও গঙ্গা দর্শনের জন্য মহাপ্রভু গৌড় দেশে আগমন করলেন। ভক্তগণের সুখের সীমা রইল না; বহুদিন পরে গৌরকে পেয়ে শ্রীশচীমাতা সুখে দেহ-স্মৃতি-রহিত হলেন। তিনি কয়েক দিন রন্ধন করে গৌরসুন্দরকে খাওয়ালেন। প্রভু শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য ভবনে কয়েক দিন সুখে থাকবার পর রামকেলি গ্রামে গেলেন।

ঐছে চলি আইলা প্রভু রামকেলি গ্রাম।
গৌড়ের নিকট গ্রাম অতি অনুপম।।
যাঁহা নৃত্য করে প্রভু প্রেমে অচেতন।
কোটি কোটি লোক আইসে দেখিতে চরণ।।

—চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১/১৬৬-১৬৭

মহাপ্রভুর প্রভাব শুনে বাদশা হুসেন শাহ বলতে লাগলেন—

বিনা দানে এত লোক যাঁর পাছে হয়।
সেই ত' গোসাঞী ইহা জানিহ নিশ্চয়।।

কাজী যবন ইহার না করিহ হিংসন।
আপন ইচ্ছায় বুলুন যাঁহা উহার মন।।
—চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১/১৬৯-১৭০

মহাপ্রভুর শুভাগমনে রামকেলি গ্রাম আনন্দে মুখরিত হল। চতুর্দ্দিক থেকে লোক মহাপ্রভুকে দেখতে আসতে লাগলেন। কেশব ছত্রী বাদশার বিশিষ্ট প্রতিনিধি। বাদশা তাঁকে প্রভুর সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করলেন। কেশব ছত্রী বললেন—হ্যাঁ শুনেছি একজন ভিখারী সন্ন্যাসী এসেছেন; তাঁর সঙ্গে দু'চারজন লোক আছে। বাদশা বললেন--আপনি কি বলছেন? সহস্র সহস্র লোক তাঁর সঙ্গে চলছে। এ কথা শুনে কেশব ছত্রী একটু হাস্য করলেন। ছত্রীর কথায় বাদশার মন প্রসন্ন হল না। তিনি শ্রীসনাতনকে জিজ্ঞাসা করলেন। সনাতন বললেন--তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করছ কেন? তোমার মনকে জিজ্ঞাসা কর।

''যে তোমারে রাজ্য দিল সে তোমার গোসাঞা।
তোমার দেশে তোমার ভাগ্যে জন্মিল আসিঞা।।"
—চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১/১৭৬)

তুমি সাক্ষাৎ দর্শন কর। মানুষের কি এরূপ শক্তি ও আকর্ষণ থাকতে পারে? এরূপ মহা আকর্ষণ করবার শক্তি ঈশ্বর ছাড়া কারও থাকে না। বাদশা শ্রীসনাতনের কথা শুনে বড় সুখী হলেন ও তিনি (মহাপ্রভু) স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করুন ব'লে সকলকে জানালেন।

গঙ্গাতটে এক বৃক্ষমূলে মহাপ্রভু উপবেশন করেছেন। সঙ্গে মাত্র প্রিয় পার্ষদবৃন্দ। ক্রমেই সন্ধ্যাকাল অতীত হতে চলল। এ-সময় সনাতন ও রূপ দু-ভাই দুই গুচ্ছ তৃণ দন্তে ধরে মহাপ্রভুর সামনে দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন। অন্তর্য্যামী মহাপ্রভু তাঁদের দেখে চিনতে পারলেন। প্রভু করুণার্দ্র হৃদয়ে দু-ভাইকে ভূমি থেকে উঠিয়ে দৃঢ় আলিঙ্গন করলেন এবং বললেন পূর্ব্বে তোমরা যে বার বার দৈন্য-পত্র আমাকে লিখেছিলে তাতে তোমাদের স্বভাব জেনেছি। তোমরা দুই ভাই জন্মে জন্মে আমার দাস। তোমাদের জন্য আমি রামকেলিতে এসেছি। আজ থেকে তোমাদের নাম হবে—শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ। বাদশা পূর্ব্বে তাঁদের নাম দিয়েছিলেন দবিরখাস ও সাকর মল্লিক। তারপর শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ সমস্ত গৌর-পার্ষদগণের চরণে কৃপা প্রার্থনা করলেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীবাস আদি ভক্তগণ দুই ভাইকে প্রচুর আশীর্ব্বাদ প্রদান করলেন। অনন্তর শ্রীসনাতন ও রূপের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীঅনুপম পুত্র শ্রীজীব পরিবারবর্গের সঙ্গে প্রভুর শ্রীচরণ দর্শন, বন্দনাদি করলেন। শ্রীজীব তখন শিশু। প্রভু তাঁর শিরে কর পদ্ম ধারণ করে ও শ্রীচরণ-রজ দিয়ে যেন ভবিষ্যৎ আচার্য্য-সম্রাটরূপে তাঁকে বরণ করলেন। ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু শ্রীগৌরহরি এইরূপে ভক্তবাসনা পূর্ণ করে পুরীর দিকে যাত্রা করলেন ও শ্রীসনাতন রূপকে আশীর্ব্বাদ করে গেলেন--''শীঘ্র সংসার বন্ধন থেকে কৃষ্ণ তোমাদের মুক্ত করে দিবেন।" শ্রীসনাতনের পিতৃদত্ত নাম ছিল অমর, শ্রীরূপের-সন্তোষ এবং অনুপমের -বল্লভ।

মহাপ্রভু রামকেলি থেকে চলে যাবার পর শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ প্রভুর শ্রীচরণ-প্রাপ্তির জন্য দুইটি পুরশ্চরণ করলেন। পরিবারবর্গকে তাঁরা চন্দ্রদ্বীপে ও ফতেয়াবাদে প্রেরণ করলেন। শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম কিছু ধন রামকেলিতে শ্রীসনাতনের জন্য রেখে আর সব নৌকায় ভরে ফতেয়াবাদে নিয়ে গিয়ে সেই ধনের কিছুটা স্বজন এবং নিজ পরিবার বর্গের জন্য রাখলেন।

মহাপ্রভুর সংবাদ গ্রহণের জন্য যাঁদের নিযুক্ত করা হয়েছিল তাঁরা এসে মহাপ্রভুর বৃন্দাবন অভিমুখে

যাত্রার কথা শ্রীরূপকে বললেন। তিনি শুনে পরম সুখী হলেন এবং অনুপমকে সঙ্গে নিয়ে মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলনের জন্য চললেন। দুইভাই চলতে চলতে প্রয়াগে এলেন। সেখানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শন লাভ করলেন। প্রয়াগে প্রভুর দর্শনের জন্য লোকের এত ভিড় যে সারাদিন দর্শনের অবকাশ হল না। সন্ধ্যাকালে গঙ্গাতটে প্রভুকে দর্শন করে দুই ভাই দৈন্য-ভরে দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন। প্রভু দেখেই চিনতে পারলেন। ভূমি থেকে উঠিয়ে আলিঙ্গন করে সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁরা শ্রীসনাতনের ও অন্যান্য যাবতীয় সংবাদ বললেন। মৃদু হাস্য করে প্রভু বললেন—“শ্রী সনাতনের বন্ধন মুক্তি হবে।” ত্রিবেণীতে মহাপ্রভুর সন্নিকটে শ্রীরূপ ও অনুপম অবস্থান করতে লাগলেন ও তাঁর উপদেশ শুনতে লাগলেন। তখন শ্রীবল্লভাচার্য্য ত্রিবেণীর পর-পারে আড়াইল গ্রামে বাস করতেন। একদিন তিনি প্রভুকে আমন্ত্রণ করে নিজগৃহে নিয়ে যান। প্রভুর সঙ্গে শ্রীরূপ ও অনুপম গেলে মহাপ্রভু শ্রীবল্লভাচার্য্যের কাছে শ্রীরূপের পরিচয় করিয়ে দিলে শ্রীবল্লভাচার্য্য তাঁদের আলিঙ্গন করতে উদ্যত হন। কিন্তু তাঁরা দৈন্য করে দূরে সরে যান। তা দেখে বল্লভাচার্য্য পরম সুখী হলেন। প্রভু ছলনা করে বললেন—আপনি এঁদের স্পর্শ করবেন না, এরা অধম। তদুত্তরে বল্লভাচার্য্য বললেন--“এ দুই অধম নহে, সর্ব্বোত্তম। এঁদের বদনে সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম নৃত্য করছে।” দুই ভাই আচার্য্যকে দণ্ডবৎ করলে আচার্য্য তাঁদের স্নেহে আলিঙ্গন করলেন এবং বহু প্রশংসা করতে লাগলেন।

মহাপ্রভু ত্রিবেণীতে অত্যধিক লোকের ভিড় দেখে দশাশ্বমেধ ঘাটে এলেন। সেখানে দশদিন অবস্থান করে শ্রীরূপ গোস্বামীকে যাবতীয় ভাগবত তত্ত্ব-সার উপদেশ দেন—

প্রভু কহে শুন রূপ ভক্তিরসের লক্ষণ।<br>
সূত্র-রূপে কহি বিস্তার না যায় বর্ণন।।<br>
পারাপার শূন্য গভীর ভক্তিরস-সিন্ধু।<br>
তোমায় চাখাইতে তার কহি একবিন্দু।।

—চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৯/১৩৬-১৩৭

মহাপ্রভু বললেন--হে রূপ! তোমার কাছে ভক্তিরসের লক্ষণ সকল সূত্রাকারে বলছি তা শুন। কোটি জ্ঞানীর মধ্যে একজন মুক্ত শ্রেষ্ঠ, কোটি মুক্ত মধ্যে এক কৃষ্ণ-ভক্ত শ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম ও শান্ত। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি অশান্ত--ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ কামী। জীবের স্বরূপ অতি সূক্ষ্ম। জীব চিৎকণ ব্রহ্মের অনুশক্তি। জীব সুকৃতি-ফলে সাধু সঙ্গ পেলে স্বরূপ-জ্ঞান লাভ করতে পারে। ভব বন্ধন তখন নাশ হয়। সদ্গুরু-কৃপায় জীব ভক্তি লতার বীজ “শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্র” প্রাপ্ত হয়। সে বীজ হৃদয়ক্ষেত্রে বপন করে নিত্য শ্রবণ কীর্ত্তন জল সেচন করতে থাকলে, ভক্তিলতা বর্দ্ধিত হয়ে পত্র পুষ্পাদিতে সুশোভিত হয়। ব্রহ্মলোক বৈকুণ্ঠ ভেদ করে গোলোকে পৌঁছে, ভজনকারী মালী তথায় সুখে প্রেম-ফল আস্বাদন করতে পারে। ভক্তির তিনটা অবস্থা--সাধন, ভাব ও প্রেম। প্রেমভক্তি যত গাঢ় হয় তত স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব উৎপন্ন হয়। ভক্তিভেদে রতি পাঁচ প্রকার। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রতি। শান্ত ভক্ত নবযোগেন্দ্র ও সনকাদি। দাস্য ভক্ত--ব্রহ্মা, শিব, নারদ, ব্রজে রক্তক পত্রকাদি। সখ্য ভক্ত— অর্জ্জুন, ভীম ও ব্রজে সুবল শ্রীদামাদি। বাৎসল্য-ভক্ত বসুদেব, দেবকী, নন্দ ও যশোদা। মধুর ভক্ত—ব্রজে গোপীগণ। দ্বারকায় রুক্মিণী সত্যভামাদি। “এই ভক্তি-রসের করিলাম দিগ্দরশন। ইহার বিস্তার

মনে করিহ ভাবন।। ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ স্ফুরয়ে অন্তরে। কৃষ্ণ কৃপায় অজ্ঞ পায় রস-সিন্ধু পারে।।”--চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৯/২৩৪-২৩৫

মহাপ্রভু শ্রীরূপকে এই সমস্ত উপদেশ দেবার পর তাঁকে বৃন্দাবনে যেতে আদেশ করলেন। তিনিও বারাণসীর দিকে যাত্রা করলেন। শ্রীরূপ ও অনুপম দুই ভাই প্রভুর বিচ্ছেদে ব্যথিত হৃদয়ে বৃন্দাবনের দিকে চলতে লাগলেন।

রূপ গোস্বামী হঠাৎ করে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে মহাপ্রভুর চরণে নিজেকে সমর্পণ করেন এবং মহাপ্রভুর কাছে চলে যান। এদিকে সনাতনও রাজসভায় যাওয়া বন্ধ করে দেন। বাদশাহকে চিঠি লেখেন তিনি অসুস্থ। একদিন অসুস্থ সনাতনকে দেখ বার জন্য বাদশাহ সনাতনের গৃহে গেলে দেখেন যে সনাতন অনেকজন পণ্ডিতকে নিয়ে শাস্ত্র আলোচনা করছেন। বাদশাহ অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, ‘তোমার ভাই সব ছেড়ে পলিয়েছে। তুমিও রাজকার্য বন্ধ করে দিয়েছো। তাহলে আমি কাকে নিয়ে চলব।’ সনাতন গোস্বামী বাদশাহকে জানিয়ে দিলেন, ‘আমার দ্বারা রাজকার্য পরিচালনা করা আর সম্ভব নয়।’ বাদশাহ ভীষণ রেগে গেলেন এবং সনাতনকে বন্দী করার আদেশ দিলেন। কিছুদিন পরে বাদশাহ উড়িষ্যা রাজ্যে যুদ্ধ করতে চলে যান। সনাতন জেলেই বন্দী হয়ে থেকে গেলেন।

একদিন হঠাৎ করে সনাতনের কাছে এক গোপন চিঠি আসে। চিঠিটি পাঠিয়েছেন শ্রীরূপ গোস্বামী। চিঠি পড়ে সনাতন গোস্বামী জানতে পারলেন তাঁর মুক্তির জন্যে শ্রীরূপ গোস্বামী এক মুদি দোকানে অর্থস্বরূপ দশ হাজার মুদ্রা রেখে দিয়েছেন। এই অর্থের সাহায্যে কারারক্ষীকে বশীভূত করে জেল থেকে তিনি অনায়াসেই মুক্তি লাভ করে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর চরণ দর্শন করতে পারবেন। পত্রপাঠ করে সনাতন গোস্বামী আনন্দিত হলেন।

কারারক্ষক অর্থাৎ জেলের পাহারাদার ছিলেন মুসলমান। তাই সনাতন গোস্বামী তাকে তার ভাষাতেই বোঝাতে লাগলেন, ‘হে কারারক্ষী! তোমাকে দেখে জিন্দাপীর (সিদ্ধ মহাপুরুষ) মনে হচ্ছে। কেতাব, কোরআন প্রভৃতি শাস্ত্রে তোমার বিপুল জ্ঞান রয়েছে। তুমি যদি কোনো একজনকে এই কারাগার থেকে মুক্ত করে দাও তার পরিবর্তে খোদা তোমাকে এই জগতের বদ্ধদশা হতে মুক্ত করে দিবেন। আর দেখ আমি পূর্বে তোমার উপকার করেছিলাম। তার বদলে তুমি আমাকে এই কারাগার হতে মুক্ত করে দাও। পরিবর্তে আমি তোমাকে পাঁচ হাজার মুদ্রা দেব। এতে তোমার পূণ্যও হবে, অর্থলাভও হবে।’

এই কথা শুনে মুসলিম কারারক্ষক বললেন, ‘ওহে মহাশয়! তোমাকে ছেড়ে দিতে আমারও মন চায়, কিন্তু বাদশাহ্ তো তাহলে আমায় ছেড়ে দিবেন না।’ উত্তরে সনাতন বললেন, ‘তুমি বাদশাহ-এর ভয় কোরো না। তিনি যুদ্ধ করতে গিয়েছেন, ফিরে আসতেও পারেন আবার নাও পারেন। আর যদি ফিরে আসেন তাহলে বাদশাহ-কে বলবে, ‘সনাতন গঙ্গার নিকটে মলত্যাগ করতে গিয়েছিল; আমি সঙ্গে ছিলাম। তার হাতে বেড়ীও ছিল। কিন্তু গঙ্গা দেখেই সনাতন গঙ্গায় ঝাঁপ দিল। আমি অনেক অনুসন্ধান করেও তাঁকে খুঁজে পেলাম না। স্রোতের টানে কোথায় চলে গেছে কিছুই ঠিক করতে পারলাম না। হাতে বেড়ী ছিল, বোধ হয় সাঁতার দিতেও পারেনি। হয়তো গঙ্গাগর্ভেই ডুবে মরেছে।’ এই সব কথা বললে বাদশাহ ভাববে আমি মরে গেছি আর তোমাকেও শাস্তি দিবে না। তুমি কোনো চিন্তা করো

না। বাদশাহ আমাকে আর কোনোদিনও দেখতে পাবে না। আমি দরবেশ হয়ে মক্কায় চলে যাব।

সনাতন দেখলেন কারারক্ষকের মন তাতেও প্রসন্ন নয়। তাই তিনি কারারক্ষককে সাত হাজার মুদ্রা দিতেও রাজি হলেন। কারারক্ষকের মন ফিরে গেল এবং রাতের অন্ধকারে সনাতনকে কারাগার থেকে মুক্ত করে গঙ্গা পার করে দিলেন। ভৃত্য ঈশানকে সঙ্গে নিয়ে সনাতন অতি সাবধানে দিনরাত চলতে চলতে পাত্ড়া নামক পর্বতে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি পর্বত পার হবার জন্য ভুঁইয়ার সাহায্য প্রার্থনা করলেন। ভুঁইয়ার সাথে একজন হাতগনিতা ছিলেন। সে সনাতনকে দেখেই ভুঁইয়ার কানে কানে বলতে লাগল যে, এর কাছে আটটি স্বর্ণমুদ্রা রয়েছে। এ কথা শোনামাত্রই ভুঁইয়া মনের আনন্দে সনাতনকে পর্বত পার করে দিতে সম্মত হলেন। বললেন রাতের বেলা পর্বত পার করে দিব, এখন আপনি ভোজন করুন। ভুঁইয়া অনেক আদর যত্ন করে সনাতনের সমস্ত ভোজনের ব্যবস্থা করলেন। সনাতন ভোজনের পর চিন্তা করলেন 'এই ভুঁইয়া আমাকে এত সম্মান করছে কেন? আমি তো দরিদ্রের ছদ্মবেশে এসেছি আর আমার কাছে কোনো টাকা পয়সাও নেই। তাহলে কী ঈশানের কাছে কিছু আছে?' এই ভেবে ঈশানকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি কিছু নিয়ে এসেছ?' উত্তরে ঈশান বলল, 'হ্যাঁ প্রভু, আমার কাছে সাতটি স্বর্ণমুদ্রা রয়েছে।' শোনামাত্রই সনাতন তাকে ভর্ৎসনা করে বলল, 'এই কালযমকে সাথে কেনো এনেছো?' তিনি সাথে সাথে ঈশানের কাছ থেকে সাতটি স্বর্ণ মুদ্রা নিয়ে ভুঁইয়ার হাতে দিয়ে বললেন যে, 'তুমি এইগুলি রাখো এবং আমাকে পর্বত পার করে দাও।' ভুঁইয়া হেঁসে বললেন, 'আমি আগে থেকেই জানি তোমার কাছে আটটি মুদ্রা রয়েছে এবং রাতের অন্ধকারে আমি তোমাকে মেরে সেই মুদ্রাগুলো নিয়ে নিতাম। তা ভালোই হলো আমি পাপ করার হাত থেকে বাঁচলাম। তোমাকে আমি বিনামূল্যে পর্বত পার করে দিব।' সনাতন বললেন, 'তুমি যদি এগুলো না নাও তবে অন্যকেউ এই মুদ্রার লোভে আমাকে মারার পরিকল্পনা করবে। আমি আবার বিপদে পড়ব। অতএব এই মুদ্রাগুলি তুমি নিয়ে আমায় আগত বিপদের হাত থেকে রক্ষা করো।'

ভুঁইয়া রাতের বেলা চারজন প্রহরীকে নিয়ে সনাতন এবং ঈশান কে পর্বত পার করে দিলেন। পর্বত পার হয়ে সনাতন পুনরায় ঈশানকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কাছে কি আরও কিছু স্বর্ণমুদ্রা অবশিষ্ট আছে?' কারণ সনাতন পূর্বেই ভুঁইয়ার কাছ থেকে শুনে নিয়েছেন যে ঈশানের নিকট আটটি স্বর্ণমুদ্রা আছে। ঈশান বলল, 'হ্যাঁ, আমার কাছে এখনও একটি স্বর্ণমূদ্রা অবশিষ্ট রয়েছে।' এইকথা শোনামাত্রই সনাতন আদেশ স্বরূপ ঈশানকে বললেন, 'তবে তুমি সেই মুদ্রা নিয়ে এখনই দেশে ফিরে যাও।'

অবশেষে সনাতন গোস্বামী হাতে করোয়া (জলপাত্র) এবং ছেঁড়া কাঁথা সম্বল করেই একা একা চলতে চলতে হাজিপুরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে তাঁর ভগ্নিপতি শ্রীকান্ত থাকতেন। শ্রীকান্ত তাঁকে একটি ভোট কম্বল দিয়ে গঙ্গাপার করে দিলেন। কিছুদিন পরে সনাতন বারাণসী এসে শুনলেন মহাপ্রভু সেখানে চন্দ্রশেখর আচার্য্যের বাড়িতে অবস্থান করছেন। তাই তিনি মহাপ্রভুকে দর্শন করবার জন্য চন্দ্রশেখরের বাড়ির বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

একথা মহাপ্রভু অন্তর্যামী রূপে জানতে পেরে চন্দ্রশেখরকে বললেন, 'যাও, বাড়ির বাইরে একজন বৈষ্ণব দাড়িয়ে আছে তাঁকে নিয়ে এসো।'

চন্দ্রশেখর বাইরে থেকে ঘুরে এসে প্রভুকে বললেন, 'আমি কোনো বৈষ্ণব দেখতে পেলাম না।' মহাপ্রভু বললেন, 'কেউ তো আছে?' চন্দ্রশেখর বললেন, 'একজন দরবেশ আছে।' প্রভু বললেন, 'তাকেই নিয়ে এসো।'

চন্দ্রশেখর সনাতনকে গৃহে নিয়ে এলে মহাপ্রভু তাঁকে প্রেম ভরে আলিঙ্গন করলেন। তৎক্ষণাৎ সনাতন মহাপ্রভুকে বললেন, 'প্রভু! আপনি এ কী করছেন!, আমি অস্পৃশ্য, যবনের সঙ্গ করেছি।' প্রত্যুত্তরে মহাপ্রভু বললেন, 'তুমি পরম বৈষ্ণব, তোমাকে স্পর্শ করলে পবিত্র হওয়া যায়।' তারপর দুজনের মধ্যে অনেক কথা হল। মহাপ্রভুর আদেশে সনাতন মাথা মুণ্ডন করে বৈষ্ণব বেশ ধারণ করলেন। তপন মিশ্র সনাতনকে মহাপ্রভুর অবশেষ প্রসাদ প্রদান করলেন। তপন মিশ্র সনাতনকে নতুন বস্ত্র প্রদান করলে, সনাতন তা নিতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন, 'যদি দিতেই হয় তবে আমায় এক খানা পুরাতন ধুতি দিন।' একদিন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ সনাতনকে নিমন্ত্রণ করলেন এবং বললেন, 'যতদিন কাশিতে থাকবে ততদিন আমার এখানে এসে প্রসাদ পাবে।' সনাতন বললেন, 'না, আমি ভিক্ষা করে খাব।' একথা শুনে মহাপ্রভু আনন্দিত হলেন বটে কিন্তু সনাতনের ভোট কম্বলটি বার বার তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল। সনাতন বুঝতে পারলেন যে এটি মহাপ্রভুর পছন্দ নয়। তাই তিনি গঙ্গার তীরে গিয়ে এক ভিখারীর কাছ থেকে তার ছেঁড়া কাথাটি নিয়ে নিজের ভোট কম্বলটি তাকে দিয়ে দিলেন। মহাপ্রভু তাই দেখে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন।

একদিন সনাতন গোস্বামী দন্তে তৃণ ধারণ করে দৈন্যতা সহকারে মহাপ্রভুর চরণে এসে নিবেদন করলেন, 'হে প্রভু!—

''কে আমি! কেনে আমায় জারে তাপত্রয়?।
ইহা নাহি জানি আমি— কেমতে হীত হয়?।।''
সাধ্য সাধন-তত্ত্ব পুছিতে না জানি।
কৃপা করি সব তত্ত্ব কহত আপনি।।

—চৈঃ চঃ মধ্যঃ ২০/১০২-১০৩

মহাপ্রভু বলতে লাগলেন—কৃষ্ণের কৃপা তোমাতে পূর্ণভাবে আছে। তোমার কোন তাপ নাই। তুমি কৃষ্ণ-ভক্তি ও কৃষ্ণতত্ত্ব সব জান। তথাপি দৃঢ়তার জন্য পুনঃ জিজ্ঞাসা করছ। এটি তোমার সাধু স্বভাব। তত্ত্ব বস্তু সাধুগণ জানলেও উত্তম ব্যক্তির নিকট দৃঢ়তার জন্য পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করেন।

''জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ।।''

—চৈঃ চঃ মধ্যঃ ২০/১০৮

জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের দাস, অনুশক্তি। শ্রীকৃষ্ণসেবা তাঁর স্বরূপের ধর্ম্ম। ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের ভেদ ও অভেদতা অচিন্ত্য স্বরূপ। কৃষ্ণ মায়াধীশ, জীব মায়াবশ। কৃষ্ণ সূর্য্যসদৃশ, জীব কিরণ কণ-সদৃশ। শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তির মধ্যে—চিৎ শক্তি, জীব শক্তি, মায়া শক্তি এ তিন শক্তি প্রধান। কৃষ্ণ মায়াবদ্ধ জীবের উদ্ধারের জন্য সাধু, শাস্ত্র ও গুরুরূপে অবতীর্ণ হন। বেদ-শাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য শ্রীকৃষ্ণ-ভজন। বেদশাস্ত্রে ত্রিবিধ তত্ত্বের কথা বলেছেন—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন। কৃষ্ণ-সম্বন্ধ তত্ত্ব, ভক্তি—অভিধেয় ও কৃষ্ণ-প্রেম প্রয়োজন তত্ত্ব। সাধন ভক্তি দুই প্রকার—বৈধী সাধন-ভক্তি ও রাগানুগা সাধন-ভক্তি। বৈধী-সাধন-ভক্তি চৌষট্টি প্রকার। এর মধ্যে সাধু-সঙ্গ, নাম-সংকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ, মথুরাবাস ও শ্রদ্ধাসহ শ্রীমূর্ত্তির সেবা, এই পাঁচটি অঙ্গ শ্রেষ্ঠ।

এভাবে দুই মাস ধরে মহাপ্রভু শ্রীসনাতন

গোস্বামীর নিকট সমস্ত ভাগবত-তত্ত্বসার উপদেশ করলেন এবং বললেন–এ সমস্ত সিদ্ধান্ত চিন্তা করে ভক্তি-শাস্ত্র রচনা কর। তোমার দুই ভাই রূপ ও অনুপম বৃন্দাবনে চলে গেছে, তুমিও তথায় গমন কর। আমি নীলাচলে চলে যাচ্ছি। সময়মত তোমরাও নীলাচলে এস। মহাপ্রভু একথা বলে ভক্তদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। প্রভুর বিরহে ভক্তগণ ক্রন্দন করতে লাগলেন। শ্রীসনাতনও কাশীবাসী ভক্তগণের থেকে বিদায় নিয়ে শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে চললেন। শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনাদির পূর্ব্বে সুবুদ্ধিরায় বৃন্দাবনে এসে বাস করছিলেন।

### শ্রীনীলাচলে–শ্রীসনাতন

একবার মথুরা থেকে একাকী ঝারিখণ্ডের বন পথে শ্রীসনাতন গোস্বামী নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করলেন। বন পথ দুর্গম, সেখানকার জল দূষিত। শ্রীসনাতন চলতে লাগলেন, উপবাসে দিন কাটছে। মাঝে মাঝে জল পান করছেন মাত্র। জলবায়ুর দোষে তাঁর শরীরে কণ্ডু-রসা হল। তিনি ভাবলেন, এ দেহ নিয়ে মহাপ্রভুর ও শ্রীজগন্নাথের দর্শন হবে না। শুনেছি মহাপ্রভু জগদীশের মন্দিরের সন্নিকটে থাকেন, মন্দির-সন্নিধানে আমার যাবার সাধ্য নাই। প্রচলিত মার্গে জগন্নাথের সেবকগণ যাতায়াত করেন, তাঁদের স্পর্শ করলে মহা অপরাধ হবে। শ্রীসনাতন ঠিক করলেন, শ্রীজগন্নাথের-রথ চক্রের তলে পড়ে প্রাণ ত্যাগ করবেন। এ পাপ-দেহ আর রাখবেন না। ক্রমে লোক-পরম্পরায় খবর নিয়ে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কুটীরে উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে বন্দনা করলেন। দেখেই শ্রীহরিদাস ঠাকুর বুঝতে পারলেন, শ্রীরূপের বড় ভাই। শ্রীহরিদাস আনন্দে শ্রীসনাতনকে দৃঢ় আলিঙ্গন করে বললেন–আপনি কি শ্রীরূপের বড় ভাই শ্রীসনাতন? শ্রীসনাতন বললেন–হাঁ আমি সেই অধম।

শ্রীহরিদাস–মহাপ্রভুর শ্রীমুখে আপনার মহিমা শুনেছি।

শ্রীসনাতন–এ পাপীর আবার মহিমা কি?

শ্রীহরিদাস–আপনি বৈষ্ণব-শিরোমণি। মহাপ্রভু বলেছেন আপনার ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তি পৃথিবীতে নাই।

শ্রীসনাতন–(কর্ণে অঙ্গুলি দিয়ে) শ্রীবিষ্ণু! শ্রীবিষ্ণু!

দুজনার আলাপ হচ্ছিল। এমন সময় মহাপ্রভু তথায় শুভাগমন করলেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুর ও শ্রীসনাতন প্রভুর শ্রীচরণ মূলে দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন। মহাপ্রভু শ্রীহরিদাসকে আলিঙ্গন করতে হরিদাস বললেন--সনাতন দণ্ডবৎ করছে।

মহাপ্রভু বললেন--হ্যাঁ সনাতন এসেছে? ভূমি থেকে উঠিয়ে প্রেমভরে গাঢ় আলিঙ্গন করলেন তাঁকে।

শ্রীসনাতন বললেন–প্রভো! আমায় ছুঁয়ো না, আমি নীচ অধম। আবার শরীরে কণ্ডুরসা।

মহাপ্রভু–সনাতন! এ শরীর তোমার? না, আমার? মহাপ্রভু জোর করে পুনঃ আলিঙ্গন করলেন। শ্রীসনাতনের প্রতি মহাপ্রভুর সে-রকম স্নেহ দেখে ভক্তগণ বিস্ময়ান্বিত হলেন। প্রভু ভক্তগণের সঙ্গে শ্রীসনাতনের মিলন করিয়ে দিলেন। বৈষ্ণবগণের চরণ বন্দনা করতেই তাঁরা শ্রীসনাতনকে আনন্দে আলিঙ্গন করতে লাগলেন।

অতঃপর মহাপ্রভু সনাতনের কুশল বিষয়ে প্রশ্ন করলেন ও মথুরায় অন্যান্য বৈষ্ণবগণের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। প্রভু বললেন–রূপ দশ মাস নীলাচলে ছিল; দিন দশ আগে গৌড় দেশে গেছে। অনন্তর প্রভু অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি সংবাদ শ্রীসনাতনকে জানালেন। শুনে সনাতন বলতে লাগলেন শিশুকাল থেকে অনুপম শ্রীরামের উপাসনা করত। দিন-রাত রামায়ণ

পাঠ করত। রূপ ও আমি একদিন তাকে পরীক্ষা করবার জন্য বললাম--অনুপম! শ্রীকৃষ্ণ পরম সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের সার, তুমি তাঁর ভজন কর; তিন ভাই একসঙ্গে কৃষ্ণকথা রসে কাল যাপন করব। আমাদের কথায় তার মন কিছুটা ফিরল, বলল–আমি চিন্তা করে দেখি। সারা রাত শ্রীরামের ত্যাগের কথা চিন্তা করতে করতে কেঁদে কেঁদে কাটাল, সকালবেলা এসে বলল–

রঘুনাথের পাদপদ্মে বেচিয়াছোঁ মাথা।
কাড়িতে না পারোঁ মাথা পাঙ বড় ব্যথা।।

–চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৪/৪০

শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি তার এইরূপ প্রগাঢ় নিষ্ঠা দেখে আমরা দু-ভাই তাকে আলিঙ্গন করে বললাম–তুমি সাধু, তুমি শ্রীরামচন্দ্রের ভজন কর, তোমাকে পরীক্ষা করবার জন্য আমরা এরূপ বলেছিলাম।

মহাপ্রভু বললেন–

"সেই ভক্ত ধন্য যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ।
সেই প্রভু ধন্য যে না ছাড়ে নিজজন।।"

চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৪/৪৬

তারপর শ্রীসনাতন গোস্বামীকে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কাছে থাকতে বলে প্রভু নিজ স্থানে এলেন ও গোবিন্দের দ্বারা দুজনার জন্য মহাপ্রসাদ প্রেরণ করলেন।

একদিন মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরের কুটীরে এসে সনাতনকে বলতে লাগলেন–সনাতন! দেহত্যাগাদি দ্বারা কৃষ্ণ পাওয়া যায় না; এ সব তমোধর্ম। ভজনের দ্বারা কৃষ্ণ পাওয়া যায়।

সনাতন, দেহত্যাগে কৃষ্ণ যদি পাইয়ে।
কোটি-দেহ ক্ষণেকে তবে ছাড়িতে পারিয়ে।।
দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাই, পাইয়ে ভজনে।
কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের উপায় কোন নাহি 'ভক্তি' বিনে।।

চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৪/৫৫-৫৬

সনাতন বললেন-- হে সর্ব্বজ্ঞ! আমি অতি দীন। আমাকে বাঁচিয়ে তোমার কি লাভ হবে?

মহাপ্রভু–সনাতন! তোমার শরীর আমার বড় সম্পত্তি। তুমি পরের সম্পত্তি নাশ করতে চাও কেন?

হরিদাস ঠাকুর বললেন–সনাতন! তুমি ধন্য। তোমার দেহ প্রভুর সেবায় সহায়-স্বরূপ।

মহাপ্রভু--সনাতন! কৃষ্ণ-প্রেম, ভক্তি-তত্ত্ব, বৈষ্ণবাচার ও বৃন্দাবনের লুপ্ত-তীর্থ উদ্ধার প্রভৃতি তোমার ঐ দেহ দ্বারা করাব।

প্রভু কহে,–তোমার দেহ মোর নিজ-ধন।
তুমি মোরে করিয়াছ আত্মসমর্পণ।।
পরের দ্রব্য তুমি কেনে চাহ বিনাশিতে?
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার কিবা না পার করিতে?
তোমার শরীর–মোর প্রধান 'সাধন'।
এ শরীরে সাধিমু আমি বহু প্রয়োজন।।

–চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৪/৭৬-৭৮

সনাতন গোস্বামী বললেন– হে প্রভু! আপনার গভীর মন, কারও বুঝবার শক্তি নাই। আমাকে যেমন নাচাবেন তেমনি নাচব।

জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিন শ্রীগদাধর পণ্ডিত মহাপ্রভুকে ও শ্রীসনাতনকে দ্বিপ্রহরে ভোজনের জন্য আমন্ত্রণ করলেন। প্রভু যথাকালে শ্রীগদাধর পণ্ডিতের গৃহে এলেন। কিছুক্ষণ সনাতনের জন্য অপেক্ষা করে শেষে ভক্তগণের অনুরোধে প্রসাদ গ্রহণ করলেন। ভক্তগণ শ্রীসনাতনের জন্য বসে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীসনাতন এলেন। তাঁর শরীর ঘর্মাক্ত, লাল হয়ে গেছে। মধ্যাহ্নের তপ্ত বালুকায় পা পুড়ে ফোস্কা পড়েছে। ভক্তগণ তাড়াতাড়ি উঠে অভ্যর্থনা করে তাঁকে ঘরের মধ্যে নিয়ে বসালেন। মহাপ্রভুর অবশেষ পাত্রটি গোবিন্দ শ্রীসনাতনকে দিলেন। ভক্তগণ একসঙ্গে বসে প্রসাদ পেলেন। প্রসাদ

গ্রহণের পর শ্রীসনাতন মহাপ্রভুর কাছে এসে দণ্ডবৎ করে বসলেন। প্রভু জিজ্ঞাসা করলে— সনাতন এত দেরী করলে কেন? শ্রীসনাতন বললেন—সমুদ্রের পথে এসেছি। তাই একটু দেরী হল। প্রভু জিজ্ঞাসা করলেন—সিংহদ্বারের শীতল পথ ছেড়ে তপ্ত বালুকা-পথে এলে কেন? শ্রীসনাতন বললেন তপ্ত-বালুকা পথে চলতে আমার কোন কষ্ট হয়নি। সিংহদ্বারের পথ দিয়ে আসবার অধিকার আমার নাই। কারণ ঐ পথে শ্রীজগন্নাথের সেবকগণ নিয়ত যাতায়াত করেন। তাঁদের সাথে এই অধমের স্পর্শ হলে মহা-অপরাধ হবে। প্রভু বললেন—তুমি পরম পবিত্রস্বরূপ। তোমার স্পর্শে দেব মুনিগণও পবিত্র হয়।

''তথাপি স্বভাব-ভক্ত মর্য্যাদা রক্ষণ।
মর্য্যাদা পালন হয় সাধুর ভূষণ।।
মর্য্যাদা-লঙ্ঘনে লোক করে উপহাস।
ইহলোক, পরলোক, দুই হয় নাশ।।''

—চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৪/১৩০-১৩১

সনাতন! তুমি বিজ্ঞ-শিরোমণি। তুমি যদি শাস্ত্র-মর্য্যাদা জগতকে শিক্ষা না দাও, জগত কিভাবে শিখবে? মহাপ্রভু একথা বলে শ্রীসনাতনকে ধরে আলিঙ্গন করলেন। শ্রীসনাতনের বৈরাগ্য-সদাচারে ও শিষ্টাচারে সমস্ত গৌরভক্তগণ চমৎকৃত হয়ে ধন্য ধন্য বলে তাঁকে প্রশংসা করতে লাগলেন।

একদিন শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত এলেন শ্রীসনাতনকে দর্শন করতে। শ্রীসনাতন জগদানন্দকে দণ্ডবৎ করে এক দুঃখের কথা নিবেদন করলেন—

ইঁহা আইলাঙ প্রভুরে দেখি' দুঃখ খণ্ডাইতে।
যেবা মনে, তাহা প্রভু না দিলা করিতে।।
নিষেধিতে প্রভু আলিঙ্গন করেন মোরে।
মোর কণ্ডুরসা লাগে প্রভুর শরীরে।।
অপরাধ হয় মোর, নাহিক নিস্তার।
জগন্নাথেহ না দেখিয়ে, -এ দুঃখ অপার।।
হিত-নিমিত্ত আইলাঙ আমি, হৈল বিপরীতে।
কি করিলে হিত হয় নারি নির্দ্ধারিতে।।

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪/১৩৭-১৪০

অতএব আমাকে কিছু সৎ পরামর্শ দাও। শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত বললেন—রথযাত্রা দর্শন করে আপনি বৃন্দাবনে চলে যান, সেটি আপনার প্রভু-প্রদত্ত আদেশ। সনাতন গোস্বামী পণ্ডিতের কথায় পরম সুখী হলেন। কিছুক্ষণ ইষ্ট-গোষ্ঠী করে শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত নিজ স্থানে চলে গেলেন। এমন সময় মহাপ্রভু সেখানে এলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী দণ্ডবৎ করতেই তাঁকে ধরে প্রভু দৃঢ় আলিঙ্গন করলেন। তাতে শ্রীসনাতন মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন—শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত বলছেন রথযাত্রা দেখে বৃন্দাবনে যেতে। তাই ভাল, অপরাধের থেকে রক্ষা পাই। একথা শুনে শ্রীজগদানন্দের প্রতি ক্রোধের ভাব দেখিয়ে মহাপ্রভু বলতে লাগলেন--জগা কালকের পড়ুয়া, সে তোমাকে উপদেশ দেয়। ব্যবহারে পরমার্থে তুমি তার গুরুতুল্য। সে নিজের অধিকার বুঝে না। তুমি পরম প্রামাণিক বিজ্ঞজন। আমারও উপদেষ্টা।

কালিকার বটুয়া জগা ঐছে গর্ব্বী হৈল।
তোমা-সবারেহ উপদেশ করিতে লাগিল?
ব্যবহারে-পরমার্থে তুমি—তার গুরু-তুল্য।
তোমারে উপদেশ করে, না জানে আপন-মূল্য?
আমার উপদেষ্টা তুমি—প্রামাণিক আর্য্য।
তোমারেহ উপদেশে বালকা— করে ঐছে কার্য্য।।

চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৪/১৫৮-১৬০

প্রভুর এ কথা শুনে সনাতন গোস্বামী প্রভুর চরণ তলে লুটিয়ে পড়ে বলতে লাগলেন—আজ বুঝতে পারলাম আপনি শ্রীজগদানন্দকে কত আপন জ্ঞান করেন, সে কত সৌভাগ্যবান্। শ্রীজগদানন্দকে আত্মীয়তারূপ সুধারস পান করাচ্ছেন, আর, গৌরব






স্তুতির দ্বারা আমাকে পান করাচ্ছেন নিম্ব-নিসিন্দা রস।

জগদানন্দে পিয়াও আত্মীয়তা-সুধারস।
মোরে পিয়াও গৌরবস্তুতি-নিম্ব-নিশিন্দা-রস।।
—চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৪/১৬৩

আজও আপনি আমাকে আপন বলে কৃপা করলেন না। আমার দুর্ভাগ্য। শ্রীসনাতনের কথা শুনে প্রভু যেন খুব লজ্জিত হলেন ও শ্রীসনাতনকে সুখী করবার জন্য বলতে লাগলেন—সনাতন! তোমার অপেক্ষা জগদানন্দ আমার প্রিয় নয়। মর্য্যাদা লঙঘন আমি সইতে পারি না। তোমার কথা শুনে তোমায় স্তুতি করতে বাধ্য হচ্ছি। সনাতন! তোমার দেহকে তুমি ঘৃণ্য জ্ঞান কর, কিন্তু আমি অমৃতের সমান জ্ঞান করি। আমি তোমাদিগকে লাল্য এবং নিজেকে লালক জ্ঞান করি। লাল্যের লালনাদিতে লালকের ঘৃণা বোধ হয় না, সুখ বোধ হয়। তদ্রূপ তোমাদের সংস্পর্শে এলে আমার পরম আনন্দ হয়। ভক্তের দেহ অপ্রাকৃত নিত্য শুদ্ধ। পরীক্ষা করবার জন্যই কৃষ্ণ তোমার দেহে কণ্ডুরসা সৃষ্টি করেছেন। ঘৃণা করে যদি তোমায় আলিঙ্গন না করতাম কৃষ্ণের স্থানে আমার অপরাধ হত। এই বলে মহাপ্রভু পুনঃ শ্রীসনাতনকে আলিঙ্গন করলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁর কণ্ডু-রসা দূর হয়ে অঙ্গ সুবর্ণের ন্যায় হল। অতঃপর শ্রীসনাতন গোস্বামী দোলযাত্রা দর্শন করে মহাপ্রভুর নির্দ্দেশমত বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করলেন। যে পথ দিয়ে মহাপ্রভু বৃন্দাবন গিয়েছিলেন শ্রীসনাতনও সে পথ ধরে বৃন্দাবনে চললেন। তিনি বৃন্দাবনে এলে শ্রীরূপ গোস্বামীও গৌড় দেশস্থ কুটুম্ব-বর্গের যথাযথ ব্যবস্থা করে পুনঃ বৃন্দাবনে ফিরে এলেন।

**শ্রীশ্রীমদনগোপালদেব প্রকট**

মহাবনে শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানের সন্নিকটে এক পত্র-কুটীরে শ্রীসনাতন গোস্বামী ভজন করতেন। মাধুকরীর জন্য তিনি একদিন যমুনার তট দিয়ে গ্রামে যাচ্ছেন। মদন গোপালদেব তখন যমুনার তীরে গোপ-বালকদের সঙ্গে খেলা করছিলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামীকে দেখেই 'বাবা! বাবা!' বলে ছুটে এলেন এবং তাঁর হাত ধরে বললেন—বাবা! আমি তোমার কাছে যাব।

শ্রীসনাতন—লালা! আমার কাছে কেন যাবে?

গোপাল—তোমার কাছে আমি থাকব।

শ্রীসনাতন—আমার কাছে থাকবে, খাবে কি?

গোপাল—বাবা! তুমি কি খাও?

শ্রীসনাতন—আমি শুষ্ক রুটি চানা খাই।

গোপাল—আমিও তা খাব।

শ্রীসনাতন—তুমি তা খেয়ে থাকতে পারবে না, তুমি মা-বাপের কাছেই থাক। পুনঃ গোপাল বললেন, "বাবা! আমি তোমার কাছে থাকব।" সনাতন গোস্বামী বালকটিকে বুঝিয়ে সুজিয়ে ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে মাধুকরীতে গেলেন। তিনি রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন সে শিশুটি হাসতে হাসতে কাছে এসে তাঁর হাত ধরে বলছেন—বাবা! আমার নাম মদন গোপাল, আমি কাল তোমার কাছে আসব। এ বলে মদন গোপালদেব অন্তর্ধান হলেন। শ্রীসনাতনের স্বপ্ন ভাঙল। আনন্দে আত্মহারা হলেন, কি দেখ লাম? এমন সুন্দর শিশু কখনও দেখিনি। হরি স্মরণ করতে করতে কুটীরের কপাট খুললেন, দেখলেন দরজার সামনে এক অপূর্ব্ব গোপাল মূর্ত্তি, তাঁর অঙ্গ শোভায় চারিদিক আলোকিত। শ্রীসনাতন গোস্বামী স্তম্ভিতভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর প্রেমাশ্রু ফেলতে ফেলতে ভূতলে দণ্ডবৎ করলেন। অতঃপর শ্রীমূর্ত্তির পূজা অভিষেকাদি করলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখে প্রেমাবিষ্ট হলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী স্বীয় পত্র-কুটীরে মদনগোপাল দেবের সেবা করতে লাগলেন। এ






শুভ সংবাদ মহাপ্রভুকে দেওয়ার জন্য শ্রীরূপ গোস্বামী তৎক্ষণাৎ একজন ভক্তকে পুরী ধামে প্রেরণ করলেন।

শ্রীসনাতন গোস্বামী আটা ভিক্ষা করে এনে, রুটি করে গোপালের ভোগ দেন। তার সঙ্গে একটু শাক তরকারী দেন। কোন দিন তৈল ও লবণের অভাবে তরকারী তৈরী করা হয় না, শুষ্ক রুটি মাত্র ভোগ দেন। এতে শ্রীসনাতনের বড় দুঃখ হতে লাগল। কিন্তু উপায় নাই; কারণ মহাপ্রভু তাঁকে যে সেবা দিয়েছেন—ভক্তিগ্রন্থ প্রণয়নাদি, তা নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত থাকেন; কখন তিনি পয়সা ভিক্ষা করে তৈল লবণ আনবেন? শ্রীসনাতন গোস্বামীর মনে কষ্ট হতে লাগল—

''মহারাজ-কুমার মদন মোহন।
তিঁহ শুষ্ক রুটি ভুঞ্জে দুঃখী সনাতন।।''

ভঃ রঃ ২/৪৬২

অন্তর্য্যামী ভগবান্ সনাতনের মন জানলেন। আমি শুষ্ক রুটি খাই, সনাতনের মনে তাতে দুঃখ হচ্ছে, সনাতন রাজ সেবা করতে চায়।

''সনাতন মন জানি মদন গোপাল।
নিজ সেবা-বৃদ্ধি ইচ্ছা হইল তৎকাল।।''

ভঃ রঃ ২/৪৬৩

শ্রীমদন গোপাল নিজ-সেবা বৃদ্ধি করার ইচ্ছা করলেন।

মুলতানের একজন ধনাঢ্য ক্ষত্রিয়—নাম শ্রীকৃষ্ণ দাস কপূর। তিনি বাণিজ্য করবার জন্য মথুরায় এসেছিলেন। যমুনার চড়ায় তাঁর নৌকা লেগে গিয়েছিল, কোন উপায়ে নৌকা জলে নামাতে পারলেন না। কি হবে? কৃষ্ণ দাস কপূর লোক-মুখে শুনতে পেলেন বৃন্দাবনে এক বড় সাধু বাস করেন, তাঁর নাম—শ্রীসনাতন গোস্বামী। কৃষ্ণ-দাস কপূর শ্রীসনাতনের কাছে এসে দেখলেন, বাবা বসে লিখছেন, পরিধানে কৌপীন মাত্র, বৈরাগ্যে শুষ্ক তনু। কৃষ্ণদাস কপূর দণ্ডবৎ করলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী তাঁকে বসার জন্য একটি পত্রের আসন দিলে, আসনটা হস্ত দ্বারা স্পর্শ করে কৃষ্ণদাস নীচে বসে বললেন, ''বাবা! কৃপা করুন''।

শ্রীসনাতন গোস্বামী বললেন—আমি ভিখারী, কি কৃপা করব?

কৃষ্ণদাস কপূর—কেবলমাত্র আপনার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি। যমুনার চড়ায় আমার নৌকা লেগে গেছে, কোন উপায়ে সরে না।

সনাতন—আমি ত কিছুই জানি না, ঐ মদন গোপালকে সব কথা বলুন।

কৃষ্ণদাস কপূর মদনগোপালকে দণ্ডবৎ করে বললেন,—হে মদন গোপাল দেব! তোমার কৃপায় যদি চড়া থেকে নৌকা সরে, এবার যত লাভ হবে সব তোমার সেবার জন্য দিয়ে দেব। এরূপ প্রার্থনা করে কপূর শেঠ বিদায় হল। সে দিন বিকেল বেলা, এমন ঝড় বৃষ্টি হল যে কপূর শেঠের নৌকা অনায়াসে যমুনার মধ্যে চলে গেল। কৃষ্ণ দাস কপূর সব বুঝতে পারলেন। সে-বার ব্যবসা করে কৃষ্ণদাস বহু টাকা লাভ করেন এবং সেই সমস্ত অর্থ দিয়ে শ্রীমদন গোপাল দেবের মন্দির, ভোগশালাদি ও নিত্য রাজ-সেবার ব্যবস্থা করে দিলেন। মদন গোপালের রাজ-সেবা দেখে শ্রীসনাতন গোস্বামী বড়ই সুখী হলেন। কৃষ্ণদাস কপূর শ্রীসনাতন গোস্বামীর থেকে দীক্ষা গ্রহণ করলেন।

**শ্রীরাধারাণীর দর্শন দান**

শ্রীরূপ ও শ্রীরঘুনাথ দাসকে দেখবার জন্য শ্রীসনাতন গোস্বামী একদিন রাধা-কুণ্ডে এলে দুই জন উঠে তাঁকে বন্দনা করলেন এবং বসবার জন্য আসন দিলেন। পরে তিন জনে ইষ্টগোষ্ঠী করতে লাগলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী চাটু পুষ্পাঞ্জলি নামক

একটি শ্রীরাধা স্তব লিখেছিলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী স্তবটি পড়লেন। তাতে একটি শ্লোক আছে—

নবগোরোচনাগৌরী প্রবরেন্দী বরাম্বরাম্।
মণিস্তবক-বিদ্যোতিবেণী-ব্যালাঙ্গনা-ফণাম্।।
—শ্রীচাটুপুষ্পাঞ্জলি

''ব্যালাঙ্গনাফণাম্'' শ্রীরাধা-ঠাকুরাণীর 'বেণী' সর্পিণীর ফণার ন্যায় শোভা পাচ্ছে। শ্রীসনাতন গোস্বামী এই উপমা বিষয়ে চিন্তা করতে লাগলেন—''বিষধর সর্পের ফণার সঙ্গে তুলনা যুক্তিযুক্ত কি না?

মধ্যাহ্নকালে স্নানের জন্য শ্রীসনাতন রাধা-কুণ্ডে এসে কুণ্ডের স্তুতি করে স্নান করতে লাগলেন। এমন সময় কুণ্ডের তীরে কিছু দূরে বৃক্ষের তল-দেশে গোপ-কুমারীগণকে খেলা করতে দেখলেন। তাঁদের প্রতি দৃষ্টিপাত করতেই তাঁদের পৃষ্ঠ-দেশে দোদুল্যমান লম্বিত বেণীগুলিতে শ্রীসনাতন গোস্বামীর সর্প ভ্রম হল। তিনি তখন ব্যগ্র হয়ে কুমারিগণকে আহ্বান করে বললেন—হে কুমারিগণ! সাবধান হও, তোমাদের পৃষ্ঠ দেশে সর্প উঠছে। কুমারিগণ নিজ মনে সানন্দে খেলছিল, তাঁর কথা শুনছিল না। তখন তিনি স্বয়ং বাধা-দেওয়ার জন্য ছুটলেন; তাঁকে আসতে দেখে গোপ-কুমারিগণসহ শ্রীরাধা-ঠাকুরাণী হাসতে হাসতে অন্তর্ধান হ'লেন। অবাক হয়ে শ্রীসনাতন গোস্বামী দাঁড়িয়ে রইলেন। অতঃপর শ্রীরূপের উপমার কথা বুঝতে পারলেন।

**"শ্রীদানকেলি কৌমুদী"**

শ্রীরূপ গোস্বামী ''ললিত মাধব'' নামে একখানি নাটক রচনা করেছিলেন; নাটকটিতে বর্ণিত আছে দ্বারকা-লীলা। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীকে নাটকখানি পাঠ করতে দিলেন। গ্রন্থখানি পাঠ করে রঘুনাথ দাস গোস্বামী এত বিরহ-বিধুর হলেন যে প্রাণ ত্যাগ করতে উদ্যত হলেন। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীকে ভারাক্রান্ত দেখে শ্রীরূপ গোস্বামী সব বুঝতে পারলেন। তখন তিনি ব্রজের নিত্য-লীলাযুক্ত ''দানকেলি কৌমুদী'' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করে পাঠ করবার জন্য শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীকে দিলেন। এবার এ গ্রন্থ পাঠ করে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী যেন সুখের সাগরে ডুবে গেলেন।

দান-কেলি পাঠে রঘুনাথ বিজ্ঞবর।
সুখের সমুদ্রে মগ্ন হৈলা নিরন্তর।।
—ভক্তি রত্নাকর পঞ্চম তরঙ্গে

**"শ্রীকৃষ্ণের দুগ্ধ দান"**

একবার অন্ন-জল ত্যাগ করে শ্রীসনাতন গোস্বামী পাবন-সরোবর তটে নির্জ্জন বনে ভজন করতে লাগলেন। অন্তর্য্যামী ভগবান্ সব জানতে পারলেন— ভক্ত অনাহারে আছেন। ভক্তের আহার ভগবান্ নিজেই যোগান—এ কথা তাঁর বাণীতে আছে। গোপ বালকের বেশে শ্রীকৃষ্ণ দুগ্ধ নিয়ে সন্ধ্যার একটু আগে গোস্বামীর নিকট এলেন।

কৃষ্ণ গোপ-বালকের ছলে দুগ্ধ লৈয়া।
দাঁড়াইলা গোস্বামী সম্মুখে হর্ষ হৈয়া।
—ভঃ রঃ ৫/১৩০৩

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—বাবা! তোমার জন্য দুধ এনেছি।

শ্রীসনাতন—তুমি কেন কষ্ট করে দুধ আনলে?

শ্রীকৃষ্ণ—তুমি না খেয়ে আছ, তাই।

শ্রীসনাতন—তুমি কেমন করে জানলে যে আমি না খেয়ে আছি?

শ্রীকৃষ্ণ—সরোবরের তীরে গোচারণ করতে এসে দেখেছি তুমি না খেয়ে আছ।

শ্রীসনাতন—অন্য কেউ এলেন না কেন?

শ্রীকৃষ্ণ—ঘরে অনেক কাজ, তাই আমাকে আসতে হয়েছে।

শ্রীসনাতন—আহা! তুমি অতটুকু শিশু, তোমার কত কষ্ট হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ—না, না, বাবা! আমার কোন কষ্ট হয় নি।

শ্রীসনাতন গোস্বামী তাড়াতাড়ি ভাণ্ডটি নিয়ে বললেন— লালা, বস; পাত্রটি খালি করে দিই।

শ্রীকৃষ্ণ—না বাবা! আমি বসতে পারব না, সন্ধ্যা হয়ে আসছে গো-দোহন করতে হবে, ভাণ্ড কাল নিয়ে যাব। এ কথা বলতে বলতে বালক অদৃশ্য হল। শ্রীসনাতন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। সব কথা বুঝতে পারলেন, শ্রীকৃষ্ণই এ সব করেছেন। নেত্র-জলে ভাসতে ভাসতে দুধ পান করলেন। তারপর থেকে তিনি মাধুকরী করে খেতেন। ব্রজবাসিগণ তাঁর থাকার জন্য একটি কুটীর করে দিলেন।

### "শ্রীরাধিকার স্নেহ"

একদিন শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীসনাতন গোস্বামীকে মিষ্টান্ন খাওয়াতে ইচ্ছা করলেন। কিন্তু মিষ্টান্ন তৈরী করার কোন সামগ্রী তখন কুটীরে ছিল না। ভক্ত ইচ্ছা পূর্ণ কারিণী শ্রীরাধা-ঠাকুরাণী সব বুঝতে পারলেন। তখন একটি গোপকুমারী বেশে তিনি শ্রীরূপের জন্য দুধ, চাল ও চিনি নিয়ে এলেন এবং ডাকতে লাগলেন—স্বামিন্! সিধা গ্রহণ করুন। কুমারীর কণ্ঠধ্বনি শুনে শ্রীরূপ গোস্বামী কুটীরের দ্বার খুললেন। দেখলেন এক অপরূপ কুমারী সিধা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

শ্রীরূপ গোস্বামী বললেন—লালি! তুমি এ-সময়ে এলে কেন?

শ্রীরাধা-স্বামিন্! আপনাদের সেবার জন্য সিধা এনেছি।

শ্রীরূপ—লালি! তুমি এত কষ্ট করলে কেন?

শ্রীরাধা-বাবা! কিসের কষ্ট? সাধু সেবার জন্য এনেছি।

শ্রীরূপ সিধা নিয়ে বসতে বললে, কুমারী বললেন আমি বসতে পারব না, ঘরে কাজ আছে। বলতে বলতে কুমারী অদৃশ্য হলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী ফিরে দেখলেন কুমারী নাই, তিনি পরম বিস্ময়ান্বিত হলেন। অনন্তর পায়স তৈরী করে শ্রীগোবিন্দদেবকে ভোগ দিলেন। প্রসাদ শ্রীসনাতন গোস্বামীকে দিলেন। প্রসাদ পেয়ে শ্রীসনাতন গোস্বামী আনন্দে আত্মহারা! জিজ্ঞাসা করলেন চাল দুধ কোথায় পেলে? শ্রীরূপ বললেন একজন গোপ-কুমারী দিয়ে গিয়েছে। শ্রীসনাতন বললেন—হঠাৎ দিয়ে গেল? শ্রীরূপ বললেন হাঁ হঠাৎ দিয়ে গেল, আজ সকাল বেলা আমার ইচ্ছা হল আপনাকে একটু মিষ্টান্ন খাওয়াই, এমন সময় দেখি এক কুমারী সিধা নিয়ে হাজির। এ কথা শুনে শ্রীসনাতনের নয়ন দিয়ে প্রেমাশ্রু পড়তে লাগল, বললেন ''এত স্বাদিষ্ট দ্রব্য আর কে দিবেন? শ্রীরাধাঠাকুরাণীই দিয়েছেন। তুমি যেন এরূপ আকাঙ্ক্ষা আর কখন ক'র না।"

''শুনিয়া গোস্বামী নিষেধয়ে বারবার।"

—ভঃ রঃ সিঃ ১৩/২২

### "শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনের কৃপা"

প্রতিদিন চৌদ্দ মাইল গোবর্দ্ধন-গিরি শ্রীসনাতন গোস্বামী পরিক্রমা করতেন। বার্দ্ধক্য-হেতু তাঁর কষ্ট হত, কিন্তু তিনি নিয়ম ভঙ্গ করতে চাইতেন না। কষ্ট করে পরিক্রমা করতেন। ভক্তের কষ্ট ভগবান্ বুঝতে পারলেন। এক গোপ-শিশুরূপে শ্রীসনাতনের কাছে এলেন, বললেন—বাবা! তুমি বৃদ্ধ হয়েছ, এত কষ্ট করে গিরিরাজ পরিক্রমা আর ক'র না। শ্রীসনাতন গোস্বামী বললেন—এটি আমার নিত্য ভজন—নিয়ম। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, বৃদ্ধকালে নিয়ম ত্যাগ কর। শ্রীসনাতন বললেন—নিয়ম কখনও ত্যাগ করা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ বললেন—বাবা! আমার কথা মান্‌বে? শ্রীসনাতন বললেন—মান্‌বার মত যদি হয়, মান্‌ব।

শ্রীকৃষ্ণ তখন নিজ পদচিহ্নযুক্ত একটি শিলা খণ্ড দিয়ে বললেন—বাবা এটি সাক্ষাৎ গোবর্দ্ধন-শিলা। শ্রীসনাতন বললেন—এ-শিলা আমি কি করব? শ্রীকৃষ্ণ বললেন—এ শিলা পরিক্রমা কর, গিরিরাজ পরিক্রমার ফল পাবে। ''শিলা সমর্পিয়া কৃষ্ণ হলেন অদর্শন।" শ্রীসনাতন গোস্বামী অবাক হলেন, তিনি বুঝতে পারলেন গিরিরাজ স্বয়ং দিয়ে গেলেন, সে দিন থেকে তিনি সেই পদচিহ্ন-শিলা পরিক্রমা করতেন।

### "শ্রীমদনগোপালের দর্শন দান"

শ্রীসনাতন গোস্বামী মহাবনে থাকতেন। একদিন যমুনা তটে তিনি শ্রীমদন গোপালকে খেলতে দেখলেন। অবাক হলেন। এ কি সে মদন গোপাল খেলছে না কি? আবার চিন্তা করলেন কোন গোপ-বালক হবে। সে দিন গেল। আর একদিন দেখলেন যমুনার তটে সে শিশুটি অন্যান্য গোপ-শিশুর সঙ্গে খেলছে। শ্রীসনাতন গোস্বামী লক্ষ্য করবার জন্য দাঁড়িয়ে রইলেন। আজ দেখব শিশু কোথায় যায়?

সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এল। খেলা সাঙ্গ করে অন্যান্য গোপশিশুগণ ঘরে চললেন। মদনগোপাল মন্দিরে প্রবেশ করলেন। তখন সনাতন গোস্বামী বুঝতে পারলেন, মদনগোপাল প্রতিদিন যমুনা-তীরে ক্রীড়া করেন।

### "ব্রজবাসীগণের স্নেহ"

শ্রীসনাতন গোস্বামী ও শ্রীরূপ গোস্বামী যখন ব্রজের যে গ্রামে যেতেন সে গ্রামের গোপগণ দু'ভাইকে প্রাণের থেকে অধিক স্নেহ করতেন। গ্রামবাসিগণ তাঁদের দই দুধ খাওয়াতেন।

গোস্বামীদ্বয় গ্রামবাসিদের সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ পরিকর মনে করতেন। সে ভাবে তাঁদের সম্মান করতেন। তাঁদের গৃহের যাবতীয় খবর বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করতেন।

এ সম্বন্ধে শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ভক্তিরত্নাকরে লিখেছেন—

কার কত কন্যা পুত্র বিবাহ কোথায়।<br>
কি নাম কাহার কৈছে প্রবীণ নির্ভয়।।<br>
গাভী বৃষাদিক কত কৃষিকর্ম কার।<br>
কার গৃহে শস্য কত কৈছে ব্যবহার।।<br>
শরীর আরোগ্য কার কৈছে মনোবৃত্তি।<br>
ঐছে জিজ্ঞাসিতে সবে হন হর্ষ অতি।।

—ভঃ রঃ ৫/১৩৬৯-১৩৭১

### "বৈষ্ণব-চূড়ামণি শিবের স্নেহ"

গোবর্দ্ধনে চাক্‌লেশ্বর নামক স্থানে শ্রীসনাতন গোস্বামী ভজন করতেন। সেখানে মশার উৎপাত বড় বেশী হল। মশার কামরে বিরক্ত হয়ে, শ্রীসনাতন একদিন বললেন—এখানে আর থাকব না। ভজনও করা যায় না, মহাপ্রভুর সেবা—গ্রন্থ লিখনাদিও হয় না।

অন্তর্য্যামী শ্রীশিব শ্রীসনাতনের মনের কথা জানতে পেরে রাত্রে শ্রীসনাতনকে স্বপ্নে বললেন-সনাতন! তুমি স্বচ্ছন্দে ভজন ও মহাপ্রভুর সেবা করতে থাক, মশার উৎপাত কাল থেকে আর থাকবে না। সে দিন থেকে সেখানে মশা আর রইল না, শ্রীসনাতন গোস্বামী নিরুপদ্রবে ভজন করতে লাগলেন।

### জীবন চক্রবর্ত্তীকে কৃপা

শ্রীল সনাতন গোস্বামী সম্বন্ধে একটি কাহিনী শোনা যায়-- একজন অত্যন্ত দরিদ্র শিবভক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে ও ভক্তমাল গ্রন্থে বর্ণনা আছে--তিনি বর্দ্ধমান জেলার মানকর নিবাসী শ্রীজীবন চক্রবর্ত্তী। তিনি দারিদ্র দুঃখে অতি কষ্ট পেয়ে শিবের নিকট ধন প্রার্থনা করেন। শিব ঠাকুর তাকে স্বপ্নে আদেশ করলেন ওহে জীবন! বৃন্দাবনে সনাতন গোস্বামীর নিকট ধন আছে,

তাঁর কাছে যাও, ধন পাবে। দরিদ্র ব্রাহ্মণ স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে বৃন্দাবনে গেলেন এবং সনাতন গোস্বামীর নিকট পৌঁছালেন, কিন্তু সনাতন গোস্বামীর পরণে মলিন বসন ও শুকনো শরীর দেখে বিশ্বাস করতে পারলেন না যে উনি ধন দিতে পারবেন। তথাপি স্বপ্নাদেশের কথা সনাতন গোস্বামীকে নিবেদন করলেন। সে কথা শুনে সনাতন গোস্বামী যেন আকাশ থেকে পড়লেন। যিনি মাধুকরী ভিক্ষা করে কোন প্রকারে জীবন ধারণ করেন, তিনি ধন কোথায় পাবেন! তাই সবিনয়ে ব্রাহ্মণকে বললেন,--"দেখুন মনে হয় আপনার কিছু একটা ভুল হচ্ছে। আপনি ভুল লোকের কাছে ধনের সন্ধানে এসেছেন।" দরিদ্র ব্রাহ্মণ একথা শুনে দুঃখিত হয়ে গৃহের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। এদিকে সনাতন গোস্বামী ভাবতে লাগলেন, হঠাৎ শিব ঠাকুর আমার কাছে তাঁর ভক্তকে কেন পাঠালেন। অনেক চিন্তার পর তাঁর মনে পড়ল একটি স্পর্শ মণির কথা। যেটি কিছুদিন পূর্বে তিনি যমুনার তীরে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন, যা ময়লা আবর্জনার মধ্যে পোঁতা রয়েছে। মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি লোক পাঠিয়ে ব্রাহ্মণকে ডেকে আনলেন এবং আবর্জ্জনার ভিতর থেকে স্পর্শমণিটি বের করে দিলেন। স্পর্শমণিটি পেয়ে ব্রাহ্মণ খুবই আনন্দিত হলেন। মনে করলেন এখন তার মত ধনী আর পৃথিবীতে কেউ থাকবে না। কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পর তার মনে হল, স্পর্শমণির ন্যায় এতবড় মহামূল্যবান বস্তু পেয়েও যিনি ভুলে গিয়েছিলেন এবং আবর্জ্জনার মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন। না জানি তাঁর কাছে আরও কি এমন মহামূল্যবান বস্তু রয়েছে। মনে হয় আমি বঞ্চিত হয়েছি। এই ভেবে তিনি শ্রীসনাতন গোস্বামীর নিকট পুনরায় ফিরে গেলেন এবং বললেন,-- আপনার কাছে কি এমন বস্তু রয়েছে, যার কারণে স্পর্শমণিকেও তুচ্ছ বোধ করেন, আমিও সেই বস্তু চাই--

যে ধনে হইয়া ধনী, মণিরে না মান মণি।
তার এক কণ মাগি নত শিরে।

শ্রীসনাতন গোস্বামী বললেন, সেই বস্তু পেতে হলে তুমি আগে স্পর্শমণিটি যমুনার জলে ফেলে দিয়ে আস। উত্তম বস্তু পাওয়ার লোভে জীবন চক্রবর্ত্তী মণিটি যমুনার জলে নিক্ষেপ করে সনাতন গোস্বামীর কাছে ফিরে এলেন। সনাতন গোস্বামী বললেন,--এই জগতের সমস্ত বস্তুই ক্ষণভঙ্গুর এবং দুঃখদায়ী। এসবের কোন মূল্য নেই। এখানে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে কৃষ্ণপ্রেম।

"'প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।"

তাই যদি প্রকৃত আনন্দ লাভ করতে চান, তাহলে হরিনাম করুন। হরিনামই শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

"গোলোকের প্রেমধন, হরিনাম সংকীর্ত্তন।"

এই বলে সনাতন গোস্বামী জীবন চক্রবর্ত্তীকে কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করলেন।

শ্রীরূপ সনাতন শ্রীব্রজমণ্ডলে কিভাবে ভজন করতেন তা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণনা আছে--

অনিকেত দুঁহে, বনে যত বৃক্ষগণ।
এক এক বৃক্ষের তলে এক এক রাত্রি শয়ন।।
'বিপ্রগৃহে' স্থূলভিক্ষা, কাঁহা মাধুকরী।
শুষ্ক রুটী-চানা চিবায় ভোগ পরিহরি'।।
করোঁয়া-মাত্র হাতে, কাঁথা, ছিঁড়া-বহির্ব্বাস।
কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণনাম, নর্ত্তন-উল্লাস।।
অষ্টপ্রহর কৃষ্ণভজন, চারি দণ্ড শয়নে।
নাম-সঙ্কীর্ত্তন-প্রেমে, সেহ নহে কোন দিনে।।
কভু ভক্তিরসশাস্ত্র করয়ে লিখন।
চৈতন্যকথা শুনে, করে চৈতন্য-চিন্তন।।

চৈঃ চঃ মধ্য ১৯/১২৭-১৩১

**"শ্রীসনাতনের রচিত গ্রন্থাবলী"**

শ্রীসনাতন গোস্বামীকৃত—শ্রীবৃহৎ- ভাগবতামৃত,

শ্রীহরিভক্তি-বিলাস ও তাঁর দিগ্‌দর্শিনী টীকা, শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তব বা দশম চরিত, শ্রীমদ্ভাগবতের টিপ্পনী ও বৃহৎ বৈষ্ণভ-তোষণী প্রভৃতি।

**"শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের মহিমা গীত"**

জয় মোর সাধু-শিরোমণি রূপ সনাতন।
জিনকে ভক্তি—এক রস নিবহী প্রীত কৃষ্ণ রাধাতন।।
বৃন্দাবন কী সহজ মাধুরী রৌম রৌম সুখ গাতন।।
সব তেজি কুঞ্জ কেলি, ভজি অহর্নিশি অতি অনুরাগ রাধাতন।।
করুণা সিন্ধু কৃষ্ণচৈতন্যকে কৃপা ফলী দৌ ভ্রাতন।।
তিন বিনু ব্যাস অনাথন যে সে সুখে তরুবর পাতন।।
শ্রীচৈতন্য মনোহভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
সোহয়ং রূপ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্।।

শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপের জন্ম তারিখ—সজ্জন তোষণী ২য় বর্ষ ২৫ পৃঃ (ইং ১৮৮৫) প্রকাশিত আছে যথা—

শ্রীসনাতন—জন্ম ১৪১০ শকাব্দ, ১৫৪৪ সম্বৎ, ১৪৮৮ খৃঃ তিনি গৃহে ২৭ বছর ও ব্রজে ৪৩ বছর বাস করেছিলেন।

তাঁর প্রকট স্থিতি—৭০ বছর, অপ্রকট—১৪৮০ শকাব্দ; ১৬১৫ সাম্বৎ, ১৫৫৮ খৃঃ আষাঢ়ী-পূর্ণিমায়।

শ্রীরূপ—জন্ম ১৪১১ শকাব্দ, ১৫৪৬ সম্বৎ, ১৪৮৯ খৃঃ, গৃহে বাস ২২ বছর, ব্রজে—৫১ বছর। শ্রীরাধারমণ ঘেরার মতে— জন্ম ১৪১৫ শকাব্দ, ১৫৫০ সম্বৎ, ১৫৬৮ খৃঃ। প্রকট স্থিতি ৭৫ বছর।

তাঁর অপ্রকট ১৪৮৬ শকাব্দ, ১৬২১ সম্বৎ, ১৫৬৪ খৃঃ শ্রাবণী শুক্লাদ্বাদশী ১৫৬৮ খৃঃ মতান্তরে ১৪৯০ শকাব্দ, ১৬২৫ সম্বৎ, ১৫৬৮ খৃঃ।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ "বৈষ্ণব কে?" গীতিতে লিখেছেন—

"তাই দুষ্ট মন, নির্জ্জন ভজন
প্রচারিছ ছলে কুযোগী বৈভব।
প্রভু সনাতনে, পরম যতনে।
শিক্ষা দিল যাহা, চিন্ত সেইসব।।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে অবলম্বন করে জগদ্বাসীকে যে শিক্ষা দিয়েছেন তা পরম যত্নের সাথে চিন্তা করতে হবে, এটিই শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ।।

**।। জয় শ্রীসনাতন গোস্বামী কি জয়।।**



# শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী

শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ব্রজের রাগমঞ্জরী।

'রঘুনাথাখ্যকো ভট্টঃ পুরা যা রাগমঞ্জরী।
কৃত শ্রীরাধিকা কুণ্ডকুটীর ববর্তিঃ স তু।।"

শ্রীরঘুনাথ ভট্টের পিতার নাম—শ্রীতপন মিশ্র। প্রভু গার্হস্থ্যজীবনে যখন পূর্ব্ববঙ্গে অধ্যাপকরূপে শুভাগমন করেছিলেন তপন মিশ্রের সঙ্গে তখন তাঁর পরিচয় হয়। তপন মিশ্র পূর্ব্ববঙ্গের লোক, শাস্ত্রজ্ঞ-পণ্ডিত ছিলেন। তিনি সাধ্য ও সাধন-তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করেছিলেন, কিন্তু তার যথার্থ অর্থ নির্ণয় করতে পারলেন না। বিফল মনোরথ হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। একদিন রাত্রে স্বপ্নে দেখছেন, এক দেবতা এসে বলছেন—মিশ্র তুমি কোন চিন্তা করো না। শ্রীনিমাই পণ্ডিতের নিকট গমন কর, তিনি তোমাকে সাধ্য সাধন-তত্ত্ব ভাল করে বুঝিয়ে দেবেন।

''মনুষ্য নহেন তেঁহো নর নারায়ণ।
নররূপে লীলা তাঁর জগৎ কারণ।।"

—চৈঃ ভাঃ আদিঃ ১৪/১২৩

এ বলে দেবতা অন্তর্দ্ধান হলেন। সকাল বেলা প্রাতঃ কৃত্যাদি শেষ করে মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য চললেন। দেখলেন শ্রীনিমাই পণ্ডিত একটি উচ্চ চৌকির উপর বসে আছেন। গৃহখানি তাঁর অঙ্গ কান্তিতে উদ্ভাসিত হচ্ছে। তাঁর নয়ন যুগল প্রফুল্ল পদ্মদলের ন্যায়, শিরে কুঞ্চিত কেশদাম, বক্ষস্থলে শুভ্র উপবীত ও পরিধানে পীতবস্ত্র। চন্দ্রের চতুর্দ্দিকে নক্ষত্রমালার ন্যায় শিষ্যগণ চারিধারে উপবিষ্ট। তপন মিশ্র দণ্ডবৎ করে করজোড়ে বলতে লাগলেন— হে দয়াময়! আমি অতি দীনহীন। আমাকে কৃপা করুন। প্রভু হাস্য সহকারে তাঁকে ধরে বসালেন এবং তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। তপন মিশ্র নিজ পরিচয় ব'লে সাধ্য ও সাধন তত্ত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন।

মহাপ্রভু বললেন—ভগবান যুগে যুগে জীবের কল্যাণের জন্য অবতীর্ণ হন এবং কিভাবে তাঁর ভজন করতে হয় সেই বিষয়ে উপদেশ দেন। সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে পরিচর্যা ও কলিতে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন।

''কলিযুগ-ধর্ম্ম হয় নাম-সংকীর্ত্তন।
চারিযুগে চারিধর্ম জীবের কারণ।।"

—চৈঃ ভাঃ আদি ১৪/১৩৭

জীবের বল, বীর্য্য ও আয়ু বিচার করে শ্রীভগবান্ আচার্য্য-মূর্ত্তিতে এ সমস্ত ধর্ম নির্ণয় করেছেন। অতএব এর অন্যথা করলে কোন ফল হয় না।

''অতএব কলিযুগে নামযজ্ঞ সার।
আর কোন ধর্ম কৈলে নাহি হয় পার।।"

—চৈঃ ভাঃ আদি ১৪/১৩৯

শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। অন্য সাধন বাসনা ত্যাগ করে সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ নাম সংকীর্ত্তন করুন।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

—চৈঃ ভাঃ আদি ১৪/১৪৫

এ মন্ত্র-প্রভাবে আপনি সাধ্য ও সাধন তত্ত্বাদি সব কিছু জানতে পারবেন। শ্রীহরিনামই সাধ্য ও সাধন। শ্রীনাম ও নামী অভেদ।

তপন মিশ্র প্রভুর উপদেশ-শ্রবণে সাষ্টাঙ্গে মহাপ্রভুর শ্রীচরণ বন্দনা করলেন এবং প্রভুসঙ্গে নবদ্বীপে আসতে চাইলেন। প্রভু আদেশ করলেন--আপনি শীঘ্র কাশী যান, সেখানে আমাদের পুনঃ মিলন হবে;

তখন বিশেষভাবে সব তত্ত্বোপদেশ দান করব। এ বলে প্রভু নবদ্বীপের দিকে যাত্রা করলেন। তপন মিশ্র সপত্নীক কাশীর দিকে চললেন।

কয়েক বছর পরে করুণাময় গৌরহরি সন্ন্যাস গ্রহণ করে জননীর আদেশে পুরীধামে গেলেন। কয়েক মাস পুরীতে অবস্থান করবার পর, ঝারিখণ্ডের (ছোট নাগপুরের) পথে বৃন্দাবন যাত্রা করে পথে কাশীধামে উপস্থিত হলেন। প্রভু মণিকর্ণিকা ঘাটে 'হরিবোল' 'হরিবোল' ধ্বনি করলেন। তপন মিশ্র তখন সে ঘাটে স্নান করছিলেন। অকস্মাৎ হরিধ্বনি শুনে চমকে উঠলেন। মরুভূমির মধ্যে সমুদ্রের বান, মহা-মায়া-বাদীদের মধ্যে 'হরিধ্বনি'! দেখলেন তীরদেশে এক অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী; অঙ্গকান্তিতে চারিদিক আলোকিত হচ্ছে। বিস্ময়ান্বিত হয়ে ভাবতে লাগলেন—ইনি কে? নবদ্বীপের শ্রীনিমাই পণ্ডিত নাকি? শুনেছি তিনি সন্ন্যাসী হয়েছেন। জল থেকে উঠে দেখলেন সত্যই সেই শ্রীনিমাই পণ্ডিত সন্ন্যাসীবেশে এসেছেন। অমনি প্রভুর শ্রীচরণ বন্দনা করে আনন্দে রোদন করতে লাগলেন। প্রভু তাঁকে ভূমি থেকে উঠিয়ে আলিঙ্গন করলেন। অনেক দিনের পর মিলন হল। তপন মিশ্র বহু আদর করে প্রভুকে গৃহে আনলেন, তারপর তাঁর শ্রীচরণ ধৌত করে, সে জল সপরিবারে পান করলেন। পরম আনন্দ হল। তপন মিশ্রের পুত্র শিশু-রঘুনাথ পাদমূলে বন্দনা করলে প্রভু তাঁকে কোলে তুলে নিলেন। মিশ্র শীঘ্র রন্ধনের ব্যবস্থা করে দিলেন। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য রন্ধন করলেন। প্রভুর স্নানের ব্যবস্থা হল এবং স্নানাদি আবশ্যকীয় কর্ম্ম শেষ করে, প্রভু ভোজন করলেন। অবশেষ পাত্র পেলেন মিশ্র। মিশ্র-পুত্র রঘুনাথ প্রভুর শ্রীচরণ সম্বাহন করতে লাগলেন। ''মিশ্রপুত্র রঘু করে পাদ সম্বাহন।" (চৈঃ চঃ মধ্যঃ) প্রভু বিশ্রাম করলেন।

মহাপ্রভুর আগমন- শ্রবণে চন্দ্রশেখর ও মহারাষ্ট্র-বিপ্র প্রভৃতি ভক্তগণ এলেন ও তাঁর শ্রীচরণ বন্দনা করলেন। প্রভু চন্দ্রশেখরকে আলিঙ্গন করলেন ও সকলকে নিয়ে কিছুক্ষণ কৃষ্ণ কথা বললেন। প্রভু বিশ্বেশ্বর, বিন্দুমাধব ও দশাশ্বমেধ ঘাট প্রভৃতি দর্শন করলেন। মহাপ্রভু শ্রীচন্দ্রশেখরের ঘরে অবস্থান করতেন এবং মিশ্রের গৃহে ভোজন করতেন। শ্রীচন্দ্রশেখর বৈদ্য-কুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

কাশীতে ব্রহ্ম, আত্মা ও চৈতন্য তিন শব্দ ভিন্ন অন্য শব্দ নাই। প্রভুর আগমনে শ্রীকৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন আরম্ভ হল। মহারাষ্ট্রবিপ্র প্রভুর শ্রীচরণ ধরে প্রার্থনা করতে লাগলেন—হে প্রভো! কাশীপুর উদ্ধার করুন। সন্ন্যাসীদের গুরু প্রকাশানন্দ সরস্বতীর নিকট আমি তিনবার আপনার শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম উচ্চারণ করলাম কিন্তু তিনি তিন বার কেবল 'চৈতন্য' শব্দ বললেন। 'কৃষ্ণ' শব্দ বললেন না। প্রভু বললেন—মায়াবাদীগণ শ্রীকৃষ্ণ চরণে অপরাধী বলে তাদের মুখে শ্রীকৃষ্ণ শব্দ বহির্গত হয় না। শ্রীভগবানের নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপ তিনের মধ্যে কোন ভেদ নাই। এ তিনটি চিদানন্দ স্বরূপ। প্রভু পরদিন বৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করলেন। যাবার সময় বলে গেলেন কৃষ্ণের কৃপা হলে সব মায়াবাদী উদ্ধার হবে।

শ্রীবৃন্দাবন ধামে প্রভু কিছুদিন স্বানন্দে ভ্রমণাদি করবার পর পুনঃ কাশী ধামে এলেন। একদিন ছল করে প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে প্রভু সাক্ষাৎকার করলেন। প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভুর দৈন্য, অপরিসীম সৌন্দর্য্য, ঔদার্য্য ও বদান্যতা দেখে তাঁর শ্রীচরণ তলে লুটিয়ে পড়লেন। সন্ন্যাসিগণ প্রভুর চরণ বন্দনা করে তাঁর মহিমা গান করতে লাগলেন। এবার কাশীতে হরিনামের বন্যা প্রবাহিত হল, কাশীর মায়াবাদ-রূপ ময়লা যেন ধুয়ে গেল। কাশীতে প্রভু

এবার দশদিন রইলেন, ভক্তগণের আনন্দের সীমা রইল না। তপন মিশ্র, চন্দ্রশেখর ও মহারাষ্ট্র বিপ্র প্রভৃতি ভক্তগণ প্রাণ ভরে প্রভুর সেবা করলেন। মিশ্র-পুত্র রঘুনাথ ইষ্টদেবের সেবা করবার পরম সৌভাগ্য লাভ করলেন।

অনন্তর প্রভু ভক্তগণের থেকে বিদায় নিয়ে পুরীর দিকে চলবার উদ্যোগ করলেন। প্রভুর বিরহে ভক্তগণ বড়ই কাতর হলেন। মিশ্র-পুত্র রঘুনাথ কাঁদতে কাঁদতে প্রভুর শ্রীচরণ-মূলে লুটিয়ে পড়লেন। প্রভু তাঁকে কোলে নিয়ে অঙ্গ ঝেড়ে অনেক বুঝালেন। বললেন--পিতামাতার সেবা কর, মাঝে মাঝে পুরী ধামে এস, দর্শন হবে। তপন মিশ্র ও চন্দ্রশেখর আদি ভক্তগণকে আলিঙ্গন করলেন ও অনেক তত্ত্ব উপদেশ দিয়ে মহাপ্রভু বিদায় হলেন।

শ্রীরঘুনাথ অল্পকাল মধ্যে ব্যাকরণ, কাব্য ও অলঙ্কারাদি শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত হলেন। বৃদ্ধ পিতামাতার সেবা করতে লাগলেন। রঘুনাথের একটু বয়স হ'লে পিতা আদেশ করলেন তুমি পুরী ধামে গিয়ে শ্রীগৌরসুন্দরকে দর্শন করে এস। শ্রীরঘুনাথের আনন্দের সীমা রইল না। রঘুনাথের জননী প্রভুর সেবার জন্য বিবিধ খাদ্য সামগ্রী তৈরী করে একটি ঝালি প্রস্তুত করলেন। শ্রীরঘুনাথ পিতামাতার অনুজ্ঞা ও আশীর্ব্বাদ নিয়ে একটি ভৃত্যসহ পুরীর দিকে যাত্রা করলেন। রাস্তায় একজন রাম-ভক্ত বৈষ্ণবের সঙ্গে দেখা হল—নাম শ্রীরাম দাস। তিনি জাতিতে কায়স্থ, রাজকর্মচারী ও কাব্য প্রকাশের অধ্যাপক। রাম দাস শ্রীরঘুনাথ ভট্টের পদধূলি মাথায় নিলেন এবং ভৃত্যের কাছ থেকে সামগ্রীর ঝালিটি নিয়ে নিজের মাথায় করে চলতে লাগলেন।

শ্রীরঘুনাথ ভট্ট বললেন—আপনি পণ্ডিত হয়ে এ কি করছেন?

রাম দাস—ভট্ট জী! আমি শূদ্রাধম, ব্রাহ্মণের একটু সেবা করে সুকৃতি সঞ্চয় করি।

শ্রীরঘুনাথ—পণ্ডিত জী! আমি অনুরোধ করছি ঝালিটি ভৃত্যের মাথায় দেন। তথাপি শ্রীরাম দাস আনন্দ ভরে ঝালি নিয়ে চলতে লাগলেন।

শ্রীরঘুনাথ ভট্ট শ্রীরাম দাসের সঙ্গে বিবিধ শাস্ত্র প্রসঙ্গ আলোচনা করতে করতে ক্রমে পুরী ধামে পৌঁছালেন।

শ্রীরঘুনাথ ভট্ট মহাপ্রভুর শ্রীচরণে এলেন ও সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করলে প্রভু তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। প্রভু তাঁর পিতা-মাতার কুশল প্রশ্ন করলেন ও চন্দ্রশেখর প্রভৃতি ভক্তগণের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। শ্রীরঘুনাথ একে একে সমস্ত কথা বললেন। শ্রীরামদাসকে প্রভু-স্থানে আনলেন। শ্রীরাম দাস প্রভুর শ্রীচরণ বন্দনা করলেও অন্তর্য্যামী প্রভু তাঁর অন্তরে মুক্তি কামনা আছে দেখে তাঁকে তত আদর করলেন না। প্রভু রঘুনাথকে সমুদ্র-স্নানপূর্ব্বক শ্রীজগন্নাথ দর্শন করে আসতে আজ্ঞা করলেন। কোন ভক্ত-সঙ্গে ভট্ট সমুদ্রস্নান ও জগন্নাথ দর্শন করে ফিরে এলে গোবিন্দ মহাপ্রভুর অবশেষ প্রসাদ তাঁকে প্রদান করলেন। শ্রীরঘুনাথ ভট্টের ভোজনের ও থাকবার ব্যবস্থা মহাপ্রভু করে দিলেন; সেখানে শ্রীরঘুনাথ থাকতেন। কোন কোন দিবস বাসা ঘরে রন্ধন করে প্রভুকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক যত্ন করে ভোজন করাতেন। শ্রীরঘুনাথ আট মাস নীলাচলে মহাপ্রভুর শ্রীচরণে সুখে কাটালেন, জগন্নাথ দেবের সামনে মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব নৃত্য, গীত ও বিবিধ ভাব বিকারাদি তিনি দর্শন করলেন। তারপর মহাপ্রভু তাঁকে কাশীতে পিতা-মাতা স্থানে ফিরে যেতে আদেশ করলেন। রঘুনাথ মহাপ্রভুর বিচ্ছেদের কথা ভেবে অস্থির হয়ে পড়লেন। প্রভু তাঁকে বিবিধ সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—বিবাহ কর না,

বৃদ্ধ পিতা-মাতার সেবা করে ও বৈষ্ণবদের সাথে ভাগবত শাস্ত্র অধ্যয়ন কর পুনর্বার নীলাচলে এসে জগন্নাথ দেবকে দর্শন কর। এই বলে মহাপ্রভু স্বীয় কণ্ঠের মালাটি শ্রীরঘুনাথকে দিলেন। প্রভু তাঁর বৃদ্ধ পিতা-মাতার জন্য ও অন্যান্য বৈষ্ণবদের জন্য জগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদ দিলেন। বিদায় কালে রঘুনাথ ভট্ট কাতর-চিত্তে প্রভুর পাদপদ্ম-মূলে দণ্ডবৎ হয়ে পড়লে, প্রভু তাঁকে তুলে দৃঢ় আলিঙ্গন-পূর্ব্বক বিদায় করলেন। প্রভুর বিচ্ছেদ বেদনায় ব্যথিত চিত্তে রঘুনাথ ভট্ট কাশী-অভিমুখে যাত্রা করলেন।

শ্রীরঘুনাথ ভট্ট কাশীতে ফিরে এসে পিতা-মাতার সেবা এবং ভাগবত অধ্যয়ন করতে লাগলেন। বৃদ্ধ পিতা ও মাতা অপ্রকট হলে রঘুনাথ শ্রীমহাপ্রভুর নির্দ্দেশমত সংসারে প্রবিষ্ট না হয়ে পুরী ধামে তাঁর শ্রীচরণে এলেন। প্রভু রঘুনাথকে দেখে খুব খুশী হ'লেন। তাঁর বৈষ্ণব পিতা-মাতার সম্বন্ধে অনেক মহিমা বললেন। রঘুনাথ আনন্দে প্রভু-সন্নিধানে দিন যাপন করতে লাগলেন। আট মাস কেটে গেল। একদিন প্রভু রঘুনাথ ভট্টকে ডেকে বললেন—''তুমি বৃন্দাবনে যাও, ব্রজে তোমার অনেক কাজ আছে। আমি জননীর আদেশে এখানে বসে আছি, ব্রজের কোন কাজ করতে পারছি না। তোমাদের দ্বারা সে কাজ করাব''। প্রভুকে ছেড়ে যেতে হবে বলে রঘুনাথের মনে খেদ হতে লাগল, প্রভু তা জানতে পেরে বললেন  সেখানে রূপ ও সনাতনের সঙ্গে অবস্থান কর, সর্বদা ভাগবত শাস্ত্র আলোচনা কর। প্রভুর আদেশে শ্রীরঘুনাথ ভট্ট বৃন্দাবনে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন, অন্যান্য বৈষ্ণবদের থেকে বিদায় নিয়ে প্রভুর শ্রীচরণে এলেন। মহাপ্রভু বিদায়কালে রঘুনাথকে জগন্নাথের চৌদ্দহাত লম্বা প্রসাদি-মালা ও তাম্বুল মহাপ্রসাদ প্রভৃতি দিয়ে আলিঙ্গন করলেন। বিদায় হয়ে রঘুনাথ ভট্ট যে পথে প্রভু বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন সে পথে চললেন। স্থানে স্থানে প্রভুর কীর্ত্তি দর্শন ও লোকমুখে তাঁর চরিত শুনতে শুনতে ক্রমে বৃন্দাবনে পৌঁছলেন। শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামী তাঁকে অতি স্নেহ ভরে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক স্বাগত করলেন। গোস্বামিগণ অতিশয় সুখী হলেন। আপন ভ্রাতা জ্ঞানে রঘুনাথ ভট্টকে স্নেহ করতে লাগলেন। বিনয়, নম্রতা প্রভৃতি সদ্‌গুণে তিনি সকলকে বশীভূত করলেন—

রূপ গোসাঞির সভায় করেন ভাগবত পঠন।
ভাগবত পড়িতে প্রেমে আউলায় তাঁর মন।।
অশ্রু কম্প গদ্‌গদ্ প্রভুর কৃপাতে।
নেত্র রোধ করে বাষ্প না পারেন পড়িতে।।

চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ১৩/১২৬-১২৭

শ্রীরঘুনাথ ভট্টের কণ্ঠ কোকিলের ন্যায় সুমধুর ছিল। এক এক শ্লোকের কত রকমের রাগ-রাগিণী ফিরাতেন। শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী শ্রীগোবিন্দদেবের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। তিনি কোন ধনাঢ্য শিষ্যের দ্বারা শ্রীগোবিন্দদেবের মন্দির নির্মাণ করালেন। বিগ্রহগণের মকর-কুণ্ডল, বংশী প্রভৃতিও নির্মাণ করালেন। মহাপ্রভু তাঁকে যে মালা দিয়েছিলেন স্মরণ কালে তা কণ্ঠে ধারণ করতেন।

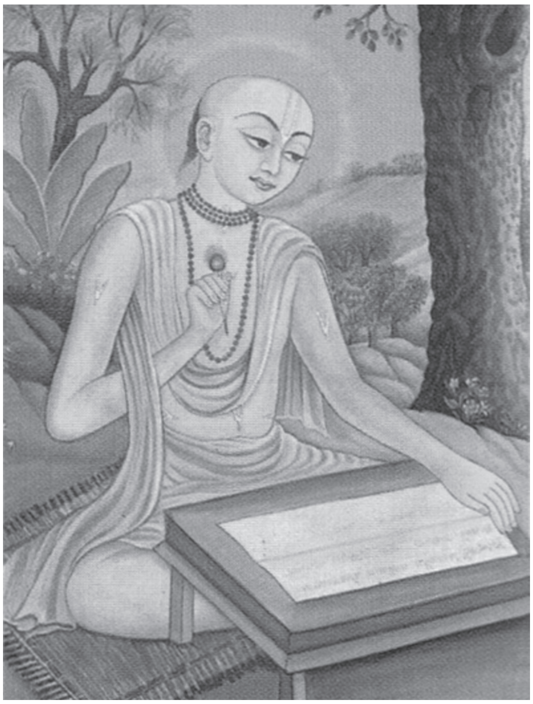
গ্রাম্য-বার্ত্তা না শুনে, না কহে জিহ্বায়।
কৃষ্ণ-কথা পূজাদিতে অষ্টপ্রহর যায়।।

—চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ১৩/১৩২

**।। জয় শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী কি জয়।।**



# শ্রীজীব গোস্বামী



''সুশীলঃ পণ্ডিতঃ শ্রীমান্‌ জীবঃ শ্রীবল্লভাত্মজঃ।।''
গৌঃ গঃ দীপিকা

পূর্বে যিনি বিলাসমঞ্জরী ছিলেন। তিনিই গোরলীলায় বল্লভের সুশীল-পণ্ডিত-পুত্র 'শ্রীজীব গোস্বামী' রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন।

শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম বা বল্লভ এই তিন ভাইয়ের মহা ঐশ্বর্য্যময় সংসারে একমাত্র পুত্র--শ্রীজীব। শিশুটির পালনের পরিপাটির অন্ত ছিল না। শিশুর গৌরবর্ণ অঙ্গকান্তিতে গৃহ আলোকিত হত। দীঘল নয়নে কি সুন্দর চাহনি—প্রতিটি অঙ্গে লাবণ্যের ছটা। রামকেলিতে শ্রীগৌরসুন্দর শুভাগমন করলে শিশুটি স্বীয় ইষ্ট-দেবের দর্শন-সৌভাগ্য লাভ করেন। তখনই মহাপ্রভু তাঁকে শ্রীচরণ-রজঃ দিয়ে ভবিষ্যৎ গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের আচার্য্য-সম্রাট পদে অভিষিক্ত করেন। যদ্যপি শ্রীজীব তখন অতি শিশু, মহাপ্রভুর ভুবনমোহন রূপটি যেন তিনি দৃঢ়ভাবে হৃদয়ে ধারণ করলেন। শিশুর ভোজনে, শয়নে, স্বপনে ও জাগরণে সর্ব্বদা সে দিব্য রূপের চিন্তা হত।

অতঃপর শ্রীজীবের পিতা অনুপম, শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন তিন জন একই সময়ে সেই মহা ঐশ্বর্য্যপূর্ণ আনন্দ কোলাহল মুখরিত সংসার থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় নিলেন। একমাত্র শিশু জীব ফতেয়াবাদে বিশাল রাজপ্রাসাদে শোকাশ্রুসিক্তা জননীর ক্রোড়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে লাগলেন। শিশুর ক্রন্দনে জননীর ও বন্ধু-বান্ধবগণের হৃদয়ে বিষাদের ছায়া পড়েছিল, তাঁরা খুব কষ্টে তাঁদের সান্ত্বনা দিতে লাগলেন।

শিশু শ্রীজীবের হৃদয়ে জেগে উঠে পিতৃব্যদ্বয়ের কথা ও পিতৃদেবের কথা। আবার তার সঙ্গে জাগে প্রেমময় গৌরহরির কথা; তখন আর ধৈর্য্য ধারণ করতে না পেরে অজ্ঞান হয়ে ভূমিতে পড়তেন। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ বিনা অন্য ক্রীড়াদি জানতেন না। কৃষ্ণ বলরামের মূর্ত্তিকে সুন্দর সাজাতেন, পূজা করতেন, নৈবেদ্য দিতেন, অনিমেষ নয়নে শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করতেন ও দণ্ডবৎ প্রণতি হতেন ভূতলে পড়ে।

''শ্রীজীব বাল্যকালে বালকের সনে।
শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধ বিনা খেলা নাহি জানে।।''
ভঃ রঃ ১/৭১৯

গৃহে পণ্ডিতগণের কাছে শ্রীজীব অল্পকাল মধ্যে ব্যাকরণ, কাব্য ও অলঙ্কারাদি শাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। তাঁর অসাধারণ মেধা দেখে অধ্যাপকগণ বলতেন--এরূপ মেধাবী নর-শিশু






সচরাচর দেখা যায় না। এ শিশু একসময় মহাপুরুষ হবে। শ্রীজীব বাল্যকালে অধ্যয়ন করতে করতে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কথা চিন্তা করতেন। একদিন শ্রীজীব স্বপ্নে দেখলেন--শ্রীরাম ও কৃষ্ণ যেন নিতাই-গৌররূপে নৃত্য করছেন।

"শ্রীজীবের মনে হৈল মহাচমৎকার।
অনিমিষ-নেত্রে শোভা দেখয়ে দোঁহার।।"

ভঃ রঃ ১/৭৩২

করুণাময় শ্রীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দ শ্রীজীবকে চরণের ধূলি দিয়ে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক অন্তর্দ্ধান হলেন। শ্রীজীবের স্বপ্ন ভঙ্গ হল, তিনি অন্তরে একটু আশ্বস্ত হলেন। মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন—সংসার ত্যাগ করে কবে একান্তভাবে মহাপ্রভুর সেবা করতে পারবেন। শ্রীজীব সংসারে একমাত্র পুত্র; জননী তাঁর বদন পানে চেয়ে সব দুঃখ ভুলে আছেন।

পিতৃব্যদ্বয় ও পিতা শ্রীবৃন্দাবন ধামে আছেন—শ্রীজীব এতাবৎকাল এরূপ ভাবনা করতেন। যখন শুনলেন পিতা অনুপমদেব গঙ্গাতটে দেহ রক্ষা করেছেন তখন তিনি দুঃখে অধীর হয়ে উঠলেন। দু'নয়ন জলে নিয়ত সিক্ত হতে লাগল। স্বজনগণ কত সান্ত্বনা দিতে লাগলেন কিন্তু কিছুতেই তাঁর মন শান্ত হ'ল না। সংসার একেবারে দুঃখময় হয়ে উঠল। শ্রীজীবের এ-প্রকার দশা দেখে স্বজনগণ বললেন—নবদ্বীপে গিয়ে শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীচরণ দর্শন করে যদি একটু শান্তি লাভ করে, শ্রীজীব তথায় যাক্। শ্রীজীবের নবদ্বীপে যাওয়া ঠিক হ'ল। দেশের যাত্রীদের সঙ্গে এক ভৃত্যসহ নবদ্বীপে যাত্রা করলেন। "ফতেয়াবাদ হৈতে চলে এক ভৃত্য লৈয়া।।"—(ভঃ রঃ ১/৭৪১) শ্রীজীব যে আগমন করছেন অন্তর্যামী শ্রীনিত্যানন্দ তা জানতে পারলেন। তিনি খড়দহ থেকে তাড়াতাড়ি নবদ্বীপে মায়াপুরে এলেন।

এদিকে শ্রীজীব ক্রমে নবদ্বীপ নগরে প্রবেশ করলেন ও নগরের মনোহর শোভা দেখে মুগ্ধ হলেন। সাষ্টাঙ্গে গঙ্গাদেবীকে বন্দনা করলেন। জিজ্ঞাসা করতে করতে শ্রীমায়াপুরে এসে লোকমুখে শুনলেন শ্রীবাস-গৃহে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু আছেন। শ্রীজীব দ্বারদেশে প্রেমভরে ভূতলে দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতসহ দ্বারে এসে শ্রীজীবকে ভূমি থেকে উঠিয়ে আলিঙ্গন করে বললেন—তুমি রূপ-সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র? শ্রীজীব পুনঃ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর চরণে পড়লেন। শ্রীজীবকে গৃহে নিলেন এবং স্বজন-গৃহাদির কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। ক্রমে ক্রমে সমস্ত বৈষ্ণবগণের চরণ বন্দনাদি করলেন শ্রীজীব। বৈষ্ণবগণ পরম সুখী হলেন শ্রীজীবকে দেখে। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ভুক্তাবশেষ প্রসাদ পেয়ে পর-দিবস প্রাতঃকালে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সাথে শ্রীশচীমাতার গৃহে এলেন। প্রভুর জন্ম-গৃহের কি অপূর্ব্ব শোভা! শ্রীজীবের হৃদয় শীতল হল। শ্রীজীব ভূপতিত হয়ে দণ্ডবৎ করলেন। প্রভুর বিশাল অঙ্গনে বৈষ্ণবগণ বসে শ্রীগৌরসুন্দরের চরিত-কথা কীর্ত্তন করছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে দর্শন করে তাঁরা দণ্ডায়মান হলেন এবং ভূতলে পড়ে দণ্ডবৎ করলেন। শ্রীজীব দেখলেন— গৃহ-বারান্দায় অতি বৃদ্ধা শ্রীশচীমাতা বসে আছেন। শুভ্র-বস্ত্রে অঙ্গ ঢাকা, গাত্রে রেশমের চাদর, বস্ত্রের সঙ্গে কেশের শুভ্রতা সাযুজ্য পাচ্ছে। শ্রীশচীমাতার দেহটী বার্দ্ধক্যবশতঃ কম্পমান। যদ্যপি অঙ্গ অতি ক্ষীণ ও জীর্ণ তথাপি শ্রীঅঙ্গের দিব্য-তেজে গৃহ আলোকিত হচ্ছে। জননী শ্রীগৌরসুন্দরের চিন্তায় আত্মবিস্মৃত হয়ে মুদিত নেত্রে বসে আছেন। ভগবদ্-জননী শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আগমন বুঝতে পারলেন--অমনি শিরে অবগুণ্ঠন টেনে ভৃত্য ঈশানকে বললেন--ঈশান! শ্রীপাদ এসেছেন, তাঁর চরণ ধৌত করে দাও।






শ্রীঈশান নিত্যানন্দপ্রভুর চরণ ধৌত করে দিলেন। শচীমাতাকে নমস্কার করে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বসলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শচীমাতাকে শ্রীজীবের পরিচয় দিলে, শচীমাতা শ্রীজীবের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন। ''কৃপা করি শচীদেবী কৈলা আশীর্ব্বাদ।।" (শ্রীনবদ্বীপ ধাম মাহাত্ম্য)। শ্রীশচীমাতার আশীর্ব্বাদ পেয়ে শ্রীজীব আনন্দ সাগরে ভাসতে লাগলেন। শ্রীশচীমাতার আমন্ত্রণে তাঁরা দ্বিপ্রহরে শচীগৃহে ভোজন করলেন।

খাও বাছা নিত্যানন্দ জননীর স্থানে।
এই আমি গৌরচন্দ্রে ভুঞ্জানু গোপনে।।

শ্রীনবদ্বীপ ধাম মাহাত্ম্য

কয়েকদিন শ্রীজীব নিত্যানন্দপ্রভুর সাথে নবদ্বীপে অবস্থান করে নবদ্বীপ-ধামে প্রভুর বিবিধ লীলা-স্থান সকল দর্শনাদি করলেন। তারপর নিত্যানন্দ প্রভুর নির্দ্দেশমত প্রথমে কাশী হয়ে শ্রীবৃন্দাবন ধাম অভিমুখে যাত্রা করলেন। শ্রীজীব কাশীধামে এসে শ্রীমধুসূদন বাচস্পতির নিকট কিছুদিন থেকে বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শ্রীমধুসূদন বাচস্পতি শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে যে ভাগবত সিদ্ধান্তপর বেদান্তের ব্যাখ্যা শুনিয়েছিলেন, সে সিদ্ধান্ত পুনঃ তিনি মধুসূদন বাচস্পতিকে শিক্ষা দেন। মধুসূদন বাচস্পতি কাশীতে সে শুদ্ধ ভাগবত-সিদ্ধান্ত ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতেন।

কাশী থেকে শ্রীজীব বৃন্দাবনে গমন করেন এবং শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামীর শ্রীচরণ দর্শন লাভ করেন। শ্রীজীবকে দেখে শ্রীরূপ সনাতন বড় সুখী হলেন; যাবতীয় খবর জিজ্ঞাসা করলে শ্রীজীব সমস্ত খবর বললেন। শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীজীবকে কাছে রেখে ভাগবত শাস্ত্র অধ্যয়ন করাতে লাগলেন ও মন্ত্র-দীক্ষা দিয়ে শ্রীশ্রীরাধা দামোদরের সেবায় নিযুক্ত করেন। শ্রীজীব অল্পকাল মধ্যে ভাগবত-সিদ্ধান্তে পরম পারদর্শী হয়ে উঠলে শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁকে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থ সংশোধন করতে দিলেন। শ্রীজীব গ্রন্থ সংশোধন করতে করতে ''দুর্গম সঙ্গমনী" নামক এক টীকা লিখলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী ১৪৭৬ শকাব্দে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের টিপ্পনী–শ্রীবৈষ্ণব-তোষণী লিখেন। এ গ্রন্থের সংশোধন করেন শ্রীজীব। শ্রীসনাতনের আজ্ঞায় ১৫০০ শকাব্দে শ্রীজীব ঐ গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ লিখেছিলেন। নাম দিয়েছিলেন ''লঘুবৈষ্ণব-তোষণী"। এ ছাড়া শ্রীজীব গোস্বামী বহু গ্রন্থ ও গোস্বামী গ্রন্থের টীকাদি লিখেছিলেন। শ্রীরূপ, সনাতন, শ্রীগোপালভট্ট, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীরঘুনাথ দাস, শ্রীকৃষ্ণ দাস, শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিত, শ্রীমধু পণ্ডিত ও শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতির অপ্রাকৃত কাব্যমাধুর্য্য তৎকালীন বিদ্বজ্জনকে মুগ্ধ করতে থাকে। ব্রজধামে এক সুবর্ণ যুগ আরম্ভ হয়।

### আদর্শ শিষ্য

শ্রীজীব নিয়মিত ভাবে শ্রীরূপের ও শ্রীসনাতনের স্নানের জল আনয়ন, মস্তকে তৈল মর্দ্দন, আশ্রম সংস্কার, শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন, ভোগরন্ধন ও গ্রন্থ-পত্রাদির সংশোধন করতেন।

পুষ্টি-মার্গের প্রবর্ত্তক শ্রীমদ্ বল্লভাচার্য্য শ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্গী ছিলেন। শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন তাঁকে গুরুতুল্য সম্মান দিতেন। তিনি শ্রীরূপ সনাতনকে পরম স্নেহ করতেন ও বারবার তাঁদের দর্শনের জন্য আসতেন। একদিন শ্রীবল্লভাচার্য্য শ্রীরূপ গোস্বামীর স্থানে এলে শ্রীরূপ গোস্বামী দণ্ডবৎ করে তাঁকে আসনে বসালেন ও স্বকৃত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর মঙ্গলাচরণ শ্লোকটি তাঁর হাতে দিলেন। তিনি পড়ে বললেন সুন্দর হয়েছে, একটু ভুল আছে, পরে সংশোধন করে দিব। তারপর

ভগবৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক আলাপ আলোচনাদি করে বিদায় হলেন। শ্রীরূপ দৈন্য করে পুনর্ব্বার আসবার জন্য বললেন। তখন গ্রীষ্মকাল। শ্রীজীব শ্রীরূপের পিছনে দাড়িয়ে পাখা করতে করতে সব কথা শুনেছিলেন। শ্রীবল্লভাচার্য্য শ্রীরূপের মঙ্গলাচরণ শ্লোকের কি সংশোধন করবেন শ্রীজীব তা বুঝতে পারলেন না। তখন তিনি কিছু না বলে পরে যমুনা-ঘাটে জল নিতে আসার ছল করে শ্রীবল্লভাচার্য্যের কাছে জিজ্ঞাসা করে, আচার্য্য যে ভুল দেখাতে চেয়েছিলেন তা খণ্ডন করলেন। শুনে বল্লভাচার্য্য খুব সুখী হলেন। ''শুনি ভট্ট প্রশংসা করিল সর্ব্বমতে।।'' (শ্রীভক্তিরত্নাকর পঞ্চম-তরঙ্গে)। অন্য দিবস শ্রীবল্লভাচার্য্য শ্রীরূপ গোস্বামীর নিকট বিবিধ ভগবদ্-প্রসঙ্গ আলোচনা করবার পর শ্রীজীবের পরিচয় জানতে চাইলেন এবং তাঁর শাস্ত্রে অগাধ বোধ আছে বলে খুব প্রশংসা করলেন। শ্রীজীব তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বলে, শ্রীরূপ গোস্বামী পরিচয় দিলেন। বল্লভাচার্য্য নিজ-স্থানে বিদায় হলেন।

অতঃপর শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীজীবকে আহ্বান করে কিছু শাসন-বাক্য বলে গৃহে ফিরে যাবার জন্য আদেশ করলেন। অস্থির-মনে পাণ্ডিত্য বুদ্ধি নিয়ে ব্রজবাস হয় না। এ বলে শ্রীরূপ গোস্বামী মৌনী হলেন। শ্রীজীব মনে বড় দুঃখ পেয়ে অপরাধ করেছেন বিবেচনা ক'রে তাঁকে দণ্ডবৎ করে গৃহে চলে যাবার সংকল্প পূর্ব্বক শ্রীরূপের নিকট থেকে যাত্রা করলেন। পুনঃ কি মনে করে শ্রীনন্দ-ঘাটে একটি জনশূন্য কুটীরে নিরাহারে রোদন করতে লাগলেন। গ্রামবাসী লোকগণ ছুটে এলেন এবং এ সংবাদ শীঘ্র শ্রীসনাতন গোস্বামীর কাছে পৌঁছাল। শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীজীবের স্থানে এসে তাঁর ক্ষীণ-শরীর ও দুঃখের ভাব দেখে তাঁকে ভূতল থেকে তুলে অঙ্গের ধূলাদি ঝেড়ে প্রবোধ দিতে লাগলেন। নিজের স্থানে তাঁকে নিয়ে এসে স্নান ভোজনাদি করালেন। সনাতন গোস্বামী শ্রীরূপের কাছে এ সমস্ত কথা বললেন, শ্রীরূপ গোস্বামী শুনে স্নেহার্দ্র হৃদয়ে কোন লোককে পাঠিয়ে তৎক্ষণাৎ শ্রীজীবকে নিজ স্থানে আনলেন। শ্রীজীব দণ্ডবৎ করতেই শ্রীরূপ অতি স্নেহ ভরে তাঁকে ভূমি থেকে উঠিয়ে কোলে নিয়ে অঙ্গের ধূলা ঝাড়তে ঝাড়তে অনেক কথা বললেন।

শ্রীজীবের দশা দেখি শ্রীরূপ গোঁসাই।
করিলেন শুশ্রূষা কৃপার সীমা নাই।।

—ভক্তি রত্নাকর

শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে যেমন শাসন করেন, তেমন স্নেহও করেন। শ্রীরূপ-সনাতনের অনুগ্রহে শ্রীজীব পৃথিবীতলে সর্ব্বশাস্ত্রে ও কৃষ্ণ ভক্তিতে সিদ্ধ হয়েছিলেন।

শ্রীরূপ সনাতন প্রভৃতি গোস্বামিগণের অপ্রকটের পর শ্রীজীব শ্রীরূপ-সনাতনের মনোভীষ্ট পূরণ-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। একবার শ্রীজীব গোস্বামী রাজপুতদের সঙ্গে গঙ্গা যমুনা নিয়ে বাদশার যে বিবাদ হয়েছিল, তার সুমীমাংসা করবার জন্য আগ্রা যান। যমুনার স্থান গঙ্গার উপরে শ্রীজীব গোস্বামী তা প্রমাণ করেন—গঙ্গা শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্ম থেকে উদ্ভুত, যমুনা, শ্রীহরিপ্রেয়সী। এ-কথা শ্রবণে বাদশা সন্তুষ্ট হয়ে শ্রীজীব গোস্বামীকে তুলট কাগজ ভেট দেন।

শ্রীমদ্ লোকনাথ গোস্বামীর অনুগ্রহ-পাত্র শ্রীনরোত্তম ঠাকুর, শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর অনুগ্রহ পাত্র শ্রীনিবাস আচার্য্য ও শ্রীহৃদয় চৈতন্য প্রভুর অনুগ্রহ-পাত্র শ্রীশ্যামানন্দ, এ তিন জন শ্রীজীবের পরম কৃপাভাজন হয়েছিলেন। সমগ্র গোস্বামী-শাস্ত্র শ্রীজীব তাঁদের পড়িয়েছিলেন এবং প্রচার করবার ভার তাঁদের উপর দিয়েছিলেন।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

শ্রীজীব গোস্বামী সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অনুভাষ্যে এইরূপ লিখেছেন–

**"ইনি (শ্রীজীবগোস্বামী) শ্রীরূপ-সনাতন অপ্রকটের পর উৎকল-গৌড়-মাথুরমণ্ডলের গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আচার্য্যপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া শ্রীগৌরসুন্দর প্রচারিত সত্য কীর্ত্তন করিয়া হরিভজন করাইতেন। মধ্যে মধ্যে ইনি ভক্তগণসহ ব্রজধাম পরিক্রমা করিতেন ও মথুরায় বিঠ্‌ঠলদেব দর্শন করিতে যাইতেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী ইঁহার প্রকটকালেই শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত রচনা করেন। ইনি কিছুকাল পরে গৌড়দেশ হইতে আগত শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও দুঃখীকৃষ্ণদাসকে যথাক্রমে আচার্য্য, ঠাকুর ও শ্যামানন্দ নাম প্রদান করিয়া তদ্‌রচিত যাবতীয় গোস্বামী-শাস্ত্রাদিসহ গৌড়দেশে নামপ্রেম প্রচারার্থ প্রেরণ করেন। প্রথমে গ্রন্থাপহরণ সংবাদ ও পরে তদুদ্ধার সংবাদ শ্রবণ করেন। ইনি শ্রীনিবাসশিষ্য রামচন্দ্র সেনকে ও তদনুজ গোবিন্দকে কবিরাজ নাম প্রদান করেন। ইনি প্রকট থাকিতে শ্রীল জাহ্নবা দেবী কতিপয় ভক্তসহ বৃন্দাবনে আগমন করিয়াছিলেন। গৌড়দেশ হইতে ভক্তগণ আসিলে ইনি তাঁদের প্রসাদ সেবা ও বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেন।"**

শ্রীভক্তিরত্নাকরে শ্রীজীবগোস্বামীর লিখিত ২৫টি গ্রন্থের নাম উল্লিখিত হয়েছে—১। হরিনামামৃত ব্যাকরণ, ২। সূত্রমালিকা, ৩। ধাতুসংগ্রহ, ৪। কৃষ্ণার্চ্চনদীপিকা, ৫। গোপালবিরুদাবলী, ৬। রসামৃত শেষ, ৭। শ্রীমাধব-মহোৎসব, ৮। শ্রীসঙ্কল্পকল্পবৃক্ষ, ৯। ভাবার্থসূচক চম্পু, ১০। গোপালতাপনী টীকা, ১১। ব্রহ্মসংহিতার টীকা, ১২। রসামৃতটীকা, ১৩। উজ্জ্বলটীকা, ১৪। যোগসার স্তবকের টীকা, ১৫। অগ্নিপুরাণস্থ শ্রীগায়ত্রীভাষ্য, ১৬। পদ্মপুরাণোক্ত শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন, ১৭। শ্রীরাধিকা কর-পদস্থিত চিহ্ন, ১৮। গোপালচম্পু--পূর্ব্ব ও উত্তর বিভাগ, ১৯। ক্রমসন্দর্ভ, ২০। তত্ত্বসন্দর্ভ, ২১। ভগবৎ সন্দর্ভ, ২২। পরমাত্মসন্দর্ভ, ২৩। কৃষ্ণসন্দর্ভ, ২৪। ভক্তিসন্দর্ভ ও ২৫। প্রীতিসন্দর্ভ।

অনভিজ্ঞ সহজিয়া সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব অপরাধমূলক কার্য্যের দ্বারা যাতে কেউ কৃষ্ণপ্রেম হতে বঞ্চিত হয়ে অমঙ্গলকে বরণ না করেন, সেকারণে তাদেরকে সাবধান করবার জন্য শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনুভাষ্যে এরূপ লিখেছেন–

**"অনভিজ্ঞ প্রাকৃত সহজিয়াসম্প্রদায়ে শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর বিরুদ্ধে তিনটী অপবাদ প্রচলিত আছে; তদ্দ্বারা কৃষ্ণবৈমুখ্যহেতু হরিগুরু-বৈষ্ণব-বিরোধ-মূলে অবশ্যই তাহাদের অপরাধ বর্দ্ধিত হয় মাত্র।**

**১। জড়প্রতিষ্ঠাভিক্ষু এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নিষ্কিঞ্চন শ্রীরূপ-সনাতনের নিকট হইতে জয়পত্র লিখাইয়া গুরুবর্গের (শ্রীরূপ-সনাতনের) মূর্খতা জ্ঞাপন করিয়া শ্রীজীবকেও জয়পত্র লিখিয়া দিতে বলেন। শ্রীজীব প্রভু তাহা শুনিয়া দিগ্বিজয়ীকে পরাজিত করিয়া গুরু অপবাদকারীর জিহ্বা স্তম্ভিত করিয়া গুরুদেবের পদ-নখ-শোভার মর্য্যাদা প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রকৃত "গুরুদেবাত্ম" শিষ্যের আদর্শ প্রদর্শন করেন। ঐ সকল সহজিয়া বলেন,–শ্রীজীবের এতাদৃশ আচরণে তাঁহার 'তৃণাদপি সুনীচতা' ও 'মানদ' ধর্ম্মের বিরোধহেতু শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু তাঁহাকে তীব্র ভর্ৎসনাপূর্ব্বক পরিত্যাগ করেন, পরে শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর ঈঙ্গিতে পুনরায় শ্রীজীব প্রভুকে গ্রহণ করেন।**

**ঐ গুরুবৈষ্ণববিরোধিগণ কৃষ্ণকৃপায় যেদিন আপনাদিগকে গুরুবৈষ্ণবের নিত্যদাস বলিয়া**

জানিবেন, সেইদিন শ্রীজীব প্রভুর কৃপা লাভ করিয়া প্রকৃত 'তৃণাদপি সুনীচ' ও 'মানদ' হইয়া হরিনামকীর্ত্তনে অধিকারী হইবেন।

২। কোন কোন অনভিজ্ঞ বলেন,—কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর 'চরিতামৃত'-রচনা-সৌষ্ঠব ও অপ্রাকৃত ব্রজরস-মাহাত্ম্য-দর্শনে স্বীয় প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ হইবে আশঙ্কায় শ্রীজীবের হিংসার উদয় হওয়ায় তিনি মূল 'চরিতামৃত' খানা কূপমধ্যে নিক্ষেপ করেন, কবিরাজ গোস্বামী তাহা শ্রবণ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। তাঁহার শিষ্য 'মুকুন্দ' নামক এক ব্যক্তি পূর্ব্বে মূল পাণ্ডুলিপি নকল করিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া পুনরায় চরিতামৃত প্রকাশিত হইলেন, নতুবা চরিতামৃতগ্রন্থ জগৎ হইতে লুপ্ত হইত।

এরূপ হেয় বৈষ্ণব-বিদ্বেষমূলক কল্পনা—নিতান্ত মিথ্যা ও অসম্ভব।

৩। অপর কোন কোন ইন্দ্রিয়তর্পণ-তৎপর ব্যভিচারি বলেন,—শ্রীজীব প্রভু শ্রীরূপগোস্বামীর মতানুযায়ী ব্রজগোপীগণের 'পারকীয় রস' স্বীকার না করিয়া স্বকীয়রসের অনুমোদন করায় তিনি রসিক ভক্ত ছিলেন না, সুতরাং তাঁহার আদর্শ গ্রাহ্য নহে।

প্রকটকালে স্বীয় অনুগতগণের মধ্যে কোন কোন ভক্তকে 'স্বকীয় রসে' রুচিবিশিষ্ট দেখিয়া তাঁহাদের মঙ্গলের নিমিত্ত তাঁহাদের অধিকার বুঝিয়া এবং পাছে অনধিকারী ব্যক্তিগণ অপ্রাকৃত পরম-চমৎকারময় পারকীয়-ব্রজরসের সৌন্দর্য্য ও মহিমা বুঝিতে না পারিয়া স্বয়ং তাদৃশ অনুষ্ঠান করিতে গিয়া ব্যভিচার আনয়ন করে, তজ্জন্য বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব প্রভু স্বকীয়-বাদ স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে তাঁহাকে অপ্রাকৃত পারকীয় ব্রজরসের বিরোধী বলিয়া বুঝিতে হইবে না, কেননা, তিনি স্বয়ং শ্রীরূপানুগবর,—সাক্ষাৎ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর শিক্ষাগুরুবর্গের অন্যতম।"

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু ভাদ্র-শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে আবির্ভূত হন এবং পৌষী শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে তিরোধান লীলা প্রকাশ করেন। শ্রীল জীব গোস্বামীর সেবিত বিগ্রহ শ্রীরাধাদামোদর জীউ বৃন্দাবনে শ্রীরাধাদামোদর মন্দিরে সেবিত হচ্ছেন। শ্রীরাধাদামোদর মন্দিরের পার্শ্বে শ্রীজীব গোস্বামীর সমাধি এবং শ্রীরাধাকুণ্ড তটে (ললিতাকুণ্ডের নিকটে) ভজনকুটীর রয়েছে।

।। জয় শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু কি জয়।।

# শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী



ব্রজে যিনি 'অনঙ্গমঞ্জরী' ছিলেন, তিনি এখন 'শ্রীগোপাল ভট্ট' গোস্বামী হয়েছেন। কেউ কেউ এঁনাকে শ্রীগুণমঞ্জরীও বলে থাকেন।

অনঙ্গমঞ্জরী যাসীৎ সাদ্য গোপালভট্টকঃ।
ভট্টগোস্বামিনং কেচিৎ আহুঃ শ্রীগুণমঞ্জরীম্।।
গৌঃ গঃ দীপিকা ১৮৪

শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী ১৪২২ শকাব্দে ১৫০০ খৃষ্টাব্দে, (মতান্তরে ১৪২৫ শকাব্দে, ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে) দক্ষিণ ভারতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর পিতার নাম শ্রীবেঙ্কট ভট্ট। শ্রীরঙ্গমের নিকটে কাবেরী নদীর তীরে বেলগুণ্ডীগ্রামে তাঁর নিবাস ছিল।

শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী মহাপ্রভুর কৃপায় স্বপ্নে সম্পূর্ণ নবদ্বীপ লীলা দর্শন করেছিলেন। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস বেশ গোপাল ভট্টের ভাল লাগেনি, তাই নির্জনে ক্রন্দন করতে থাকলে মহাপ্রভু তাঁকে স্বপ্নে সম্পূর্ণ নদীয়ালীলা দর্শন করিয়ে প্রেমাবিষ্ট হয়ে তাঁকে কোলে বসিয়ে অশ্রু জলে সিক্ত করিয়েছিলেন।

এত কহি গোপালেরে করি প্রভু কোলে।
গোপালের অঙ্গসিক্ত কৈল নেত্রজলে।।
কহিল এসব কথা রাখিহ গোপনে।
হইল পরমানন্দ গোপালের মনে।।
ভক্তিরত্নাকর ১/১২৩-১২৪

করুণাময় শ্রীগৌরহরি প্রেম বিতরণ করতে করতে ক্রমে ক্রমে দক্ষিণ দেশের প্রতি নগরে নগরে শ্রীনাম-প্রেম বিতরণ করছেন। তাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত হরিনামামৃত পান করে সহস্র সহস্র নরনারীর প্রাণ শীতল হয়। দীন হীন পতিত জনগণ কৃষ্ণ নামামৃত পান করে জীবন ধন্যাতিধন্য করল। শ্রীমহাপ্রভু নাম-প্রেম বর্ষণ করতে করতে মহাতীর্থ শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। শ্রীরঙ্গনাথ দেবের সুবিশাল গগনভেদী চূড়াযুক্ত শ্রীমন্দির। তার সাতটি প্রকার। দিন রাত লক্ষ লক্ষ দর্শকের সমাগম। ব্রাহ্মণগণ দ্বারা উচ্চারিত মন্ত্রধ্বণিতে মন্দিরটি সর্ব্বদা মুখরিত। শ্রীগৌরসুন্দর যখন সে মন্দিরে কোটী গন্ধর্ব্ব বিনিন্দিত সুমধুর কণ্ঠে "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ" নামকীর্ত্তন ধরলেন, সকলে স্তম্ভিত, বিস্মিত ও পুলকিত হয়ে উঠলেন। কি অপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তিখানি, যার কাছে তপ্ত সোনার কান্তিও নিষ্প্রভ হয়। তাতে প্রস্ফুটিত কমল তুল্য দীর্ঘ নয়নযুগল দিয়ে দরদর করে প্রেমবারি ঝরছে। প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সুষমা যেন মদনের মন হরণ করছে। ব্রাহ্মণগণ ভাবতে লাগলেন—এ কি কোন দেব? মনুষ্যের শরীরে কি এত অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হতে পারে? পুনঃ 'হরিবোল' 'হরিবোল' করে নেত্র-নীরে ভাসতে ভাসতে যখন শ্রীবিগ্রহের সামনে বাতাহত তরুর ন্যায় পতিত হলেন, তখন মনে হল,—যেন কনকগিরি ভূতলে লুটাচ্ছে। শ্রীব্যেঙ্কট ভট্ট দিব্য পুরুষটিকে দেখে আর স্থির থাকতে পারলেন না। ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে উঠে লোকজনকে সরিয়ে তিনি প্রভুর নৃত্য-কীর্ত্তনের সুবিধা করে দিতে লাগলেন। তারপর প্রভু যখন একটু স্থির হলেন, তখন ব্যেঙ্কট তাঁর শ্রীচরণ রজঃ

গ্রহণ করলেন। প্রভু তাঁর দিকে তাকিয়ে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে তাঁকে দৃঢ় আলিঙ্গন করলেন। শ্রীব্যেঙ্কট ভট্ট প্রভুকে আমন্ত্রণ করে স্বীয় গৃহে নিয়ে গেলেন। তাঁর শ্রীচরণ ধৌত করে সে জল সপরিবারে পান করলেন। ভট্টের গৃহ আনন্দময় হল।

মহাপ্রভু ১৪৩৩ শকাব্দে ব্যেঙ্কট ভট্টের গৃহে গমন করেছিলেন। ভট্টের ত্রিমল্ল ভট্ট ও প্রবোধানন্দ সরস্বতী নামে আরও দু'টী ভাই ছিলেন। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ ছিলেন শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ী ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী। শ্রীব্যেঙ্কট ভট্ট ও ত্রিমল্লভট্ট রামানুজ সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব ছিলেন। শ্রীব্যেঙ্কট ভট্টের পুত্র শ্রীগোপাল ভট্ট। ইনি তখন শিশু। মহাপ্রভুর শ্রীচরণে প্রণাম করতে প্রভু তাঁকে কোলে নিয়ে জড়িয়ে ধরলেন। প্রভু ভোজনান্তর অবশেষ গোপালকে ডেকে দিলেন। এভাবে প্রসাদ দিয়ে তাঁকে ভবিষ্যৎ আচার্য্য রূপে অভিষিক্ত করলেন।

প্রভু যখন শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে এলেন তখন চাতুর্ম্মাস্য কাল। এ সময়টী প্রভু ভট্টের গৃহে যাপন করবার জন্য রইলেন। শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বহু 'শ্রী' সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবের বাস, প্রভুর দিব্য-ভাব দেখে সকলে তাঁর প্রেমে আবিষ্ট হলেন। প্রতিদিন এক এক বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ-প্রভুকে ভোজন করাতেন। চার মাস কাল এরূপে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেও অনেক বৈষ্ণব গৃহস্থ আমন্ত্রণ করবার সুযোগ পেলেন না।

প্রভু ভট্ট গৃহে অবস্থান করতেন। শ্রীগোপাল প্রতিদিন প্রভুর পরিচর্য্যা করতেন। মহাপ্রভু শ্রীবেঙ্কট ভট্ট ও তাঁর আত্মীয়বর্গের সেবায় সন্তুষ্ট হলেও লক্ষ্য করলেন, বেঙ্কটভট্টের হৃদয়ে কিছু অভিমান আছে। ভট্ট শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসনা করতেন। তিনি ভাবতেন শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের উপাসনাই শ্রেষ্ঠ্য। লক্ষ্মীনারায়ণ সর্ব্বারাধ্য। আর কৃষ্ণ রাম নৃসিংহ প্রভৃতি সকলেই নারায়ণের আরাধনা করেন। তাই ভট্টের অভিমান দূর করার জন্য মহাপ্রভু তাঁদের সঙ্গে হাস্য পরিহাসাদি করতেন।

একদিন প্রভু বললেন—ভট্ট! তোমার লক্ষ্মী সাধ্বী শিরোমণি। আমার কৃষ্ণ গোপ, গো-চারক। তাঁর সঙ্গ কেন চান?

ব্যেঙ্কট ভট্ট বললেন—কৃষ্ণ ও নারায়ণ একই স্বরূপ। কৃষ্ণেতে অধিক লীলা বৈদগ্ধিতাদি গুণ আছে। তাঁর স্পর্শে পতিব্রতা ধর্ম যায় না, কৌতুক করে লক্ষ্মী তাঁর স্পর্শ করতে চান। এতে আপনি পরিহাস করছেন কেন?

প্রভু—লক্ষ্মীদেবী তপস্যা করে কৃষ্ণকে পেলেন না। শ্রুতিগণ তপস্যা করে কৃষ্ণ পেলেন কি করে?

ভট্ট—এ বিষয়ে আমি কিছু বুঝতে পারি না।

"তুমি সাক্ষাৎ সেই কৃষ্ণ, জান নিজ ধর্ম।
যারে জানাহ সেই জানে তোমার লীলা-মর্ম্ম।।"

—চৈঃ চঃ মধ্যঃ ৯

প্রভু--কৃষ্ণের বিশেষ লক্ষণ— স্বমাধুর্য্য দ্বারা সকলের চিত্ত আকর্ষণ করেন। কৃষ্ণকে একমাত্র ব্রজগোপীর ভাবে পাওয়া যায়। কৃষ্ণ নিত্য গোপরাজ-নন্দন। নিজেকে সতত গোপ অভিমান করেন। গোপীভিন্ন অন্য কাউকেও তিনি স্পর্শ করেন না। লক্ষ্মীদেবী বৈকুণ্ঠেশ্বরী। তিনি কদাপি গোপীর আনুগত্য স্বীকার করতে চান না। শ্রুতিগণ গোপীর আনুগত্যের জন্য তপস্যা করে গোপগৃহে গোপকন্যারূপে জন্মগ্রহণ করবার পর শ্রীকৃষ্ণকে পেয়েছিলেন। লক্ষ্মীদেবী সে দেহে শ্রীনন্দ নন্দনের সঙ্গ চান। সেজন্য তপস্যা করেও তিনি পান নি। ব্রজবাসীগণ জানেন কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র নন্দন। কেউ পুত্র জ্ঞানে, কেউ মিত্র জ্ঞানে ও কেউ কান্ত জ্ঞানে হৃদয়ভরে স্নেহ করে। যশোদার শুদ্ধ বাৎসল্য, তাঁর ঐশ্বর্য্য দেখলেও মুগ্ধ হন না। তাতে তাঁর বাৎসল্য-প্রীতি

আরও বেড়ে যায়। দেবকীর ঐশ্বর্য্য-মিশ্র বাৎসল্য, ঐশ্বর্য্য মুগ্ধ হয়ে স্তুতি করেন। ভগবান্ কেবল বাৎসল্যভাবে যত প্রীত হন ঐশ্বর্য্যমিশ্র ভাবে তত প্রীত হন না।

ব্রজবাসীগণ কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হন না, তাঁকে ভগবান্ বলে মানেন না। এভাবে ভগবান্ বড়ই প্রীত হন। শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-মূর্ত্তি শ্রীনারায়ণ। সেজন্য লক্ষ্মী প্রভৃতির মন হরণ করতে পারেন। কিন্তু শ্রীনারায়ণ গোপীগণের মন হরণ করতে পারেন না। এক সময় কৃষ্ণ গোপীগণের সঙ্গে বিলাস করতে করতে অন্তর্দ্ধান হলেন। গোপীগণ কাতরভাবে কুঞ্জে কুঞ্জে অন্বেষণ করতে লাগলেন। কোথাও পেলেন না। কৃষ্ণ গোপীগণকে বঞ্চনা করবার জন্য এক কুঞ্জের মধ্যে চতুর্ভুজরূপে অবস্থান করতে লাগলেন। গোপীগণ অনেক খোঁজ করতে করতে সে কুঞ্জে এলেন। চতুর্ভুজধারীকে দেখলেন, নারায়ণ জ্ঞান করে নমস্কার করলেন এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা করলেন– হে নারায়ণ! কৃপা করে নন্দনন্দনকে মিলিয়ে দাও। এ বলে গোপীগণ অন্যত্র কৃষ্ণ অন্বেষণ করতে লাগলেন। অবশেষে শ্রীরাধা ঠাকুরাণী অনুসন্ধান করতে করতে সেখানে এলেন এবং মূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। তখন কৃষ্ণ আর চতুর্ভুজ রাখতে পারলেন না, দ্বিভুজ হলেন।

শ্রীরাধা বললেন–হে সখি ললিতে! শীঘ্র এস বংশীধারীকে পেয়েছি।

ললিতা–বংশীধারী কোথায়?

শ্রীরাধা–এই ত' বংশীধারী।

ললিতা–উনি ত' নারায়ণ?

বিশাখা–আমরা ত' দেখে এলাম।

শ্রীরাধা–তোমরা কি চোখের মাথা খেয়েছ?

তখন সখীগণ সকলে সমবেত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ উচ্চ হাস্য করতে লাগলেন।

ভট্ট-পরিবার প্রভুর শ্রীমুখে এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণ-লীলা শ্রবণ করে যেন আনন্দ-সাগরে ভাসতে লাগলেন। ব্যেঙ্কট ভট্ট প্রভুর শ্রীচরণে দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন। প্রভু তাঁকে তুলে আলিঙ্গন করলেন ও অনেক প্রশংসা করলেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় শ্রীব্যেঙ্কটভট্ট, তাঁর ভাই শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী ও ত্রিমল্ল ভট্ট প্রত্যেকেই লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসনা পরিত্যাগ করে সর্ব্বতোভাবে রাধাকৃষ্ণের উপাসনায় নিযুক্ত হয়েছিলেন।

ভট্টের গৃহে চার মাস প্রভু এরূপে কৃষ্ণ-কথা-রঙ্গে অতিবাহিত করলেন। তারপর বিদায় চাইলেন। ভট্ট-গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠল। ভট্ট পুত্র শ্রীগোপাল কেঁদে প্রভুর শ্রীচরণ তলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। প্রভু আর কয়েক দিন থেকে প্রবোধ দিয়ে গোপালকে বললেন,–তুমি এখন গৃহে মাতা-পিতার সেবা কর। পরে বৃন্দাবনে এস। নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণ নাম শ্রবণ-কীর্ত্তন কর। প্রভু সকলকে এরূপ উপদেশ করে তীর্থ যাত্রা করলেন।

শ্রীগোপাল ভট্ট অল্পকাল মধ্যে ব্যাকরণ কাব্য অলঙ্কার ও বেদান্ত শাস্ত্রাদিতে পারদর্শী হলেন। তাঁর পিতৃব্য শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বিশেষ করে ভক্তিশাস্ত্র শিক্ষা দিতে লাগলেন। ''পিতৃব্য কৃপায় সর্ব্ব-শাস্ত্রে হৈল জ্ঞান। গোপালের সম এথা নাই বিদ্যাবান্।।'' (ভক্তিরত্নাকর প্রথম তরঙ্গ)

শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী তাঁর পিতৃব্য শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের নিকট হতে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে এই বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যায়।

''ভক্তের্বিলাসাংশ্চিুতে প্রবোধা-<br>
নন্দস্য শিষ্যো ভগবৎপ্রিয়স্য।<br>
গোপালভট্টো রঘুনাথদাসং<br>
সন্তোষয়ন্ রূপ সনাতনো চ।।''

প্রভুর শ্রীচরণ দর্শনের পর হতে শ্রীগোপাল ভট্টের মন নিয়ত প্রভুর চরণ চিন্তায় মগ্ন হল।

কবে পুনঃ প্রভুর দর্শন পাব? সর্ব্বদা এ চিন্তায় দিনাতিপাত করতেন। বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে ত্যাগ করে যেতে পারেন না। এরূপে কিছুদিন কেটে গেল। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর অন্তিম সময় উপস্থিত হল। গোপালকে ডেকে বললেন--বৎস! আমাদের অন্তর্দ্ধানের পর তুমি শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীচরণে বৃন্দাবনে চলে যেও। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী এরূপ আদেশ করে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ স্মরণ করতে করতে স্বধামে প্রবেশ করলেন।

বৃন্দাবনে যাইতে পুত্রেরে আজ্ঞা দিয়া।
দোঁহে সঙ্গোপন হৈলা প্রভু সোঙরিয়া।।

—ভক্তিরত্নাকর

বৈষ্ণব পিতা-মাতার অপ্রকটের পর শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী বৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করলেন। বৃন্দাবনে শ্রীগোপাল ভট্ট এলে শ্রীরূপ গোস্বামী পুরীতে প্রভুর নিকট তৎক্ষণাৎ লোক প্রেরণ-পূর্ব্বক সংবাদ পাঠিয়ে দিলেন।

প্রভু শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনকে পূর্ব্বেই জানিয়ে রেখেছিলেন বৃন্দাবনে শ্রীগোপাল ভট্ট আগমন করবেন। শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামী তাঁকে আপন ভ্রাতার ন্যায় আদর-যত্ন করতে লাগলেন। তাঁদের মধ্যে অনবদ্য প্রেম-মৈত্রী, ভাব প্রকট হল।

শ্রীরূপ গোস্বামীর প্রেরিত ভক্ত পত্রসহ পুরীতে মহাপ্রভুর সন্নিকটে উপস্থিত হলেন। প্রভু পত্রখানি দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। বৈষ্ণবগণের নিকট শ্রীগোপাল ভট্টের বিবরণ বলতে লাগলেন। প্রভু বৃন্দাবন থেকে শ্রীরূপ গোস্বামীর প্রেরিত লোকের দ্বারা শ্রীরূপের নিকট পত্র ও শ্রীগোপাল ভট্টের জন্য ডোর কৌপীন ও বহির্ব্বাস প্রেরণ করলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী সে লোকের মাধ্যমে প্রভুর পত্র ও শ্রীগোপাল ভট্টের জন্য কৌপীন বহির্ব্বাসাদি পেয়ে অতিশয় আনন্দিত হলেন।

শ্রীগোপাল ভট্ট মহাপ্রভুর প্রদত্ত ডোর-কৌপীন পেয়ে বড়ই সুখী হলেন এবং তা প্রভুর কৃপা-প্রসাদ জ্ঞানে ধারণ করলেন। শ্রীরূপের পত্রে কি কি করণীয় তাও জ্ঞাত হলেন। সেইভাবে তিনি চলতে লাগলেন। তিনিও শ্রীরূপ-সনাতনের ন্যায় অনিকেত ছিলেন। কুঞ্জে কুঞ্জে রাত্রি যাপন করতেন এবং ভক্তি-গ্রন্থাদি অধ্যয়ন লিখনাদি কাজ করতেন।

কোন সময় শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী হরিদ্বারের নিকট সাহারণপুরে দেববন্দ্য গ্রামে শুভ বিজয় করেন। একদিন গ্রামান্তরে এক ভক্ত-গৃহে শুভ বিজয় করছেন। অপরাহ্ণ কাল হঠাৎ বৃষ্টি আরম্ভ হল। পথে এক ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয় নিলেন। ব্রাহ্মণটি পরম ভক্তিমান। শ্রীভট্ট গোস্বামীকে খুব আদর যত্ন করতে লাগলেন। গোস্বামিপাদ তাতে খুব সুখী হলেন। ব্রাহ্মণটি অপুত্রক ছিলেন। তিনি আশীর্বাদ করলেন, তোমার হরি-ভক্তিপরায়ণ পুত্র হবে। ব্রাহ্মণ বললেন—প্রথম পুত্র আপনার সেবার জন্য দিব।

শ্রীভট্ট গোস্বামী কিছুদিন সাহারণপুরে হরিনাম প্রচার করে বৃন্দাবনে ফিরে এলেন। আসবার সময় গণ্ডকী নদী থেকে বারটী শালগ্রাম এনেছিলেন। সে বারটী শালগ্রামের মধ্যে একটী মূর্ত্তি প্রকট করে শ্রীরাধারমণদেব নাম ধারণ করেন।

প্রায় দশ বছর পরের কথা। একদিন শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী মধ্যাহ্নকালে যমুনা স্নান করে ভজন কুটিরে ফিরছেন। দূর থেকে দেখলেন একটী শিশু দরজায় বসে আছে। শিশুটী শ্রীগোস্বামিপাদকে দেখে গাত্রোত্থান করলেন, তাঁকে দণ্ডবৎ করলেন। শ্রীভট্ট গোস্বামী জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কে? কুমারটি উত্তর করল আমি সাহারণপুর দেববন্দ্য গ্রাম থেকে এসেছি।

শ্রীভট্ট গোস্বামী—তোমার পিতার নাম কি? কেন



আমার কাছে এসেছ? কুমার বললো—আপনার সেবা করবার জন্য পিতা আমাকে পাঠিয়েছেন। আমার নাম গোপীনাথ। তখন শ্রীভট্ট গোস্বামীর পূর্ব্ব কথাসমূহ মনে পড়ল। বালকটিকে সেবক করে রেখে দিলেন। গোপীনাথ অতি সাবধানে শ্রীভট্ট গোস্বামীর সেবা করতে লাগলেন।

পরবর্ত্তীকালে শ্রীগোপীনাথ পূজারী গোস্বামী নামে পরিচিত হন। ব্রহ্মচারীরূপে ইনি আজীবন শ্রীরাধারমণ দেবের সেবা করেছিলেন। এঁনার ছোট ভাই শ্রীদামোদর দাস স-পরিবার শ্রীগোপীনাথজীর নিকট থেকে মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং শ্রীরাধারমণ দেবের সেবায় নিযুক্ত হন। শ্রীদামোদর দাসের তিন পুত্র হরিনাথ, মথুরানাথ ও হরিরাম।

**শিশুর ক্রন্দনে**

শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী বারটি শালগ্রাম সেবা করতেন। যেখানে যেতেন ঝোলায় করে নিয়ে যেতেন। একসময় তাঁর মনে শ্রীবিগ্রহ সেবার ইচ্ছা হল। এ সময় একজন ধনী ব্যবসায়ী শ্রীভট্ট গোস্বামীর দর্শনের জন্য এলেন। শেঠ শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীকে দর্শন সম্ভাষণ করে বড়ই সুখী হলেন। শ্রীভগবানের সেবার জন্য বহু উপকরণ বস্ত্রালঙ্কার অর্পণ করলেন। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী সমস্ত দ্রব্য শালগ্রামের সামনে রেখে দিলেন।

শেঠজী শ্রীগোস্বামিপাদের থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন। শ্রীভট্ট গোস্বামী সন্ধ্যাকালে শালগ্রামের আরতি করলেন এবং ভোগাদি অর্পণ করে শালগ্রামগণকে শয়ন দিলেন। উপরে একখানি ঝুড়ি চাপা দিলেন। শ্রীগোস্বামিপাদ কিছু রাত্র পর্য্যন্ত ভজনাদি করবার পর কিছু সামান্য প্রসাদ নিয়ে শয়ন করলেন। প্রাতঃকালে যমুনা স্নান করে যখন শালগ্রাম জাগরণ করতে গেলেন, ঝুড়ি তুলে দেখলেন, শালগ্রামগুলির মধ্যে একটি শালগ্রাম দিব্য বংশীধারণ করে ত্রিভঙ্গরূপে অবস্থান করছেন। শ্রীভট্ট গোস্বামী সে অপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করে আনন্দ সাগরে ভাসতে লাগলেন। সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করে বিবিধ স্তব-স্তুতি করতে লাগলেন। এ শুভ সংবাদ শুনে শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীসনাতন গোস্বামী ও অন্যান্য বৈষ্ণব গোস্বামিগণ শীঘ্র সেখানে উপস্থিত হলেন এবং ভুবনমোহন রূপ দর্শন করে প্রেমাশ্রু ধারায় সিক্ত হতে লাগলেন। সম্বৎ ১৫৯৯, খৃষ্টাব্দ ১৫৪২ বৈশাখী পূর্ণিমাতে এ শ্রীবিগ্রহ প্রকট হন। গোস্বামিগণ নামকরণ করলেন— ''শ্রীরাধারমণ দেব।''

শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী শ্রীরাধারমণ দেবের সেবা করতে করতে মহাপ্রভুর কথা স্মরণে বিহ্বল হতেন। শ্রীভট্টের দু'নয়ন দিয়ে অশ্রুধারা ঝরত। তখন শ্রীরাধারমণ দেব শ্রীগৌরাঙ্গ-স্বরূপে শ্রীভট্টকে দর্শন দিতেন।

গোপালের প্রেমাধীন শ্রীরাধারমণ।
শ্রীগৌরসুন্দর মূর্ত্তি হৈলা সেইক্ষণ।।

—ভক্তিরত্নাকর

শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী শ্রীনিবাস আচার্য্যকে মন্ত্র-দীক্ষা প্রদান করেন। শ্রীমদ্ সনাতন গোস্বামী শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর নামে শ্রীহরিভক্তিবিলাস রচনা করেন। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী ষট্ সন্দর্ভের কারিকা, কৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা, সৎ ক্রিয়াসার দীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

শ্রীগোপাল ভট্টের রচিত শ্লোক—
ভাণ্ডীরেশ শিখণ্ডমণ্ডন বর শ্রীখণ্ডলিপ্তাঙ্গ হে!
বৃন্দারণ্য পুরন্দর স্ফুরদমন্দেন্দীবর-শ্যামল।।
কালিন্দীপ্রিয় নন্দনন্দন পরানন্দারবিন্দেক্ষণ।
শ্রীগোবিন্দ মুকুন্দ সুন্দরতনো মাং দীনমানন্দয়।।

**পদ্যাবলী**

''শ্রীগোপাল ভট্ট আশ, বৃন্দাবন কুঞ্জে বাস,
শয়ন স্বপন নয়নে হেরি' ভুলল মন আপ হেঁ।

শাঙ্গর চীত উনতে নাগিও পলকন নারে আঁখি।
যুথ যুথ, মন মথ ঝুলত, গোপাল ভট্ট ইথে সাখি।।
ঐছে হট পুনঃ উলটি বৈঠলি, কানুক বদন নিতান্ত না হেরলি,
গোপাল ভট্ট ভনয়ে, ভামিনী পীরিতি টুটলো গো।।”

শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী ১৫০৭ শকাব্দে আষাঢ়ী কৃষ্ণা-পঞ্চমী তিথিতে (মতান্তরে শুক্লা পঞ্চমী, ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দ (১৫০০ শকাব্দে) শ্রাবণ কৃষ্ণা-ষষ্ঠী তিথিতে) তিরোধান লীলা করেন। শ্রীরাধারমণ মন্দিরের সন্নিকটে তাঁর সমাধি বিদ্যমান।

**।। জয় শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী কি জয়।।**



## শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী

‘‘দাস শ্রীরঘুনাথস্য পূর্ব্বাখ্যা রসমঞ্জরী।
অমুং কেচিৎ প্রভাষন্তে শ্রীমতীং রতিমঞ্জরীম্।।
ভানুমত্যাখ্যয়া কেচিদাহুস্তং নামভেদতঃ।।

গৌঃ গঃ ১৮৬

শ্রীকৃষ্ণলীলায় যিনি রসমঞ্জরী ছিলেন, তিনিই এখন শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী রূপে প্রকট হয়েছেন। কেউ কেউ ওনাকে ‘রতিমঞ্জরী’, আবার কেউ কেউ ভানুমতী বলে থাকেন।

আনুমানিক ১৪১৬ শকাব্দে হুগলী জেলার অন্তর্গত সপ্তগ্রাম হতে কিছু দূরে প্রাচীন সরস্বতী নদীর পূর্ব্বতীরে শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রামে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী আবির্ভূত হন। সপ্তগ্রাম হতে শ্রীকৃষ্ণপুরের দূরত্ব এক মাইলের কিছু বেশী। সপ্তগ্রাম বলতে সাতটি গ্রামের সমষ্টি--১। সপ্তগ্রাম,২। শিবপুর, ৩। বাসুদেবপুর, ৪। কৃষ্ণপুর, ৫। নিত্যানন্দপুর, ৬। বংশবাটী ও ৭। শঙ্খনগর।

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর পিতা ছিলেন শ্রীগোবর্দ্ধন মজুমদার। গোবর্দ্ধন মজুমদার এবং শ্রীহিরণ্য মজুমদার দুই ভাই ছিলেন। তারা দুজনে সপ্তগ্রামের অধিপতি (জমিদার) ছিলেন। তাঁদের বার্ষিক আয় ছিল আট লক্ষ মুদ্রা। শোনা যায় সে সময় এক মুদ্রায় বা এক টাকায় আট মন চাল পাওয়া যেত।

শ্রীবলরাম আচার্য্য ছিলেন শ্রীহরিণ্য ও গোবর্দ্ধন মজুমদারের পুরোহিত। তিনি চাঁদপুরে অবস্থান করতেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুর যখন বেনাপোলের জঙ্গলে রামচন্দ্র খাঁর প্রেরিত বেশ্যাকে উদ্ধার করে বেনাপোল পরিত্যাগ করে চাঁদপুরে শ্রীবলরাম আচার্য্যের গৃহে অবস্থান করেছিলেন, সেই সময় শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী বাল্য অবস্থায় হরিদাস ঠাকুরের দর্শন লাভ করেন। মহাভাগবত হরিদাস ঠাকুরের দর্শন ও কৃপাতেই শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী মহাপ্রভুর সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন।

‘‘রঘুনাথ দাস বালক করেন অধ্যয়ন।
হরিদাস ঠাকুরেরে যাই’ করেন দর্শন।।





হরিদাস কৃপা করেন তাঁহার উপরে।
সেই কৃপা 'কারণ' হৈল চৈতন্য পাইবারে।।"

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩/১৬৮-১৬৯

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের একমাত্র পুত্র ছিলেন। তাঁর আদর যত্নের সীমা ছিল না। তিনি রাজপুত্রের ন্যায় প্রতিপালিত হতেন। কিন্তু তিনি সৎসঙ্গ প্রভাবে অল্প বয়সে সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করতে পারলেন। এই সংসারের ধন, জন, পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি তিনি উদাসীন ও বিরক্ত হয়ে পড়লেন। যখন মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করে শান্তিপুরে অদ্বৈত গৃহে এলেন, তখন শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী মহাপ্রভুকে প্রথম দর্শন করেন। মহাপ্রভুকে দর্শনমাত্রই তিনি প্রেমাবিষ্ট হয়ে পড়েন। রঘুনাথের পিতা গোবর্দ্ধন মজুমদার অদ্বৈত প্রভুকে অনেক শ্রদ্ধা-ভক্তি করতেন। পিতার সম্বন্ধে অদ্বৈত আচার্য্যের রঘুনাথের প্রতি যথেষ্ট স্নেহ ছিল। তিনি প্রতিদিন রঘুনাথকে মহাপ্রভুর অবশেষ প্রসাদ দিতেন। মহাপ্রভু শান্তিপুর থেকে নীলাচলে চলে গেলে রঘুনাথ গৃহে ফিরে এসে গৌর-বিরহে উন্মত্ত হয়ে গেলেন। রঘুনাথের প্রেমোন্মত্ত অবস্থা দেখে তাঁর পিতা ১১ জন প্রহরীর (৫ পাইক, ৪ সেবক, ২ ব্রাহ্মণ) সাহায্যে তাঁকে কড়া পাহারার মধ্যে রাখলেন। তবুও রঘুনাথ মাঝে মাঝে ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়। আবার পিতা তাঁকে পাহারাদার দিয়ে ধরে নিয়ে আসেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাত্রার সময় কানাইর নাটশালা থেকে প্রত্যাবর্ত্তন করে শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে এসেছেন। এই সংবাদ পেয়ে রঘুনাথ পিতার নিকট মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য অনুমতি চাইলেন। পুত্রকে ব্যাকুল দেখে পিতা চিন্তিত হয়ে অনেক লোক ও দ্রব্যসহ পুত্রকে মহাপ্রভুর নিকট প্রেরণ করলেন। কিন্তু শীঘ্র ফিরে আসতে বললেন। রঘুনাথ দাস শান্তিপুরে মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করে যেন প্রাণ ফিরে পেলেন। মহাপ্রভুর নিকট নিজ দুঃখের কথা নিবেদন করলেন এবং কি উপায়ে সংসার বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করা যায় তাঁর জন্য প্রার্থনা জানালেন। সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভু রঘুনাথের হৃদয়ের ভাব বুঝে তাঁকে শিক্ষা প্রদানের জন্য আশ্বাস দিয়ে বললেন—

"স্থির হঞা ঘরে যাও, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল।।
মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাঞা।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ' অনাসক্ত হঞা।।
অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক ব্যবহার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার।।"

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৬/২৩৭-২৩৯

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উপদেশের তাৎপর্য্য মর্কট-বৈরাগ্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখেছেন—

**"বাহ্যদর্শনে ভোগবুদ্ধি-বিশিষ্ট বানরগণ যেরূপ গৃহাদি অথবা বস্ত্রাদিবর্জ্জিত হইয়া বিরাগ-বিশিষ্ট পুরুষের সহিত সমান বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, অথচ ইন্দ্রিয়তর্পণ হইতে নিবৃত্ত হয় না, তাদৃশ লোক দেখান বৈরাগ্যকেই মর্কট-বৈরাগ্য বলে। যে বৈরাগ্য শুদ্ধভক্তি হইতে তৎসহ জাতরূপে উৎপন্ন না হইয়া কৃষ্ণেতর বস্তুর প্রতি কামনার বা বাসনার ব্যাঘাত হইতে জাত, যাহা শুদ্ধভক্তির অনুকূলরূপে যাবজ্জীবন স্থায়ী না থাকিয়া ক্ষণিক বা ফল্গু, তাহাই শ্মশান-বৈরাগ্য বা মর্কট-বৈরাগ্য। কৃষ্ণসেবা-কল্পে নিতান্ত অপরিহার্য্য বিষয়ের ভোগ স্বীকারমাত্র করিয়া তত্তদ্বিষয়ে অভিনিবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক বাস করিলে মানব কর্ম্মফলাধীন হয় না।"**

**"যাবতা স্যাৎ স্ব-নির্ব্বাহঃ স্বীকুর্য্যাত্তাবদর্থবিৎ।
আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ।।**

**—ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব বিভাগ নারদীয় বচন**

**এই শ্লোকের 'স্বনির্ব্বাহঃ' শব্দে শ্রীজীব**

**প্রভু দুর্গমসঙ্গমনী টীকায় 'স্ব-স্ব ভক্তিনির্ব্বাহঃ' বলিয়াছেন। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ফল্গুবৈরাগ্য ও যুক্ত-বৈরাগ্য কাহাকে বলে তাহা সুস্পষ্টরূপে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। যথা–**

**"প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরি-সম্বন্ধি-বস্তুনঃ।**
**মুমুক্ষুভি পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।।"**

**অর্থাৎ "শ্রীহরিসেবায় যাহা অনুকূল। বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।।"**

**"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।**
**নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।।"**

**অর্থাৎ "আসক্তিরহিত, সম্বন্ধসহিত, বিষয়সমূহ সকলি মাধব।"**

প্রভুর--এ আদেশ শুনে শ্রীরঘুনাথ ঘরে ফিরে গেলেন এবং বিষয়ী-প্রায় অবস্থান করে সংসারে কার্য্য করতে লাগলেন। তা দেখে পিতা-মাতা অতিশয় সুখী হলেন। শ্রীরঘুনাথের মন প্রভুর শ্রীচরণে পড়ে আছে। একরাতে পালিয়ে তিনি পুরীর দিকে যাত্রা করলেন। তাঁর পিতা দশ জন লোক পাঠিয়ে তাঁকে ধরে আনলেন। এরূপে যতবার রঘুনাথ পালায় ততবার তাঁকে ধরে আনা হয়। বংশের একমাত্র সন্তান রঘুনাথ। তাঁকে কড়া পাহারা দিয়ে রাখা হল। পিতা-মাতা চিন্তা করলেন রঘুনাথের যদি বিবাহ দেওয়া যায় তবে আর পালাতে পারবে না। রঘুনাথকে অল্প বয়সে বিবাহ দিলেন এক বড় জমিদারের কন্যার সঙ্গে। পত্নী দেখতে অপ্সরার ন্যায়। শ্রীরঘুনাথের মন তাতে কি মোহিত হয়? তাঁর মন কোটি কন্দর্পের দর্পহারী শ্রীহরির পাদপদ্মে।

অর্থ হলে শত্রুও হয়। হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের জমিদারীর মোট আয় বিশ লক্ষ। নবাবকে দিতে হত বার লক্ষ। এ ঐশ্বর্য্য দেখে মুসলমান চৌধুরীর সহ্য হল না। চৌধুরী নবাবের সেরেস্তায় গিয়ে মিথ্যা নালিশ করল। হুজুর ঘরের খবর রাখেন না? হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের জমিদারীতে বর্ত্তমান আয় বিশ লক্ষ কিন্তু আপনাকে দিচ্ছে বার লক্ষ মাত্র। আদায় যদি বেশী হয় আপনাদের করও তাকে বেশী দিতে হবে। নবাব বললেন– তুমি ঠিক বলছ, তলব কর। রাজাকে কম দিয়ে নিজে বেশী নিচ্ছে এ কেমনতর কথা, হিরণ্য-গোবর্দ্ধনকে বন্দী কর। হিরণ্য-গোবর্দ্ধন একথা শুনে পালালেন। নবাবের সৈন্য বাড়ী ঘিরল। তাঁদের না পেয়ে শ্রীরঘুনাথ দাসকে বেঁধে নিয়ে গেল। তাঁকে কারাগারে রাখল। উজির ধমক দিয়ে বললেন–তোমার বাপ জ্যেঠা কোথায়?

আমি জানি না।

তুমি জান, কিন্তু মিথ্যা বলছ।

আমি কি করে জানব তাঁরা কোথায় গেছেন? উজির তখন খুব তর্জ্জন-গর্জ্জন করতে করতে মারবার ভয় দেখাতে লাগলেন। শ্রীরঘুনাথ দাস কিন্তু নির্ভীক। উজির রঘুনাথের সৌম্যমূর্ত্তি ও প্রসন্ন বদন দেখে ভুলে গেলেন।

"মারিতে আসিয়া যদি দেখে রঘুনাথে।
মন ফিরে যায় তবে না পারে মারিতে।।"

–চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৬/২২

মুসলমান উজির মনে মনে ভয় পেলেন। কায়স্থ জাতি। তাদের বুদ্ধি-বিদ্যার কাছে সকলে নত হয়। শ্রীরঘুনাথের মিষ্ট বাক্যে ক্রমে উজিরের মন নরম হল, বলতে লাগলেন– তোমার বাপ-জ্যেঠা এত টাকা পাচ্ছে, আমাদের বেশী দিচ্ছে না। শ্রীরঘুনাথ বললেন–আমার বাপ-জ্যেঠা ত আপনার ভাইয়ের মত। ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া হয় আবার সহজে মিলনও হয়। আমি যেমন পিতার পুত্র, তেমনি আপনারও পুত্র। আমি আপনার পাল্য, আপনি আমার পালক। পালক হয়ে পাল্যকে তাড়ন করা উচিত নয়। আপনি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, জিন্দাপীরের ন্যায় ব্যক্তি। অধিক আর কি বলব? এ কথা শুনে ম্লেচ্ছ অধিকারীর

মন আর্দ্র হল। দাড়ি বেয়ে অশ্রু পড়তে লাগল। বললেন—আজ থেকে তুমি আমার পুত্র। অধিকারী এ কথা বলে শ্রীরঘুনাথকে মুক্ত করে দিলেন। শ্রীরঘুনাথ ঘরে ফিরে এলেন এবং বাপ-জ্যেঠাকে বলে নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করালেন। মীমাংসা সহজেই হয়ে গেল। শ্রীরঘুনাথকে সকলে প্রশংসা করতে লাগলেন। শ্রীরঘুনাথ দাসের এক বছর এভাবে কেটে গেল। শ্রীরঘুনাথ দাস আবার সংসার ছেড়ে পালাবার জন্য উদ্যত হলেন। পিতা জানতে পেরে কড়া পাহারা দিয়ে রাখতে লাগলেন। শ্রীরঘুনাথ নিরুপায় হলেন। ভাবতে লাগলেন কেন শ্রীগৌরসুন্দর নিজ পাদপদ্মে আমাকে স্থান দিচ্ছেন না? তাঁর জননী বলতে লাগলেন—পুত্র পাগল হয়েছে, বেঁধে রাখ। পিতা বললেন—বেঁধে রাখলেই বা কি হবে?

ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য-স্ত্রী অপ্সরা-সম।
এ সব বান্ধিতে নারিলেক যাঁর মন।।
দড়ির বন্ধনে তাঁরে রাখিবা কেমতে?
জন্মদাতা পিতা নারে 'প্রারব্ধ' খণ্ডাইতে।।
চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হঞাছে ইঁহারে।
চৈতন্য প্রভুর 'বাতুল' কে রাখিতে পারে?

চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৬/৩৯-৪১

গোবর্দ্ধন দাস একথা বলে পত্নীকে প্রবোধ দিলেন।

একদিন শ্রীরঘুনাথ চিন্তা করলেন, করুণাময় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা ছাড়া বোধ হয় শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা পাওয়া যাবে না। আগে তাঁর শ্রীচরণ একবার দর্শন করি। শ্রীরঘুনাথ একদিন বাপ-মাকে বললেন—আমি পানিহাটিতে শ্রীরাঘব পণ্ডিতের ঘরে কীর্ত্তন-মহোৎসব দর্শন করতে যাব। এবার বাপ-মা বাধা দিলেন না, যাবার অনুমতি দিলেন। তাঁর নিরাপত্তার জন্য সঙ্গে কয়েক জন ভৃত্য দিলেন ও অর্থ-কড়ি দিলেন।

পানিহাটি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভাবে আনন্দময়। গৃহে-গৃহে শ্রীহরি সংকীর্ত্তন মহোৎসব। শ্রীরঘুনাথ দাস পানিহাটিতে এসে পরম সুখী হলেন। ক্রমে তিনি গঙ্গাতটে যেখানে ভক্ত সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বসে আছেন সে স্থানে উপস্থিত হলেন। দূর থেকে শ্রীরঘুনাথ দেখলেন, গঙ্গাতট আলোকিত করে একটা বৃক্ষমূলে ভক্তগণ সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বসে আছেন। শ্রীরঘুনাথ দেখেই দূর থেকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন।

শ্রীহিরণ্য-গোবর্দ্ধন প্রসিদ্ধ জমিদার। সর্ব্বত্র তাঁদের খ্যাতি। তাঁরা ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের সেবা-পরায়ণ। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীজগন্নাথ মিশ্র প্রভৃতি নবদ্বীপ শান্তিপুরাদি নিবাসী পণ্ডিতগণের বহু অর্থ-কড়ি দানাদি করে সাহায্য করেন। তাঁদের পুত্র শ্রীরঘুনাথ দাস এসেছেন সর্ব্বত্র সাড়া পড়ে গেল। শ্রীরঘুনাথ দাসের কথা ভক্তগণ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণে নিবেদন করলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু রঘুনাথ দাসের নাম শুনেই বললেন—রে রে চোরা! আয়, তোকে আজ দণ্ড দিব।

নিকটে না আইস, চোরা, ভাগ' দূরে দূরে।
আজি লাগ্ পাঞাছি, দণ্ডিমু তোমারে।।
দধি, চিড়া ভক্ষণ করাহ মোর গণে।
শুনিয়া আনন্দ হৈল রঘুনাথের মনে।।

চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৬/৫০-৫১

শ্রীরঘুনাথ দাসকে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণে নিয়ে এলেন। শ্রীচরণ মূলে রঘুনাথ দাস লুটিয়ে পড়লেন। করুণাময় নিত্যানন্দ অভয় চরণ তাঁর শিরে ধারণ করলেন, শ্রীরঘুনাথের সেই শ্রীচরণ-স্পর্শ মাত্র যেন সব বন্ধন কেটে গেল। সাহাস্য বদনে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বলতে লাগলেন—তুমি আমার ভক্তগণকে চিড়া-দধি ভোজন করাও। এই তোমার

দণ্ড। এ কথা শুনে শ্রীরঘুনাথের আনন্দের সীমা রইল না। তখনই দই-চিড়া মহোৎসবের আয়োজন আরম্ভ হল। চারিদিকে লোক প্রেরণ করে দই-চিড়া আনতে লাগলেন। উৎসবের নাম শুনে পসারিগণ দই চিড়া পাকা কলাদি নিয়ে পসার বসাল। শ্রীরঘুনাথ দাস মূল্য দিয়ে সমস্ত দ্রব্য কিনতে লাগলেন। এদিকে গ্রাম গ্রামান্তর থেকে ভক্তগণ সজ্জন ব্রাহ্মণগণ আসতে লাগলেন। বড় বড় মৃৎকুণ্ডিকার মধ্যে পাঁচ-সাত জন ব্রাহ্মণ চিড়া ভিজাতে লাগলেন। এক জন ভক্ত শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্য চিড়া ভিজাতে লাগলেন। অর্দ্ধেক চিড়া দই কলা দিয়ে, আর অর্দ্ধেক ঘন দুধ, চিনি চাঁপা কলা দিয়ে মাখতে লাগলেন। অনন্তর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বৃক্ষমূলে পিণ্ডার উপর উপবেশন করলেন। তখন তাঁর সামনে চিড়া-দইপূর্ণ সাতটী মৃৎকুণ্ডিকা রাখা হল। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর চারি পার্শ্বে রামদাস, সুন্দরানন্দ দাস, গদাধর, শ্রীমুরারি, কমলাকর, শ্রীপুরন্দর, ধনঞ্জয়, শ্রীজগদীশ, শ্রীপরমেশ্বর দাস, মহেশ পণ্ডিত, শ্রীগৌরীদাস, হোড়কৃষ্ণ দাস ও উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর প্রভৃতি ভক্তগণ উপবেশন করলেন। নীচে বসলেন অভ্যাগত পণ্ডিত ভট্টাচার্য্যগণ। গঙ্গাতটে স্থান না পেয়ে কেউ কেউ গঙ্গায় নেমে চিড়া-দই নিচ্ছেন। সে দিন শ্রীরাঘব পণ্ডিতের ঘরে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আমন্ত্রণ ছিল। বিলম্ব দেখে শ্রীরাঘব পণ্ডিত স্বয়ং এলেন। দেখলেন —বিরাট মহোৎসবের ঘটা, ঠিক যেন সখাগণ সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বন্য-ভোজন লীলা। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বললেন—রাঘব! তোমার ঘরের প্রসাদ রাত্রে গ্রহণ করব। এখন রঘুনাথ দাসের উৎসব হউক। তুমিও বস। এ বলে তাঁকে নিকটে বসালেন এবং দই চিড়া ও দুধ-চিড়াপূর্ণ দুটা মৃৎকুণ্ডিকা এনে দিলেন। সকলের চিড়া দেওয়া শেষ হলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর ধ্যানে বসলেন। অন্তর্য্যামী শ্রীগৌরসুন্দর তাঁর ধ্যানে জানতে পেরে সেখানে এলেন।

''মহাপ্রভু আইল দেখি নিতাই উঠিলা।
তাঁরে লঞা সবার চিড়া দেখিতে লাগিলা।।''
(চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু হাস্য করতে করতে সবার হোলনা থেকে এক এক গ্রাস নিয়ে মহাপ্রভুর মুখে দিতে লাগলেন। এরূপ লীলাপূর্ব্বক শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কিছুক্ষণ ভ্রমণ করতে লাগলেন। তারপর নিজ আসনে তিনি বসলেন ও ভক্তগণকে ভোজন করতে আদেশ দিলেন। মহা 'হরি' 'হরি' ধ্বনিতে ভক্তগণ দশদিক মুখরিত করতে লাগলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ভোজন করছেন না দেখে কেউ ভোজন করছেন না। ভক্তগণ অগ্রে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে ভোজন করবার প্রার্থনা জানালেন, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ভোজন আরম্ভ করলেন। সমস্ত ভক্তগণ আনন্দভরে ভোজন করতে লাগলেন। সকলের পুলিন ভোজনের কথা মনে হতে লাগল। ভোজন শেষ হলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীরঘুনাথ দাসকে ডেকে অবশেষ প্রদান করলেন। এবার শ্রীরঘুনাথ দাস শ্রীনিত্যানন্দ কৃপা-প্রসাদে শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা পাবেন এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হলেন। তারপর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁর শিরে হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন—''অচিরাৎ প্রভু তোমাকে কৃপা করবেন।''

অতঃপর শ্রীরঘুনাথ দাস প্রভু ভক্তগণের সেবার্থে কিছু কিছু মুদ্রাদি দিয়ে গৃহে যাবার জন্য বিদায় চাইলেন। ভক্তগণ সকলেই কৃপা আশীর্ব্বাদ করলেন। শ্রীরঘুনাথ এ রূপে গৃহে ফিরে এলেন। শ্রীরঘুনাথকে দেখে পিতা-মাতা সুখী হলেন। শ্রীরঘুনাথ বাহ্য ব্যবহার ঠিক মত করতে লাগলেন। এবার বাইরে দুর্গা-মণ্ডপে শয়ন করতে লাগলেন। পাহারাদারগণ তাঁকে ঠিক ঠিক পাহারা দিতে লাগল।

একদিন প্রায় চার দণ্ড রাত থাকতে তাঁদের কুলগুরু শ্রীযদুনন্দন আচার্য্য রঘুনাথের গৃহে এলেন। তিনি এসে দাঁড়াতেই শ্রীরঘুনাথ শয্যা থেকে উঠে দণ্ডবৎ করলেন ও এত রাত্রে আসবার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন—বিগ্রহ সেবকটি সেবা ত্যাগ করে গৃহে চলে গেছে। তুমি তাকে বুঝিয়ে পুনর্ব্বার সেবায় নিযুক্ত করবার ব্যবস্থা কর। শ্রীরঘুনাথ দাস বললেন—চলুন, আমি তাকে বুঝিয়ে বিগ্রহের সেবায় পুনঃ নিযুক্ত করে দিব। এ বলে শ্রীরঘুনাথ দাস শ্রীযদুনন্দন আচার্য্যের সঙ্গে চললেন। পাহারাদারগণ ঘুমন্ত অবস্থায় মনে করল রঘুনাথ গুরুদেবের সঙ্গে তাঁর গৃহে যাচ্ছে। শ্রীরঘুনাথ কিছু দূর শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে গিয়ে বললেন—গুরুদেব! আপনি গৃহে ফিরে যান আমি সেবকটিকে বুঝিয়ে শীঘ্র পাঠিয়ে দিচ্ছি। শ্রীযদুনন্দন আচার্য্য বললেন—আচ্ছা তুমি যাও। শ্রীরঘুনাথ দাস ভাবলেন প্রভু ভাল সময় উপস্থিত করেছেন। কৌশলে তিনি শ্রীগুরুদেবের আদেশ নিয়ে শ্রীপুরী ধামের দিকে যাত্রা করলেন। গ্রামের প্রসিদ্ধ পথ ছেড়ে বন পথে চলতে লাগলেন। এক দিনে পনর ক্রোশ রাস্তা হেঁটে সন্ধ্যার সময় এক গোপ পল্লীতে উপস্থিত হলেন এবং গোয়ালাদের থেকে কিছু দুধ মেগে পান করে রাত কাটালেন। সকাল বেলা আবার চলতে লাগলেন।

এদিকে সকাল বেলা শ্রীরঘুনাথের খোঁজ আরম্ভ হল। গোবর্দ্ধন দাস তাড়াতাড়ি গুরু শ্রীযদুনন্দন আচার্য্যের গৃহে এলেন। রঘুনাথ কোথায়? যদুনন্দন দাস সব ঘটনা বললেন। এবার গোবর্দ্ধন দাস বুঝতে পারলেন, রঘুনাথ ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেছে। গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠল। তৎক্ষণাৎ চারিদিকে অনুসন্ধানের জন্য লোকজন ছুটল। বহু অনুসন্ধান করেও রঘুনাথকে পাওয়া গেল না। গোবর্দ্ধন দাস গৌড়ীয় ভক্তদের সঙ্গে নীলাচলের দিকে রঘুনাথ যাচ্ছে কিনা সন্ধান নেওয়ার জন্য কয়েকজন লোককে পত্র লিখে শ্রীশিবানন্দ সেনের নিকট প্রেরণ করলেন। হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের লোক শ্রীশিবানন্দ সেনকে নীলাচলের পথে গিয়ে ধরল এবং সব কথা বলল ও পত্র দিল। শ্রীশিবানন্দ সেন সব কথা বুঝতে পারলেন। তিনি জানালেন তাঁদের সঙ্গে রঘুনাথ আসে নাই। হয়ত অন্য পথে নীলাচলে গিয়েছে লোক এসে হিরণ্য-গোবর্দ্ধন দাসকে এ সংবাদ জানাল।

শ্রীরঘুনাথ দাস ছত্রভোগের পথে পুরীর দিকে চললেন।

ভক্ষণ নাহি সমস্ত দিবস গমন।
ক্ষুধা নাহি বাধে, চৈতন্য-চরণ প্রাপ্ত্যে মন।।
কভু চর্ব্বন, কভু রন্ধন, কভু দুগ্ধপান।
যবে যেই মিলে তাহে রাখে নিজ প্রাণ।।

চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৬/১৮৬-১৮৭

এ ভাবে এক মাসের পথ বার দিনে অতিক্রম করে পুরীতে পৌঁছলেন। এর মধ্যে তিন দিন মাত্র ভোজন করেছিলেন। পুরীতে পৌঁছে মহাপ্রভুর নিকট এলেন। দূর থেকে শ্রীরঘুনাথ দাস প্রভুকে বন্দনা করতেই মুকুন্দ দেখলেন ও বুঝতে পারলেন। প্রভুকে বললেন—রঘুনাথ দাস দণ্ডবৎ করছে। ইহা শুনে প্রভু বললেন, রঘুনাথ! রঘুনাথ! এস, এস। রঘুনাথ নম্রভাবে নিকটে আসতেই প্রভু তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। প্রভুর স্নেহ-আলিঙ্গনে রঘুনাথের সমস্ত দুঃখ দূর হল। আনন্দে তাঁর দু-নয়ন দিয়ে প্রেমাশ্রু ঝড়তে লাগল। প্রভু বললেন—রঘুনাথ! কৃষ্ণ বড় করুণাময়। তোমাকে বিষয় বিষ্ঠাগর্ত্ত থেকে উদ্ধার করেছেন।

শ্রীরঘুনাথ দাস বললেন—প্রভো! আমি কৃষ্ণ কৃপা জানি না। তোমার কৃপায় উদ্ধার হয়েছি এ মাত্র জানি। মহাপ্রভুর মাতামহ শ্রীনালাম্বর চক্রবর্ত্তী

রঘুনাথের পিতা ও জ্যেঠাকে কায়স্থ ও বয়সে ছোট জেনে 'ভায়া' বলে ডাকতেন। রঘুনাথের পিতা ও জেঠাও নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীকে ব্রাহ্মণ ও বয়সে বড় জেনে 'দাদা' বলে সম্বোধন করতেন। এজন্য মহাপ্রভু রহস্যচ্ছলে বললেন—

"তোমার বাপ-জ্যেঠা—বিষয়-বিষ্ঠা গর্ত্তের কীড়া।
সুখ করি' মানে বিষয়-বিষের মহাপীড়া।।
যদ্যপি ব্রহ্মণ্য করে ব্রাহ্মণের সহায়।
শুদ্ধবৈষ্ণব নহে, বৈষ্ণবের প্রায়।।
তথাপি বিষয়ের স্বভাব করে মহা অন্ধ।
সেই কর্ম্ম করায়, যাতে হয় ভব-বন্ধ।।
হেন বিষয় হৈতে কৃষ্ণ উদ্ধারিলা তোমা।
কহন না যায় কৃষ্ণকৃপার মহিমা।।"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬/১৯৭-২০০

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ কৃষ্ণকৃপা এবং বিষয়বিষের মহাপীড়া সম্বন্ধে এরূপ লিখেছেন—

**'প্রাক্তন কর্ম্মফলাদি অপেক্ষা কৃষ্ণকৃপা অধিকতর সামর্থ্যবিশিষ্ট। কৃষ্ণের এই অনুকম্পাই রঘুনাথকে বিষয়রূপ বিষ্ঠাগর্ত্ত হইতে উদ্ধার করিল। বিষয়ে অনুরাগী হইলে জীব নিজবলে তাহা ত্যাগ করিতে পারে না; বিশেষতঃ শুদ্ধ কৃষ্ণদাস জীবের নিকট বিষয়--বিষ্ঠাগর্ত্ত তুল্য। মহাপ্রভু শ্রীল রঘুনাথকে নির্ব্বিষয় বলিয়া জানিলেও আর্ত্ত বিষয়ীকে শিক্ষা দিবার জন্যই তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া ইহা কহিলেন।**

**'বিষয়' উহার ভোক্তা বিষয়ীকে মহাক্লেশ প্রদান করে, তথাপি বিষয়াবিষ্ট-চিত্ত সাংসারিকগণ সেই মহাক্লেশপ্রদ বিষয়কে 'সুখ' বলিয়া মনে করে। জড়েন্দ্রিয় ভোগ্যবিষয়—ত্যাগযোগ্য পূরীষগহ্বরের তুল্য; বিষয়াভিনিবিষ্ট জীব—ঘৃণ্য পূরীষের কীটতুল্য অর্থাৎ পারমার্থিকের দৃষ্টিতে জড়ভোক্তা প্রাকৃতবিষয়ী—বিষ্ঠাগর্ত্তের কীটতুল্য এবং সেই কীটরূপে মহানন্দে নিতান্তঘৃণ্য বিষয়বিষ্ঠার আস্বাদনে প্রমত্ত।'**

তখন প্রভু হাস্য করতে করতে বললেন—তোমার বাপ জ্যেঠা বিষয়টাকে সুখ বলে মনে করে ব্রাহ্মণের সেবা করে ও পুণ্য করে। অভিমান করে আমি বড় দানী। তারা শুদ্ধ বৈষ্ণব নন, বৈষ্ণব-প্রায়। বিষয় বাড়ান তাদের যাবতীয় সৎকার্য্যের মূলে। বিষয়-বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া যায় কিরূপে তার সন্ধান রাখে না। বিষয়ের এমন স্বভাব মনুষ্যের মন্দ প্রবৃত্তি এনে দেবেই রঘুনাথ! এমন বিষয় থেকে তুমি মুক্তি লাভ করেছ। তোমার বাপ-জ্যেঠাকে আমার মাতামহ শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ভাইয়ের মত দেখেন। সে সম্বন্ধে তোমার বাপ জ্যেঠা আমার দাদু হন। তাই পরিহাস করে তোমাকে এ সব কথা বললাম।

অতঃপর মহাপ্রভু শ্রীস্বরূপ-দামোদরকে সম্বোধন করে বললেন রঘুনাথকে তোমায় দিলাম। পুত্র বা ভৃত্য জ্ঞানে একে অঙ্গীকার কর। 'স্বরূপের রঘু' বলে এর খ্যাতি হবে। তারপর প্রভু তাঁকে শীঘ্র সমুদ্র-স্নান ও জগন্নাথ দর্শন করে এসে প্রসাদ গ্রহণ করতে বললেন।

শ্রীরঘুনাথ দাস সমুদ্র-স্নান ও জগন্নাথ দর্শন করে এলে শ্রীগোবিন্দ প্রভুর ভোজন—অবশেষ পাত্রটি তাঁকে দিলেন। শ্রীরঘুনাথ মহানন্দে প্রভুর অবশেষ পেয়ে সমস্ত ক্লেশ থেকে মুক্ত হলেন। নিজেকে ধন্যাতিধন্য মনে করলেন। পাঁচ দিন শ্রীরঘুনাথ প্রভুর নিকট ভোজন করলেন। অনন্তর সারা দিন ভজন করতেন না। রাত্রে সিংহদ্বারে দাঁড়িয়ে মেগে খেতেন। অন্তর্য্যামী প্রভু তা জানতে পেরে একদিন সেবক গোবিন্দকে ভঙ্গী করে জিজ্ঞাসা করলেন রঘুনাথ কি প্রসাদ নিচ্ছে ? গোবিন্দ বললেন--এখানে প্রসাদ নেওয়া বন্ধ করে রাত্রে

সিংহদ্বারে মেগে খায়। প্রভু তা শুনে বললেন--

বৈরাগী করিবে সদা নাম-সংকীর্ত্তন।
মাগিয়া খাঞা করে জীবন রক্ষণ।।
বৈরাগী হঞা যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা।।
বৈরাগী হঞা করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ।।
বৈরাগীর কৃত্য-সদা নাম-সংকীর্ত্তন।
শাক পত্র ফল মূলে উদর ভরণ।।
জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়।।

—চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৬/২২৩-২২৭

প্রভু জগৎকে শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীরঘুনাথ দাসকে লক্ষ্য করে এ সমস্ত কথা বললেন। শ্রীরঘুনাথ দাস বাস্তবতঃ সর্ব্বত্যাগী নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ।

শ্রীরঘুনাথ দাস সামনা-সামনি প্রভুর কাছে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতেন না। শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামীর দ্বারা বা অন্য কারও দ্বারা জিজ্ঞাসা করতেন। একদিন শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর দ্বারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করলেন। প্রভু তাঁর উত্তরে বলতে লাগলেন—

গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যকথা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে।।
অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে।।

—চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৬/২৩৬-২৩৭

প্রভুর শ্রীমুখ থেকে শ্রীরঘুনাথ দাস এই অমৃতময় উপদেশ শুনে প্রভুকে সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করলেন। প্রভু শ্রীরঘুনাথ দাসকে স্নেহে আলিঙ্গন করলেন।

একদিন শিবানন্দ সেন শ্রীরঘুনাথ দাসের কাছে তাঁর পিতার যাবতীয় চেষ্টার কথা বললেন। রথযাত্রা উৎসব শেষ হলে গৌড়দেশের ভক্তগণ মহাপ্রভুর অনুজ্ঞা নিয়ে দেশে ফিরে এলেন। শ্রীগোবর্দ্ধন দাস মজুমদার প্রেরিত লোক শ্রীশিবানন্দ সেনের গৃহে এসে তাঁর নিকট শ্রীরঘুনাথের সম্বন্ধে যাবতীয় কথা শ্রবণ করলেন। অতঃপর শ্রীগোবর্দ্ধন দাস শ্রীরঘুনাথের নিকট একজন ব্রাহ্মণ ও এক ভৃত্য এবং চার শত মুদ্রা প্রেরণ করলেন। শ্রীরঘুনাথ সে-অর্থ স্বয়ং গ্রহণ না করে প্রভুর সেবার জন্য কিছু কিছু গ্রহণ করতে লাগলেন। মাসে দুই দিন মহাপ্রভুকে আমন্ত্রণ করে ভোজন করাতে লাগলেন। দু বছর এভাবে কেটে গেল। তারপর প্রভুর নিমন্ত্রণ বন্ধ করে দিলেন। একদিন শ্রীস্বরূপদামোদর গোস্বামী শ্রীরঘুনাথকে জিজ্ঞাসা করলেন—প্রভুর ভোজন-আমন্ত্রণ বন্ধ করলে কেন? শ্রীরঘুনাথ দাস বললেন— বিষয়ীর অন্নে প্রভুর মন প্রসন্ন হয় না। আমার অনুরোধে তিনি নিমন্ত্রণ স্বীকার করেন মাত্র। এ নিমন্ত্রণে মাত্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া কিছু নাই। এ কথা শুনে প্রভু সুখী হয়ে বললেন—

বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ।।
বিষয়ীর অন্ন হয় রাজস নিমন্ত্রণ।
দাতা, ভোক্তা, দুঁহার মলিন হয় মন।।
ইঁহার সংকোচে আমি এতদিন নিল।
ভাল হৈল জানিয়া সে আপনি ছাড়িল।।

—চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৬/২৭৮-২৮০

আমি রঘুনাথের আগ্রহে কেবল আমন্ত্রণ স্বীকার করতাম। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ উপরোক্ত বিষয়টি বিশ্লেষণ করে এইরূপ উপদেশ প্রদান করেছেন—

"অহং, মম অভিমানযুক্ত জড়-ভোক্তা প্রাকৃতবিষয়ীর ভোগ্য অর্থের দ্বারা জড়াতীত সচ্চিদানন্দ বস্তু হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করিতে চেষ্টা করিলে প্রতিষ্ঠামাত্র ফললাভ হয়, বাস্তবিক

অপ্রাকৃত হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবা হয় না। একান্ত শরণাগত হইয়া অর্থাৎ সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন পূর্ব্বক নিত্যমঙ্গলেচ্ছু জীবের নিজার্জ্জিত সমস্ত অর্থের দ্বারা এবং কায়-মনো-বাক্যে-প্রাণে অপ্রাকৃত হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করা কর্ত্তব্য।

জন্মৈশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীমদ-মত্ত বিষয়িগণ শ্রীমূর্ত্তির তথাকথিত সেবা করাইয়া তৎপ্রসাদজ্ঞানে উহা বৈষ্ণবদিগকে প্রদান করে। নির্বুদ্ধিতাবশতঃ তাহারা জানে না যে, তাহাদের অভক্তিময় মনোবৃত্তিপ্রদত্ত কোন বস্তুই অধোক্ষজ অজিত গ্রহণ করেন না। সুতরাং অনেকস্থলে তাদৃশ জড়-ভোক্তা বিষয়ীর জড়াভিমান গন্ধমিশ্রিত সাহায্য গ্রহণ দ্বারা তৎকৈঙ্কর্য্য কৃষ্ণভজনপরায়ণ নিরপেক্ষ অর্থাৎ জড়ভোগবিরক্ত বৈষ্ণবগণ স্বীকার করেন না; তাহাতে প্রাকৃত ধনী বিষয়িগণ স্বীয় দেহাদিতে অহং বুদ্ধিপ্রসূত মূর্খতাবশতঃ বৈষ্ণবের প্রতি বিরোধ পোষণ করেন এবং বৈষ্ণবের তাদৃশ ব্যবহারে দুঃখিত হন।

অবৈষ্ণব বা প্রাকৃত সহজিয়াগণ—বিষয়ী। তাহাদের অভক্তিপ্রদত্ত অন্নের গ্রহণ বা ভোজন-সংসর্গফলে সাধক বৈষ্ণবের সঙ্গদোষ ঘটে এবং তৎফলে সাধকগণ তাহাদের ন্যায় স্বভাব লাভ করে। অবৈষ্ণব ও বৈষ্ণব নামধারী প্রাকৃত-সহজিয়াগণের সহিত বিন্দুমাত্র প্রচ্ছন্নপ্রীতির সহিতও যদি কেহ ছয়প্রকার সঙ্গ (দান, প্রতিগ্রহ, ভোজন ও ভোজনে প্রবর্ত্তন, গূঢ় কথা বর্ণন ও জিজ্ঞাসা) করে, তা হইলে অপ্রাকৃত শুদ্ধকৃষ্ণভক্তির স্থানে জড়েন্দ্রিয়-তর্পণমূলক প্রাকৃত ভোগ আসিয়া সাধককে কৃষ্ণভক্তিচ্যুত করে। সুতরাং আত্মেন্দ্রিয় তর্পণপর বিষয়মলিন অশুদ্ধচিত্তজনের পক্ষে অপ্রাকৃত কৃষ্ণস্মরণাদি-সেবন কখনও সম্ভব নহে।”

বিষয়ীর রাজস নিমন্ত্রণ সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এরূপ লিখেছেন—

‘নিমন্ত্রণ তিন প্রকার—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক; বিশুদ্ধ বৈষ্ণবের নিমন্ত্রণ—সাত্ত্বিক, বিষয়ী পুণ্যবান্ ব্যক্তির অন্ন—রাজস এবং পাপিষ্ঠের অন্ন—তামস।

শ্রীরঘুনাথ দাস কিছুদিন সিংহদ্বারে মেগে খাওয়ার পর ছত্রে গিয়ে মেগে খেতে লাগলেন। অন্তর্য্যামী প্রভু তা বুঝতে পেরে ছলপূর্ব্বক সেবককে জিজ্ঞাসা করলেন এখন রঘুনাথ কি সিংহদ্বারে মেগে খায়? সেবক বললেন—রঘুনাথ সিংহদ্বারে মেগে খাওয়া বন্ধ করে ছত্রে গিয়ে মেগে খায়। তা শুনে প্রভু বললেন—

“প্রভু কহে—ভাল কৈল ছাড়িল সিংহদ্বার।
সিংহদ্বারে ভিক্ষা বৃত্তি—বেশ্যার আচার।।”

—(চৈঃ চঃ ৬/২৮৪)

শ্রীরঘুনাথের আচরণে প্রভু পরম সুখী হলেন। অন্য একদিন শ্রীরঘুনাথকে ডেকে প্রভু গোবর্দ্ধন শিলা ও গুঞ্জামালা দিয়ে বললেন—

“প্রভু কহে এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ।
ইঁহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ।।”

এই গোবর্দ্ধন শিলাটি প্রভু সাক্ষাৎ কৃষ্ণ জ্ঞানে কখন হৃদয়ে ধারণ, কখন অঙ্গ আঘ্রাণ করতেন, কখন বা নেত্র জলে স্নান করাতেন। তিন বছর প্রভু এ শিলা সেবার পর প্রিয় শ্রীরঘুনাথ দাসকে অর্পণ করলেন। পূর্ব্বে শ্রীশঙ্করানন্দ সরস্বতী নামক একজন সন্ন্যাসী বৃন্দাবন ধাম থেকে এ শিলা ও গুঞ্জামালা নিয়ে প্রভুকে বহু আগ্রহ করে ভেট দিয়েছিলেন। প্রভু স্মরণের সময় গুঞ্জামালাটি কণ্ঠে ধারণ করতেন।

শ্রীরঘুনাথ দাস জল তুলসী দিয়ে সেই গোবর্দ্ধন শিলার সাত্ত্বিক সেবা করতে লাগলেন। শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভু জলের জন্য একটি কুঁজা দিলেন। শ্রীরঘুনাথ কিছুদিন এরূপ সাত্ত্বিক সেবা

করতে থাকলে, একদিন স্বরূপ দামোদর প্রভু বললেন—রঘুনাথ গিরিধারীকে কমপক্ষে আটটি কড়ির খাজা সন্দেশ প্রদান কর। সেদিন থেকে শ্রীরঘুনাথ আট কড়ির খাজা সন্দেশ গিরিধারীকে ভোগ দিতে লাগলেন। তিনি খুব নিয়মের সহিত ভজন করতেন। সাড়ে সাত প্রহর ভজন-কীর্তনে অতিবাহিত করতেন। চার দণ্ড মাত্র আহার ও বিশ্রামের জন্য দিতেন। জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করতেন। গাত্র-আবরণ ছিল এক ছেঁড়া কাথা।

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী কিছুদিন ছত্রে মেগে খাওয়ার পর তা বন্ধ করে বাজারে পরিত্যক্ত পচা অন্ন-প্রসাদ এনে জলে ধুয়ে লবণ দিয়ে সে প্রসাদ গ্রহণ করতে লাগলেন। একদিন শ্রীস্বরূপ দামোদর প্রভু শ্রীরঘুনাথের ভজন কুটীরে এসে সেই প্রসাদ এক মুষ্টি মেগে খেলেন। খুব তৃপ্তি পেলেন। তিনি মহাপ্রভুর কাছে এলেন এবং প্রভুর কাছে সে প্রসাদের স্বাদের কথা বললেন। তা শুনে রঘুনাথের সে প্রসাদের প্রতি প্রভুর মনে বড় লোভ হল। একদিন গোপনে প্রভু শ্রীরঘুনাথের ভজন-কুটীরে এসে সে-অন্ন প্রসাদ গ্রহণ করতে লাগলেন। শ্রীরঘুনাথ দেখে হায় হায় করে ছুটে এলেন এবং প্রভুর হাত থেকে সে প্রসাদ কেড়ে নিয়ে বললেন—হে প্রভো! এ সব আপনার খাবার যোগ্য নয়। প্রভু বললেন—

''খাসা বস্তু খাও সবে, মোরে না দেহ' কেনে?
এত বলি' একগ্রাস করিলা ভক্ষণে।।
আর গ্রাস লৈতে স্বরূপ হাতেতে ধরিলা।
'তব যোগ্য নহে' বলি 'বলে কাড়ি' নিলা।।

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬/৩২২-৩২৩

প্রভুর শ্রীচরণে পড়ে শ্রীরঘুনাথ কাঁদতে লাগলেন। প্রভু বার বার শ্রীরঘুনাথকে আলিঙ্গন করতে লাগলেন। শ্রীরঘুনাথের বৈরাগ্য দেখে প্রভু অন্তরে বড়ই সুখ লাভ করলেন।

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর করুণা-ধারায় নিত্য স্নান করতে করতে যেন পরম সুখে প্রভুর শ্রীচরণে কালাতিপাত করতে লাগলেন। এভাবে যোল বছর অতিবাহিত হল।

যোল বছর পরে মহাপ্রভু ও স্বরূপ দামোদর অপ্রকট হলেন। রঘুনাথ দাস বিরহে সন্তপ্ত হলেন। ঠিক করলেন বৃন্দাবনে-গোবর্দ্ধনে ভৃগুপাত করে শরীর ত্যাগ করবেন। এই সঙ্কল্প নিয়ে বৃন্দাবনে পৌঁছালেন। শ্রীরূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী তাঁকে অনেক বুঝিয়ে দেহ ত্যাগের সঙ্কল্প থেকে নিবৃত্ত করলেন এবং তৃতীয় ভ্রাতার রূপে নিকটে রাখলেন। শ্রীরঘুনাথের নিকট থেকে মহাপ্রভুর অমৃতময়ী লীলাকথা শ্রবণ করে শ্রীরূপ-সনাতন পরম আনন্দ লাভ করতেন।

পূর্ব্বেই শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীগোপাল ভট্ট, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীলোকনাথ, শ্রীকাশীশ্বর ও শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী প্রভৃতি শ্রীবৃন্দাবন ধামে প্রভুর নির্দ্দেশমত অবস্থান করছিলেন। প্রভুর অন্তর্দ্ধানে সকলে বিরহ-দাবানলে দগ্ধীভূত হতে লাগলেন। তথাপি বহু কষ্টে ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক সকলে সমবেতভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা সিদ্ধান্ত বাণী প্রচারে ব্রতী হয়ে গ্রন্থাদি লিখতে লাগলেন। এঁনারা সকলে মহান পণ্ডিত ছিলেন। এঁনাদের গুণ-মহিমাতে আকৃষ্ট হয়ে তদানীন্তন ভারতের বড় বড় সাহিত্যিক কবি ও রাজন্যবর্গ ব্রজধামে আগমন করতে লাগলেন। ব্রজধামে এক মহান সুবর্ণ-যুগের উদয় হল। ঠিক এ সময় পশ্চিম ভারতের একজন মহান আচার্য্য শ্রীবল্লভাচার্য্য বৃন্দাবনে আগমন করলেন।

**শ্রীরাধাকুণ্ড সংস্কার**

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীরাধাকুণ্ডে বাস করতেন। তখন শ্রীরাধাকুণ্ড অসংস্কার অবস্থায় ছিল। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী কুণ্ডটির সুন্দরভাবে

সংস্কারের কথা মাঝে মাঝে চিন্তা করতেন। এক সময় এক বড় শেঠ বহু কষ্টে পদব্রজে শ্রীবদরিকাশ্রমে গিয়েছিলেন। তিনি শ্রীবদরিনারায়ণ দেবকে বহু ভক্তিপুরঃসর পূজাদি করেন এবং বহু অর্থ অর্পণ করেন। সেদিন শ্রীবদরিকা আশ্রমে রাত্র বাস করলেন। স্বপ্নে শ্রীবদরিনারায়ণ শেঠকে দর্শন দিয়ে বললেন--তুই এ সব অর্থ নিয়ে ব্রজে আরিট গ্রামে যা এবং তথায় রঘুনাথ দাস নামে একজন আমার পরম ভক্ত আছে তাঁকে দে। যদি সে না নিতে চায় আমার কথা বলিস এবং কুণ্ডদ্বয়ের সংস্কারের কথা মনে করিয়ে দিস্। স্বপ্ন দেখে শেঠ বড় সুখী হলেন। সুখে গৃহে ফিরে এলেন ও শ্রীনারায়ণের আজ্ঞা পালনে তৎপর হয়ে ব্রজধামে আরিট গ্রামে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর সন্নিকট এলেন। অতঃপর শেঠ শ্রীদাস গোস্বামীকে দণ্ডবৎ প্রণাম করবার পর সমস্ত কথা নিবেদন করলেন। কথা শুনে শ্রীদাস গোস্বামী একটু চমৎকৃত হলেন। তিনি শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড সংস্কারের অনুমতি প্রদান করলেন। শেঠ পরম আনন্দিত মনে সংস্কার কার্য্য আরম্ভ করলেন।

''শুনি মহাজন মহা আনন্দ হইল।
সেই ক্ষণে বহুলোক নিযুক্ত করিল।।
শীঘ্রই কুণ্ডদ্বয় খোদাইল যত্নমতে।।"

শ্রীভক্তি রত্নাকর

শ্রীরাধাকুণ্ড তীরে পঞ্চ পাণ্ডব পঞ্চ বৃক্ষরূপে অবস্থান করছেন। তাদের কাটবার কথা হল, সে রাত্রে পাণ্ডবগণ শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীকে দর্শন দিয়ে বৃক্ষ কাটতে নিষেধ করলেন। অদ্যাপি বৃক্ষগুলি কুণ্ডতীরে শোভা পাচ্ছে। শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের সংস্কার হলে ভক্তগণের আনন্দের সীমা রইল না। কুণ্ডের আশে পাশে অষ্ট সখীর কুণ্ডাদি ও অষ্ট সখীর কুঞ্জাদি নির্ম্মাণ করা হল। এসব দেখে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী আনন্দে আত্মহারা হলেন।

শ্রীদাস গোস্বামী শ্রীরাধাকুণ্ড তটে অনিকেত (গৃহহীন হয়ে) বাস করতেন। মাঝে মাঝে মানস গঙ্গাতটেও এরূপে বাস করতেন। তখন সেখানে ভয়ানক জঙ্গল ছিল। তাতে হিংস্র ব্যাঘ্রাদি বাস করত। একদিন শ্রীসনাতন গোস্বামী মানস-গঙ্গাতটে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর ভজন কুটীরে এলেন। সেখানে তিনি মধ্যাহ্ন ভোজন করবেন। মানস-গঙ্গার পাবন ঘাটে স্নান করতে গেলেন। কিছু দূরে দেখলেন একটি ব্যাঘ্র জল পান করে চলে গেল। তার কিছু দূরে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী ভজন আবেশে বৃক্ষতলে অবস্থান করছেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী দেখে বিস্মিত হলেন। অনন্তর তিনি শ্রীদাস গোস্বামীকে কুটীরের মধ্যে ভজন করবার অনুরোধ জানালেন। সে দিন থেকে তিনি কুটীরে ভজন করতেন।

**শ্রীরাধাদাসী অভিমান**

ব্রজধামে পারকীয়াভাবে শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী শ্রীগোবিন্দের সেবা করতেন। এ দুজনার অনন্ত সখী ছিল। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী নিজেকে শ্রীরাধার সখীগণের দাসী বলে অভিমান করতেন। তিনি কখন চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে যেতেন না এবং চন্দ্রাবলীর সখীদের সঙ্গে বার্ত্তালাপ করতেন না। এরূপে মানস- ভজনে দিনাতিপাত করতেন। শ্রীদাস নামক এক ব্রজবাসী ভক্ত রোজ শ্রীদাস গোস্বামীকে এক দোনা মাঠা দিতেন। তিনি সেটুকু পান করে সারাদিন ভজন করতেন। একদিন শ্রীদাস ব্রজবাসী চন্দ্রাবলীর স্থান সখীস্থলীতে গোচারণ করতে গিয়েছিলেন। সেখানে বড় বড় পলাশ পাতা দেখতে পেলেন। তিনি কয়েকটি পলাশ পাতা ভেঙ্গে নিলেন। ঘরে এসে সে পাতার দোনা তৈরী করে মাঠা নিয়ে



শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর কাছে এলেন এবং মাঠার দোনাটি দিলেন। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী দোনা হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন--শ্রীদাসজী! এ সুন্দর পলাশ পাতা কোথায় পেলেন? শ্রীদাস বললেন গোচারণ করতে সখীস্থলীতে গিয়ে এ সুন্দর পলাশ পাতা এনেছি।

সখীস্থলীর নাম শুনার সঙ্গে সঙ্গে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর ক্রোধ হল। এটি প্রেমের পরাকাষ্ঠা অবস্থার ভাব যা কামাতুর মাৎসর্য্য পরায়ণ ব্যক্তিরা বুঝতে পারে না।

''কতক্ষণে স্থির হৈয়া কহে দাসপ্রতি।
সে চন্দ্রাবলীর স্থান,—না যাইবা তথি।।
ইহা শুনি' দাস ব্রজবাসী স্থির হৈয়া।
জানিলেন সাধকদেহেতে সিদ্ধ-ক্রিয়া।।
এ-সবার এই দেহ নিত্যসিদ্ধ হয়।
ইথে যে পামর সেই করয়ে সংশয়।।''

—ভক্তিরত্নাকর ৫/৫৭২-৫৭৪

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী সখীস্থলীর নাম শুনেই রোষভরে মাঠাসহ দোনাটি দূরে নিক্ষেপ করলেন। বললেন— শ্রীরাধার অনুগত যারা তারা সখীস্থলীর জিনিস গ্রহণ করেন না। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীরাধা-নিষ্ঠা দেখে শ্রীদাস ব্রজবাসী বিস্মিত হলেন।

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী মহাপ্রভু ও রাধাগোবিন্দের বিরহে অন্নজল ত্যাগ করলেন। শুধুমাত্র অল্প মাঠা সেবন করতেন। প্রতিদিন সহস্র দণ্ডবৎ, লক্ষ হরিনাম, রাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীন সেবা, মহাপ্রভুর চরিত্র কথন, ত্রিসন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে অপতিত স্নান এভাবে সাড়ে সাত প্রহর অতিবাহিত করতেন। কোনদিন চারদণ্ড নিদ্রা আবার কোনদিন তাও হত না।

শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর উদ্দেশে একটি গীত রচনা করেছেন—

কোথায় গো প্রেমময়ী রাধে রাধে!
রাধে রাধে গো জয় রাধে রাধে।।
দেখা দিয়া প্রাণ রাখ রাধে রাধে।
তোমার কাঙ্গাল তোমায় ডাকে রাধে রাধে।।
রাধে বৃন্দাবন-বিলাসিনি রাধে রাধে।
রাধে কানুমনোমোহিনি রাধে রাধে।।
রাধে অঙ্গসখীর শিরোমণি রাধে রাধে।
রাধে বৃষভানুনন্দিনি রাধে রাধে।।
(গোসাঞী) নিয়ম ক'রে সদাই ডাকে রাধে রাধে।
(গোসাঞী) একবার ডাকে কেশীঘাটে,
আবার ডাকে বংশীবটে, রাধে রাধে।।
(গোসাঞী) একবার ডাকে নিধুবনে,
আবার ডাকে কুঞ্জবনে রাধে রাধে।
(গোসাঞী) একবার ডাকে রাধাকুণ্ডে,
আবার ডাকে শ্যামকুণ্ডে রাধে রাধে।।
(গোসাঞী) একবার ডাকে কুসুমবনে,
আবার ডাকে গোবর্দ্ধনে রাধে রাধে।
(গোসাঞী) একবার ডাকে তালবনে,
আবার ডাকে তমালবনে রাধে রাধে।।
(গোসাঞী) মলিন বসন দিয়ে গায়,
ব্রজের ধূলায় গড়াগড়ি যায় রাধে রাধে।
(গোসাঞী) মুখে রাধা রাধা বলে,
ভাসে নয়নের জলে রাধে রাধে।।
(গোসাঞীঃ বৃন্দাবনে কুলি কুলি,
কেঁদে বেড়ায় রাধা বলি' রাধে রাধে।
(গোসাঞী) ছাপ্পান্ন দণ্ড রাত্রি দিনে,
জানে না রাধা-গোবিন্দ বিনে রাধে রধে।।
তারপর চারিদণ্ড শুতি থাকে,
স্বপনে রাধা-গোবিন্দ দেখে রাধে রাধে।।

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী সর্ব্বদা শ্রীরাধা গোবিন্দের মানস সেবা করতেন। একদিন মানসে






পরমান্ন রন্ধন করে শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভোগ লাগালেন। তাঁরা সুখে ভোজন করলেন, অন্যান্য সখীগণও ভোজন করলেন। অতঃপর সেই অবশেষ প্রসাদ স্বয়ং ভোজন করলেন। প্রেমভরে ভোজন করতে করতে একটু বেশী পরিমাণে ভোজন হল। শ্রীদাস গোস্বামী সকাল হতে প্রায় অপরাহ্ন কাল পর্য্যন্ত দরজা খুললেন না। ভক্তগণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। অনেক ডাকাডাকি করার পর দরজা খুললেন। ভক্তগণ জিজ্ঞাসা করলেন, কুটীর বন্ধ করে শুয়ে আছেন কেন? শ্রীদাস গোস্বামী বললেন--শরীর অসুস্থ। ভক্তগণ শুনে দুঃখী হলেন। তখনই মথুরায় শ্রীসনাতন গোস্বামীর নিকট সংবাদ পাঠালেন। সে সময় শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীবল্লভাচার্য্যের গৃহে অবস্থান করছিলেন। খবর পেয়ে শ্রীবল্লভাচার্য্যের পুত্র শ্রীবিঠ্ঠল নাথজী দু'জন বৈদ্যকে রাধাকুণ্ডে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর নিকট প্রেরণ করলেন।

নাড়ী দেখি চিকিৎসক কহে বার বার।
দুগ্ধ অন্ন খাইলা ইহো ইথে দেহ ভার।।

—ভক্তিরত্নাকর ৫ম তরঙ্গ

বৈদ্যের কথা শুনে সকলে অবাক হলেন। অতঃপর ভক্তগণ রহস্য বুঝতে পারলেন।

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর রচিত স্তবাবলী, দানচরিত, মুক্তাচরিত প্রভৃতি গ্রন্থাবলী ও অনেক গীত আছে।

চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষস্তবে তিনি মহাপ্রভুর করুণা বর্ণনা করেছেন—

''মহাসম্পদ্দাবাদপি পতিতমুদ্ধৃত্য কৃপায়া।
স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কুজনমপি মাং ন্যস্য মুদিতঃ।
উরোগুঞ্জাহারং প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধনশিলাং
দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি।।"

'আমি মহাকুজন হইলেও কৃপাপূর্ব্বক যিনি আমাকে পতিত দেখিয়ে সম্পৎ ও দারা (পাঠান্তরে বিষয়রূপ দাবাগ্নি) হইতে উদ্ধার করতঃ শ্রীস্বরূপে অর্পণ করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, যিনি আমাকে স্বীয় বক্ষের গুঞ্জামালা ও গোবর্দ্ধনশিলা দান করিয়াছিলেন, সেই গৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হয়া আমাকে মত্ত করিতেছেন।'

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী জন্ম—১৪২৮ শকাব্দে, অপ্রকট—১৫০৪ শকাব্দ আশ্বিন শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে; স্থিতি—৭৫ বছর।

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর রচিত একটি গীত-

**শ্রীরাধাস্তব**

চন্দ্রবদনি ধনি, মৃগনয়নী।
রূপে গুণে অনুপমা রমণীমণী।।
মধুরিম হাসিনি, কমল-বিকাশিনি,
মোতিম-হারিণি কম্বু-কণ্ঠিনী।
থির-সৌদামিনি, গলিতকাঞ্চন জিনি',
তনু-রুচি-ধারিণি পিক-বচনী।।
উরজ-লম্বি-বেণি, মেরু' পর যেন ফণি,
আভরণ বহু মণি, গজ-গমনী।
বীণা-পরিবাদিনি, চরণে নূপুর-ধ্বনি,
রতিরসে পুলকিনি কৃষ্ণ-মোহিনী।।
সিংহ জিনি' মাঝ খিণি, তাহে মণি-কিঙ্কিণি,
ঝাঁপি ওঢ়নি তনু পদ অবনী।
বৃষভানু-নন্দিনি, জগজন-বন্দিনি,
দাস রঘুনাথ-পহুঁ-মনোহারিণী।।

**।। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী কি জয়।।**




# শ্রীজয়দেব গোস্বামী

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গম্ভীরায় শেষ ১২ বছর রাধাভাবে বিভাবিত হয়ে শ্রীজয়দেবের গীতগোবিন্দ আস্বাদন করতেন।

''চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি,
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ-রামানন্দ-সনে, মহাপ্রভু রাত্রি-দিনে।
গায়, শুনে-পরম আনন্দ।।

চৈঃ চঃ মঃ ২/৭৭

শ্রীজয়দেবের আবির্ভাব একাদশ বা দ্বাদশ শক শতাব্দীতে। তাঁর আবির্ভাব সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। অনেকের মতে বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্বগ্রামে, কারও মতে উৎকলদেশে, আবার কারও মতে দক্ষিণাত্যে জয়দেবের আবির্ভাব স্থান। শ্রীজয়দেবের পিতার নাম শ্রীভোজনদেব এবং মাতা শ্রীবামাদেবী।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে উল্লেখ আছে ''শ্রীজয়দেব অজয়নদ হতে শ্রীরাধামাধব বিগ্রহ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অজয়নদের তীরে কুশেশ্বর শিবের স্থানে বসে তিনি বিশ্রাম করতেন এবং সাধন-ভজনে নিমগ্ন থাকতেন।

শ্রীজয়দেব বঙ্গদেশের রাজা শ্রীলক্ষ্মনসেনের রাজত্বকালে রাজধানী নবদ্বীপে লক্ষ্মনসেনের রাজপ্রাসাদের নিকটে অনেক দিন অবস্থান করেছিলেন। আশুতোষদেবের বাংলা অভিধানে লিখিত আছে–''জয়দেব কিছুদিন লক্ষ্মণ সেনের সভায় রাজকবি ছিলেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য গ্রন্থে উল্লেখ আছে–(১১/৯১-১২৯)

যে কালে লক্ষণসেন নদীয়ার রাজা।
জয়দেব নবদ্বীপে হ'ন তাঁর প্রজা।।
বল্লালদীর্ঘিকাকূলে বাঁধিয়া কুটীর।
পদ্মাসহ বৈসে তথা জয়দেব ধীর।।
দশ অবতার স্তব রচিল তথায়।
সেই স্তব লক্ষণের হস্তে কভু যায়।।
পরম আনন্দে স্তব করিল পঠন।
জিজ্ঞাসিলা রাজা, 'স্তব কৈল কোন্ জন'।।
গোবর্ধন আচার্য রাজারে তবে কয়।
'মহাকবি জয়দেব রচয়িতা হয়'।।
কোথা জয়দেব কবি' জিজ্ঞাসে ভূপতি।
গোবর্ধন বলে, 'এই নবদ্বীপে স্থিতি'।।
শুনিয়া গোপনে রাজা করিয়া সন্ধান।
রাত্রযোগে আইল তবে জয়দেব-স্থান।।
বৈষ্ণব-বেশেতে রাজা কুটীরে প্রবেশে।
জয়দেব নতি করি' বৈসে একদেশে।।
জয়দেব জানিলেন, ভূপতি এ জন।
বৈষ্ণব-বেশেতে আইল হ'য়ে অকিঞ্চন।।
অল্পক্ষণে রাজা তবে দেয় পরিচয়।
জয়দেবে যাচে যাইতে আপন আলয়।।
অত্যন্ত বিরক্ত জয়দেব মহামতি।
বিষয়ি-গৃহেতে যেতে না করে সম্মতি।।
কৃষ্ণভক্ত জয়দেব বলিল তখন।
তব দেশ ছাড়ি' আমি করিব গমন।।
বিষয়ি-সংসর্গ কভু না দেয় মঙ্গল।
গঙ্গা পার হ'য়ে যা'ব যথা নীলাচল।।
রাজা বলে, ''শুন প্রভু আমার বচন।
নবদ্বীপ ত্যাগ নাহি কর কদাচন।।
তব বাক্য সত্য হ'বে মোর ইচ্ছা র'বে।
হেন কার্য কর দেব মোরে কৃপা যবে।।

গঙ্গা-পারে চম্পহট্ট স্থান মনোহর।
সেই স্থানে থাক তুমি দু’ এক বৎসর।।
মম ইচ্ছামতে আমি তথা না যাইব।
তব ইচ্ছা হ’লে তব চরণ হেরিব।।”
রাজার বচন শুনি’ মহা কবিবর।
সম্মত হইয়া বলে বচন সত্বর।।
যদ্যপি বিষয়ী তুমি, এ রাজ্য তোমার।
কৃষ্ণভক্ত তুমি, তব নাহিক সংসার।।
পরীক্ষা করিতে আমি বিষয়ী বলিয়া।
সম্ভাষিণু, তবু তুমি সহিলে শুনিয়া।।
অতএব জানিলাম, তুমি কৃষ্ণভক্ত।
বিষয় লইয়া ফির হ’য়ে অনাসক্ত।।
চম্পকহট্টেতে আমি কিছুদিন র’ব।
গোপনে আসিবে তুমি ছাড়িয়া বৈভব।।”
হৃষ্টচিত্ত হ’য়ে রাজা অমাত্যদ্বারায়।
চম্পকহট্টেতে গৃহ নির্ম্মাণ করায়।।
তথা জয়দেব কবি রহে দিন কত।
শ্রীকৃষ্ণভজন করে রাগমার্গ-মত।।
পদ্মাবতী দেবী আনে চম্পকের ভার।
জয়দেব পূজে কৃষ্ণ নন্দের কুমার।।
মহাপ্রেমে জয়দেব করয়ে পূজন।
দেখিল, শ্রীকৃষ্ণ হৈল চম্পকবরণ।।
পুরটসুন্দরকান্তি অতি মনোহর।
কোটীচন্দ্র নিন্দি’ মুখ পরম সুন্দর।।
চাঁচর-চিকুর শোভে গলে ফুলমালা।
দীর্ঘবাহু-রূপে আলো করে পর্ণশালা।।
দেখিয়া গৌরাঙ্গ-রূপ মহাকবিবর।
প্রেমে মূর্চ্ছা যায়, চক্ষে অশ্রু ঝর ঝর।।
পদ্মাবতী দেবী সেই রূপ নিরখিয়া।
হইল চৈতন্যহীন ভূমেতে পড়িয়া।।
পদ্মহস্ত দিয়া প্রভু তোলে দুই জনে।
কৃপা করি’ বলে তবে অমিয়-বচনে।।
তুমি দোঁহে মম ভক্ত পরম।
দরশন দিতে ইচ্ছা হইল আমার।।
অতি অল্প দিনে এই নদীয়া-নগরে।
জনম লইব আমি শচীর উদরে।।
সর্ব অবতারের সকল-ভক্ত-সনে।
শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে বিতরিব প্রেমধনে।।
চব্বিশ বৎসরে আমি করিয়া সন্ন্যাস।
করিব অবশ্য নীলাচলেতে নিবাস।।
তথা ভক্তগণ-সঙ্গে মহাপ্রেমাবেশে।
শ্রীগীতগোবিন্দ আস্বাদিব অবশেষে।।
তব বিরচিত গীতগোবিন্দ আমার।
অতিশয় প্রিয়বস্তু কহিলাম সার।।
এই নবদ্বীপধাম পরম চিন্ময়।
দেহান্তে আসিবে হেথা কহিনু নিশ্চয়।।
এবে তুমি দোঁহে যাও যথা নীলাচল।
জগন্নাথে সেব গিয়া, পাবে প্রেমবল।।

শ্রীজয়দেবের পত্নী পদ্মাবতী। কথিত আছে শ্রীজগন্নাথদেবের আজ্ঞায় জয়দেব পদ্মাবতীকে বিবাহ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। প্রসঙ্গটি বিশ্বকোষে এভাবে বর্ণিত হয়েছে– ‘‘একজন ব্রাহ্মণের কোন সন্তান ছিল না। তিনি বহুকাল শ্রীজগন্নাথের আরাধনা করায় তার একটি কন্যা সন্তান হয়। সেই কন্যার নাম পদ্মাবতী। বিবাহযোগ্যা হলে ব্রাহ্মণ কন্যাকে শ্রীজগন্নাথের চরণে উৎসর্গ করার জন্য আনলেন। জগন্নাথদেব প্রত্যাদেশ করলেন,–‘‘জয়দেব নামে আমার এক সেবক সংসার ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়ে আমার নাম সার করেছে। তুমি তাকেই এই কন্যা সম্প্রদান কর।” জগন্নাথের আদেশে ব্রাহ্মণ তার কন্যাকে নিয়ে শ্রীজয়দেবের স্থানে উপস্থিত হয়ে সমস্ত কথা নিবেদন করলেন। শ্রীজয়দেব বললেন, ‘‘সংসারী হওয়ার আমার কোন ইচ্ছা নেই। তাই আপনার কন্যাকে বিবাহ করা আমার পক্ষে সম্ভব

নয়।” ব্রাহ্মণ বললেন—“আমি অত কিছু জানি না। প্রভু জগন্নাথের আদেশে আমি এখানে এসেছি। আমার কন্যাকে এখানে রেখে যাচ্ছি, তুমি যা ভালো বুঝবে তাই করবে।” এই বলে ব্রাহ্মণ চলে গেলেন। জয়দেব নিতান্তই অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। তিনি ব্রাহ্মণ কন্যা পদ্মাবতীকে জিজ্ঞাসা করলেন—“তোমার পিতা ত’ চলে গেলেন। তুমি কোথায় যাবে আমাকে বল আমি তোমাকে সেখানেই রেখে আসব। এখানে তোমার থাকা হবে না।” পদ্মাবতী কাতর স্বরে বললেন,— “শ্রীজগন্নাথের আদেশে পিতা আমাকে তোমার হাতে সর্ম্পণ করেছেন। তুমি আমার স্বামী, হৃদয়সর্ব্বস্ব, তুমি যদি আমাকে ত্যাগ কর তাহলে আমি তোমার পদতলেই এ প্রাণ বিসর্জন দেব। হে নাথ! তুমিই আমার একমাত্র গতি।” তখন জয়দেব নিরুপায় হয়ে সংসারী হলেন।

সংসারে প্রবেশের পর জয়দেব এক নারায়ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেমের স্রোত প্রবাহিত হতে থাকে। সেই স্রোতে ভাসতে ভাসতে তিনি অপূর্ব গীতগোবিন্দ প্রচার করেন। কথিত আছে—জয়দেব গীতগোবিন্দে সকল রস ও ভাবের অবতারণার পর একটি স্থানে তাঁর লেখনি থেমে যায়। সেটি হচ্ছে মান প্রকরণ। শ্রীমতী রাধা ঠাকুরাণী মান করেছেন। তাঁকে শান্ত করার জন্য শ্রীগোবিন্দ তাঁর পায়ে ধরেছেন। এই কথাটি লিখতে জয়দেবের সাহস হল না। তিনি লেখায় বিরাম দিয়ে সমুদ্র স্নানে গেলেন। এদিকে স্বয়ং জগন্নাথ জয়দেবের বেশে তাঁর গৃহে প্রবেশ করে পুঁথি খুলে লিখে দিলেন “দেহি পদপল্লবমুদারং”। অর্থাৎ জয়দেব যে কথা লিখতে ভয় পাচ্ছিলেন সে কথা স্বয়ং জগন্নাথ লিখে দিলেন। পদ্মাবতী জয়দেবকে এত শীঘ্র ফিরে আসতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, “কি ব্যাপার, তুমি এইমাত্র স্নান করতে গেলে আবার এর মধ্যে ফিরে এলে কেন?”

জয়দেবরূপী জগন্নাথ উত্তর দিলেন—“যেতে যেতে একটি কথা মনে পড়ে গেল, পরে ভুলে যাই। সেজন্যই এসে লিখে গেলাম।” এই বলে জয়দেবরূপী জগন্নাথ চলে গেলেন। তার কিছুক্ষণ পরই আসল জয়দেব স্নান করে ফিরলেন। এবার পদ্মাবতী খুবই অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—“তুমি স্নান করতে গিয়ে স্নান না করেই শীঘ্রই ফিরে এলে, কিছু লিখলে আবার স্নানে গেলে আবার অল্প সময়ের মধ্যে কিভাবে চলে এলে? এখন আমার মনে সন্দেহ হচ্ছে—যিনি লিখে গেলেন তিনি কে? আর তুমিই বা কে? জয়দেব কিছু বুঝতে পারলেন না। তিনি সঙ্গে সঙ্গে পুঁথি খুলে দেখলেন, স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে “দেহি পদপল্লবমুদারম্” আর সারা ঘরে শঙ্খ-চক্র-পদ্ম যুক্ত শ্রীহরির চরণ চিহ্ন। তাঁর শরীর পুলকিত হল। প্রেমাশ্রু বিসর্জন করতে করতে তিনি পদ্মাবতীকে বললেন—হে পদ্মে! তুমিই ধন্য। তোমারই জীবন স্বার্থক। তোমার ভাগ্যে প্রভুর দর্শন লাভ হল। আমি হতভাগ্য সেজন্য আমার কিছুই হল না।”

শ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্রে একটি প্রবাদ আছে—একজন মালিনী পুরুষোত্তম ধামে একটি ক্ষেত্রে বসে ভাবে বিভোর হয়ে শ্রীজয়দেব রচিত গীতগোবিন্দ গান করছিলেন। তাঁর গানে আকৃষ্ট হয়ে জগন্নাথ সেখানে চলে গেলেন। যতক্ষণ গান হল শুনলেন। তারপর মন্দিরে ফিরে এলেন। রাজা জগন্নাথ দেবকে দর্শন করতে এসে দেখলেন, তাঁর শ্রীঅঙ্গে ধূলা ও উত্তরীয় কাঁটা ভর্ত্তি। তিনি সেবকগণকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। কেউ কিছু বলতে পারলেন না। সেবকগণ ভীত হলেন। জগন্নাথদেব রাতে রাজাকে স্বপ্নে জানালেন— “আমার অঙ্গে ধূলাকাঁটার জন্য কেউ দায়ী নয়। আমি নিজেই মালিনীর নিকট গীতগোবিন্দ শুনতে গিয়েছিলাম। সেখান থেকেই আমার গায়ে

ধূলা ও কাঁটা লেগেছে।” উৎকলরাজ স্বপ্নে এই বৃত্তান্ত জানার পর বিস্মিত হলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মালিনীকে আনার জন্য পালকি পাঠালেন। মালিনীর নিকট সবকথা শুনে তাঁকে প্রতিদিন জগন্নাথের সম্মুখে গীতগোবিন্দ গান করার জন্য আদেশ করলেন। সেই থেকে আজ অবধি মালিনীর বংশের রমণীগণ জগন্নাথ মন্দিরে শ্রীজগন্নাথের সম্মুখে গীতগোবিন্দ গান করেন। বর্তমানে তাদেরকে দেবদাসী বলা হয়।

ভগবান যে প্রকৃতই ভক্তবৎসল তাঁর প্রমাণ জয়দেবের জীবনে পরিলক্ষিত হয়। জয়দেব খুবই দীনহীন অবস্থায় থাকতেন। তিনি কোনরকম রাজ ঐশ্বর্য্য ভোগ করতেন না। তাঁর ভজন কুটীরটি ছিল খড়ের চালের নির্মিত। একদিন তিনি নিজ কুটীরের খড়ের চাল ছাইছিলেন। চারিদিকে ভয়ানক রোদ। গা পুড়ে যাওয়ার মত অবস্থা। সাথে কেউ নেই যিনি জয়দেবকে সাহায্য করবেন। ভক্তের দুঃখ দেখে ভগবান আর স্থির থাকতে পারলেন না। যাতে চাল ছাওয়ার কাজ তাড়াতাড়ি শেষ হয় সেজন্য ভগবান নিজেই চালের বাঁধন ফিরিয়ে দড়ির যোগান দিতে লাগলেন। জয়দেব ভাবলেন তাঁর পত্নীই তাঁকে সাহায্য করছেন। খুব শীঘ্র চাল ছাওয়ার কাজ সমাপ্ত হলে তিনি নিচে এসে কাউকে দেখতে পেলেন না। পদ্মাবতীকে জিজ্ঞাসা করলেন কিছুক্ষণ পূর্বে ঘরের চাল ছাইতে তুমি কি আমাকে সাহায্য করেছিলে? পদ্মা উত্তর দিলেন, না; আমি তো অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তখন জয়দেব অত্যন্ত বিস্মিতচিত্তে ঠাকুরঘরে গিয়ে দেখলেন, রাধামাধবের হাতে ঝুল ময়লা লেগে রয়েছে। তিনি বুঝতে পারলেন রাধামাধবই তাঁকে সাহায্য করেছে। তিনি রাধামাধবের পাদপদ্মে পড়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন। কেউ কেউ বলেন জয়দেব শ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্রে তাঁর জীবনের অন্তিম দিনগুলি অতিবাহিত করেছেন। কেউ বললেন কেন্দুবিল্ব গ্রামে, আবার কেউ বলেন বৃন্দাবনে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ বলেছেন, জয়দেবের শেষ জীবন জগন্নাথ ক্ষেত্রেই অতিবাহিত হয়েছে।”

কলকাতা বসুমতী সাহিত্যমন্দির হতে প্রকাশিত শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থের প্রারম্ভে লিখিত ‘শ্রীজয়দেব চরিত’ নামক প্রবন্ধে কিছু ঘটনা পাওয়া যায়। ঘটনাগুলি হল ঃ

(১)

একসময় কবি জয়দেবের প্রাণধন শ্রীরাধামাধবের সেবা ও উৎসবের জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়েছিল। তাই তিনি অর্থ সংগ্রহের জন্য দেশান্তরে যাত্রা করেন। কিছু অর্থ সংগ্রহ করে যখন তিনি ফিরছিলেন, তখন রাস্তায় কিছু দস্যু তাঁর সমস্ত অর্থ কেড়ে নেয় এবং তাঁর হাত-পা কেটে তাঁকে একটি কূপের মধ্যে ফেলে দেয়। জয়দেব সেই কূপের মধ্যে পড়ে দারুণ যন্ত্রণাসত্ত্বেও উচ্চ স্বরে হরিনাম করতে থাকেন। দৈবক্রমে তৃতীয় দিনে এক রাজা মৃগয়া করার জন্য যাচ্ছিলেন। তিনি কূপের মধ্যে হরিধ্বনি শুনে বিস্মিত হলেন। কূপের কাছে গিয়ে দেখলেন একজন ব্যক্তি ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তিনি তাকে সেখান থেকে তুলে রাজপ্রাসাদে নিয়ে গিয়ে প্রচুর সেবা শুশ্রুষা করলেন। রাজারাণীর যত্নে জয়দেব ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলেন। তারা জয়দেবের গীত গোবিন্দ শুনে মুগ্ধ হলেন। বুঝতে পারলেন জয়দেব একজন মহান ভক্ত। শীঘ্রই পদ্মাবতীকেও রাজভবনে নিয়ে এলেন। রাজারাণী উভয়েই বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে শ্রীজয়দেবের শ্রীমুখ থেকে কৃষ্ণকথা শ্রবণ ও বৈষ্ণব সেবা করে জীবন ধন্য করতে লাগলেন।

যারা জয়দেবকে নির্যাতন করেছিলেন, সেই

দস্যুগণ একদিন বৈষ্ণববেশে রাজভবনে অতিথি হলেন। জয়দেব তাদেরকে চিনতে পেরেও সম্মানের সাথে অতিথি সেবার ব্যবস্থা করে দিলেন। কিন্তু দস্যুগণ জয়দেবের মহৎ উদ্দেশ্য বুঝতে পারল না, তারা ভাবল নিশ্চয়ই জয়দেব তাদেরকে দণ্ড দেবে। তাই তারা চলে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। জয়দেব তাদের অভিপ্রায় বুঝতে পারলেন। তাই রাজাকে বলে তাদেরকে বহু অর্থ প্রদান করালেন এবং রাজকর্ম্মচারীগণকে সঙ্গে দিয়ে বিদায় দিলেন।

দস্যুগণ কিছুদূর গিয়ে রাজকর্ম্মচারীগণকে বললেন—"আপনাদের আর বেশী দূর যেতে হবে না, তবে একটা গোপন কথা বলছি, আপনারা এই কথাটি রাজাকে গিয়ে বলবেন। কথাটি হচ্ছে—এই যে মোহান্ত বাবাজী (জয়দেব) রাজপ্রাসাদে রয়েছে সে কোন সাধু নয়। বৈষ্ণব হওয়ার পূর্বে আমরা এক রাজার অনুচর ছিলাম। রাজা কোন এক বিশেষ কারণে তোমাদের ঐ মোহান্ত বাবাজীকে হত্যা করার জন্য আমাদের আদেশ দেন। আমরা তাকে প্রাণে না মেরে হাত-পা কেটে বিদায় দেই। তিনিই এখন রাজপ্রাসাদে এসে সাধু সেজেছেন। আমরা যাতে গুপ্ত রহস্যটি ফাস না করি, সেজন্য তিনি আমাদের বহু অর্থ দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি বিদায় দিলেন।" এভাবে দস্যুরা পরম ভাগবত জয়দেবের নামে মিথ্যা কথা বানিয়ে বানিয়ে বলছিলেন। কিন্তু ধরিত্রীদেবী তা আর সহ্য করতে পারলেন না। দস্যুরা মহাপুরুষের নামে মিথ্যা কথা বলতে বলতেই ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হল।

রাজকর্ম্মচারীগণ জয়দেবের ন্যায় মহাভাগবত চরণে অপরাধিদের অদ্ভুত শাস্তি প্রত্যক্ষ করে রাজার নিকট এসে সমস্ত ঘটনা বর্ণন করেন। এতে রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হন।

(২)

রাণীর সাথে জয়দেব-পত্নী পদ্মাবতীর খুব ভাল সম্পর্ক ছিল। সেসময় সহমরণ প্রথা ছিল। রাণীর ভাইয়ের মৃত্যু হলে তাঁর ভাইয়ের পত্নীর সহমরণের জন্য তিনি কান্না করছিলেন। তখন পদ্মাবতী তাকে বুঝিয়ে বললেন—"স্বামীর মৃত্যুতে পতিব্রতা পত্নীর প্রাণ শরীরে থাকে না।"

রাণী সঙ্গে সঙ্গে কিছু বললেন না। অন্য একদিন পদ্মাবতীর কথাটির সত্যতা পরীক্ষা করার জন্য বললেন, 'কিছুক্ষণ পূর্বে তোমার স্বামী জয়দেবের হঠাৎ মৃত্যু হয়েছে।' এই সংবাদ শোনামাত্রই পদ্মাবতী প্রাণ ত্যাগ করলেন। রাণী নিজেকে অপরাধী ভেবে শোক সন্তপ্ত হয়ে সজোরে কান্না শুরু করলেন। রাজা অশ্রু বিসর্জন করতে করতে জয়দেবকে তাঁর পত্নীর প্রাণদানের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন। ভক্তপ্রবর জয়দেব তাঁর পত্মীর কানের কাছে গিয়ে কৃষ্ণনামামৃত সিঞ্চন করতে লাগলেন। পদ্মাবতী যেন ঘুম থেকে উঠে বসলেন। সকলে পরম আনন্দিত হলেন। রাজারাণী উভয়েই জয়দেব-পদ্মাবতীর মহত্ব দর্শন করে পুনঃ পুনঃ তাঁদের চরণে প্রণতি করতে লাগলেন।

(৩)

অতঃপর শ্রীজয়দেব বৃন্দাবন দর্শনের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে গেলে রাজারাণীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ইষ্টদেব শ্রীশ্রীরাধামাধব জীউকে সঙ্গে নিয়ে বৃন্দাবনে উপস্থিত হন। সেখানে কেশীঘাটের সন্নিধানে শ্রীরাধামাধব জিউর সেবা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সুমধুর কণ্ঠনিঃসৃত গীতগোবিন্দ শ্রবণ করে ব্রজবাসী ভক্তগণ মুগ্ধ হয়ে যেতেন। অনেকে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন। এক ভক্ত কেশীঘাটের উপর রাধামাধবের জন্য একটি মন্দির নির্মাণ করে দেন।

শোনা যায়, শ্রীজয়দেব দীর্ঘকাল বৃন্দাবনে বাস করেন। অন্তিম সময়ে তিনি নিজ জন্মভূমি কেন্দুবিল্ব

গ্রামে এসে সাধন ভজন করেন। তিনি প্রতিদিন অনেক দূরে গিয়ে গঙ্গাস্নান করতেন, একদিন দৈবক্রমে গঙ্গাস্নানে যেতে না পেরে তিনি অত্যন্ত দুঃখী হন। তখন গঙ্গাদেবী কেন্দুবিল্ব গ্রামে প্রবাহিত হয়ে তাঁকে কৃপা করেন। কথিত হয় নিজ জন্মভূমিতেই তাঁর সাধন লীলার পরিসমাপ্তি ঘটে। তাঁর পবিত্র স্মৃতি রক্ষা করার জন্য প্রতিবছর ঐ কেন্দুবিল্ব গ্রামে মেলা হয়।

জয়দেব গোস্বামী কেন্দুবিল্ব গ্রামে এসে শেষজীবন অতিবাহিত করলেও তাঁর প্রাণধন শ্রীরাধামাধবের সেবা বৃন্দাবন হতে কেন্দুবিল্ব গ্রামে আনার কথা শোনা যায় না। জয়পুরের রাজা শ্রীজয়দেবের তিরোধানের পর তাঁর শ্রীরাধামাধব বিগ্রহকে নিয়ে জয়পুরের ঘাটি নামক স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন। আজও শ্রীরাধামাধব জয়পুরে সেবিত হচ্ছেন।

শ্রীজয়দেব গোস্বামী পৌষী কৃষ্ণ-ষষ্ঠী তিথিতে তিরোধান লীলা করেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর শেষলীলায় ১২ বছর গম্ভীরায় থেকে যে সমস্ত কথা আলোচনা করতেন তাঁর মধ্যে গীতগোবিন্দ অন্যতম।

''শ্রীরাধার প্রলাপ যৈছে উদ্ধব-দর্শনে।  
সেইমত উন্মাদ-প্রলাপ করে রাত্রিদিনে।।  
বিদ্যাপতি, জয়দেব, চণ্ডীদাসের গীত।  
আস্বাদেন রামানন্দ-স্বরূপ-সহিত।।"

চৈঃ চঃ আঃ ১৩/৪১-৪২

''ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ, আর রসাভাস।  
শুনিলে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস।।  
অতএব স্বরূপ-গোঁসাই করে পরীক্ষণ।  
শুদ্ধ হয় যদি, প্রভুরে করা'ন শ্রবণ।।  
বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, শ্রীগীতগোবিন্দ।  
এই তিন গীতে করা'ন প্রভুর আনন্দ।।"

—চৈঃ চঃ মঃ ১০/১১৩-১১৫

''যবে যেই ভাব প্রভু করয়ে উদয়।  
ভাবানুরূপ গীত গায় স্বরূপ-মহাশয়।।  
বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, শ্রীগীতগোবিন্দ।  
ভাবানুরূপ শ্লোক পড়েন রায়-রামানন্দ।।"

—চৈঃ চঃ অ ১৭/৫-৬

''ক্ষণেকে প্রভুর বাহ্য হৈল, স্বরূপেরে আজ্ঞা দিল,  
'স্বরূপ কিছু কর মধুর গান।'  
স্বরূপ গায় বিদ্যাপতি, গীতগোবিন্দ গীতি,  
শুনি' প্রভু জুড়াইল কান।।"

—চৈঃ চঃ অ ১৭/৬২

**।। জয় শ্রীল জয়দেব গোস্বামী কি জয়।।**



# শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু (বীরভদ্র)

সঙ্কর্ষণস্য যো ব্যূহঃ পয়োব্ধিশায়িনামকঃ।
স এব বীরচন্দ্রোঽভূচ্চৈতন্যাভিন্নবিগ্রহঃ।।

গৌঃ গঃ দীঃ ৬৭

শ্রীসঙ্কর্ষণের পয়োব্ধিশায়ী অর্থাৎ ক্ষীরোদকশায়ী নামক ব্যূহই এখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অভিন্ন বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দের পুত্র 'বীরচন্দ্র'।

শ্রীমদ্ বীরচন্দ্র বা শ্রীবীরভদ্র প্রভু কার্ত্তিক কৃষ্ণ নবমী তিথিতে আবির্ভূত হন।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—

শ্রীবীর ভদ্র গোসাঞি স্কন্ধ মহাশাখা।
তাঁর উপশাখা যত অসংখ্য তাঁর লেখা।।
ঈশ্বর হইয়া কহায় মহাভাগবত।
বেদধর্ম্মাতীত হঞা বেদ ধর্মে রত।।
অন্তরে ঈশ্বর-চেষ্টা, বাহিরে নির্দ্দম্ভ।
চৈতন্য ভক্তিমণ্ডপে তেঁহো মূল স্তম্ভ।।
অদ্যাপি যাঁহার কৃপা-মহিমা হইতে।
চৈতন্য-নিত্যানন্দ গায় সকল জগতে।।
সেই বীরভদ্র-গোসাঞির চরণ-শরণ।
যাঁহার প্রসাদে হয় অভীষ্ট পূরণ।।

—চৈঃ চঃ আদি ১১/৮-১২

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের অনুভাষ্যে শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ লিখেছেন—"শ্রীবীরভদ্র গোসাঞি—ইনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র ও শ্রীজাহ্নবা মাতার শিষ্য। ইনি শ্রীবসুধার গর্ভজাত।"

শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর বিবাহ সম্বন্ধে শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী লিখেছেন--

রাজবল হাটের নিকট ঝামটপুরে।
গেলেন ঈশ্বরী এক ভৃত্যের মন্দিরে।।
তথা বিপ্র যদুনন্দনাচার্য্য বৈসয়।
ঈশ্বরী কৃপায় তেঁহো হৈলা ভক্তিময়।।
যদু নন্দনের ভার্য্যা লক্ষ্মী নাম তাঁর।
কহিতে কি অতি পতিব্রতাধর্ম যাঁর।।
তাঁর দুই দুহিতা--শ্রীমতী, নারায়ণী।
সৌন্দর্যের সীমাদ্ভূত অঙ্গের বলনী।।
ঈশ্বরী ইচ্ছায় সে বিপ্র ভাগ্যবান্।
প্রভু বীরচন্দ্রে দুই কন্যা কৈল দান।।

—ভক্তি রত্নাকর

শ্রীযদুনন্দন আচার্য্য শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর শিষ্য হয়েছিলেন। শ্রীসতী ও শ্রীনারায়ণীকে শ্রীজাহ্নবা মাতা মন্ত্র দীক্ষা দান করেন। শ্রীবসুধা দেবীর গর্ভজাত কন্যা শ্রীমতী গঙ্গাদেবী, তিনি সাক্ষাৎ গঙ্গার অবতার ছিলেন। শ্রীমাধব আচার্য্যের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। শ্রীমাধব আচার্য্য শান্তনু রাজার অবতার ছিলেন।

বৈষ্ণব বন্দনায় শ্রীমাধব আচার্য্যের নাম আছে—

প্রেমানন্দময় বন্দো আচার্য্য মাধব।
ভক্তি বলে হৈলা গঙ্গাদেবীর বল্লভ।।

**তীর্থ ভ্রমণ**

জননীর অনুমতি নিয়ে শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু শ্রীবৃন্দাবন ধাম যাত্রা করেন। তিনি প্রথমে সপ্তগ্রামে শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের গৃহে গমন করেন। শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের পুত্র শ্রীনিবাস দত্ত ঠাকুর শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুকে বিশেষ সম্মানসহ দুই দিবস সৎকার করেন। শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু সেখান থেকে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে গমন করেন। অদ্বৈতাচার্য্যের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুকে বহু সম্মান সৎকার করেন এবং সংকীর্ত্তনে মগ্ন হন। সেখান থেকে শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু অম্বিকা কালনায় শ্রীগৌরীদাস

পণ্ডিতের গৃহে গমন করেন। শ্রীহৃদয় চৈতন্য প্রভু তাঁকে বহু আদর– সৎকার করেন। সেখান থেকে নবদ্বীপে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র গৃহে আগমন করলে প্রভুর পরিকরগণ তাঁকে নিত্যানন্দাত্মজ জেনে আনন্দে বহু সৎকার করেন। দুই দিন সেখানে অবস্থান করে তিনি শ্রীখণ্ডে শুভাগমন করেন। খণ্ডবাসী শ্রীরঘুনন্দন ও শ্রীকানাই ঠাকুর তাঁকে বহু সম্মান প্রদান করেন ও আলিঙ্গন করেন। কয়েক দিন সেখানে অবস্থান করবার পর শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু যাজীগ্রামে শ্রীনিবাস আচার্য্যের গৃহে শুভাগমন করেন। আচার্য্য প্রভু মহাভক্তিভরে তাঁকে পূজা করেন। সেখানে কয়েকদিন সংকীর্ত্তন মহোৎসব করবার পর শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু কন্টক নগরে গমন করলেন। একদিন সেখানে অবস্থান করে বুধরী গ্রামে শ্রীগোবিন্দ রাজের গৃহে শুভাগমন করেন। বহু ভক্ত সহ শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ তাঁকে পূজা করে সৎকার করেন। তাঁদের ভক্তিতে শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু অতিশয় সন্তুষ্ট হয়ে দুই দিন সেখানে অবস্থান করেন। অতঃপর শ্রীখেতরি গ্রামে শুভ পদার্পন করেন।

শ্রীঠাকুর নরোত্তম কত না আনন্দে।
আগুসরি লৈয়া গেল প্রভু বীরচন্দ্রে।।
সংকীর্ত্তন নৃত্য কৈলা গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণে।
আইলা অসংখ্য লোক প্রভুর দর্শনে।।

–ভক্তি রত্নাকর

খেতরি গ্রামে কয়েকদিন সংকীর্তন মহোৎসব করবার পর শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করলেন। তাঁর প্রভাবে পথে অনেক পাপী পাষণ্ডী উদ্ধার হয়। তিনি শ্রীবৃন্দাবন ধামে পৌঁছিলে তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য ব্রজের মহান্ত গোস্বামিগণ আগমন করেন–শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীঅনন্তাচার্য্য, শ্রীহরিদাস পণ্ডিত, শ্রীমদন গোপাল দেবের সেবাধিকারী–শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য–শ্রীকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগোপীনাথ অধিকারী, শ্রীমধু পণ্ডিত, তাঁর সতীর্থ ভ্রাতা–শ্রীগোপীনাথের পূজারী শ্রীভবানন্দ, শ্রীকাশীশ্বর, তাঁর শিষ্য শ্রীগোবিন্দ গোস্বামী ও শ্রীযাদবাচার্য্য প্রভৃতি।

প্রভু বীরচন্দ্রে লৈয়া আইলা সর্ব্বজনে।
ব্রজবাসিগণ হর্ষ প্রভুর দর্শনে।।
প্রভু প্রেম-ভক্তি রীতি কেবা না বিহ্বল।
গায় গুণ ব্রজবাসী বৈষ্ণব সকল।।
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন।
সবাসহ বীরচন্দ্র করিলা দর্শন।।

–ভক্তিরত্নাকর

অতঃপর শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু শ্রীভূগর্ভ গোস্বামীর ও শ্রীজীব গোস্বামীর অনুমতি নিয়ে বন ভ্রমণে যাত্রা করেন। তিনি দ্বাদশ বন, শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড ও গোবর্দ্ধন গিরিরাজ প্রভৃতি দর্শন করে অত্যদ্ভুত প্রেম প্রকট করেন, তা' দেখে ব্রজবাসিগণ অত্যন্ত মুগ্ধ হন। এরূপে কিছুদিন ব্রজ ধাম দর্শন করে পুনঃ গৌড়দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এরূপ অত্যদ্ভুত প্রেম দর্শনে সর্ব্বত্রই তাঁর যশ প্রচারিত হয়। তাঁব ঐশ্বর্য্য ছিল অভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ন্যায়।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি লীলার একাদশ পরিচ্ছেদের অষ্টম শ্লোকের অনুভাষ্যে লিখেছেন– **"গোপীজন বল্লভ, রামকৃষ্ণ ও রামচন্দ্র–এ তিন জন শিষ্যই ইঁহার পুত্র বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কনিষ্ঠ রামচন্দ্র খড়দহে বাস করতেন, তিনি শাণ্ডিল্য গোত্রীয় শুদ্ধ শ্রোত্রীয় বটব্যাল। জ্যেষ্ঠ গোপীজন বল্লভ বর্দ্ধমান জেলার মানকরের নিকট লতাগ্রামে এবং মধ্যম রামকৃষ্ণ মালদহের নিকট**

**গণেশপুরে বাস করতেন।"**

খড়দহে অবস্থিত প্রাচীন শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরে শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর আনীত প্রস্তরখণ্ড হতে তিনটি বিগ্রহ শ্রীশ্যামসুন্দর, শ্রীরাধাবল্লভ ও শ্রীনন্দদুলাল জিউ প্রকটিত হয়েছিলেন। প্রস্তরখণ্ডটি যে ঘাটে এসেছিল, সেই ঘাটের নাম শ্যামসুন্দর ঘাট।

**।। জয় শ্রীল বীরচন্দ্র প্রভু কি জয়।।**

# শ্রীঈশান ঠাকুর

ঈশান ঠাকুর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শাখায় অন্তর্ভুক্ত–

''শ্রীনাথ মিশ্র, শুভানন্দ, শ্রীরাম, ঈশান।
শ্রীনিধি, শ্রীগোপীকান্ত, মিশ্র ভগবান।।"

চৈঃ চঃ আঃ ১০/১১০

শ্রীঈশান ঠাকুর শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহ ভৃত্য ছিলেন। মনে হয় শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের পুত্র-কন্যাদি জন্মাবার পূর্ব্ব থেকে ঈশান তাঁর গৃহে আছেন। ক্রমে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আট কন্যা ও দুই পুত্র হয়েছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীবিশ্বরূপ ও কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীবিশ্বম্ভর। আট কন্যা পর পর পরলোক গমন করেন। ষোল বর্ষ বয়সে বিশ্বরূপ গৃহত্যাগ করেন। অনন্তর শ্রীজগন্নাথ মিশ্রও নিত্যধামে বিজয় করেন।

এই সময় শ্রীঈশান ঠাকুর শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের সংসার রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। তিনি শ্রীশচীদেবীকে মায়ের ন্যায় দেখতেন, শ্রীশচীদেবীও তাঁকে পুত্র-প্রায় স্নেহ করতেন। গঙ্গা থেকে জল এনে গৃহ বাগিচায় তরিতরকারী উৎপাদন, যজমান গৃহ থেকে বার্ষিক ধান-চাল আদায়, বাজার করা ও অতিথি অভ্যাগত এলে তাঁদের পাদধৌত করে দেওয়া প্রভৃতি শচীমাতার গৃহের যাবতীয় কাজ ঈশান ঠাকুর করতেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শচীমাতার গৃহে এলে শ্রীঈশান তাঁর শ্রীচরণ ধৌত করে দিতেন। ''ঈশান দিলেন জল ধুইতে চরণ।" (চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ৮/৫৯)

''ঈশান করিল সব গৃহ উপস্কার।। (চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ৮/৭৩) ভোজনের পর গৃহ সংস্কার ঈশান ঠাকুর করতেন।

ঈশান ঠাকুর শিশু অবস্থায় মহাপ্রভুকে কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। নিমাইও ঈশানকে ছেড়ে এক দণ্ডও থাকতে পারতেন না।

''ওহে বাপু কহিতে কি জানি ক্রিয়া তান।
নিমাই চান্দের অতি প্রিয় যে ঈশান।।

ভক্তিরত্নাকর–১২/৯৫

শ্রীগৌরসুন্দর বাল্যকালে অতি চঞ্চল ছিলেন। যা পাবার জন্য জিদ্ করতেন, তা ঈশান ঠাকুর এনে দিতেন।

বাল্যকালে নিমাই চঞ্চল অতিশয়।
যে আখুটী করে তা ঈশান সমাধায়।।

ভক্তিরত্নাকর ১২/৯৭

শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি যদি কখনও কোথাও যেতেন, সঙ্গে থাকতেন ঈশান ঠাকুর।

ঈশানের প্রাণ শচীনন্দন নিমাই।
ঈশান বিহনে না যায়েন কুন ঠাঁই।।

ভঃ রঃ ১২/৯৬

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে শ্রীঈশান ঠাকুরের মহিমা এইভাবে বর্ণন করেছেন--

সর্ব্বকাল সেবিলেন আইরে ঈশান।
চতুর্দ্দশ লোকমধ্যে মহা ভাগ্যবান্।।
শচীদেবী ঈশানে যতেক স্নেহ কৈল।
কহিতে কি জানি তাহা সাক্ষাৎ দেখিল।।

চৈতন্য ভাগবত

শ্রীদেবকীনন্দন দাস বৈষ্ণব-বন্দনায় বলেছেন—

বন্দিব ঈশান দাস করজোড় করি।
শচী ঠাকুরাণী যাঁরে স্নেহ কৈল বড়ি।।

শ্রীমহাপ্রভুর সন্ন্যাসে যাবার পর তাঁর গৃহ, মা ও পত্নীকে দেখাশুনার ভার পড়েছিল শ্রীঈশান ঠাকুরের উপর।

পরবর্ত্তীকালে মহাপ্রভু পুরী থেকে শ্রীদামোদর পণ্ডিতকে নবদ্বীপ-মায়াপুরে জননীর তত্ত্বাবধানের জন্য প্রেরণ করেন।

প্রভু কহে দামোদর চলহ নদীয়া।
মাতার সমীপে তুমি রহ তাঁহা যাঞা।।

চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৩/২১

শ্রীদামোদর পণ্ডিত নদীয়াবাসী ছিলেন। তিনি প্রভুর আদেশে শচীমাতার কাছে থেকে তাঁকে বহু প্রকারে সান্ত্বনা দিতেন এবং মহাপ্রভুর বিবিধ চরিত কথা শুনাতেন। তিনি মাঝে মাঝে পুরীধামে যেতেন এবং প্রভুর সংবাদ নিয়ে শীঘ্র নদীয়ায় শ্রীশচীমাতার কাছে আসতেন। ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থে শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখেছেন—মহাপ্রভুর ও শ্রীশচীমাতার অন্তর্দ্ধানের পর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীকে ও ঈশান ঠাকুরকে শ্রীবংশীবদনানন্দ সেবা করতেন।

যখন শ্রীনিবাস আচার্য্য নবদ্বীপ মায়াপুরে আগমন করেন, তখন শ্রীবংশীবদনানন্দ শ্রীনিবাস আচার্য্যকে শ্রীঈশান ঠাকুরের ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন।

শ্রীবংশীবদন ধরি করিলেন কোলে।
শ্রীনিবাসে সিক্ত কৈল নিজ নেত্র জলে।।

ভঃ রঃ ৪/২২

মহাপ্রভুর গৃহে শ্রীনিবাস আচার্য্যের সাথে প্রথমেই শ্রীবংশীবদনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়। তারপর শ্রীবংশীবদন ঠাকুর শ্রীনিবাস আচার্য্যকে নিয়ে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াজীর শ্রীচরণ দর্শন করালেন।

হেনকালে বংশীবদন জানাইলা।
নীলাচল হৈতে শ্রীনিবাস এথা আইলা।।
শুনি ঈশ্বরীর ইচ্ছা হইল দেখিতে।
শ্রীনিবাস গেলেন শ্রীঈশ্বরী সাক্ষাতে।।

ভঃ রঃ ৪/৩৯-৪০

পুনঃ কয়েক বছর পরে যখন শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীনরোত্তম ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ এসেছিলেন তখন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী অপ্রকট হয়েছিলেন। তাঁর দর্শন তাঁদের হয় নাই। কিন্তু অতি বৃদ্ধ ঈশান ঠাকুরের দর্শন হয়েছিল।

দেখেন ঈশানে সূর্য্যসম তেজ তাঁর।।
বসিয়া আছেন একা পরম নির্জ্জনে।
কি অদ্ভুত চেষ্টা অশ্রু মুদ্রিত নয়নে।।

ভঃ রঃ ১২/১১৩

শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ তিনজন শ্রীঈশান ঠাকুরকে দণ্ডবৎ করার পর আত্ম পরিচয় প্রদান করলেন। শ্রীঈশান ঠাকুর তাঁদেরকে মহাপ্রভুর প্রিয় ভক্ত

জেনে অতি স্নেহে আলিঙ্গন করলেন। এই সময় শ্রীবংশীবদন ঠাকুরের কথা ভক্তি-রত্নাকরে উল্লেখ নাই। অতঃপর তিনজন শ্রীঈশান ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে মহাপ্রভুর লীলাস্থান নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমা করলেন। নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা অন্তে ঈশান ঠাকুরের থেকে তিন জন বিদায় নিচ্ছেন, তার বর্ণনা ভক্তিরত্নাকরে এরূপ আছে।

শ্রীঈশান ঠাকুরের চরণ বন্দিয়া।
হইতে বিদায় বিদারিয়া যায় হিয়া।।

ভঃ রঃ ১৩/৯

তিন জন শ্রীঈশান ঠাকুরের থেকে বিদায় হয়ে শ্রীখণ্ডাভিমুখে যাত্রা করলেন। শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর, তিন জনের শীঘ্রই আগমন হবে অনুমানে বুঝতে পেরে, তাঁদের দর্শন উৎকণ্ঠায় বসেছিলেন; ঠিক এই সময় তিনজন শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের ভবনে প্রবেশ করলেন এবং ঠাকুরকে দণ্ডবৎ করলেন। শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর আনন্দাশ্রু ফেলতে ফেলতে তিনজনকে আলিঙ্গন করতে লাগলেন। সকলে বসলেন, শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর নবদ্বীপ মায়াপুরের কথা, ভক্ত শ্রীঈশান ঠাকুরের কুশল প্রশ্নাদি করতে লাগলেন। ঠিক এই সময় নবদ্বীপ মায়াপুর হতে সংবাদ এল শ্রীঈশান ঠাকুর অপ্রকট হয়েছেন।

"শ্রীঈশান ঠাকুর হইল সংগোপন।।"

ভঃ রঃ ১৩/২১

শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৃহভৃত্য ঈশান ছাড়া 'ঈশান' নামে আরও কয়েকজন ভক্ত ছিলেন। ১। শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভৃত্যের নাম 'ঈশান'। ২। বৃন্দাবন বাসী গৌড় দেশীয় ভক্তের নাম 'ঈশান'। ৩। গৌর গণোদ্দেশ দীপিকা মতে যিনি পূর্বে মৌন মঞ্জরী ছিলেন তিনি এখন 'ঈশান আচার্য্য' হয়েছেন। ৪। অদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থ রচয়িতা 'শ্রীঈশান নাগর'।

**।। জয় শ্রীঈশান ঠাকুর কি জয়।।**

# শ্রীবংশীবদনানন্দ ঠাকুর

শ্রীবংশীবদনানন্দ ঠাকুর ১৪১৬ শকে (কারও মতে ১৪২৭ শকে) মধুপূর্ণিমায় আবির্ভূত হন।

"বংশী কৃষ্ণপ্রিয়া যাসীৎ সা বংশীদাসঠক্কুরঃ।।"

গৌঃ গঃ দীপিকা ১৭৯

যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় বংশী ছিলেন, তিনিই এখন বংশীবদনানন্দ ঠাকুর হয়েছেন।

গোপীগণ বর্ণনা করেছেন ওহো! ঐ বংশীর কি সৌভাগ্য। গোবিন্দের যে অধরামৃত পান করার জন্য আমরা লালায়িত বংশী সেই অমৃত নিরন্তর পান করে। সেই বংশীই নবদ্বীপে বংশীবদনানন্দ ঠাকুর হয়েছেন। শ্রীবংশীবদনানন্দ ঠাকুরের জীবনী শ্রীবল্লভদাসের রচিত 'বংশীবিলাস' গ্রন্থে জানা যায়। ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থেও কিছু বর্ণনা আছে।

বৈষ্ণব সমাজে বংশীবদনানন্দ ঠাকুর পাঁচটি নামে পরিচিত-বংশীবদন, বংশীদাস, বংশী, শ্রীবদন ও বদনানন্দ।

কুলিয়ার মধ্যবর্ত্তী– তেঘরি, বেঁচিআড়া, বেদড়াপাড়া ও চিনেডাঙ্গা গ্রাম। প্রসিদ্ধ শ্রীকর চট্টোপাধ্যায়ের পুত্রগণ বিল্বগ্রাম বা পাটুলী হতে কুলিয়া বেঁচিআড়া গ্রামে এসে বসবাস করেন। শ্রীকর চট্টোপাধ্যায়ের বংশধর শ্রীযুধিষ্ঠির চট্টোপাধ্যায়। তাঁর শ্রীমাধব দাস চট্টোপাধ্যায় (ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়) শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় (তিন কড়ি চট্টোপাধ্যায়) ও শ্রীকৃষ্ণসম্পত্তি চট্টোপাধ্যায় (দুইকড়ি চট্টোপাধ্যায়) নামে তিন পুত্র ছিলেন। শ্রীপুরী ধাম হতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু যখন জননী ও গঙ্গা দর্শনের জন্য নবদ্বীপে কুলিয়াতে এসেছিলেন তখন শ্রীমাধব দাস চট্টোপাধ্যায়ের (ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের) গৃহে সাতদিন অবস্থান করেছিলেন এবং দেবানন্দ পণ্ডিত প্রভৃতিকে উপদেশ দিয়ে উদ্ধার করেছিলেন।

শ্রীমাধব দাসের (ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়) গৃহে বংশীবদন ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীবংশীবদনের মায়ের নাম শ্রীমতী চন্দ্রকলা দেবী। বংশীবদন ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণের বংশী অবতার। বংশীবদন ঠাকুর যেদিন জন্মগ্রহণ করেন সেদিন মহাপ্রভু তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সঙ্গে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যও ছিলেন। ছকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রভুর পরম অনুরাগী ছিলেন। তাঁর পুত্র বংশীকেও প্রভু অতিশয় স্নেহ করতেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বংশীবদন ঠাকুর সম্বন্ধে কোন কথা নাই। শ্রীমদ্ কবিকর্ণপুর চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকে ৯ম অঙ্কে ৩৩শ সংখ্যয়–"**নবদ্বীপস্য পারে কুলিয়া গ্রামে মাধব দাস বাট্যামুত্তীর্ণবান্। নবদ্বীপলোকানুগ্রহ হেতোঃ সপ্ত দিনানি তত্র স্থিতবান্।।**" শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য্যের গৃহ হতে মহাপ্রভু গঙ্গা পার হয়ে কুলিয়া গ্রামে মাধব দাস চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে নবদ্বীপ-বাসিগণকে কৃপা করবার জন্য সাতদিন অবস্থান করেছিলেন। শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ভক্তিরত্নাকরে লিখেছেন যখন শ্রীনিবাস আচার্য্য নবদ্বীপ মায়াপুরে মহাপ্রভুর গৃহে এসেছিলেন, তখন বংশীবদন ঠাকুর শ্রীনিবাসকে অনুগ্রহ করেন ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর শ্রীচরণ দর্শন করান।

"শ্রীবংশীবদন ধরি করিলেন কোলে।
শ্রীনিবাস সিক্ত কৈল নিজ নেত্রজলে।"

(ভঃ রঃ ৪/২৩)

মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পর শ্রীবংশীবদন ঠাকুর

বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর সেবায় নিযুক্ত হন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর একান্ত কৃপা পাত্র বলে বংশীবদন ঠাকুর বিখ্যাত হয়েছিলেন। তিনি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর অন্তর্ধানের পর শ্রীমূর্ত্তি সেবা মায়াপুর হতে কুলিয়া পাহাড়পুরে স্থানান্তরিত করেছিলেন। তাঁর বংশধরগণ যে সময় শ্রীজাহ্নবা মাতার কৃপাবলম্বন পূর্ব্বক শ্রীপাট বাঘনাপাড়া আশ্রয় করেন, তখন মালঞ্চবাসী সেবায়েতদিগের হাতে শ্রীমূর্ত্তি-সেবা কুলিয়া গ্রামেই ছিল।

কুলিয়া পাহাড়পুর গ্রামে শ্রীবংশীবদনের পূর্ব্ব পুরুষগণের সেবিত শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ ছিলেন। তথায় প্রাণবল্লভ নামে এক বিগ্রহ শ্রীবংশীবদন ঠাকুর নিজে স্থাপিত করেন। পরবর্তী কালে শ্রীবংশীবদন ঠাকুর বিল্বগ্রামে গিয়ে বাস করেন। ঐ বিল্বগ্রামের ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা তাঁর জ্ঞাতি ছিলেন। শ্রীবংশীবদন ঠাকুরের শ্রীচৈতন্য দাস ও শ্রীনিত্যানন্দ দাস নামে দুই পুত্র ছিলেন। শ্রীচৈতন্য দাসের পুত্র শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীশচীনন্দন। ''শ্রীনিত্যানন্দ শক্তি শ্রীজাহ্নবা মাতা এই রামচন্দ্রকে ভিক্ষা করে নিয়েছিলেন এবং দীক্ষাদান করে খড়দহ গ্রামে রেখে বৈষ্ণব-তত্ত্ব শিক্ষা দিয়েছিলেন।" (গৌড়ীয় ২২/৩০/৩৭ সংখ্যা) শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী ব্রহ্মচারী ছিলেন, বাঘনা পাড়ার শ্রীরাম-কৃষ্ণের সেবা ছোট ভাই শ্রীশচীনন্দনের হাতে সমর্পণ করেছিলেন। শ্রীশচীনন্দন গোস্বামীর পুত্রগণ হচ্ছেন বাঘনা পাড়ার গোস্বামিগণ।

বংশীবদনানন্দ ঠাকুরের পৌত্র এবং চৈতন্য দাসের পুত্র শ্রীরামচন্দ্র বা রামাই ব্রজের প্রস্কন্দন তীর্থে শ্রীরাম ও কৃষ্ণ বিগ্রহ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

শ্রীবংশীবদনানন্দ ঠাকুর একজন পদকর্ত্তা ছিলেন। তাঁর গীতি সমূহ অতি সরস ও মধুর। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করলে তাঁর বিরহে শ্রীশচীমাতা যে বিলাপ করেছিলেন তা অবলম্বনে শ্রীবংশীবদনানন্দ ঠাকুর এ গানটী রচনা করেন—

গীত

আর না হেরিব, প্রসব কপালে, অলকা কাচ।<br>
আর না হেরিব, সোনার কমলে, নয়ন খঞ্জন নাচ।।<br>
আর না নাচিবে, শ্রীবাস মন্দিরে, ভকত চাতক লৈয়া।<br>
আর না নাচিবে, আপনার ঘরে, আমরা দেখিব চাইয়া।।<br>
আর কি দু'ভাই, নিমাই নিতাই, নাচিবে এক ঠাঞী।<br>
নিমাই করিয়া, ফুকরি সদাই নিমাই কোথাও নাই।।<br>
নিদয় কেশব ভারতী আসিয়া, মাথায় পাড়িল বাজ।<br>
গৌরাঙ্গসুন্দর, না দেখি কেমনে, রহিব নদীয়া মাজ।।<br>
কেবা হেন জন, আনিবে এখন, আমার গৌরাঙ্গ রায়।<br>
শাশুড়ী বধূর, রোদন শুনিয়া বংশী গড়াগড়ি যায়।।

শ্রীবংশীবদন ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণের দান-লীলা, নৌকাবিলাস ও বনবিহার লীলাদি বহু বর্ণন করেছেন।

*প্রস্কন্দন তীর্থ—কালীয় নাগকে দমন করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ যমুনায় ঝাঁপ দিলে তাঁর অঙ্গ শীতল হয়ে যায়। তখন শ্রীকৃষ্ণের শীত দূর করার জন্য দ্বাদশ আদিত্য একসঙ্গে উদিত হয়ে তাপ দেন। তাতে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ থেকে ঘাম ঝড়তে থেকে। সেই ঘাম যমুনায় মিশ্রিত হয়। দ্বাদশ আদিত্য টীলার সন্নিকটে যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-নিঃসৃত ঘাম যমুনায় মিশ্রিত হয়েছিল সেই স্থানটিকে প্রস্কন্দন তীর্থ বলা হয়।*

।। জয় শ্রীবংশীবদনানন্দ ঠাকুর কি জয়।।

# শ্রীঅভিরাম ঠাকুর (শ্রীরামদাস)

শ্রীঅভিরাম গোপাল ঠাকুরের অন্য নাম ছিল শ্রীরাম দাস। শ্রীকৃষ্ণ লীলায় যিনি শ্রীদাম নামক গোপ-সখা ছিলেন, তিনি অধুনা অভিরাম বা রামদাস নামে খ্যাত।

''পুরা শ্রীদাম নামাসদভি রামোঽধুনা মহান্।
দ্বাত্রিংশতা জনৈরেব বাহ্যং কাষ্ঠ মুবাহ যঃ।।''

অভিরাম গোপাল ঠাকুর হুগলী জেলার খাঁনাকুল কৃষ্ণনগরে বাস করতেন। তাঁর শ্রীপাটের দ্বারে একটি বকুল গাছ আছে। ঐ স্থানটি 'সিদ্ধবকুল কুঞ্জ' নামে পরিচিত। ঐ বৃক্ষের নীচে অভিরাম ঠাকুর সর্বপ্রথম উপবেশন করেছিলেন। তিনি নিত্যানন্দের প্রিয় পাত্র ছিলেন। অভিরাম গোপাল ঠাকুরের পত্নীর নাম– শ্রীমালিনী দেবী। শ্রীগোপীনাথ জীউ অভিরাম গোপাল ঠাকুরকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে খাঁনাকুল কৃষ্ণনগরে প্রকট হন। প্রবাদ আছে শ্রীগোপীনাথ ভূমির মধ্যে ছিলেন। স্বপ্নে বলেন–আমি এখানে আছি, আমাকে বের করে পূজা কর। তারপর শ্রীঅভিরাম সে স্থান খনন করতেই ভূগর্ভে মনোহর শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ প্রাপ্ত হন। গোপীনাথ বিগ্রহ সন্ধানের জন্য মাটি খনন করলে একটি পুষ্করিণী তৈরী হয়। ঐ পুষ্করিণীটি 'অভিরাম কুণ্ড' বা রাম কুণ্ড নামে বিখ্যাত।

গোপীনাথ প্রকট কুণ্ডের দিব্য জল।
স্নান পানে হৈলা সবে আনন্দ বিহ্বল।।
রাম কুণ্ড বলি খ্যাতি হইল তাহার।
লোক যাতায়াত যত সীমা নাই তার।।

–ভক্তিরত্নাকর

অভিরাম ঠাকুর অত্যন্ত তেজীয়ান শক্তিশালী আচার্য্য ছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আদেশে তিনি ভক্তিধর্ম প্রচার করেন। সে সময় তিনি বহু পাষণ্ডকে উদ্ধার করেছিলেন।

''অভিরাম গোস্বামীর প্রতাপ প্রচণ্ড।
যাঁরে দেখি কাঁপে সদা দুর্জ্জয় পাষণ্ড।।
নিত্যানন্দ আবেশে উন্মত্ত নিরন্তর।
জগতে বিদিত যাঁর কৃপা মনোহর।।''

– ভক্তিরত্নাকর

একদিন শ্রীঅভিরাম গোপাল ঠাকুর কৃষ্ণ-ভাবাবিষ্ট হয়ে সখ্য রসে বংশী বাজাতে ইচ্ছা করেন। প্রেমানন্দে মত্ত হয়ে ঠাকুর চতুর্দিকে বংশীর অনুসন্ধান করতে লাগলেন। এমন সময় সামনে একটি বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড দেখলেন। বত্রিশ জন লোক সেই কাষ্ঠ-খণ্ড তুলতে সমর্থ হচ্ছিল না। তিনি সেই কাষ্ঠ-খণ্ড তুলে বংশী তৈরী করে বাজাতে লাগলেন।

''রামদাস অভিরাম--সখ্যপ্রেম রাশি।
যোলসাঙ্গের কাষ্ঠ তুলি যে করিল বাঁশি।।''

–চৈঃ চঃ আঃ ১০/১১৬

ভক্তিরত্নাকরে বর্ণনা আছে–১০০ জনও যে কাঠ বহন করতে পারতেন না, অভিরাম ঠাকুর প্রেমে উন্মত্ত হয়ে সেই কাঠটিকে বাঁশীর ন্যায় ধারণ করেছিলেন।

''শতাধিক লোকে যারে নারে চালাইতে।
হেন কাষ্ঠে বংশী করি ধরিলেন হাতে।।

–ভক্তিরত্নাকর ৪/১২৩

শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের একটি প্রসিদ্ধ চাবুক ছিল। তার নাম ছিল জয়-মঙ্গল। তিনি যাকে সেই চাবুক মারতেন তার কৃষ্ণ প্রেমোদয় হত।

একদিন শ্রীনিবাস আচার্য্য তাঁর দর্শনের জন্য এলেন। তাঁর অঙ্গে ঠাকুর তিনবার ঐ চাবুক স্পর্শ করতেই, ঠাকুরের পত্নী শ্রীমালিনী দেবী বলতে লাগলেন—ঠাকুর! আর মেরো না, শান্ত হও। শ্রীনিবাস বালক; তোমার চাবুক স্পর্শে সে অধীর হয়ে পড়বে। শ্রীনিবাস আচার্য্যের চাবুক-স্পর্শে কৃষ্ণ-প্রেমোদয় হল।

শ্রীগৌরসুন্দর যখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে গৌড় দেশে প্রচারকার্য্য করতে আদেশ করেন, শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গে শ্রীরামদাস, শ্রীগঙ্গাধর দাস প্রভৃতিকে দিয়েছিলেন। শ্রীঅভিরাম গোপাল ঠাকুরকে দেখে পাষণ্ডগণ কম্পমান হত। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ইচ্ছানুসারে তিনি বিবাহ করেছিলেন।

অভিরাম ঠাকুর বিষ্ণুমূর্ত্তি ব্যতীত অন্য শিলা বা মূর্ত্তিকে প্রণাম করলে সেই মূর্ত্তি বিদীর্ণ ও চূর্ণ হয়ে যেত। অবৈষ্ণবগণও তাঁর প্রণাম সহ্য করতে পারত না।

হুগলী জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণনগর এবং বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর, কোতলপুর প্রভৃতি স্থানে শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের শিষ্যবর্গের বংশধরগণ বসবাস করেন। শ্রীপাট খাঁনাকুল কৃষ্ণনগরে শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের সেবিত শ্রীশ্রীগোপীনাথ জীউ বিরাজ করছেন। শ্রীঅভিরাম গোপাল ঠাকুর চৈত্র কৃষ্ণ সপ্তমীতে অন্তর্দ্ধান হন।

জগৎগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ গৌরমণ্ডল পরিক্রমার সময় অভিরাম ঠাকুরের শ্রীপাটে শুভ বিজয় করেছিলেন। শ্রীপাটের সেবকগণ সেই সময় শ্রীল প্রভুপাদকে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা ও সম্বর্দ্ধনা দিয়েছিলেন।

**।। জয় শ্রীল অভিরাম ঠাকুর কি জয়।।**

# শ্রীপরমেশ্বর দাস (শ্রীপরমেশ্বরী দাস)

''পরমেশ্বরীদাস নিত্যানন্দৈকশরণ।
কৃষ্ণভক্তি পায়, তাঁর যে করে স্মরণ।।''

চৈঃ চঃ আঃ ১১/২৯

''নাম্নার্জ্জুনঃ সখা প্রাগ্ যোঃ দাসঃ পরমেশ্বরঃ।''

গৌঃ গঃ দীঃ ১৩২

যিনি পূর্বে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম অর্জুন নামে সখা ছিলেন, তিনিই এখন পরমেশ্বর দাস হয়েছেন।

শ্রীল পরমেশ্বরী দাস ঠাকুর বৈদ্য বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর শ্রীপাট আঁটপুরে। এই স্থানের পূর্ব নাম ছিল বিশখালি। স্থানটি হাওড়া আমতা রেল লাইনে চাঁপাডাঙ্গা শাখার আঁটপুর ষ্টেশনের নিকট।

নীলাচলে অবস্থানের সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আদেশ করেছিলেন গৌড়দেশে প্রচার করার জন্য। মহাপ্রভুর আদেশে নিত্যানন্দ প্রভু তাঁর পার্ষদদের নিয়ে গৌড়দেশে যাত্রা করলেন। সে সময় নিত্যানন্দ প্রভুর সাথে ছিলেন শ্রীরামদাস, শ্রীগদাধর দাস, শ্রীরঘুনাথ বৈদ্য, কৃষ্ণদাস পণ্ডিত, পুরন্দর দাস ও পরমেশ্বরী দাস। বন্দাবন দাস ঠাকুর বর্ণনা করেছেন–

''কৃষ্ণদাস পণ্ডিত, পরমেশ্বরী দাস।
পুরন্দর পণ্ডিতের পরম উল্লাস।।
নিত্যানন্দস্বরূপের যত আপ্তগণ।
নিত্যানন্দসঙ্গে সবে করিলা গমন।।
পথে চলিতেই নিত্যানন্দ মহাশয়।
সর্ব্ব-পারিষদ আগে কৈলা প্রেম-ময়।।
সবার হইল আত্ম-বিস্মৃতি অত্যন্ত।
কার দেহে কত ভাব নাহি তার অন্ত।।

চৈঃ ভাঃ অঃ ৫/২৩২-২৩৫

কৃষ্ণদাস পরমেশ্বরীদাস দুইজন।
গোপালভাবে 'হৈ হৈ' করে অনুক্ষণ।।

চৈঃ ভাঃ অঃ ৫/২৪০

শ্রীপরমেশ্বরী দাস নিত্যানন্দ প্রভুর লীলা পুষ্টির জন্য একজন প্রধান সহায়ক ছিলেন। তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর জীবন সদৃশ ছিলেন।

''নিত্যানন্দ জীবন পরমেশ্বরী দাস।
যাঁহার বিগ্রহে নিত্যানন্দের বিলাস।।''

চৈঃ ভাঃ অঃ ৫/৭৩২

শ্রীপরমেশ্বরী দাস আঁটপুর গ্রামে শ্রীগৌরবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই বিগ্রহে প্রকাশিত হয়েছেন–

পুরন্দরপণ্ডিত পরমেশ্বরীদাস।
যাঁহার বিগ্রহে গৌরচন্দ্রের প্রকাশ।।
সত্বরে ধাইয়া আইলেন সেইক্ষণে।
প্রভু দেখি' প্রেমযোগে কান্দে দুই জনে।।

চৈঃ ভাঃ অঃ ৫/৯৫-৯৬

শ্রীনিত্যানন্দ-শক্তি শ্রীজাহ্নবাদেবী যখন খেতরী মহোৎসবে গিয়েছিলেন, সেই সময় পরমেশ্বরী দাস ঠাকুরও তাঁর সাথে ছিলেন।

''গৌরাঙ্গ নকড়ি কৃষ্ণদাস, দামোদর।
শ্রীপরমেশ্বরী বলরাম বিজ্ঞবর।।
শ্রীমুকুন্দ, দাস বৃন্দাবন আদি করি।
এ সবায় সহ সুখে চলয়ে ঈশ্বরী।।''

ভঃ রঃ ১০/৩৭৬-৩৭৭

শ্রীপরমেশ্বরী দাস ঠাকুর জাহ্নবা মাতার সাথে বৃন্দাবনেও গিয়েছিলেন। বৃন্দাবনে গিয়ে তিনি জাহ্নবা মাতার কৃষ্ণ-শ্রীগোপীনাথের সাথে

রাধারাণীর মিলন দর্শন করে প্রেমে আপ্লুত হয়ে গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তিনি জাহ্নবা মাতার আদেশে আঁটপুরে শ্রীরাধাগোপীনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

''তরা আটপুর গ্রামে শীঘ্র করি যাহ।
তথা রাধাগোপীনাথ সেবা প্রকাশহ।।
ঈশ্বরী আজ্ঞায় শ্রীপরমেশ্বরী দাস।
রাধা গোপীনাথ সেবা করিল প্রকাশ।।''

ভঃ রঃ ১৩/২৪৫-২৪৬

শ্রীপরমেশ্বরী দাস ঠাকুর কিছুদিন খড়দহে অবস্থান করেছিলেন। তিনি যখন বৃন্দাবন থেকে ফিরে আসেন সে সময় পুরী জেলার গরলগাছা গ্রামে কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর যখন খড়দহে উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন পরমেশ্বরী ঠাকুর তাঁকে পুরীর রাস্তার বিবরণ দিয়েছিলেন।

পরমেশ্বরী দাস ঠাকুরের অলৌকিক শক্তি ছিল। কোন এক সময় তিনি হুগলী জেলার শ্রীরামপুরের নিকটে আক্‌নামহেশ গ্রামে শ্রীকমলাকর পিপ্পলায়ের শ্রীপাটে হরিনাম সংকীর্ত্তন করছিলেন। উচ্চ-সংকীর্ত্তন ও নৃত্য দেখে কিছু পাষণ্ডী লোকের গাত্রদাহ শুরু হয়। তারা পরিকল্পনা করছিল কি করে কীর্ত্তনের স্থানটিকে কলঙ্কিত করা যায় এবং বৈষ্ণবদের জব্দ করা যায়। পরিশেষে তারা একটি মৃত শৃগালকে কীর্ত্তনের স্থানে নিক্ষেপ করে। পাষণ্ডীরা ভাবল, এবার বোধ হয় কীর্ত্তন বন্ধ হবে। কিন্তু পরমেশ্বরী দাস কীর্ত্তন বন্ধ করলেন না। তাঁর সংকীর্ত্তনের প্রভাবে মৃত শৃগালও জীবিত হয়ে ভক্তদের সাথে কীর্ত্তন করতে লাগল। ভক্তগণ পরম আনন্দে বিস্মিত হলেন। পাষণ্ডীগণ এসে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। বৈষ্ণব বন্দনায় লিখিত আছে–

''পরমেশ্বর দাস বন্দিব সাবধানে।
শৃগালে লওয়ান নাম সংকীর্ত্তন স্থানে।।''

শ্রীমন্দিরের সামনে একসঙ্গে দুটি বিশাল বকুল বৃক্ষ ও একটি কদম্ব বৃক্ষ রয়েছে। সেখানে পরমেশ্বরীদাস ঠাকুরের শ্রীপাটের সমাধি এবং তুলসীমঞ্চ রয়েছে। যে দুটি বকুল বৃক্ষ পরমেশ্বরী দাস ঠাকুরের সময়ে ছিল, তারই শাখা থেকে (মতান্তরে দাঁতন থেকে) বর্ত্তমানে দুটি বৃক্ষ উৎপন্ন হয়েছে, এরকম প্রবাদ আছে। প্রতি বছর কদম্ব বৃক্ষে একটি ফুল হয়, সেই ফুল দিয়ে শ্রীবিগ্রহের চরণপূজা হয়। বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীল পরমেশ্বরী ঠাকুরের তিরোভাব উৎসব সম্পন্ন হয়।

**।। জয় শ্রীল পরমেশ্বরী দাস ঠাকুর কি জয়।।**

# শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর

"মহাভাগবত শ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ।
সর্ব্বভাবে সেবে নিত্যানন্দের চরণ।।"

চৈঃ চঃ আদিঃ ১১/৪১

শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় বর্ণনা আছে,–

"সুবাহুর্যো-ব্রজে গোপো দত্ত উদ্ধারণাখ্যকঃ।"

পূর্ব্বে যিনি ব্রজে সুবাহু নামক গোপসখা ছিলেন, অধুনা তিনি শ্রীউদ্ধারণ দত্ত নামে খ্যাত।

শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর লিখেছেন–

কতদিনে থাকি নিত্যানন্দ খড়দহে।
সপ্তগ্রাম আইলেন সর্ব্বগণ সহে।।
সেই সপ্তগ্রামে আছে সপ্ত ঋষিস্থান।
জগতে বিদিত সে ত্রিবেণী ঘাট নাম।।
সেই গঙ্গাঘাটে পূর্ব্বে সপ্ত ঋষিগণ।
তপ করি পাইলেন গোবিন্দ চরণ।।
তিন দেবী সেই স্থানে একত্র মিলন।
জাহ্নবী যমুনা সরস্বতীর সঙ্গম।।
প্রসিদ্ধ ত্রিবেণী ঘাট সকল ভুবনে।
সর্ব্ব পাপ ক্ষয় হয় যাঁর দরশনে।।
নিত্যানন্দ প্রভুবর পরম আনন্দে।
সেই ঘাটে স্নান করিলেন সর্ব্ববৃন্দে।।
উদ্ধারণ দত্ত ভাগ্যবন্তের মন্দিরে।
রহিলেন তথা প্রভু ত্রিবেণীর তীরে।।
কায়-মনোবাক্যে নিত্যানন্দের চরণ।
ভজিলেন অকৈতবে দত্ত উদ্ধারণ।।
নিত্যানন্দ স্বরূপের সেবা অধিকার।
পাইলেন উদ্ধারণ কিবা ভাগ্য তাঁর।।
জন্ম জন্ম নিত্যানন্দ স্বরূপ ঈশ্বর।
জন্ম জন্ম উদ্ধারণ তাঁহার কিঙ্কর।।
যতেক বণিক্ কুল উদ্ধারণ হৈতে।
পবিত্র হইল দ্বিধা নাহিক ইহাতে।।
বণিক্ তারিতে নিত্যানন্দ অবতার।
বণিকেরে দিলা প্রেমভক্তি অধিকার।।
সপ্তগ্রামে সব বণিকের ঘরে ঘরে।
আপনে নিতাইচাঁদ কীর্ত্তনে বিহরে।।
বণিক্ সকল নিত্যানন্দের চরণ।
সর্ব্বভাবে ভজিলেন লইয়া শরণ।।
বণিক্ সবার কৃষ্ণ ভজন দেখিতে।
মনে চমৎকার পায় সকল জগতে।।
নিত্যানন্দ প্রভুবর মহিমা অপার।
বণিক্ অধম মূর্খ যে কৈল নিস্তার।।
সপ্তগ্রামে প্রভুবর নিত্যানন্দ রায়।
গণসহ সংকীর্ত্তন করেন লীলায়।।
সপ্তগ্রামে যত হৈল কীর্ত্তন বিহার।
শত বৎসরেও তাহা নারি বর্ণিবার।।
পূর্ব্বে যেন সুখ হৈল নদীয়া নগরে।
সেই মত সুখ হৈল সপ্তগ্রাম পুরে।।

–চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৫/৪৪৩-৪৬১

শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের পিতার নাম শ্রীকর দত্ত, মাতার নাম-শ্রীভদ্রাবতী। শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর নৈহাটী গ্রামের রাজার দেওয়ান্ ছিলেন। আজও রাজ-প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান আছে। ঠাকুর রাজ-কার্য্য উপলক্ষ্যে যে স্থানে বাস করতেন তা আজও উদ্ধারণপুর নামে অভিহিত।

–চৈঃ চঃ আদিঃ ১১/৪১; অনুভাষ্য

১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে শ্রীল প্রভুপাদ প্রথম শ্রীগৌরমণ্ডল পরিক্রমা আরম্ভ করেন। সে বছর

উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের শ্রীপাটে এসে শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন—

"শ্রীল নিত্যানন্দ-প্রভু সমস্ত তদ্রূপবৈভবের মালিক। শ্রীগৌরসুন্দর যখন শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে উদার ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য গৌড়-সাম্রাজ্যে প্রেরণ করেন, তখন শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দগণের প্রধান স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। তিনি অবর ব্রাত্য বৈশ্যকুলে উদ্ভুত হইলেও সেই কুলের পরিচয়ে পরিচিত হইতে পারেন না, অথবা সেই জাতির অন্তর্গত নহেন, অর্থাৎ ঠাকুর মহাশয় কিছু সুবর্ণবণিক্ নহেন—বৈষ্ণবে শৌক্রজাতিবুদ্ধির বশে তাঁহাকে সুবর্ণবণিক্ বুদ্ধি করিলে অনন্ত রৌরবে গমন করিতে হইবে। তিনি ব্রজের শ্রীবলদেবের সখা। তিনি সাধারণ গোয়ালাও নহেন, তিনি শ্রীবলদেবের নিত্যসঙ্গী চিন্ময় দুধ-বেচা চিন্ময় ব্রজবাসী গোয়ালা। সেই ব্রজসখা প্রপঞ্চে যে-স্থানে উদিত হইয়াছিলেন, আজ আমরা বহুভাগ্য-ফলে সে-স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। সেই স্মৃতি আমাদের উদ্দীপনের বস্তু।

বিষ্ণু ও বৈষ্ণবে কোন ভেদ নাই,—কেবল উভয়ে নিত্য সেব্য-সেবকভাব-সম্বন্ধ; একজন—বিষয়-তত্ত্ব, আর একজন--আশ্রয়-তত্ত্ব। সাক্ষাৎ শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ বলিলে যাহা বুঝায়, উদ্ধারণ ঠাকুরকে তাহাই বুঝিতে হইবে। আমরা অনেক সময় ভগবদ্ভক্তগণকে—নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপরিকর বৈকুণ্ঠবস্তু-সমূহকে মায়িকবুদ্ধির দ্বারা—অক্ষজজ্ঞানে মাপিতে গিয়া অপরাধ-সঞ্চয়- পূর্ব্বক বলিয়া থাকি,—"ভগবদ্ভক্তগণও আমাদের ন্যায় কর্ম্মফলবাধ্য জাতির অন্তর্গত! বদ্ধজীব আমরা অনেক সময় সুবর্ণবণিককুলে জাত হইয়া মনে করিয়া থাকি,-- শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুর আমাদেরই বংশের একজন--আমরাও এক একজন 'ছোটখাট' উদ্ধারণ ঠাকুর।

সুবর্ণবণিককুলোদ্ভূত কোন ব্যক্তি যদি শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুরের অনুবর্ত্তন করিয়া অনন্যচিত্তে হরিভজন করেন, তবেই তিনি উদ্ধারণ ঠাকুরের অনুগত হওয়ার দরুণ সুবর্ণবণিক্কূলে উদ্ভূত হইলেও সমগ্র জগতের নিকট হইতে উদ্ধারণ ঠাকুরের ন্যায় বৈষ্ণব-সম্মান পাইবার যোগ্য। কিন্তু যদি তিনি কিংবা শূদ্রকুলজাত বা ব্রাহ্মণাদি কুলজাত কোন ব্যক্তি হরিভজন না করেন, তবে তাঁহারা কর্ম্মফলবাধ্য সামাজিক প্রাকৃত ব্যক্তি মাত্র। সেই সকল ব্যক্তি উদ্ধারণ ঠাকুরের দোহাই দিয়া কখনও বৈষ্ণব-সম্মান লাভ করিবার যোগ্য নহেন। যদি কেহ ভ্রমবশতঃ তাঁহাকে সুবর্ণবণিক্বংশীয় মনে করেন, তাহা হইলে ভগবদ্ভক্তে জাতিবুদ্ধি করায় তিনি শাস্ত্র ও সাধুজন কর্ত্তৃক "নারকী" সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হন। যাঁহারা সত্য সত্য হরিভজন করেন, তাঁহারাই বস্তুতঃ শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর আলিঙ্গিত বিগ্রহ এবং শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত বংশোদ্ভূত।

অর্চ্চ্যেবিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বাবৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেহম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকল কলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ।।
শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
বীক্ষেত জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্।।

—শ্রীপদ্মপুরাণ

বৈষ্ণবকে অবৈষ্ণবের সহিত সমান জ্ঞান করার ন্যায় মহাপরাধ আর নাই। শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুরকে 'সুবর্ণবণিক্' মনে করিয়া যাঁহারা আপনাদিগকে উদ্ধারণ ঠাকুরের কুলোদ্ভুত জ্ঞান করেন, ঠাকুরকে নিজের সমজাতি বুদ্ধি করেন এবং অর্চ্চ্য গণ্ডকীশিলা নারায়ণে প্রাকৃতশিলাজ্ঞান করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই নরক লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীগুরুদেব—অভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ; আমার গুরুদেব—সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ-প্রভু। আমার গুরুদেব যাঁহাকে গুরুদেব বলিয়াছেন, তিনি আমার শ্রীগুরুদেবের নিকট নিত্যানন্দাভিন্ন-স্বরূপ। আমার পরম গুরুদেব যাঁহাকে তাঁহার গুরুদেব বলিয়াছেন, তিনি আমার পরম গুরুদেবের নিকট অভিন্ন নিত্যানন্দস্বরূপ। আপনারা বৈষ্ণব, সকলেই শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর বিচিত্র ভাব-বিলাস। তাই বলিয়া আমার গুরুদেব নিজ-মুখে কখনও বলেন নাই যে, 'আমি নিত্যানন্দ'। তিনি সর্ব্বদাই শ্রীগৌরসুন্দরের দাস—গৌরচন্দ্রের মনোঽভীষ্টের সেবাকারী বলিয়াই অভিমান করেন। কিন্তু আমি যদি আমার অত্যন্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ কোনও দিন কর্ণে শুনিতে পাই যে, আমার গুরুদেব শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ নহেন, সে-দিন আমি নিশ্চয়ই জানিব যে, আমার গুরুদেব আমাকে অত্যন্ত অপরাধিজ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়াছেন। যে পাষণ্ডী আমার শ্রীগুরুদেবকে নিত্যানন্দ ভিন্ন অন্য কিছু বলে, সেই প্রকার পাষণ্ডীর সহিত আমার যেন স্বপ্নেও সাক্ষাৎকার না হয়।

পূর্ব্বজন্মের পাপফলে মানুষ অবরকুলে জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু তাই বলিয়া উদ্ধারণ-প্রভু পাপফলে নীচকুলে উদ্ভূত হন নাই। তিনি কিছু মাটির বা মাটিয়া উদ্ধারণ নহেন। তাঁহাকে আমরা অক্ষজ-জ্ঞানে মাপিতে গেলে বঞ্চিত হইব।"

প্রভুপাদ এইরূপে কিছুকাল উপদেশ প্রদান করিলে পর "শুদ্ধভকত-চরণ-রেণু ভজন-অনুকূল"-- এই গানটি কীর্ত্তন করিতে মাধবীমণ্ডপের চতুষ্পার্শ্ব পরিক্রমা করা হইল।

স্থানীয় একজন লোক বলিলেন,--"যখন শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু এই স্থানে আগমন করেন, তখন তাঁহার জন্য দাল রাঁধিবার কালে শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুর এইরূপ গাছের একটি শাখা গ্রহণ করিয়া ঐ দালে কাঠি দিয়াছিলেন। শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে পক্কান্নভোগ প্রদান করেন।"

পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুরকে লোকচক্ষে স্বীয় বর্ণপ্রতিকূল ব্রাহ্মণেতর সুবর্ণবণিক্- বুদ্ধি করেন নাই। কোনও সদ্‌গুরু দীক্ষা-প্রদানান্তে শিষ্যকে পূর্ব্ববৎ 'পতিত' রাখিয়া নিজে 'পতিতপাবন' নাম ধারণ করিতে পারেন না। শিষ্যই আচার্য্যের প্রিয়তম পুত্র; শিষ্য শ্রীগুরুদেবের উপদিষ্ট মন্ত্র-দ্বারা শ্রীগুরু ও ভগবান্‌কে ভোগ-প্রদান-পূর্ব্বক নিত্য সেই উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করেন। শিষ্যকে শাস্ত্রে এইজন্য 'বিঘসাশী" অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের "উচ্ছিষ্টভোজী" বলা হয়। যাঁহারা মনে করেন যে, শ্রীগৌরসুন্দর ভোজ্যান্ন শৌক্র ব্রাহ্মণের পক্কান্ন ব্যতীত বৈষ্ণব সনোড়িয়া প্রভৃতি বা বৃত্ত ব্রাহ্মণের হস্তে খাদ্যসামগ্রী গ্রহণ করিতেন না, তাঁহারা ভ্রান্ত। শ্রীল গৌরসুন্দর অজ্ঞান কর্ম্মসঙ্গিগণের বুদ্ধিভেদ না জন্মাইবার জন্যই সময় সময় ঐরূপ আচরণ করিলেও বুদ্ধিমান্ সারগ্রাহী ভক্তগণের প্রতি তাঁহার ঐরূপ শিক্ষা ছিল না। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর আনুগত্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অক্ষজজ্ঞানে শ্রীগৌরসুন্দরের চরিত্র মাপিতে গিয়া অনেক দুর্ভাগা বঞ্চিত হইয়াছেন ও হইতেছেন। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু ও শ্রীগৌর-মহাপ্রভুর শিক্ষা কখনও পরস্পর বিরুদ্ধ হইতে পারে না। ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর জগদ্‌গুরু শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর দ্বারা শাস্ত্রীয় সদাচার শিক্ষাই দিয়াছেন।

সপ্তগ্রামে শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের স্বহস্তে-সেবিত শ্রীমহাপ্রভুর ষড়ভুজ মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তির দক্ষিণে নিত্যানন্দ, বামে শ্রীগদাধর বিরাজমান। অন্য সিংহাসনে শ্রীরাধাগোবিন্দ ও নিম্নে শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের আলেখ্য আছে।

শ্রীনিত্যানন্দ-শক্তি শ্রীজাহ্নবা মাতা সপ্তগ্রামে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের গৃহে এসেছিলেন। ''ঈশ্বরী গেলেন শীঘ্র উদ্ধারণ ঘরে।।'' (ভঃ রঃ ১১/৭৭৫) ঈশ্বরী জাহ্নবা দেবী যখন এসেছিলেন তখন শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর প্রকট ছিলেন না।

শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের পুত্রের নাম শ্রীনিবাস দত্ত ঠাকুর। পৌষী কৃষ্ণ-ত্রয়োদশীতে শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর অপ্রকট হন।।

**।। জয় শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর কি জয়।।**

# শ্রীপুরুষোত্তম দাস

''সদাশিবসুতো নাম্না নাগরঃ পুরুষোত্তমঃ।
বৈদ্যবংশোদ্ভবো নাম্না দাম যো বল্লবো ব্রজে।।
—গৌঃ গঃ ১৩১

ব্রজে যিনি 'দাম' নামে গোপ ছিলেন, তিনি এখন বৈদ্য বংশে উৎপন্ন সদাশিবের পুত্র 'নাগর পুরুষোত্তম'।। 'দাম' দ্বাদশ গোপালের অন্যতম। ব্রজলীলায় শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুর কৃষ্ণের বাল্য-ক্রীড়ার সঙ্গী।

কংসারি সেনের পুত্র সদাশিব কবিরাজ, তাঁর পুত্র শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুর। তাঁর পুত্র শ্রীকানু ঠাকুর এভাবে চার পুরুষ পর্য্যন্ত এঁনারা মহাপ্রভুর প্রসিদ্ধ পার্ষদ ছিলেন। গৌর গণোদ্দেশ দীপিকায় বর্ণনা আছে-- কংসারি সেন ব্রজলীলায় 'রত্নাবলী', সদাশিব 'চন্দ্রাবলী' ছিলেন।

শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুর শিশুকাল থেকে শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীচরণ ধ্যান পরায়ণ ছিলেন।

শ্রীসদাশিব কবিরাজ—বড় মহাশয়।
শ্রীপুরুষোত্তম দাস—তাঁহার তনয়।।
আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে।
নিরন্তর বাল্যলীলা করে কৃষ্ণ সনে।।
চৈঃ চঃ আদিঃ ১১/৩৮-৩৯

সদাশিব কবিরাজ মহাভাগ্যবান্।
যাঁর পুত্র শ্রীপুরুষোত্তম দাস নাম।।
বাহ্য নাহি পুরুষোত্তম দাসের শরীরে।
নিত্যানন্দ চন্দ্র যাঁর হৃদয়ে বিহরে।।
—চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৫/৭৪১-৭৪২

শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুরের প্রধান চারজন শিষ্য ছিলেন। শ্রীমাধবাচার্য্য, শ্রীযাদবাচার্য্য, দেবকীনন্দন দাস প্রভৃতি। এঁরা কুলীন ব্রাহ্মণ বংশীয় ছিলেন। শ্রীমাধবাচার্য্য নিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা গঙ্গাদেবীর স্বামী, শ্রীদেবকীনন্দন দাস 'শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা' গ্রন্থের লেখক। শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুরের শ্রীবিগ্রহগণ পূর্ব্বে তাঁর শ্রীপাট চাকদহ ও শিমুরালি ষ্টেশন হতে কিছু দূরে সুখসাগরে ছিলেন। সুখসাগর গ্রাম ধ্বংসের পর শ্রীবিগ্রহগণ চান্দুড়িয়ায় আনীত হন। বর্ত্তমানে জিরাটের গঙ্গা-বংশগণের তত্ত্বাবধানে অন্যান্য

বিগ্রহগণসহ শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুরের শ্রীবিগ্রহগণ সেবিত হচ্ছেন। পুরুষোত্তম ঠাকুরের শ্রীপাট ''বসু জাহ্নবার'' পাট নামে অভিহিত। (চৈঃ চঃ আদি ১১/৩৮-৩৯ অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুরের পুত্র শ্রীকানু ঠাকুর।
তাঁর পুত্র—মহাশয় শ্রীকানু ঠাকুর।
যাঁর দেহে রহে কৃষ্ণ প্রেমামৃত পুর।।

চৈঃ চঃ আদি ১১/৪০

শ্রীসদাশিব কবিরাজের পুত্র শ্রীপুরুষোত্তম দাস ঠাকুর। তাঁর পুত্র শ্রীকানু ঠাকুর। শ্রীকানু ঠাকুরের সম্বন্ধে প্রবাদ আছে--শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুরের পত্নীর নাম জাহ্নবা ছিল। ঠাকুর কানাইর আবির্ভাবের পরেই জাহ্নবা অপ্রকট হন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এ কথা জানতে পেরে তাঁর গৃহে শুভাগমন করেন এবং শিশু কানুকে নিয়ে খড়দহ গ্রামে আসেন। শ্রীকানু ঠাকুরের জন্ম শকাব্দ ১৪৫৭, বাংলা ৯৪২ সাল আষাঢ়ী শুক্লা দ্বিতীয়া রথযাত্রা বাসরে। শ্রীকানু বা কানাই ঠাকুরের কৃষ্ণভক্তি পরায়ণতা দেখে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁর এক নাম দিয়েছিলেন— শিশু কৃষ্ণদাস।

শ্রীকানাই ঠাকুর পাঁচ বছর বয়সে শ্রীঈশ্বরী জাহ্নবা দেবীর সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবন ধামে গমন করেন। শ্রীজীব গোস্বামী প্রমুখ আচার্য্যগণ তার নাম রাখেন 'ঠাকুর কানাই'। জনশ্রুতি আছে যে, বৃন্দাবনে ঠাকুর কানাই কীর্ত্তনানন্দে বিহ্বল হয়ে যখন নৃত্য করছিলেন তখন তাঁর দক্ষিণ পদের একটি নূপুর পদ হতে অন্তর্হিত হয়ে যায়। ঠাকুর কানাই তখন বলেন—যে স্থানে এ নূপুর পড়েছে, আমি সে স্থানে বাস করব। যশোহর জেলায় খানা নামক গ্রামে ঐ নূপুর পতিত হয়। তদবধি ঠাকুর শ্রীকানাই বোধখানা গ্রামে এসে বাস করতে থাকেন।

প্রেমবিলাস গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে শ্রীকানাই ঠাকুর খেতরির উৎসবে শ্রীজাহ্নবা মাতার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুরের যেমন বহু শৌক্র ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিলেন, তেমনি শ্রীকানাই ঠাকুরেরও বহু শৌক্র ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিলেন।

বর্গীর হাঙ্গামার সময় শ্রীকানাই ঠাকুরের বংশধরগণ শ্রীবিগ্রহসহ বোধখানা ত্যাগ পূর্ব্বক নদীয়া জেলার অন্তর্গত 'ভাজন ঘাট' নামক গ্রামে এসে বসবাস করেন। অতঃপর বর্গীর হাঙ্গামা মিটবার পর কানাই ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্রের বংশধর হরিকৃষ্ণ গোস্বামী পুনঃ বোধখানাতে এসে বাস করেন এবং প্রাণবল্লভ নামক শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। বর্ত্তমান বরাহনগরে বোধখানা গোস্বামীর বংশধর শ্রীহরিপদ গোস্বামী এম, এ, কাব্য সাংখ্য ব্যাকরণতীর্থ মহাশয়ের বংশ ধরগণ বাস করছেন। সামবেদীয় কৌমুদী শাখার রাঢ়ীশ্রেণীর শ্রীরাম নামক একজন ব্রাহ্মণ শ্রীকানাই ঠাকুরের প্রসিদ্ধ শিষ্য ছিলেন। মেদিনীপুর জেলায় শিলাবতী নদীর তীরে গড়বেতা নামক গ্রামে শ্রীকানাই ঠাকুরের শিষ্যগণ বাস করতেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে উল্লেখ আছে ''কারও মতে পুরুষোত্তম দাসের উপাধি 'নাগর', আবার কারও মতে তাঁর নিবাস স্থানের নাম নাগর হওয়ায় তিনি 'পুরুষোত্তম নাগর' নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি একসময় প্রেমে উন্মত্ত হয়ে সর্পের বিষ ভক্ষণ করেছিলেন। তাতেও তাঁর কোন বিকার হয় নি। এই অলৌকিক শক্তি দেখে সকলেই আশ্চর্য্য হয়েছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পার্ষদদের মধ্যে অনেকেরই এরকম অলৌকিক শক্তি ছিল।

**।। জয় শ্রীপুরুষোত্তম দাস ঠাকুর কি জয়।।**



# শ্রীকমলাকর পিপ্পলাই

'কমলাকরঃ পিপ্পলাই নাম্নাসীদ যো মহাবলঃ'

—গৌঃ গঃ ১২৮

যিনি ব্রজে দ্বাদশ-গোপালের অন্যতম 'মহাবল' ছিলেন, তিনিই গৌরলীলায় নিত্যানন্দ প্রভুর পার্ষদ 'কমলাকর পিপ্পলাই' রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন।

''কমলাকর পিপ্পলাই অলৌকিক রীত।
অলৌকিক প্রেম তাঁর ভুবনে বিদিত।।''

—চৈঃ চঃ আ ১১/২৪

'''মহাবল' গোপাল যে ছিল বৃন্দাবনে।
কমলাকর পিপ্পলাই সেই সে এখানে।।
দিবারাত্র করে রাধাকৃষ্ণ-গুণগান।
নিত্যানন্দপ্রভু শাখা বৈষ্ণবের প্রাণ।।
গঙ্গার পশ্চিমতীরে মাহেশে রহিল।
জগন্নাথ-প্রতিমূর্ত্তি সেবা কৈল।।''

—বৈষ্ণবাচারদর্পণ

''আক্‌নে মাহেশে জন্ম জাগেশ্বরে স্থিত।
কমলাকর পিপ্পলাই এই যে লিখিত।।''

শ্রীপাটপর্য্যটন।

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে উল্লেখ আছে শ্রীকমলাকর পিপ্পলাই ১৪১৪ শকাব্দ, ৮৯৯ বঙ্গাব্দ আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর পিতৃদেব জমিদার ছিলেন। আবির্ভাব স্থান সুন্দরবনের 'খালিজুলি' গ্রামে। ছোট ভাইয়ের নাম শ্রীনিধি পিপ্পলাই। তিনি রাঢ়ীয়শ্রেণীর শৌক্র ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

কমলাকর পিপ্পালাই খালিজুলি গ্রামে আবির্ভূত হলেও হুগলী জেলার শ্রীরামপুর ষ্টেশন থেকে আড়াই মাইল দূরে 'মাহেশে' গিয়ে অবস্থান করেছিলেন। মাহেশের জগন্নাথ বিগ্রহ এঁনারাই প্রতিষ্ঠিত। পূর্বে মাহেশ গ্রাম জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। কমলাকর পিপ্পলাই সেখানে যাওয়ার পর গ্রামটি সুন্দর হয়েছে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ চৈতন্য চরিতামৃতের অনুভাষ্যে কমলাকর পিপ্পলাই সম্বন্ধে দুটি কিংবদন্তীর উল্লেখ করেছেন—

**১। ''শ্রীকমলাকর পিপ্পলাইর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীনিধিপতি পিপ্পলাই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অন্বেষণে বহু স্থান ভ্রমণ করিয়া শেষে 'মাহেশ' গ্রামে যাইয়া তাঁহার দর্শন লাভ করিলেন। তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াও ভ্রাতাকে দেশে ফিরাইতে না পারিয়া নিজেই পরিজনবর্গসহ তথায় যাইয়া বাস করিয়াছিলেন। এখনও মাহেশ গ্রামে কমলাকর পিপ্পলাইর বংশের বিশঘর দ্বিজ বাস করিতেছেন।**

**২। 'ধ্রুবানন্দ' নামক জনৈক উদাসীন বৈষ্ণব পুরুষোত্তমক্ষেত্রে গিয়াছিলেন। তাঁহার নিজ হস্তে রন্ধন করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবকে ভোগ দিবার প্রবল ইচ্ছা হইলে শ্রীজগন্নাথদেব স্বপ্নে তাঁহাকে গঙ্গাতীরে মাহেশে যাইয়া শ্রীজগন্নাথ প্রতিষ্ঠার পর নিজ হস্তে রন্ধন করিয়া ভোগ দিবার জন্য নির্দ্দেশ করিলেন। ধ্রুবানন্দ মাহেশে যাইয়া দেখিলেন শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলদেব ও শ্রীসুভদ্রা জলে ভাসিতেছেন। তিনি গঙ্গাজল হইতে তাঁহাদিগকে উত্তোলন করিয়া গঙ্গাতীরে একটী কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাদের সেবা করিতে লাগিলেন। তাঁহার অপ্রকটকালে কোন্ ব্যক্তি শ্রীজগন্নাথ সেবা সুষ্ঠুরূপে করিবেন, এই বিষয়ে চিন্তামগ্ন হইলে শ্রীজগন্নাথদেব স্বপ্নে দর্শন দিয়া**

**বলিলেন—‘সুন্দরবনের নিকটে খালিজুলি’ গ্রামে ‘কমলাকর পিপ্পলাই’ নামে আমার (শ্রীজগন্নাথের) ভক্ত একজন পরমবৈষ্ণব আছেন। তিনি আমার দ্বারা স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া তোমার নিকট আসিবেন, তাঁহাকে উক্ত সেবা সমর্পণ করিবে।’ পরদিনই কমলাকর পিপ্পলাই স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া তথায় আসিলে ‘ধ্রুবানন্দ’ তাঁহাকে শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলদেব ও শ্রীসুভদ্রার সেবা প্রদান করিলেন। কমলাকর পিপ্পলাই শ্রীজগন্নাথদেবের সেবার অধিকার লাভের পর ‘অধিকারী’ উপাধী প্রাপ্ত হইলেন। তদবধি তাঁহার বংশে ‘অধিকারী’ উপাধি প্রচলিত হইয়াছে। রাঢ়ীয় শ্রেণীর শৌক্র-ব্রাহ্মণগণের পঞ্চান্ন প্রকার গ্রামীর মধ্যে পিপ্পলাই অন্যতম।**

**কমলাকর পিপ্পলাইয়ের পুত্রের নাম চতুর্ভুজ, চতুর্ভুজের দুই পুত্র—শ্রীনারায়ণ ও শ্রীজগন্নাথ। নারায়ণের পুত্র জগদানন্দ এবং জগন্নাথের পুত্র রাজীব লোচন।”**

কমলাকর পিপ্পলাই যখন জগন্নাথের সেবা গ্রহণ করেন সে সময় অর্থ কষ্ট ছিল। ধীরে ধীরে মাহেশের জগন্নাথের মহিমা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে ঢাকার নবাব ওয়ালিশ স (সুজা?) ১০৬০ বঙ্গাব্দে শ্রীজগন্নাথ দেবকে ১১৮৫ বিঘা জমি দান করেন। মাহেশের দেড় ক্রোশ পশ্চিমে জগন্নাথের নাম অনুসারে ঐ মৌজার নাম হয় জগন্নাথপুর।

শ্রীনিত্যানন্দ বংশবিস্তার গ্রন্থে বর্ণনা আছে—

‘মাহেশনিবাসী এক বিপ্র শুদ্ধচিত্ত।
বিষ্ণু বৈষ্ণব পূজা তাঁর নিত্যকৃত্য।।
সুধাময় নাম পিপ্পলায়ের জামাতা।
বিদ্যুন্মালা নাম হয় তাঁহার বণিতা।।”

কমলাকর পিপ্পলাইয়ের কন্যা বিদ্যুন্মালার সাথে মাহেশ-নিবাসী শ্রীসুধাময় চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। তাঁদের কন্যা নারায়ণী দেবী। শ্রীবীরভদ্র প্রভুর সাথে নারায়ণী দেবীর বিবাহ হয়। মাহেশে অধিকারীদের মতে কন্যার নাম ‘রাধারাণী’।

—গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীবীরভদ্রপ্রভু সম্বন্ধে লিখেছেন--“**হুগলী জেলার অন্তর্গত ঝামটপুর গ্রামনিবাসী যদুনাথাচার্য্যের ঔরসে বিদ্যুন্মালার (লক্ষ্মীর) গর্ভজাত কন্যা শ্রীমতীকে এবং তাঁহাদের পালিতা কন্যা নারায়ণীকে শ্রীবীরভদ্র প্রভু বিবাহ করেন।”**

“শ্রীযদুনন্দন, শুদ্ধচিত্ত হন,
নানাবিধ গুণালয়।
ভার্য্যা বিদ্যুন্মালা, লক্ষ্মীসম লীলা,
পিতা যাঁর পিপ্পলাই।।
মাহেশে নিবাস, জগন্নাথে আশ,
অন্য আশা কিছুই নাই।
শ্রীকমলাকর, যাহার শ্বশুর,
জামাতা যদুনন্দন।।”

—বৈষ্ণবাচারদর্পণ

শ্রীকমলাকর পিপ্পলাই ১৪৩৯ শকাব্দে পাণিহাটীতে দণ্ডমহোৎসবে, খেতুরী মহোৎসবে এবং কাটোয়ায় দাসগদাধর-প্রদত্ত মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন।

“কমলাকর পিপ্পলাই বড় ভাবের উদ্দাম।
নিত্যানন্দ দিলা যাঁরে পাণিহাটী গ্রাম।।”

—বিজয়খণ্ডে

খড়দহ হতে শ্রীজাহ্নবাদেবী সগণে খেতুরী উৎসবে যোগদানের সময় কমলাকর পিপ্পলাই উপস্থিত ছিলেন--শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে (১০/৩৭৫) উল্লিখিত আছে—

“শ্রীশঙ্কর, শ্রীকমলাকর পিপ্পলাই।
নৃসিংহ, চৈতন্য, জীব, পণ্ডিত কানাই।।”

বৈষ্ণবাচারদর্পণমতে ইনি কন্যাকে বিবাহ দিয়ে

বৃন্দাবনধাম যান এবং সেখানে অবস্থানকালে অপ্রকট হন। মাহেশের অধিকারিগণ বলেন কমলাকর পিপ্পলাইর তিরোধান ১৪৮৫ শকাব্দে ৯৭০ বঙ্গাব্দে ৭১ বৎসর বয়সে চৈত্রী শুক্লাত্রয়োদশী তিথিতে।

।। জয় শ্রীল কমলাকর পিপ্পলাই কি জয়।।

# শ্রীসারঙ্গ মুরারী ঠাকুর (শ্রীশার্ঙ্গ ঠাকুর)

ব্রজে নান্দীমুখী যাসীৎ সাদ্য সারঙ্গঠক্কুরঃ।
প্রহ্লাদো মন্যতে কৈশ্চিন্মৎপিত্রা স ন মন্যতে।।
—গৌঃ গঃ দীঃ ১৭২

ব্রজে যিনি 'নান্দীমুখী' ছিলেন, তিনি এখন 'সারঙ্গ ঠাকুর' হয়েছেন। অনেকেই তাঁকে প্রহ্লাদ মনে করেন কিন্তু আমার পিতা (শ্রীশিবানন্দ সেন) তা মনে করেন না।

শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ঠাকুর লিখেছেন--

রামদাস, কবিদত্ত, শ্রীগোপাল দাস।
ভাগবতাচার্য্য, ঠাকুর সারঙ্গ দাস।।
—শ্রীচৈঃ চঃ আদি ১০/১১৩

শ্রীসারঙ্গ মুরারি ঠাকুরকে কেউ শ্রীশার্ঙ্গ ঠাকুর কেউ শ্রীশার্ঙ্গ-পাণি ও কেউ সার্ঙ্গধর বলেন। তিনি নবদ্বীপের অন্তর্গত মোদদ্রুম দ্বীপে (মামগাছিতে) অবস্থান করতেন। সেখানে আজও তাঁর সেবিত শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথ বিদ্যমান। মন্দির-আঙ্গিনায় প্রাচীন একটি বকুল বৃক্ষ আছে। বৃক্ষটি সেই সময়কার বলে অনুমিত হয়।

শ্রীসারঙ্গ ঠাকুর গঙ্গার তীরে নির্জনে ভজন করে অনেক অলৌকিক শক্তি লাভ করেছিলেন। ভজনে বিঘ্ন হবে ভেবে তিনি কোন শিষ্য না করার সঙ্কল্প নিয়েছিলেন। কিন্তু মহাপ্রভু তাঁকে শিষ্য করতে বাধ্য করেছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে উল্লেখ আছে– ''দেবানন্দ পণ্ডিত শ্রীবাসের চরণে অপরাধ করেছিল। তাই মহাপ্রভু তাঁকে ভর্ৎসনা করার জন্য এসেছিলেন। যখন মহাপ্রভু ফিরছিলেন, তখন রাস্তায় সারঙ্গ ঠাকুরের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তখন মহাপ্রভু তাঁকে আদেশ করেন—''সারঙ্গ তুমি তোমার সঙ্কল্প ত্যাগ করে শিষ্য কর।''

মহাপ্রভুর আদেশ পেয়ে সারঙ্গ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, ''কাল প্রাতে সর্ব প্রথম যার সাথে দেখা হবে তাকেই শিষ্য করে মন্ত্র দেব।''

'মুরারী' নামে একটি বালকের সর্প দংশনে মৃত্যু হয়। সেই সময় প্রথা ছিল সর্পাঘাতে মৃত ব্যক্তিকে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়ার। তাই প্রথা অনুযায়ী মুরারীকে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া হল।

পরদিন প্রাতে যখন সারঙ্গ ঠাকুর গঙ্গাস্নানে গেলেন। মুরারীর মৃতদেহে তাঁর পদস্পর্শ হল। তিনি ভাবলেন এটা নিশ্চয়ই মূল্যবান কিছু হবে। এই ভেবে উপরে তুলে দেখলেন, একটা মৃতদেহ। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পূর্ব দিনের সঙ্কল্পের কথা মনে পড়ে গেল। তিনি ঠিক করলেন এই মৃত দেহকেই দীক্ষা দেবেন। মৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন--তুমি কে? সারঙ্গ ঠাকুরের অলৌকিক প্রভাবে মৃত ব্যক্তিটি উঠে বসল এবং তাঁকে প্রণাম করে বলল আমার নাম মুরারী।

আমি আপনার দাস। আমাকে কৃপা করুন। তখন সারঙ্গ ঠাকুর মুরারীকে দীক্ষা দিয়ে শিষ্য করলেন। সেই থেকে সারঙ্গ ঠাকুরের নাম হয় সারঙ্গ মুরারী। মুরারী একান্তভাবে গুরুসেবা করতে লাগলেন। কিছুদিন পরে সারঙ্গ ঠাকুর তাকে রাধাগোপীনাথের সেবার অধিকার দিলেন।

শ্রীসারঙ্গ মুরারীর অনুগত সেবকগণ বর্ত্তমানে 'শব' নামক গ্রামে বসবাস করছেন। সারঙ্গ মুরারীর শ্রীপাটের সন্নিকটেই শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীপাট।

শ্রীসারঙ্গ মুরারীর আবির্ভাব আষাঢ় কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী তিথিতে এবং তিরোভাব অগ্রহায়ণ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী তিথিতে।

**।। জয় শ্রীল সারঙ্গ মুরারী ঠাকুর কি জয়।।**

# শ্রীকালিয়া কৃষ্ণদাস (কালা কৃষ্ণদাস)

''প্রসিদ্ধ কালিয়া কৃষ্ণদাস ত্রিভুবনে।
গৌরচন্দ্র লক্ষ্য হয় যাঁহার স্মরণে।।

চৈঃ ভাঃ অঃ ৫/৭৪০

ইনি দ্বাদশ-গোপালের অন্যতম শ্রীলবঙ্গসখা।

নাম্নার্জ্জুনঃ সখা প্রাগ্ যো দাসঃ শ্রীপরমেশ্বরঃ।
কালাঃ শ্রীকৃষ্ণদাসঃ স যো লবঙ্গঃ সখা ব্রজে।।

গৌঃ গঃ দীঃ ১৩২

যিনি পূর্ব্বে 'অর্জুন' নামে সখা ছিলেন, তিনি 'শ্রীপরমেশ্বর দাস'। ব্রজে যিনি 'লবঙ্গ' নামক সখা ছিলেন, তিনি এখন 'কালা কৃষ্ণদাস' হয়েছেন।

শ্রীকালিয়া কৃষ্ণদাসের শ্রীপাট আকাইহাট গ্রামে। গ্রামটি কাটোয়া ষ্টেশন থেকে দুই মাইল বা দাঁইহাট ষ্টেশন থেকে এক মাইল দূরে অবস্থিত। এই শ্রীপাটে নুপুর কুণ্ড রয়েছে। কেউ বলেন শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের আবার কেউ বলেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নুপুর ঐ কুণ্ডে পতিত হয়েছিল।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের অনুভাষ্যে লিখেছেন—

'পাবনা জেলান্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ বেনাবন্দরের প্রায় ৩ মাইল পশ্চিমে ইচ্ছামতী নদীর উত্তরতীরে 'সোনাতলা' গ্রামনিবাসী 'গোস্বামী' মহাশয়গণের মতে—কালা-কৃষ্ণদাস ঠাকুর বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণকুলোদ্ভুত ভরদ্বাজ-গোত্র এবং ভাদড়গ্রামী। আকাই হাট হইতে কালা-কৃষ্ণদাস ঠাকুর হরিনাম প্রচার উপলক্ষে পাবনায় আগমন করেন। যে-স্থানে তিনি আশ্রম করেন, সেই মাঠে এখনও গৃহাদির ভগ্ন-চিহ্ন আছে। পরে ঐ স্থানে তাঁহার জ্ঞাতিগণও আগমন করেন। আকাইহাটে বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ না থাকায় তিনি এই দেশেই বিবাহ করেন এবং কিছুদিন পরে তিনি পুনরায় আকাইহাটে ও শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন।'

শ্রীকালীয়া কৃষ্ণদাসের দুই পুত্র। শ্রীমোহনদাস ও শ্রীগৌরাঙ্গ দাস বা বৃন্দাবন দাস। এঁনার বংশধরগণ এখনও পাবনা জেলার সোনাতলা গ্রামে আছেন। সেখানে কৃষ্ণ-দ্বাদশী তিথিতে কালা-কৃষ্ণদাস ঠাকুরের তিরোভাব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তার সেবিত বিগ্রহের নাম শ্রীকালাচাঁদ জীউ। সোনাতলা শ্রীপাটের ভিটা, মন্দিরের ইট ও পুষ্করিণীর ঘাট আজও দেখা যায়।

''রাঢ়ে যাঁর জন্ম কৃষ্ণদাস দ্বিজবর।
শ্রীনিত্যানন্দের তিঁহো পরম-কিঙ্কর।।
কালা-কৃষ্ণদাস্দ বড় বৈষ্ণবপ্রধান।
নিত্যানন্দচন্দ্র বিনা নাহি জানে আন।।''

—চৈঃ চঃ আ ১১/৩৬-৩৭

শ্রীজাহ্নবাদেবীর নবদ্বীপ হইতে কাটোয়ায় (কণ্টকনগরে) আগমনকালে ভক্তগণের মধ্যে অন্যতম সঙ্গী ছিলেন কালা-কৃষ্ণদাস।

''আকাইহাটের কৃষ্ণদাসাদি সহিত।
কণ্টকনগরে সবে হৈলা উপনীত।।''

—ভক্তিরত্নাকর ১০/৪০৯

---

*⁕ শ্রী মন্মহাপ্রভুর দক্ষিণভারত যাত্রাকালে মহাপ্রভুর কৌপীন, বহির্বাস, জলপাত্র বহনের জন্য শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যে কৃষ্ণদাস বিপ্রকে সঙ্গে দিয়াছিলেন, তিনি দ্বাদশগোপালের অন্যতম কালা-কৃষ্ণদাস হইতে পৃথক্ ব্যক্তি।—শ্রীল প্রভুপাদ চৈঃ চঃ ম ৭/৩৯ অনুভাষ্য।*

# শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভু

শ্রীঅচ্যুতানন্দ অদ্বৈত আচার্য্যের পুত্র। তিনি ১৪২৮ শকাব্দে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য ও সীতাদেবীকে অবলম্বন করে শান্তিপুরে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কারও মতে আবির্ভাব সন ১৪২৬ শকাব্দ।

শ্রীঅচ্যুতানন্দ অদ্বৈত আচার্য্যের প্রথম পুত্র। তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের পরম প্রিয়জন ছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর যখন নীলাচল থেকে শান্তিপুরে অদ্বৈত ভবনে আগমন করেছিলেন, তখন শ্রীঅচ্যুতানন্দ পাঁচ বছরের শিশু।

''দিগম্বর শিশুরূপ অদ্বৈত তনয়।।
আসিয়া পড়িলা গৌরচন্দ্র পদতলে।
ধূলার সহিত প্রভু লইলেন কোলে।।
প্রভু বলে অচ্যুত! আচার্য্য মোর পিতা।
সে সম্বন্ধে তোমায় আমায় দুই ভ্রাতা।।''

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ১/২১৬-২১৭)

১৪৩১ শকাব্দে শ্রীগৌরসুন্দর শান্তিপুরে আগমন করেন।

শ্রীগৌর গণোদ্দেশ দীপিকায় বর্ণনা আছে—

তস্য পুত্রোঽচ্যুতানন্দঃ কৃষ্ণচৈতন্যবল্লভঃ।
শ্রীমৎপণ্ডিতগোস্বামিশিষ্যঃ প্রিয় ইতি শ্রুতম্।।

শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্যের পুত্র 'শ্রীঅচ্যুতানন্দ', শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অতিশয় প্রিয় ও শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য এবং প্রিয় বলে প্রসিদ্ধ।।

যঃ কার্ত্তিকেয়ঃ প্রাগাসীদিতি জল্পন্তি কেচন।
কেচিদাহূ রসবিদোহচ্যুতানাম্নী তু গোপিকা।।
উভয়ন্তু সমীচীনং দ্বয়োরেকত্র সঙ্গতাৎ।
কার্ত্তিকেয়ঃ কৃষ্ণমিশ্রস্তৎ সাম্যাদিতি কেচন।।

কেউ কেউ বলেন, 'কার্তিকেয়' 'শ্রীঅচ্যুতানন্দ' হয়েছেন। আবার অন্য রস বিদ্গণ বলেন, ব্রজের 'অচ্যুতা' নামক গোপী এখন 'শ্রীঅচ্যুতানন্দ' হয়েছেন। দুটি বিচারই সঠিক। কারণ 'কার্তিকেয়' এবং 'অচ্যুতা' উভয়েই মিলে 'শ্রীঅচ্যুতানন্দ' হয়েছেন। কার্তিকেয় এবং শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রের সমানতার জন্য অনেকেই শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রকেও কার্তিকেয় বলেন।।

—গৌঃ গঃ দীঃ ৮৭-৮৮

অদ্বৈত আচার্য্যের দুই পত্নী। প্রথম পত্নী 'শ্রী' দেবীর গর্ভে তিন পুত্র ও দ্বিতীয় পত্নী সীতা দেবীর গর্ভে তিন পুত্র—অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণমিশ্র ও গোপাল দাস। ''অচ্যুতঃ কৃষ্ণমিশ্রশ্চ গোপাল দাস এব চ। রত্নত্রয়মিদং প্রোক্তং সীতাগর্ভাব্ধিসম্ভবম্।।'' বলরাম, স্বরূপ ও জগদীশ 'শ্রী' দেবীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহারা তিন জনই গৌর-বিমুখ স্মার্ত্ত মায়াবাদী ছিলেন। (চৈঃ চঃ আদি ১২/৩৬ অনুভাষ্য)

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অমৃতপ্রবাহভাষ্যে লিখেছেন—'প্রথমে অদ্বৈতপ্রভুর সকলগণেরই একমত ছিল, পরে কতকগুলি লোকের দৈববিপাকে পৃথক্ মত হইয়া পড়িল। আচার্য্যের নিজমতে যাঁহারা চলিলেন, তাঁহারা শুদ্ধবৈষ্ণব; যাঁহারা দৈবপরতন্ত্র হইয়া আচার্য্যোপদিষ্ট মত হইতে স্বতন্ত্র কোন প্রকার স্বমত কল্পনা করিলেন, তাঁহারা অসার। অসার ব্যক্তিদিগের নামে আমাদের কিছু প্রয়োজন নাই, তথাপি সারগ্রাহী-বৈষ্ণবদিগকে অসারবাহিগণ হইতে পৃথক্ রাখিবার অভিপ্রায়ে একত্রে গণনা করতঃ পাত্না উড়াইয়া ধান্য পৃথক্ করার ন্যায় উল্লেখ করিতেছি। তণ্ডুলশূন্য অসার ধান্যকে পাত্না বলে।'

''আচার্য্যের মত যেই, সেই মত সার।
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি' চলে, সেই ত' অসার।।''

—চৈঃ চঃ আ ১২/১০

''যে যে লৈল শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত।
সেই আচার্য্যের গণ—'মহাভাগবত'।।
সেই সেই,—আচার্য্যের কৃপার ভাজন।
অনায়াসে পাইল সেই চৈতন্য-চরণ।।''

—চৈঃ চঃ আ ১২/৭৩-৭৪

শ্রীযদুন্দন দাস কৃত ''শাখানির্ণয়ামৃত'' নামক গ্রন্থে বলেছেন—'মহারসামৃতা-নন্দমচ্যুতানন্দ-নামকম্। গদাধর প্রিয়তমং শ্রীমদদ্বৈতনন্দনম্।'' ভক্তিরসামৃত আনন্দে বিভোর শ্রীঅদ্বৈতনন্দন অচ্যুতানন্দ গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর প্রিয় শিষ্য ছিলেন। শ্রীঅচ্যুতানন্দ মহাপ্রভুর প্রকট কাল পর্যন্ত শ্রীনীলাচলে অবস্থান করেছিলেন—

''অচ্যুতানন্দ—অদ্বৈত আচার্য্য তনয়।
নীলাচলে রহে প্রভুর চরণ আশ্রয়।।''

(চৈঃ চঃ আদি ১০/১৫০)

শ্রীজগন্নাথের রথাগ্রে নৃত্যাদির সময় শান্তিপুর নিবাসী শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের কীর্ত্তন সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীঅচ্যুতানন্দ নৃত্য ও কীর্ত্তন করতেন।

''শান্তিপুর আচার্য্যের এক সম্প্রদায়।
অচ্যুতানন্দ নাচে তাহা আর সব গায়।।''

'শৈশবকাল হতে শ্রীঅদ্বৈত পুত্র অচ্যুতানন্দ গৌরাঙ্গে নিষ্ঠাবান্ ছিলেন। কোন সময় অদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে একজন সন্ন্যাসী এসেছিলেন। তাঁকে বিশেষ সম্মান করে আচার্য্য বসতে আসন প্রদান করেন। সন্ন্যাসী বললেন—আমার একটি প্রশ্ন আছে। কেশব ভারতী চৈতন্যের কি হন?

আচার্য্য বললেন—কেশব ভারতী শ্রীচৈতন্যের গুরু হন। শিশু অচ্যুতানন্দ শুনে পিতার নিকট ছুটে এলেন এবং ক্রোধভরে বলতে লাগলেন—

"চৈতন্যের গুরু আছে বলিলা যখনে।
মায়াবশ বিনা ইহা কহিলা কেমনে?
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সেই চৈতন্য ইচ্ছায়।
সব চৈতন্যের লোম্ কূপেতে মিশায়।।
যাহা হইতে হয় আসি জ্ঞানেরপ্রচার।
তান গুরু কেমতে বোলহ আছে আর।।
বাপ তুমি, তোমা হৈতে শিখিবাঙ্ কোথা।
শিক্ষাগুরু হই কেন বলহ অন্যথা।।"

চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৪/১৬১-১৬২, ১৭০-১৭১

চৌদ্দ ভুবনের গুরু চৈতন্য গোসাঞি।
তাঁর গুরু-অন্য এই কোন শাস্ত্রে নাই।।
পঞ্চম বর্ষের বালক কহে সিদ্ধান্তের সার।
শুনিয়া পাইলা আচার্য্য সন্তোষ অপার।।

চৈঃ চঃ আঃ ১২/১৬-১৭

এই সমস্ত কথার উত্তরে অদ্বৈত আচার্য্য বলতে লাগলেন—

"তুমি সে জনক বাপ মুই সে তনয়।
শিখাইতে পুত্ররূপে হইলে উদয়।।"

শ্রীঅচ্যুতানন্দ বিবাহ করেন নাই। সীতা ঠাকুরাণীর গর্ভে নন্দিনী নাম্নী একটি কন্যা হয়েছিল। অচ্যুতানন্দের ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণমিশ্রের দুই পুত্র—রঘুনাথ ও দোল গোবিন্দ। রঘুনাথের বংশ শান্তিপুরে মদনগোপাল পাড়ায় এখনও বিদ্যমান। দোল গোবিন্দের তিন পুত্র। এঁরা মালদহ গিয়ে বাস করতেন। কয়েক পুরুষ পরে এ-বংশে বীরচন্দ্র গোস্বামী নামে এক পরম সাধক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করে কাটোয়ায় মহাপ্রভুর বিগ্রহ স্থাপন করেন।

শ্রীনরোত্তম ও শ্রীনিবাস আচার্য্যের উদ্যোগে খেতরি গ্রামে যে মহোৎসব হয়েছিল তাতে শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভু গিয়েছিলেন। তিনি গৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন। শেষকালে শান্তিপুরের বাটীতে বাস করেছিলেন।

**।। জয় অদ্বৈত তনয় শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভু কি জয়।।**

# শ্রীপ্রতাপরুদ্র দেব

শ্রীমদ্ কবিকর্ণপুর 'গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায়' লিখেছেন—

"ইন্দ্রদ্যুম্নো মহারাজো জগন্নাথার্চ্চকঃ পুরা।
জাতঃ প্রতাপরুদ্রঃ সন্ সম ইন্দ্রেন সেঽধুনা।।"

যিনি পুরাকালে শ্রীজগন্নাথদেবের অর্চ্চক, মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে খ্যাত ছিলেন, তিনি অধুনা প্রতাপরুদ্র নামে ইন্দ্রের ন্যায় অনন্ত ঐশ্বর্য্য সমন্বিত হয়ে উৎকল রাজ্যে বিরাজমান।

গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্র ছিলেন উৎকলের গঙ্গা বংশীয় রাজা। কটকে তাঁর রাজধানী ছিল।

শ্রীপ্রতাপরুদ্রের পিতার নাম—শ্রীপুরুষোত্তম দেব, মায়ের নাম শ্রীরূপাম্বিকা বা শ্রীপদ্মাবতী দেবী। শ্রীজগন্নাথদেবের বিবিধ ব্রতোৎসব ও যাত্রা-পর্ব্বাদির ব্যবস্থা করেছিলেন শ্রীপুরুষোত্তম দেব। তিনি নিজেকে শ্রীজগন্নাথদেবের ভৃত্য জ্ঞান করতেন। রথ-যাত্রার সময় স্বহস্তে সুবর্ণের ঝাড়ু দিয়ে শ্রীজগন্নাথদেবের রথারোহণ মার্গ পরিষ্কার করতেন।

শ্রীজগন্নাথদেব শ্রীপুরুষোত্তম দেবের প্রতি এত সদয় ছিলেন যে স্বয়ং কাঞ্চিরাজ্যের অধিপতিকে পরাজিত করে তাঁর কন্যা পদ্মাবতীকে গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীপুরুষোত্তম দেবকে সম্প্রদান করেন। সে কন্যারই গর্ভে গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্রের জন্ম হয়। তিনি গদাধর শাখায় গণিত হন।

শ্রীপ্রতাপরুদ্র সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবার পর পিতার ন্যায় নিজেকে শ্রীজগন্নাথ দেবের সেবায় নিয়োজিত করেন। এ সমস্ত কথা 'শ্রীসরস্বতী বিলাস' নামক গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণিত আছে। শ্রীকবি কর্ণপুর গোস্বামী মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রের আদেশেই শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক রচনা করেন। "শ্রীমৎ প্রতাপরুদ্রেণ শ্রীহরিচরণমধিকৃত্য কমপি প্রবন্ধমভিনেতুমাদিষ্টোঽস্মি।" শ্রীমৎ প্রতাপরুদ্র কর্তৃক শ্রীহরি-পাদপদ্ম অবলম্বনে কোন প্রবন্ধ (নাটক) অভিনয় করবার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি।

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাস গ্রহণ করে পুরীধামে এলেন। শ্রীসার্ব্বভৌম পণ্ডিত প্রভুর অনেক দিব্য বিভূতি দর্শন করলেন। তিনি পূর্বে শঙ্কর-বেদান্তী অদ্বৈতবাদী ছিলেন, মহাপ্রভুর কৃপায় তিনি পরম বৈষ্ণব হলেন। পুরীধামে কয়েকমাস অবস্থান করবার পর মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশে নাম-প্রেম বিতরণ করতে যাত্রা করলেন। উৎকলাধিপতি গজপতি প্রতাপরুদ্র লোক-পরম্পরায় প্রভুর মহিমা কিছু কিছু শ্রবণ করলেন। তাতেই তাঁর মনে প্রভুর দর্শনের ইচ্ছা জাগল। একদিন সার্ব্বভৌম পণ্ডিতকে তিনি তাঁর গৃহে ডাকলেন ও বসতে আসন দিয়ে নমস্কার করে জিজ্ঞাসা করলেন—

শুনিলাম তোমার ঘরে এক মহাশয়।
গৌড় হইতে আইলা তিঁহো মহা কৃপাময়।।
তোমারে বহু কৃপা কৈলা কহে সর্বজন।
কৃপা করি করাহ মোরে তাঁহার দর্শন।।

—চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১০/৫-৬

শুনেছি আপনার ঘরে একজন মহাপুরুষ এসেছেন। তিনি আপনাকে বহু কৃপা করেছেন। আমায় দয়া করে একবার তাঁর দর্শন করান। সার্ব্বভৌম বললেন আপনি যা শুনেছেন তা ঠিক। আপনার পক্ষে তাঁর দর্শন পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ

তিনি পরম বৈরাগ্যবান্ সন্ন্যাসী। কখনও রাজদর্শন করেন না। তথাপি চেষ্টা করে দেখতাম। কিন্তু তিনি ত' বর্ত্তমানে এখানে নেই, দক্ষিণ দেশে গমন করেছেন। প্রতাপরুদ্রদেব বললেন—শ্রীজগন্নাথদেবকে ছেড়ে তীর্থ করতে গেলেন কেন? ভট্টাচার্য্য বললেন—মহান্তগণের এ এক লীলা। তীর্থে গিয়ে তাঁরা তীর্থ পবিত্র করেন। কারণ তাঁদের হৃদয়ে তীর্থপাদ শ্রীহরি সদা বিরাজমান। মহান্তগণ তীর্থভ্রমণ ছলে জগদ্বাসীকে কৃপা করেন। তাঁরা জীবের ন্যায় নহেন, তাঁরা স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুল্য। রাজা বললেন—তীর্থ করবার জন্য তাঁকে যেতে দিলেন কেন? তাঁর চরণ ধরে রাখলেন না কেন? ভট্টাচার্য্য বললেন—তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, কারও ইচ্ছাধীন নহেন। রাজা বললেন—আপনি বিজ্ঞ শিরোমণি হয়ে তাঁকে যখন ঈশ্বর বলছেন, আমিও তাঁকে ঈশ্বর বলে মানি। পুনর্বার তিনি নীলাচলে এলে আমায় একবার দর্শন করাবেন। ভট্টাচার্য্য বললেন—তিনি কিছুদিনের মধ্যে আসবেন, তবে তাঁর জন্য একখানি নির্জ্জন ঘর প্রয়োজন। রাজা বললেন—শ্রীকাশী মিশ্রের ভবন খুব নির্জ্জন ও শ্রীমন্দিরের সন্নিকটে। আশা করি ওনার ঐ ভবনটি উপযোগী হবে। ভট্টাচার্য্য রাজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে-দিনই কাশী মিশ্রের কাছে গেলেন। শ্রীমিশ্রকে আদ্যোপান্ত সব কিছু বললেন। শুনে তিনি আনন্দিত হয়ে বললেন--আমি বড় ভাগ্যবান্, ''মোর গৃহে প্রভুপাদের হবে অবস্থান।''

শ্রীমহাপ্রভুকে দর্শন করবার জন্য ভক্তগণের উৎকণ্ঠা দিন দিন বাড়তে লাগল। ঠিক এই সময় প্রভু পুনঃ নীলাচলে ফিরে এলেন, ভক্তগণের আনন্দের সীমা রইল না। প্রভুর চরণে ভক্তগণ আনন্দে মিলিত হলেন। সার্ব্বভৌম দণ্ডবৎ করলে, প্রভু তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। অনন্তর ভট্টাচার্য্য কাশী মিশ্র ও ভবানন্দ প্রভৃতি পুরীর ভক্তগণকে প্রভুর সঙ্গে মিলন করিয়ে দিলেন। কাশীমিশ্র প্রভুর শ্রীচরণ বন্দনা করতেই তিনি তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। প্রভুর আলিঙ্গনে মিশ্র প্রেমাবিষ্ট হলেন। কাশী মিশ্র বহু ভক্তি-পুরঃসর প্রভুকে নিজ গৃহে নিয়ে গেলেন ও তাঁর শ্রীচরণ পূজা করে সপরিবারে আত্মনিবেদন করলেন। মহাপ্রভু সে-কালে তাঁকে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখালেন—

প্রভু চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি তাঁরে দেখাইল।
আত্মসাৎ করি তাঁরে আলিঙ্গন কৈল।।

—চৈঃ চঃ মধ্য ১০/৩৩

কাশী মিশ্রের পুষ্পবাটিকা মধ্যে এক নির্জ্জন গৃহে প্রভু সুখে অবস্থান করতে লাগলেন। একদিন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুর কাছে বললেন—উৎকলাধিপতি গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্র আপনার মহিমা শুনে আপনার প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়েছেন। তিনি একবার আপনার শ্রীচরণ দর্শন করতে চান। সার্ব্বভৌমের কথা শুনে প্রভু ''নারায়ণ'' স্মরণপূর্ব্বক কানে আঙ্গুল দিলেন ও বললেন—ভট্টাচার্য্য! আপনি অযোগ্য কথা বলছেন কেন? আমি সন্ন্যাসী বৈরাগী। রাজ-দর্শন আমার পক্ষে নিষিদ্ধ—স্ত্রী দর্শনের ন্যায় বিষতুল্য। ভট্টাচার্য্য বললেন—আপনি ঠিক বলেছেন কিন্তু রাজা প্রতাপরুদ্র জগন্নাথের সেবক; ভক্তোত্তম। মহাপ্রভু বললেন—জগন্নাথের সেবক হলেও সে রাজা বিষয়ী, কাল সর্প সম। ভট্টাচার্য্য! রাজ-দর্শনের কথা পুনঃ মুখে আনবেন না। যদি পুনঃ বলেন, আমি অন্যত্র চলে যাব। প্রভুর কথা শুনে ভট্টাচার্য্য ভয় পেলেন, তাঁকে দণ্ডবৎ করে অনুনয় বিনয় পূর্ব্বক স্বগৃহে এলেন। প্রভুর সঙ্গে রাজার কেমন করে মিলন ঘটাবেন সে বিষয় সার্ব্বভৌম খুব চিন্তা করতে লাগলেন।

এদিকে শ্রীরামানন্দ প্রভুর আজ্ঞামত বিষয়-আশয়

সব ত্যাগ করে দক্ষিণ গোদাবরী থেকে পুরীধামে এলেন। তিনি রাজা শ্রীপ্রতাপরুদ্রের সঙ্গে মিলিত হলে প্রভুর আজ্ঞায় রামানন্দ বিষয় ত্যাগ করেছেন শুনে রাজা খুব সুখী হলেন। রাজা বললেন—বর্ত্তমানে আপনি যে বেতন পাচ্ছেন তাই আপনাকে দেওয়া হবে, আপনি মহাপ্রভুর সেবা করুন।

অতঃপর শ্রীরামানন্দ রায় মহাপ্রভুর কাছে এসে দণ্ডবৎ করতেই প্রভু তাঁকে ধরে প্রেমে আলিঙ্গন করলেন। উভয়ে কিছুক্ষণ কৃষ্ণকথা বললেন। অনন্তর রাজা প্রতাপরুদ্রের সদ্ ব্যবহারের কথা শ্রীরামানন্দ রায় প্রভুর কাছে সমস্ত জানালেন। শ্রীরামানন্দ রায় আরও জানালেন যে—প্রভুর প্রতি রাজার যে প্রীতি দেখলেন, সে প্রীতির লেশমাত্র তাঁর নিজের নাই। প্রভু বললেন—

আপনি কৃষ্ণ-ভক্তোত্তম,—

''আপনাকে যে প্রীতি করে সেই ভাগ্যবান্।''

রাজা আপনাকে প্রীতি করছেন এজন্য কৃষ্ণ তাঁকে কৃপা করবেন।

এদিকে মহারাজ প্রতাপরুদ্র, সার্ব্বভৌম পণ্ডিতকে গৃহে এনে, মহাপ্রভুর চরণে তাঁর বক্তব্য জানিয়েছেন কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। কিছুক্ষণ নীরব থেকে সার্ব্বভৌম দুঃখিত চিত্তে সব কথা বললেন। তাঁকে যদি আবার বলা যায়, তিনি হয়ত পুরীধাম ছেড়ে চলে যাবেন। শুনে, মহারাজ দুঃখ করে বলতে লাগলেন—

পাপী নীচ উদ্ধারিতে তাঁর অবতার।
জগাই মাধাই আদি করিয়াছেন উদ্ধার।।
প্রতাপরুদ্রের ছাড়ি' করিবে জগৎ নিস্তার।
এই প্রতিজ্ঞা করি' করিয়াছেন অবতার?

—চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১১/৪৫-৪৬

মহারাজ বললেন—প্রভু যেমন প্রতিজ্ঞা করেছেন আমাকে দর্শন দেবেন না আমিও তেমনই প্রতিজ্ঞা করছি, তাঁর কৃপা ছাড়া প্রাণ ধারণ করব না। মহাপ্রভুর কৃপা যদি লাভ করতে না পারি, এ দেহ, রাজ্য, ধন প্রভৃতি দিয়ে কি করব? সার্ব্বভৌম রাজাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতে লাগলেন—দেব! আপনি বিষাদ করবেন না, ধৈর্য্য ধারণ করুন; মহাপ্রভু কৃপাময়, অবশ্যই কৃপা করবেন।

রথযাত্রা আগত প্রায়। গৌড়দেশ থেকে প্রভুর ভক্তগণ পুরীধামে আগমন করতে লাগলেন। রাজার ইচ্ছা হল, প্রভুর ভক্তগণকে দর্শন করেন। রাজা সার্ব্বভৌম পণ্ডিতকে নিয়ে স্বীয় অট্টালিকায় আরোহণ করলেন এবং উপবিষ্ট হয়ে ভক্তগণকে দর্শন করতে লাগলেন। সার্ব্বভৌম ভক্তগণের পরিচয় দিলেন একে একে। প্রভুর ভক্তগণকে দেখে রাজা চমৎকৃত হলেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীবাসাদি ভক্তগণের দিব্য তেজোময় বিগ্রহ দর্শন করে রাজা সেখান থেকে তাঁদের প্রণাম করতে লাগলেন। তিনি ভক্তগণের সৎকারের জন্য উত্তম ব্যবস্থা করে দিলেন।

মহারাজ প্রতাপরুদ্রদেব কটক গিয়ে সার্ব্বভৌম পণ্ডিতের নিকট এক পত্র লিখলেন—

যদি মোরে কৃপা না করিবে গৌরহরি।
রাজ্য ছাড়ি 'যোগী হই' হইব ভিখারী।।

—চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১২/১০

পত্রখানি ভট্টাচার্য্য ভক্তগণকে দেখালেন, ভক্তগণও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ভক্তগণ মহাপ্রভুর শ্রীচরণে উপস্থিত হলে, অন্তর্য্যামী প্রভু জানতে পেরে বললেন—আপনারা কিছু জিজ্ঞাসা করবার জন্য এসেছেন মনে হয়। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বললেন—তুমি অন্তর্য্যামী, সব জান। তথাপি বলছি—মহারাজ প্রতাপরুদ্রদেব বড় ঐকান্তিকতার সহিত তোমার চরণ আশ্রয় করেছেন। তোমার দর্শন না পেলে যোগী হবেন, তোমার পাদপদ্ম




দর্শন ব্যতীত সমস্ত সুখ তাঁর তুচ্ছ মনে হচ্ছে। প্রভু বললেন—আপনাদের ইচ্ছা আমাকে কটক নিয়ে রাজার সঙ্গে মিলন করান। এতে ত' পরমার্থ দূরের কথা, লোকে নিন্দা করবে। লোকের কথা দূরে থাকুক দামোদর আমাকে ভর্ৎসনা করবে। দামোদর যদি বলে, রাজার সঙ্গে দেখা করতে পারি। শ্রীদামোদর বললেন—তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সমস্তই জান। আমি ক্ষুদ্র জীব তোমাকে কি বিধি দিব? তুমি স্নেহের বশ, রাজা তোমাকে স্নেহ করেন, তোমাদের মিলন একদিন দেখবই। তাঁর স্নেহ তোমার মিলন ঘটাবে।

যদ্যপি তুমি ঈশ্বর, পরম স্বতন্ত্র।
তথাপি তোমার স্বভাব প্রেম পরতন্ত্র।।

অতঃপর ভক্তগণের সঙ্গে মন্ত্রণা করে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, মহাপ্রভুর একখানি বস্ত্র রাজার কাছে প্রেরণ করলেন। সে বস্ত্রখানি সাক্ষাৎ প্রভু জ্ঞানে রাজা পূজা করতে লাগলেন।

একদিন শ্রীরামানন্দ রায় রাজকুমারকে সঙ্গে নিয়ে প্রভুর কাছে এলেন। রাজকুমারের অঙ্গ শ্যাম-বর্ণ, পরিধানে উজ্জ্বল— পীতবস্ত্র, কর্ণে কুণ্ডল, গলে মণি-মুক্তার মালা, নানা আভরণে অঙ্গ ঝলমল্ করছে। রাজকুমার দর্শনে প্রভুর শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ হল, তিনি ভাবাবিষ্ট হয়ে প্রেমে কুমারকে আলিঙ্গন করলেন। রাজকুমার প্রভু স্পর্শে প্রেমাবিষ্ট হয়ে 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলে নাচতে লাগলেন। প্রভু রাজকুমারকে কৃপা করলেন। শ্রীরামানন্দ রায় রাজকুমারকে সঙ্গে নিয়ে মহারাজের কাছে এলেন এবং পুত্রের প্রতি মহাপ্রভুর কৃপার কথা বললেন, শুনে রাজা বড় সুখ পেলেন এবং পুত্রস্পর্শ করে যেন প্রভুর স্পর্শ লাভ করলেন।

রথযাত্রা এল। রথযাত্রার পূর্ব্ব দিন মহাপ্রভু শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির মার্জ্জন উৎসব সম্পন্ন করলেন। রথযাত্রার দিন ভক্তগণ সহ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বিজয়-উৎসব দর্শন করতে লাগলেন। রাজবেশ ত্যাগ করে শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব শ্রীমন্দির থেকে রথ পর্য্যন্ত শ্রীজগন্নাথের বিজয়-মার্গ সুবর্ণের ঝাড়ু দিয়ে মার্জ্জন ও চন্দন-জল দিয়ে ধৌত করে দিলেন। রাজাকে এত দীন ভাবে শ্রীজগন্নাথদেবের সেবা করতে দেখে মহাপ্রভুর মনে কৃপার উদয় হল।

উত্তম হঞা রাজা করে তুচ্ছ সেবন।
অতএব জগন্নাথের কৃপার ভাজন।।
মহাপ্রভু সুখ পাইল সে-সেবা দেখিতে।
মহাপ্রভুর কৃপা হৈল সে-সেবা হইতে।।

—চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৩/১৭-১৮

অতঃপর রথে বসে শ্রীজগন্নাথের গুণ্ডিচা যাত্রাকালে মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথের আগে চৌদ্দ সম্প্রদায় নিয়ে মহানৃত্য-গীত করতে লাগলেন। তা দেখে রাজার আনন্দের সীমা রইল না। মহারাজ স্বয়ং পাত্র-মিত্র নিয়ে লোকের ভিড় রক্ষা করতে লাগলেন। নৃত্য করতে করতে মহাপ্রভু শ্রীপ্রতাপরুদ্রের সামনে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। অমনি প্রতাপরুদ্রদেব তাঁকে ধরে ফেললেন। কিছুক্ষণ পরে প্রভুর বাহ্যদশা ফিরে এলে তিনি বুঝতে পারলেন, ভক্তগণের অসাবধানতা হেতু রাজা তাঁকে স্পর্শ করেছেন। প্রভু রাজার সেবায় অন্তরে সুখী হলেও বাহ্যে বলতে লাগলেন—ছি —ছি রাজা আমাকে স্পর্শ করেছে। প্রভুর তাচ্ছিল্য ভাব দেখে রাজা একটু মনঃক্ষুণ্ণ হলেন। তখন সার্ব্বভৌম পণ্ডিত রাজাকে আশ্বাস দিয়ে শান্ত করলেন। রথ ক্রমে গলগণ্ডি নামক স্থানে এল। সেখানে ভক্তগণসহ মহাপ্রভু মহানৃত্য গীত করতে করতে প্রেমে মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হলেন। এদিকে, গলগণ্ডিতে জগন্নাথের ভোগের সময় হয়েছে দেখে ভক্তগণ প্রভুকে "জগন্নাথবল্লভ" উদ্যানে নিয়ে গেলেন এবং এক বৃক্ষমূলে বেদিকার উপর

শয়ন করিয়ে রাখলেন। কাননটির সৌন্দর্য্য ঠিক যেন বৃন্দাবনের। এ সময় শ্রীসার্ব্বভৌম পণ্ডিতের পরামর্শে মহারাজ প্রতাপরুদ্রদেব বৈষ্ণব বেশ ধারণ করে সেখানে প্রবেশ করলেন এবং ভক্তগণের অনুমতি নিয়ে মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের সেবা করতে করতে রাস পঞ্চাধ্যায়ের গোপী গীতের শ্লোক সমূহ মধুর স্বরে পাঠ করতে লাগলেন।

জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি।
দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকা-স্ত্বয়ি ধৃতাসবস্ত্বাং বিচিন্বতে।।
তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ।।

ভাঃ ১০/৩১/১,৯

শুনিতে শুনিতে প্রভুর সন্তোষ অপার।
'বল, বল' বলি' প্রভু বলে বার বার।।
''তব কথামৃতং'' শ্লোক রাজা যে পড়িল।
উঠি প্রভু প্রেমাবেশে আলিঙ্গন কৈল।।
তুমি মোরে দিলে বহু অমূল্য রতন।
মোর কিছু দিতে নাহি দিলু আলিঙ্গন।।

—**—

'ভূরিদা' 'ভূরিদা' বলি করে আলিঙ্গন।
ইহোঁ নাহি জানে, ইহোঁ হয় কোন জন।।
পূর্ব্ব সেবা দেখি' তাঁরে কৃপা উপজিল।
অনুসন্ধান বিনা কৃপা প্রসাদ করিল।।

—চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৪/৯-১৫

শ্রীপ্রতাপরুদ্রের প্রতি মহাপ্রভুর কৃপা দেখে ভক্তগণের আনন্দের সীমা রইল না।

শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করে মহাপ্রভু কটক মহানদীর কিনারে এলেন ও সাক্ষী-গোপাল দর্শন করলেন। সেখানে স্বপ্নেশ্বর নামক এক ব্রাহ্মণের গৃহে ভোজন করলেন এবং বকুল-তলায় এসে বিশ্রাম করলেন। এ খবর পেয়ে মহারাজ প্রতাপরুদ্র তাড়াতাড়ি মহাপ্রভুর দর্শনে এলেন এবং দূর থেকে প্রভুকে বহু স্তব স্তুতি করতে লাগলেন—

তাঁর ভক্তি দেখি প্রভুর তুষ্ট হৈল মন।
উঠি মহাপ্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।।

—চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৬/১০৫

অতঃপর মহাপ্রভু রাজাকে কৃষ্ণ নাম উপদেশাদি করলেন। রাজার প্রতি এই প্রকার কৃপা দেখে ভক্তগণ প্রভুর এক নাম দিলেন— 'প্রতাপরুদ্র সংত্রাতা''।

সন্ধ্যায় যে ঘাটে মহানদী পার হয়ে মহাপ্রভু যাত্রা করবেন, সে ঘাটের পার্শ্বে হস্তী-পৃষ্ঠে রাজপরিবারবর্গ মহাপ্রভুকে দর্শনের জন্য সারি সারি দাঁড়ালেন। মহারাজ নূতন নৌকা নিয়ে পাত্র মিত্র সঙ্গে ঘাটে অবস্থান করতে লাগলেন। অতঃপর মহাপ্রভু নদী পারের জন্য ঘাটে এলে, মহারাজ সাষ্টাঙ্গে মহাপ্রভুকে বন্দনা করে সজল-নয়নে নৌকা আরোহণের জন্য প্রার্থনা জানালেন। মহাপ্রভু রাজার প্রীতি দেখে প্রেমার্দ্র-হৃদয়ে তাঁদের প্রতি করুণ দৃষ্টিপাত করতে করতে এবং তাঁকে আশীর্ব্বাদ দিতে দিতে নৌকায় আরোহণ করলেন। প্রভুর নৌকা আরোহণ দেখে রাজপরিবার বর্গ প্রেমে ক্রন্দন করতে লাগলেন। মহারাজ ধরাতলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। সার্ব্বভৌম পণ্ডিত রাজাকে সাবধানে ধরে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। ''কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে নেত্রে অশ্রু বরিষয়।'' 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে অশ্রুসিক্ত নয়নে রাজা ক্রন্দন করতে লাগলেন। মহারাজ প্রতাপরুদ্রদেব শ্রীরামানন্দ রায়কে বলে দিলেন—''শ্রীপ্রভুপাদ যে যে ঘাটে নদী পার হবেন এবং বিশ্রাম করবেন, সে সে ঘাটে যেন তাঁর চরণ স্মৃতি চিহ্ন-স্বরূপ স্তম্ভ নির্মাণ করা হয়।'' আমি নিত্য সে ঘাটে স্নান করব এবং এ-দেহ অন্তিম সময়ে সেখানে ত্যাগ করব।

তাঁহা স্তম্ভ রোপণ কর মহাতীর্থ করি।
নিত্য স্নান করিব তাঁহা যেন মরি।।

—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত





শ্রীচৈতন্য ভাগবতের বর্ণনানুসারে, মহাপ্রভু যে সময় নীলাচলে প্রথম শুভ বিজয় করেন তখন গজপতি প্রতাপরুদ্র বিজয় নগর জয় করবার জন্য গিয়েছিলেন। কিছুদিন পুরীতে বাস করবার পর গঙ্গা ও শচীমাতাকে দেখবার জন্য মহাপ্রভু গৌড়দেশে আসেন এবং পুনঃ রামকেলি হয়ে নীলাচলে যাত্রা করেন। মহারাজ প্রতাপরুদ্র এই সময় মহাপ্রভুকে দেখবার জন্য কটক থেকে পুরীতে আগমন করলেন ও তাঁকে দর্শন করবার জন্য ভক্তগণকে বিশেষ অনুনয় বিনয় করতে থাকেন। রাজার আর্ত্তি দেখে ভক্তগণ রাজাকে অন্তরাল থেকে মহাপ্রভুর নৃত্য-গীত দেখতে পরামর্শ দেন। অন্তরালে থেকে রাজা মহাপ্রভুর নৃত্য-গীত দেখতে আরম্ভ করলেন। দেখতে পেলেন দিব্যোন্মাদ অবস্থায় মূর্চ্ছিত হয়ে মহাপ্রভু ভূতলে গড়াগড়ি দিচ্ছেন, নয়নের জলে ও মুখের লালায় তাঁর শ্রীঅঙ্গ সিক্ত হয়েছে। দিব্যভাব রাজা বুঝতে পারলেন না, তাঁর মনে ঘৃণার ভাব এল। রাজা প্রভুর এ-সমস্ত দেখে গৃহে ফিরে এলেন। সে রাত্রে স্বপ্ন দেখতে লাগলেন—

রাজা দেখে জগন্নাথ অঙ্গ ধূলাময়।  
দুই শ্রীনয়নে যেন গঙ্গাধারা বয়।।  
দুই শ্রীনাসায় জল পড়ে নিরন্তর।  
শ্রীমুখের লালা পড়ে তিতে কলেবর।।

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৫/১৬৮-১৬৯

রাজা শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীচরণ স্পর্শ করতে উদ্যত হলে শ্রীজগন্নাথ বলছেন—তোমার অঙ্গ কর্পূর-চন্দনে বিলেপিত। আমার শরীর ধূলা-লালাময়। তুমি আমায় স্পর্শ কর না। আমি যখন নৃত্য করছিলাম, তখন আমার অঙ্গে ধূলা লালা দেখে তুমি আমায় ঘৃণা করেছিলে।

সেই ক্ষণে দেখে রাজা সেই সিংহাসনে।  
চৈতন্য গোসাঞী বসি আছেন আপনে।।  
সেইমত সকল শ্রীঅঙ্গ ধূলাময়।  
রাজারে বলেন হাসি এ ত যোগ্য নয়।।

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৫/১৭৭-১৭৮

এবার গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্র মহারাজ বুঝতে পারলেন, যিনি জগন্নাথ তিনিই সন্ন্যাসীরূপী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু। তখন মহারাজ ভূতলে পড়ে বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন।

**শ্রীপ্রতাপরুদ্রের বংশাবলী**

সূর্য্য বংশের শেষ রাজা শ্রীচুড়ঙ্গদেব। শ্রীচুড়ঙ্গদেবের সপ্তম অধস্তন পুরুষ শ্রীঅনঙ্গ ভীমদেব। ইনি শ্রীজগন্নাথের বর্ত্তমান মন্দির প্রায় আটশত বছর আগে নির্মাণ করেছিলেন। শ্রীঅনঙ্গ ভীমদেবের সপ্তম অধস্তন পুরুষ শ্রীকপিলেন্দ্রদেব (১৪৩৫--১৪৭০ খৃষ্টাব্দ)। তাঁর পুত্র শ্রীপুরুষোত্তমদেব (১৪৭০-১৪৯৭ খৃষ্টাব্দ)। শ্রীপুরুষোত্তম দেবের পুত্র শ্রীপ্রতাপরুদ্র দেব (১৪৯৭-১৫৪১)। পদ্মা, পদ্মলয়া, শ্রীইলা ও মহিলা এই চারজন প্রতাপরুদ্রের মহিষী ছিলেন। শ্রীপ্রতাপরুদ্র দেবের তিন পুত্র ছিলেন--১। পুরুষোত্তম জানা, ২। কালু আদেব ও ৩। কখাড় আদেব। শ্রীমতী তুক্কা নাম্নী শ্রীপ্রতাপরুদ্র দেবের এক কন্যা ছিলেন। শ্রীসরস্বতী বিলাস নামক গ্রন্থে উৎকল রাজাদের বংশাবলীর বিশেষ বর্ণনা আছে।

শ্রীপুরুষোত্তম জানা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী কর্ত্তৃক স্বপ্নাদৃষ্ট হয়ে নীলাচল চক্রবেড়ের মধ্য হতে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দ দেব সমীপে আগমন করেছিলেন।

শ্রীপ্রতাপরুদ্র দেবের রাজ্য সীমা--(১৪৯৭ খৃষ্টাব্দ) বাংলার হুগলী ও মেদিনীপুর জেলা থেকে আরম্ভ করে মাদ্রাজের গুণ্টুর জেলা পর্য্যন্ত এবং তেলেঙ্গনার অধিকাংশ প্রতাপরুদ্রের অধিকারে ছিল। ১৫১০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে প্রবল পরাক্রান্ত

শ্রীকৃষ্ণদেব রায় বিজয় নগরের সিংহাসনে আরোহণ করবার পর উড়িষ্যা রাজ্যের দক্ষিণ ভাগ বিজয়ে মনোনিবেশ করেন। তাই দক্ষিণ সীমা রক্ষা করবার জন্য শ্রীপ্রতাপরুদ্র দেব দক্ষিণ দিকে যাত্রা করেন। এ সময় মহাপ্রভু নীলাচলে শুভাগমন করেন।

''যে সময় ঈশ্বর আইলা নীলাচলে।
তখন প্রতাপরুদ্র নাহিক উৎকলে।।
যুদ্ধ রসে গিয়াছেন বিজয় নগরে।
অতএব প্রভু না দেখিলা সেই বারে।।"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আছে, দক্ষিণ দিকে দক্ষিণ গোদাবরী, উত্তরে রূপ-নারায়ণ নদের তীরবর্ত্তী পিছলদা পর্য্যন্ত।

''পিছলদা পর্য্যন্ত সেই যবন আইলা।"

—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলা

শ্রীপ্রতাপরুদ্র দেবের অপ্রকট সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ কিছুই পাওয়া যায় না। ময়ূরভঞ্জের রাজধানী বারিপদা থেকে এগার মাইল দক্ষিণে পূর্ব্বদিকে প্রতাপপুর নামে এক গ্রাম আছে। প্রতাপরুদ্র মহারাজের সমাধি মন্দির নাকি তথায় ছিল। বর্ত্তমান নদীর ভাঙ্গনে তা জলমগ্ন হয়েছে। বিগ্রহগণ (মহাপ্রভু, জগন্নাথ ও দধিবামন) প্রতাপপুরে অন্যত্র অবস্থান করছেন। শ্রীগৌর আবির্ভাব তিথিতে প্রতাপপুরে মহোৎসব হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটে মহারাজ প্রতাপরুদ্রের তীব্র বিহরদশা ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে—

''হেনকালে প্রভু-অদর্শনকথা শুনি।
অঙ্গ আছাড়িয়া রাজা লোটায় ধরণী।।
শিরে করাঘাত করি' হৈল অচেতন।
রায় রামানন্দ মাত্র রাখিল জীবন।।
প্রভুর বিয়োগ রাজা সহিতে না পারে।
নীলাচল হইতে রহিল কত দূরে।।"

—ভঃ রঃ ৩/২১৭-২১৯

শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের অধস্তন রাজগণ—

১। কালুয়া-প্রতাপ, ২। কখারুয়া-প্রতাপ, ৩। গোবিন্দ-বিদ্যাধর, ৪। চক্র-প্রতাপ, ৫। নরসিংহদেব, ৬। রঘুরামদেব, ৭। মুকুন্দদেব হরিচন্দন, ৮। রামচন্দ্রদেব, ৯। পুরুষোত্তমদেব, ১০। নৃসিংহদেব, ১১। গঙ্গাধরদেব, ১২। বলভদ্রদেব, ১৩। ২য় মুকুন্দদেব, ১৪। দিব্যসিংহদেব, ১৫। হরেকৃষ্ণদেব, ১৬। গোপীনাথদেব, ১৭। ২য় রামচন্দ্রদেব, ১৮। বীরকেশরীদেব, ১৯। ২য় দিব্যসিংহদেব, ২০। ৩য় মুকুন্দদেব, ২১। ৩য় রামচন্দ্রদেব, ২২। ২য় বীরকেশরীদেব, ২৩। ৩য় দিব্যসিংহদেব, ২৪। ৪র্থ মুকুন্দদেব, ২৫। ৪র্থ শ্রীরামচন্দ্রদেব, ২৬। ৩য় বীরকেশবীদেব, ২৭। ৪র্থ দিব্যসিংহদেব।

**।। জয় শ্রীল প্রতাপরুদ্র দেব কি জয়।।**

# শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী (শ্রীমকরধ্বজ পণ্ডিত)

শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীর পিতৃপ্রদত্ত নাম 'শ্রীমকরধ্বজ পণ্ডিত'। বাল্যনাম গোপাল। তিনি উৎকলবাসী ব্রাহ্মণ। পিতার নাম শ্রীমুরারী পণ্ডিত। মাতার নাম জানা যায় নি। তিনি শ্রীবক্রেশ্বর প্রভুর শিষ্য ছিলেন। শিশুকাল থেকেই তিনি বক্রেশ্বর প্রভুর নিয়ামকত্বে অবস্থান করতেন। মহাপ্রভু তাঁর প্রতি বড়ই স্নেহশীল ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে নানা রহস্য করতেন, প্রভু তাঁকে রহস্য করে 'গুরু' বলে ডাকতেন। সেই থেকে তিনি গোপালগুরু নামে পরিচিত হন। এই বিষয়ে একটি ঘটনা শুনা যায়—

পুরীতে একজন নামানন্দী সাধু ছিলেন। তিনি নিরন্তর হরিনাম করতেন। তাঁর এমনি অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল যে, তিনি শয়নে ভোজনে এমনকি বাহ্য ক্রিয়ায় গেলেও জিহ্বা দিয়ে হরিনাম উচ্চারণ করতেন। একসময় তার মনে হল, বাহ্য ক্রিয়ার সময় হরিনাম করলে হয়ত হরিনাম অশুদ্ধ হয়ে যাবে। তাই তিনি একদিন জিহ্বাটিকে টেনে ধরে বাহ্যক্রিয়া করছিলেন। গোপাল এর কারণ বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলেন, ঠাকুর তুমি এভাবে জিহ্বা টেনে ধরে বাহ্যকৃত করছ কেন? তখন সেই সাধু বললেন, বাহ্যকৃত্যের সময় হরিনাম উচ্চারণ করলে তা অপবিত্র হয়ে যাবে তাই এমন করছি। তখন গোপাল বলল ''সেকি কথা ঠাকুর! যার নাম স্মরণ করলে অপবিত্র বস্তুও পবিত্র হয়ে যায়, আর সামান্য বাহ্যকৃত্যের সময় সেই নাম অপবিত্র হয়ে যাবে। আগুনকে কি কেউ ময়লা করতে পারে। বরং আগুন সমস্ত ময়লাকে পুড়িয়ে তার মত করে নেয়। আর এখন যদি তুমি মরে যাও তাহলে তো ভগবানের নাম না নিয়েই মরবে। তোমার তো অধোগতি হবে। শোন! ভগবানের নাম নিলে কোনও কালাকাল, স্থান, পাত্র বিচার করতে হয় না। সর্বক্ষণ সর্বভাবে এই নাম করা যায়।'' মহাপ্রভু দূর থেকে এসব শুনছিলেন। তিনি সকলের সামনে ঘোষণা করলেন, গোপাল শুধুমাত্র একজন বালক নয়। আজ সে গুরুর ন্যায় এক সাধুকে শিক্ষা দিয়েছে। এজন্য আজ থেকে ওর নাম 'গোপাল গুরু'।

গোপালগুরুর খ্যাতি সর্বত্র প্রচারিত হলে অভিরাম ঠাকুর তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য রওনা দিলেন। অভিরাম ঠাকুরের এরূপ মহিমা ছিল, যে প্রকৃত বিষ্ণুমূর্তি, প্রকৃত শালগ্রাম এবং শুদ্ধ বৈষ্ণব ছাড়া কেউ তার প্রণাম সহ্য করতে পারত না। নকল মূর্ত্তি হলে প্রণামের সঙ্গে সঙ্গেই তা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যেত। ভণ্ড বা অশুদ্ধ বৈষ্ণব হলে প্রণামের সাথে সাথেই সে মরে যেত। তাই অভিরাম ঠাকুর গোপালগুরুকে পরীক্ষা করতে আসছেন। শুনে বৈষ্ণবগণ চিন্তিত হলেন। বৈষ্ণবদের চিন্তার কারণ জানতে পেরে মহাপ্রভু গোপাল গুরুর ললাটে নিজের পাদপদ্ম অর্পণ করে পদাকৃতি তিলক করে দিলেন। গোপাল মহাপ্রভুর কোলে বসলেন। অভিরাম ঠাকুর গোপালকে প্রণাম করলেন। কিন্তু তাঁর কোন ক্ষতি হল না। সেই থেকে গোপালগুরুর পরম্পরায় হরিপদাকৃতি তিলক প্রচলিত হয়েছে। গোপালগুরু সম্বন্ধে 'বক্রেশ্বর চরিত' গ্রন্থে বর্ণনা আছে—

'চন্দ্রশেখর, শঙ্করারণ্য আচার্য্য এই দুইজন।
গোবিন্দানন্দ, দেবানন্দ নাহিক কথন।।
গোপালগুরু গোস্বামীর গুণের নাহি লেখা।
বক্রেশ্বর পণ্ডিতের এই পঞ্চ শাখা।।'

মহারাজ প্রতাপরুদ্রদেবের পিতা পুরুষোত্তমদেব কাঞ্চী থেকে অন্যান্য মূর্ত্তির সাথে রাধাকান্ত মূর্ত্তি এনেছিলেন। ঐ মূর্ত্তিপ্রথমে জগন্নাথ দেবের ছত্রভোগ মন্দিরের পশ্চিম উত্তর কোনে একটি মন্দিরে পূজিত হত। পরবর্তীতে মহারাজ প্রতাপরুদ্রের গুরু কাশীমিশ্র ঐ মূর্ত্তিটি পূজার জন্য তাঁর কাছ থেকে প্রার্থনা করেন। কাশীমিশ্র নিঃসন্তান ছিলেন। তাই তিনি তাঁর সর্বস্য মহাপ্রভুর চরণে অর্পণ করেন। এজন্য মহাপ্রভু শ্রীরাধাকান্তের সেবা গোপালগুরুকে অর্পণ করেন, তৎসঙ্গে শ্রীরাধাকান্তের উদ্যান-আদি সমস্ত সম্পত্তি অর্পণ করেন। বক্রেশ্বর পণ্ডিত রাধাকান্ত মঠের গাদিতে বসে আচার্য্যের কার্য্য করেন নি। তিনি সর্বক্ষণ মহাপ্রভুর সঙ্গে নৃত্য কীর্ত্তনেই অতিবাহিত করতেন। এজন্য মহাপ্রভু গোপাল গুরুকে উক্ত গাদি প্রদান করেন। এজন্য মাঘী শুক্লা দ্বাদশীতে ঐ মঠে আচার্য্য অভিষেক উৎসব আজও অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর রস উপাসনার দুইটি ধারা প্রবাহিত হয়েছে। একটি ধারা শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মাধ্যমে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুতে প্রবাহিত। অপরটি শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের মাধ্যমে শ্রীগোপাল গুরুতে সঞ্চারিত। শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী 'স্মরণ ক্রম পদ্ধতি' বা 'সেবাস্মরণ পদ্ধতি' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। শ্রীগৌরগোবিন্দার্চ্চন পদ্ধতিও তিনি রচনা করেছেন। গোপাল গুরুর শিষ্য শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী। গোপালগুরুর সময় থেকেই শ্রীকাশীমিশ্র ভবন রাধাকান্ত মঠ নামে পরিচিত।

গোপালগুরু গোস্বামী বৃদ্ধ হলে তাঁর শিষ্য ধ্যানচন্দ্র গোস্বামীকে শ্রীরাধাকান্ত মঠের সেবাভার অর্পণ করেন। সেবাভার অর্পণের পর গোপালগুরু অপ্রকট হন। গুরুর বিরহে ধ্যানচন্দ্র শোকসন্তপ্ত হন। গোপালগুরুর শ্রীঅঙ্গ সৎকারের জন্য স্বর্গদ্বারে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিকে শাসন বিভাগের কর্মচারীরা রাধাকান্ত মঠ অবরোধ করেন। ধ্যানচন্দ্র অবরোধের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা বলেন, সরকারের অনুমতি ছাড়া রাধাকান্ত মঠের গাদী সমর্পিত হয়েছে। এর কোন লিখিত প্রমাণ নাই। ধ্যানচন্দ্র বলেন—গুরুদেব তো আমাকে এই মঠের সেবাভার অর্পণ করেছেন। কর্মচারীরা বলেন— তাহলে প্রমাণপত্র দেখান, নইলে এস্থান থেকে বেড়িয়ে যান। আজ থেকে এই মঠের তত্ত্বাবধায়ক হবে সরকার। তখন ধ্যানচন্দ্র গোস্বামী কাঁদতে কাঁদতে স্বর্গদ্বারে শ্মশানে গিয়ে গুরুদেবের চরণে কাতর আর্তি জানান। শিষ্যের কাতর প্রার্থনায় গোপালগুরু চিতা থেকে উঠে কীর্ত্তন করতে করতে রাধাকান্ত মঠের দিকে যাত্রা শুরু করেন। এই অলৌকিক ঘটনা দেখে রাজ কর্ম্মচারীরা মন্দিরের দ্বার খুলে দিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যান। এরপর গোপালগুরু গোস্বামী ধ্যানচন্দ্রকে লিখিতরূপে গাদিতে বসিয়ে নবমী তিথিতে তিরোধান লীলা করেন।

গোপালগুরুর অপ্রকটের একবছর পর ব্রজবাসী বৈষ্ণবরা রথযাত্রায় পুরীতে এলেন। তারা রাধাকান্ত মঠে গিয়ে শুনলেন গোপালগুরু এক বছর পূর্বে অপ্রকট হয়েছেন। তারা বিস্মিত হলেন। যদি তিনি অপ্রকট হয়েছেন তাহলে বংশীবটে কে ভজন করছেন? কারণ তারা গোপালগুরুকে বংশীবটে দেখে এসেছেন। ধ্যানচন্দ্র একথা শুনে বিস্মিত হলেন এবং দ্রুতগতিতে বৃন্দাবনে পৌঁছলেন। দেখলেন সত্যিই গুরুদেব ভজন করছেন। গুরুর চরণে নিপতিত হলেন। কাঁদতে কাঁদতে গুরুর চরণে বারবার মিনতি করলেন পুরীতে ফিরে যাওয়ার জন্য। তখন গোপাল গুরু বললেন, আমি আর ফিরে যাব না। যদি আমার জন্য তোমার এতই বিরহ হয়ে

থাকে তাহলে নিম কাঠ দিয়ে আমার মূর্তি তৈরী করে মন্দিরে রেখে পূজা কর। সেই থেকে গোপাল গুরুর শ্রীমূর্ত্তি শ্রীমন্দিরের জগমোহনে অবস্থিত আছেন।

কাশীমিশ্রের সময় রাধাকান্ত মঠে কেবলমাত্র কৃষ্ণবিগ্রহ বিরাজিত ছিল। গোপালগুরু রাধাকান্তের বামে শ্রীরাধা এবং ডানে ললিতাদেবী, বামে গৌরাঙ্গ ডানে শ্রীনিত্যানন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। উড়িষ্যা দেশে মন্দিরের মধ্যে অবস্থিত ক্ষুদ্র গৃহকে 'গম্ভীরা' বলে। কাশীমিশ্রের ভবনস্থ গম্ভীরা মহাপ্রভুর ভজন ও বিশ্রামস্থানরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। গোপালগুরুর সময় থেকেই গম্ভীরায় মহাপ্রভুর পাদুকা, কাঁথা এবং কমণ্ডুলু শিষ্য পরম্পরায় পূজিত হচ্ছেন। শ্রীরাধাকান্ত মঠ থেকে প্রকাশিত 'শ্রীগুরু প্রণালী' গ্রন্থে শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীকে 'শ্রীমঞ্জুমেধা' সখীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

নীলাচলে নরোত্তম ঠাকুরের সাথে গোপালগুরুর সাক্ষাৎ হয়েছিল।

'নরোত্তম গেলা কাশীমিশ্রের ভবন।
শ্রীগোপালগুরুসহ হইল মিলন।।
শ্রীগোপালগুরু অতি অধৈর্য্য হিয়ায়।
নরোত্তমে কোলে লইয়া কান্দে উভরায়।।'

—ভক্তিরত্নাকর ৩/৩৮২,৩৮৯

কার্ত্তিকী শুক্লা নবমী তিথিতেই শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীর তিরোধান তিথি পালিত হয়।

**শ্রীল গোপালগুরু গোস্বামিপ্রভুর শোচক**

আরে মোর গোপালগুরু, মকরধ্বজ নাম যাঁহার।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাঁকে, 'গোপাল' বলিয়া ডাকে,
দেখি' শিশু-চরিত্র উদার।।
গৌরাঙ্গের সেবারসে, সদাই আনন্দে বাসে,
গোরা বিনু নাহি জানে আন।
তিলেক না দেখি যাঁরে, ধৈর্য ধরিতে নারে,
গোরা যেন গোপালের প্রাণ।
গোপাল-শিশুর প্রতি, শিক্ষা দিল এক রীতি,
প্রভু প্রেমাবেশে ঢুলি' ঢুলি'।
কহে সবে—'আরে আরে,আজি হৈতে গোপালেরে,
ডাকিবা 'গোপাল-গুরু' বলি'।।
গোপালে করুণা দেখি', সবার সজল আঁখি,
সুখের সমুদ্র উছলিল।
সবে কহে অনুপাম, 'শ্রীগোপালগুরু' নাম,
প্রভু-দত্ত জগতে ব্যাপিল।।
গোপালের গুরুভক্তি, কহিতে নাহিক শক্তি,
সদাই প্রসন্ন বক্রেশ্বর।
মহামত্ত নিজগীতে, নাহিক উপমা দিতে,
সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষ কলেবর।।
দেখিল সকল ঠাঁই, এমন দযালু নাই,
কেবা না জগতে যশ ঘোষে।।
সবে কৈল প্রেমপাত্র, হইল বঞ্চিত মাত্র,
নরহরি নিজ-কর্ম্মদোষে।।

**।। জয় শ্রীল গোপালগুরু গোস্বামী কি জয়।।**

# শ্রীসুবুদ্ধি রায়

বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন গঙ্গার তীরে গৌড় নামক নগরের রাজধানী স্থাপন করেন। স্কন্ধপুরাণে পঞ্চ গৌড়ের উল্লেখ আছে। পঞ্চগৌড় বলতে সারস্বত, কান্যকুব্জ, উৎকল, মৈথিল ও গৌড়দেশ উল্লেখিত। প্রাচীন গৌড় বর্তমানে মালদহ জেলার মধ্যে গঙ্গাগর্ভে অবস্থান করছেন।

একসময় গৌড়ের রাজা ছিলেন সুবুদ্ধি রায়। তিনি ব্রাহ্মণ বংশে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সমস্ত শাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি যখন গৌড়ের রাজা ছিলেন তখন তার অধিনে হুসেন শাহ চাকরী করতেন।

"পূর্ব্বে যবে সুবুদ্ধি রায় ছিলা গৌড়ে অধিকারী।
হুসেন শাঁ সৈয়দ করে তাঁহার চাকুরী।।"

—চৈঃ চঃ মঃ ২৫/১৮০

একবার সুবুদ্ধি রায় হুসেন শাহকে একটি পুকুর খনন করার দায়িত্ব দেন। হুসেন শাহ পুকুর খনন করতে গিয়ে কিছু ক্ষমার অযোগ্য ভুল করলে সুবুদ্ধি রায় তাকে চাবুক দিয়ে মারেন। দৈববশতঃ পরবর্তীতে ঐ হুসেন শাহই গৌড়ের বাদশাহ হলেন। কিন্তু তিনি সুবুদ্ধি রায়কে পূর্বের উপকারের কথা স্মরণ করে কৃতজ্ঞতার বশে অনেক সম্মান করতেন। হুসেন শাহের পীঠে (পৃষ্ঠে) সুবুদ্ধি রায়ের চাবুক মারার চিহ্ন ছিল। একদিন তার বেগম পীঠে আঘাতের চিহ্ন দেখে জিজ্ঞাসা করেন এটা কি করে হল? উত্তরে সুবুদ্ধি রায় পূর্বের ঘটনা সব খুলে বলেন। বেগম সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধিত হয়ে রাজাকে অনুরোধ করেন সুবুদ্ধি রায়কে প্রাণদণ্ড দেওয়ার জন্য।

হুসেন শাহ বলেন, তা কি করে হয়? তিনি আমার প্রভু। তার কৃপাতেই আমি আজ গৌড়ের বাদশাহ হয়েছি। বেগম বলেন, ঠিক আছে প্রাণদণ্ড যখন দিতে পারবে না! তাহলে তার জাতি নষ্ট করে দাও। হুশেন শাহ বলেন,) আমি তা করলে তিনি আর প্রাণে বাঁচবেন না। তখন বেগম বললেন, যদি তুমি তার জাতিনাশ না কর তাহলে আমি প্রাণে বাঁচব না। হুশেন শাহ নিরুপায় হয়ে সুবুদ্ধি রায়কে কঁরোয়ার পানি পান করালেন। হিন্দু ধর্মের বিধান অনুসারে সুবুদ্ধি রায় জাতি থেকে চ্যুত হলেন। পূর্ব থেকেই তার বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য এসেছিল। এই সুযোগে তিনি গৃহ পরিজনবর্গ সব পরিত্যাগ করে কাশীধামে চলে গেলেন। কাশীধামে গিয়ে স্মার্ত পণ্ডিতদের কাছে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন এবং প্রায়শ্চিত্তের বিধান চাইলেন। ব্রাহ্মণদের মধ্যে কেউ বলল গরম ঘি খেয়ে প্রাণত্যাগ করতে, আবার কেউ বললেন তুষের আগুনে প্রাণত্যাগ করতে। এই ব্যবস্থার কথা শুনে সুবুদ্ধি রায়ের মনে সন্দেহ হল —'যদি মরেই গেলাম তাহলে প্রায়শ্চিত্ত করে কি লাভ'। এরই মধ্যে মহাপ্রভু কাশীধামে পদার্পণ করলেন। সুবুদ্ধি রায় মহাপ্রভুর কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। সব শুনে মহাপ্রভু বললেন, রায়! তুমি বৃন্দাবনে গিয়ে কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন কর—

প্রভু কহে,—ইঁহা হৈতে যাহ' বৃন্দাবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তন।।
এক 'নামাভাসে' তোমার পাপ-দোষ যাবে।
আর 'নাম' লইতে কৃষ্ণচরণ পাইবে।।
আর কৃষ্ণনাম লৈতে কৃষ্ণস্থানে স্থিতি।
মহাপাতকের হয় এই প্রায়শ্চিত্তি।।

চৈঃ চঃ মঃ ২৫/১৯১-১৯৩

মহাপ্রভুর আদেশে সুবুদ্ধি রায় বৃন্দাবন অভিমুখে

যাত্রা করলেন। বৃন্দাবনে তিনি সমস্ত প্রকার ক্লেশ সহ্য করে জঙ্গল থেকে শুকনো কাঠ সংগ্রহ করে মথুরার হাটে বিক্রি করতেন। তাতে যে সামান্য পয়সা পেতেন, তাই দিয়ে সামান্য চানা চিবিয়ে জীবন ধারণ করতেন। তার মধ্য থেকে কিছু পয়সা জমিয়ে মাঝে মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ডেকে দধি-অন্ন খাওয়াতেন।

শুষ্ককাষ্ঠ আনি' রায় বেচে মথুরাতে।
পাঁচ ছয় পয়সা হয় এক এক বোঝাতে।।
আপনে রহে এক পয়সার চানা চাবাঞা।
আর পয়সা বাণিয়া-স্থানে রাখেন ধরিয়া।।
দুঃখী বৈষ্ণব দেখি' তাঁরে করান ভোজন।
গৌড়ীয়া আইলে দধি, ভাত, তৈল-মর্দ্দন।।

সুবুদ্ধি রায়ের বৈরাগ্য ও বৈষ্ণব সেবার জন্য নিস্কপট সেবা দেখে শ্রীল রূপ গোস্বামী অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। তিনি সুবুদ্ধি রায়কে সমস্ত বৃন্দাবন দর্শন করিয়েছিলেন।

রূপ-গোসাঞি আসি' তাঁরে বহুপ্রীতি কৈলা।
আপন-সঙ্গে লঞা 'দ্বাদশ বন' দেখাইলা।।

চৈঃ চঃ মঃ ২৫/২০০

সুবুদ্ধি রায় সনাতন গোস্বামীকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তিনি মহাপ্রভুর আদেশে অত্যন্ত দীনহীন ভাবে গোস্বামীগণের সঙ্গে বৈরাগ্য ও নিষ্ঠার সাথে হরিনাম করতে করতে জীবনের অবশিষ্ঠ সময় অতিবাহিত করেন।

**।। জয় শ্রীল সুবুদ্ধি রায় কি জয়।।**

# শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায়

শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায় মিথিলার ত্রিহুতবাসী পণ্ডিত ব্রাহ্মণ। ত্রিহুত বিহার প্রদেশের দ্বারভাঙ্গা জেলার অন্তর্গত। তিনি প্রয়াগের আড়াইল গ্রামে শ্রীবল্লভাচার্য্য ভবনে মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করেন। তিনি একজন মহাভাগবত পুরুষ ছিলেন।

"হেনকালে আইলা রঘুপতি উপাধ্যায়।
তিরুহিতা পণ্ডিত বড় বৈষ্ণব মহাশয়।।
আসি তেঁহো কৈল প্রভুর চরণ বন্দন।
'কৃষ্ণে মতি রহু' বলি প্রভুর বচন।।"

রঘুপতি মহাপ্রভুকে বন্দনা করলেন। প্রভু বললেন—তোমার মুখে কৃষ্ণের বর্ণনা শুনতে চাই। রঘুপতি বলতে লাগলেন—

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তি ভবভীতাঃ।
অহমিহনন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম।।

—চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৯/৯৬ পদ্যাবলীধৃত

ভবযন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ পাবার আশায় কেউ শ্রুতির কেউ স্মৃতির কেউ বা মহাভারতের উপাসনা করে। আমি কিন্তু অন্য কারও উপাসনা করি না। যাঁর গৃহ বারান্দায় দোলনা মধ্যে শ্রীবালকৃষ্ণ আনন্দে দুলছেন, একমাত্র সেই শ্রীনন্দ মহারাজকে বন্দনা করি, ভজনা করি।

প্রভু বললেন—আরও বল।

রঘুপতি বললেন—

কম্প্রতি কথয়িতুমীশে সম্প্রতি কো বা প্রতীতিমায়াতু।
গোপতি-তনয়াকুঞ্জে গোপবধূটী-বিটং ব্রহ্ম।।

চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৯/৯৮

কাকেই বা বলতে পারি, এখন কেই বা তা বিশ্বাস করবে যে সূর্য্যতনয়া কুঞ্জে গোপবধূদিগের লম্পট পরমব্রহ্ম লীলা করে।

প্রভু বলতে লাগলেন—আরও বল, আরও বল।

রঘুপতি প্রভুর প্রেম দেখে চমৎকৃত হলেন—"মনুষ্য নহে ইহো,—কৃষ্ণ করিল নির্দ্ধার।।"

প্রভু বললেন—শ্রেষ্ঠ উপাসনা কি?

রঘুপতি—শ্যামরূপই শ্রেষ্ঠ উপাসনা।

প্রভু—তার বাসস্থান কোথায়?

রঘুপতি—মথুরা ও বৃন্দাবন।

প্রভু—রসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রস কোনটি?

রঘুপতি—আদ্যরস মধুর রসই শ্রেষ্ঠ।

প্রভু রঘুপতির মুখে এ সব কথা শুনে উঠে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন।

প্রেমাবেশে প্রভু তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন।
প্রেমে মত্ত হঞা তেঁহো করেন নর্ত্তন।।

—চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৯/১০৭

শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরো রসঃ।।

পদ্যাবলীতে (৮২) শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের শ্লোক —শ্যামরূপই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপ, মধুপুরীই শ্রেষ্ঠা পুরী, কৈশোর বয়সই ধ্যেয়, আর আদ্য অর্থাৎ শৃঙ্গার রসই শ্রেষ্ঠ্য রস।

**।। জয় শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায় কি জয়।।**

# শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী

অনেকেই বলে থাকেন শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী ও প্রকাশানন্দ সরস্বতী এক জন ব্যক্তিরই নাম। আশুতোষ দেবের নতুন বাংলা অভিধানেও এই বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু এই কথাটি ভুল। শ্রীল প্রভুপাদ এই বিষয়ে চৈঃ ভাঃ মঃ ৩/৩৭ পয়ারের শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্যে লিখেছেন--

**'প্রকাশানন্দ নামক একজন কৈবলাদ্বৈতাবাদী অধ্যাপক যতি বেদের ব্যাখ্যাকালে আমার অপ্রাকৃত নিত্য অঙ্গসমূহকে বিখণ্ডিত করে। এই প্রকাশানন্দকে কেহ কেহ অনভিজ্ঞতাবশে কাবেরীপ্রবাসী ব্যেঙ্কটভট্টের অনুজ প্রবোধানন্দের সহিত সমজ্ঞান করে। ভক্তমাল নামক সহজিয়া গ্রন্থাভ্যন্তরে এইপ্রকার ভ্রম দোষ প্রবেশ করায়, অধুনাতন লেখকগণের মধ্যেও সেই ভ্রম দোষ ন্যূনাধিক প্রবেশ করিয়াছে।'**

তুঙ্গবিদ্যা ব্রজে যাসীৎ সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদা।
সা প্রবোধানন্দযতির্গৌরোদ্গানসরস্বতী।।

ব্রজে যিনি সর্বশাস্ত্র বিশারদ 'তুঙ্গবিদ্যা' ছিলেন, তিনিই এখন মহাপ্রভুর গুণ কীর্ত্তন-কারী 'শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী' যতি হয়েছেন।।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী ছিলেন শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী। তিনি শ্রীরঙ্গক্ষেত্রবাসী ছিলেন এবং শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর পিতৃব্য ছিলেন। তাঁর থেকে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী দীক্ষা গ্রহণ করেন।

শ্রীহরিভক্তি বিলাসের ভূমিকায় স্বয়ং গোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদ লিখেছেন–

''ভক্তেবিলাসাং শ্চিনুতে প্রবোধানন্দস্য
শিষ্যো ভগবৎ প্রিয়স্য।
গোপালভট্টো রঘুনাথদাসং
সন্তোষয়ন্ রূপসনাতনৌ চ।।''

''শ্রীরঘুনাথ দাস ও শ্রীরূপসনাতনকে প্রসন্ন করার জন্য ভগবৎ প্রিয় শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের শিষ্য আমি শ্রীগোপাল ভট্ট ভক্তির বিলাস সমূহ চয়ন করছি।

১৪৩৩ শকাব্দে মহাপ্রভু যখন শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বিজয় করেন তখন শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ তাঁর দর্শন ও কৃপা লাভ করেন।

''শ্রীবৈষ্ণব এক,–ব্যেঙ্কট ভট্ট নাম।
প্রভুরে নিমন্ত্রণ কৈল করিয়া সম্মান।।''

চৈঃ চঃ মঃ ৯/৮২

ত্রিমল্ল ভট্ট, ব্যেঙ্কট ভট্ট ও শ্রীপ্রবোধানন্দ তিন ভাই। (ভঃ রঃ ১/১২৮) তিন ভাই শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব ছিলেন। মহাপ্রভু চার মাস তাঁদের গৃহে অবস্থান করে নিয়ত কৃষ্ণ-কথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীগোপাল ভট্ট তখন শিশু ছিলেন। তাঁকে প্রভু বড় আদর করতেন। শ্রীগোপাল ভট্ট প্রভুর শ্রীচরণ মর্দ্দন করতেন এবং তাঁকে জল এনে দিতেন।

শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী ঐশ্বর্য্য মার্গে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক ছিলেন। পরবর্ত্তী কালে শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় শ্রীরাধাগোবিন্দ-উপাসনা পদ্ধতি গ্রহণ করেন এবং মধুর রসের মহাকাব্য গ্রন্থসকলও প্রণয়ন করেন। তাঁর বিশুদ্ধ ভক্তিময় হৃদয়ে শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের দিব্যস্বরূপ এবং তাঁর

ধাম ও পরিকর-গণের স্বরূপ যুগপৎ স্বতঃস্ফুরিত হয়েছিল। ইহা তাঁর লেখায় প্রকাশ পেয়েছে।

শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী শ্রীবৃন্দাবন শতক, শ্রীনবদ্বীপ শতক ও শ্রীরাধারস সুধানিধি নামক অপূর্ব্ব ভক্তি রসময় গ্রন্থ রচনা করেন।

ত্রিদণ্ডি গোস্বামী শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ ভক্তি সমাধি-ভাবময় নেত্রে শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের স্বরূপ এবং তাঁর ধামের স্বরূপ যেভাবে দর্শন করেছিলেন তা নবদ্বীপশতক গ্রন্থে প্রথমে বন্দনা-মুখে বর্ণন করেছেন–

নবদ্বীপে কৃষ্ণং পুরটরুচিরং ভাববলিতং
মৃদঙ্গাদ্যৈর্যন্ত্রৈঃ স্বজনসহিতং কীর্ত্তনপরম্।
সদোপাস্যং সর্ব্বৈঃ কলিমঙ্গলহরং ভক্তসুখদং
ভজামস্তং নিত্যং শ্রবণমননাদ্যর্চ্চন বিধৌ।।

ভাবানুবাদ–শ্রীকৃষ্ণ এই নবদ্বীপধামে কিরূপ মূর্ত্তি প্রকট করে বিরাজ করছেন–"নবদ্বীপে কৃষ্ণং পুরটরুচিরং।"নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণ সুবর্ণের ন্যায় মনোহর কান্তি ধারণ করে বিরাজ করছেন। তারপর তাঁর বিলাসের কথা বলছেন–"ভাববলিতং মৃদাঙ্গাদ্যৈঃ যন্ত্রৈঃ স্বজনসহিতং কীর্ত্তন পরম্" অষ্টসাত্ত্বিকাদি বিবিধ প্রেম বিকার (শ্রীরাধা ঠাকুরাণীর ক্ষণে ক্ষণে যে প্রেম বিকার) দ্বারা মণ্ডিত এবং স্বজনসহ মৃদঙ্গ করতাল আদি বাদ্যযন্ত্র যোগে স্ব-নাম সংকীর্ত্তনে নৃত্যপরায়ণ। অতঃপর শ্রীগৌরকৃষ্ণের মহিমা সম্বন্ধে বলছেন–"সদোপাস্যং সর্ব্বৈঃ" তিনি ব্রহ্মা শিব ও ইন্দ্রাদির নিত্য উপাস্য তত্ত্ব। "কলিমল হরং" এই কলিকালে অবতীর্ণ হয়ে তিনি বিবিধ কুতর্ক মায়াবাদ প্রভৃতি অজ্ঞানকল্পিত মতবাদের বিধ্বংসকারী এবং "ভক্ত সুখদং" শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্ম আশ্রিত ভক্তগণের সুখ প্রদানকারী। আমি (প্রবোধানন্দ সরস্বতী) নিত্য শ্রবণ-মনন-অর্চ্চনাদির দ্বারা তাঁকে উপাসনা করি।

অতঃপর নবদ্বীপ ধামের স্বরূপ সম্বন্ধে বলছেন–

শ্রুতিশ্ছন্দোগ্যাখ্যা বদতি পরমব্রহ্ম পুরকং
স্মৃতির্ব্বৈকুণ্ঠাখ্যং বদতি কিল যদ্বিষ্ণুসদনম্।
শ্বেতদ্বীপং চান্যে বিরল রসিকো যং ব্রজবনং
নবদ্বীপং বন্দে পরম সুখদং তং চিদুদিতম্।।

ছান্দোগ্যাদি শ্রুতি যাঁকে পরম ব্রহ্মপুরী, স্মৃতিগণ যাঁকে বৈকুণ্ঠ লোক বা বিষ্ণুসদন ও ভক্তি-রসিকগণ যাঁকে শ্বেতদ্বীপ বা ব্রজবন বলে সেই পরম সুখদ চিদ্ধাম অধুনা নবদ্বীপ নামে ধরাতলে উদিত; আমি ঐ ধামকে বারবার বন্দনা করি।

শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ শ্রীরাধা ঠাকুরাণীর মহিমা বর্ণন করেছেন–

যস্যাঃ কদাপি রসনাঞ্চল খেলনোত্থ-
ধন্যাতি ধন্যঃ পবনেন কৃতার্থমানী।
যোগীন্দ্রদুর্গম-গতিমধুসুদনোঽপি
তস্যা নমোঽস্তু বৃষভানুভুবো দিশেঽপি।।

–শ্রীরধারস সুধানিধি

কোন সময় যে শ্রীমতী রাধা ঠাকুরাণীর বস্ত্রাঞ্চল সঞ্চালন ফলে পবনদেব ধন্যাতিধন্য হয়ে শ্রীকৃষ্ণ গাত্র স্পর্শ করায় যোগীন্দ্রগণেরও অতি দুর্ল্লভ সেই শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত আপনাকে কৃত কৃতার্থ মনে করেছিলেন। সেই শ্রীমতী বার্ষবানবীদেবীর উদ্দেশ্যে আমাদের নমস্কার বিহিত হউক।

শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী গোকুলে কাম্যবনে বাস করতেন।

তিনি মহাপ্রভুর অপ্রকটে খেদ পূর্ব্বক বলেছিলেন–

অভিব্যক্তো যত্র দ্রুত কনক গৌর হরিরভূন্মহিম্নি
তস্যৈব প্রণয়রসমগ্নং জগদভূৎ।
অভদুচ্চৈরুচ্চৈস্তুমুলহরিসংকীর্ত্তন বিধি
স কাল কিং ভূবোহপ্যহহপরিবর্ত্তেত মধুরঃ।।

–শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃত ১৩৯ শ্লোক

যে কালে গলিত কনক-কান্তি শ্রীগৌরহরি প্রপঞ্চের গোচরীভূত হয়েছিলেন, তৎকালে তাঁর প্রভাবে পৃথিবী প্রণয় রসে মগ্ন এবং উচ্চৈঃস্বরে তুমুল কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন প্রণালীও প্রবর্তিত হয়েছিল। হায়! সেই মধুর কাল আর কি ফিরে আসবে?

হরিদাস দাসের লিখিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানেও ভুল তথ্য লক্ষ্য করা যায়। তিনি লিখেছেন– ''মতান্তরে প্রকাশানন্দেরই বৈষ্ণব নাম হয় প্রবোধানন্দ।''

**।। জয় শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী কি জয়।।**

# শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী

অনেকেই বলে থাকেন শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী ও প্রকাশানন্দ সরস্বতী এক জন ব্যক্তিরই নাম। আশুতোষ দেবের নতুন বাংলা অভিধানেও এই বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু এই কথাটি ভুল। শ্রীল প্রভুপাদ এই বিষয়ে চৈঃ ভাঃ মঃ ৩/৩৭ পয়ারের শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্যে লিখেছেন--

**'প্রকাশানন্দ নামক একজন কৈবলাদ্বৈতাবাদী অধ্যাপক যতি বেদের ব্যাখ্যাকালে আমার অপ্রাকৃত নিত্য অঙ্গসমূহকে বিখণ্ডিত করে। এই প্রকাশানন্দকে কেহ কেহ অনবিজ্ঞতাবশে কাবেরীপ্রবাসী ব্যেঙ্কটভট্টের অনুজ প্রবোধানন্দের সহিত সমজ্ঞান করে। ভক্তমাল নামক সহজিয়া গ্রন্থাভ্যন্তরে এইপ্রকার ভ্রম দোষ প্রবেশ করায়, অধুনাতন লেখকগণের মধ্যেও সেই ভ্রম দোষ ন্যূনাধিক প্রবেশ করিয়াছে।'**

শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী শ্রীমহাপ্রভুর সমসাময়িক কাশী বাসী একদণ্ডী শঙ্কর সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি কাশীতে বেদান্ত অধ্যয়ন করাতেন। প্রথমতঃ তিনি মহাপ্রভুকে গৌরদেশবাসী ভাবুক সন্ন্যাসী বলে বহু অবজ্ঞা করতেন।

শুনিয়াছি গৌড়দেশের সন্ন্যাসী ভাবুক।
কেশব ভারতী শিষ্য লোক প্রতারক।।
চৈতন্য নাম তার ভাবুকগণ লঞা।
দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে বুলে নাচাঞা।।
যেই তাঁরে দেখে সেই ঈশ্বর করি কহে।
ঐছে মোহন বিদ্যা যে দেখে সে মোহ।।
সার্ব্বভৌম, ভট্টাচার্য্য–পণ্ডিত প্রবল।
শুনি চৈতন্যের সঙ্গে হইল পাগল।।
সন্ন্যাসী নামমাত্র মহা ইন্দ্রজালী।
কাশীপুরে না বিকাবে তাঁর-ভাবকালি।।

–চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৭/১১৬-১২০

অতঃপর শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ গৃহে যখন মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ দর্শন করেন, তাঁর অমিত অদ্ভুত ঐশ্বর্য্য বলে তৎক্ষণাৎ মুগ্ধ হয়ে তাঁর চরণে অবনত হয়ে পড়ে।

বসিয়া করিলা কিছু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ।
মহাতেজোময় বপু কোটি সূর্য্য ভাস।।
প্রভাবে আকর্ষিল সব সন্ন্যাসীর মন।
উঠিলা সন্ন্যাসী সব ছাড়িয়া আসন।।

–চৈঃ চঃ আদি ৭/৬০-৬১

সেই মহানিন্দুক প্রকাশানন্দ সরস্বতী মহাপ্রভুর অদ্ভুত অঙ্গতেজ দর্শন করে শিষ্যগণ সহ আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

অনন্তর প্রকাশানন্দ শিষ্যগণ সহ প্রভুর সঙ্গে বেদান্ত সম্বন্ধে নানা বাদ বিতণ্ডা আরম্ভ করলেন।

পুছিল, তোমার নাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'।
কেশব-ভারতীর শিষ্য, তাতে তুমি ধন্য।।
সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী তুমি, রহ এই গ্রামে।
কি কারণে আমা-সবার না কর দর্শনে।।
সন্ন্যাসী হইয়া কর নর্ত্তন-গায়ন।
ভাবুক সব সঙ্গে লঞা করহ কীর্ত্তন।।
বেদান্ত-পঠন, ধ্যান,--সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি' কর কেনে ভাবুকের কর্ম্ম।।

চৈঃ চঃ আদি ৭/৬৬-৬৯

তদুত্তরে মহাপ্রভু বললেন--

প্রভু কহে,--শুন, শ্রীপাদ, ইহার কারণ।
গুরু মোরে মূর্খ দেখি' করিল শাসন।।
মূর্খ তুমি, তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।
'কৃষ্ণমন্ত্র' জপ' সদা,--এই মন্ত্রসার।।
কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে সবে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ।।
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম,--এই শাস্ত্রমর্ম্ম।।
এত বলি' এক শ্লোক শিখাইল মোরে।
কণ্ঠে করি' এই শ্লোক করিহ বিচারে।।
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।
এই আজ্ঞা পাঞা নাম লই অনুক্ষণ।
নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত হৈলমন।।
ধৈর্য্য ধরিতে নারি, হৈলাম উন্মত্ত।
হাসি, কান্দি, নাচি, গাই, যৈছে মদমত্ত।।
তবে ধৈর্য্য ধরি' মনে করিলাম বিচার।
কৃষ্ণনামে জ্ঞানাচ্ছন্ন হইল আমার।।
পাগল হইলাঙ আমি, ধৈর্য্য নাহি মনে।
এত চিন্তি' নিবেদিলাম গুরুর চরণে।।
কিবা মন্ত্র দিলা, গোসাঞি কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল।।
হাসায়, নাচায়, মোরে করায় ক্রন্দন।
এত শুনি' গুরু মোরে বলিলা বচন।।
কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্রের এই ত' স্বভাব।
যেই জপে, তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব।।
কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা--পরম পুরুষার্ত।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্ত।।
পঞ্চম পুরুষার্ত--প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু।
ব্রহ্মাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু।।
কৃষ্ণনামের ফল--'প্রেমা', সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ভাগ্যে সেই প্রেমা তোমায় করিল উদয়।।
প্রেমার স্বভাবে করে চিত্ত-তনু ভোক্ষ।
কৃষ্ণের চরণ-প্রাপ্ত্যে উপজায় লোভ।।
প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে, কান্দে, গায়।
উন্মত্ত হইয়া নাচে, ইতি-উতি ধায়।।
স্বেদ, কম্প, রোমাঞ্চাশ্রু, গদগদ, বৈবর্ণ্য।
উন্মাদ, বিষাদ, ধৈর্য্য, গর্ব্ব, হর্ষ, দৈন্য।।
এত ভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায়।
কৃষ্ণের আনন্দামৃতসাগরে ভাসায়।।
ভাল হৈল, পাইলে তুমি পরমপুরুষার্থ।
তোমার প্রেমেতে আমি হৈলাঙ কৃতার্থ।।
নাচ, গাও, ভক্তসঙ্গে কর সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণনাম উপদেশি' তার' সর্ব্বজন।।
এত বলি' এক শ্লোক শিখাইল মোরে।
ভাগবতের সার এই বলে বারে বারে।।
এই তাঁর বাক্যে আমি দৃঢ় বিশ্বাস ধরি'।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন করি।।
সেই কৃষ্ণনাম কভু গাওয়ায়, নাচায়।

গাহি, নাচি নাহি আমি আপন-ইচ্ছায়।।
কৃষ্ণনামে যে আনন্দসিন্ধু-আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক-সব।।

চৈঃ চঃ আদি ৭/৭১-৯৭

প্রভু বাস্তব সিদ্ধান্ত বাণে সবকিছু খণ্ড বিখণ্ড করে ফেললেন। শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বাত্মক ভাবে বেদান্ত সূত্রের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করলেন।

এই মত সর্ব্ব সূত্রের ব্যাখ্যান শুনিয়া।
সকল সন্ন্যাসী কহে বিনয় করিয়া।।
বেদময় মূর্ত্তি তুমি—সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ক্ষম অপরাধ পূর্ব্বে যে কৈলুঁ নিন্দন।।

—চৈঃ চঃ আদি ৭/১৪৭-১৪৮

প্রকাশানন্দ সরস্বতী শিষ্যগণ সহ প্রভুর চরণে শরণ নিলেন। প্রভু সকলের অপরাধ ক্ষমা করলেন। প্রভুর সে করুণা দর্শন করে সন্ন্যাসিগণ কৃষ্ণ নামে পাগল হলেন। ''কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম সদা করয়ে গ্রহণ।'' কাশীতে মহাপ্রভু সন্ন্যাসিগণ নিয়ে মহা হরিসংকীর্ত্তন আরম্ভ করলেন।

বাহু তুলি প্রভু বলে—বল হরি হরি!
হরি ধ্বনি করে লোক স্বর্গ-মর্ত্ত্য ভরি।।

—চৈঃ চঃ আদিঃ ৭/১৫৯

প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে প্রভু এইভাবে কৃপা করেছিলেন।

**।। জয় শ্রীল প্রকাশানন্দ সরস্বতী কি জয়।।**

# শ্রীরাঘব পণ্ডিত

শ্রীকাশীশ্বরগোস্বামী শশিরেখা পুরা ব্রজে।
ধনিষ্ঠা ভক্ষ্যসামগ্রীং কৃষ্ণায়াদাদ্ব্রজেহুমিতম্।
সৈব সম্প্রতি গৌরাঙ্গপ্রিয়ো রাঘবপণ্ডিতঃ।।

ব্রজে যিনি 'শশীরেখা' নামক সখী ছিলেন, তিনি এখন 'কাশীশ্বর গোস্বামী' হয়েছেন। ব্রজের 'ধনিষ্ঠা' সখী যিনি শ্রীকৃষ্ণের জন্য প্রচুর খাদ্য-সামগ্রী প্রস্তুত করতেন তিনি এখন মহাপ্রভুর প্রিয় 'শ্রীরাঘব পণ্ডিত' হয়েছেন।

গুণমালা ব্রজে যাসীদ্দময়ন্তী তু তৎস্বসা।
রত্নরেখা কৃষ্ণদাসঃ কৃষ্ণানন্দঃ কলাবতী।।

ব্রজের 'গুণমালা' সখী এখন শ্রীরাঘব পণ্ডিতের বোন 'দময়ন্তী', রত্নরেখা সখী 'শ্রীকৃষ্ণদাস' এবং 'কলাবতী' সখী 'শ্রীকৃষ্ণানন্দ' হয়েছেন।।

যশোমতী আজ্ঞা পেয়ে ধনিষ্ঠা আনীত।
শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ রাধা ভুঞ্জে হয়ে প্রীত।।

—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শিয়ালদহ-কৃষ্ণনগর লাইনে সোদপুর ষ্টেসনের এক মাইল পশ্চিমে গঙ্গার তীরে পানিহাটিতে শ্রীরাঘব পণ্ডিতের শ্রীপাট। রাঘব ভবনে মহাপ্রভু নিত্য অবস্থান করেন। মহাপ্রভু যে চার স্থানে সর্বদা আবির্ভূত হন তার মধ্যে রাঘব ভবন অন্যতম।

হেনমতে শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে।
আইসেন চলিয়া আপন-কুতূহলে।।
নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ।
সংহতি জগদানন্দ, আর ব্রহ্মানন্দ।।

চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ২/৩৪-৩৫

মহাপ্রভু কুমারহট্টে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে থেকে পনিহাটীতে শ্রীরাঘব পণ্ডিতের গৃহে এলেন।

কতদিন থাকি প্রভু শ্রীবাসের ঘরে।
তবে গেলা পানিহাটি রাঘব মন্দিরে।।
কৃষ্ণ-কার্য্যে আছেন শ্রীরাঘব পণ্ডিত।
সম্মুখে শ্রীগৌরচন্দ্র হইলা বিদিত।।
প্রাণনাথ দেখিয়া শ্রীরাঘব পণ্ডিত।
দণ্ডবত হইয়া পড়িলা পৃথিবীত।

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৫/৭৫-৭৭

শ্রীরাঘব পণ্ডিত শ্রীবিগ্রহগণের সেবা করছেন, আর ভাবছেন শ্রীগৌরসুন্দর কখন শুভাগমন করবেন। ঠিক এমন সময় শ্রীগৌরসুন্দর ''হরেকৃষ্ণ'' ''হরেকৃষ্ণ'' বলতে বলতে রাঘব ভবনে প্রবেশ করলেন। কণ্ঠস্বর শুনে শ্রীরাঘব পণ্ডিত বুঝতে পারলেন প্রভু এসেছেন, তৎক্ষণাৎ সেবা ছেড়ে গৃহের বাইরে এলেন। দেখলেন শ্রীমহাপ্রভু পরিকরসহ বিদ্যমান। তখনই আনন্দে আত্মহারা হয়ে শ্রীরাঘব পণ্ডিত মহাপ্রভুর শ্রীচরণতলে লুটিয়ে পড়লেন। শ্রীরাঘব পণ্ডিতকে মহাপ্রভু প্রেমার্দ্রচিত্তে ভূমি থেকে উঠিয়ে আলিঙ্গন করলেন। উভয়ের নয়ন জলে উভয়ে সিক্ত হতে লাগলেন।

রাঘবের ভক্তি দেখি' শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ।
রাঘবেরে করিলেন শুভদৃষ্টিপাত।।
প্রভু বলে,—''রাঘবের আলয়ে আসিয়া।
পাসরিলুঁ সব দুঃখ রাঘব দেখিয়া।।
গঙ্গায় মজ্জন কৈলে যে সন্তোষ হয়।
সেই সুখ পাইলাঙ রাঘব-আলয়।।

শ্রীমহাপ্রভু বললেন—রাঘব পণ্ডিতের গৃহে আসার পর সমস্ত শ্রম দূর হল। গঙ্গা-স্নানে যে ফল হয়, রাঘবের ঘরে এসে তা পেলাম।

মহাপ্রভু বললেন—আজ রাঘব পণ্ডিতের ঘরে উৎসব হবে। রাঘব পণ্ডিত তাড়াতাড়ি রান্না চাপিয়ে দিলেন। রাঘবের গৃহে সাক্ষাৎ রাধা ঠাকুরাণী রন্ধন করেন। অল্পক্ষণের মধ্যে শ্রীরাঘব পণ্ডিত বহু প্রকার পদ তৈরী করলেন। শীঘ্র শ্রীকৃষ্ণের ভোগ লাগালেন। অনন্তর অন্তঃপুরে মহাপ্রভুর ভোজনের ব্যবস্থা করলেন, সঙ্গে নিত্যানন্দ প্রভুও বসলেন। দুই ভাই আনন্দে ভোজন করতে করতে বলতে লাগলেন—

.................. রাঘবের কি সুন্দর পাক।
এমত কোথাও আমি নাহি খাই শাক।।
শাকেতে প্রভুর প্রীতি রাঘব জানিয়া।
রান্ধিয়া আছেন শাক বিবিধ আনিয়া।।

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৫/৮৯-৯০

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে শ্রীরাঘবের রন্ধনের প্রশংসা করতে করতে মহাপ্রভু ভোজন সমাপ্ত করলেন। শ্রীমুখ প্রক্ষালন করে বাইরে বসলেন, এ সময় শ্রীগদাধর দাস এলেন। মহাপ্রভুকে প্রণাম করতেই প্রভু তাঁকে বহু কৃপা করলেন। একই সময় পুরন্দর পণ্ডিত ও পরমেশ্বরী দাস ঠাকুরও এলেন। ক্ষণকাল মধ্যে এলেন শ্রীরঘুনাথ বৈদ্য। তিনি পরম বৈষ্ণব। মহাপ্রভু হাসতে হাসতে তাঁদের সঙ্গে বিবিধ বার্ত্তালাপ করতে লাগলেন।

পানিহাটি গ্রামে ভক্তগণ একে একে আগমন করতে লাগলেন। রাঘব পণ্ডিতের ভবনে মহোৎসব চলতে লাগল। শ্রীরাঘব পণ্ডিতের ভগিনী শ্রীদময়ন্তী দেবী তিনি মহাপ্রভুর একান্ত সেবা পরায়ণা।

মহাপ্রভু এক দিন রাঘব পণ্ডিতকে বলতে লাগলেন—রাঘব আমার দ্বিতীয় দেহ শ্রীনিত্যানন্দ। নিত্যানন্দ আমায় যা করায় আমি তাই করি। আমার যা কিছু নিগূঢ় লীলা সব নিত্যানন্দের দ্বারা করে থাকি। এ-সব রহস্য পরে তুমি জানতে পারবে। যে বস্তু মহা-যোগেশ্বরদেরও দুর্ল্লভ, শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় তা' তোমরা অনায়াসে পাবে। শ্রীরাঘব পণ্ডিতকে এ সব কথা বলে মহাপ্রভু বরাহনগরে শ্রীভাগবত আচার্য্যের ঘরে এলেন।

পানিহাটি ত্যাগ করবার আগে মহাপ্রভু ভক্ত মকরধ্বজ করকে বললেন—তুমি রাঘব পণ্ডিতের সেবা করবে।

কিছু দিন পরে সপার্ষদ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীরাঘব পণ্ডিতের ঘরে এলেন। নিত্যানন্দ প্রভুকে দেখে শ্রীরাঘব পণ্ডিতের আনন্দের সীমা রইল না। শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি রাঘব পণ্ডিতের স্বাভাবিক প্রেম। পানিহাটিতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অবস্থান করতে লাগলেন। শ্রীমকরধ্বজ কর সপরিবারে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সেবা করতে লাগলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নির্দ্দেশ মত কীর্ত্তন বিলাসের জন্য ভক্তগণ পানিহাটিতে মিলিত হতে লাগলেন। মহাগায়ক শ্রীমাধব ঘোষ এলেন। আর এলেন বাসু ঘোষ ও গোবিন্দ ঘোষ। তিন ভাই সঙ্গীত সম্রাট।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মহানৃত্য ও সংকীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় রাঘব ভবন আনন্দময় হয়ে উঠল। সংকীর্ত্তন করতে করতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু খট্টার উপর বসে আদেশ করলেন—আমার অভিষেক কর। তখন শ্রীরাঘব পণ্ডিত ভক্তগণসহ মহানন্দে অভিষেক কার্য্য আরম্ভ করলেন।

গন্ধ-চন্দন-পুষ্প-দীপ-নৈবেদ্য ও সহস্র কলস জলের ব্যবস্থা করা হল। অভিষেক আরম্ভ হল। কলসে কলসে জল শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শিরে ভক্তগণ সংকীর্ত্তন করতে করতে ঢালতে লাগলেন। তারপর নব বস্ত্রাদি পরিয়ে তাঁর শ্রীঅঙ্গে গন্ধ চন্দন লেপন করা হল। গলদেশে দিব্য বনমালা প্রদান

করা হল। শ্রীরাঘব পণ্ডিত শিরে ছত্র ধারণ করলেন, ভক্তগণ দুই পার্শ্বে চামর ব্যজন করতে লাগলেন। ভক্তগণের আনন্দ কোলাহলে চারিদিক্‌ পূর্ণ হল। শ্রীনিত্যানন্দের প্রেম-দৃষ্টিপাতে দিগ্বিদিক প্রেমময় হয়ে উঠল। এমন সময় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু রাঘব পণ্ডিতকে বললেন—কদম্বের মালা পরব, কদম্ব পুষ্প আমার বড় প্রিয়।

শ্রীরাঘব পণ্ডিত বললেন প্রভো! কদম্ব পুষ্প ত এ সময় পাওয়া যায় না।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বললেন, বাগিচায় গিয়ে দেখ, পাবে, রাঘব পণ্ডিত বাগিচায় এলেন, দেখলেন আশ্চর্য্য ব্যাপার। জম্বির বৃক্ষে অপূর্ব্ব কদম্ব ফুল ফুটে আছে। পণ্ডিত আনন্দে বাহ্যদশা শূন্য হলেন। তৎক্ষণাৎ ফুল তুলে মালা গাঁথলেন। মালা নিয়ে এলেন শ্রীনিত্যানন্দ স্থানে এবং হরিধ্বনি করতে করতে সে মালা পরালেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর গলদেশে।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা দর্শন করে ভক্তগণ পরম বিস্ময়ান্বিত হলেন। সে দিন আর এক লীলা করলেন নিত্যানন্দ প্রভু। ভক্তগণ চতুর্দ্দিকে বসে আছেন অকস্মাৎ সকলেই দমনক পুষ্পের গন্ধ পেতে লাগলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বললেন--আপনারা কিসের গন্ধ পাচ্ছেন?

ভক্তগণ বললেন অপূর্ব্ব দমনক ফুলের গন্ধ পাচ্ছি। নিত্যানন্দ প্রভু হাসতে হাসতে বললেন, আজকের একটি রহস্যের কথা আপনারা শুনুন।

চৈতন্য গোসাঞি আজি শুনিতে কীর্ত্তন।
নীলাচল হৈতে করিলেন আগমন।।
সর্ব্বাঙ্গে পরিয়া দিব্য দমনকের মালা।
এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিলা।।
সেই শ্রীঅঙ্গের দিব্য দমনকের গন্ধে।
চতুর্দ্দিক পূর্ণ হই আছয়ে আনন্দে।।
তোমা সবাকার নৃত্য-কীর্ত্তন দেখিতে।
আপনে আইলা প্রভু নীলাচল হৈতে।।

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৫/২৯৪-২৯৭

ভক্তগণ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কথা শ্রবণ করে পরম চমৎকৃত হলেন।

পানিহাটিতে শ্রীরাঘব ভবনে কত অলৌকিক শক্তি প্রকাশ করে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বিহার করেছিলেন।

কি ভোজনে কি শয়নে কিবা পর্য্যটনে।
ক্ষণেক না যায় ব্যর্থ সংকীর্ত্তন বিনে।।

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৫/৩৬০

অবধূত শ্রীনিত্যানন্দ রায় এইভাবে পানিহাটি রাঘব ভবনে আনন্দভরে কত দিব্য-লীলা প্রকট করে ভক্তগণকে সুখী করলেন।

রাঘবের ঝালি সুপ্রসিদ্ধ। যখন তিনি প্রতিবছর রথযাত্রার সময় মহাপ্রভুর দর্শনে যেতেন সঙ্গে করে ঝালি নিয়ে যেতেন।

রাঘব-পণ্ডিত চলে ঝালি সাজাইয়া।
দময়ন্তী যত দ্রব্য দিয়াছে করিয়া।।
নানা অপূর্ব্ব ভক্ষ্যদ্রব্য প্রভুর যোগ্য ভোগ।
বৎসরেক প্রভু যাহা করেন উপযোগ।।

চৈঃ চঃ অঃ ১০/১৩-১৪

ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু স্নেহমাত্র লয়।
সুকুতাপাতা-কাশন্দিতে মহাসুখ হয়।।
'মনুষ্য'-বুদ্ধি দময়ন্তী করে প্রভুর পায়।
গুরু-ভোজনে উদরে কভু 'আম' হঞা যায়।।
সুকুতা খাইলে সেই আম হইবেক নাশ।
সেই স্নেহ মনে ভাবি' প্রভুর উল্লাস।।

—চৈঃ চঃ অঃ ১০/১৮-২০

পুরীতে অবস্থান কালে মহাপ্রভু ভক্তগণের সামনে রাঘব পণ্ডিতের প্রেমনিষ্ঠার কথা বর্ণনা করতেন।

রাঘব-পণ্ডিতে কহেন বচন সরস।
তোমার নিষ্ঠা প্রেমে আমি হই’ তোমার বশ।।
ইঁহার কৃষ্ণসেবার কথা শুন, সর্ব্বজন।
পরম-পবিত্র সেবা অতি সর্ব্বোত্তম।।
আর দ্রব্য রহু, শুন নারিকেলের কথা।
পাঁচ গণ্ডা করি’ নারিকেল বিকায় তথা।।

শ্রীরাঘব পণ্ডিতের গৃহে শত শত নারিকেলের গাছ ছিল। তথাপি তিনি অনেক দূর থেকে বেশী মূল্য দিয়ে নারিকেল কিনে আনতেন। সেই নারিকেল ছাড়িয়ে সুশীতল জলে ডুবিয়ে রাখতেন। তারপর সুন্দরভাবে সংস্কার করে নারিকেলের মুখ ছিদ্র করে কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে নিবেদন করতেন। কৃষ্ণ কখনও নারিকেল জল পান করতেন। কখনও ভিতরের শাস খেয়ে নিতেন।

শস্য সমর্পন করি বাহিরে ধেয়ান।
শস্য খাঞা কৃষ্ণ করে শূন্য ভাজন।।

চৈঃ চঃ মঃ ১৫/৭৭

রাঘব পণ্ডিত অত্যন্ত পরিপাটির সাথে সেবা করতেন। একদিন তিনি বহু দূর থেকে সুস্বাদু নারিকেল কিনে এনেছেন। পূর্বের ন্যায় সংস্কার করে সেবকের হাতে দিলেন। কিন্তু সেবক দ্বারের ভিতে হাত দিয়ে নারিকেল স্পর্শ করলেন। অমনি তিনি রেগে বললেন--দ্বার দিয়ে কত লোকে আসা-যাওয়া করে। তাদের পদধূলি দ্বারে এসে লাগে। আর তুমি সেই দ্বারে হাত দিয়ে ভগবানের নৈবেদ্য স্পর্শ করলে। এই বলে তিনি নারিকেলটি প্রাচীরের বাইরে ফেলে দিলেন।

এতবলি’ ফল ফেলে প্রাচীর লঙিঘয়া।
ঐছে পবিত্র প্রেম-সেবা জগৎ জিনিয়া।।
তবে আর নারিকেল সংস্কার করাইল।
পরম পবিত্র করি’ ভোগ লাগাইল।।
এইমত কলা, আম্র, নারিকেল, কাঁঠাল।
যাহা যাহা দূর-গ্রামে শুনিয়াছে ভাল।।
বহুমূল্য দিয়া আনি’ করিয়া যতন।
পবিত্র সংস্কার করি’ করে নিবেদন।।
এইমত ব্যঞ্জনের শাক, মূল, ফল।
এইমত চিড়া, হুড়ুম, সন্দেশ সকল।।
এইমত পিঠা-পানা, ক্ষীর-ওদন।
পরম পবিত্র, আর করে সর্ব্বোত্তম।।
কাশম্দি, আচার আদি অনেক প্রকার।
গন্ধ, বস্ত্র, অলঙ্কার, সর্ব্বদ্রব্য সার।।
এইমত প্রেমের সেবা করে অনুপম।
তাহা দেখি’ সর্ব্বলোকর জুড়ায় নয়ন।।

চৈঃ চঃ মঃ- ১৫

শ্রীরাঘব পণ্ডিত পুরীধামে গুণ্ডিচা-মার্জন লীলায়, জগন্নাথদেবের রথযাত্রায় এবং জলকেলি লীলায় মহাপ্রভুর সঙ্গী ছিলেন। রথের সামনে সাত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথম সম্প্রদায়ের মূল গায়ক স্বরূপদামোদর। নর্ত্তক অদ্বৈত আচার্য্য এবং পাঁচজন দোহারের মধ্যে শ্রীরাঘব পণ্ডিত অন্যতম।

**।। জয় শ্রীল রাঘব পণ্ডিত কি জয়।।**

# শ্রীভগবান্ আচার্য্য

‘‘আচার্য্য ভগবান্ খঞ্জঃ কলা গৌরস্য কথ্যতে।’

– গৌঃ গঃ ৭৪

ভগবান আচার্য্য নামক খঞ্জকে গৌরাঙ্গের কলা বলা হয়।

শ্রীভগবান্ আচার্য্যের আবির্ভাব নবদ্বীপ, কিন্তু তিনি হালিশহরে বাস করতেন। তিনি খঞ্জ ছিলেন। তাঁর পিতার নাম শতানন্দ খাঁ। ন্যায় শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতার জন্য ভগবান আচার্য্য ‘ন্যায়াচার্য্য’ উপাধি লাভ করেন। তাঁর মধ্যে অল্প বয়সে বৈরাগ্য লক্ষ্য করে পিতা নবদ্বীপ বাসী মধুসূদন ঘটকের কন্যার সাথে বিবাহ দেন। তা সত্ত্বেও তিনি সংসারের সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে মহাপ্রভুর কাছে চলে যান। মহাপ্রভু তাঁকে বুঝিয়ে আবার সংসারে পাঠিয়ে দেন। তার দুই পুত্র হয় রঘুনাথ ও রামানাথ। তাঁর মন সর্বদা মহাপ্রভুর চরণে পড়ে থাকত। তাই পুত্রদ্বয় এবং পত্নীকে নিজ শ্যালক এবং শিষ্যদের নিকট রেখে হালিশহর ছেড়ে চিরতরে মহাপ্রভুর কাছে চলে যান।

ভগবান্ আচার্য্য ছিলেন ‘গোপ অবতার’। অতি সরল মহাপ্রভুর শ্রীচরণে অনুরক্ত। কোন কোন দিন তিনি মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করে ভোজন করাতেন। তিনি একবার ছোট হরিদাসের দ্বারা শ্রীমাধবী দেবীর নিকট থেকে মহাপ্রভুর ভিক্ষার জন্য চাল আনিয়াছিলেন।

মহাপ্রভু ভোজনের সময় সেকথা জানতে পারলে ছোট হরিদাসকে বর্জন করেছিলেন। বৈরাগীর ক্ষেত্রে প্রকৃতি সম্ভাষণ বিষ ভক্ষণের থেকেও অসাধু, এই শিক্ষা দেওয়ার জন্য মহাপ্রভু কঠোরতা প্রদর্শন করেছিলেন।

প্রভুকহে, বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পাঁরো আমি তাহার বদন।।

চৈঃ চঃ অঃ ৩/১১৭

পুরীতে মহাপ্রভুর যত লীলা সংঘটিত হয়েছিল তাঁর মধ্যে কিছু লীলায় ভগবান্ আচার্য্য উপস্থিত ছিলেন। অদ্বৈত আচার্য্য পুরীতে এলে মহাপ্রভু যে কয়জনকে স্বাগত করতে পাঠিয়েছিলেন তার মধ্যে ভগবান আচার্য্য অন্যতম। মহাপ্রভু চটক পর্বতে ধাবিত হলে যে সকল ভক্ত পশ্চাৎ ধাবন করেছিলেন তাদের মধ্যে ভগবান আচার্য্যও ছিলেন।

‘‘পুরী ভারতী গোসাঞি আইলা সিন্ধুতীরে।
ভগবান আচার্য্য খঞ্জ চলিলা ধীরে ধীরে।।”

চৈঃ চঃ অঃ ১৪/৯০

ভগবান আচার্য্য শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামীর সঙ্গে সখ্যভাবে অনেক নর্মালাপ করতেন। ভগবান আচার্য্যের ছোট ভাইয়ের নাম গোপাল। কাশীতে আচার্য্য শঙ্করের বেদান্ত ভাষ্য পড়ে গোপাল পুরীতে ভগবান্ আচার্য্যের নিকট এল। সকলকে গোপালের মুখে বেদান্ত ভাষ্য শ্রবণ করাবার জন্য ভগবান্ আচার্য্য উদ্গ্রীব হলেন। একদিন তিনি শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভুকে বললেন, এস, গোপালের মুখে বেদান্ত শুনি। শ্রীস্বরূপ গোস্বামী বললেন–বৈষ্ণবের শঙ্কর বেদান্ত ভাষ্য শুনতে নাই। আপনার বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়েছে, তাই গোপালের মুখে মায়াবাদ ভাষ্য শুনতে উৎসুক হয়েছেন। বৈষ্ণব হয়ে যাঁরা মায়াবাদ ভাষ্য শুনেন তাঁদের বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়ে পড়ে, সেব্য-সেবক জ্ঞান থাকে না ও নিজকে ঈশ্বর

বলে অভিমান করেন। সেব্য-সেবক ভাবশূন্য কথা শুনলে মহাভাগবতগণের মনে দুঃখ হয়।

ভগবান্ আচার্য্য বললেন– আমাদের চিত্ত কৃষ্ণের প্রতি দৃঢ় নিষ্ঠাযুক্ত আছে। আমাদের মন ফিরবে না।

স্বরূপ-গোস্বামী বললেন–তথাপি মায়াবাদ শ্রবণে মহাদোষ। মায়াবাদ সিদ্ধান্তে–জীবকে ব্রহ্মজ্ঞান ও ঈশ্বরের স্বরূপ অস্বীকার করা হয়। মায়াবাদ ভাষ্য শুনলে দুঃখে ভক্তের হৃদয় ফেটে যায়। আপনার অসৎ মায়াবাদ শ্রবণে এত মতি হল কেন? শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর কথা শুনে ভগবান্ আচার্য্য লজ্জায় ও ভয়ে নীরব রইলেন। বাসায় ফিরে এলেন। বুঝতে পারলেন গোপালের প্রতি স্নেহবশতঃ এই অসৎ মায়াবাদ শুনতে তাঁর রুচি হয়েছিল। গোপালকে আচার্য্য শীঘ্রই দেশে পাঠিয়ে দিলেন।

একবার বঙ্গদেশ থেকে একজন ব্রাহ্মণ পুরীতে ভগবান্ আচার্য্যের কাছে এলেন। তিনি আচার্য্যের পরিচিত। ব্রাহ্মণটি পণ্ডিত, তিনি মহাপ্রভুর সম্বন্ধে এক নাটক রচনা করেছেন। একদিন নাটক খানি ভগবান্ আচার্য্যকে ও কতিপয় বৈষ্ণবকে শুনালেন। তাঁরা নাটকের প্রশংসা করলেন। অতঃপর ব্রাহ্মণের ইচ্ছা হল নাটক মহাপ্রভুকে শুনাবেন। একদিন তিনি ভগবান্ আচার্য্যের কাছে এই প্রস্তাব করলেন। কিন্তু নিয়ম ছিল যে গদ্য-পদ্য-নাটক প্রভৃতি যে কোন সাহিত্য মহাপ্রভুকে শুনাবার পূর্ব্বে শ্রীস্বরূপ গোস্বামীকে শুনাতে হবে। তিনি যদি পছন্দ করেন তবেই মহাপ্রভু শুনেন। কারণ কোন অপসিদ্ধান্ত কিম্বা রসাভাস দোষ মহাপ্রভু সইতে পারেন না।

একদিন কথা প্রসঙ্গে শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর নিকট ভগবান্ আচার্য্য বলতে লাগলেন–বঙ্গদেশ থেকে একজন কবি এসেছেন, তিনি আমার পরিচিত। তিনি মহাপ্রভু সম্বন্ধে এক নাটক রচনা করে এনেছেন, আমরা সকলে শুনেছি, বড় সুন্দর হয়েছে। তুমি যদি একবার শুন ও অনুমোদন কর তবে মহাপ্রভুকে শুনাতে পারি।

স্বরূপ কহে তুমি গোপ পরম উদার।
যে সে শাস্ত্র শুনিতে ইচ্ছা উপজয়ে তোমার।।

–চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৫/১০১

স্বরূপ গোস্বামী বললেন--আপনি পরম উদার, যে কোন কথা ও শাস্ত্র শুনতে ইচ্ছা করেন। যাদের সাধুসঙ্গ হয়নি, রসতত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্ব জ্ঞান নাই, তাদের বর্ণনা কদাপি সুসিদ্ধান্ত-যুক্ত হয় না। তাতে রসাভাস প্রভৃতি দোষ থাকবেই।

গ্রাম্য কবির কবিত্ব শুনিতে হয় দুঃখ।
বিদগ্ধ আত্মী বাক্য শুনিতে হয় সুখ।।
রূপ যৈছে দুই নাটক করিয়াছে আরম্ভে।
শুনিতে আনন্দ বাড়ে যার মুখবন্ধে।।

–চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৫/১০৭-১০৮

সৎসঙ্গে ভক্তিরস অনুশীলন করে নাই, ভক্তিশাস্ত্র পড়ে নাই বা ভক্তিরস বিচার শুনে নাই তারা হল গ্রাম্য কবি। তাদের বাক্য ভক্তি রসিকের হৃদয়ে সুখোৎপাদন করতে পারে না।

ভগবান্ আচার্য্য বললেন–তুমি একবার শুনে দেখ, যদি ভাল মনে না কর ত শুনাব না। ভাল মনে কর ত শুনাব। এবার স্বরূপ দামোদর প্রভু স্বীকৃত হলেন। কবিকে ডেকে ভগবান্ আচার্য্য তাঁর কাব্য শুনাতে বললেন। কবি স্বরূপ দামোদর ও অন্যান্য ভক্তগণের সামনে নান্দী শ্লোক পড়তে লাগলেন।

জগন্নাথ সুন্দর শরীর।
শ্রীচৈতন্য গোসাঞি শরীর মহাধীর।।
সহজে জড় জগতের চেতন করাইতে।
নীলাচলে মহাপ্রভু হৈলা আবির্ভূতে।।

–চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৫/১১

শ্লোকের অভিপ্রায়—শ্রীজগন্নাথ হলেন শরীর, মহাপ্রভু প্রাণ। জড় জগতকে চৈতন্য করাবার জন্য নীলাচলে বর্ত্তমানে উদিত হয়েছেন। শ্লোক শুনে শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামী বললেন মূর্খ অতত্ত্বজ্ঞ এইরূপ বর্ণন করে। শ্রীজগন্নাথকে স্থূলরূপে দর্শন ও মহাপ্রভুকে প্রাণরূপে দর্শন অপরাধজনক কথা। দুই পূর্ণ ব্রহ্ম, দেহ-দেহী অভেদ। ভগবদ্ বিগ্রহকে স্থূল জড় কঠিন পাথর মনে করা মহাপরাধ। ঈশ্বরের দেহ-দেহীতে কোন ভেদ নাই।

শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর সিদ্ধান্ত শুনে সকলে স্তম্ভিত হলেন। বললেন শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর সিদ্ধান্ত সত্য সিদ্ধান্ত, কবির বাক্যে বহু দোষ রয়েছে।

কবি শুনে স্তম্ভিত ও লজ্জিত হয়ে অবনত শিরে বসে রইলেন, তখন শ্রীস্বরূপ গোস্বামী বলতে লাগলেন—

যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য চরণে।।
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে জানিবা সিদ্ধান্ত সমুদ্র তরঙ্গ।।
তবে পাণ্ডিত্য তোমার হইবে সফল।
কৃষ্ণের স্বরূপ-লীলা বর্ণিবা নির্মল।

—চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৫/১৩১-১৩৩

শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামীর করুণা ব্যঞ্জক বাক্য শুনে বঙ্গ দেশের কবি সুখী হলেন। অনন্তর তিনি সব ত্যাগ করে মহাপ্রভুর শ্রীচরণতলে পুরীতে রইলেন।

সেই কবি সর্ব্ব ত্যজি রহিলা নীলাচলে।
গৌর ভক্তগণের কৃপা কে কহিতে পারে।।

—চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৫/১৫৮

বাস্তবতঃ কবি অতিশয় সরল, হিংসা-মাৎসর্য্যাদি দোষশূন্য ছিলেন। নিজের ভুল বুঝতে পেরে ভক্তগণের চরণে শরণ নিলেন। কবি ভগবান আচার্য্যকে অনুনয় করে বললেন আপনি আমার মহৎ উপকার করেছেন। যদি এই সমস্ত ভক্তের সঙ্গ আমার না হত, চিরকাল আমার জীবনে এইরূপ ভুল থেকে যেত।

খড়দহ থেকে শ্রীজাহ্নবা দেবী যখন ভক্তগণকে নিয়ে খেতরীধামে গিয়েছিলেন, সেই ভক্তদের সাথে ভগবান আচার্য্যের পুত্র শ্রীরঘুনাথ আচার্য্য ছিলেন।

**।। জয় শ্রীল ভগবান্ আচার্য্য কি জয়।।**



# শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিত

নিত্যানন্দ-প্রিয়ভৃত্য পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
অত্যন্ত বিরক্ত সদা কৃষ্ণ প্রেমময়।।

—চৈঃ চঃ আঃ ১১/৩১

শ্রীল ধনঞ্জয় পণ্ডিত পূর্ব লীলায় বলরামের প্রিয় দ্বাদশ গোপালের অন্যতম বসুদাম সখা। 'বসুদাম সখা যশ্চ পণ্ডিতঃ শ্রীধনঞ্জয়ঃ।'—গৌঃ গঃ ১২৭

ধনঞ্জয় পণ্ডিতের আবির্ভাব স্থান ও পিতৃমাতৃ পরিচয় সম্বন্ধে মতভেদ আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব আভিধানে লেখা আছে—''তাঁর জন্ম চট্টগ্রাম জেলার জাড়গ্রামে ১৩০৬ শকে চৈত্রী শুক্লা পঞ্চমীতে। পিতার নাম শ্রীপতি বন্দোপাধ্যায়, মাতার নাম কালিন্দী দেবী, পত্নীর নাম হরিপ্রিয়া। এই সম্বন্ধে গৌরাঙ্গ মাধুরীতে অন্যপ্রকার বর্ণনা দেখা যায়—''ইনি বীরভূম জেলার বোলপুরের নিকট সিয়ান মুলুক গ্রামে আবির্ভূত হয়েছিলেন। পিতার নাম আদিদেব বাচস্পতি এবং মাতার নাম দয়াময়ী দেবী। শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের অনুভাষ্যে লিখেছেন— **"কেহ কেহ বলেন, ধনঞ্জয় পণ্ডিতের প্রকৃত জমভূমি চট্টগ্রম জেলায় জাড়গ্রামে।"**

শ্রীমদ্ বৃন্দাবনদাস ঠাকুর এ বলে শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের মহিমা বর্ণন করেছেন। শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের শ্রীপাট শীতল গ্রামে অবস্থিত। এ গ্রাম বর্দ্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত। সেখান থেকে এসে শীতল গ্রামে বা সাঁচড়া পাঁচড়া গ্রামে ইনি শ্রীবিগ্রহ-সেবা প্রকাশ করেন।

নবদ্বীপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তন-বিলাসে শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিত অবস্থান করতেন। তিনি শ্রীবৃন্দাবন ধাম থেকে ফিরে এসে জলন্দি নামক গ্রামেও শ্রীবিগ্রহ সেবা প্রকাশ করেছিলেন। বর্ত্তমানে এ স্থানে শ্রীশ্রীগোপীনাথ, শ্রীশ্রীনিতাই গৌর ও শ্রীশ্রীদামোদর শালগ্রাম সেবিত হচ্ছেন। শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের কোন বংশধর ছিল না। শ্রীসঞ্জয় নামে তাঁর এক ভাই ছিলেন। তাঁর পুত্রের নাম—শ্রীরাম কানাই ঠাকুর। তাঁর শ্রীপাট বর্ত্তমান—বোলপুরের সন্নিকট মুলুকগ্রামে আছে। কেউ কেউ বলেন—সঞ্জয় শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন। শীতল গ্রামে এখন যাঁরা সেবাইত আছেন তাঁরা শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের শিষ্য বংশধর। শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের এক শিষ্য শ্রীজীবন কৃষ্ণের স্থাপিত শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর জীউ বর্ত্তমানে শ্রীগোপাল রায় চৌধুরীর ভবনে আছেন। শীতলগ্রামে শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের সমাধি মন্দির বর্ত্তমান। কার্ত্তিক শুক্লাষ্টমী তিথিতে শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিত নিত্য লীলায় প্রবেশ করেন।

**।। জয় শ্রীল ধনঞ্জয় পণ্ডিত কি জয়।।**

# শ্রীল সুন্দরানন্দ ঠাকুর

সুন্দরানন্দ—নিত্যানন্দের শাখা ভৃত্য।
যাঁর সঙ্গে নিত্যানন্দ করে ব্রজ নর্ম।।

—চৈঃ চঃ আদি ১১ পরিঃ

শ্রীমদ্ কবিকর্ণপুর গোস্বামী লিখেছেন—

‘‘পুরা সুদাম—নামাসীদ্ অদ্য ঠক্কুর সুন্দরঃ।”

—গৌর গণোদ্দেশ দীপিকা

পূর্ব্বে ব্রজে যিনি সুদাম নামক গোপাল ছিলেন, অধুনা তিনি সুন্দরানন্দ ঠাকুররূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। জগৎগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ লিখেছেন--

‘‘ইঁহার শ্রীপাট—মহেশপুর গ্রাম—ই, বি, আর, লাইনে মাজদিয়া ষ্টেশন থেকে ১৪ মাইল পূর্ব্ব দিকে; অধুনা যশোহর জেলায় অবস্থিত। এ স্থানটিতে প্রাচীন স্মৃতি চিহ্ন একমাত্র সুন্দরানন্দের জন্ম ভিটা ভিন্ন আর কিছু নাই।

সুন্দরানন্দ ঠাকুর বিবাহ করেন নাই। এজন্য তাঁর বংশ নাই। জ্ঞাতি ভ্রাতাদের এবং সেবায়েত শিষ্য বংশ বর্ত্তমানে আছেন।”

—চৈঃ চঃ আদি ১১ পরিঃ ২৩ শ্লোক অনুভাষ্য

প্রেমরস সমুদ্র সুন্দরানন্দ নাম।
নিত্যানন্দ-স্বরূপের পার্ষদ প্রধান।।

—চৈঃ ভাঃ অন্তঃ ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রীল সুন্দরানন্দ ঠাকুর অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন ছিলেন। তিনি জম্বীরের (গোঁড়লেবুর) বৃক্ষে কদম্বফুল ফুটিয়ে শ্রীরাধারমনের সেবা করেছিলেন।

‘‘সুন্দরানন্দ ঠাকুর বন্দিব বড় আশে।
ফুটাল কদম্বফুল জম্বীরের গাছে।।”

—বৈষ্ণব বন্দনা।

একবার সুন্দরানন্দ ঠাকুর প্রেমের আবেশে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে কুমীরকে টেনে এনেছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু যেমন পতিত পাবন। তাঁর পার্ষদগণও তেমন পতিত পাবনত্ব শক্তি ধারণ করেন।

কার্ত্তিক পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুর অপ্রকট লীলা করেন।

**।। জয় শ্রীল সুন্দরানন্দ ঠাকুর কি জয়।।**



# শ্রীকালিদাস ও শ্রীঝড়ু ঠাকুর

শ্রীকালিদাস কায়স্থ কুলে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর জন্মস্থান হুগলী জেলার 'ভেদো' বা 'ভাদোয়া গ্রামে'। তিনি শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর জ্ঞাতি খুড়ো। গৌর গণোদ্দেশ দীপিকায় বর্ণনা আছে ''পুলিন্দ তনয়া মল্লী কালিদাসোঽধুনাভবৎ–(গৌঃ গঃ ১৯০) পুলিন্দ কন্যা মল্লী এখন কালিদাস রূপে জন্মগ্রহণ করেছে। ভুঁইমালী কুলে আবির্ভূত শ্রীঝড়ু ঠাকুরের শ্রীপাট ও ভেদোগ্রামে।

মহাভাগবত কালিদাস সর্বক্ষণ কৃষ্ণনাম করতেন। তিনি সব সময় চেষ্টা করতেন ভক্তদের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ গ্রহণ করতে। তিনি বিভিন্ন ছল করে ভক্তের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করতেন। প্রথমে উত্তম বস্তু নিয়ে সেবার জন্য কোন ভক্তকে দিতেন। তারপর তাদের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ প্রার্থনা করতেন। কেউ দিতে না চাইলে লুকিয়ে গ্রহণ করতেন।

ঝড়ু ঠাকুর ভুঁইমালী কুলে আবির্ভূত হলেও পরম বৈষ্ণব ছিলেন। একদিন কালিদাস সুমিষ্ট আম নিয়ে তাঁর গৃহে উপস্থিত হলেন। ঝড়ু ঠাকুর কালিদাসকে অতিথি জ্ঞানে বহু সম্মান করে বললেন,–আমি নীচজাতি, জানি আমার গৃহে আপনি প্রসাদ গ্রহণ করবেন না। আজ্ঞা দিন, ব্রাহ্মণের ঘরে রন্ধনের ব্যবস্থা করি। সেখানে আপনি প্রসাদ গ্রহণ করলে আমি ধন্য হব। ঝড়ু ঠাকুরের দৈন্যপূর্ণ বাক্য শুনে কালিদাস বললেন,–আমি অত্যন্ত পতিত অধম। বহু সৌভাগ্যের ফলে আপনার দর্শন লাভ করেছি। আপনি কৃপা করে আপনার চরণধূলি আমার মস্তকে অর্পণ করুন। একথা শুনে কালিদাস অত্যন্ত লজ্জিত হলেন। কালিদাস ঝড়ু ঠাকুরকে প্রণাম করে বিদায় গ্রহণ করলে ঝড়ু ঠাকুর কিছুদূর তাঁর অনুগমন করলেন। তারপর ফিরে এলেন। কালিদাস গৃহে না গিয়ে যে যে স্থানে ঝড়ু ঠাকুরের চরণ চিহ্ন ছিল, সে স্থানের ধূলি সর্ব অঙ্গে লেপন করতে করতে ঝড়ু ঠাকুরের গৃহের নিকটে এসে লুকিয়ে রইল।

ঝড়ু ঠাকুর গৃহে গিয়ে কালিদাসের প্রদত্ত আম মানসে কৃষ্ণকে ভোগ লাগালেন। তারপর পতি-পত্নী দুজনে আম প্রসাদ গ্রহণ করলেন। ভোজনের পর আমের উচ্ছিষ্ট চোষা ও আঁটি বাইরে গর্তে ফেলে দিলেন আর কালিদাস সেই উচ্ছিষ্ট চোষা ও আঁটি চুষতে লাগলেন–

সেই খোলা, আঁটি, চোকলা চূষে কালিদাস।
চূষিতে চূষিতে হয় প্রেমেতে উল্লাস।।
এইমত যত বৈষ্ণব বৈসে গৌড়দেশে।
কালিদাস ঐছে সবার নিলা অবশেষে।।

চৈঃ চঃ অঃ ১৬/৩৭-৩৮

ফলস্বরূপ কালিদাস যখন নীলাচলে গেলেন একদিন মহাপ্রভুর পদধৌত জল প্রাপ্ত হলেন–

এক অঞ্জলি, দুই অঞ্জলি, তিন অঞ্জলি পিলা।
তবে মহাপ্রভু তাঁরে নিষেধ করিলা।।
অতঃপর আর না করিহ পুনর্ব্বার।
এতাবতা বাঞ্ছা-পূরণ করিলুঁ তোমার।।

চৈঃ চঃ অঃ ১৬/৪৬-৪৭

আবার মহাপ্রভু একদিন নিজের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ কালিদাসকে দিলেন–

প্রভুর ইঙ্গিতে গোবিন্দ সব জানে।
কালিদাসেরে দিল প্রভুর শেষপাত্র-দানে।।
বৈষ্ণবের শেষ-ভক্ষণের এতেক মহিমা।
কালিদাসে পাওয়াইল প্রভুর কৃপা-সীমা।।
তাতে 'বৈষ্ণবের ঝুটা' খাও ছাড়ি' ঘৃণা-লাজ।

যাহা হইতে পাইবা বাঞ্ছিত সব কাজ।।
কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় 'মহাপ্রসাদ' নাম।
'ভক্তশেষ' হৈলে 'মহা-মহাপ্রসাদাখ্যান'।।
ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদ-জল।
ভক্তভুক্ত-শেষ,—এই তিন সাধনের বল।।
এই তিন-সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়।।
তাতে বার বার কহি,—শুন ভক্তগণ।
বিশ্বাস করিয়া কর এ-তিন-সেবন।।
তিন হৈতে কৃষ্ণনাম-প্রেমের উল্লাস।
কৃষ্ণের প্রসাদ, তাতে 'সাক্ষী' কালিদাস।।
চৈঃ চঃ অঃ ১৬/৫৬-৬৩

বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট গ্রহণের দ্বারা যে ভগবানের অশেষ কৃপা লাভ করা যায়, কালিদাস তাঁর আচরণের দ্বারা জগতের জীবকে এই শিক্ষাই দিলেন।

কালিদাসের সেবিত বিগ্রহ বর্তমানে ত্রিবেণীতে সেবিত হচ্ছেন। ঝড়ু ঠাকুরের সেবিত বিগ্রহ শ্রীমদ্ গোপাল ভাদোয়া গ্রামেই সেবিত হচ্ছেন।

**।। জয় শ্রীল কালিদাস ঠাকুর কি জয়।।**
**।। জয় শ্রীল ঝড়ু ঠাকুর কি জয়।।**

## পাঠান বৈষ্ণব—শ্রীবিজলী খাঁন ও রামদাস

বিজলি খাঁন জাতিতে পাঠান মুসলমান হলেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব হয়েছিলেন।

শ্রীবৃন্দাবন ধাম দর্শন করে যমুনা পার হয়ে মহাবনের পথ দিয়ে মহাপ্রভু প্রয়াগের দিকে চলেছেন। পথে এক বৃক্ষ মূলে বসে বিশ্রাম করছিলেন। এমন সময় রাখাল বালকদের বংশী-ধ্বনি শুনে বৃক্ষমূলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন এবং মুখ দিয়ে ফেনা বের হতে লাগল। এমন সময়ে পাঠান সৈন্যগণ সেখানে এল।

বিজলি খাঁন নয়জন পাঠান সৈন্যসহ ঘোড়ায় চড়ে যেতে যেতে দেখলেন, গাছের তলায় এক সন্ন্যাসী মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়ে পড়ে রয়েছেন। তাঁর আশে-পাশে চারজন লোক বসে আছে। বিজলি খাঁন অশ্ব থামিয়ে বিচার করলেন—সন্ন্যাসীর সঙ্গে সোনার মোহর প্রভৃতি ছিল, এ চার ঠগ্ তাঁকে ধুতুরা খাইয়ে তাঁর কাছ থেকে সমস্ত অর্থ-কড়ি লুঠ করেছে। চারজনকে বন্দী করতে বিজলি খাঁন আদেশ করলেন। পাঠান সৈন্যগণ তাঁদের বন্দী করল।

কৃষ্ণদাস রাজপুত বললেন—তোমাদের বাদশার দোহাই। এই সন্ন্যাসী আমাদের গুরু। এঁনার মূর্চ্ছা রোগ আছে। মাঝে মাঝে এনার এরকম অবস্থা হয়। আমরা সঙ্গে থেকে তাঁকে রক্ষা করি। এখনি চৈতন্য লাভ করবেন, তোমরা সব—দেখতে পাবে।

চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৮/১৬৭-১৭৬

অতঃপর কিছুক্ষণ পরে মহাপ্রভু 'হরি' 'হরি' বলে হুঙ্কার করে উঠলেন।

"হুঙ্কার করি উঠে বলে 'হরি' 'হরি'।
প্রেমাবেশে নৃত্য করে ঊর্দ্ধ বাহু করি।।"

চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৮/১৭৭

সেই মধুর 'হরি' 'হরি' ধ্বনি শুনে ম্লেচ্ছগণ

চমৎকৃত হল। ভীত হয়ে ভক্তগণকে সত্বর মুক্ত করে দিল। তারপর বিজলি খাঁন প্রভুকে নমস্কার করে বললেন--যতিবর! এ চার ঠগ্ আপনাকে ধুতুরা খাইয়ে সব হরণ করে নিয়েছে। প্রভু বললেন—আমি সন্ন্যাসী, আমার কোন অর্থ-কড়ি নাই। মৃগী ব্যাধিতে কোন কোন সময় অচৈতন্য হলে এঁরা আমায় রক্ষা করেন।

বিজলি খাঁনের সঙ্গে একজন মৌলবী ছিলেন। তিনি হিন্দু ও ইসলাম শাস্ত্রে পারঙ্গত ছিলেন। তিনি বললেন—আপনাকে পেয়ে আমরা বড় প্রীত হয়েছি। আপনার কাছে কিছু শুনতে চাই। প্রভু বললেন—স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা করুন। মৌলবী বললেন—নির্বিবশেষ-বাদ ও সবিশেষ-বাদ কি? আমাদের শাস্ত্রেও অদ্বৈতবাদের কথা আছে। দুই বাদের তাৎপর্য্য ভাল ভাবে শুনতে ইচ্ছা করি।

মহাপ্রভু বললেন—আপনাদের শাস্ত্রে ঈশ্বরকে নির্বিবশেষ বলেছেন। আবার সবিশেষও বলেছেন। আপনাদের শাস্ত্রে ঈশ্বর এক-তিনি সর্বৈবশ্বর্য্যময়, পূর্ণ। তাঁর অঙ্গকান্তি শ্যামবর্ণ।

''সর্বৈবশ্বর্য্যপূর্ণ তেহোঁ শ্যাম কলেবর।''

চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৮/১৯০

সেই ভগবানের সেবার দ্বারা সংসার বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ হয়। তাঁর চরণ সেবাই বা প্রীতিই পরম পুরুষার্থ।

মহাপ্রভুর মুখে এরূপ তত্ত্বকথা শুনে মৌলবী এবং বিজলি খাঁন পরম সুখী হলেন। মৌলবী প্রভুর চরণ বন্দনা করে বলতে লাগলেন—

সেইত গোসাঞি তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
মোরে কৃপা কর মুঞি অযোগ্য পামর।।
অনেক দেখিনু মুঞি ম্লেচ্ছ শাস্ত্র হৈতে।
সাধ্য-সাধন তত্ত্ব নারি নির্দ্ধারিতে।।
তোমা দেখি জিহ্বা মোর বলে কৃষ্ণ-নাম।
আমি বড় জ্ঞানী এই গেল অভিমান।।
কৃপা করি বল মোরে সাধ্য-সাধনে।
এত বলি পড়ে মহাপ্রভুর চরণে।।
প্রভু কহে—উঠ কৃষ্ণ নাম তুমি লইলা।
কোটী জন্মের পাপ গেল, পবিত্র হৈলা।।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহ কৈলা উপদেশ।
সবে কৃষ্ণ কহে সবার হৈল প্রেমাবেশ।।

—চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৮/২০১-২০৬

পরিশেষে মহাপ্রভু মৌলবী সাহেবের নাম দিলেন রামদাস। এ সমস্ত তত্ত্ব সিদ্ধান্ত শুনে রাজকুমার বিজলি খাঁন কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে প্রভুর চরণে পড়লেন। প্রভু তাঁকে অনেক উপদেশ করলেন। প্রভুর কৃপায় পাঠানগণ বৈষ্ণব হলেন।

''সেইত পাঠান সব বৈরাগী হইলা।।
পাঠান বৈষ্ণব বলি হৈল তাঁর খ্যাতি।
সর্ব্বত্র গাহিয়া বুলে মহাপ্রভুর কীর্ত্তি।।
সেই বিজলি খাঁন হইল মহাভাগবত।
সর্ব্বতীর্থে হৈল তার পরম মহত্ত্ব।।

—চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৮ পরিচ্ছেদ

**।। জয় পাঠান বৈষ্ণব—শ্রীবিজলী খাঁন ও রামদাস কি জয়।।**

# কবি কর্ণপুর (শ্রীপুরী দাস)

শ্রীল কবিকর্ণপুরের জন্ম হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত কাঞ্চনপল্লী গ্রামে (কাঁচড়াপাড়ায়) ১৪৪৮ শকাব্দে, ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে। তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ শ্রীশিবানন্দ সেনের পুত্র। গৌরগণোদ্দেশ দীপিকার ১৭৬নং শ্লোকে তিনি তাঁর পিতৃ-মাতৃ পরিচয় প্রদান করেছেন—

পুরা বৃন্দাবনে বীরাদূতী সর্ব্বাশ্চ গোপিকাঃ।
নিনায় কৃষ্ণনিকটং সেদানীং জনকো মম।
ব্রজে বিন্দুমতী যাসীদদ্য সা জননী মম।।

অর্থাৎ পূর্ব্বে বৃন্দাবনে যিনি গোপীগণকে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি এখন আমার পিতা শ্রীশিবানন্দ সেন হয়েছেন, আর যিনি বিন্দুমতী ছিলেন তিনি আমার জননী হয়েছেন।

শ্রীশিবানন্দ সেনের তিন পুত্র—শ্রীচৈতন্য দাস, শ্রীরামদাস এবং শ্রীপরমানন্দ দাস। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীপাদ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে লিখেছেন—যাঁর পরিবারের সকল সদস্যদেরকে মহাপ্রভু আপন মনে করতেন, এহেন শ্রীশিবানন্দ সেনের সমুদ্রসম সৌভাগ্যের কথা কে বর্ণনা করতে পারে?

শিবানন্দের ভাগ্যসিন্ধু কে পাইবে পার।
যাঁর সব গোষ্ঠীকে প্রভু কহে 'আপনার'।।

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১২/৫১

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পুরীধামে অবস্থানকালে সেবক গোবিন্দকে আদেশ করেছিলেন যে, শিবানন্দ সেনের পত্নী এবং পুত্র যারাই এখানে এসেছে তুমি তাঁদের সকলকে আমার অবশিষ্ট প্রসাদ দেবে।

শিবানন্দের 'প্রকৃতি' পুত্র-যাবৎ এথায়।
আমার অবশেষ-পাত্র তারা যেন পায়।।

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১২/৫৩

শ্রীশিবানন্দ সেন শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার বাহানা করে প্রতিবছর বহু ভক্তদের নিয়ে মহাপ্রভুর দর্শনে যেতেন। একবার যখন শিবানন্দ সেন মহাপ্রভুর কাছে গেলেন, তখন মহাপ্রভু তাঁকে বললেন—

এবার তোমার যেই হইবে কুমার।
'পুরীদাস' বলি নাম ধরিহ ইহার।।

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১২/৪৭

সেই সময় বালক মায়ের গর্ভেই ছিল। যখন শিবানন্দ সেন উড়িষ্যা থেকে ঘরে ফিরে এলেন, তখন শিশুর জন্ম হল।

প্রভু-আজ্ঞায় ধরিলা নাম—'পরমানন্দ-দাস'
'পুরীদাস' করি' প্রভু করেন উপহাস।।

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১২/৪৯

এক বছর পর যখন শ্রীশিবানন্দ সেন তিন পুত্রকে সাথে নিয়ে মহাপ্রভুর কাছে গেলেন তখন—

ছোট পুত্রে দেখি প্রভু নাম পুছিলা।
'পরমানন্দ দাস' নাম সেন জানাইলা।।

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১২/৪৫

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লেখিত উপরোক্ত পয়ারগুলি পড়ার পরে কিছু প্রশ্ন থেকে যায়।

প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে— শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শিবানন্দ সেনকে পুত্রের নাম 'পুরীদাস' রাখতে বলেছিলেন, তাহলে তিনি পুত্রের নাম 'পরমানন্দ দাস' কেন রাখলেন?

দ্বিতীয় প্রশ্ন-শিবানন্দ সেন যদি কোন কারণে পুত্রের নাম 'পরমানন্দ দাস' রেখেও থাকেন। তাহলে শ্রীকবিরাজ গোস্বামী কেন বলছেন যে, শিবানন্দ সেন মহাপ্রভুর আজ্ঞাতেই পুত্রের নাম 'পরমানন্দ দাস' রেখেছেন?





তৃতীয় প্রশ্ন-শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু 'পুরীদাস' বলে বালকের উপহাস কেন করতেন?

এইপ্রশ্নগুলির সমাধান হচ্ছে—শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় প্রভৃতি গ্রন্থে স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে, শ্রীশিবানন্দ সেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু এবং অন্যান্য গৌড়ীয় ভক্তগণের একান্ত প্রিয় ভক্ত ছিলেন। এজন্য শিবানন্দ সেন মহাপ্রভুর আদেশকে লঙ্ঘন করে পুত্রের নাম পরমানন্দ দাস রাখবেন, এটা কখনই সম্ভব হতে পারে না। তবে এটা সত্য যে, যখন মহাপ্রভু তাঁকে পুত্রের নাম 'পুরী দাস' রাখার কথা বলছিলেন, তখন শিবানন্দ সেন মহাপ্রভুর অনুপ্রেরণায় বুঝে নিয়েছিলেন যে মহাপ্রভু তাকে তৃতীয় পুত্রের নাম 'পরমানন্দ দাস' রাখতে বলছেন। এজন্য কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন, মহাপ্রভুর আদেশেই শিবানন্দ সেন পুত্রের নাম রেখেছেন 'পরমানন্দ দাস'।

মহাপ্রভুর অনুপ্রেরণায় শিবানন্দ সেনের তৃতীয় পুত্রের নাম 'পরমানন্দ দাস' রাখার কারণ হচ্ছে—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের শিষ্য শ্রীপাদ পরমানন্দ পুরী গোস্বামীকে গুরু-তুল্য আদর সম্মান করতেন। মহাপ্রভু এবং ওনার পার্ষদগণ কখনই তাঁর নাম ধরতেন না। শুধুমাত্র পুরী গোসাঞি বলতেন। ঐ সময় নীলাচলে 'পুরী গোসাঞি' বলতে সকলেই বুঝে নিতেন যে 'শ্রীপরমানন্দ পুরীর' কথা বলা হচ্ছে। এজন্য শিবানন্দ সেন পুত্রের নাম 'পরমানন্দ দাস' রাখলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও শ্রীপরমানন্দ পুরীর সম্মুখে এই বালককে দেখিয়ে বলেছিলেন—

''স্বামিন্! তব দাসঃ।।''

অর্থাৎ—হে পরমানন্দপুরী প্রভু! এই বালক (শ্রীকবিকর্ণপুর) তোমার দাস। (চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ১০/৫)

৭ বছর বয়সে পরমানন্দ দাসের অদ্ভুত কবিত্ব দেখে মহাপ্রভু তাঁর নাম ''কবি কর্ণপুর'' রেখে ছিলেন। ঘটনাটি হচ্ছে— একবার শিবানন্দ সেন পত্নীকে নিয়ে পুরীতে এলেন। সঙ্গে ছোট পুত্র পরমানন্দকেও এনেছিলেন। শিবানন্দ সেন পুত্রকে সাথে নিয়ে মহাপ্রভুর কাছে এলে, মহাপ্রভু সেই বালককে দেখে স্নেহাবিষ্ট হয়ে 'কৃষ্ণনাম' উচ্চারণ করতে বললেন। মহাপ্রভু বার বার 'কৃষ্ণ কহ' বললেও সেই বালক কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করল না। শিবানন্দ সেনও অনেক চেষ্টা করে পুত্রের মুখে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করাতে পারলেন না।

তখন মহাপ্রভু আশ্চর্য্য হয়ে বললেন—

প্রভু কহে,— আমি নাম জগতে লওয়াইলুঁ।<br>
স্থাবরে-পর্য্যন্ত কৃষ্ণনাম কহাইলুঁ।।<br>
ইহারে নারিলুঁ কৃষ্ণনাম কহাইতে!

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৬/৬৯-৭০

তখন স্বরূপ দামোদর এর কারণ নির্দ্দেশ করে বললেন—''আপনি বালককে কৃষ্ণ নাম মন্ত্র দিয়েছেন। মন্ত্র উচ্চারণ করা নিষেধ বলে সে মনে মনে জপ করছে—এটিই তার মনোকথা বলে আমার মনে হচ্ছে''। একথা শুনে মহাপ্রভু সুখী হলেন। জগৎগুরু প্রভুপাদ তাঁর অনুভাষ্যে লিখেছেন—''শ্রীগুরুদেবের নিকট প্রাপ্ত মন্ত্র অন্যের নিকট প্রকাশ করিলে মন্ত্রের বীর্য্য থাকে না। শ্রীগদাধর পণ্ডিতের আখ্যায়িকায় আমরা পূর্ব্বেই তাহা জানাইয়াছি। এই কারণে পুরী দাস মহাপ্রভুর প্রদত্ত কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করেন নাই।''

একদিন মহাপ্রভু পুরীদাসের মৌন ভঙ্গ করার জন্য বললেন 'পড় পুরীদাস'। অমনি পুরীদাস মৌন ভঙ্গ করে বলতে লাগলেন—

শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষ্ণো রঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম।<br>
বৃন্দাবন-রমনীনাং মণ্ডলমখিলং হরির্জয়তি।।

অর্থাৎ সেই শ্রীহরির জয় হোক। যিনি বৃন্দাবনের রমনীগণের অখিল ভূষণ স্বরূপ। কর্ণযুগলের নীলকমল, চোখের অঞ্জন, বক্ষের মহেন্দ্রমণিদাম সবকিছুই তিনি।

মাত্র ৭ বছরের শিশুর মুখ থেকে এহেন শ্লোক শুনে উপস্থিত সকলেই আশ্চর্য্য হলেন। কোন অধ্যয়ন না করেও এত সুন্দর শ্লোক উচ্চারণ করা মহাপ্রভুর কৃপা ছাড়া সম্ভব নয়।

যদিও পরমানন্দ দাস অর্থাৎ কবি কর্ণপুর মহাপ্রভুর নিকট হতে কৃষ্ণনাম মন্ত্র অনুশীলনের আদেশ পেয়েছিলেন, তথাপি তিনি সামাজিক প্রথা অনুযায়ী অদ্বৈত শাখায় শ্রীনাথ পণ্ডিতের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন।

কবি কর্ণপুর যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাদের মধ্যে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মহাকাব্য, আনন্দ বৃন্দাবন চম্পু, অলঙ্কার কৌস্তুভ, শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক, গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা, বৃহদ্‌গণোদ্দেশ-দীপিকা, আর্য্যশতক, দশমস্কন্ধ শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা, শ্রীচৈতন্য সহস্রনাম ও কেশবাষ্টক উল্লেখযোগ্য। কবিকর্ণপুর ব্রজের গুণচূড়া সখী।

গুণচূড়া সখী হন কবি কর্ণপূর।
কাঁচড়াপাড়ায় বাস চৈত্য শাখা শূর।।
বৃদ্ধ-পদাঙ্গুষ্ঠ প্রভু যাঁর মুখে দিলা।
পুরীদাস নাম বলি শক্তি সঞ্চারিলা।।

বৈষ্ণবাচার দর্পণ

**।। জয় শ্রীল কবি কর্ণপুর গোস্বামী কি জয়।।**

# শ্রীউদ্ধব দাস

শ্রীমান উদ্ধব দাস চন্দ্রের আবেশ অবতার।
‘‘শ্রীমানুদ্ধবদাসোঽপি চন্দ্রাবেশাবতারকঃ।।’’

— গৌঃ গঃ ১১২

ইনি গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শাখায় গণিত হন।
‘‘শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী, আর উদ্ধব দাস।
জিতামিত্র, কাষ্ঠকাটা জগন্নাথ দাস।।

—চৈঃ চঃ আঃ ১২/৮৩

শ্রীরূপ গোস্বামী বৃন্দাবনে থাকতেন। অতি বৃদ্ধ হওয়ায় গোবর্দ্ধনে গিয়ে গোবর্দ্ধনধারী গোপালকে দর্শন করতে অসমর্থ হলে, গোপালদেব কৃপা করে তাকে দর্শন দেওয়ার জন্য ম্লেচ্ছের ভয় দেখানোর ছল করে বল্লভ ভট্টের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীবিঠ্ঠল নাথের গৃহে এসে একমাস অবস্থান করেছিলেন। তখন রূপ গোস্বামী প্রতিদিন উদ্ধব দাসকে নিয়ে গোপালকে দর্শন করতে যেতেন।

‘‘শ্রীউদ্ধবদাস, আর মাধব দুইজন।
শ্রীগোপাল দাস, আর দাস নারায়ণ।।

—চৈঃ চঃ ম ১৮/৫১

শ্রীউদ্ধব দাস শ্রীবন্দাবনে কুটীরে অবস্থান করতেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য ও রাঘব গোস্বামী বৃন্দাবন পরিক্রমার সময় উদ্ধব দাসের ভজন কুটীরে পদার্পন করতেন। তখন উদ্ধব দাস তাঁদের অনেক সেবা করেছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দ প্রভুকে শ্রীজীব গোস্বামী বহুমূল্য গোস্বামীগ্রন্থ প্রদান করেছিলেন। তাঁরা যখন গরুর গাড়িতে করে গ্রন্থগুলি বাংলায় নিয়ে যাচ্ছিলেন,

তখন তাঁদেরকে বিদায় দেওয়ার জন্য যে সমস্ত ভক্তরা গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে শ্রীউদ্ধব দাস অন্যতম।

‘‘শ্রীগোবিন্দ বাণী কৃষ্ণদাস অত্যুদার।
শ্রীউদ্ধব মধ্যে মধ্যে গৌড়ে গতি যার।।’’
ভঃ রঃ ৬/৫১৪

গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে শ্রীউদ্ধব দাস নামে আরও দুইজন বৈষ্ণবের নাম উল্লেখ রয়েছে। (১) একজন নন্দগ্রামে পাবন সরোবরের তটে কুটীরে থেকে ভজন করতেন। ইনি সনাতন গোস্বামীর অনুগত ছিলেন। (২) মুর্শিদাবাদ জেলার টেঞাগ্রাম নিবাসী শ্রীরাধা-মোহন ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা শ্রীউদ্ধব দাস। তাঁর আসল নাম শ্রীকৃষ্ণকান্ত মজুমদার।

**।। জয় শ্রীল উদ্ধব ঠাকুর কি জয়।।**

# শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিত

শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় বর্ণনা আছে--

পুরাসীদ্রঘুনাথস্য যো বশিষ্ঠমুনির্গুরুঃ।
স প্রকাশবিশেষেণ গঙ্গাদাসসুদর্শনৌ।।

পূর্ব্বে যিনি শ্রীরামচন্দ্রের গুরু ‘বশিষ্ঠ’ ছিলেন, প্রকাশভেদে তিনিই ‘গঙ্গাদাস’ ও ‘সুদর্শন’ নামে অভিহিত হয়েছেন।

আচার্য্যঃ শ্রীজগন্নাথো গঙ্গাদাসঃ প্রভুপ্রিয়ঃ।
আসীন্নিধুবনে প্রাগ্ যো দুর্ব্বাসা গোপিকাপ্রিয়ঃ।।

শ্রীজগন্নাথ আচার্য্য এবং মহাপ্রভুর প্রিয়পাত্র শ্রীগঙ্গাদাস, এই দুইজন পূর্ব্বে নিধুবনে গোপীকাপ্রিয় শ্রীদুর্ব্বাসা ছিলেন।

শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিত দ্বাপরে শ্রীসান্দীপনি মুনি ছিলেন। তাঁর কাছে শ্রীরাম ও কৃষ্ণ বিদ্যা অধ্যয়ন করেছিলেন।

‘‘নবদ্বীপে আছে অধ্যাপক-শিরোমণি।
গঙ্গাদাস পণ্ডিত যে হেন সান্দীপনি।।’’
চৈঃ ভাঃ আঃ ৮/২৬

শ্রীগৌরসুন্দরের যজ্ঞোপবীত হয়ে গেল। কিছুদিন গৃহে অধ্যয়ন করলেন। শিশুর বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করবার বিশেষ আগ্রহ দেখে শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে দেওয়ার জন্য শ্রীজগন্নাথ মিশ্র শ্রীনিমাইকে সঙ্গে নিয়ে পণ্ডিতের বাটীতে এলেন।

শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিত শ্রীজগন্নাথ মিশ্রকে দেখে সম্ভ্রমে উঠে আলিঙ্গন করলেন এবং অতি আদরে আসনে বসালেন। শ্রীজগন্নাথ মিশ্র বললেন—এই পুত্র আপনাকে দিলাম। এঁকে আপনি লেখা পড়া শিখাবেন।

শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিত বললেন—অনেক বড় সৌভাগ্য ছাড়া এইরূপ মহাপুরুষ লক্ষণযুক্ত বালককে পড়ান যায় না। আমার যত শক্তি আছে তদনুসারে এঁকে পড়াব। শ্রীজগন্নাথ মিশ্র বালককে শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের হাতে সমর্পণ করে ঘরে ফিরে এলেন।

শিষ্য দেখি পরম আনন্দ গঙ্গাদাস।
পুত্র প্রায় করি রাখিলেন নিজ পাশ।।
চৈঃ ভাঃ আদি ৮/৩২

শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিত দিব্য বালকের অতিমর্ত্ত্য স্বভাবে বুঝতে পারলেন এ-শিশু অসাধারণ। পুত্রের ন্যায় আদর করে শিষ্যকে অধ্যয়ন করাতে লাগলেন। অলৌকিক মেধাবিশিষ্ট বালক শ্রীনিমাই গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট একবার যে সূত্র শুনতেন তা কণ্ঠস্থ করে নিতেন। টোলে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই শীর্ষস্থান অধিকার করলেন।

এই সময় দিব্য বালকের অসাধারণ মেধা এইরূপ প্রকাশিত হয়েছিল যে উপাধ্যায় গঙ্গাদাসের ব্যাখ্যার উপরেও স্বয়ং সুন্দর ব্যাখ্যা সিদ্ধান্ত স্থাপন করতেন। টোলে শত শত শিষ্য তাঁর সঙ্গে তর্ক করে কেউই পারতেন না। ঈশ্বর যখন যে লীলা করেন তাই সর্ব্বোত্তম। শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিত দিব্য বালকের অদ্ভুত বুদ্ধি দেখে শিষ্যদিগের মধ্যে তাঁকে শ্রেষ্ঠ করে দেখতেন।

শ্রীগঙ্গাদাসের শিষ্যগণ মধ্যে শ্রীকমলাকান্ত, মুরারি গুপ্ত ও শ্রীকৃষ্ণানন্দ প্রভৃতি ছাত্র শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁদের শ্রীগৌরসুন্দর নানাবিধ ফাঁকি জিজ্ঞাসা করতেন। গঙ্গার ঘাটে ঘাটে গিয়ে তিনি পড়ুয়াদিগের সঙ্গে নানা তর্ক-বিতর্ক করতেন।

সূত্র ব্যাখ্যাকালে শ্রীগৌরসুন্দর যে সিদ্ধান্ত স্থাপন করতেন তা পুনরায় খণ্ডন করতেন। খণ্ডিত সিদ্ধান্ত আবার সুন্দরভাবে স্থাপন করতেন। তাঁর এই ধরণের প্রতিভা দেখে পড়ুয়াদের বিস্ময় উৎপাদিত হত। শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিত অতিশয় আনন্দ লাভ করতেন।

শ্রীনিমাই কিছু দিন শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট ন্যায় ও অলঙ্কার আদি অভ্যাস করে গুরুদেবের আদেশ নিয়ে স্বয়ং এক ন্যায় বিদ্যালয় আরম্ভ করলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের এই বিদ্যাপীঠ হল মুকুন্দ-সঞ্জয়ের বৃহৎ চণ্ডীমণ্ডপে। শ্রীনিমাই পণ্ডিতের ছাত্র সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগল। অত অল্প বয়সে ন্যায়শাস্ত্রে শ্রীনিমাই পণ্ডিতের অদ্ভুত বুৎপত্তি দেখে সকলে, এমনকি গঙ্গাদাস পণ্ডিত পর্য্যন্ত বিস্মিত হতেন।

হেন মতে শ্রীমুকুন্দ সঞ্জয় মন্দিরে।
বিদ্যারসে বৈকুণ্ঠ নায়ক বিহরে।।

—চৈঃ ভাঃ আদি ১৫/৩২

কিছুদিন এইরূপ বিদ্যাবিলাস করে জননী শচীকে খুব সুখী করলেন। অনন্তর শ্রীগয়া ধামে গমন করলেন। সেখানে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য শ্রীঈশ্বর পুরীর থেকে মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করলেন। দীক্ষা গ্রহণ করবার পর শ্রীগৌরসুন্দর জগতে প্রেমভক্তি প্রকাশ আরম্ভ করলেন। শ্রীগয়াধামে আবশ্যকীয় কর্ম্মাদি করে গৃহে ফিরে এলেন। এবার কৃষ্ণ বর্ণন ভিন্ন কিছু বলেন না, জানেনও না। শিষ্যগণের অনুরোধে যদিও পাঠশালায় পড়াতে বসতেন, প্রতি সূত্রের কেবল কৃষ্ণপর ব্যাখ্যা করতেন।

অগত্যা শিষ্যগণ গুরু গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট শ্রীনিমাই পণ্ডিতের সে সময়ের অবস্থা বর্ণন করলেন। গঙ্গাদাস পণ্ডিত সমস্ত কথা শুনলেন। অপরাহ্নকালে শ্রীগৌরসুন্দর যখন শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতকে বন্দনা করতে এলেন, তখন তিনি স্নেহে আশীর্ব্বাদ করে বলতে লাগলেন—

গুরু বলে—বাপ বিশ্বম্ভর শুন বাক্য।
ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন নহে অল্প ভাগ্য।।

—চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ১/২৭২

তোমার মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী, পিতা শ্রীজগন্নাথ মিশ্র উভয় কুলে কেউ মূর্খ নাই। ন্যায় শাস্ত্রাদির ব্যাখ্যায় তুমিও পরম যোগ্য। অধ্যাপনা ছাড়লে যদি ভক্তি হয়, তোমার বাপ পিতামহ কি অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়েছিলেন? তাঁরা কি ভক্ত ছিলেন না? এ সব চিন্তা করে তুমি অধ্যয়ন কর। ব্রাহ্মণ যদি মূর্খ হয় তবে ভাল মন্দ কেমন করে বিচার করবে? এ সব চিন্তা করে তুমি অধ্যয়ন কর এবং ছাত্রদের

ভালমত পড়াও। আমি দিব্যি করে বলছি তুমি যেন এ বাক্যের অন্যথা কর না।

মহাপ্রভু গুরু গঙ্গাদাস পণ্ডিতের এ সব কথা শুনে বললেন—আপনার শ্রীচরণ-প্রসাদে নবদ্বীপে এমন কেউ নাই যিনি আমার সঙ্গে তর্কে পেরে উঠেন। আমি যে সমস্ত সূত্রের ব্যাখ্যা করব, দেখি নবদ্বীপে কোন্ বড় পণ্ডিত আছেন তা খণ্ডন করতে পারেন? আমি এখনই নগরে গিয়ে পড়াতে আরম্ভ করব। শ্রীগৌরসুন্দরের এই সমস্ত কথা শুনে শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিত সুখী হলেন। মহাপ্রভু গুরুর চরণ ধূলি নিয়ে পড়াতে চললেন—

আর কিবা গঙ্গাদাস পণ্ডিতের সাধ্য।<br>
যার শিষ্য চতুর্দ্দশ ভুবন আরাধ্য।।

শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ১/২৮৭

মহাপ্রভু শ্রীবাস অঙ্গনে সাত প্রহরিয়া মহাভাব প্রকাশ করে যে সমস্ত ভক্তবৃন্দকে কৃপা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন গঙ্গাদাস পণ্ডিত। মহাপ্রভু গঙ্গাদাসকে একটি অতীতের কথা মনে করালেন।

মহাপ্রভু বললেন—তোমার মনে আছে, একবার যবনের ভয়ে তুমি স্ত্রী পরিজন সহ ঘর ছেড়ে খেয়াঘাটে পালিয়ে এসেছিলে। সেসময় ঘাটে মাঝি না থাকায় তুমি বিপদে পড়েছিলে। রাত শেষ হতে চলল, তবু নৌকা এল না। সকাল হলে যবনরা এসে স্ত্রী পরিজনবর্গকে স্পর্শ করে দূষিত করবে এই ভয়ে গঙ্গায় প্রবেশ করে দেহত্যাগ করার সঙ্কল্প করেছিলে। এমন সময় নৌকা নিয়ে এক মাঝি ঘাটে উপস্থিত হয়েছিল। তুমি তার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলে—

'আরে ভাই, আমারে রাখহ এইবার।<br>
জাতি, প্রাণ, ধন, দেহ সকল তোমার।।<br>
রক্ষা কর, পরিকর সঙ্গে কর পার।<br>
এক তঙ্কা, এক জোড়া বখ্‌শীষ তোমার।।

তখন মাঝি তোমাকে পার করে দিয়েছিল। তুমি জান সেই মাঝি কে? আমিই সেই মাঝি তোমাকে পার করার জন্য বৈকুণ্ঠ থেকে এসেছিলাম। একথা শুনে গঙ্গাদাস পণ্ডিত প্রেমে মূর্চ্ছিত হলেন।

যখন মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করে শান্তিপুরে গিয়েছিলেন, তখন যে সকল ভক্তগণ নবদ্বীপ থেকে তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে গঙ্গাদাস পণ্ডিত অন্যতম। তিনি প্রতিবছর মহাপ্রভুকে দর্শন করার জন্য রথযাত্রার সময় পুরীতে যেতেন। রথের সম্মুখে যে সাত সম্প্রদায়ের কীর্ত্তন হত, তার মধ্যে দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের দোহার গায়কগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিত।

গঙ্গাদাস পণ্ডিত-চরণে নমস্কার।<br>
বেদপতি সরস্বতীপতি শিষ্য যাঁর।।<br>
চৈঃ ভাঃ মঃ ১/২৮৩

**।। জয় শ্রীল গঙ্গাদাস পণ্ডিত কি জয়।।**

# শ্রীদামোদর পণ্ডিত

দামোদরপণ্ডিত শাখা প্রেমেতে প্রচণ্ড।
প্রভুর উপরে যেঁহো কৈল বাক্যদণ্ড।।
দণ্ড-কথা কহিব আগে বিস্তার করিয়া।
দণ্ডে তুষ্ট প্রভু তাঁরে পাঠাইলা নদীয়া।।

চৈঃ চঃ আঃ ১০/৩১-৩২

দামোদর পণ্ডিত পূর্বলীলায় প্রখরা শৈব্যা ছিলেন। কোন কারণে সরস্বতী দেবীও তাঁর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছেন।

শৈব্যা যাসীদ্‌ব্রজে চণ্ডী স দামোদর পণ্ডিতঃ।
কুতশ্চিৎ কার্য্যতো দেবী প্রাবিশত্তং সরস্বতী।।

গৌঃ গঃ ১৫৯

দামোদর ও শঙ্কর পণ্ডিত দুই ভাই। শ্রীদামোদর পণ্ডিত সর্বক্ষণ মহাপ্রভুকে শাষণ করতেন। এতে মহাপ্রভু প্রসন্নই হতেন। একদিন মহাপ্রভু নিজমুখেই বলেছিলেন,—

আমি ত'—সন্ন্যাসী, দামোদর-ব্রহ্মচারী।
সদা রহে আমার উপর শিক্ষা-দণ্ড ধরি'।।
ইঁহার আগে আমি না জানি ব্যবহার।
ইঁহারে না ভায় স্বতন্ত্র চরিত্র আমার।।
লোকাপেক্ষা নাহি ইঁহার কৃষ্ণকৃপা হৈতে।
আমি লোকাপেক্ষা কভু না পারি ছাড়িতে।।

চৈঃ চঃ ম ৭/২৫-২৭

সন্ন্যাস গ্রহণের পর, মহাপ্রভু কাটোয়া থেকে শান্তিপুর গিয়েছিলেন অদ্বৈত আচার্য্যের বাড়ি। তিনি তাঁর মাতা মা শচীদেবীকে মায়াপুর থেকে শান্তিপুরে নিয়ে আসার জন্য একজন দূতকে পাঠিয়েছিলেন। সে সময় মহাপ্রভু তাঁর মাতৃদেবীকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ জ্ঞাপন পূর্বক জিজ্ঞাসা করেছিলেন ''মা! আমি ত' এখন সন্ন্যাসী। আমি বৃন্দাবনে যেতে চাই। এতে তোমার মত কি?"। শচীমাতা বললেন, ''বৃন্দাবন অনেক দূর। আমি তোমার কোন সংবাদ পাব না। তাই তুমি জগন্নাথ পুরী ধামে থাক। ভক্তরা প্রায়ই নবদ্বীপ থেকে পুরী ধামে যাতায়াত করে। আমি তাদের মাধ্যমে তোমার সংবাদ পেতে পারব।"

মায়ের আদেশ অনুসারে যখন মহাপ্রভু পুরীধামে থাকতেন, তখন একটি ছোট্ট ছেলে প্রতিদিন তাঁর কাছে যেত। সে এক বিধবা ব্রাহ্মণীর সন্তান। ছেলেটি খুবই সুন্দর নম্র ভদ্র ছিল এবং মহাপ্রভুকে সে খুবই ভালবাসত।

প্রভু-স্থানে নিত্য আইসে, করে নমস্কার।
প্রভু-সনে বাত্ কহে, প্রভু-'প্রাণ' তার।।
প্রভুতে তাহার প্রীতি, প্রভু দয়া করে।
দামোদর তার প্রীতি সহিতে না পারে।।

চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৩/৪-৫

ছেলেটি প্রতিদিন মহাপ্রভুকে প্রণাম করে, প্রভুর খবর নেয়, প্রভুই যেন তার প্রাণ। তাই মহাপ্রভুও তাকে আদর করে। কিন্তু দামোদর পণ্ডিত এসব সহ্য করতে পারে না। সে ছেলেটিকে বার বার নিষেধ করে কিন্তু ছেলেটি মহাপ্রভুকে না দেখলে থাকতে পারে না। দামোদর যতবার নিষেধ করে ছেলেটি ততবার মহাপ্রভুর কাছে আসে। সহ্য করতে না পেরে একদিন মহাপ্রভুকে বলে বসলেন—

অন্যোপদেশে পণ্ডিত কহে গোসাঞির ঠাঞি।
'গোসাঞি' 'গোসাঞি' এবে জানিমু 'গোসাঞি'।।

চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৩/১১

দামোদর অভিমানের স্বরে বললেন, প্রভু! তুমি ত' পর উপদেশে পণ্ডিত। লোকে তোমাকে 'গোসাঞি' বলে। আর গোসাঞির এমন ব্যবহার।

দেখবে কয়েকদিন পর লোকে সমস্ত জায়গায় তোমার বদনাম করবে।

মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করলেন, দামোদর! কি হয়েছে? তুমি এভাবে বলছ কেন?

শুনি' প্রভু কহে,—ক্যা কহ, দামোদর?
দামোদর কহে,—তুমি স্বতন্ত্র 'ঈশ্বর'।।
স্বচ্ছন্দে আচার কর, কে পারে বলিতে?
মুখর জগতের মুখ পার আচ্ছাদিতে।।
পণ্ডিত হঞা মনে কেনে বিচার না কর?
রাণ্ডী-ব্রাহ্মণীর বালকে প্রীতি কেনে কর?।।
যদ্যপি ব্রাহ্মণী সেই তপস্বিনী সতী।
তথাপি তাহার দোষ—সুন্দরী যুবতী।।
তুমিহ—পরম-যুবা, পরম-সুন্দর।
লোকের কাণাকাণি-বাতে দেহ' অবসর।।
এত বলি' দামোদর মৌন হইলা।
অন্তরে সন্তোষ প্রভু হাসি' বিচারিলা।।
ইহারে কহিয়ে শুদ্ধপ্রেমের তরঙ্গ।
দামোদর-সম মোর নাহি 'অন্তরঙ্গ'।।

চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৩/১৩-১৯

দামোদরের কথা শুনে মহাপ্রভু প্রসন্ন হয়ে মনে মনে হাসলেন এবং চিন্তা করলেন, দামোদরের মতো আমার কেউ অন্তরঙ্গ নেই। তাই তাকে আমার মায়ের দেখাশোনার জন্য নবদ্বীপে পাঠাবো। তাই মহাপ্রভু একদিন দামোদরকে বললেন--

প্রভু কহে,—দামোদর, চলহ নদীয়া।
মাতার সমীপে তুমি রহ তাহা যাঞা।।
তোমা বিনা তাঁহার রক্ষক নাহি আন।
আমাকেহ যাতে তুমি কৈলা সাবধান।।
তোমা-সম 'নিরপেক্ষ' নাহি মোর গণে।
'নিরপেক্ষ' নহিলে 'ধর্ম্ম' না যায় রক্ষণে।।
আমা হৈতে যে না হয়, সে তোমা হৈতে হয়।
আমারে করিলা দণ্ড, আন কেবা হয়।।
মাতার গৃহে রহ যাই' মাতার চরণে।
তোমার আগে নাহি কারো স্বচ্ছন্দাচরণে।।
মধ্যে মধ্যে আসিবা কভু আমার দরশনে।
শীঘ্র করি' পুনঃ তাঁহা করহ গমনে।।
মাতারে কহিহ মোর কোটী নমস্কারে।
মোর সুখ-কথা কহি' সুখ দিহ' তাঁরে।।
নিরন্তর নিজ-কথা তোমারে শুনাইতে।
এই লাগি' প্রভু মোরে পাঠাইলা ইহাতে।।
এত কহি' মাতার মনে সন্তোষ জন্মাইহ।
আর গুহ্যকথা তাঁরে স্মরণ করাইহ।।
বারে বারে আসি' আমি তোমার ভবনে।
মিষ্টান্ন ব্যঞ্জন সব করিয়ে ভোজনে।।
ভোজন করিয়ে আমি, তুমি তাহা জান'।
বাহ্য করিতে তাহা স্ফূর্ত্তি করি' মান'।।
এই মাঘ-সংক্রান্ত্যে তুমি রন্ধন করিলা।
নানা ব্যঞ্জন, ক্ষীর, পিঠা, পায়স রান্ধিলা।।
কৃষ্ণে ভোগ লাগাঞা যবে কৈলা ধ্যান।
আমার স্ফূর্ত্তি হৈল, অশ্রু ভরিল-নয়ন।।
আস্তে-ব্যস্তে আমি গিয়া সকলি খাইল।
আমি খাই,—দেখি' তোমার সুখ উপজিল।।
ক্ষণেকে অশ্রু মুছিয়া শূন্য দেখি' পাত।
স্বপ্ন দেখিলু, যেন নিমাঞি খাইল ভাত।।
বাহ্য-বিরহ-দশায় পুনঃ ভ্রান্তি হৈল।
ভোগ না লাগাইলু,—এই জ্ঞান হৈল।।
পাকপাত্রে দেখিলা, সব অন্ন আছে ভরি'।
পুনঃ ভোগ লাগাইলা, স্থান-সংস্কার করি'।।
এইমত বার বার করিয়ে ভোজন।
তোমার শুদ্ধপ্রেমে মোরে করে আকর্ষণ।।
তোমার আজ্ঞাতে আমি আছি নীলাচলে।
নিকটে লঞা যাও আমা তোমার প্রেমবলে।।
এইমত বার বার করাইহ স্মরণ।
মোর নাম লঞা তার বন্দিহ চরণ।।

এত কহি' জগন্নাথের প্রসাদ আনাইলা।
মাতাকে, বৈষ্ণবে দিতে পৃথক্ পৃথক্ দিলা।।
তবে দামোদর চলি' নদীয়া আইলা।
মাতারে মিলিয়া তার চরণে রহিলা।।
আচার্য্যাদি বৈষ্ণবেরে মহাপ্রসাদ দিলা।
প্রভুর যৈছে আজ্ঞা, পণ্ডিত তাহা আচরিলা।।

চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৩/২১-৪৩

দামোদর পণ্ডিতের সামনে ভক্তগণ ভয়ে ভয়ে চলতেন। তাঁর সামনে কেউ সচ্ছন্দ ব্যবহার করতে পারত না। কোন ভক্তের মধ্যে সামান্য মর্যাদা লঙ্ঘন দেখলেও দামোদর বাক্যদণ্ডের দ্বারা মর্যাদা রক্ষা করতেন।

''এই ত' কহিল দামোদরের বাক্যদণ্ড।
যাহার শ্রবণে ভাগে অজ্ঞান পাষণ্ড।।

চৈঃ চঃ অঃ ৩/৪৬

মায়াপুরে শ্রীদামোদর পণ্ডিতের সাথে নরোত্তম ঠাকুরের সাক্ষাৎ হয়েছিল। নরোত্তম ঠাকুর দামোদর পণ্ডিতকে দর্শন করে প্রেমে-আপ্লুত হয়েছিলেন। প্রণাম করেছিলেন।

'তথা দামোদর পণ্ডিতের দরশনে।
হইয়া অধৈর্য্য প্রণমিলা সে চরণে।।

ভঃ রঃ ৮/৯৩

শ্রীদামোদর পণ্ডিত আকুমার ব্রহ্মচারী ছিলেন।

**।। জয় শ্রীল দামোদর পণ্ডিত কি জয়।।**

# শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী (শ্রীনৃসিংহানন্দ)

মহাপ্রভু সন্ন্যাস নিয়ে নীলাচলে চলে গেছেন। ইচ্ছা হল বৃন্দাবনে যাবেন। নবদ্বীপে এলেন। বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে অবস্থান করে কুলিয়া গ্রামে দেবানন্দ পণ্ডিত ও গোপাল চাপালের অপরাধ ভঞ্জন করে রামকেলি গ্রামে পৌঁছলেন। রূপ-সনাতনের সাথে সাক্ষাৎ করে বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী ধ্যানে কুলিয়া থেকে বৃন্দাবন পর্য্যন্ত রত্নদ্বারা পথ নির্মাণ করতে লাগলেন। যাতে মহাপ্রভুর কোন কষ্ট না হয়। কিন্তু যেই মাত্র কানাই নাটশালা পর্যন্ত পৌঁছালেন আর পথ বাঁধতে পারলেন না। ধ্যান ভেঙ্গে গেল। বুঝতে পারলেন মহাপ্রভু কানাই নাটশালা পর্য্যন্ত গিয়ে ফিরে আসবেন, এ বছর আর বৃন্দাবনে যাবেন না। বাস্তবেও তাই হল। মহাপ্রভু নীলাচলে ফিরে গেলেন। দ্রব্যময় সেবার থেকে মানস সেবা শ্রেষ্ঠ্য। পুরাণে দৃষ্টান্ত আছে– প্রতিষ্ঠানপুরের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ মানসসেবার দ্বারা সশরীরে বৈকুণ্ঠ ধামে শ্রীনারায়ণের পাদপদ্ম প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

প্রতিবছর রথযাত্রার সময় গৌড়ের ভক্তগণ পুরীতে মহাপ্রভুর দর্শনে যেতেন। একবার মহাপ্রভু শিবানন্দ সেনের ভাগিনা শ্রীকান্তকে নির্দ্দেশ দিলেন– 'এবার পৌষমাসে তিনি নিজেই গৌড়দেশে যাবেন। তাই কেউ যেন পুরীতে না আসেন।' এই সংবাদটি ভক্তগণকে জানানোর জন্য শ্রীকান্ত গৌড়দেশে এসে ভক্তগণকে সংবাদটি জানালেন। ভক্তগণ আনন্দিত হলেন। কিন্তু পৌষ মাস শেষ





হয়ে গেল, তবুও মহাপ্রভু এলেন না। শিবানন্দ সেন ও জগদানন্দ পণ্ডিত দুঃখী হলেন। এমন সময় শ্রীনৃসিংহানন্দ সেখানে উপস্থিত হলেন। তাঁদের দুঃখের কারণ জানতে পেরে আশ্বাস দিয়ে বললেন, -- তোমরা দুঃখ কর না। আমি তিন দিনের মধ্যে মহাপ্রভুকে এখানে নিয়ে আসব। শ্রীনৃসিংহানন্দের প্রভাব আগে থেকেই জানতেন বলে শিবানন্দ ও জগদানন্দ সেকথা বিশ্বাস করলেন। শ্রীনৃসিংহানন্দ দুই দিন ধ্যানমগ্ন রইলেন। শিবানন্দকে বললেন আগামীকাল মহাপ্রভু আসবেন। তুমি রন্ধনের সামগ্রী দাও। শিবানন্দ আনন্দে সমস্ত বন্দোবস্ত করলেন। নৃসিংহানন্দ নিজ হাতে বহু প্রকার অন্ন-ব্যঞ্জন ও পায়সাদি রন্ধন করে তিনটি আলাদা পারসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীজগন্নাথদেব ও শ্রীনৃসিংহদেবকে ভোগ নিবেদন করলেন।

''দেখে, শীঘ্র আসি, বসিলা চৈতন্য-গোসাঞি।
তিন ভোগ খাইলা, কিছু অবশিষ্ট নাই।।''

চৈঃ চঃ অঃ ২/৬২

মহাপ্রভু একাই তিন জনের প্রসাদ ভোজন করলেন। নৃসিংহানন্দের আনন্দ হল, আবার দুঃখও হল। কারণ তাঁর আরাধ্য শ্রীনৃসিংহদেব উপবাসী রয়েছেন। মহাপ্রভু একাই সব ভোজন করেছেন। জগন্নাথ, নৃসিংহ ও মহাপ্রভুর মধ্যে যে কোন ভেদ নাই, এই তত্ত্বটি জানানোর জন্যই মহাপ্রভু একাই সব ভোজন করলেন। তারপর পানিহাটিতে চলে গেলেন। কিন্তু নৃসিংহানন্দ হা হুতাশ করতে লাগলেন–

শিবানন্দ কহে,–কেনে করহ ফুৎকার?
ব্রহ্মচারী কহে,–দেখ প্রভুর ব্যবহার।।
তিন জনার ভোগ তেঁহো একেলা খাইলা।
জগন্নাথ-নৃসিংহ উপবাসী হইলা।।

চৈঃ চঃ অঃ ২/৭০-৭১

শিবানন্দের মনে সন্দেহ হল। সত্যিই কি মহাপ্রভু এসেছিলেন, নাকি নৃসিংহানন্দ ঢং করছেন। যাইহোক পুনরায় রন্ধনের সামগ্রী দিলেন। নৃসিংহানন্দ পুনরায় রন্ধন করে তার আরাধ্যদেবকে ভোগ দিলেন।

বর্ষার শেষে শিবানন্দ সেন ভক্তগণকে নিয়ে মহাপ্রভুর নিকটে উপস্থিত হলেন। তখন একদিন মহাপ্রভু বলতে লাগলেন–

এক দিন সভাতে প্রভু বাত্ চালাইলা।
নৃসিংহানন্দের গুণ কহিতে লাগিলা।।
গতবর্ষ পৌষে মোরে করাইল ভোজন।
কভু নাহি খাই ঐছে মিষ্টান্ন-ব্যঞ্জন।।
শুনি' ভক্তগণ মনে আশ্চর্য্য মানিল।
শিবানন্দের মনে তবে প্রত্যয় জন্মিল।।

চৈঃ চঃ আঃ ২/৭৬-৭৮

প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারীর মধ্যে নৃসিংহ দেবের আবেশ লক্ষ্য করে মহাপ্রভু তাঁর নাম দিয়েছিলেন– 'শ্রীনৃসিংহানন্দ'।

'শ্রীনৃসিংহ-উপাসক-শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী।
প্রভু তাঁর নাম কৈলা 'শ্রীনৃসিংহানন্দ করি'।।'

চৈঃ চঃ আঃ ১০/৩৫

চলিল প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী মহাশয়।
সাক্ষাৎ নৃসিংহ যাঁর, সঙ্গে কথা কয়।।

চৈঃ ভাঃ অঃ ৮/১২

মহাপ্রভু তিনভাবে জীব উদ্ধার করেছেন। সাক্ষাৎ দর্শন দিয়ে, হঠাৎ কোথাও আবির্ভূত হয়ে এবং যোগ্য ভক্তের মধ্যে আবেশিত হয়ে।

প্রদ্যুম্ন-নৃসিংহানন্দ আগে কৈলা 'আবির্ভাব'।
লোক নিস্তারিব'–এই ঈশ্বর-স্বভাব।।

চৈঃ চঃ অঃ ২/৬

**।। জয় শ্রীল প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী কি জয়।।**





# শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী

শুক্লাম্বরো ব্রহ্মচারী পুরাসীদ্‌যজ্ঞপত্নিকা।
প্রার্থয়িত্বা যদন্নং শ্রীগৌরাঙ্গো ভুক্তবান্ প্রভুঃ।
কেচিদাহুর্ব্রহ্মচারী যাজ্ঞিকব্রাহ্মণঃ পুরা।।

পূর্ব্বে যিনি 'যজ্ঞপত্নী' ছিলেন, তিনিই এখন 'শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী' হয়েছেন। মহাপ্রভু মাঝে মধ্যে এঁনার থেকে অন্ন প্রার্থনা (ভিক্ষা) করে ভোজন করতেন। কেউ-কেউ বলেন, ইনি পূর্ব্বে 'যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ' ছিলেন।।

শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী নবদ্বীপ বাসী ছিলেন। তিনি বাহ্যিক দৃষ্টিতে দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। মহাপ্রভু তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন।

'প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন।।"

চৈঃ চঃ মঃ ২০/৩৭

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পিতার শ্রাদ্ধ করার জন্য গয়ায় গিয়েছিলেন। গয়া থেকে ফিরে এসে ভক্তদের সাথে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে মিলিত হয়েছিলেন।

শ্রীমান্ পণ্ডিত চলিলেন গঙ্গাতীরে।
শুক্লাম্বর-ব্রহ্মচারী–তাহান মন্দিরে।।
শুনিঞা এ-সব কথা প্রভু-গদাধর।
শুক্লাম্বর-গৃহ-প্রতি চলিলা সত্বর।।
'কি আখ্যান কৃষ্ণের কহেন শুনি গিয়া।'
থাকিলেন শুক্লাম্বর-গৃহে লুকাইয়া।।
সদাশিব, মুরারি, শ্রীমান্, শুক্লাম্বর।
মিলিলা সকল যত প্রেম-অনুচর।।
হেনই সময়ে বিশ্বম্ভর দ্বিজরাজ।
আসিয়া মিলিলা হেথা বৈষ্ণবসমাজ।।

চৈঃ ভাঃ মঃ ১/৭৮-৮২

মহাপ্রভু সেখানে অদ্ভুত প্রেম-বিকার প্রদর্শন করেন। তা দেখে গদাধর পণ্ডিত, শ্রীসদাশিব, শ্রীমুরারি শ্রীবাস পণ্ডিত প্রত্যেকেই বিস্মিত হন।

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী প্রতিদিন ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করতেন। এভাবেই তাঁর জীবন নির্বাহ হত। একদিন মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হয়ে বসে আছেন। এমন সময় শুক্লাম্বর কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে মহাপ্রভুর সামনে এসে কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হয়ে নৃত্য করতে লাগলেন। তাঁর ভাব দেখে মহাপ্রভু প্রসন্ন হলেন। তিনি শুক্লাম্বরের গুণকীর্ত্তন করতে করতে অকস্মাৎ তাঁর ঝুলি থেকে এক মুষ্টি চাল নিয়ে চিবাতে শুরু করলেন। চালগুলো খুব ভালো ছিল না। কারণ সেগুলো ভিক্ষার চাল। লোকে ভাল জিনিস ভিক্ষা দেয় না। তাই শুক্লাম্বর অপরাধের ভয়ে ব্যাকুল হয়ে বলতে লাগলেন– 'প্রভু আপনি এ কি করছেন! এই নিকৃষ্ট চাল আপনার ভোজনের যোগ্য নয়।' মহাপ্রভু বললেন,– শুক্লাম্বর! চিন্তা করো না। ভক্তের দ্রব্য আমি এভাবেই গ্রহণ করি। কিন্তু অভক্তের প্রতি দৃষ্টিপাতও করি না।

প্রভু বলে,–"শুন শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী!
তোমার হৃদয়ে আমি সর্ব্বদা বিহরি।।
তোমার ভোজনে হয় আমার ভোজন।
তুমি ভিক্ষায় চলিলে আমার পর্য্যটন।।
প্রেম-ভক্তি বিলাইতে মোর অবতার।
জন্ম জন্ম তুমি প্রেমসেবক আমার।।
তোমারে দিলাম আমি প্রেমভক্তি-দান।
নিশ্চয় জানিহ 'প্রেম-ভক্তি মোর প্রাণ'।।
শুক্লাম্বরের বর শুনি' বৈষ্ণব-মণ্ডল।
জয় জয় হরিধ্বনি করিল সকল।।

চৈঃ ভাঃ মঃ ১৬/১৩৪-১৩৮






একদিন মহাপ্রভু শুক্লাম্বরকে বললেন—

"তোর অন্ন খাইতে আমার ইচ্ছা বড়।
কিছু ভয় না করিহ, বলিলাম দঢ়।।"

চৈঃ ভাঃ মঃ ২৬/২

শুক্লাম্বর বললেন, প্রভু! আমি অত্যন্ত অধম। আমার ভিক্ষার দ্রব্য আপনি কি করে ভোজন করবেন? মহাপ্রভু বললেন,—শুক্লাম্বর তুমি কোন চিন্তা করো না। আমার বড় ইচ্ছা তোমার রান্নাকরা অন্ন ভোজন করব। শুক্লাম্বর খুব চিন্তায় পড়ে গেলেন। ভক্তগণ বললেন,—শুক্লাম্বর! তুমি ভয় পেয়ো না। যিনি ভগবানকে প্রীতি করেন তিনি তাঁর ঘরে মেগে খান। এটিই তাঁর স্বভাব।

বিশেষে যে জন তানে সর্ব্বভাবে ভজে।
সর্ব্বকাল তান অন্ন আপনেই খোঁজে।।
আপনে শূদ্রার পুত্র বিদুরের স্থানে।
অন্ন মাগি' খাইলেন ভক্তির কারণে।।

চৈঃ ভাঃ মঃ ২৬/১০-১১

যদি তুমি নিজেকে অধম মনে করে স্পর্শ না করতে চাও তাহলে আলগেছে (অল্প স্পর্শ করে) রান্না কর। ভক্তগণের কথামত শুক্লাম্বর গৃহে গিয়ে অতি সাবধানে রন্ধন করলেন। মহাপ্রভু ভক্তগণসহ শুক্লাম্বরের গৃহে এলেন। বিষ্ণুকে নিবেদন করে সেই অন্ন স্বয়ং গ্রহণ করতে লাগলেন।

শুক্লাম্বর-প্রতি দেখি' কৃপার বৈভব।
কাঁন্দিতে লাগিল অন্যোহন্যে ভক্ত সব।।
এই মত প্রভু পুনঃ পুনঃ আস্বাদিয়া।
করিলেন ভোজন আনন্দযুক্ত হৈয়া।।
যে প্রসাদ পায়েন ভিক্ষুক শুক্লাম্বর।
দেখুক অভক্ত যত পাপী কোটীশ্বর।।
ধন-জনে পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই।
'ভক্তিরসে বশ প্রভু' সর্ব্বশাস্ত্রে গাই।।

চৈঃ ভাঃ মঃ ২৬/২৮-৩১

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর এই বিষয়ে গৌড়ীয়-ভাষ্যে লিখেছেন,—'**যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু ব্রহ্মার পবিত্র যজ্ঞে ভোজন করিয়া থাকেন। শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী নানা স্থান হইতে ভিক্ষা সংগ্রহ করিতেন। বাহ্যদর্শনে সেই তণ্ডুল স্পর্শদোষাদি বিজড়িত ছিল। ভিক্ষাদ্বারা অনেক সময় অক্ষত তণ্ডুল সংগৃহীত হয় না বলিয়া গৃহস্থগণ ভিক্ষুকের স্পৃষ্টদ্রব্য গ্রহণ করেন না। অক্ষত তণ্ডুল স্পর্শদোষদুষ্ট অপেক্ষা পবিত্র বটে, কিন্তু ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল তদপেক্ষা আরও পবিত্র; যেহেতু উহা ভগবৎকৃপালব্ধ দান মাত্র। আপাতদর্শনে তাহাতে স্পর্শদোষাদির বা মর্য্যাদা-পথের লঙ্ঘন দৃষ্ট হয় বটে; কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের প্রবর্ত্তিত বিচারে মহাপ্রসাদে হৃদয়ের পবিত্রতাই প্রধান প্রয়োজনীয় বিষয়।**

**শতলক্ষ মুদ্রার অধীশ্বর হইলেই যে ভগবানকে ভোজন করান যাইতে পারে, এরূপ নহে। নির্ধন শুক্লাম্বর ভিক্ষাবৃত্তির সঞ্চিত তণ্ডুলের দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন। ভক্তিহীন পাপিসম্প্রদায় এ সকল কথা কিছুই বুঝিতে পারেন না।**'

"হরিষে চলিলা শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী।
যাঁ'র অন্ন মাগি' খাইলেন গৌরহরি।।"

—চৈঃ ভাঃ অ ৮/২৩

"একদিন প্রভু অন্ন মাগি শুক্লাম্বরে।
এই পথে গণসহ গেলা তার ঘরে।।
কি বলিব—এথা মহা-কৌতুক বাড়িল।
ভুঞ্জিলেন প্রভু, শুক্লাম্বর পাক কৈল।।"

—ভক্তিরত্নাকর ১২/৩৪৬৭-৬৮

**।। জয় শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী কি জয়।।**

# শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়ক

মহাপ্রভু ভবানন্দকে বলেছিলেন,–'তুমি পাণ্ডু, পঞ্চপাণ্ডব তোমার নন্দন।'

রামানন্দ রায়, পট্টনায়ক গোপীনাথ।
কলানিধি, সুধানিধি, নায়ক বাণীনাথ।।
এই পঞ্চ পুত্র তোমার–মোর প্রিয়পাত্র।
রামানন্দ সহ মোর দেহ-ভেদ মাত্র।।

চৈঃ চঃ আঃ ১০/১৩৩-১৩৪

শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়ক ভবানন্দ রায়ের দ্বিতীয় পুত্র। তিনি মহাপ্রভুর ঐকান্তিক ভক্ত ছিলেন। ভ্রাতার নাম–শ্রীরামানন্দ রায়, যিনি দক্ষিণ গোদাবরীর রাজ্যপাল ছিলেন।

মহারাজ প্রতাপরুদ্রদেব শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়ককে মালজাঠ্যা দণ্ডপাট নামক স্থানের অধিকারী করেছিলেন। দণ্ডপাটপুরের জন্য গোপীনাথ পট্টনায়ক বছর বছর রাজাকে কর দিতেন। একবার দু লাখ কাহন কড়ি পট্টনায়কের বাকী পড়ে। রাজকুমারগণ পট্টনায়কের নিকট সে কর চাইলে, তিনি কড়ির পরিবর্ত্তে কিছু ঘোড়া দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। রাজকুমারগণ তাতেই রাজি হন।

একদিন রাজকুমারগণ ঘোড়ার মূল্য নির্ণয় করতে এলেন, গোপীনাথ পট্টনায়ক ঘোড়া শালে গিয়ে ঘোড়ার দর দাম করতে লাগলেন। এক রাজকুমার ঘোড়ার মূল্য কমাতে চাইলেন, পট্টনায়ক ক্রুদ্ধ হলেন। রাজকুমারের কথা বলবার সময় গ্রীবা ফিরিয়ে উর্দ্ধদিকে দেখবার একটি স্বভাব ছিল। পট্টনায়ক বললেন–আমার ঘোড়া তোমার মত গ্রীবা ফিরিয়ে ঊর্দ্ধ দিকে তাকায় না। রাজকুমার পট্টনায়কের পরিহাসে খুব রুষ্ট হলেন। গৃহে এসে পট্টনায়কের দুর্ব্যবহারের কথা রাজাকে অতিরঞ্জন করে জানালেন। বিচারে বড়জানা (রাজার বড় পুত্র) গোপীনাথ পট্টনায়ককে চাঙ্গে চড়াবার আদেশ দিলেন। গোপীনাথ পট্টনায়ককে বন্দী করে নিয়ে এলেন। এ সব কথা শুনে ভক্তগণের বড় চিন্তার বিষয় হল।

ভক্তগণ শীঘ্র এসে প্রভুর চরণে নিবেদন করলেন--বড়জানা গোপীনাথকে চাঙ্গ থেকে খড়্গের উপর ফেলে হত্যা করছে।

মহাপ্রভু বললেন–রাজা তাকে শাস্তি দিচ্ছে কেন? ভক্তগণ মহাপ্রভুর কাছে সমস্ত কথা বললেন।

প্রভু বললেন–এতে রাজার কি দোষ? রাজা তাঁর প্রাপ্য অংশ চাচ্ছেন। রাজার ধন গোপীনাথ অযথা খরচ করেছে। রাজার ধন রাজাকে দিতে হবে। বিচার যখন সে করে না তখন তাঁকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। যারা বুদ্ধিমান, তারা আগে রাজার ঋণ শোধ করে, পরে নিজের ব্যয় করে।

এমন সময় আর একজন ভক্ত এসে বললেন–হে প্রভো! গোপীনাথের সঙ্গে বাণীনাথ প্রভৃতিকেও বেঁধে নিয়ে গেছে। প্রভু বললেন–রাজা তাঁর প্রাপ্য নেবেন। তাঁকে আমি কি করব? আমি ত সন্ন্যাসী। যদি তাকে রক্ষা করতে চাও তবে সকলে মিলে শ্রীজগন্নাথের শ্রীচরণে নিবেদন কর। তিনি ঈশ্বর–সর্ব্ব সামর্থ্যবান্। বাণীনাথকে যখন রাজা বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিল তখন সে কি করছিল?

''বাণীনাথ নির্ভয়ে লয় কৃষ্ণ-নাম।
'হরে কৃষ্ণ' 'হরে কৃষ্ণ' কহে অবিশ্রাম।।
সংখ্যা লাগি' দুই-হাতে অঙ্গুলিতে লেখা।
সহস্রাদি পূর্ণ হৈলে, অঙ্গে কাটে রেখা।।"

চৈঃ চঃ অঃ ৫৬-৫৭






ভক্তটির কথা শুনে ভক্তবৎসল প্রভুর চিত্ত দ্রবীভূত হল, বললেন– আমি কি করব? এই বলে লোকটিকে জগন্নাথের কাছে প্রার্থনা করতে পাঠালেন। এমন সময় রাজ পুরোহিত শ্রীকাশীমিশ্র প্রভু স্থানে এলেন। তিনি প্রতিদিন একবার প্রভুর দর্শনে আসতেন। শ্রীকাশীমিশ্র প্রভুর কুশল প্রশ্ন করলেন। প্রভু বললেন–এখানে নানা উপদ্রব, চিত্তে স্বস্তি পাচ্ছি না।

কাশীমিশ্র বললেন–হে প্রভো! কি উপদ্রব বলুন।

প্রভু বললেন–ভবানন্দের পরিবার নানা অসদুপায়ে রাজস্ব লুঠে খাচ্ছে। গোপীনাথ রাজার বহু ধন অপব্যয় করেছে, রাজা এখন সে অর্থ চান। গোপীনাথ কিন্তু দিতে চায় না। তজ্জন্য রাজা তাকে শাস্তি দিচ্ছেন। চারবার লোক এসে আমাকে এ সংবাদ দিল। এখন আমি কি করতে পারি? আমি ত সন্ন্যাসী! এ সব বিষয়কথা বলে লোকে আমায় দুঃখ দিচ্ছে, তাই এখান থেকে চলে গিয়ে কোন নির্জ্জন স্থানে বসে ভজন করতে চাই।

কাশীমিশ্র শীঘ্র উঠে মহাপ্রভুর শ্রীচরণ ধরে বলতে লাগলেন –হে প্রভো! আমি প্রার্থনা করছি তুমি ক্ষেত্র ছেড়ে যেয়ো না। আজ থেকে এরূপ কথা নিয়ে কাউকেও তোমার কাছে আসতে দেব না। যারা তোমার কাছে বিষয় কথা নিয়ে আসে তারা অজ্ঞ। শ্রীকাশী মিশ্র প্রভুর শ্রীচরণে অনেক অনুনয়-বিনয়াদি করে নিজ গৃহে ফিরে এলেন। ঠিক এমন সময় তাঁর কাছে রাজা শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব এলেন এবং দণ্ডবৎ করে গুরু কাশী মিশ্রের পাদ সম্বাহন করতে লাগলেন। যত দিন রাজা পুরুষোত্তমক্ষেত্রে থাকেন ততদিন দিনে একবার করে গুরু স্থানে আসেন।

অতঃপর কাশী মিশ্র ভঙ্গীপূর্ব্বক রাজাকে বলতে লাগলেন–দেব! এক অপূর্ব্ব কথা শুনুন। মহাপ্রভু ক্ষেত্র ছেড়ে আলালনাথ চলে যাচ্ছেন। এ কথা শুনে রাজা দুঃখিত হয়ে বললেন–কেন মহাপ্রভু ক্ষেত্র ছেড়ে চলে যাচ্ছেন? তখন কাশী মিশ্র রাজার কাছে সমস্ত বিবরণ বললেন–

গোপীনাথ পট্টনায়কে চাঙ্গে চড়াইলা।
তার সেবক আসি প্রভুরে কহিলা।।
শুনিয়া ক্ষোভিত হৈল মহাপ্রভুর মন।
ক্রোধে গোপীনাথে কৈল বহুত ভর্ৎসন।।
অজিতেন্দ্রিয় হঞা করে রাজ বিষয়।
নানা অসৎ পথে করে রাজ দ্রব্য ব্যয়।।

✻ ✻ ✻ ✻

রাজ কড়ি না দেয় আমারে ফুকারে।
এই মহাদুঃখ ইহা কে সহিতে পারে।।
আলাল যাই তাঁহা নিশ্চিন্তে রহিমু।
বিষয়ীর ভাল-মন্দ বার্ত্তা না শুনিমু।।
এত শুনি কহে রাজা পাঞা মনে ব্যথা।
সব দ্রব্য ছাড়ো যদি প্রভু রহেন এথা।।
এককক্ষণ প্রভুর যদি পাইয়ে দরশন।
কোটি চিন্তামণি লাভ নহে তার সম।।
কোন ছার পদার্থ এই দুই লক্ষ কাহন।
প্রাণ রাজ্য করোঁ প্রভু পদে নির্মঞ্ছন।।

চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৯/৮৬-৯৬

রাজার এ সমস্ত কথা শুনে কাশী মিশ্র বললেন তুমি কড়ি ছেড়ে দিবে প্রভুর এ ইচ্ছা নয়। তিনি তাদের দুঃখ সইতে পারেন না।

রাজা বললেন–আমি ত গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়ায়ে খড়্গো কাটবার ব্যাপার কিছুই জানি না। সে পুরুষোত্তম জানাকে পরিহাস করেছিল, তাই সে মিথ্যা ভয় দেখিয়েছে। আপনি শীঘ্র প্রভুর কাছে যান এবং প্রভুকে রাখবার যত্ন করুন। আমি গোপীনাথের যাবতীয় বাকী কড়ি ছেড়ে দিলাম।

কাশী মিশ্র বললেন—এতে প্রভু সুখী হবেন না। রাজা বললেন—তবে আপনি বলবেন—''ভবানন্দ রায় রাজার পূজ্য মান্য পাত্র, তাঁর প্রতি ও তাঁর পুত্রগণের প্রতি রাজা সহজেই প্রীতি করে থাকেন।''

রাজা এ সব কথা বলে গৃহে এলেন এবং পুরুষোত্তম জানাকে ডেকে গোপীনাথের কড়ি ছাড়বার কথা বলে দিলেন। পুরুষোত্তম জানা শীঘ্র এসে গোপীনাথ পট্টনায়ককে বন্ধন থেকে মুক্ত করে দিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র গোপীনাথকে ডেকে বললেন—

রাজা কহে ''সব কৌড়ি তোমারে ছাড়িলুঁ।
সেই মালজাঠ্যা-পাট তোমারে ত দিলুঁ।।
আর বার ঐছে না খাইহ রাজ ধন।
আজি হৈতে দিলুঁ তোমায় দ্বিগুণ বর্ত্তন।।''
এত বলি, 'নেতধটী' তারে পরাইল।
প্রভু-আজ্ঞা লঞা যাহ, বিদায় তোমা দিল।।''

—চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৯/১০৫-১০৭

ওথা কাশীমিশ্র আসি প্রভুর চরণে
রাজার চরিত্র সব কৈলা নিবেদনে।।
প্রভু কহে,—''কাশীমিশ্র, কি তুমি করিলা?
রাজ প্রতিগ্রহ তুমি আমা করাইলা?''
মিশ্র কহে,—'শুন' প্রভু রাজার বচনে।
অকপটে রাজা এই কৈল নিবেদনে।।

—চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৯/১১৬-১১৮

রাজার বিনয় ব্যবহার শুনে প্রভু পরিতুষ্ট হলেন। এ সময় শ্রীভবানন্দ রায় পাঁচ পুত্র সঙ্গে প্রভুর কাছে এলেন এবং প্রভুর শ্রীচরণে পড়ে বলতে লাগলেন—

তোমার কিঙ্কর এই সব মোর কূল।
এ বিপদে রাখি প্রভু, পুনঃ নিলা মূল।।
ভক্ত-বাৎসল্য এবে প্রকট করিলা।
পূর্ব্বে যেন পঞ্চপাণ্ডবে বিপদে তারিলা।।
নেতধটী মাথে গোপীনাথ চরণে পড়িল।
রাজার কৃপা বৃত্তান্ত সকল কহিল।।
বাকী কৌড়ি বাদ আর দ্বিগুণ বর্ত্তন কৈলা।
পুনঃ বিষয় দিয়া নেতধটী পরাইলা।।
কাঁহা চাঙ্গের উপর সেই মরণ প্রমাদ।
কাহা নেতধটী পুনঃ—এ সব প্রসাদ।।
চাঙ্গের উপর তোমার চরণ ধ্যান কৈলু।
চরণ স্মরণ প্রভাবে এই ফল পাইলু।।
লোকে চমৎকার মোর এ সব দেখিয়া।
প্রশংসে তোমার কৃপা মহিমা গাঞা।।
কিন্তু তোমার স্মরণের নহে এ মুখ্য ফল।
'ফলাভাস' এই,—যাতে বিষয় চঞ্চল।।
রামরায়ে বাণীনাথে কৈলা নির্ব্বিষয়।
সেই কৃপা আমাতে নাহি যাতে ঐছে হয়।।
শুদ্ধ কৃপা কর গোসাঞি ঘুচাহ বিষয়।
নির্ব্বিন্ন হইনু মোতে বিষয় না হয়।।

চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৯/১৩০-১৩৯

গোপীনাথের কথা শুনে প্রভু বললেন—তুমি যদি সন্ন্যাসী হও তোমার কুটুম্বগণের ভরণ-পোষণ কে করবে? তুমি বিষয় ভোগ কর কিংবা বিরক্ত হও, জন্মে জন্মে তোমরা পঞ্চ ভাই আমার নিজ দাস। কিন্তু আমার একটি আজ্ঞা পালন কর, রাজার মূলধন কখনও ব্যয় করো না। রাজার প্রাপ্য ভাগ দিয়ে যে অর্থ পাবে তা ধর্ম-কর্মাদিতে ব্যয় করবে। প্রভু একথা বলে সবাইকে আলিঙ্গন করে বিদায় করলেন।

সবায় আলিঙ্গিয়া বিদায় যবে দিলা।
হরিধ্বনি করি সব ভক্ত উঠি গেলা।।

চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৯/১৪৬

**।। জয় শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়ক কি জয়।।**




# শ্রীসদাশিব দাস

শ্রীসদাশিব পণ্ডিত শ্রীচৈতন্য শাখায় গণিত হন। তিনি নবদ্বীপবাসী। মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তনলীলায় তিনি অন্যতম পার্ষদ ছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নবদ্বীপে এলে, তাঁর ঘরে অবস্থান করেছিলেন।

''সদাশিব পণ্ডিত যাঁর প্রভুপদে আশ।
প্রথমেই নিত্যানন্দের যাঁর ঘরে বাস।।''

—চৈঃ চঃ আঃ ১০/৩৪

নবদ্বীপে মহাপ্রভুর জলক্রীড়ার সময় শ্রীসদাশিব অন্যতম সঙ্গী ছিলেন। মহাপ্রভু গয়া থেকে ফিরে এসে অলৌকিক প্রেমবিকার প্রকট করলে সদাশিব তা দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। ভগবান একমাত্র ভক্তিতেই বশ। তিনি অন্য কোন জাগতিক গুণের দ্বারা বশীভূত হন না। এই শিক্ষাটি দেওয়ার জন্য মহাপ্রভু শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীকে কৃপা করেছিলেন—তার ভিক্ষালব্ধ ক্ষুদযুক্ত চাল গ্রহণ করেছিলেন। সে সময় মহাপ্রভু সদাশিব আদি ভক্তগণকে শুক্লাম্বরের গৃহে মিলিত হওয়ার জন্য আদেশ করেছিলেন—

কালি সবে শুক্লাম্বর-ব্রহ্মচারি-ঘরে।
তুমি আর সদাশিব আসিহ সত্বরে।।

চৈঃ ভাঃ মঃ ১/৪০

সদাশিব, মুরারি, শ্রীমান্, শুক্লাম্বর।
মিলিলা সকল যত প্রেম-অনুচর।।

চৈঃ ভাঃ মঃ ১/৮১

শ্রীসদাশিব পণ্ডিত যে মহাপ্রভুর কত প্রিয় ভক্ত ছিলেন, তা তাঁর কথাতেই বোঝা যায়। তিনি সদাশিবের নিকট নিজ হৃদয়ের দুঃখ নিবেদন করে সুখ লাভ করতেন।

তুমি আর সদাশিব পণ্ডিত-মুরারি।
তোমা'-সবা' স্থানে দুঃখ করিব গোহারি।।

চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ১/৭০

একবার মহাপ্রভু চন্দ্রশেখর আচার্যের ভবনে ব্রজলীলার অভিনয় করেছিলেন। সেই অভিনয়ের সাজ-সজ্জা প্রস্তুত করার দায়িত্ব ছিল শ্রীসদাশিব ও বুদ্ধিমন্ত খানের।

সদাশিব বুদ্ধিমন্ত খানেরে ডাকিয়া।
বলিলেন প্রভু,—''কাচ সজ্জ কর গিয়া।।

চৈঃ ভাঃ মঃ ১৮/৭

আজ্ঞা শিরে করি' সদাশিব বুদ্ধিমন্ত।
গৃহে চলিলেন, আনন্দের নাহি অন্ত।।

চৈঃ ভাঃ মঃ ১৮/১৪

'সদাশিব, বুদ্ধিমন্ত খান দুইজনে।
নানা বেশ-দ্রব্য সজ্জ কৈল এইখানে।।
লক্ষ্মী আদি কাচে নাচিবেন গৌররায়।
হইবে কীর্ত্তন— যাতে জগত মাতায়।।
ভক্তি রত্নাকর

**।। জয় শ্রীসদাশিব দাস কি জয়।।**





# বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য

ভগবান্ শ্রীগৌরহরির প্রিয় পার্ষদ ছিলেন শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।

'ভট্টাচার্য্যঃ সার্ব্বভৌমঃ পুরাসীদ্‌গীষ্পতির্দিবি।।"

– গৌঃ গঃ ১১৯

পূর্বে যিনি দেবগুরু বৃহস্পতি ছিলেন, তিনিই এখন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য হয়েছেন।

বর্ত্তমান নবদ্বীপ বা চাঁপাহাটি থেকে–আড়াই মাইল দূরে বিদ্যানগর নামক প্রসিদ্ধ পল্লীতে তাঁর জন্ম। পিতার নাম মহেশ্বর বিশারদ। ভ্রাতার নাম বিদ্যা বাচস্পতি। বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ছিলেন ভারতের সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িক। তিনি মিথিলায় গিয়ে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তদানীন্তর বিখ্যাত নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্র ছিলেন তাঁর গুরু। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ন্যায় বিদ্যা সমাপ্ত করে যখন বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেছিলেন, ন্যায়ের কোন গ্রন্থ তিনি সঙ্গে আনতে পারেন নাই। তাই ভট্টাচার্য্য মহাশয় সমগ্র ন্যায় গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করে বঙ্গদেশে নবদ্বীপ নগরে ফিরে এলেন। নবদ্বীপে নব্য ন্যায়-শাস্ত্রের এক বিদ্যাপীঠ স্থাপন করলেন। অগণিত ছাত্রকে ন্যায় বিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগলেন। অল্পদিনের মধ্যে নবদ্বীপ নগর ন্যায় বিদ্যা শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র হল। তখনকার প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি ছিলেন সার্ব্বভৌম পণ্ডিতের ছাত্র। শিরোমণির ন্যায়ের টীকার নাম "দীধিতি–"। এর জন্যই শ্রীগৌরসুন্দর নিজের লিখিত ন্যায়শাস্ত্রের টীকা গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শঙ্কর বেদান্তেরও অত্যদ্ভুত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বহু ছাত্রকে অদ্বৈত বেদান্ত অধ্যয়ন করাতেন। উৎকলাধিপতি গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্রের বিশেষ আগ্রহে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীজগন্নাথ পুরীধামে গিয়ে শঙ্কর বেদান্ত অধ্যাপনা করতেন।

ভগবান শ্রীগৌরহরি সন্ন্যাস-গ্রহণের পর কয়েকজন ভক্তসহ পুরী অভিমুখে যাত্রা করলেন। ক্রমে রেমুনা, কটক, সাক্ষী-গোপাল ও ভুবনেশ্বর হয়ে আঠার-নালায় এলেন। সেখান থেকে ভঙ্গি করে ভক্তগণের সঙ্গ ছেড়ে তিনি একাকী জগন্নাথ ধামে এলেন এবং শ্রীজগন্নাথ দর্শনে চললেন। শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করে দূর থেকে জগন্নাথদেবের দর্শন করেই প্রেমাবেশে অচৈতন্য হয়ে ভূতলে পড়লেন। দৈবক্রমে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য সেখানে ছিলেন। পড়িছাগণ (পাহারাদারগণ) ছুটে এল কিন্তু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুর অঙ্গ স্পর্শ করতে তাঁদের নিষেধ করলেন।

প্রভুর সৌন্দর্য্য আর প্রেমের বিকার।
দেখি সার্ব্বভৌম হইলা বিস্মিত অপার।।

–চৈঃ চঃ মধ্য ৬/৬

বহুক্ষণ অপেক্ষা করা সত্ত্বেও প্রভুর চৈতন্য হল না। এদিকে মন্দিরে ভোগের সময় হল। তখন শিষ্যবর্গ ও পড়িছাদের সাহায্যে সার্ব্বভৌম পণ্ডিত প্রভুকে নিজ গৃহে নিয়ে এক পবিত্র-স্থানে শায়িত করে রাখলেন। নাসারন্ধ্রের কাছে তুলা ধরে দেখলেন তিনি জীবিত। তারপর ভট্টাচার্য্য বিচার করলেন– "এঁনার শরীরে যে ভাব দেখছি তা সাধারণ জীবে থাক্‌তে পারে না। এই সুদীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব নিত্যসিদ্ধ ভক্তগণেরই হয়ে থাকে।

অধিরূঢ় মহাভাব যার থাকে তারই এই রকম ভাবের উদয় হয়।"

মহাপ্রভুর সঙ্গে যে ভক্তগণ ছিলেন তাঁরা এর






মধ্যে জগন্নাথ মন্দিরে এলেন এবং জানতে পারলেন যে মহাপ্রভু জগন্নাথ দর্শন করে প্রেমে মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হলে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাঁকে নিজগৃহে নিয়ে গিয়েছেন। ভক্তগণ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে সঙ্গে নিয়ে সার্ব্বভৌম গৃহে এলেন এবং দেখলেন যে তখনও মহাপ্রভু প্রেমে অচৈতন্য অবস্থায় আছেন। তখন সকলে উচ্চ সংকীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। এবার মহাপ্রভুর চৈতন্য ফিরে এল। ''হরি হরি'' ধ্বনি করে তিনি হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন। তখন সকলে মিলে মহা-সংকীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। তারপর সকলে বিশ্রাম করলেন। শ্রীসার্ব্বভৌম পণ্ডিত শ্রীমহাপ্রভু এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পদধূলি গ্রহণ করলেন ও মধ্যাহ্ন-ভোজন করবার জন্য নিবেদন জানালেন। গোপীনাথ আচার্য্য সার্ব্বভৌম পণ্ডিতকে মহাপ্রভুর সমস্ত পরিচয় জানালেন। গোপীনাথ আচার্য্য ছিলেন মহাপ্রভুর পরম ভক্ত এবং শ্রীসার্ব্বভৌমের ভগ্নীপতি। ভক্তগণকে নিয়ে মহাপ্রভু সমুদ্র স্নান করে এলেন। ইতিমধ্যে সার্ব্বভৌম পণ্ডিত শ্রীজগন্নাথ মন্দির থেকে প্রচুর প্রসাদ আনালেন এবং সেই প্রসাদ দ্বারা মহাপ্রভু ও ভক্তগণের যথাযোগ্য সৎকার করালেন। শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ বড় সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন—

বহুত প্রসাদ সার্ব্বভৌম আনাইল।
তবে মহাপ্রভু সুখে ভোজন করিল।।
সুবর্ণ থালাতে অন্ন উত্তম ব্যঞ্জন।
ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু করেন ভোজন।।
সার্ব্বভৌম পরিবেশন করেন আপনে।
প্রভু কহে মোরে দেহ লাফ্‌রা ব্যঞ্জনে।।
পীঠাপানা দেহ তুমি ইহাঁ সবাকারে।
তবে ভট্টাচার্য্য কহে জুড়ি দুই করে।।
জগন্নাথ কৈছে করিয়াছেন ভোজন।
আজি সব মহাপ্রসাদ কর আস্বাদন।।
এত বলি পীঠাপানা সব খাওয়াইলা।
ভিক্ষা করাঞা আচমন করাইলা।।

—চৈঃ চঃ মধ্য ৬/৪১-৪৬

মহাপ্রভুর বিশ্রামের জন্য সার্ব্বভৌম একটি ছোট ঘরের ব্যবস্থা করলেন। সেখানে মহাপ্রভু কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলেন। তারপর সার্ব্বভৌম পণ্ডিত গোপীনাথ আচার্য্যকে সঙ্গে নিয়ে প্রভুর কাছে এলেন। সার্ব্বভৌম পণ্ডিত মহাপ্রভুকে ''নমো নারায়ণায়'' বলে নমস্কার করলেন। মহাপ্রভু ''কৃষ্ণে মতি রহু'' বলে আশীর্ব্বাদ করলেন। সার্ব্বভৌম পণ্ডিত তখন বুঝতে পারলেন ইনি বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী। গোপীনাথ আচার্য্যের কাছে সার্ব্বভৌম মহাপ্রভু সম্বন্ধে সবকিছু আগেই জেনেছিলেন। মহাপ্রভু নদীয়ার লোক বলে সার্ব্বভৌম তাঁকে খুব যত্ন করতে লাগলেন।

একদিন মহাপ্রভু নিভৃতে সার্ব্বভৌমকে বললেন—''আমি বালক সন্ন্যাসী, ভাল মন্দ কিছুই বুঝি না। আপনার আশ্রয় নিলাম। আপনি আমার গুরু-স্বরূপ, আপনার সঙ্গ লাভের জন্যই এখানে এসেছি। আপনি আমায় সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করবেন।'' ঈশ্বরের মায়া কাটিয়ে উঠা বড় কঠিন। এই মনোহর বাক্য শুনে সার্ব্বভৌম মোহিত হলেন। তিনি বলতে লাগলেন—''তুমি অতি অল্প বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করে ভুল করেছ। তোমার যে ভক্তি যোগ দেখছি তাতে সন্ন্যাসে কি করবে? তবে আমি সর্ব্বতোভাবে তোমাকে রক্ষা করব এবং বেদান্ত শ্রবণ করাব।'' প্রভুর মায়ায় মুগ্ধ সার্ব্বভৌম তাঁকে বেদান্ত শ্রবণ করাতে লাগলেন। ক্রমান্বয়ে সাতদিন বেদান্ত ব্যাখ্যা করবার পর অষ্টম দিনে সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন—''তুমি সাতদিন বেদান্ত শ্রবণ করেছ—কিন্তু—ভাল মন্দ কিছুই বলছ না। বুঝতে পারছ কি না তাও জানতে পারছি না।'' মহাপ্রভু বিনীতভাবে উত্তর দিলেন—''আমি মূর্খ,

আমার পড়াশুনা মোটেই নাই। আপনার আদেশ মত বেদান্ত শুনেছি বটে, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না।” সার্ব্বভৌম বললেন—‘‘না যদি বুঝতে পার, জিজ্ঞাসা করবে ত?” মহাপ্রভু বললেন—‘‘আপনি তো জিজ্ঞাসা করতে বলেন নাই। সন্ন্যাস ধর্ম্ম রক্ষা করবার জন্য বেদান্ত শুনতে বলেছেন। তাই আমি শুনেছি।” তখন সার্ব্বভৌম বললেন—‘‘তোমার মনের গভীর ভাব আমি কিছু বুঝতে পারছি না। তুমি মৌন হয়ে শুধু শুনছ।” মহাপ্রভু মৃদু হাস্য করে বললেন—‘‘আমি ত’ বেদান্ত সূত্রের অর্থ ভালই বুঝতে পারছি, কিন্তু আপনার ব্যাখ্যা শুনে আমার মন বিকল হয়ে যাচ্ছে। যেমন স্বপ্রকাশিত সূর্য্যকে মেঘ আচ্ছাদিত করে সেরূপ আপনার ব্যাখ্যা যেন স্বতঃ প্রকাশিত অর্থটিকে আচ্ছাদিত করে রাখছে। আপনি মুখ্য অর্থটি বলছেন না, কল্পনাজাত অর্থের দ্বারা মূল সূত্রটিকে আবৃত করছেন মাত্র।” সার্ব্বভৌম বললেন—‘‘আমি ত’ শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য ব্যাখ্যা করে বলেছি।” মহাপ্রভু বললেন--‘‘শঙ্করাচার্য্য যে ভাষ্য করেছেন তা মায়াবাদ ভাষ্য। তাতে সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের শক্তি লোপ পেয়েছে। শ্রুতি উপনিষদের মুখ্য অর্থ ছেড়ে দিয়ে কতকগুলি কল্পনাজনক অর্থ করেছেন।”

প্রণব যে মহাবাক্য—ঈশ্বরের মূর্ত্তি।
প্রণব হৈতে সর্ব্ববেদ জগতে উৎপত্তি।।

—চৈঃ চঃ মধ্য ৬/১৭৪

অনাদিসিদ্ধ বেদশাস্ত্রে প্রণবকে মহাবাক্য বলা হয়েছে। শ্রীশঙ্করাচার্য্য বেদের একদেশসূচক বাক্য ‘‘তত্ত্বমসি” কে মহাবাক্যরূপে কল্পনা করেছেন। ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ, আচার্য্য শঙ্কর সে বিগ্রহকে সত্ত্বগুণের বিকার বলেছেন। শ্রুতির ভগবদ্-স্বরূপের ‘‘এক অদ্বিতীয়” শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি তার সমস্ত শক্তিকে মায়া মিথ্যা বলেছেন। কিন্তু ঈশ্বর অচিন্ত্যশক্তি সম্পন্ন—তিনি যুগপৎ বহু শক্তি প্রকট করে বিহার করতে পারেন। তাতে তাঁর বিরাটত্বের হানি হয় না। খনি বহু সুবর্ণ প্রসব করলেও স্বরূপে সমান থাকে। একটি দীপ থেকে বহু দীপ জ্বালালেও মূল দীপ সমান থাকে। তদ্রূপ ভগবান্ বহু শক্তি যুগপৎ প্রকাশ করলেও মূল স্বরূপের কোন হানি হয় না। অতএব পরিণামবাদ অর্থাৎ শক্তিবাদ ব্যাস সূত্রের অনুমোদিত সিদ্ধান্ত। শঙ্করাচার্য্য সে পরিণামবাদ বা শক্তিবাদকে মিথ্যা মায়া বলে কল্পনা করেছেন। ব্রহ্ম শব্দের মুখ্য অর্থ ভগবান্—তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ। শঙ্করাচার্য্য তা না বলে ব্রহ্ম নির্ব্বিকার, নিরাকার বলে কল্পনা করেছেন। এইভাবে ব্যাসদেবের বাস্তব সিদ্ধান্তটিকে অবজ্ঞা করে তিনি বেদান্ত শাস্ত্রের কাল্পনিক অর্থ করেছেন। তবে এটি শঙ্করাচার্য্যের দোষ নহে। তিনি সাক্ষাৎ শঙ্কর। তিনি ভগবানের আদেশে অসুরগণকে বিমোহিত করবার জন্য ধরাতলে শঙ্করাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং কল্পিত ভাষ্য রচনা করেছিলেন—এই কথা পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে আছে।

স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা।।
মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তিনা।।

চৈঃ চঃ মঃ ৬/১৮১-১৮২

মহাপ্রভুর মুখে এইসব কথা শুনে সার্ব্বভৌম স্তব্ধ হয়ে গেলেন। আর কিছু বলতে সাহস করলেন না। তখন মহাপ্রভু বললেন—‘‘ভট্টাচার্য্য! আপনি বিস্ময়ান্বিত হবেন না। ভগবানে ভক্তি পরম পুরুষার্থ। মুক্ত আত্মারাম পুরুষগণও এ ভক্তিযোগে ঈশ্বরের ভজন করে থাকেন। এর প্রমাণস্বরূপ ভাগবতে ‘‘আত্মা-রাম” শ্লোকে শ্রীশুকদেব গোস্বামী

বলেছেন। শ্রীমদ্ শুকদেব পূর্ব্বে মহাজ্ঞানী ছিলেন। পরে ভক্তিযোগে ভগবদ্ উপাসনা করেছিলেন—যথা ভাগবত-কীর্ত্তন।"

অতঃপর মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমকে ''আত্মারাম" শ্লোক ব্যাখ্যা করতে বললেন। ভট্টাচার্য্য ত্রয়োদশ প্রকার ব্যাখ্যা করে বললেন, আমি যতটুকু জানি বললাম। মহাপ্রভু সেই শ্লোকের আঠার প্রকার ব্যাখ্যা করলেন। কিন্তু তাঁর এত প্রকারের ব্যাখ্যার মধ্যেও সার্ব্বভৌমের কোন ব্যাখ্যার একটি শব্দ পর্যন্ত ছিল না। এবার সার্ব্বভৌম বিস্ময়ে হতবম্ব হয়ে মনে মনে বলতে লাগলেন—

ইঁহো সাক্ষাৎ কৃষ্ণ—মুঞি না জানিয়া।
মহা অপরাধ কৈনু গর্ব্বিত হঞা।।

—চৈঃ চঃ মধ্য ৬/২০০

অতঃপর তিনি মহাপ্রভুর চরণ তলে লুটিয়ে পড়লেন এবং অতি দৈন্যের সঙ্গে ক্ষমা চাইতে লাগলেন। তখন শ্রীগৌর-সুন্দরের হৃদয় গলে গেল এবং তাঁকে কৃপা করবার ইচ্ছা হল। তিনি সার্ব্বভৌমকে ষড়ভুজ মূর্ত্তি দেখালেন। ত্রেতাযুগে রাম, দ্বাপরে কৃষ্ণ, কলিতে দণ্ড-কমণ্ডলুধারী সন্ন্যাসী গৌরাঙ্গ। সার্ব্বভৌমের সমস্ত সংশয় দূর হল। প্রভুর কৃপায় তাঁর সমস্ত তত্ত্ব বিকাশ প্রাপ্ত হল। তৎক্ষণাৎ শত শ্লোকে প্রভুর স্তবগান করলেন—এই স্তবমালাটির নাম হল ''সার্ব্বভৌম শতক"। তার মধ্যে দুটি শ্লোক—

বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে।।

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ।।

''শুনি সুখে প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন।
ভট্টাচার্য্য প্রেমাবেশে হৈল অচেতন।।
অশ্রু, স্তম্ভ, পুলক, স্বেদ কম্প থরহরি।
নাচে গায় কান্দে পড়ে প্রভু পদ ধরি।।

* * *

জগৎ নিস্তারিলে তুমি সেহ অল্পকার্য্য।
আমা উদ্ধারিলে তুমি এ শক্তি আশ্চর্য্য।।
তর্কশাস্ত্রে জড় আমি যৈছে লৌহ পিণ্ড।
আমা দ্রবাইলে তুমি প্রতাপ প্রচণ্ড।।

—চৈঃ চঃ মধ্য ৬/২১৪

তিনি যে মহাপ্রভুকে শিশুজ্ঞান করে বেদান্ত শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন এবং তাঁকে রক্ষা করবার কথা বলেছিলেন এসব কথা স্মরণ করে সার্ব্বভৌম বড় লজ্জিত ও অনুতপ্ত হতে লাগলেন। অন্তর্য্যামী প্রভু সব জানতে পেরে তাঁকে বললেন— ''ভট্টাচার্য্য, তুমি মুগ্ধ হয়ো না। যোগিগণের ঈশ্বর শিবও আমার মায়ায় স্থির থাকতে পারেন না।" সার্ব্বভৌম প্রভুর পরিকরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন। মহাপ্রভুর নাম ও কথা ছাড়া অন্য কথা ত্যাগ করলেন—''শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গৌর গুণধাম" এই নাম নিরন্তর কীর্ত্তন করতে লাগলেন। সার্ব্বভৌমকে এইভাবে উদ্ধার করাতে মহাপ্রভুর মহিমা তখন পুরীধামে চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। গজপতি প্রতাপরুদ্রের পুরোহিত শ্রীকাশী মিশ্রও মহাপ্রভুর প্রতি আকৃষ্ট হলেন। তিনি মহাপ্রভুকে থাকবার জন্য একটি নির্জ্জন গৃহ দিলেন।

একদিন জগন্নাথদেবের মঙ্গল আরতি দর্শন করে কিছু প্রসাদ নিয়ে মহাপ্রভু তাড়াতাড়ি সার্ব্বভৌম গৃহে এলেন। তখনও সার্ব্বভৌম শয্যা ত্যাগ করেন নাই। মহাপ্রভু ''হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ" বলে দরজায় এসে

দাঁড়ালেন। সার্ব্বভৌম তাড়াতাড়ি উঠে মহাপ্রভুকে বন্দনা করলেন। জগন্নাথের প্রসাদটুকু মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমের হাতে দিলেন। ভট্টাচার্য্যও তৎক্ষণাৎ নমস্কার করে প্রসাদ মুখে দিলেন। সার্ব্বভৌমের প্রসাদের উপর এরূপ বিশ্বাস ও ভক্তি দেখে মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হলেন এবং ভট্টাচার্য্যকে ধরে নৃত্য করতে লাগলেন। মহাপ্রভু বললেন—

আজি মুঞি অনায়াসে জিনিল ত্রিভুবন।
আজি মুঞি করিনু বৈকুণ্ঠ আরোহণ।।
আজি মোর পূর্ণ হইল সর্ব্ব অভিলাষ।
সার্ব্বভৌমের হইল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস।।
আজি তুমি নিষ্কপটে হৈলা কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ আজি নিষ্কপটে তোমা হৈল সদয়।।
আজি সে খণ্ডিল মোর দেহাদি বন্ধন।
আজি তুমি ছিন্ন কৈলে মায়ার বন্ধন।।
আজি কৃষ্ণপ্রাপ্তি-যোগ্য হৈল তোমার মন।
বেদধর্ম্ম লঙ্ঘি কৈলে প্রসাদ ভক্ষণ।।

চৈঃ চঃ মধ্য ৬/২৩০-২৩৪

মহাপ্রভু এই বলে নিজ স্থানে ফিরে এলেন। গোপীনাথ আচার্য্য সার্ব্বভৌম পণ্ডিতের বিষ্ণুভক্তি দর্শন করে চমৎকৃত হলেন। একদিন সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর নিকটে এলে মহাপ্রভু তাঁকে কিছু বলতে বললেন। সার্ব্বভৌম ভাগবতের শ্লোক পাঠ করতে লাগলেন— একটি শ্লোকের পাঠ বদল করে ''ভক্তি পদে স দায়ভাক্'' এইরূপ পদ উচ্চারণ করলেন। মহাপ্রভু বললেন—'মুক্তিপদে দায়ভাক্'' পদটি এইরূপ বদল করবার কারণ কি? সার্ব্বভৌম উত্তরে বললেন—

মুক্তি শব্দ কহিতে মনে হয় ত্রাস।
ভক্তি শব্দ কহিতে মনে হয়ত উল্লাস।।

একথা শুনে মহাপ্রভু আনন্দে সার্ব্বভৌমকে দৃঢ় আলিঙ্গন করলেন।

একবার মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম পণ্ডিতের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করতে গিয়েছিলেন। সার্ব্বভৌমের পত্নী মহাপ্রভুর জন্য বহু যত্নে বিবিধ প্রকার ব্যঞ্জন ও পিঠা প্রস্তুত করেছিলেন। প্রথমে ভগবান্‌কে অর্পণ করে সার্ব্বভৌম প্রভুর ভোজনের জন্য আসন পাতলেন এবং থালার চারিদিকে বাটিতে বাটিতে ব্যঞ্জন পিঠা প্রভৃতি সাজিয়ে প্রার্থনা করে মহাপ্রভুকে ভোজন করতে বসালেন। তাঁদের ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে ভক্তবৎসল মহাপ্রভুও— সানন্দে ভোজন করতে লাগলেন। সার্ব্বভৌম স্বয়ং পরিবেশন করছিলেন। ইতিমধ্যে সার্ব্বভৌমের জামাতা অমোঘ পণ্ডিত ভট্টাচার্য্যের অজ্ঞাতসারে সেখানে এসে মহাপ্রভুর ভোজন দেখল। অমোঘ পণ্ডিত নিন্দুক স্বভাবের লোক ছিল। সন্ন্যাসী আবার এত ভোজন করে' বলে প্রভুকে নিন্দা করল এবং সে কথা আজ্ঞ বার সার্ব্বভৌমের কানে গেল। অমনি সার্ব্বভৌম পণ্ডিত ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠলেন। লাঠি নিয়ে অমোঘকে তাড়া করলেন, সে পালিয়ে গেল। ভট্টাচার্য্য গালি দিয়ে বললেন—''তোর মৃত্যু হউক, আমার কন্যা ষাঠী বিধবা হোক। ভগবৎ নিন্দুকের মুখ যেন আর না দেখতে হয়'। ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুর চরণ ধরে ক্রন্দন করতে লাগলেন। মহাপ্রভু হাসতে হাসতে তাকে অনেক বুঝিয়ে ভোজন করতে বললেন এবং নিজ স্থানে চলে এলেন। সার্ব্বভৌম ও তাঁর পত্নী দুঃখে দিনরাত কিছু ভোজন করলেন না, শুয়ে পড়লেন। ভগবদ্ চরণে অপরাধ করার ফলে সেই রাত্রিতেই বিসূচিকা রোগে অমোঘের মৃত্যু হল। প্রাতঃকালে কোন ভক্ত মহাপ্রভুকে সেকথা জানালেন। যেখানে অমোঘের মৃতদেহ ছিল অন্তর্য্যামী প্রভু কাউকেও জিজ্ঞাসা না করে ঠিক সেখানে গেলেন এবং অমোঘের বক্ষঃ স্পর্শ করে বলতে লাগলেন—

সহজে নির্ম্মল এই ব্রাহ্মণ হৃদয়।
কৃষ্ণের বসতি এই যোগ্য স্থান হয়।।
মাৎসর্য্য চণ্ডাল কেন ইঁহা বসাইলা।
পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলা।।

* * *

উঠহ অমোঘ তুমি লহ কৃষ্ণনাম।
অচিরে তোমারে কৃপা করিবে ভগবান্।।

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৫/২৭১-২৭৭

অমোঘ পণ্ডিত মহাপ্রভুর শ্রীকরকমল স্পর্শমাত্রই চৈতন্য লাভ করলেন এবং ''কৃষ্ণ কৃষ্ণ'' বলে উঠে প্রেমানন্দে নৃত্য করতে লাগলেন। পরিশেষে অমোঘ পণ্ডিত মহাপ্রভুর শ্রীচরণ ধরে ক্রন্দন করতে করতে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। মহাপ্রভু বললেন—তুমি সার্ব্বভৌমের জামাতা। তাই তোমার সমস্ত পাপ দূর হয়েছে। তুমি নিরন্তর কৃষ্ণনাম কর। অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমাকে কৃপা করবেন।" ভগবান্ কত ভক্ত-বৎসল। ভক্তের কোন আত্মীয় পর্য্যন্ত ভগবানের প্রতি কোন অপরাধ করলে, ভক্তের কথা স্মরণ করে সেই আত্মীয়ের অপরাধও ক্ষমা করেন এবং তাঁকে শ্রীচরণে আশ্রয় দেন। গৌরসুন্দরের এরূপ অহৈতুকী কৃপা দেখে ভক্তগণ পরম বিস্ময়ান্বিত হলেন।

মহাপ্রভু যখন দক্ষিণদেশে গমন করেন, দক্ষিণ গোদাবরীতে শ্রীরামানন্দ রায়ের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য সার্ব্বভৌম পণ্ডিত তাঁকে বিশেষ অনুরোধ করেন। মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে গৌরসুন্দর দেখা দিবেন না বলেছিলেন কিন্তু সার্ব্বভৌম পণ্ডিত রথযাত্রাকালে কৌশলে মহাপ্রভুর সঙ্গে তাঁর মিলন করালেন। পুরীধামে মহাপ্রভুর প্রবীণ ভক্ত ও পার্ষদরূপে সার্ব্বভৌম শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা করেছিলেন।

শ্রীসার্ব্বভৌম পণ্ডিতের শ্রীমধুসূদন বাচস্পতি নামে একজন শিষ্য কাশীতে বাস করতেন এবং বেদান্ত শাস্ত্র পড়তেন। মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম পণ্ডিতকে ভক্তিসিদ্ধান্তপর যে বেদান্ত ব্যাখ্যা শুনিয়েছিলেন, সে ব্যাখ্যা মধুসূদন বাচস্পতি উপস্থিত থেকে শুনেছিলেন। পরবর্ত্তীকালে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আদেশে শ্রীজীব গোস্বামী যখন কাশী যান, তখন তিনি শ্রীমধুসূদন বাচস্পতির নিকট বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বাচস্পতি মহাপ্রভুর নিকট শ্রুত সিদ্ধান্তসমূহ শ্রীজীব গোস্বামীকে শিক্ষা দেন।

**।। জয় শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কি জয়।।**



# কূর্ম্ম-বিপ্র

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জীব উদ্ধারের জন্য পুরুষোত্তম ধাম থেকে বৈশাখ মাসে দক্ষিণ দেশে যাত্রা করেছিলেন, সঙ্গে ছিলেন কৃষ্ণদাস নামে এক বিপ্র। মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করতে করতে কূর্ম্মস্থানে এসে 'কূর্ম্ম' নামে এক সদাচারী ব্রাহ্মণকে কৃপা করেছিলেন।

কূর্ম্ম বিপ্রের মধ্যে প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। বিপ্রের ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে মহাপ্রভু তাঁর গৃহে গিয়েছিলেন। বিপ্র মহাপ্রভুর পাদপদ্ম ধৌত করে সবংশে সেই জল পান করেছিলেন। অনেক যত্ন করে মহাপ্রভুকে প্রসাদ দিয়েছিলেন। পরে মহাপ্রভুর অবশিষ্ট প্রসাদ স্বয়ং গ্রহণ করেছিলেন।

''কূর্ম্ম'-নামে সেই গ্রামে বৈদিক ব্রাহ্মণ।<br>
বহু শ্রদ্ধা-ভক্ত্যে কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ।।<br>
ঘরে আনি প্রভুর কৈল পাদ প্রক্ষালন।<br>
সেই জল বংশ-সহিত করিল ভক্ষণ।।<br>
অনেকপ্রকার স্নেহে ভিক্ষা করাইল।<br>
গোসাঞির প্রসাদান্ন সবংশে খাইল।।

চৈঃ চঃ মঃ ৭/১২১-১২৩

কূর্ম্ম বিপ্র বহু স্তব স্তুতির দ্বারা মহাপ্রভুকে প্রসন্ন করলেন। প্রার্থনা করলেন, –হে প্রভু! তুমি চলে গেলে তোমার বিরহ সহ্য করা আমার পক্ষ্যে সম্ভব হবে না। অতএব আমাকে তোমার সাথে নিয়ে চল। উত্তরে মহাপ্রভু বললেন, এমন কথা কখনও বলবে না। তুমি গৃহে থেকে নিরন্তর কৃষ্ণনাম কর এবং সকলকে কৃষ্ণনাম করাও–

প্রভু কহে,–ঐছে বাত্ কভু না কহিবা।<br>
গৃহে রহি' কৃষ্ণ-নাম নিরন্তর লৈবা।।<br>
যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ।<br>
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ।।<br>
কভু না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।<br>
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ।।

চৈঃ চঃ মঃ ৭/১২৭-১২৯

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ উক্ত আদেশের তাৎপর্য্য বিষয়ে তাঁর রচিত অনুভাষ্যে লিখেছেন--

**''শ্রীমন্মহাপ্রভুকে যাঁহারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া একান্তভাবে আশ্রয়পূর্ব্বক সেবা করিতে সঙ্কল্প করেন, ভগবান্ গৌরসুন্দর তাঁহাদের ভজন স্বীকার করিয়া এই শিক্ষা দেন যে, গৃহে থাকিয়া অর্থাৎ উৎকট-ভজন-পরায়ণ' অভিমান ত্যাগপূর্ব্বক গৃহবাসরূপ দৈন্যের সহিত নিরন্তর কৃষ্ণনাম গ্রহণরূপ আচরণ করিয়া শুদ্ধকৃষ্ণনাম-ভজন প্রচার কর। 'আমি সর্ব্বোত্তম বৈষ্ণব, শিষ্য করিলে গর্ব্বরূপ ভজন নষ্ট হয়'--এই উৎকট ভক্তাভিমান ত্যাগ করিয়া দৈন্যের সহিত শুদ্ধনাম-গ্রহণাচার ও শুদ্ধনাম-প্রচাররূপ গুরুর কার্য্য করিলে জড় প্রতিষ্ঠারূপ বিষয়-তরঙ্গ প্রবল হইতে পারে না। শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব ও শ্রীরঘুনাথ দাস প্রভৃতি পার্ষদ মহাত্মাগণের গ্রন্থ লিখিয়া উপদেশপ্রদান এবং শ্রীমন্নরোত্তম, শ্রীল মধ্ব-রামানুজাদির বহু শিষ্যবরণকে ভক্ত্যঙ্গের বাধক ও বিষয়-তরঙ্গ বলিয়া কল্পনা করিয়া অনেক নির্ব্বোধ লোক প্রকৃত অকিঞ্চন ভক্তগণের চরণে অপরাধী হন। তাঁহারা প্রভুর এই আদেশ সবিশেষ আলোচনা করিয়া নিজের ক্ষুদ্র গর্ব্বপূর্ণ দীনাভিমান**

**পরিত্যাগপূর্ব্বক হরি-বিমুখজনের প্রতি প্রতিশোধ না দেখাইতে গিয়া গৌরানুগত্যপূর্ব্বক যাহাতে নিজভবন বৃদ্ধি করেন, তজ্জন্য জগদ্গুরু আচার্য্যরূপে শ্রীগৌরাঙ্গের ইহাই শিক্ষা প্রদান।"**

এই কূর্ম্মক্ষেত্রেই মহাপ্রভু শ্রীবাসুদেব বিপ্রকে কৃপা করেছিলেন। বাসুদেব বিপ্রের কুষ্ঠ ব্যাধী ছিল। ঘৃণায় তার কাছে কেউ যেত না। তাঁর সর্ব শরীর ক্রিড়াময় হয়েছিল। কিন্তু মহাপ্রভু তাঁকে আলিঙ্গন করে সুন্দর রূপ প্রদান করেছিলেন। কূর্ম্ম বিপ্রের ন্যায় মহাপ্রভু বাসুদেব বিপ্রকেও হরিনাম প্রচারের আদেশ করেছিলেন। মহাপ্রভু কূর্ম্মক্ষেত্র থেকে প্রস্থান করলে কূর্ম্ম বিপ্র এবং বাসুদেব বিপ্র উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করে প্রেমাবিষ্ট হয়েছিলেন।

**।। জয় শ্রীকূর্ম্ম বিপ্র কি জয়।।**

# শ্রীসনোড়িয়া বিপ্র

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে লিখেছেন,–'**পশ্চিমদেশে বৈশ্যগণ কয়েকভাগে বিভক্ত--আগরওয়ালা, কালওয়ার, সানোয়াড় ইত্যাদি। তন্মধ্যে আগরওয়ালাই অতি শুদ্ধ; কালওয়ার, সানোয়াড় প্রভৃতি শ্রেণী নিজ নিজ কার্য্যদোষে পতিত। ঐ কালওয়ার ও সানোয়াড়দিগকে যাহারা যাজন করেন, তাহাদিগকে সানোড়িয়া-ব্রাহ্মণ ইত্যাদি বলে। সানোয়াড় শব্দে সুবর্ণবণিক, তাহাদের যাজক ব্রাহ্মণেরাই সানোয়াড়-ব্রাহ্মণ। যাজনদোষে পতিত হওয়ায় সেই ব্রাহ্মণদিগের গৃহে সন্ন্যাসীগণ ভোজন করেন না।**

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর এইপ্রসঙ্গে তাঁর লিখিত অনুভাষ্যে শুদ্ধভক্তিপর বিচার প্রদর্শন করেছেন। **শুদ্ধভক্ত (সনোড়িয়া) বিপ্র শৌক্র সম্বন্ধে জলাচরণীয় না হইলেও ভক্তির অনুকূল দৈববর্ণাশ্রমে ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত। বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিকারী অদৈববর্ণাশ্রমীকে এবং মহাপ্রসাদে কুতর্ককারিগণকে 'মূর্খ' সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়।"**

শ্রীসনোড়িয়া ব্রাহ্মণ শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের শিষ্য ছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর মথুরায় আদি কেশব দর্শন করে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম স্থানে প্রেম-ভরে নৃত্য-কীর্ত্তন করতে লাগলেন। সেই কালে শ্রীসনোড়িয়া ব্রাহ্মণও সেখানে এসে মহাপ্রভুর চরণে নমস্কার করে নৃত্য-কীর্ত্তন করতে লাগলেন।

মথুরা আসিয়া কৈলা বিশ্রাম তীর্থে স্নান।
জন্ম-স্থানে 'কেশব' দেখি করিলা প্রণাম।।
প্রেমাবেশে নাচে গায় সঘনে হুঙ্কার।
প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি লোকে চমৎকার।।
এক বিপ্র পড়ে প্রভুর চরণ ধরিয়া।
প্রভু সঙ্গে নৃত্য করে প্রেমাবিষ্ট হঞা।।
দুঁহে প্রেমে নৃত্য করি করে কোলাকুলি।
'হরি' 'কৃষ্ণ' কহে দুঁহে বলি বাহু তুলি।।

—চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৭/১৫৬-১৫৯

এরূপে কিছুক্ষণ নৃত্যাদি করবার পর প্রভু

বিশ্রাম করলেন। তারপর নিভৃতে ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন—‘‘আর্য্য সরল তুমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ! কাঁহা হৈতে পাইলে তুমি এই প্রেমধন।।” এরূপ অদ্ভুত প্রেম আপনি কোথা হতে পেলেন? ব্রাহ্মণ বললেন—পূর্ব্বে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী ভ্রমণ করতে করতে মথুরানগরে এসেছিলেন। তিনি কৃপাপূর্বক আমার গৃহে শুভাগমন করেন এবং আমায় মন্ত্র-দীক্ষা দিয়ে আমার হাতে ভিক্ষা গ্রহণ করেন।

‘‘কৃপা করি তেহোঁ মোর নিলয়ে আইলা।
মোরে শিষ্য করি মোর হাতে ভিক্ষা কৈলা।”

চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৭/১৬৭

প্রভু একথা শুনে গাত্রোত্থান পূর্বক গুরুজ্ঞানে ব্রাহ্মণের চরণ বন্দনা করলেন। ভয় পেয়ে ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি উঠে প্রভুর চরণে পড়লেন। প্রভু বললেন—

‘‘প্রভু কহে—তুমি গুরু! আমি শিষ্য প্রায়।
গুরু হঞা শিষ্যে নমস্কার না যুয়ায়।।”

নিত্য গুরু-সাধু-বিপ্র-মর্য্যাদা দাতা শ্রীমহাপ্রভুর কথা শুনে ব্রাহ্মণ বিস্মিত ও ভীত হয়ে বললেন—আপনি সন্ন্যাসী। আমি অধম গৃহস্থ। আমার প্রতি এই সমস্ত কথা বলা কখনও উচিত হয় না। তবে আপনার প্রেম দেখে অনুমানে আপনাকে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামীর সঙ্গে কোন সম্বন্ধ আছে বলে মনে হচ্ছে। যেখানে কৃষ্ণ-প্রেম সেখানে তাঁর সম্বন্ধ। তা ছাড়া এরূপ প্রেম অন্যত্র দুর্ল্লভ; অন্য স্থানে এ প্রেমের গন্ধও নাই।

বলভদ্র ভট্টাচার্য্য বললেন, ইনি মাধবেন্দ্রপুরীর কৃপাধন্য শ্রীল ঈশ্বরপুরী পাদের শিষ্য। শুনে সনোড়িয়া ব্রাহ্মণ নাচতে লাগলেন। অনন্তর প্রভুকে নিয়ে ব্রাহ্মণ নিজ গৃহে এলেন এবং প্রভুর বিবিধ পরিচর্য্যা করতে লাগলেন। রন্ধনের যোগাড় করে দিলেন। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য রন্ধন করতে লাগলেন।

ভাগবত-ধর্ম মর্য্যাদা-রক্ষক প্রভু হাস্য করতে করতে বিপ্রের প্রতি বললেন—

‘‘পুরী গোসাঞি তোমার ঘরে কর‍্যাছেন ভিক্ষা।
মোরে তুমি ভিক্ষা দেহ—এই মোর শিক্ষা।।”

—চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৭/১৭৯

মহাপ্রভু যখন সনোড়িয়া ব্রাহ্মণের হাতে প্রসাদ পেতে চাইলেন তখন ব্রাহ্মণ অতিশয় দৈন্য ভরে বলতে লাগলেন—

‘‘তোমারে ভিক্ষা দিব বড় ভাগ্য সে আমার।
তুমি ঈশ্বর নাহি তোমার বিধি ব্যবহার।।
মূর্খ লোক করিবেক তোমার নিন্দন।
সহিতে না পারিমু সেই দুষ্টের বচন।।”

সনোড়িয়া ব্রাহ্মণের কথা শুনে প্রভু বললেন—শ্রুতি, স্মৃতি ও মুনিগণ কেউ এক মত নহে। সাধুগণের ব্যবহার ধর্ম সংস্থাপন হেতু। শ্রীপুরী গোস্বামী যে আচরণ করেছেন, সেই আচরণই ধর্মসার স্বরূপ। অতঃপর সনোড়িয়া ব্রাহ্মণ প্রভুকে বহু যত্ন করে ভোজন করালেন। মহাপ্রভু জগতে শ্রীগুরু মর্য্যাদা-ধর্ম স্থাপন করলেন—তাঁর হাতে ভোজন করে।

অতঃপর মহাপ্রভু ব্রাহ্মণকে সঙ্গে নিয়ে মথুরার চব্বিশ ঘাট দর্শনাদি করলেন। যাবৎকাল প্রভু বৃন্দাবনাদিতে ভ্রমণ করেছিলেন, তাবৎকাল এ ব্রাহ্মণটি তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

**।। জয় শ্রীল সনোড়িয়া ব্রাহ্মণ কি জয়।।**

# শ্রীবুদ্ধিমন্ত খান

'শ্রীচৈতন্যের অতিপ্রিয় বুদ্ধিমন্ত খান।
আজন্ম আজ্ঞাকারী তেহো সেবক-প্রধান।।'

—চৈঃ চঃ আ ১০/৭৪

বুদ্ধিমন্ত খান শ্রীচৈতন্য শাখায় গণিত হন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীনবদ্বীপ ধাম মাহাত্ম্য গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন,– ''সত্যযুগে শ্রীসুবর্ণসেন নামে এক ধার্মিক রাজা সুবর্ণবিহারে বাস করতেন। তিনি নারদের কৃপায় মহাপ্রভুর প্রতি প্রেমভক্তি লাভ করেছিলেন। তিনি একদিন স্বপ্নে শ্রীগৌরগদাধরের দর্শন লাভ করেন। নিদ্রাভঙ্গ হলে তিনি গৌর বিরহে ক্রন্দন করতে থাকেন। তখন দৈববাণী হয়,– ''হে সবর্ণসেন রাজা, তুমি এখন আর আমার দর্শন পাবে না। আমি কলিযুগে গৌররূপে অবতীর্ণ হব। তুমি তখন বুদ্ধিমন্ত খান রূপে আমার পার্ষদ হবে।"

সেই সুবর্ণসেন রাজা এখন বুদ্ধিমন্ত খান রূপে জন্ম নিয়েছেন। তিনি নবদ্বীপে বাস করতেন। সেই সময় বুদ্ধিমন্ত খান এবং মুকুন্দ সঞ্জয় ধনাঢ্য ব্যক্তিরূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তারা গরীব দুঃখীকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করতেন। মহাপ্রভু যখন গয়া থেকে ফিরে এসে কৃষ্ণপ্রেমে বিকারগ্রস্ত হয়েছিলেন, তখন নিমাইয়ের আত্মীয় স্বজনরা বায়ুরোগ মনে করে বুদ্ধিমন্ত খানকে ডেকেছিলেন চিকিৎসার জন্য।

বুদ্ধিমন্ত খান মহাপ্রভু ও বিষ্ণুপ্রিয়ার বিবাহের সমস্ত খরচ বহন করেছিলেন। শ্রীবাস অঙ্গনে, চন্দ্রশেখর ভবনে, সংকীর্ত্তন লীলায় এবং জগাই মাধাই উদ্ধারের পর জলকেলি লীলায় বুদ্ধিমন্ত খান মহাপ্রভুর সঙ্গী ছিলেন। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে ব্রজলীলার অভিনয়ে বেশভূষার দায়িত্বে ছিলেন বুদ্ধিমন্ত খান।

সত্বর চলহ বুদ্ধিমন্ত খান তুমি।
কাচ সজ্জ কর গিয়া নাচিবাঙ আমি।।
আজ্ঞা শিরে করি' সদাশিব বুদ্ধিমন্ত।
গৃহে চলিলেন, আনন্দের নাহি অন্ত।।
সেইক্ষণে কাথিয়ার চান্দোয়া টানিয়া।
কাচ সজ্জ করিলেন সুন্দর করিয়া।।
লইয়া যতেক কাচ বুদ্ধিমন্ত খান্।
থুইলেন লঞা ঠাকুরের বিদ্যমান।।

চৈঃ ভাঃ মঃ ১৮/১৩-১৬

মহাপ্রভু কাটোয়ায় সন্ন্যাস গ্রহণের পর শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে এলে, যে সকল ভক্তগণ মহাপ্রভুর দর্শনে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বুদ্ধিমন্ত খান। তিনি প্রতিবছর গৌড়ীয় ভক্তদের সাথে পুরীতে যেতেন মহাপ্রভুর দর্শনে।

'চলিলেন বুদ্ধিমন্ত খান্ মহাশয়।
আজন্ম চৈতন্য-আজ্ঞা যাঁহার বিষয়।।

চৈঃ ভাঃ অ ৮/৩০

।। জয় শ্রীবুদ্ধিমন্ত খান কি জয়।।





# শ্রীরঙ্গ পুরী

'শ্রীরঙ্গপুরী-সহ তাহাঞি মিলন।
রামদাস বিপ্রের কৈল দুঃখ বিমোচন।।"

চৈঃ চঃ ম ১/১১৩

তথা হৈতে পাণ্ডুরপুরে আইলা গৌরচন্দ্র।
বিঠ্‌ঠল-ঠাকুর দেখি' পাইলা আনন্দ।।
প্রেমাবেশে কৈল বহুত কীর্ত্তন-নর্ত্তন।
তাঁহা এক বিপ্র তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ।।
বহুত আদরে প্রভুকে ভিক্ষা করাইল।
ভিক্ষা করি' তথা এক শুভবার্ত্তা পাইল।।
মাধব-পুরীর শিষ্য 'শ্রীরঙ্গ-পুরী' নাম।
সেই গ্রামে বিপ্রগৃহে করিলা বিশ্রাম।।
শুনিয়া চলিলা প্রভু তাঁরে দেখিবারে।
বিপ্রগৃহে বসি' আছেন, দেখিলা তাঁহারে।।
প্রেমাবেশে করে তাঁরে দণ্ড-পরণাম।
অশ্রু, পুলক, কম্প, সর্ব্বাঙ্গে পড়ে ঘাম।।

দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করে মহাপ্রভু মহীশূরে উডুপীতে এলেন। সেখান থেকে এলেন মহারাষ্ট্র দেশে। ভীমা নদীর তীরে পাণ্ডুরপুরে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে শ্রীবিঠ্‌ঠল দেবকে দর্শন করে প্রেমাবিষ্ট হলেন। বহু নৃত্য-গীত করলেন। বিঠ্‌ঠল দেবকে দর্শন করার পর মধ্যাহ্ন কালে কোন এক পূজারী ব্রাহ্মণের ঘরে ভিক্ষা গ্রহণ করলেন। তাঁর মুখে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গ পুরীর কথা মহাপ্রভু শুনতে পেলেন। অনন্তর শ্রীমহাপ্রভু রঙ্গ পুরীকে দেখতে চললেন। গিয়ে দেখলেন—শ্রীরঙ্গ পুরী ঘরের মধ্যে বসে ''নাম" করছেন। পুরীকে দর্শন করেই স্বীয় গুরু শ্রীঈশ্বর পুরী পাদের কথা মনে পড়ল। মহাপ্রভু অঙ্গন থেকেই শ্রীরঙ্গ পুরীকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম ও বন্দনা করলেন। শ্রীরঙ্গ পুরী তাড়াতাড়ি এসে প্রভুকে ধরে তুললেন।

শ্রীরঙ্গ পুরী জিজ্ঞাসা করলেন,—শ্রীপাদ! তোমার পরিচয় কি?

মহাপ্রভু বললেন—আমি শ্রীঈশ্বরপুরী-পাদের অধম ভৃত্য। ঈশ্বরপুরীর নাম শুনে রঙ্গ পুরীর দু'নয়ন দিয়ে জল ধারা পড়তে লাগল। কিছুক্ষণ নীরবে কাঁদার পর দুহাত দিয়ে প্রভুর গলা জড়িয়ে ধরে বললেন—আহা, শ্রীঈশ্বর পুরী ত আমাদের ছেড়ে নিত্য লীলায় প্রবেশ করেছেন। বাবা! তোমায় দেখে বড় শান্তি পেলাম! মহাপ্রভু—সজল নয়নে বললেন, হে গোঁসাই, কত ভাগ্যে আপনার দর্শন পেলাম।

শ্রীরঙ্গপুরী বললেন—শ্রীপাদ! তোমার পূর্ব্ব আশ্রমের পরিচয় শুনতে চাই। মহাপ্রভু বললেন, —বঙ্গদেশে গঙ্গাতটস্থিত নবদ্বীপ নগরীতে আমার জন্মস্থান। পিতার নাম শ্রীজগন্নাথ মিশ্র। বর্ত্তমানে তিনি বৈকুণ্ঠবাসী। মাতার নাম শ্রীশচীদেবী। আর এক পুত্র ছিলেন, তাঁর নাম ছিল বিশ্বরূপ। আমি যখন খুব ছোট ছিলাম তিনি দেশান্তরী হয়েছিলেন। এখন আমিও সন্ন্যাসী হয়ে তাঁর অনুসন্ধান করছি।

রঙ্গ পুরী বললেন,—বাবা বহুদিনের কথা মনে পড়ল। আমি একবার শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে নবদ্বীপ গিয়েছিলাম। তোমার পিতা জগন্নাথ মিশ্র বহু সমাদর করে শ্রীগুরুদেবকে গৃহে নিয়ে পূজা করেছিলেন এবং ভোজন করিয়েছিলেন। তোমার মাতৃ দেবীর রান্নার স্বাদ এখনও ভুলতে পারি নি। তিনি যে শাক রান্না করেছিলেন—তা অপূর্ব্ব। আহা, তুমি সেই জগন্নাথ-শচীর পুত্র। এই বলে রঙ্গ পুরী মহাপ্রভুকে আবার জড়িয়ে ধরলেন। তারপর বললেন—বাবা, একটা কথা। বলতে প্রাণ ফেটে যায়।

মহাপ্রভু—গোসাঞি, কি কথা বলুন। আমি কি শুনবার যোগ্য নই?

রঙ্গপুরী—দীর্ঘকাল বেঁচে থাকলে অনেক কষ্ট হয়! আবার দেখাও যায় অনেক কিছু।

মহাপ্রভু—কষ্ট কি? দেখা যায় কি?

রঙ্গ পুরী—তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করে শ্রীশঙ্করারণ্য নাম ধারণ করেছিল। এই পাণ্ডারপুরেই থাকতো। তারপর আর কি বলব! এই বলে শ্রীরঙ্গপুরী অচেতন হয়ে পড়লেন।

মহাপ্রভু দুঃখভরে পুরীকে ধরে বসালেন এবং বললেন—গোসাঞি, তারপর বলুন। আহা কি মধুর কথা শুনছি! বিশ্বরূপের জন্য সন্ন্যাসী হয়ে আমি দেশে দেশে ভ্রমণ করছি। জননীর কাছে প্রতিজ্ঞা করে এসেছি—বিশ্বরূপের সন্ধান যে কোন রকমে সংগ্রহ করব।

শ্রীরঙ্গপুরী কাঁদতে কাঁদতে বললেন,— কথা মুখে আনতে প্রাণ ফেটে যায়। আহা, ক' মাস হল.... (নীরব)।

মহাপ্রভু--গোসাঞি, আপনি কাঁদছেন কেন? তারপর কি হল বলুন।

রঙ্গ পুরী--বাবা, আমি কেন বেঁচে আছি জানি না! এই ক্ষেত্রেই তাঁর সিদ্ধিলাভ হয়েছে।

বিশ্বরূপের অপ্রকট-বার্ত্তা শ্রবণ মাত্রই ভূতলে মহাপ্রভু মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। শোকাশ্রুতে ভূতল সিক্ত হতে লাগল। এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ করে মহাপ্রভু প্রায় সারাদিন অচৈতন্য অবস্থায় রইলেন। শ্রীরঙ্গ পুরী প্রভুর কণ্ঠ ধরে কত কাঁদলেন।

তিন-চার দিন রঙ্গ পুরীর আশ্রমে থেকে মহাপ্রভু বিবিধ কথা প্রসঙ্গে সময় কাটালেন। পুনঃ তীর্থভ্রমণে যাত্রা করলেন। শ্রীরঙ্গ পুরীও দ্বারকা অভিমুখে চলে গেলেন।

মহাপ্রভু যখন ক্ষেত্রধামে ফিরে এলেন, শ্রীরঙ্গ পুরীও সেখানে এলেন। শেষ পর্য্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করেছিলেন। মহাপ্রভু তাঁকে শ্রীগুরুর ন্যায় ভক্তি করতেন। শ্রীরঙ্গ পুরীও তাঁকে প্রাণের প্রাণ মনে করতেন।

।। জয় শ্রীরঙ্গপুরী কি জয়।।



# শ্রীরামচন্দ্র পুরী

শ্রীরামচন্দ্র পুরীর পিতামাতার পরিচয় ও জন্মস্থান অজ্ঞাত। তাঁর বড় পরিচয় তিনি শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। তিনি শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য হয়েও শুষ্কজ্ঞানী সম্প্রদায়ের সঙ্গ প্রভাবে ভক্তিবিরুদ্ধ সিদ্ধান্তে রুচিবিশিষ্ট ছিলেন। তিনি নিন্দুক প্রকৃতির ছিলেন।

জগদানন্দ পণ্ডিত মহাপ্রভু, শ্রীল পরমানন্দ পুরী ও রামচন্দ্রপুরীকে পরস্পর কথা বলতে দেখে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করেন। প্রসাদ সেবার পর রামচন্দ্রপুরী জগদানন্দকে অবশিষ্ট প্রসাদ পাওয়ার জন্য নির্দেশ করলেন এবং নিজে পরিবেশন করে বেশী বেশী করে খাওয়ালেন। প্রসাদ সেবার পর কটাক্ষ করে বললেন—

''শুনি, চৈতন্যগণ করে বহুত ভক্ষণ।
সত্য সেই বাক্য—সাক্ষাৎ দেখিলুঁ এখন।।
সন্ন্যাসীরে এত খাওয়াইয়া করে ধর্ম্ম নাশ।
বৈরাগী হইয়া এত খায়, বৈরাগ্যের নাহি বাস।।''

চৈঃ চঃ অ ৮/১৩-১৪

অনেকেই ভাববেন মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য মানে মহাপ্রভুর গুরুবর্গ (কাকাগুরু)। তিনি নিন্দুক কি করে হলেন? কারণ হচ্ছে গুরুর চরণে অপরাধ। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী রেমুনায় অবস্থানকালে কৃষ্ণবিরহে কাতর হয়ে রাধারাণীর ভাবে ''অয়ি দীনদয়াদ্রনাথ! হে মথুরানাথ! কদাবলোক্যসে! হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করাম্যহম্।।'' বলতে বলতে কান্না করতেন। সে সময় রামচন্দ্রপুরী সেখানে ছিলেন। তিনি গুরুদেবকে কান্না করতে দেখে হৃদয়ের ভাব না বুঝেই মর্ত্তজ্ঞানে উপদেশ কতেন—গুরুদেব! আপনি কাঁদবেন না। আপনি তো পূর্ণব্রহ্ম। আপনার চিন্তা কিসের? রামচন্দ্র পুরীর কথা শুনে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী লোক শিক্ষার জন্য ক্রোধ প্রকাশ করে বলেছিলেন—

শুনি' মাধবেন্দ্র-মনে ক্রোধ উপজিল।
দূর, দূর, পাপিষ্ঠ বলি' ভর্ৎসনা করিল।।
'কৃষ্ণ-কৃপা' না পাইনু, না পাইনু 'মথুরা'।
আপন-দুঃখে মরোঁ,—এই দিতে আইল জ্বালা।।
মোরে মুখ না দেখাবি তুই, যাও যথি-তথি।
তোরে দেখি' মৈলে, মোর হবে অসদগতি।।
কৃষ্ণ না পাইনু মরোঁ আপনার দুঃখে।
মোরে 'ব্রহ্ম' উপদেশে এই ছার মূর্খে।।

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৮/২০-২৩

শ্রীল প্রভুপাদ এই বিষয়ে লিখেছেন—

**''রামচন্দ্রপুরী স্বীয়-গুরু শ্রীমাধবেন্দ্রকে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-কাতর দেখিয়াও তাঁহার অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভস্ফূর্ত্তি বুঝিতে অসমর্থ হইয়া লৌকিক-বিচারক্রমে মর্ত্ত্যজ্ঞানে প্রাকৃত-অভাবজন্য শোককাতর জানিয়া নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মের অনুভূতি করাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। তাহাতে মাধবেন্দ্র পুরী শিষ্যের মূর্খতা ও গুর্ব্ববজ্ঞা উপলব্ধি করিয়া তাহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা হইতে বিরত হইলেন এবং তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।''**

একই গুরুর দুই শিষ্য দুই প্রকৃতির। শ্রীল ঈশ্বরপুরী শ্রীগুরুদেবের বপু ও বাণী সেবা করে গুরুকৃপায় কৃষ্ণপ্রেমে নিমজ্জিত হলেন। আর রামচন্দ্র পুরী সেবাবিমুখ হয়ে নিন্দুক হলেন।

মহদনুগ্রহ-নিগ্রহের সাক্ষী দুইজনে।
এই দুইদ্বারা শিখাইলা জগজনে।।

চৈঃ চঃ অঃ ৮/৩০

গুরুকৃপা হতে বঞ্চিত রামচন্দ্রপুরী সর্বদা পরের ছিদ্র অন্বেষণ করে বেড়ান। প্রথমে বিভিন্ন বৈষ্ণবের নিন্দা করতেন। তারপর সেই অপরাধ বর্দ্ধিত হতে হতে শেষ পর্যন্ত ভগবানেরও নিন্দা করে বসলেন। অর্থাৎ মহাপ্রভুর নিন্দা করে বসলেন।

রামচন্দ্রপুরী নিন্দুক হলেও প্রতিদিন মহাপ্রভুকে দর্শন করতে যেতেন। মহাপ্রভু তাঁকে গুরুবুদ্ধিতে প্রণাম করতেন। একদিন সকালবেলা মহাপ্রভুর ঘরে এসে পিপীলিকা দেখে কটাক্ষ করে বললেন—"এই স্থানে নিশ্চয়ই গুড় রাখা ছিল। নাহলে পিপীলিকা কেন? আহা! সন্ন্যাসীর কি জিহ্বার লালসা।"

সহজেই পিপীলিকা সর্ব্বত্র বেড়ায়।
তাহাতে তর্ক উঠাঞা দোষ লাগায়।।
শুনি' তাহা প্রভুর সঙ্কোচ-ভয় মনে।
গোবিন্দে বোলাঞা কিছু কহেন বচনে।।
আজি হৈতে ভিক্ষা আমার এই ত' নিয়ম।
পিণ্ডাভোগের এক চৌঠি, পাঁচগণ্ডার ব্যঞ্জন।।
ইহা বই অধিক আর কিছু না লইবা।
অধিক আনিলে আমা এথা না দেখিবা।।
সকল বৈষ্ণবে গোবিন্দ কহে এই বাত্।
শুনি' সবার মাথে যৈছে হৈল বজ্রাঘাত।।
রামচন্দ্রপুরীকে সবায় দেয় তিরস্কার।
এই পাপিষ্ঠ আসি' প্রাণ লইল সবার।।

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৮/৪৯-৫৪

মহাপ্রভু অর্ধ ভোজন শুরু করলেন। ভক্তগণ মহাদুঃখে দিনযাপন করতে লাগলেন। একদিন রামচন্দ্রপুরী এলেন। মহাপ্রভু তাঁকে প্রণাম করলেন।

প্রণাম করি' প্রভু কৈলা চরণ বন্দন।
প্রভুরে কহয়ে কিছু হাসিয়া বচন।।
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে 'ইন্দ্রিয়-তর্পণ'।
যৈছে তৈছে করে মাত্র উদর ভরণ।।
তোমারে ক্ষীণ দেখি, শুনি,—কর অর্দ্ধাশন।
এই 'শুষ্ক-বৈরাগ্য' নহে সন্ন্যাসীর 'ধর্ম্ম'।।
যথাযোগ্য উদর ভরে, না করে 'বিষয়' ভোগ।
সন্ন্যাসীর তবে সিদ্ধ হয় জ্ঞানযোগ।।

চৈঃ চঃ অঃ ৮/৬১-৬৪

রামচন্দ্রপুরীর কথা শুনে মহাপ্রভু সদৈন্যে বললেন, আমি অজ্ঞ বালক, আপনি শিষ্যজ্ঞানে যে শিক্ষা দিলেন তা অবশ্যই পালন করব। মহাপ্রভু অর্ধভোজন করছেন শুনে ভক্তগণও অর্ধভোজন শুরু করলেন। একদিন পরমানন্দ পুরী এসে মহাপ্রভুকে বললেন—

রামচন্দ্রপুরী হয় নিন্দুক-স্বভাব।
তার বোলে অন্ন ছাড়ি' কিবা হলে লাভ?।।
পুরীর স্বভাব,—যথেষ্ট আহার কারাঞা।
যে না খায়, তারে খাওয়ায় যতন করিয়া।।
খাওয়াঞা পুনঃ তারে করয়ে নিন্দন।
এত অন্ন খাও,—তোমার কত আছে ধন?।।
সন্ন্যাসীকে এত খাওয়াঞা কর ধর্ম্ম নাশ!
অতএব জানিনু'—তোমার কিছু নাহি 'ভাস'।।
কে কৈছে ব্যবহারে, কেবা কৈছে খায়।
এই অনুসন্ধান তেঁহো করয় সদায়।।
শাস্ত্রে যেই দুই ধর্ম্ম কৈরাছে বর্জ্জন।
সেই কর্ম্ম নিরন্তর ইঁহার করণ।।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/২৮/১)

পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ।
বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ।।

শ্রীউদ্ধবের নিকট শ্রীভগবান্ বললেন,— প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনে বিশ্বকে একস্বরূপ জেনে পরের স্বভাব ও কর্ম্ম কখনও প্রশংসা বা গর্হণ করবেন না।

তার মধ্যে পূর্ব্ববিধি 'প্রশংসা' ছাড়িয়া।
পরবিধি 'নিন্দা' করে 'বলিষ্ঠ' জানিয়া।।
তথাহি ন্যায়ঃ—
পূর্ব্বপরয়োর্মধ্যে পরবিধির্বলবান্।।

পূর্ব্ব ও পরবিধির মধ্যে পরবিধিই বলবান্।

যাঁহা গুণ শত আছে, তাহা না করে গ্রহণ।
গুণমধ্যে ছলে করে দোষ-আরোপণ।।
ইঁহার স্বভাব ইঁহা করিতে না যুয়ায়।
তথাপি কহিয়ে কিছু মর্ম্ম-দুঃখ পায়।।

চৈঃ চঃ অঃ ৮/৭০-৮০

মহাপ্রভু বললেন,– রামচন্দ্রপুরীর কি দোষ। তিনি তো যথার্থই বলেছেন।

ভক্তগণের একান্ত ইচ্ছায় মহাপ্রভু ভোজনের পরিমান সামান্য বাড়ালেন। কিছুদিন পর রামচন্দ্রপুরী তীর্থ ভ্রমণে গেলেন। শুনে ভক্তগণ আনন্দিত হলেন। যেন মাথা থেকে পাথর সরে গেল।

মহাপ্রভু রামচন্দ্রপুরীকে কখনও লৌকিক মর্যাদা প্রদান করেছেন, কখনও তৃণের ন্যায় উপেক্ষাও করেছেন।

কভু রামচন্দ্রপুরীর হয় ভৃত্যপ্রায়।
কভু তারে নাহি মানে, দেখে তৃণ-প্রায়।।
ঈশ্বর-চরিত্র প্রভুর—বুদ্ধির অগোচর।
যবে যেই করেন, সেই সব—মনোহর।।

চৈঃ চঃ অঃ ৮/৯২-৯৩

গুরু উপেক্ষা কৈলে, ঐছে ফল হয়।
ক্রমে ঈশ্বরপর্য্যন্ত অপরাধে ঠেকয়।।
যদ্যপি গুরুবুদ্ধ্যে প্রভু তার দোষ না লইল।
তার ফলদ্বারা লোকে শিক্ষা করাইল।।

শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় বর্ণিত হয়েছে–

বিভীষণো যঃ প্রাগাসীদ্রামচন্দ্রপুরী স্মৃতঃ।।

পূর্ব্বে যিনি শ্রীরামের প্রিয় 'বিভীষণ' ছিলেন। তিনিই এখন 'শ্রীরামচন্দ্রপুরী' হয়েছেন।। ৯২।।

বিঃ দ্রঃ – অনেকে মনে করতে পারেন শ্রীরামচন্দ্রপুরী 'নিন্দুক' ছিলেন। তিনি মহাপ্রভু ও তাঁর ভক্তগণের নিন্দা করেছিলেন। কিন্তু বিভীষণ প্রভুর ভক্ত ছিলেন। তাহলে তিনি নিন্দুক রামচন্দ্রপুরীর মধ্যে প্রবেশ করলেন কিভাবে? তার উত্তরে পরবর্তী শ্লোক–

উবাচাতো গৌরহরির্নৈতদ্রামস্য কারণম্।
জটিলা রাধিকা শ্বশ্রূঃ কার্য্যতোহবিশদেব তম্
অতো মহাপ্রভুর্ভিক্ষাসঙ্কোচাদি ততোহকরোৎ।।

শ্রীরাধারাণীর শাশুড়ী 'জটিলা' কোন কারণে রামচন্দ্রপুরীর মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন। এজন্য মহাপ্রভু বলতেন, ভক্তদের নিন্দা রামচন্দ্রপুরী করেনি (কারণ তিনি বিভীষণ), করেছে জটিলা। এজন্য মহাপ্রভু রামচন্দ্রপুরীর সামনে ভোজন করতে সঙ্কোচ করতেন। কারণ; মহাপ্রভু 'শ্রীরাধা' আর রামচন্দ্রপুরী শাশুড়ী 'জটিলা'।

বিঃ দ্রঃ– শ্রীরামচন্দ্রপুরী মহাপ্রভুর পার্ষদ। তাঁকে কেউ যেন মর্ত্ত্য জ্ঞান করে অবজ্ঞা না করেন। তিনি জগৎ শিক্ষার জন্য এই লীলা করেছেন।

শ্রীরামচন্দ্রপুরীর লীলায় শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ–

১। পরছিদ্র অ্যন্বেষণ বা বিষ্ণু-বৈষ্ণবের নিন্দা করা ভক্তির প্রতিকূল। পরের ছিদ্র অন্বেষণের স্বভাব পরিত্যাগ করে সাধক নিজের ছিদ্র দেখবেন। তাহলে সংশোধিত হয়ে ভজন পথে অগ্রসর হতে পারবেন। ''যদি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাতী মাতা; উপাড়ে বা ছিণ্ডে তার শুখি, যায় পাতা।।'' শ্রীল রূপ গোস্বামীকে উপলক্ষ্য করে মহাপ্রভু যে শিক্ষা দিয়েছেন শুদ্ধভক্তি কামনাকারী সাধকগণের পক্ষ্যে তা সর্বদা স্মরণীয়।

২। সদ্গুরুর চরণ আশ্রয় করলেই সবাই একই রকম হয় না। বাহ্যিকভাবে গুরু পদাশ্রয় করে মন্ত্র গ্রহণ করলেই প্রকৃত শিষ্য হওয়া যায় না। নিস্কপট সেবা পরায়ন শিষ্যকেই গুরুদেব কৃপা করে থাকেন, গুরুকৃপা তাঁরই উপলব্ধি হয়। শ্রীল রূপ গোস্বামী ৬৪ প্রকার ভক্তির অঙ্গের কথা উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে 'বিশ্রম্ভেন গুরোঃ সেবা' কথাটি সাধকগণকে

বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। সৎ শিষ্য সর্বদা গুরুদেবের শাষণকে স্বীকার করেন।

৩। গুরু-বৈষ্ণবের মর্যাদা লঙ্ঘন, ভক্তিপথের প্রতিকূল 'মর্যাদা লঙ্ঘন প্রভু সহিতে না পারে' এ কথাটি সর্বদা মনে রাখতে হবে। যারা দুর্ভাগা জীব তারা অনর্থযুক্ত হয়ে ভগবানের মায়ায় মোহিত হয়ে নিজেদেরকে মহাজ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ্য মনে করে অহঙ্কারের বশবর্তী হয়ে গুরু বৈষ্ণবকে সংশোধন করতে চায়, উপদেশ দিতে যায়। এটি ধৃষ্টতার পরিচয়।

৪। যাদের ভক্তিজগতে উন্নতির ইচ্ছা রয়েছে তারা যেন নিজের থেকে শ্রেষ্ঠ্য বৈষ্ণবের সঙ্গ করেন। ''স্বজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে''। বিষ্ণু-বৈষ্ণবের সেবা-পরায়ন সাধুর কৃপায় বিষ্ণু-বৈষ্ণব সেবায় রুচি বৃদ্ধি পায়।

৫। গুরুদেবের গুরুভ্রাতা যদি গুরুদেবের সম্বন্ধ ধারণ করেন, তাহলে তিনিও গুরুর ন্যায় পূজ্য। তাঁকে সর্বদা মর্যাদা প্রদান করা উচিৎ। তাঁর দেওয়া আদেশ নির্দ্দেশ সমীচীন না হলেও তাঁর প্রতি খারাপ ব্যবহার বা শাসনবাক্য প্রয়োগ করা কখনই ঠিক নয়। মহাপ্রভু স্বয়ং আচরণ করে এই শিক্ষাই দিয়েছেন। তাঁর অনুগত ভক্তদের উচিৎ সেই শিক্ষাকে মান্য করা। তা নাহলে লোক দেখানো গোরা ভজা হয়ে যাবে।

'' গোরার আমি, গোরার আমি মুখে বলিলে নাহি চলে।
গোরার আচার গোরার বিচার লইলে ফল ধরে।।''

**।। জয় শ্রীল রামচন্দ্র পুরী কি জয়।।**

# মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু যখন কাশীতে চন্দ্রশেখরের গৃহে অবস্থান করছিলেন, সেই সময় এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ প্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করতে এলেন। তিনি মহাপ্রভুর রূপ ও প্রেমাদি দেখে চমৎকৃত হলেন। তিনিও তাঁর বড় ভক্ত হলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী গৃহত্যাগ করে কাশীতে এলে মহাপ্রভু তাঁকে কৃপা করলেন এবং মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করে দিলেন। বিপ্র শ্রীসনাতন গোস্বামীকে স্বীয় গৃহে প্রসাদ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ করলেন এবং বললেন—আপনি যতদিন কাশীতে থাকবেন এখানে ভিক্ষা গ্রহণ করবেন। সনাতন গোস্বামী বললেন—আমি প্রতিদিন এক ব্যক্তির গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করব না। গৃহে-গৃহে মাধুকরী করব।

কাশীতে যেখনে সেখানে মহাপ্রভুর নিন্দা হয় দেখে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বড় ব্যথিত হলেন। একদিন তিনি চিন্তা করতে লাগলেন—যারা মহাপ্রভুর সম্মুখীন হয়, তারা তাঁর স্বরূপ অনুভব করে, তাঁকে ঈশ্বর বলে মানে।

কোন প্রকারে পারোঁ যদি একত্র করিতে।
ইহা দেখি সন্ন্যাসিগণ হবে ইহাঁর ভক্তে।।

চৈঃ চঃ মধ্য ২৫/৯

কোন রকমে একবার যদি মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে মহাপ্রভুর মিলন ঘটাতে পারি, তাহলে তাঁকে দর্শন করে তাঁরা নিশ্চয়ই মুগ্ধ হবেন এবং ভক্ত হবেন। আমি সব সময় কাশীতে বাস করি। মহাপ্রভু সম্বন্ধে যদি তাঁদের মত বদলাতে না পারি, তাদের

মুখে অনবরত তাঁর নিন্দা আমাকে শুনতে হবে। এ সব চিন্তা করে ব্রাহ্মণ এক মতলব ফাঁদলেন,— "আমার গৃহে সন্ন্যাসীদের এক ভোজের আয়োজন করব। তাতে শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী ও অন্যান্য সন্ন্যাসীদের আমন্ত্রণ করব, মহাপ্রভুর শ্রীচরণে পড়ে তাঁকেও যে কোন ভাবে আনব।" এ সব চিন্তা করে ব্রাহ্মণ একদিন ভোজের আয়োজন করলেন। প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে আমন্ত্রণ করলেন। পরিশেষে মহাপ্রভুর শ্রীচরণে এলেন। তাঁর চরণ ধরে অনেক অনুনয় বিনয় করে বলতে লাগলেন—আপনার শ্রীচরণে এক অনুরোধ।

মহাপ্রভু বললেন—কি অনুরোধ?

মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ—আমি সন্ন্যাসী ভোজনের আয়োজন করেছি, কৃপা পূর্ব্বক তাতে আপনাকেও যোগ দিতে হবে।

মহাপ্রভু—আমি কোথাও আমন্ত্রণে—ভোজন করি না।

ব্রাহ্মণ—আমি তা' জানি। আপনি দীন দয়াল, দীনের প্রতি দয়া করে আমার অনুরোধ রক্ষা করবেন আশা করি।

মহাপ্রভু কিছুক্ষণ কি চিন্তা করলেন—আচ্ছা বেশ! তোমার ভোজন-উৎসবে যোগদান করব। এ কথায় ভক্তগণ আনন্দে হরি-হরি ধ্বনি করতে লাগলেন।

ঐদিন সন্ন্যাসিগণ মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রের গৃহে এসে সমবেত হতে লাগলেন। সন্ন্যাসীদের গুরু শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীও এলেন। ব্রাহ্মণ খুব যত্ন করে তাঁকে উচ্চ আসনে বসালেন। অতঃপর মহাপ্রভু চন্দ্রশেখর ও তপন মিশ্র আদি ভক্তগণকে সঙ্গে নিয়ে সকলের শেষে এলেন। ব্রাহ্মণ বহু ভক্তি পুরঃসর প্রভুকে স্বাগত জানালেন। মহাপ্রভু সন্ন্যাসীদের দেখে দূর থেকে প্রণাম করলেন, পরে সভাপ্রান্তে পাদ-প্রক্ষালন স্থানে গিয়ে বসলেন এবং কিছু ঈশ্বর্য্য প্রকাশ করলেন। সন্ন্যাসীদের গুরু শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী দূর থেকে মহাপ্রভুর তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় অপূর্ব্ব অঙ্গদ্যুতি দেখে ও ঈশ্বরীয় প্রভাব দেখে আসনে বসতে পারলেন না, শিষ্যগণের সহিত দণ্ডায়মান হলেন। তারপর শ্রীপ্রকাশানন্দ অমনি ছুটে এলেন প্রভুর কাছে এবং প্রভুর দু'খানি হাত ধরে বললেন—শ্রীপাদ! একি! এ অপবিত্র স্থানে বসেছেন কেন? সভা মধ্যে আসুন।

মহাপ্রভু দৈন্যভরে বললেন—আমি কি আপনাদের মধ্যে বসবার যোগ্য?

প্রকাশানন্দ—আপনি এ কি বলছেন? এত দৈন্য করছেন কেন? প্রভাবে ত' আপনাকে ঈশ্বর বলে মনে হয়।

মহাপ্রভু—ছি, ছি, অমন কথা বলবেন না। জীবকে নারায়ণ জ্ঞান করা মহাপরাধ। আমি কৃষ্ণদাস। প্রভুর কথা শুনে সন্ন্যাসীগণ চমৎকৃত হলেন। প্রকাশানন্দ সরস্বতী জোর করে প্রভুকে সভামধ্যে নিয়ে গেলেন এবং উত্তম আসনে বসালেন।

সন্ন্যাসীগণ মনে মনে বলতে লাগলেন—ইনি এত মহৎ বক্তি কিন্তু কত দৈন্য-ব্যঞ্জক বিনম্র ব্যবহার। দিগ্বিজয়ী কেশব ভট্ট, মহান্ বৈদান্তিক সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিতগণও এঁনার কাছে পরাজিত। এত বড় পণ্ডিত কিন্তু অভিমানের লেশমাত্র এঁনার মধ্যে দেখ ছি না। মানুষ এত নিরভিমান হতে পারেন না—ইনি নিশ্চয়ই ঈশ্বর।

শ্রীপ্রকাশানন্দ বললেন—শ্রীপাদ আপনি সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী; এখানে আছেন, আমাদের সঙ্গে মিশেন না কেন?

মহাপ্রভু—আমি হীন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী, আপনাদের সঙ্গে মিশবার যোগ্য নই।

প্রকাশানন্দ—আপনি সন্ন্যাসী হয়ে নৃত্য গীত করেন, বেদান্ত শুনেন না কেন? সন্ন্যাসীর ধর্ম ত' বেদান্ত শ্রবণ।





মহাপ্রভু—শ্রীপাদ, আপনি ঠিক বলেছেন, আমি কেন বেদান্ত শুনি না তা শুনন। আমি হলাম মূর্খ, বেদান্ত কিছুমাত্র বুঝি না। এ সম্বন্ধে গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করলাম তিনি বললেন—কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তনই যুগধর্ম। এই নাম কীর্ত্তন কর, এতে সর্ব্বসিদ্ধি হবে। আমি নাম সংকীর্তন করতে লাগলাম, তখন সেই কৃষ্ণ নামই আমাকে নাচতে ও গাওয়াতে লাগল। ফলে অবশেষে আমি নাচতে গাইতে লাগলাম। আমি নিজ ইচ্ছায় নাচ-গান করি না।

প্রভুর মধুর বাক্য শুনে সন্ন্যাসীগণের মন ফিরে গেল। বললেন আপনি ঠিক বলেছেন কলিকালে এই পথই উত্তম। আমরা বুঝি, তথাপি সম্প্রদায় অনুরোধে বেদান্ত শ্রবণ করি।

প্রকাশানন্দ সরস্বতী বললেন—আপনি বঞ্চনা করছেন। আপনার কথা শুনেছি, মহাবৈদান্তিক সার্ব্বভৌম পণ্ডিতও আপনার কাছে পরাভূত হয়ে আপনার শরণাপন্ন হয়েছেন। আপনি ছলনা ত্যাগ করুন। আমরা না বুঝে আপনার চরণে বহু অপরাধ করেছি তজ্জন্য ক্ষমা প্রর্থনা করছি। প্রকাশানন্দ এই বলে প্রভুর চরণ স্পর্শ করতে উদ্যত হলেন, প্রভু উঠে প্রকাশানন্দকে দৃঢ় আলিঙ্গন করলেন ও আসনে বসালেন। অতঃপর অনেক বোঝালেন—

শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী ও সন্ন্যাসীগণ মহাপ্রভুর শুদ্ধ সিদ্ধান্ত শ্রবণ করে অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হলেন। পরে বিনয় সহকারে মহাপ্রভুকে বলতে লাগলেন—

বেদময় মূর্তি তুমি—সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ক্ষম অপরাধ পূর্ব্বে যে কৈলুঁ নিন্দন।।

—চৈঃ চঃ আদি ৭/১৪৮

মহাপ্রভু উঠে প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে আলিঙ্গন করলেন। ভক্তগণ দেখে মহা আনন্দে 'হরি' 'হরি' ধ্বনি করতে লাগলেন। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের আনন্দের সীমা রইল না, প্রেমাশ্রু নেত্রে প্রভুর চরণতলে পড়ে বললেন--হে বাঞ্ছাকল্পতরু! আমি যে বাঞ্ছা করেছিলাম তা পূর্ণ হল। অনন্তর তিনি মহাপ্রভু প্রকাশানন্দ ও সন্ন্যাসীগণকে নিয়ে ভোজন মণ্ডপে প্রবেশ করলেন। যথাযথ আসনে সকলকে বসিয়ে শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ অন্ন প্রদান করলেন। প্রসাদ ভোজন কালে প্রভু এক এক বার মহা 'হরি' 'হরি' ধ্বনি করতে লাগলেন। সেই দিন থেকে কাশী কৃষ্ণ প্রেমময় হয়ে উঠল।

সেই হৈতে সন্ন্যাসীর ফিরে গেল মন।
কৃষ্ণ-কৃষ্ণ নাম সদা করয়ে কীর্তন।।

❊ ❊ ❊ ❊

বাহু তুমি প্রভু বলে বল হরি হরি।
হরি ধ্বনি করে লোক স্বর্গ মর্ত্য ভরি।।

—চৈঃ চঃ আদি ৭/১৫৯

মহাপ্রভু কয়েক দিন কাশীতে অবস্থান করবার পর ভক্তগণ থেকে বিদায় নিয়ে পুরী ধামের দিকে যাত্রা করলেন।

**।। জয় শ্রীমহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ কি জয়।।**



# শ্রীগোবিন্দ দাস

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ও শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ দুই ভাই। শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ মাতামহ শ্রীদামোদর কবিরাজের আলয়ে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ মাতৃগর্ভে অতিরিক্ত মাস অবস্থান করার ফলে জননী সুনন্দার অতিশয় কষ্ট হচ্ছিল। দাসী শ্রীদামোদর কবিরাজকে এসে এ কথা বললেন। তখন শ্রীদামোদর কবিরাজ দেবীর পূজা করছেন। তজ্জন্য দাসীর সঙ্গে কোন কথা না বলে চক্ষে ইঙ্গিত করে বললেন—দেবী-যন্ত্রটী সুনন্দাকে দেখাও, এখনই পুত্র প্রসব হবে। দাসীটী ইঙ্গিত না বুঝে দেবী-যন্ত্র ধৌত করে সেই জল সুনন্দাকে পান করাল, তাতে তিনি সুখে পুত্র প্রসব করলেন।

"শীঘ্র যন্ত্র-ধৌত করি জল পিয়াইল।"

ভক্তিরত্নাকর ৯/১৪৯

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের জন্মের পর পিতা চিরঞ্জীব সেন অপ্রকট হন। তখন থেকে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ও শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ মাতামহ শ্রীদামোদর কবিরাজের আলয়ে প্রতিপালিত হন। শ্রীদামোদর কবিরাজ শাক্ত ছিলেন। মাতামহের সঙ্গ ফলে শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীগোবিন্দ শাক্ত ভাবাপন্ন হন।

শ্রীরামচন্দ্র পরবর্ত্তীকালে শ্রীনিবাস আচার্য্যের অনুগ্রহে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন।

শ্রীগোবিন্দ ঘোরতর শাক্ত হয়ে পড়েন। তিনি ভগবতী ছাড়া অন্য কোন কথা বলতেন না, কোন পূজাও করতেন না। সকলকে ভগবতী উপাসনার কথাই বলতেন। গীত পদ্যাদি যা লিখতেন সমস্তই ভগবতী সম্বন্ধে।

শ্রীরামচন্দ্র শ্রীআচার্য্য স্থানে শিষ্য হৈতে।
গোবিন্দ একান্তে বসি বিচারয়ে চিতে।।
ভগবতী পাদপদ্ম কৈলে আরাধন।
না হৈত কি এ ভব বন্ধাদি মোচন।।

ভক্তিরত্নাকর ৯/১৫৮

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীনিবাস আচার্য্যের অনুগ্রহ পাবার পর শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন— শক্তি উপাসনা মার্গে ভববন্ধন থেকে কি মুক্তি পাওয়া যায় না?

ঠিক সেই সময় তিনি দৈববাণী শুনলেন—

হেন কালে অলক্ষ্যে কহয়ে ভগবতী।
কৃষ্ণ না ভজিলে কারু না ঘুচে দুর্গতি।।

—ভক্তিরত্নাকর ৯/১৫৯

অলক্ষ্যে দেবী যেন বলছেন—শ্রীকৃষ্ণ ভজন ছাড়া কারও ভববন্ধন মোচন হয় না। শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ এই দৈববাণী শুনে বুঝতে পারলেন শ্রীকৃষ্ণ ভজন ছাড়া অন্য কোন মার্গে বা অন্য কোন উপাসনার দ্বারা ভববন্ধন থেকে মুক্তি হয় না— ইহা দেবীর উপদেশ। তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণ ভজন করবার জন্য দৃঢ় সংকল্প করলেন।

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণ ভজনের জন্য বড়ই ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। বড় ভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্র শ্রীনিবাস আচার্য্যের অনুগ্রহে ধন্য হয়েছেন, তিনিও তাই শ্রীআচার্য্যের শ্রীচরণ আশ্রয় করতে উৎসুক হলেন।

আচার্য্য প্রভুর শিষ্য হইব সর্ব্বথা।
তবে সে ঘুচিবে মোর অন্তরের ব্যথা।।

—ভক্তিরত্নাকর ৯/১৬১

আমি নিশ্চয় শ্রীআচার্য্য ঠাকুরের চরণ আশ্রয়ে ধন্য হব। শ্রীগোবিন্দ এইরূপ বিচার করে যাজি গ্রামে যাবার উদ্যোগ করলেন, এমন সময়






শুনলেন শ্রীনিবাস আচার্য্য বৃন্দাবনে চলে গেছেন। শ্রীগোবিন্দের মনে বড় খেদ উপস্থিত হল। তখন তিনি মনে মনে বিচার করতে লাগলেন—

বৈষ্ণবগণেও মোর হিত চিন্তা কৈল।
কহিল পিতার বার্ত্তা তাহা না শুনিল।।
মোর পিতা চিরঞ্জীব সেন বিদ্যাবান।
চৈতন্যচন্দ্রের ভক্ত গুণের নিধান।।
এ হেন সন্তান হৈয়া গেনু ছারে খারে।
এ কেবল কর্ম্মদোষ কি বলিব কারে।।

—ভক্তিরত্নাকর ৯/১৬৬

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ চিন্তা করতে লাগলেন— বৈষ্ণবগণ পূর্বে আমার হিত চিন্তা করে শ্রীকৃষ্ণ ভজনের কথা বলেছিলেন। ভাগ্যদোষে তখন তাঁদের কথায় কর্ণপাত করি নাই।

আমার পিতা চিরঞ্জীব সেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরম অনুগ্রহ পাত্র ছিলেন। তিনি ছিলেন পরম ভাগবত ও সমস্ত গুণের নিধান। হায়! আমি এহেন লোকের সন্তান হয়ে বৃথা জীবন কাটালাম। এ জগতে দেখছি আমার সমান দুর্ভাগা আর কে আছে?

পুনঃ যদিও দেবী স্বয়ং অহৈতুকী কৃপা করে কৃষ্ণ ভজন করতে বললেন, তাতে শ্রীকৃষ্ণ ভজনে কিছুটা মতি হল কিন্তু সদ্‌গুরু কোথায় পাব? মনে করলাম শ্রীনিবাস আচার্য্যের শ্রীচরণ আশ্রয় করব, তিনি ত' শ্রীবৃন্দাবনে বাস করছেন।

মোর জ্যেষ্ঠ আচার্য্য প্রভুর দরশনে।
ফিরিল যেমন নিষ্ঠা হৈল সে চরণে।।

—ভঃ রঃ ৯/১৬৯

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ এই সমস্ত কথা বলে যখন খেদ করছিলেন তখন দৈববাণী শুনলেন—

হেনকালে দৈববাণী হইল আকাশে।
অভিলাষ পূর্ণ হবে অল্প দিবসে।।

—ভঃ রঃ ৯/১৭২

তোমার শীঘ্র অভিলাষ পূর্ণ হবে তুমি ধৈর্য্য ধারণ কর। এবার গোবিন্দ কবিরাজ কিছুটা আশ্বস্ত হ'লেন। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ছোট ভা'য়ের এই সমস্ত চেষ্টা শুনে বড়ই সুখী হলেন।

এদিকে শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্যের জন্য গৌড় দেশবাসী ভক্তগণ বড়ই চঞ্চল হয়ে উঠলেন। আচার্য্যকে শ্রীবৃন্দাবন থেকে আনবার জন্য শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজকে পাঠানো হবে; সকলে ঠিক করলেন।

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ বৈষ্ণবগণের আজ্ঞা নিয়ে শুভদিনে বৃন্দাবন যাত্রা করে, তিনি কুমারহট্ট নগরে ছোট ভ্রাতা শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের কাছে এলেন। শ্রীগোবিন্দের কৃষ্ণ ভজন উৎকণ্ঠা দেখে তিনি খুব সুখী হলেন এবং আচার্য্যপাদ এলেই সব বাসনা সিদ্ধ হবে জানালেন।

এ সময় তিনি শ্রীগোবিন্দ কবিরাজকে কুমার নগর থেকে তেলিয়া বুধরি গ্রামে গিয়ে বাস করতে বললেন। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ বৃন্দাবনে যাবার পর শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ তেলিয়া বুধরি গ্রামে এসে বসত-বাটী নির্মাণ করেন।

ভক্তগণের ইচ্ছায় শ্রীনিবাস আচার্য্য গৌড় দেশে এলেন এবং বিভিন্ন স্থানে ভক্তগণ সঙ্গে সুখে হরিকথা কীর্ত্তন পূর্ব্বক ভ্রমণ করতে লাগলেন। তাঁর শুভাগমনে গৌড় দেশে শ্রীহরি সঙ্কীর্ত্তন বন্যা আরম্ভ হল। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু তাঁর সঙ্গে অবস্থান করছিলেন।

অতঃপর ভক্তগণ সঙ্গে শ্রীআচার্য্য তেলিয়া বুধরিতে এলেন। শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ অতিশয় ভক্তিপূত হৃদয়ে দৈন্য ভরে শ্রীল আচার্য্যকে আমন্ত্রণ করে স্বগৃহে আনলেন। বিপুল ভাবে তাঁর সেবা-আদি করতে লাগলেন। বুধরি গ্রামবাসী আচার্য্য দর্শনে পরমানন্দিত হলেন। এই সময়

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ আচার্য্যের চরণে পড়ে কৃপা প্রার্থনা করলেন। করুণাময় শ্রীআচার্য্য ঠাকুর তাঁকে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল মন্ত্রে দীক্ষিত করলেন।

"রাধা কৃষ্ণ মন্ত্র দীক্ষা দিলেন গোবিন্দে।।"

—ভঃ রঃ ১০/১৭১

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ আচার্য্য চরণে আত্মসমর্পণ করলেন। তাঁর ভক্তি দর্শনে বৈষ্ণবগণের আনন্দের সীমা রইল না। এই সময় গৌড় দেশে পুনঃ প্রেমভক্তি বন্যা প্রবাহিত হল।

গৌড় দেশে শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ মহাকবি বলে বিখ্যাত ছিলেন। তাঁর বিদ্যা প্রতিভা অত্যদ্ভূত ছিল। "তিনি সঙ্গীত-মাধব" নামে একখানি মহানাটক রচনা করেন। তাঁর আরও কয়েকখানি রচিত গ্রন্থ বঙ্গ-সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ আছে। যেমন ছিল তাঁর সংগীত রচনা শক্তি, তেমনি ছিলেন তিনি সুকণ্ঠ গায়ক। শ্রীমদ্ জীব গোস্বামী, শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীজাহ্নবা মাতা গোস্বামিনী প্রভৃতি তাঁর ভক্তিময়ী সংগীত শ্রবণে পরম সুখী হয়ে তাঁকে কবিরাজ উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি শ্রীবিদ্যাপতির মৈথিল ভাষাযুক্ত পদাবলীর অনুসরণে গীত রচনা করেন। তিনি শ্রীরূপ গোস্বামীর ভক্তি-রসামৃত সিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণির শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাব সম্বলিত গীত রচনা করেন। তাঁর সংগীতে এত অনুপ্রাস, এত সরল সহজ ভাষা গম্ভীর ভাব যুক্ত যে শ্রোতার হৃদয় সহজেই আদ্রিভূত করে তুলে।

শরণাগতির দৈন্যাত্মক একটি গীত—

ভজহুঁরে মন, শ্রীনন্দ-নন্দন,
অভয় চরণারবিন্দ রে।
দুর্লভ মানব, জনম সৎসঙ্গে,
তরহু এ ভব সিন্ধু রে।।
শীত আতপ, বাত বরিষণ,
এ দিন যামিনী জাগি রে।
বিফলে সেবিনু, কৃপণ দুরজন,
চপল সুখলব লাগি রে।।
এ ধন যৌবন, পুত্র পরিজন,
ইথে কি আছে পরতীতি রে।
কমল দল জল, জীবন টলমল,
ভজহু হরি পদ নিতি রে।।
শ্রবণ কীর্ত্তন, স্মরণ বন্দন,
পাদ সেবন দাস্য রে।
পূজন সখিজন, আত্ম নিবেদন,
গোবিন্দ দাস অভিলাষ রে।।

* * * *

বিরহ গীত--

পরাণ পিয়া সখি হামারি পিয়া।
অবহু না আওল কুলিশ হিয়া।।
নখর খোয়ায়লু দিবস লিখি-লিখি।
নয়ন অন্ধায়লু পিয়া পথ দেখি।।
যব হাম বালা পিয়া পরিহরি গেল।
কিয়ে দোষ কিয়ে গুণ বুঝই না ভেল।।
অব হাম তরুণি বুঝলু রসভাষ।
হেন জন নাহি যে কহয়ে পিয়া পাশ।।
বিদ্যাপতি কহ কৈছন প্রীত।
গোবিন্দ দাস কহ ঐছন রীত।।

* * * *

বিরহ গীত--

মাধব তুহুঁ রহলি মধুপুর।
ব্রজপুর আকুল দুকুল কলরব
কানু কানু করি ঝুর।।
যশোমতী নন্দ অন্ধ সম বৈঠত
সাহসে উঠই না পার।
সখাগণ বেনু ধেনু সব বিছুরল
বিছুরল নগর বাজার।।
কুসুম ত্যজিয়া অলি ক্ষিতিতলে লুঠই

তরুগণ মলিন সমান।
শারি শুক পীক ময়ুরী না নাচত
কোকিল না করতঁহি গান।।
বিরহিনী বিরহ কি কহব মাধব
দশবিশ বিরহ হুতাশ।
সহজে যমুনা জল হোয়ল অধিক
কহ তহি গোবিন্দ দাস।।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব রস সাহিত্য হিসাবে শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের এই সমস্ত গীতি অনুপম। স্বয়ং শ্রীমদ্ জীব গোস্বামী শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের পদ সমূহ শ্রবণে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে 'কবিরাজ' আখ্যা প্রদান করেছিলেন। শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের পদাবলী গীত সংখ্যা পদকল্পতরুতে ৪৬০ আছে।

গোবিন্দ কবিরাজের জন্ম ১৪৫৯ শকে, অপ্রকট ১৫৩৫ শকে, আশ্বিন মাসের শুক্ল প্রতিপদে। তাঁর পত্নীর নাম মহামায়া। পুত্রের নাম শ্রীদিব্যসিংহ। দিব্যসিংহের পুত্রের নাম কবি ঘনশ্যাম।

**।। জয় শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ কি জয়।।**

# শ্রীজ্ঞান দাস

শ্রীমদ্ জ্ঞান দাসের জন্ম আনুমানিক ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে। ভক্তিরত্নাকরে শ্রীজ্ঞান দাসের বাসভূমি সম্বন্ধে উল্লেখ আছে–

রাঢ় দেশে কাঁদড়া নামেতে গ্রাম হয়।
তথায় মঙ্গল জ্ঞানদাসের আলয়।।

শ্রীমদ্ জ্ঞান দাস নিত্যানন্দ শক্তি শ্রীজাহ্নবা দেবীর শিষ্য ছিলেন। তিনি বীরভূম জেলার কাঁদড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।

আজও কাঁদড়া গ্রামের শ্রীমদ্ জ্ঞান দাসের ঠাকুর বাড়ী আছে। তিনি বিবাহ করেন নাই। তাঁর জ্ঞাতি-বংশধরগণ বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত কোতলপুর গ্রামে আছেন।

''পদসমুদ্র নির্য্যাস তত্ত্বের'' সংগ্রহ কর্ত্তা বাবা মনোহর দাস শ্রীমদ্ জ্ঞান দাসের মিত্র ছিলেন। শ্রীমনোহর দাসও শ্রীজাহ্নবা দেবীর শিষ্য ছিলেন।

শ্রীমদ্ জ্ঞান দাস রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। খেতরির মহোৎসবে ইনি শ্রীজাহ্নবা দেবীর সঙ্গে এসেছিলেন। বাবা মনোহর দাসও উৎসবে যোগদান করেছিলেন।

শ্রীনরোত্তম বিলাসে আছে–

শ্রীল রঘুপতি উপধ্যায় মহীধর।
মুরারি, মুকুন্দ, জ্ঞান দাস, মনোহর।।

'মনোহর' মনোহর দাস বুঝতে হবে। প্রতি বছর পৌষ পূর্ণিমার সময় কাঁদড়া গ্রামে শ্রীমদ্ জ্ঞান দাসের নামে শ্রীহরি নাম সংকীর্ত্তন মহোৎসব হয়।

শ্রীমদ্ জ্ঞান দাস কবি ও পদকর্ত্তা ছিলেন, তাঁর পদ কীর্ত্তন অতি সরস ও হৃদয়গ্রাহী।

**পদ কীর্ত্তন–শ্রীনিত্যানন্দ রূপ-গুণ বর্ণন–**

আরে মোর আরে মোর নিত্যানন্দ রায়।
আপে নাচে আপে গায় চৈতন্য বোলায়।।
লম্ফে লম্ফে যায় নিতাই গৌরাঙ্গ আবেশে।
পাপিয়া পাষণ্ড আর না রহিল দেশে।।
পট্টবাস পরিধান মুকুতা শ্রবণে।
ঝল মল ঝল মল করে নানা আভরণে।।

সঙ্গে রঙ্গে যায় নিতাই রামাই সুন্দর।
গৌরি দাস আদি করি সঙ্গে সহচর।।
চৌদিকে নিতাই মোর হরি বোল বোলায়।
জ্ঞান দাস নিশি দিশি নিতাই গুণ গায়।।

—

পূরবে গোবর্দ্ধন ধরল অনুজ যার
জগ জনে কহে বলরাম।
এবে সে চৈতন্য সঙ্গে আইলা কীর্ত্তন রঙ্গে
ধরি পহুঁ নিত্যানন্দ নাম।।
পরম উদার করুণাময় বিগ্রহ
ভুবন মঙ্গল গুণ ধাম।
গৌর প্রেম রসে কটির বসন খসে
অবতার অতি অনুপাম।।
নাচত গাওত হরি হরি বোলত
নিরবধি জনু মাতোয়াল।
হাস প্রকাশ মিলিত মধুরাধরে
বোলত পরম রসাল।।
রাম দাসের পহুঁ সুন্দরের জীবন
গৌরী দাসের ধন প্রাণ।
অখিল জীব যত এহ রসে উনমত
জ্ঞান দাস গুণ গান।।

—

**হোরি লীলা–**

দোলত রাধা মাধব সঙ্গে।
দোলায়ত সব সখিগণ বহু রঙ্গে।।
ডারত ফাগু দুহুঁ জন অঙ্গে।
হেরইতে দুহুঁ রূপ মুরুছে অনঙ্গে।।
বাওত কত কত যন্ত্র সুতান।
কত কত রাগ মাল করুগান।।
চন্দন কুঙ্কুম ভরি পিচকারি।
দুহুঁ অঙ্গে কোই কোই দেওত ডারি।।
বিগলিত অরুণ বসন দুহুঁ গায়।
শ্রম জল বিন্দু বিন্দু শোভে তায়।।
হেম মরকতে জনু জড়িত পঙার।
তাহে বেঢ়ল গত মোতিম হার।।
দোলোপরি দুহুঁ নিবিড়বিলাস।
জ্ঞানদাস হেরি পুরয়ে আশ।।

—

বিরহ–

শুন শুন নিরদয় কান।
তুহুঁ অতি হৃদয় পাষাণ।।
সো ধনি বিরহ বিষাদে।
খোয়ল কুল মরিষাদে।।
জীবন তনু ছিল শেষ।
সেই রহত অবলেশ।।
তাকর নাহিক আশ।
অতয়ে আয়লু তুয়া পাশ।।
খেনে মুরছিত খেনে হাস।
খেনে তান গদ গদ ভাষ।।
উঠিতে শকতি নাই তার।
জীবন মানয়ে ভার।।
চৌদশি চাঁদ সমান।
মলিন না ধরল বয়ান।।
ভউতলে শুতলি তায়।
সহচরি করু কি উপায়।।
জ্ঞান দাস কহ রোষ।
তিরি বধ লাগব তোয়।।

**।। জয় শ্রীজ্ঞান দাস কি জয়।।**




# শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী

শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী শ্রীজাহ্নবা মাতা গোস্বামিনীর প্রতিপাল্য শিষ্য ছিলেন।

শ্রীবংশীবদন ঠাকুরের পুত্র—(১) শ্রীচৈতন্যদাস ও (২) শ্রীনিত্যানন্দ দাস। শ্রীচৈতন্যদাসের পুত্র শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী। ইনি মহাপ্রভাবশালী আচার্য্য ছিলেন। এঁনাকে দ্বিতীয় বংশীবদন ঠাকুর বলা হত।

তিনি পুরী, কাশী, প্রয়াগ ভ্রমণ করে মথুরায় আসেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থলী আদি কেশব প্রভৃতি দর্শন করেন। অনন্তর গোকুলের দ্বাদশ বনাদি দর্শন করেন। বৃন্দাবন ধামে তিনি কয়েক বছর অবস্থান করেছিলেন। অতঃপর তিনি রাম ও কৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি নিয়ে গৌড়দেশে আগমন করেন। তাঁর ভক্তি সিদ্ধান্ত শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ভক্তি সদাচারতা ও আচার-নিষ্ঠা প্রভৃতি দেখে সকলে মুগ্ধ হন। অল্পকাল মধ্যে তাঁর যশ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। বহু সম্ভ্রান্ত পণ্ডিত ও ধনাঢ্য ব্যক্তি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

অম্বিকা নগরের দুই ক্রোশ পশ্চিমে বালুকা নাম্নী একটা ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিতা, তার তীরে ছিল ঘোর জঙ্গল। জঙ্গলে ছিল হিংস্র ব্যাঘ্রের বাস। সেই স্থানে শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী বসবাস করতে লাগলেন। চারিদিকে শিষ্যগণের বসত বাটী করলেন। গোস্বামীর প্রভাবে সেই স্থান যেন মহাতীর্থে পরিণত হল। গোস্বামী মহোদয় এক দিন একটি ব্যাঘ্রকে হরিনাম করতে বললেন। ব্যাঘ্রটি হরিনাম করতে লাগল। তিনি যাঁকে নাম উপদেশ করতেন, তিনি নামে মত্ত হতেন এবং উদ্ধার লাভ করতেন। সেইজন্য ঐ স্থানের নাম হল ''বাঘনাপাড়া'' ব্যাঘ্রকে উপদেশ দিয়ে উদ্ধার করলেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় বাঘ্নাপাড়া গোস্বামিদিগের এক প্রশস্তি পত্রে বাঘ্নাপাড়া নামের কারণ উল্লেখ করেছেন।

''জয়তঃ শ্রীরামকৃষ্ণৌ বাঘ্না পল্লীবিভূষণৌ।
জাহ্নবীবল্লভৌ রামচন্দ্রকীর্ত্তিস্বরূপকৌ।।
ব্যাঘ্রোপ্তি বৈষ্ণবঃসাক্ষাৎ যৎপ্রভাবাদ্বভূব তৎ।
ব্যাঘ্নাপল্ল্যাত্মকং বন্দে শ্রীপাটং গৌড়পাবনং।।
—(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের স্বলিখিত জীবনী)

বাঘ্নাপাড়ায় শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী শ্রীরাম ও কৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। অদ্যাপি সেই মূর্ত্তি তথায় বিরাজ করছেন। পশ্চিম অঞ্চলের কোন বণিক ভক্ত বিগ্রহের জন্য উত্তম মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছিলেন।

শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী সম্বন্ধে বৈষ্ণব-বন্দনা গ্রন্থে আছে—

জাহ্নবীর প্রিয় বন্দ্য রামাই গোসাঞী।
যে আনিল গৌড় দেশে কানাই বলাই।।
যৈছে বীরভদ্র জানি তৈছে শ্রীরামাই।
জাহ্নবী মাতার আজ্ঞা ইথে আন নাই।।

শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামীর শ্রীরামকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রাপ্তি সম্বন্ধে এইরূপ কিংবদন্তী আছে—

অরুণ উদয় কালে তীর্থ প্রস্কন্দনে।
স্নান করিবারে প্রভু করেন গমনে।।
স্নান কালে রাম কৃষ্ণ শ্রীমূর্ত্তি যুগল।
প্রভু রামচন্দ্র কোলে আসিয়া উঠিল।।

—বংশীশিক্ষা

প্রস্কন্দন তীর্থে স্নান করবার সময় 'শ্রীরামকৃষ্ণ' রামচন্দ্র গোস্বামী মহোদয়ের কোলে এসে উঠলেন।





ভগবান্ ভক্তের থেকে কি ভাবে সেবা নেন এবং কিভাবে জগজ্জীবের উদ্ধারের জন্য প্রকটিত হন তা কে বুঝতে পারে?

একদিন রাত্রিকালে শ্রীবীরচন্দ্র গোস্বামী বহু শিষ্য নিয়ে শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামীর গৃহে এলেন এবং বললেন অদ্য আম্র প্রসাদ গ্রহণ করতে চাই। কোন শিষ্যের দ্বারা বকুল বৃক্ষ থেকে আম্রফল পাড়িয়ে শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী শ্রীবীরচন্দ্র গোস্বামীকে ও শিষ্যগণকে ভোজন করালেন।

শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী একজন বিখ্যাত পদকর্ত্তা ছিলেন। তিনি ১৪৫৯ শকে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫০৫ শকের মাঘ মাসের কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথিতে অপ্রকট হন। তিনি কখনও বুধরী গ্রামে কখনও বাঘ্নাপাড়ার নিকটে রাধানগরে অবস্থান করতেন। ইনি ব্রহ্মচারী ছিলেন। ছোট ভ্রাতা শ্রীশচীনন্দনকে মন্ত্র দীক্ষা প্রদান করে বাঘ্নাপাড়ায় শ্রীবিগ্রহ সেবায় নিযুক্ত করেন। শচীনন্দন গোস্বামী স-পরিবারে বাঘ্নাপাড়াতে অবস্থান করেন। পরবর্ত্তী কালে শ্রীযুক্ত বিহারী গোস্বামী প্রভৃতি তাঁর বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী লিখিত গ্রন্থ—১। করচাঞ্জরী ২। সম্পূটিকা ও ৩। পাষণ্ড দলন।

তাঁর দুইটি পদকীর্ত্তন শ্রীপদকল্পতরু গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে।

পহুঁ মোর গৌরাঙ্গ রায়।  
শিব শুক বিরিঞ্চি যার গুণ গায়।।  
কমলা যাঁহার ভাবে সদাই আকুলি।  
সেই পহুঁ বাহু তুলি কান্দে হরি বলি।।  
যে অঙ্গ হেরি হেরি অনঙ্গ ভেল কাম।  
সো অব কীর্ত্তন ধূলি ধূসর অভিরাম।।  
খেনে রাধা রাধা বলি উঠে চমকিয়া।  
গদাধর নরহরি রহে মুখ চাঞা।।  
পূরব নিবিড় প্রেমে পুলকিত অঙ্গ।  
রামচন্দ্র কহে কে না বুঝে ও না রঙ্গ।।

⁂ ⁂ ⁂ ⁂

দেখ শচীনন্দন জগত জীবন ধন  
অনুক্ষণ প্রেমধন জগজনে যাচে।  
ভাবে বিভোর বর গৌর পুলকিত  
সঘনে বোলাঞা হরি গোরা পহুঁ নাচে।।  
সব অবতার সার গোরা অবতার।  
হেম বরণ যিনি নিরুপম তনু খানি  
অরুণ নয়নে বহে প্রেমক ধার।।  
বৃন্দাবন গুণ শুনি লুঠত সে দ্বিজমণি  
ভাব ভরে গরগর পহুঁ মোর হাসে।  
কাশীশ্বর অভিরাম পণ্ডিত পুরুষোত্তম  
গুণ-গান করতহি নরহরি দাসে।।  
খোল করতাল শুনি কিবা শিশু কিবা ধনী  
ধায়ত সবহুঁ প্রেম প্রতি আশে।  
এমন গৌর গুণ যাক জাগয়ে মনে  
তাকর সেবক রামচন্দ্র দাসে।।

**।। জয় শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী কি জয়।।**






# ছোট হরিদাস ঠাকুর

ছোট হরিদাসকে দিয়ে মহাপ্রভু সমস্ত বৈরাগীগণকে শিক্ষা দিয়েছেন।

একদিন শ্রীভগবান্ আচার্য্য মহাপ্রভুকে ভোজন করাতে ইচ্ছা করলেন। তাই ছোট হরিদাসকে বললেন—আমার নাম করে মহাপ্রভুর সেবার জন্য ভাল শালীধান্যের চাল শ্রীমাধবী দেবীর কাছ থেকে চেয়ে আন। শ্রীহরিদাস তাই মাধবী দেবীর কাছ থেকে চাল এনেছেন।

শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান্ আচার্য্যের ঘরে ভোজন করে গম্ভীরাতে ফিরে এলেন এবং বললেন—আজ থেকে ছোট হরিদাস যেন আমার এখানে না আসে। এ কথা শুনে দুঃখে হরিদাস তিন দিন অনশনে রইলেন। শ্রীস্বরূপ দামোদর আদি ভক্তগণ তাঁর জন্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণে অনেক অনুনয়-বিনয় আদি করতে লাগলেন।

মহাপ্রভু বললেন—

বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারো আমি তাহার বদন।।
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন।।
ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া।।

—চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ২/১২০

এ সব কথা বলে প্রভু মৌন হলেন। স্বরূপাদি ভক্তগণ আর কিছুই না বলে নিজ নিজ স্থানে চলে গেলেন।

মহাপ্রভুর গভীর আশয় বুঝবার সাধ্য কার আছে? তিনি ঈশ্বর অচিন্ত্য অগম্য তত্ত্ব স্বরূপ। শ্রীমাধবী দেবী শ্রীরাধিকার অংশ রূপা। তিনি বৃদ্ধা নিরন্তর ভজনশীলা।

লোক-শিক্ষক প্রভুর এই এক লীলা। তিনি ঠাকুর বড় শ্রীহরিদাসের দ্বারা জগতে শ্রীহরিনাম গ্রহণকারী সাধু ও শ্রীনামের মহিমা প্রচার করেছেন। ছোট হরিদাস ঠাকুরের দ্বারা জগতে শ্রীহরিনাম গ্রহণকারী সাধু ও অসাধুর স্বরূপ প্রচার করেছেন। বাস্তবিক পক্ষে ছোট হরিদাস ঠাকুর মহাপ্রভুর পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি পরম শুদ্ধ-স্বরূপ ছিলেন। মহাপ্রভুর কীর্ত্তনীয়াদিগের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।

আর একদিন শ্রীস্বরূপ দামোদর আদি ভক্তগণ মহাপ্রভুর শ্রীচরণে এসে হরিদাসের জন্য অনুনয় ও ক্ষমা ভিক্ষা করতে লাগলেন। তদুত্তরে মহাপ্রভু বললেন—

"মোর বশ নহে মোর মন।
প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগী না করি দর্শন।।"

আমার মন আমার বশ নয়। আমার মন প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগীর দর্শন করতে চায় না অতএব আমি কি করব? তোমরা নিজ নিজ কার্য্যে গমন কর। যদি পুনঃ কিছু বল অন্যত্র চলে যাব। প্রভুর কথা শুনে ভক্তগণ নীরব হলেন এবং নিজ নিজ কার্য্যে চলে গেলেন।

ছোট হরিদাসের অপরাধ কি ভক্তগণ বুঝতে পারলেন না। এ যেন প্রভুর একটি অগম্য লীলা। ভক্তকে লক্ষ্য করে জগৎকে শিক্ষা দেন। এ লীলা দেখে বৈরাগীগণ ত' সাবধান হ'লেন, গৃহস্থগণও সাবধান হলেন।

দেখি ত্রাস উপজিল সব ভক্তগণে।
স্বপ্নেহ ছাড়িল সব স্ত্রী-সম্ভাষণে।।

—চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ২/১৪৪

হরিদাসের জন্য কিছু বলতে একদিন স্বরূপাদি ভক্তগণ শ্রীপরমানন্দ পুরীপাদকে মহাপ্রভুর কাছে প্রেরণ করলেন। পুরীপাদ মহাপ্রভুর কাছে এলেন। মহাপ্রভু বহু সমাদর করে পুরীকে বসালেন। পুরী গোস্বামী বলতে লাগলেন নিজ পুত্র প্রতি কি ক্ষমা করতে হয় না? সেইরূপ হরিদাসকে ক্ষমা কর।

পুরী গোস্বামীর এই কথা শুনে মহাপ্রভু যেন রোষভরে বললেন—শ্রীপাদ! ঠিক কথা। হরিদাসকে নিয়ে আপনি এখানে থাকুন। আমি আলালনাথে চলে যাচ্ছি। এ কথা বলে গোবিন্দকে সঙ্গে নিয়ে তখনই চলে যেতে উদ্যত হলেন। অমনি তাড়াতাড়ি পুরী গোস্বামী সামনে এসে হাতে ধরে অনুনয়-বিনয় করে তাঁকে ঘরে ফিরিয়ে আনলেন। পুরী গোস্বামী বললেন—তোমার যা ইচ্ছা তা কর, তোমাকে আর কেউ কিছু বলবে না।

পুরী গোস্বামী ছোট হরিদাসের কাছে এলেন এবং বলতে লাগলেন—সকলে তোমার হিত কামনা করছেন। প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর। কৃপা নিশ্চয় করবেন, তুমি বাড়াবাড়ি করলে তিনিও জিদ্ করবেন। তুমি উঠে স্নান ভোজন কর। এভাবে তাঁকে ভক্তগণ অনেক বুঝিয়ে স্নান ভোজনাদি করালেন। মহাপ্রভু যখন জগন্নাথে যান তখন দূর হতে হরিদাস তাঁকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণামাদি করেন। এ ভাবে বছর কেটে গেল কিন্তু মহাপ্রভু হরিদাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন না।

হরিদাস বড়ই দুঃখিত হলেন, একদিন রাত্রি শেষে মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণাম করে প্রয়াগ ধামের দিকে যাত্রা করলেন। হরিদাস প্রয়াগ ধামে পৌঁছিয়ে কয়েকদিন থাকার পর, একদিন মহাপ্রভুর শ্রীচরণ চিন্তা করতে করতে জলে সমাধি গ্রহণ করলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ দিব্য-দেহ প্রাপ্ত হলেন। সে দেহে মহাপ্রভুর শ্রীচরণে এলেন। এবার প্রভুর কৃপা হল।

"প্রভু কৃপা লঞা অন্তর্দ্ধানে রহিলা।।
গন্ধর্ব্ব দেহে গান করে অন্তর্দ্ধানে।
রাত্রে প্রভুরে শুনায় অন্য নাহি জানে।।"

—চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ২/১৪৯

বৈকুণ্ঠস্থ গন্ধর্ব্বদেহ প্রাপ্ত হয়ে হরিদাস শ্রীমহাপ্রভুর সন্নিধানে অবস্থান পূর্ব্বক রাত্রিকালে কীর্ত্তন শুনাতে লাগলেন। লীলাময় প্রভুর লীলা কে বুঝবে? একদিন হঠাৎ ভক্তগণকে জিজ্ঞাসা করলেন—হরিদাস কোথায়? তাঁকে এখানে নিয়ে এস। ভক্তগণ বললেন—হে প্রভো! তোমার কৃপার আশায় এক বছর কাল থাকার পর হঠাৎ কোথায় গেছে তা আমরা কেউ জানি না। এ কথা শুনে মহাপ্রভু মৃদু হাস্য করলেন। মহাপ্রভুর হাস্য দেখে ভক্তগণের মনে সন্দেহ হল।

একদিন মহাপ্রভু ভক্তগণসহ সমুদ্রস্নান করছেন। এমন সময় সমুদ্রের মাঝখান থেকে হরিদাসের কণ্ঠের মধুর কীর্ত্তন ধ্বনি ভেসে আসতে লাগল। সকলে অবাক। দেখা যায় না, কিন্তু হরিদাসের মধুর কণ্ঠের কীর্ত্তন ধ্বনি শুনা যায়। গোবিন্দ মুকুন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ বললেন এতো হরিদাসের কণ্ঠস্বর। হরিদাস আত্মঘাতী হয়ে ব্রহ্মরাক্ষস রূপে গান করছে।

স্বরূপ দামোদর প্রভু বললেন এ সব অনুমান ঠিক নয়। যে আজীবন কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, মহাপ্রভুর সেবা ও ক্ষেত্রে বাস করল সে কখনও ব্রহ্মরাক্ষস হতে পারে না। বৈকুণ্ঠে অবস্থান পূর্ব্বক গন্ধর্ব্ব দেহে সে মহাপ্রভুকে কীর্ত্তন শুনাচ্ছে। সব কিছুই পরে জানতে পারবে।

এমন সময় প্রয়াগ হতে একজন বৈষ্ণব এলেন। তাঁর মুখে সকলে ছোট হরিদাসের সমস্ত কথা শুনতে পেলেন।

পর বছর যখন গৌড় ভক্তগণ রথযাত্রার সময় পুরীতে এলেন, শ্রীবাস পণ্ডিত একদিন মহাপ্রভুকে

জিজ্ঞাসা করলেন—হরিদাস কোথায়? মহাপ্রভু বললেন—‘‘স্বকর্ম ফলভুক্ পুমান্।’’

এ লীলার গূঢ় তাৎপর্য্য শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন—

আপন কারুণ্য লোকে বৈরাগ্য শিক্ষণ।
স্বভক্তের গাঢ় অনুরাগ প্রকটীকরণ।।
তীর্থের মহিমা নিজ ভক্তে আত্মসাৎ।
এক লীলায় করেন প্রভু কার্য্য পাঁচ সাত।।

—চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ২/১৬৯

**।। জয় শ্রীল ছোট হরিদাস প্রভু কি জয়।।**

# জগাই-মাধাই

একদিন মহাপ্রভু আদেশ করলেন—

শুন শুন নিত্যানন্দ, শুন হরিদাস।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ।।
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
‘বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা।।’
ইহা বই আর না বলিবা, বলাইবা।
দিন-অবসানে আসি’ আমারে কহিবা।।

চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৩/৮-১০

শ্রীহরিদাস ঠাকুর ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর আদেশে বেড়িয়ে পড়লেন। পূর্ব্বাহ্নে কিভাবে হরিনাম প্রচার করেছেন, তা অপরাহ্নকালে শ্রীমহাপ্রভুর কাছে বলতে লাগলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ বললেন-- আজ নগরে এক অপরূপ দৃশ্য দেখলাম।

প্রভু—কি অপরূপ দৃশ্য দেখ্‌লে?

নিত্যানন্দ—ভয়ঙ্কর দুই মাতাল, তারা নাকি জাতিতে ব্রাহ্মণ?

প্রভু—তারপর?

নিত্যানন্দ—তাদের কাছে বললাম ‘হরে কৃষ্ণ’ বল।

প্রভু—তারপর?

নিত্যানন্দ—তারপর আর কি? ধেয়ে আসল মারবার জন্য, ভাগ্যক্রমে বেঁচে এলাম।

প্রভু—সে দুই বেটা কে?—

গঙ্গাদাস—প্রভো! তারা দুজন ব্রাহ্মণের ছেলে, তাদের পিতা-মাতা অতি শুদ্ধাচারী ছিলেন। তারা আগে নদীয়ায় কোতোয়ালের কাজ করতো। আগে ভাল ছিল। অধুনা এমন পাপ নাই যা তারা করে না। মদ্য-পান ও চুরি হল তাদের বড় কাজ। সে দুজনের নাম জগাই আর মাধাই।

মহাপ্রভু—চিনতে পেরেছি, চিনতে পেরেছি। সে দু বেটা যদি এখানে আসে, খণ্ড খণ্ড করব।

নিত্যানন্দ—তাদের খণ্ড খণ্ড কর আর না কর, সে দুজন থাকতে আমি কোথাও যাব না। তাদের গোবিন্দ নাম বলাও দেখি। তবে ত’ তোমার মহিমা বুঝব। ভাল লোককে হরিনাম বলান সহজ। এদের যদি হরি বলাতে পার, তবে ত’ বাহাদুরি।

প্রভু হাস্য করে বললেন—তারা উদ্ধার পেয়ে গেল।

নিত্যানন্দ—তারা উদ্ধার পেল! কি করে পেল?

প্রভু—তোমার দর্শন যখন পেয়েছে, তাদের উদ্ধার না হয়ে কি পারে? তুমি যখন তাদের কল্যাণ চিন্তা করছ তাদের উদ্ধার অবশ্যম্ভাবী। প্রভুর কথা শুনে বৈষ্ণবগণ আনন্দে হরি হরি ধ্বনি করলেন। সকলে বুঝলেন জগাই মাধাইর উদ্ধার লাভ হবে।

শ্রীহরিদাস ঠাকুর অদ্বৈত আচার্য্যের কাছে

বলতে লাগলেন—হে আচার্য্য? প্রভু আমাকে এক মহা চঞ্চলের সহিত পাঠান। তিনি থাকেন কোথায়? আর আমি থাকি কোথায়? গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কেটে চলেছেন, আমি ত' ডেকে ডেকে হয়রান হয়ে যাই। বর্ষাকালে গঙ্গায় কুমীর ঘুরে বেড়ায়। আমার ত' ভয় করে। বৃষ দেখলে ''আমি মহেশ'' বলে তার উপরে চড়েন। গাভী দেখলে দোহন করে দুধ খেতে থাকেন। আমি যদি নিষেধ করি তখন বলেন ''তোর ঠাকুর আমাকে কি করতে পারে?''

আচার্য্য--এইটি শ্রীনিত্যানন্দের অবধূত ভাবের বর্ণনা তিনি কৃষ্ণপ্রেমে পাগল।

হরিদাস—আজ ত' ভাগ্য গুণে বেঁচে এসেছি।

আচার্য্য—কেন? কি হয়েছিল?

হরিদাস—দুই বড় মাতাল রাস্তায় পড়ে আছে। তাদের কাছে গিয়ে বললাম—হরিনাম বল। এ উপদেশ শুনে দু মাতাল লাফিয়ে এল মারতে। অবধূত পালিয়ে গেলেন। আমি বৃদ্ধ; দৌঁড়াতে পারি না। পেছন থেকে দাঁড়া দাঁড়া বলতে বলতে মদের নেশায় দুজন রাস্তায় পড়ে গেল। আপনার কৃপায় আজ বেঁচে এলাম।

আচার্য্য—হরিদাস! তুমি যা বলছ সব ঠিক। জগাই-মাধাই দুই মাতাল, অবধূত আর এক মাতাল। তিন মাতাল এক জায়গায় থাকা ঠিক নয়। হরিদাস! শুন এই অবধূত দু-তিন দিনের মধ্যে ঐ দু মাতালকে এখানে নিয়ে আসবে। দেখবে তাদের সঙ্গে নাচবে। চল তুমি ও আমি জাত-পাত নিয়ে পালাই।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীহরিদাস এভাবে ব্যঙ্গ উক্তিচ্ছলে নিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা কীর্ত্তন করছেন শুনে ভক্তগণ আনন্দ-সাগরে ভাসতে লাগলেন।

জগাই-মাধাই মদ খেয়ে রাত্রে মহাপ্রভুর বাড়ীর কাছে পড়ে থাকে। কোন সময়ে কীর্ত্তনের তালে তালে নাচে। সকাল বেলা প্রভুকে দেখে বলে—বেশ কীর্ত্তন হয়েছে। বেশ কীর্ত্তন হয়েছে। গায়কদের একটু দেখতে চাই, তাদের ভাল ভাল জিনিস এনে দিব।

একদিন সন্ধ্যার সময় প্রেমরসে মত্ত হয়ে শ্রীনিত্যানন্দ সেখানে গেলেন। জগাই মাধাইকে জড়িয়ে ধরলেন।

জগাই মাধাই বলল—কে জড়িয়ে ধরল?

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বললেন—আমি অবধূত।

অবধূত নাম শুনি মাধাই কুপিয়া।
মারিল প্রভুর শিরে মুটকী তুলিয়া।।
—চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ১৩/১৭৮

অবধূত নাম শুনে মাধাই মুটকী (ভাঙ্গা কলসীর কানা) তুলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শিরে মারল। শির কেটে দর দর ধারে রক্ত পড়তে লাগল। শ্রীনিত্যানন্দ প্রেমরসে উন্মত্ত, কেবল ''হরি বোল'' ''হরি বোল'' বলছিলেন।

মাধাই আবার মারতে উদ্যত হল। জগাই অমনি মাধাইর হাত চেপে ধরল। বলল দেশান্তরী সন্ন্যাসী মেরে লাভ কি?

ভক্তগণ তাড়াতাড়ি মহাপ্রভুর কাছে সংবাদ দিলেন। প্রভু তৎক্ষণাৎ সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে ছুটে এলেন। দেখলেন প্রেমরসে বাহ্যদশাশূন্য নিত্যানন্দের ললাট থেকে দর দর করে রক্ত পড়ছে। শ্রীনিত্যানন্দের উপর এই অত্যাচার মহাপ্রভু সইতে পারলেন না। ক্রোধে কেঁপে উঠলেন। সুদর্শন! সুদর্শন! বলে নিজ চক্রকে ডাকতে লাগলেন। অমনি ভয়ঙ্কর চক্র তথায় উপস্থিত হল। জগাই-মাধাই সেই ভয়ঙ্কর চক্র দেখে ভয়ে একেবারে জড়সড় হয়ে পড়ল। চক্রের কি তেজ! কোটি ব্রহ্মাণ্ড ক্ষণকাল মধ্যে ভস্মসাৎ করতে পারে।

ভক্তগণ বড় ভীত হয়ে পড়লেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও চাইলেন না, জগাই মাধাইকে এ ভাবে বধ করা হোক। তিনি করজোড়ে বলতে লাগলেন—ঠাকুর! ক্রোধ সংবরণ কর। এ অবতারে ত' অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা দৈত্য বধ করা হবে না। এই দুই পাপীর প্রাণ ভিক্ষা আমি চাই।



তাদের প্রতি নিত্যানন্দ প্রভুর অহৈতুকী কৃপা দেখে মহাপ্রভু স্তম্ভিত হলেন। ভক্তগণ বিস্মিত হলেন। এত দয়া এত করুণা! এত প্রহার খেয়েও শ্রীনিত্যানন্দের বিন্দুমাত্র দ্বেষ নাই।

এদিকে জগাই-মাধাই সুদর্শন চক্র দেখে ভীত হয়ে অমনি মহাপ্রভুর শ্রীচরণতলে লুটিয়ে পড়ল। মাধাই নিত্যানন্দকে মারতে গেলে জগাই ধরেছিল বলে, মহাপ্রভু জগাইকে বললেন—"কৃষ্ণ তোকে কৃপা করবেন। তোর প্রেমভক্তি হউক।" জগাইকে আশীর্ব্বাদ করা মাত্র সে প্রেমে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হল। তখন মহাপ্রভু বললেন—"জগাই! ওঠ! আমার দিব্যরূপ দর্শন কর। আমি সত্য সত্যই তোকে প্রেম ভক্তি দিলাম।"

জগাই উঠে নেত্র খুলে দেখল মহাপ্রভু চতুর্ভূজ মূর্ত্তি ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছেন।

চতুর্ভূজ শঙ্খ, চক্র, গদাপদ্মধর।
জগাই দেখিল সেই প্রভু বিশ্বম্ভর।।

—চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ১৩/১৯৬

জগাই পুনর্ব্বার মহাপ্রভুর শ্রীচরণ মূলে লুটিয়ে পড়ল। মহাপ্রভু তাকে শ্রীচরণ দিলেন। জগাই তা নিজ বক্ষের উপর স্থাপন করল।

মহাপ্রভু জগাইকে কৃতার্থ করেছেন দেখে মাধাইও প্রভুর চরণে দণ্ডবৎ করে কৃপা-ভিক্ষা করতে লাগল।

প্রভু—তোকে কৃপা করব না।

মাধাই—প্রভো! দুই ভাই একই প্রকার পাপ করেছি। একজনকে কৃপা করলেন, আর একজনকে করবেন না কেন?

প্রভু—তুই নিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গে রক্তপাত করেছিস্। নিত্যানন্দের ন্যায় প্রিয় আমার কেহ নাই। আমার দেহ থেকেও নিত্যানন্দকে অধিক মনে করি। নিত্যানন্দ যদি তোকে কৃপা করে তবেই আমার কৃপা পাবি। মাধাই অমনি শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীচরণ তলে লুটিয়ে পড়ল। বলল—প্রভো! আমি তোমার রক্তপাত করেছি। তুমি যদি ক্ষমা না কর আমার নিস্তার নাই।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বললেন—মাধাই! তোর সমস্ত অপরাধ দূর হল, প্রভুর দিব্যরূপ দর্শন কর। তোদের সমস্ত ভার আমি নিলাম। আর কোন পাপ করিস্ না।

মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা প্রাপ্ত হয়ে জগাই-মাধাই তাঁদের শ্রীচরণে পড়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন। শ্রীগৌর ও শ্রীনিত্যানন্দ দুই জনকে তুলে আলিঙ্গন করে বললেন—তোদের সমস্ত পাপ দূর হল। আজ থেকে তোরা পরম পবিত্র হলি ও আমাদের ভক্ত হলি। তোদের যারা ভোজন করাবে, তারা আমাকেই ভোজন করাবে।

তো দোহার মুখে মুঞি করিব আহার।
তোর দেহে হইবেক মোর অবতার।।

—চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ১৩/২২৮

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের মধুর লীলা দর্শন করে ভক্তগণ প্রেমভরে হরি হরি ধ্বনি করতে লাগলেন। সেই দিন থেকে জগাই-মাধাই প্রভুর ভক্তগণের অন্যতম হল। গঙ্গার ঘাটে বসে নিরন্তর হরিনাম করতে লাগল এবং সকলের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগল।

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ দুই ভাই যে করুণার অবতার তা সকলে বুঝতে পারলেন। জগাই-মাধাই পূর্ব্বে বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল জয়-বিজয় ছিলেন। ব্রাহ্মণের অভিশাপে অসুর যোনি প্রাপ্ত হয়। সত্যযুগে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ, ত্রেতা যুগে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ, দ্বাপরে শিশুপাল ও দন্তবক্র, কলিযুগে জগাই ও মাধাই।

**।। জয় শ্রীল জগাই মাধাই কি জয়।।**

# শ্রীরাধামোহন ঠাকুর

শ্রীরাধামোহন ঠাকুর ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর প্রপৌত্র। শ্রীবৈষ্ণব দাস (শ্রীগোকুলানন্দ সেন) পদ কল্পতরু গ্রন্থের শেষে ঠাকুরের বংশ পরিচয় এইরূপ দিয়েছেন–

শ্রীআচার্য্য প্রভু বংশে শ্রীরাধামোহন।
কে কহিতে পারে তার গুণের বর্ণন।।
যাঁহার বিগ্রহে গৌর প্রেমের বিলাস।
যেন শ্রীআচার্য্য প্রভুর দ্বিতীয় প্রকাশ।।
গ্রন্থ কৈলা পদামৃত সমুদ্র আখ্যান।
জন্মিল আমার লোভ তাহা করি গান।।

শ্রীরাধামোহন ঠাকুর যেমন বিদ্বান তেমনি অসাধারণ গীতবিদ্যায় বিশারদ ছিলেন। তিনি ''শ্রীপদামৃত সুমদ্র'' নামক গ্রন্থ সংকলন করেছিলেন।

বাংলা ১১২৫ সালে গৌড় মণ্ডলে ''স্বকীয়া ও পারকীয়া'' সম্বন্ধে এক বিশাল আলোচনা সভা হয়েছিল, তাতে বহু পণ্ডিতের সমাবেশ হয়েছিল। সভামধ্যে শ্রীরাধামোহন ঠাকুর শ্রীজীবের ষট-সন্দর্ভ অনুসারে পারকীয়বাদের প্রাধান্য স্থাপন করেছিলেন। পণ্ডিতগণ সে সিদ্ধান্ত অবনত শিরে গ্রহণ করেন।

এ সভায় বৈষ্ণবদাস (গোকুলানন্দ সেন) ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্ত মজুমদার উপস্থিত ছিলেন। এঁরা শ্রীরাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন।

বিচার সভায় শ্রীরাধামোহন যে জয়পত্র পেয়েছিলেন তা শ্রীযুক্ত মুর্শিদকুলী খাঁর দরবারে বাংলা ১১২৫ সালের ১৭ই ফাল্গুন রেজিষ্ট্রী করা হয়েছিল। তখন ঠাকুর মহাশয়ের বয়স ত্রিশ বছর।

শ্রীরাধামোহন ঠাকুরের প্রধান শিষ্যগণের অন্যতম ছিলেন মহারাজ শ্রীনন্দ কুমার। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার কর্ত্তৃক মহারাজ শ্রীনন্দ কুমারের ফাঁসি হয়। এতে শ্রীঠাকুর মহাশয় অত্যন্ত ব্যথিত হন। তিনি ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে অপ্রকট হন।

শ্রীরাধামোহন ঠাকুর একজন বিশিষ্ট পদকর্ত্তা ছিলেন। তাঁর রচিত গৌর বিষয়ক গীত যথা–

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম সার।
অপরূপ কলাপ বিরিখ অবতার।।
অযাচিতে বিতরই দুর্লভ প্রেমফল।
বঞ্চিত না ভেল পামর সকল।।
চিন্তামণি নহে সেই ফলের সমান।
আচণ্ডাল-আদি করি তাহা কৈলা দান।।
হেন প্রভু না সেবিলে কোন কাজ নয়।
এ রাধামোহন মাগে চরণে আশ্রয়।।

গোষ্ঠ লীলা–

দেখ দেখ ব্রজেশ্বরি-নেহ।
গোধন সঙ্গে বিজয় করু নিজ সুতে
কি করব না পায়ই থেহ।। ধ্রু।।
মুখ ধরি চুম্বন করতহিঁ পুনঃ পুনঃ
নয়নে গলয়ে জল-ধার।
স্তন-গত বসন বাগি পড়য়ে ঘন
ক্ষীর ধার অনিবার।।
বিনিহিত নয়ন বয়ন-কমল পর
যৈছন চান্দ চকোর।।
দিন অবসানে কীয়ে পুন হেরব
অনুমানি হোয়ত বিভোর।।
কো বিহি অদ্‌ভুত প্রেম ঘটায়ল
তাহে পুনঃ ইহ পরমাদ।
ভন রাধামোহন অনুদিন ঐছন
হোয়ত রস-মরিষাদ।।

যুগল–

ভ্রমই গহন বনে যুগল কিশোর।
সঙ্গহি সখিগণ আনন্দে ভোর।।
সখি! এক কহে পুন হোর দেখ সখি।
দুহুঁ দোঁহা দরশনে অনিমিখ আঁখি।।
তরু সব পুলকিত ভ্রমরের গণ।
সৌরভে ধায়ল ছাড়ি ফুল বন।।
শ্রম ভরে বৈঠলি মাধবি কুঞ্জ।
রাই-মুখ-কমলে পড়ল অলিপুঞ্জ।।
লীলা কমলহি কানু তাহে বারি।
মধুসূদন গেও কহত উচারি।।
এত শুনি রাই বিরহে ভেল ভোর।
কহ রাধামোহন অনুরাগ ওর।।

**।। জয় শ্রীরাধামোহন ঠাকুর কি জয়।।**

# শ্রীদময়ন্তী দেবী

যশোমতী আজ্ঞা পেয়ে ধনিষ্ঠা-আনীত।
শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ রাধা ভুঞ্জে হয়ে প্রীত।।
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

কবিকর্ণপুর গোস্বামী গৌরগণোদ্দেশ দীপিকাতে লিখেছেন যিনি পূর্ব্বে ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণের ভোগ-সামগ্রী তৈরি করতেন এবং ধনিষ্ঠা নামে খ্যাত ছিলেন, তিনিই গৌর অবতারে শ্রীরাঘব পণ্ডিত নামে খ্যাত। যিনি কৃষ্ণ অবতারে ‘‘গুণমালা’’ নামে গোপী ছিলেন তিনি অধুনা গৌর অবতারে দময়ন্তী রূপে জন্ম গ্রহণ করেছেন।

শ্রীরাঘব পণ্ডিতের ভগিনী দময়ন্তী দেবী। তিনি মহাপ্রভুর বার মাসের ভোগ্যসামগ্রী তৈরি করে দিতেন। শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস করিবাজ গোস্বামী শাখা-বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন—

রাঘব পণ্ডিত প্রভুর আদ্য-অনুচর।
তাঁর শাখা মুখ্য এক মকরধ্বজ কর।।
তাঁহার ভগিনী দময়ন্তী প্রভুর প্রিয় দাসী।
প্রভুর ভোগসামগ্রী যে করে বারমাসি।।
সে-সব সামগ্রী যত ঝালিতে ভরিয়া।
রাঘব লইয়া যান গুপ্ত করিয়া।।
বার মাস তাহা প্রভু করেন অঙ্গীকার।
রাঘবের ঝালি বলি প্রসিদ্ধি যাহার।।
—চৈঃ চঃ আদি১০/২৪-২৭

শ্রীরাঘব পণ্ডিত পানিহাটি গ্রামে বাস করতেন। অদ্যাপি পানিহাটিতে তাঁর সেবিত শ্রীবিগ্রহ আছেন। গৌড়দেশের ভক্তগণ আষাঢ় মাসে রথযাত্রার সময় মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য পুরীধামে যেতেন। প্রভুর সেবার জন্য প্রত্যেকে কিছু না কিছু তৈরী করে নিতেন। পানিহাটি থেকে শ্রীরাঘব পণ্ডিত মহাপ্রভুর বার মাসের খাবার তৈরি করে নিতেন।

মানুষ স্বভাবতঃ প্রিয় পাত্রকে সুখ দেবার চেষ্টা করে থাকে। মহাপ্রভু যে সাক্ষাৎ ভগবান্ রাঘব পণ্ডিত ও দময়ন্তী তা জানতেন। তথাপি তাঁর প্রতি তাঁদের প্রীতি এত প্রবল ছিল যে, কোন্ সময় কোন্ জিনিসটি খেলে শরীর ভাল থাকে, বিচার করে দময়ন্তী দেবী সারা বৎসর বসে বসে জিনিস পত্র তৈরি করতেন, তা সব ঝালি সাজিয়ে পুরীধামে নিয়ে যেতেন এবং মহাপ্রভুর নিকট অর্পণ করতেন।

মহাপ্রভুর সেবক গোবিন্দ এ-সব যত্ন করে রেখে দিতেন এবং তাঁর ভোজনের সময় প্রতিদিন

কিছু কিছু দিতেন। দময়ন্তী কি কি জিনিস তৈরী করে দিতেন তার একটা তালিকা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্য চরিতামৃতে দিয়েছেন। এখানে তা উদ্ধৃত হল।

আম্রকাশন্দি, আদা ঝাল কাশন্দি নাম।
নেম্বু আদা আম্রফালি বিবিধ বিধান।।
আম্‌সি আম্রখণ্ড তৈলাম্র আমসত্তা।
যত্ন করি গুণ্ডা করি পুরাণ সুখ্‌তা।।
সুখ্‌তা বলি অবজ্ঞা না করিহ চিত্তে।
সুখ্‌তায় যে সুখ হয় নহে পঞ্চামৃতে।।
ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু স্নেহ মাত্র লয়।
সুখ্‌তা পাতা কাশন্দিতে মহাসুখ হয়।।
মনুষ্য বুদ্ধি দময়ন্তী করে প্রভুর পায়।
গুরু ভোজনে উদরে কভু আম হঞা যায়।।
সুখ্‌তা পাইলে সেই আম হইবেক নাশ।
সেই স্নেহ মনে ভাবি প্রভুর উল্লাস।।
ধনিয়া মৌহরীর তণ্ডুল গুণ্ডা করিয়া।
নাড়ু বান্ধিয়াছে চিনি পাক করিয়া।।
শুটীখণ্ড নাড়ু আর আম পিত্তহর।
পৃথক পৃথক বান্ধি, বস্ত্রের কুথলী ভিতর।।
কোলি শুণ্ঠি, কোলি চূর্ণ, কোলি খণ্ড আর।
কত নাম লইব আর শত প্রকার আচার।।
নারিকেল খণ্ড আর নাড়ু গঙ্গাজলি।
চিরস্থায়ী খণ্ড বিকার করলা সকলি।।
চিরস্থায়ী ক্ষীর সার মণ্ডাদি বিকার।
অমৃত কর্পূর আদি অনেক প্রকার।।
শালিকা চটি ধান্যের আতপ চিঁড়া করি।
নূতন বস্ত্রের বড় কুথলী সব ভরি।।
কতেক চিড়া হুড়ুম করি ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনি পাকে নাড়ু কৈলা কর্পূরাদি দিয়া।।
শালিধান্যের তণ্ডুল ভাজা চূর্ণ করিয়া।
ঘৃতসিক্ত চূর্ণ কৈলা চিনি পাক দিয়া।।
কর্পূর মরিচ লবঙ্গ এলাচি রসবাস।
চূর্ণ দিয়া নাড়ু কৈলা পরম সুবাস।।
শালি ধান্যের খই পুনঃ ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনি পাক উখড়া কৈলা কর্পূরাদি দিয়া।।
ফুট কলাই চূর্ণ করি ঘৃতে ভাজাইলা।
চিনি পাকে কর্পূর দিয়া নাড়ু কৈলা।।
কহিতে না জানি নামও জন্মে যাহার।
ঐছে নানা ভক্ষ্য দ্রব্য সহস্র প্রকার।।
রাঘবের আজ্ঞা আর করেন দময়ন্তী।
দুঁহার প্রভুতে স্নেহ পরম ভকতি।।
গঙ্গামৃত্তিকা আনি বস্ত্রেতে ছানিয়া।
পাঁচ কুড়ি করিয়া দিলা গন্ধ দ্রব্য দিয়া।।
পাতল মৃৎপাত্রে চন্দনাদি ভরি।
আর সব বস্ত্র ভরে বস্ত্রের কুথলী।।
—চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ১০/১৪/১৪-৩৬

শ্রীরাঘব পণ্ডিতের আদেশে দময়ন্তী এত সব জিনিস প্রভুর জন্য তৈরি করতেন। ছোট ছোট ঝুলিতে এ সব রাখা হত; পরে একটা বড় থলিতে ভরে সাবধানে থলির মুখটি শেলাই করে দেওয়া হত। এত বড় থলি বহন করার জন্য তিন জন মুটিয়া নিযুক্ত করা হত। থলি সাবধানে পুরী পর্য্যন্ত পৌঁছাবার ভার থাকত মকরধ্বজ করের উপর। এরূপে রাঘব পণ্ডিত ও দময়ন্তী দেবী মহাপ্রভুর সেবা করতেন। তাঁদের শুদ্ধ-বাৎসল্য প্রীতিতে তুষ্ট হয়ে ভগবান সব দ্রব্য হরষিত মনে অঙ্গীকার করতেন। এ সব হচ্ছে ভক্তবৎসল ভগবানের লীলা। এ পরম মধুর আখ্যান শ্রবণ করলে জীবের অজ্ঞান-বন্ধন ছুটে যায় এবং কৃষ্ণ পদে রতি হয়।

**।। জয় শ্রীরাঘব পণ্ডিত ও শ্রীদময়ন্তী কি জয়।।**

# শ্রীসীতা ঠাকুরাণী

শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহোদয় শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব প্রসঙ্গে সীতা ঠাকুরাণীর বড় মধুর বর্ণনা দিয়েছেন।

অদ্বৈত আচার্য্য ভার্য্যা জগৎ পূজিতা আর্য্যা
নাম তাঁর সীতা ঠাকুরাণী।
আচার্য্যের আজ্ঞা পাঞা গেল উপহার লঞা
দেখিতে বালক শিরোমণি।।

—চৈঃ চঃ আদিঃ ১৩/১১১

শ্রীসীতা ঠাকুরাণী শ্রীশচীদেবীর ন্যায় নিত্য পূজ্যা জগন্মাতা। গৌরসুন্দরের প্রতি বাৎসল্য প্রেমে তিনি সর্ব্বদা বিহ্বল থাকতেন এবং শ্রীশচী জগন্নাথ মিশ্রের সদুপদেষ্টা ছিলেন।

পুত্র ভূমিষ্ঠ হবার পরক্ষণেই শ্রীজগন্নাথ মিশ্র মহোদয় শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য্যের নিকট লোক প্রেরণ করলেন। সে লোকমুখে অপূর্ব্ব পুত্র জন্ম-বার্ত্তা পেয়ে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য আনন্দ সাগরে ভাসতে লাগলেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে গঙ্গাস্নান এবং বহু নৃত্য গীত করবার পর সহধর্ম্মিণী সীতা ঠাকুরাণীকে তাড়াতাড়ি নবদ্বীপ মায়াপুরে প্রেরণ করলেন।

শ্রীসীতা ঠাকুরাণী যোগমায়া ভগবতী পৌর্ণমাসীর অবতার। দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণ জন্মোৎসবের সময় নন্দগৃহে উপস্থিত থেকে ইনি নন্দ যশোদাকে বিবিধ উপদেশ প্রদান করেছিলেন।

পতিদেবের নির্দ্দেশ অনুযায়ী শ্রীসীতা ঠাকুরাণী দোলায় চড়ে ভৃত্যগণসহ মায়াপুরে মিশ্রগৃহে শুভাগমন করলেন। বহু সম্মানের সহিত শ্রীজগন্নাথ মিশ্র তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন।

ভক্ষ্য ভোজ্য উপহার সঙ্গে লইল বহু ভার
শচীগৃহে হৈল উপনীত।
দেখিয়া বালক ঠাম সাক্ষাৎ গোকুল কান
বর্ণমাত্র দেখি বিপরীত।।

শ্রীসীতা ঠাকুরাণী জগন্নাথ মিশ্র গৃহে এসে নবজাত শিশু দর্শন করতে লাগলেন। দেখলেন সাক্ষাৎ গোকুলের সেই কৃষ্ণ, বর্ণটি কেবল ভিন্ন। তাঁর বর্ণ ইন্দ্র নীলমণির ন্যায়। এঁর বর্ণ তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায়।

সর্ব্ব অঙ্গ সুনির্ম্মাণ, সুবর্ণ প্রতিমা ভান
সর্ব্ব অঙ্গ সুলক্ষণময়।
বালকের দিব্য জ্যোতি দেখি পাইল বহু প্রীতি
বাৎসল্যতে দ্রবিল হৃদয়।।

শ্রীসীতা ঠাকুরাণীর হৃদয় শিশুটিকে দর্শন করে বাৎসল্য প্রেমে গলে গেল। বাম হাতে বালকের শিরে ধান্য দুর্ব্বা দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে বললেন দুই ভাই চিরজীবী হও।

দুর্ব্বা ধান্য দিল শীর্ষে কৈল বহু আশীষে
চিরজীবী হও দুই ভাই।
ডাকিনী শাঁখিণী হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিতে
ডরে নাম থুইল নিমাই।।

—চৈঃ চঃ আঃ ১১/১১৭

এরূপ বাৎসল্য রসাবেশে ধান্য দুর্ব্বা দিয়ে আশীর্ব্বাদ করবার পর শ্রীসীতা ঠাকুরাণী নামকরণ করবেন ভাবলেন। কিন্তু যেন বাৎসল্য রস সাগরে একেবারে ডুবে ডাকিনী শাঁখিণী প্রভৃতির ভয়ে নামটি রাখলেন 'শ্রীনিমাই'। শুদ্ধ বাৎসল্য প্রীতির কাছে অমিত ঐশ্বর্য্য বীর্য্য প্রভৃতি হার মানে। এ প্রীতিতে ভগবান্ বড় তুষ্ট হন।

কয়েক দিন মায়াপুরে থেকে, শ্রীসীতা ঠাকুরাণী শচী দেবীকে পুত্র পালন সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিলেন। পরে শান্তিপুরে নিজ গৃহে ফিরে এলেন। পুত্র জন্মোৎসবে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবী পরম পূজ্যা শ্রীসীতা ঠাকুরাণীকে মূল্যবান্ নব বস্ত্রাদি দিয়ে বহু সৎকার করেছিলেন।

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর মায়াপুরেও একটি বাসভবন ছিল। তথায়ও তিনি মাঝে মাঝে বাস করতেন এবং শ্রীবাসাদি ভক্তগণসহ কৃষ্ণকথা আলাপে সুখে কাল কাটাতেন। শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবের পর ভক্তগণের ও জগন্নাথ মিশ্রের বিশেষ অনুরোধে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য সীতা ঠাকুরাণীর সঙ্গে বেশীর ভাগ সময় মায়াপুরে বাস করতে লাগলেন।

শ্রীশচী দেবীর অতিশয় পূজ্যপাত্রী ছিলেন শ্রীসীতা ঠাকুরাণী। শচী ও সীতা ঠাকুরাণী যেন এক প্রাণ ছিলেন। সীতা ঠাকুরাণী রোজ তাঁদের গৃহে আসতেন এবং শিশু গৌরসুন্দরকে লালন পালন বিষয়ে উপদেশ দান করতেন। মিশ্র গৃহে দিব্য শিশু ভক্তগণের নয়ন মনের আনন্দ বর্দ্ধন করতে করতে চন্দ্রকলার ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে লাগলেন।

কয়েক বছর পরে জগন্নাথ মিশ্রের বড় পুত্র—'শ্রীবিশ্বরূপ' হঠাৎ সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করলেন। শচী ও জগন্নাথ মিশ্র শোকে বড় কাতর হয়ে পড়লেন এবং শিশু গৌরসুন্দরও ভ্রাতৃবিয়োগ ব্যথা অনুভব করেন। সে সময় অদ্বৈত আচার্য্য ও সীতা ঠাকুরাণী তাঁদের বিশেষভাবে প্রবোধ দান করতেন এবং শিশুকে রক্ষা করতেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের পত্নী মালিনী দেবীও সব সময় বালককে স্নেহে লালন পালন করতেন। তিনি ও শচীদেবী একাত্মা বিশিষ্টা ছিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর শৈশব লীলার পর ক্রমে কৈশোর লীলা এবং যৌবন লীলা করলেন। পরে গয়া ধামে গমন করলেন এবং স্বরূপ প্রকট করলেন। সেখান থেকে ফিরে শ্রীবাস অঙ্গনে ভক্তগণকে নিয়ে কীর্ত্তন আরম্ভ করবার সময় অদ্বৈত আচার্য্য সীতা ঠাকুরাণীকে নিয়ে শান্তিপুর থেকে মায়াপুরে আগমন করলেন এবং সর্ব্ব প্রথমে গৌরসুন্দরের পাদপদ্ম-যুগল পূজা করলেন।

অতঃপর গৌরসুন্দর নবদ্বীপের কীর্ত্তন-বিলাস লীলা সমাপ্ত করে জীবোদ্ধার ইচ্ছায় সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করলেন। তা শুনে সীতা ঠাকুরাণী চারদিন শচীদেবীর ন্যায় নিদারুণ বিরহ বেদনায় পীড়িত হয়ে মৃতপ্রায় ভূতলে পড়ে রইলেন। ভক্তবৎসল গৌরসুন্দর এঁদের প্রীতিবন্ধনে বন্দী হয়ে আর বৃন্দাবনে যেতে পারলেন না। শান্তিপুরে ফিরে এলেন। সীতা ঠাকুরাণীর ও অদ্বৈত আচার্য্যের প্রাণও সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এল। চারদিন উপবাসের পর গৌরসুন্দর সীতা-ঠাকুরাণীর হাতে রান্না-করা দ্রব্য ভোজন করলেন।

সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বেও মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে মাঝে মাঝে শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে আগমন করে অষ্টপ্রহর শ্রীকৃষ্ণনাম-লীলা সংকীর্ত্তন মহোৎসব অনুষ্ঠান করতেন। তার এক সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন পদকর্ত্তা শ্রীপরমেশ্বরী দাস ঠাকুর।

একদিন পহুঁ হাসি, অদ্বৈত মন্দিরে আসি,
বসিলেন শচীর কুমার।
নিত্যানন্দ করি সঙ্গে, অদ্বৈত বসিয়া রঙ্গে,
মহোৎসবের করিলা বিচার।।
শুনিয়া আনন্দে আসি, সীতাঠাকুরাণী হাসি,
কহিলেন মধুর বচন।
তা'শুনি আনন্দ মনে, মহোৎসবের বিধানে,
কহে কিছু শচীর-নন্দন।।
শুন ঠাকুরাণী সীতা, বৈষ্ণব আনিয়া এথা,

আমন্ত্রণ করিয়া যতনে।
যেবা গায় যেবা বায়, আমন্ত্রণ করি তায়,
পৃথক্ পৃথক্ জনে জনে।।
এত বলি গোরা রায়, আজ্ঞা দিল সবাকায়,
বৈষ্ণব করহ আমন্ত্রণে।
খোল করতাল লৈয়া, অগুরু চন্দন দিয়া,
পূর্ণ ঘট করহ স্থাপনে।।
আরোপণ কর কলা, তাহে বান্ধ ফুল মালা,
কীর্ত্তনমণ্ডলী কুতুহলে।
মাল্য চন্দন গুয়া, ঘৃত মধু দধি দিয়া,
খোল মঙ্গল সন্ধ্যাকালে।।
শুনি মহাপ্রভুর কথা, প্রীতে বিধি কৈল যথা,
নানা উপহার গন্ধ বাসে।
সবে হরি হরি বলে, খোল মঙ্গল করে,
পরমেশ্বর দাস রসে ভাসে।।

—শ্রীপদকল্পতরু

নদীয়ার প্রাণধন সন্ন্যাস গ্রহণ করে যখন পুরীধামে অবস্থান করতে লাগলেন, অদ্বৈত আচার্য্য সীতাঠাকুরাণী ও পুত্র অচ্যুতানন্দ প্রতি বছর তথায় যেতেন। যাবার সময় সীতা ঠাকুরাণী গৌরসুন্দরের প্রিয় খাদ্য দ্রব্য সকল তৈরী করে নিতেন এবং গৌরসুন্দরকে গৃহে নিমন্ত্রণ করে ভোজন করাতেন।

মধ্যে মধ্যে আচার্য্যাদি করেন নিমন্ত্রণ।
ঘরে ভাত রান্ধে আর বিবিধ ব্যঞ্জন।।

—চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ১০/১৩৪

তাঁদের প্রেমে বাঁধা মহাপ্রভু মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় এসে ভোজন করতেন। সীতাঠাকুরাণী চিরকাল বাৎসল্য রসে তাঁকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করতেন। শ্রীগৌরসুন্দরও শচীমাতা থেকে অভিন্ন মনে করে সীতাঠাকুরাণীকে ভক্তি করতেন। শ্রীসীতাঠাকুরাণীর গর্ভে অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণ মিশ্র ও গোপাল মিশ্র নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁরাও গৌরসুন্দরের অনুগত ছিলেন।

শ্রীসীতাঠাকুরাণীর পিতা শ্রীনৃসিংহ ভাদুড়ী। সীতাঠাকুরাণীর ''শ্রী'' নামে একটী ভগিনী ছিলেন।

নৃসিংহ ভাদুড়ী অতি উল্লাস অন্তরে।
দুই কন্যা সম্প্রদান কৈলা অদ্বৈতেরে।।

* * * *

আচার্য্যের ভার্য্যা দুই জগত পূজিতা।
সর্ব্বত্র বিদিত নাম 'শ্রী' আর সীতা।।

—শ্রীভঃ রঃ ১২/১৭৮৫

গৌর গণোদ্দেশ দীপিকায়—

যোগমায়া ভগবতী গৃহিণী তস্য সাম্প্রতং।
সীতারূপেণাবতীর্ণা 'শ্রী' নাম্নী তৎপ্রকাশতঃ।।

ভগবতী যোগমায়া শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর পত্নী সীতাদেবী এবং তৎপ্রকাশ 'শ্রী' রূপে সম্প্রতি অবতীর্ণ হলেন।

**।। জয় শ্রীসীতাঠাকুরাণী কি জয়।**
**জয় শান্তিপুর নাথ অদ্বৈত আচার্য্য কি জয়।।**








# দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব ভট্ট

শ্রীনবদ্বীপ ধাম মাহাত্ম্য গ্রন্থে বর্ণনা আছে--দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত পূর্বে নিম্বাদিত্য ছিলেন।

নিম্বাদিত্য একবার বেলপুকুরে শিবের আরাধনা করলে, প্রসন্ন হয়ে শিব বলেন-- "ওহে নিম্বাদিত্য! তুমি বেলবনে প্রবেশ কর। সেখানে চতুঃস্বন তপস্যারত আছেন। তারা তোমার গুরু। তাঁদের কৃপায় তোমার সর্বসিদ্ধি হবে"। শিবের আদেশে নিম্বাদিত্য বেলবনে গিয়ে চতুঃস্বনকে দেখে আনন্দে হরিনাম উচ্চারণ করলে, সেই হরিনামের ধ্বনি শুনে চতুঃস্বনের ধ্যান ভঙ্গ হয় এবং তাঁরা নিম্বাদিত্যকে রাধাকৃষ্ণের যুগল মন্ত্রে দীক্ষা প্রদান করেন। গুরুকৃপায় অল্পদিনেই নিম্বাদিত্যের মন্ত্র সিদ্ধি হয়ে গেলে, একদিন রাধাকৃষ্ণের দর্শন লাভ করেন। আবার সেই রাধাকৃষ্ণই গৌররূপ ধারণ করে তাকে আদেশ করেন, "ওহে নিম্বাদিত্য! তুমি এখন রাধাকৃষ্ণের যুগল ভক্তির কথা জগতে প্রচার কর। আমি যখন গৌররূপে অবতীর্ণ হব, তুমি তখন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব কাশ্মীর রূপে জন্মগ্রহন করবে"।

যে সময় শ্রীনিমাই পণ্ডিত নবদ্বীপে অধ্যাপক শিরোমণি বলে খ্যাতি লাভ করেছিলেন, সে সময় এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত চারিদিক জয় করে সেখানে এলেন। সাধন করে তিনি সরস্বতী দেবীর কৃপা লাভ করেছেন। দেবীই তাঁকে বর দিয়েছেন। সমস্ত শাস্ত্র যেন তাঁর জিহ্বাগ্রে। তখন নবদ্বীপে বড় সাড়া পড়ে গেল। পণ্ডিতদের বিদ্যা প্রতিভা যেন স্তিমিত হয়ে পড়ল। সকলে মহাচিন্তায় পড়লেন। উপায় কি? এ কথা ছাত্র পরম্পরায় শ্রীনিমাই পণ্ডিতের কানে গেল। তিনি বললেন–

শুন ভাই সব কহি তত্ত্ব কথা।
অহঙ্কার না সহেন ঈশ্বর সর্বথা।।
যে যে গুণে মত্ত হই করে অহঙ্কার।
অবশ্য ঈশ্বর তাহা করেন সংহার।।
ফলবন্ত বৃক্ষ আর গুণবন্ত জন।
নম্রতা সে তাঁহার স্বভাব অনুক্ষণ।।

চৈঃ ভাঃ আদি ১৩/৪৬

প্রাচীনকালে হৈহয়, নহুষ, বেণ ও রাবণ প্রভৃতি মহাবীর ছিল–দিগ্বিজয়ী। কিন্তু ঈশ্বর কি তাদের অহংকার সয়েছেন ? না; তাদের দমন করেছেন। সেরূপ এই দিগ্বিজয়ীও পরাজিত হবে দেখতে পাবে।

শ্রীনিমাই পণ্ডিত চিন্তা করতে লাগলেন–এ ব্রাহ্মণের মহা অহংকার হয়েছে। একে যদি সভাতে পরাস্ত করি তাহলে সকলে একে অসম্মান করবে। এর সমস্ত ধন সম্পত্তি লুঠ করে নেবে। ব্রাহ্মণের বড় কষ্ট হবে। তাকে এমন জায়গায় পরাস্ত করব, যেন অন্যে না জানতে পারে।

অপরাহ্নে প্রভু ছাত্রগণকে নিয়ে গঙ্গাতটে বসে বিবিধ শাস্ত্রালাপ করছেন। সন্ধ্যা সমাগমে পূর্ণিমার পূর্ণ চন্দ্রোদয় হল। স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নারাশি গঙ্গার জলে পড়ে মুক্তাদামের ন্যায় ঝল্‌মল্ করছে। বসন্তের মলয় পবনে প্রাণ শীতল হচ্ছে। গঙ্গার লহরী কলকল তানে বেলা ভূমি স্পর্শ করছে। চতুর্দিক নিধুম। ঠিক এমন সময় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত গঙ্গা দর্শন করতে আসছেন, আর মনে মনে নিমাই পণ্ডিতের কখন দেখা হবে ভাবছেন। ব্রাহ্মণ ক্রমে গঙ্গাঘাটে এলেন। দেখলেন ঘাটের এক পার্শ্বে এক বৃক্ষতলে তারাগণ বেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায় ছাত্রগণ বেষ্টিত এক পুরুষ বসে আছেন। দূর থেকে দিগ্বিজয়ী অনুমানে

বুঝলেন ইনিই শ্রীনিমাই পণ্ডিত। অনন্তর তিনি গঙ্গা দর্শন স্পর্শন করে প্রভুর সন্নিকটে এলেন। প্রভু তাঁকে দেখা মাত্রই গাত্রোত্থান করে স্বাগত করলেন এবং মৃদু হাস্য করতে করতে খুব স্নেহভরে সভা মধ্যে বসালেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ প্রভুর ঐশ্বরিক প্রভাব দেখে সম্ভ্রমযুক্ত হলেন।

প্রভু বললেন—আপনি ব্রাহ্মণ মহাপণ্ডিত। আপনার দর্শনে আমরা ধন্য, পবিত্র হলাম। তখন দিগ্বিজয়ী প্রভুর পরিচয় শুনতে চাইলেন। ছাত্রগণ পরিচয় দিলেন। প্রভু হাস্য করতে করতে বললেন—আমি শিশুশাস্ত্র ব্যাকরণ পড়াই মাত্র। লোকে পরিহাস করে পণ্ডিত বলে। প্রভুর মধুর আলাপে ব্রাহ্মণের প্রাণ শীতল হল। তিনি খুব সুখী হলেন। বললেন—বেশ আপনার আলাপে সুখী হলাম। আপনি শিশু শাস্ত্র ব্যাকরণের পণ্ডিত।

প্রভু বললেন—এ পবিত্র সময়ে আপনি আমাদিগকে গঙ্গার স্তোত্র কিছু শ্রবণ করান। আমরা শুনে পবিত্র হই। ব্রাহ্মণ গঙ্গার স্তোত্র রচনা করে অনর্গল পাঠ করতে লাগলেন। সরস্বতী দেবী তাঁর কণ্ঠদেশে বিরাজমান। শুনে প্রভু ও ছাত্রগণ ধন্য ধন্য বলে প্রশংসা করতে লাগলেন। বললেন—জয়দেব, ভবভূতি ও কালিদাস প্রভৃতি আপনার কবিত্ব প্রতিভায় হার মানেন। আপনার শ্লোকের যে গূঢ় অভিপ্রায় আপনিই জানেন। তাই আপনি যদি দু' একটি শ্লোকের অর্থ শুনান তবে আমরা কিছু বুঝতে পারি।

দিগ্বিজয়ী বললেন— আমি ত' বহু শ্লোক বলেছি, তার মধ্যে কোন্ শ্লোকের অর্থ শুনতে চান? মহাপ্রভু দিগ্বিজয়ীর রচিত একটা শ্লোক পড়লেন! দিগ্বিজয়ী শুনে অবাক। বললেন—আপনি কি করে কণ্ঠস্থ করলেন?

মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং।
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিসুভগা।।

সরস্বতী দেবী এ ব্যাখ্যা করেছেন।

দিগ্বিজয়ী বললেন—পণ্ডিত, আপনার ব্যাখ্যা শুনে আমি বিস্মিত হলাম। অলঙ্কার শাস্ত্র পড়েন নাই। তথাপি এ রূপ ব্যাখ্যা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা।

মহাপ্রভু বললেন—শাস্ত্রের বিচার ভাল-মন্দ জানি না। সরস্বতী যা বলালেন তা বললাম।

শিষ্যগণ হাস্য করতে লাগলে প্রভু নিষেধ করলেন। ব্রাহ্মণের প্রতি বলতে লাগলেন—আপনি মহা পণ্ডিত শিরোমণি, আপনার কবিত্ব গঙ্গা-ধারার ন্যায়। এত বড় কবি 'কোথাও দেখি না। ভবভূতি, কালিদাসাদিরও কবিত্বে দোষ গুণ আছে। দোষ গুণের বিচার ত' বড় কথা নয়, কবিত্ব শক্তি বিশেষ কথা।

শৈশব চাপল্য কিছু না লবে আমার।
শিষ্যের সমান মুঞি না হও তোমার।।
আজি বাসা যাহ কালি মিলন আবার।
শুনিব তোমার মুখে শাস্ত্রের বিচার।।

--চৈঃ চঃ আদিঃ ১৬/১০৩-১০৪

মহাপ্রভু অতিশয় বিনয় বাক্যে ব্রাহ্মণকে নিজ বাসায় প্রেরণ করলেন। ব্রাহ্মণ রাত্রে সরস্বতী মন্ত্র জপ করতে লাগলেন। সরস্বতী দর্শন দিয়ে বলতে লাগলেন—

যাঁর ঠাঞি তোমার হইল পরাজয়।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নাথ সেই সুনিশ্চয়।।
আমি যাঁর পাদপদ্মে নিরন্তর দাসী।
সম্মুখ হইতে আপনারে লজ্জা বাসি।।

—চৈঃ ভাঃ আদিঃ ১৩/১২৯-১৩০

পণ্ডিতের নিদ্রাভঙ্গ হল, শীঘ্র একাকী গঙ্গা স্নান করতে চললেন। গঙ্গা স্নান করে শ্রীনিমাই পণ্ডিতের গৃহে এলেন এবং তাঁর শ্রীচরণে দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন।

প্রভু বললেন—আপনি এ কি করছেন? আমি

শিশু আমাকে বন্দনা করছেন কেন? ব্রাহ্মণ বললেন—দেবীর কৃপায় এবার আপনাকে জানতে পেরেছি, আপনাকে ভজনা করলে সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধি হয়। আপনিই বৈকুণ্ঠপতি শ্রীনারায়ণ। তা আজ প্রত্যক্ষভাবে শ্রীসরস্বতী দেবী বলেছেন। তখন মহাপ্রভু বলতে লাগলেন—

শুন দ্বিজবর তুমি মহাভাগ্যবান্।
সরস্বতী যাঁহার জিহ্বায় অধিষ্ঠান।।
দিগ্বিজয় করিব বিদ্যার কার্য্য নহে।
ঈশ্বরে ভজিলে সেই বিদ্যা সত্য কহে।।
মন দিয়া বুঝ দেহ ছাড়িয়া চলিলে।
ধন বা পৌরুষ সঙ্গে কিছু নাহি চলে।।
এতেকে মহান্ত সব সর্ব্ব পরিহরি।
করে ঈশ্বর সেবা দৃঢ় চিত্ত করি।।
এতেকে ছাড়িয়া বিপ্র সকল জঞ্জাল।
শ্রীকৃষ্ণ চরণ গিয়া ভজহ সকাল।।
যাবৎ মরণ নাহি উপসন্ন হয়।
তাবৎ সেবহ কৃষ্ণ করিয়া নিশ্চয়।।
সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণ-পাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয়।।
মহা উপদেশ এই কহিলুঁ তোমারে।
সবে বিষ্ণু-ভক্তি সত্য অনন্ত সংসারে।।
এত বলি মহাপ্রভু সন্তোষিত হৈয়া।
আলিঙ্গন করিলেন দ্বিজেরে ধরিয়া।।
পাইয়া বৈকুণ্ঠ নায়কের আলিঙ্গন।
বিপ্রের হইল সর্ব্ব বন্ধ বিমোচন।।

—চৈঃ ভাঃ আদি ১৩/১৭২-১৮১

এ সমস্ত উপদেশ শ্রবণ করে দিগ্বিজয়ী ব্রাহ্মণ সেই দিবস সব সঙ্গরহিত হয়ে কৃষ্ণ-ভজনে প্রবৃত্ত হলেন।

দিগ্বিজয়ী সম্বন্ধে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ বলেন—“ইনি—“ক্রমদীপিকা” নামক স্মৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। তাতে শ্রীরাধা-গোবিন্দের উপাসনা সম্বন্ধে বিশেষ বর্ণন আছে।

**।। জয় শ্রীদিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কি জয়।।**

# শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্য

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রিয়ভক্ত শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্য। শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন--

বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ভক্তি অধিকারী।
মথুরাগমনে প্রভুর যেঁহ ব্রহ্মচারী।।

—চৈঃ চঃ আদি ১০/১৪৬

মহাপ্রভু যখন মথুরা-বৃন্দাবন গমন করেছিলেন তখন বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ব্রহ্মচারীরূপে প্রভুর সঙ্গে গিয়েছিলেন। শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্য ব্রজ-লীলায় ছিলেন মধুরেক্ষণা নাম্নী গোপী। বলভদ্রাখ্যকো ভট্টাচার্য্যঃ শ্রীমধুরেক্ষণা। (গৌঃ গঃ ১৭১) তিনি রন্ধন বিদ্যায় সুনিপুণা ছিলেন।

দ্বিতীয় বার শান্তিপুরে এসে কানাই নাটশালাদি দর্শন করে এবং অদ্বৈত ভবনে জননীর সঙ্গে মিলিত হয়ে মহাপ্রভু যখন পুরী যাত্রা করেন তখন সঙ্গে ছিলেন—বলভদ্র ভট্টাচার্য্য এবং দামোদর পণ্ডিত। পুরীধামে এসে মহাপ্রভু কয়েকদিন ভক্ত সঙ্গে সংকীর্ত্তন নৃত্যাদি উৎসব করলেন।

একদিন রাত্রিকালে কোন ভক্তকে না জানিয়ে তিনি শ্রীবৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করলেন। সঙ্গে ছিলেন বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও এক ভৃত্য ব্রাহ্মণ। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য অতি সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ।

মহাপ্রভু দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন যাত্রা করবার সময় বললেন– সঙ্গে কাউকেও নেব না–একাকী যাব। শুনে ভক্তগণ বড়ই চিন্তিত হলেন, দুর্গম পথ দিয়ে প্রভু একা কি করে যাবেন? স্বরূপ দামোদর বললেন–তুমি যদি অন্য কাউকেও সঙ্গে না নাও, নিওনা, কিন্তু সরল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলভদ্রকে ত' নাও। আমাদের এই অনুরোধ রক্ষা কর। তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তোমার উপর কর্ত্তৃত্ব করবার সাধ্য কার? বলভদ্র তোমার রন্ধনাদি করে দিবে, তাঁর সঙ্গে যে একজন ভৃত্য ব্রাহ্মণ আছে তাকেও নাও। তোমার জলপাত্র ও বস্ত্রাদি নিয়ে চল্‌বে এবং তোমার সেবা করবে।

শ্রীস্বরূপ দামোদর ও ভক্তগণের অনুরোধ মহাপ্রভু রক্ষা করলেন, বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও সেবক ব্রাহ্মণটিকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন।প্রাতঃকালে ভক্তগণ মহাপ্রভুকে না দেখে হাহাকার করতে লাগলেন। সকলে খোঁজ করতে উদ্যত হলে শ্রীস্বরূপ দামোদর তাঁদের নিষেধ করলেন।

মহাপ্রভু রাজপথ ছেড়ে বনপথ দিয়ে চলতে লাগলেন। ক্রমে ঝারিখণ্ড (ছোটনাগপুর) এলেন। বনপথে দেখলেন– দলে দলে হস্তী, ব্যাঘ্র, গণ্ডার, সিংহ ও শূকর প্রভৃতি ঘোরাফেরা করছে। মহাপ্রভু কীর্ত্তন করতে করতে চলছেন। তারাও পথ ছেড়ে দিয়ে প্রভুর পাশে পাশে চলছে। মধুর কীর্ত্তনধ্বনি শ্রবণ করে এবং সাক্ষাৎ আনন্দ-মূর্ত্তি প্রভুকে দর্শন করে তারা হিংস্র স্বভাব ভুলে গেল। এই সব দেখে শ্রীবলভদ্র ও ভৃত্য ব্রাহ্মণ অবাক। প্রভুর একি অচিন্ত্য লীলা! চলতে চলতে হঠাৎ প্রভুর শ্রীচরণ স্পর্শে সিংহ ও ব্যাঘ্র যেন প্রেমে স্তম্ভিত হয়ে পড়ল। তৎকালে প্রভু 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলে' নাচতে বললে, তারা 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলে নাচতে আরম্ভ করল। প্রভু এক ব্যাঘ্রকে বললেন–'কৃষ্ণ' বলে নাচ, অমনি 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলে নাচতে লাগল।

প্রভু কহে কহ কৃষ্ণ, ব্যাঘ্র উঠিল।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল।।

–চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৭/২৯

বনে এক নদীতে মহাপ্রভু স্নান করছেন, তখন একদল মত্ত হস্তীও সেখানে স্নান করতে আসে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে মহাপ্রভু তাঁদের অঙ্গে জল ছিটাতে লাগলেন।

সেই জল বিন্দু কণা লাগে যার গায়।
সেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে প্রেমে নাচে গায়।।

–চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৭/৩২

মহাপ্রভুর শ্রীহস্তের নিক্ষিপ্ত জলবিন্দু-স্পর্শ পেয়ে হস্তী সকল 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলে নাচতে লাগল। কেউ আবার নদীতটে 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলে গড়াগড়ি দিতে লাগল। প্রভুর এইসব লীলা দেখে শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্য একেবারেই চমৎকৃত হয়ে গেলেন।

মহাপ্রভু চলেছেন মধুর কীর্ত্তন করতে করতে, সেই মধুর কীর্ত্তন ধ্বনি শুনে আকৃষ্ট চিত্তে মৃগ-মৃগীগণও প্রভুর শ্রীঅঙ্গঘ্রাণ নিতে নিতে সঙ্গে চলতে লাগল। তাদের দেখে প্রভু ভাবাবিষ্ট হয়ে তাদের অঙ্গে হাত বুলাতে লাগলেন। কৃষ্ণ বিরহে গোপীগণ যে গান গেয়েছিলেন মৃগ-মৃগীগণকে দেখে তাদের কণ্ঠ জড়িয়ে প্রভু সেই সব গান গাইতে লাগলেন। প্রভুর মধুর কণ্ঠধ্বনি শুনে ময়ূর-ময়ূরী মেঘধ্বনি ভ্রমে প্রভুকে ঘিরে নৃত্য করতে লাগল। প্রভুর মধুর কণ্ঠধ্বনিতে বৃক্ষশাখে কোকিল প্রভৃতি পক্ষীগণ চিত্রবৎ অবস্থান করতে লাগল। স্থাবর

বৃক্ষ লতাও তাঁর মধুরকণ্ঠ ধ্বনিতে যেন পুলকিত হয়ে উঠল। বৃক্ষ সকল অশ্রুধারাবৎ মধুধারা বর্ষণ করতে লাগল। নদীসকল আনন্দ হিল্লোলরূপী হস্ত উদ্বেলিত করে প্রভুর শ্রীচরণ স্পর্শ করতে চাইল। মহাপ্রভুর অচিন্ত্য শক্তিতে ঝারিখণ্ডের বৃক্ষলতা পশু-পক্ষী সকলেই যেন প্রেমভাব ধারণ করল।

সেই ঝারিখণ্ডের বনে কোন স্থানে পাষণ্ডী প্রভৃতি অসভ্য লোকদেরও মহাপ্রভু কৃষ্ণনাম দিয়ে শুদ্ধ করলেন। মহাপ্রভু যে গ্রামের উপর দিয়ে যেতেন এবং যে গ্রামে অবস্থান করতেন সে সব গ্রামের লোকদের প্রেমভক্তি লাভ হত। কেহ যদি প্রভুর শ্রীমুখে একবার কৃষ্ণ নাম শ্রবণ করত সে নাম তার অন্তরে গভীর রেখাপাত করত। তাকে দেখে অন্য ব্যক্তিও কৃষ্ণনামে পাগল হত।

ঝারি-খণ্ডের বন-প্রদেশে শাক-মূলাদি সংগ্রহ করে বলভদ্র ভট্টাচার্য্য রন্ধন করতেন, মহাপ্রভু কত আনন্দভরে তাই ভোজন করতেন। মহাপ্রভুর সেবায় উপযোগী যেখানে যে জিনিস বলভদ্র ভট্টাচার্য্য পেতেন তা যত্ন করে নিয়ে নিতেন। চলতে চলতে পথে গ্রাম পাওয়া গেলে কোন শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ গৃহে তাঁরা মধ্যাহ্নে ভিক্ষা গ্রহণ করতেন এবং রাত্রিবাস করতেন। যে গ্রামে বিপ্র মিলত না, সেই গ্রামে শূদ্র মহাজনের বাড়ীতে বলভদ্র ভট্টাচার্য্য রন্ধন করতেন। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য প্রভুর প্রিয় স্নিগ্ধ সেবক ছিলেন। দু-চার দিনের সব্জি চাল ডাল সর্ব্বদা তিনি সঙ্গে রাখতেন। বন্য প্রদেশে, যেখানে লোকের বসতি নাই, বৃক্ষমূলে রান্না করতেন। ভৃত্য ব্রাহ্মণটি জলপাত্র, প্রভুর যাবতীয় সেবার দ্রব্য মাথায় করে চলতেন। শীতকালে পার্ব্বত্য দেশে যেতে যেতে নির্ঝরের উষ্ণোদকে প্রভু দিনে তিনবার স্নান করতেন। সকাল সন্ধ্যায় অগ্নি জ্বালিয়ে তার তাপে শ্রীঅঙ্গ উষ্ণ করতেন।

শ্রীবলভদ্রের সেবা দেখে সুখে প্রভু একদিন বলতে লাগলেন—ভট্টাচার্য্য, তোমার প্রসাদে আমার এত সুখ হল। কত দেশ ভ্রমণ করেছি, কিন্তু কোথাও কোন দুঃখ অনুভব করি নাই। কৃষ্ণ বড় কৃপালু, আমাকে বহু কৃপা করলেন। বন পথে আমাকে এনে বড় সুখ দিলেন।

ভট্টাচার্য্য বললেন—প্রভো! তুমি সাক্ষাৎ কৃষ্ণ! আমি অধম জীব, আমার প্রতি সদয় হয়ে আমাকে যে সেবার অধিকার দিয়েছ এই তোমার অহৈতুকী দয়া।

মহাপ্রভু চল্‌তে চল্‌তে ক্রমে কাশীর মণিকর্ণিকা ঘাটে পৌঁছালেন। তখন শ্রীতপন মিশ্র সেই ঘাটে স্নান করছিলেন। তপন মিশ্র পূর্ব্ববঙ্গে পদ্মাবতী নদীর তটে বাস করতেন। মহাপ্রভু অধ্যাপক বেশে যখন পূর্ব্ববঙ্গে পদ্মাবতী তটে গমন করেন, তখন তপন মিশ্র প্রভুর কৃপা-উপদেশ পেয়েছিলেন ও তাঁর নির্দ্দেশ মত কাশীবাসী হয়েছিলেন।

তপন মিশ্র ইতি পূর্ব্বে জানতে পেরেছিলেন প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন। অকস্মাৎ প্রভুকে দেখে বিস্ময়ান্বিত হলেন, অবাক ভাবে তাকিয়ে রইলেন, ভাবলেন—ইনি নিশ্চয় অধ্যাপক শিরোমণি শ্রীনিমাই পণ্ডিত হবেন। তাড়াতাড়ি জল থেকে উঠে মিশ্র মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ করলেন, মহাপ্রভু মিশ্র বলে দৃঢ় আলিঙ্গন করলেন। মিশ্র আনন্দে প্রভুর চরণে পড়ে কাঁদতে লাগলেন। মিশ্রকে প্রভু বিবিধ কুশল-বার্ত্তাদি জিজ্ঞাসা করলেন। উভয়ে উভয়ের মিলনে বড়ই আনন্দিত হলেন। তারপর তপন মিশ্র প্রভুকে বিশ্বেশ্বর ও বিন্দুমাধব দর্শন করালেন। শ্রীগৌরসুন্দর প্রেম পুলকিত অঙ্গে নৃত্য-গীতাদি করলেন। অনন্তর তপন মিশ্রের গৃহে শুভাগমন করলেন। মিশ্র সগোষ্ঠী মহাপ্রভুর শ্রীচরণতলে দণ্ডবৎ করে পাদ ধৌতাদি করে সেই জল শিরে ধারণ ও পান করলেন। বলভদ্র ভট্টাচার্য্যকে তপন মিশ্র বহু সম্মান প্রদর্শন করলেন।

কয়েকদিন কাশীতে অবস্থান করবার পর প্রভু

বিদায় নিলেন। প্রভুর বিরহে তপন মিশ্র আদি ভক্তগণ কাতর হয়ে পড়লেন। প্রভু তাঁদের সান্ত্বনা দিয়ে গৃহে পাঠিয়ে প্রয়াগের দিকে চলতে লাগলেন। প্রয়াগে এলেন, ত্রিবেণীতে স্নান করে শ্রীবেণীমাধব বিগ্রহ দর্শন করলেন। সেখানে বহু নৃত্য-গীতাদি করলেন। যমুনার নীল জল দর্শন করে প্রভুর শ্রীকৃষ্ণ স্মৃতি হল, প্রেমোন্মত্ত হয়ে যমুনায় ঝাঁপ দিলেন। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও ভৃত্য ব্রাহ্মণটী তাড়াতাড়ি তাঁকে ধরে তুললেন। কয়েকদিন প্রয়াগ ধামে থাকার পর, মথুরায় জন্মস্থানে এলেন। সেখানে যে অদ্ভুত নৃত্য-গীতাদি করলেন তা দেখে মথুরাবাসিগণ পরম চমৎকৃত হলেন। আদিকেশব দর্শন করলেন, সেবক প্রসাদী মালা প্রভুর কণ্ঠে দিলেন। মথুরা নগরে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য সনোড়িয়া ব্রাহ্মণ গৃহে তিনি ভিক্ষা গ্রহণ করলেন। মথুরার চব্বিশ ঘাট দর্শন করলেন। তারপর প্রবেশ করলেন গোপেন্দ্র নন্দনের লীলা-ভূমি দ্বাদশ বন যুক্ত শ্রীবৃন্দাবনে। গাভীগণ প্রভুকে পেয়ে আনন্দে হুঙ্কার দিতে লাগলেন। বাৎসল্য-প্রীতিতে প্রভু তাদের গলা জড়িয়ে ধরলেন। তারা অঙ্গ লেহন করতে লাগল। বলভদ্র ভট্ট দেখে অবাক! মৃগ-মৃগিগণ তাঁর অঙ্গের ঘ্রাণ নিতে লাগল ও ময়ূর-ময়ূরীগণ আনন্দে নৃত্য করতে লাগল। শুক-শারী মধুর স্বরে শ্লোক পাঠ করতে লাগল। প্রভুর করস্পর্শে তরু-লতাগণ যেন পুলকরূপ নব পত্রোদগম ও হাসিরূপ ফুলভারে তাঁর চরণ স্পর্শ করতে লাগল। প্রভুও প্রতিটি তরুলতাকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করতে লাগলেন। আবার সেই প্রাণবন্ধু যেন ফিরে এসেছেন। বন্ধু দেখে যেমন বন্ধুর আনন্দ হয়, সেরূপ গৌরকৃষ্ণকে দর্শন করে বৃন্দাবনের স্থাবর-জঙ্গম সকলে আনন্দে বিহ্বল হল। কৃষ্ণ যেন আবার বৃন্দাবনে উদয় হয়েছেন। তাই চতুর্দ্দিকে কেবল আনন্দ কোলাহল। বন্য মৃগ-মৃগীগণের কণ্ঠ ধরে প্রভু প্রেমে রোদন করতে লাগলেন। তারাও প্রভুর করুণ রোদন দেখে রোদন করতে লাগল। প্রভু শুক-শারীকে বললেন—কৃষ্ণ-গুণ বর্ণন কর। আনন্দে শুকসারী কৃষ্ণ-গুণ বর্ণন করতে লাগল। তারপর ময়ূর-ময়ূরীগণ এসে প্রভুকে ঘিরে নাচতে লাগল, ময়ূরের কণ্ঠ নিরীক্ষণ করে প্রভুর কৃষ্ণস্মৃতি হল, তিনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। বলভদ্র সাবধানে প্রভুকে কোলে ধারণ করলেন। ভৃত্য ব্রাহ্মণ যমুনা থেকে জল এনে প্রভুর মুখে ছিটাতে লাগলেন। কর্ণে উচ্চস্বরে কৃষ্ণনাম করলে তাঁর চৈতন্য ধীরে ধীরে ফিরে এল। শ্রীবৃন্দাবনে এসে প্রভুর প্রেমাবেশ চতুর্গুণ বেড়ে উঠল। বৃন্দাবনের কোন স্থানে রোদন, কোথাও আনন্দে নৃত্য, কোথাও কৃষ্ণবিরহে বিরহিণী রাধার ন্যায় মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হতে লাগলেন। বলভদ্র ভট্ট সাবধানে প্রভুর সেবা করতে লাগলেন।

আরিট গ্রামে এলেন। সেখানকার লোকদের কাছে রাধাকুণ্ডের কথা জিজ্ঞাসা করলেন, তারা কিছু বলতে পারল না। সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভু এক ধান্যক্ষেত্রে অল্পজলে স্নান করলেন, বললেন—এই সেই রাধাকুণ্ড। তারপর সেই কুণ্ডের স্তব পাঠ করতে লাগলেন। ''গোপীদের মধ্যে শ্রীরাধা ঠাকুরাণী যেমন শ্রেষ্ঠা তেমনি তাঁর কুণ্ডও পরমা আরাধ্যা।" কুণ্ডের মৃত্তিকা দিয়ে প্রভু তিলক করলেন। তাঁর আদেশে বলভদ্র ভট্টাচার্য্য কিছু মৃত্তিকা নিয়ে নিলেন। ক্রমে কুসুম সরোবর, গোবর্দ্ধন প্রভৃতি দর্শন করলেন। গিরিরাজকে ''হরিদাসবর্য্য" বলে প্রেমে আলিঙ্গন করলেন। সে দিন ব্রহ্মকুণ্ডে এসে বলভদ্র রান্না করলেন, রাত্রে শ্রীহরিদেবের মন্দিরে প্রভু বহু নৃত্য-গীতাদি করলেন। মহাপ্রভুর একান্ত ইচ্ছা হল শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের গোপাল দর্শন করবার, কিন্তু গোপাল রয়েছেন গোবর্দ্ধন গিরিরাজের উপর। তিনি গিরিরাজে চড়বেন না। দর্শন কিরূপে হবে?

সেই রাত্রে গোবর্দ্ধনধারী হরি এক ছল করে গাঠুলি গ্রামে এলেন। সেখানে মহাপ্রভু গোবর্দ্ধনধারীকে মহানন্দে দর্শন করলেন। তিন দিন গোপালদেবের সামনে নৃত্য-গীত করলেন। অতঃপর প্রভু বিদায় হলেন। গাঠুলি গ্রাম হতে গোপাল দেবও নিজস্থানে গেলেন।

মহাপ্রভু পুনঃ বৃন্দাবনে ফিরে এলেন। সেখানে যমুনার পরপার থেকে কৃষ্ণদাস রাজপুত এলেন, প্রভুর দর্শনে। প্রভু তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কে? কৃষ্ণদাস রাজপুত বললেন—আমি অধম গৃহস্থ; জাতিতে রাজপুত।

মহাপ্রভু—তুমি কি চাও?

কৃষ্ণদাস—বৈষ্ণব কিঙ্কর হতে চাই।

মহাপ্রভু—তুমি কেমনে জানলে যে আমি এখানে এসেছি?

কৃষ্ণদাস—শেষ রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম আপনি বৃন্দাবনে আছেন, তাই প্রাতে ছুটে এলাম।

মহাপ্রভু—কৃষ্ণদাস! কৃষ্ণ তোমাকে এনেছেন। এই বলে প্রভু তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। প্রভুর সঙ্গে কৃষ্ণদাস অক্রূর— তীর্থে এলেন। সেখানে মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন ভোজন করলেন। কৃষ্ণদাস রাজপুতকে অবশিষ্ট পাত্র দিলেন। পত্নী-পুত্র ও গৃহত্যাগ করে কৃষ্ণদাস প্রভুর সঙ্গে ভ্রমণ করতে লাগলেন।

বৃন্দাবনে পুনঃ কৃষ্ণ প্রকট হয়েছেন বলে সর্ব্বত্র গুজব রটে গেল। একদিন অক্রূর তীর্থ থেকে লোক এল বৃন্দাবনে। প্রভু জিজ্ঞাসা করলেন কোথা থেকে তোমরা এসেছ? তারা বলল কালীয়দহ তীর্থ থেকে। কালীয়দহে কৃষ্ণ পুনঃ প্রকট হয়ে কালীয়নাগের শিরে নৃত্য করছেন। তিন রাত্রি ধরে সকলে দর্শন করেছে। এ কথা শুনে মহাপ্রভু হাসতে লাগলেন। এই ভ্রান্ত বাক্যে সরলমতি বলভদ্র ভট্টাচার্য্যেরও মতিভ্রম হল। তিনি সন্ধ্যাকালে প্রভুর কাছে বললেন—আমি কৃষ্ণ দর্শন করতে যাব।

মহাপ্রভু—কোথায় কৃষ্ণ দর্শন করতে যাবে?

ভট্টাচার্য্য—কালীয়দহে।

মহাপ্রভু—মূর্খের বাক্যে মূর্খ হলে? তুমি পণ্ডিত ব্যক্তি। তুমি কোন বিবেচনা করতে পারলে না? কলিকালে কৃষ্ণ দর্শন হয় না। মূর্খ লোক নিজের ভ্রমে মিথ্যা কোলাহল করছে। বসে থাক, সব কিছু পরে জানতে পারবে।

প্রাতঃকালে প্রভুর কাছে কালীয়দহ হতে কোন লোক এল, প্রভু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন কৃষ্ণ দেখলে?

লোকটি বলল—কোথায় কৃষ্ণ? কৈবর্ত্ত্যগণ নৌকা নিয়ে দেউটী জ্বালিয়ে দহের জলে মাছ ধরে, দূর থেকে লোকের ভ্রম হয়। নৌকাকে কালীয়নাগ, জেলেটিকে কৃষ্ণ ও দীপটিকে মণি মনে করে।

বৃন্দাবনে কৃষ্ণ-উদয় ঠিক, কৃষ্ণকে লোকে দেখছে— তাও ঠিক। কিন্তু ভ্রমবশতঃ কৃষ্ণকে কৃষ্ণ না বলে মানুষকে কৃষ্ণ কল্পনা করছে। এবার বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের ভ্রম দূর হল। তিনি খুব লজ্জিত হলেন, প্রভুর শ্রীচরণে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন।

মহাপ্রভু পুনঃ একদিন অক্রূর ঘাটে এলেন এবং স্নান করলেন। সেখানে গোপ-গোপীগণ ব্রহ্মলোক দর্শন করেছিলেন। মহাপ্রভুকে দর্শন করবার জন্য সেখানে দিনরাত লোকের খুব ভিড় হতে লাগল এবং খুব আমন্ত্রণও আসতে লাগল। এ সব দেখে সনোড়িয়া ব্রাহ্মণ, বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও কৃষ্ণদাস রাজপুত ঠিক করলেন প্রভুকে অন্যত্র নিয়ে যাবেন। প্রভুর বৃন্দাবনে অবস্থানের অনেক অসুবিধাও দেখা দিল। তিনি যমুনার জল দেখলে প্রেমোন্মত্ত হয়ে তাতে ঝাঁপ দিয়ে পড়েন, প্রেমে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন। ভক্তগণ একদিন মহাপ্রভুর চরণে নিবেদন করলেন—এখানে বহু লোক আপনাকে আমন্ত্রণ করতে আসে ও দর্শন করতে আসে। আপনাকে না দেখলে আমাদের বড় জ্বালাতন করে। আমরা অতীষ্ঠ হয়ে উঠেছি। তাই মনে করি এখান থেকে

প্রয়াগ অভিমুখে যাত্রা করলে ভাল হয়, মাঘ মাসও নিকটবর্ত্তী হয়েছে।

বৃন্দাবন ছেড়ে যেতে মহাপ্রভুর ইচ্ছা হচ্ছিল না, তথাপি ভক্তগণের ইচ্ছায় বৃন্দাবন থেকে বিদায় নিলেন। ক্রমে চললেন প্রয়াগের দিকে। যেতে যেতে পথে এক বৃক্ষতলে প্রভু বসলেন বিশ্রামের জন্য। সেখানে রাখাল বালকগণের বংশীধ্বনি শুনে প্রভুর কৃষ্ণস্মৃতি হল। তিনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। মুখ দিয়ে ফেনা বের হতে লাগল, ভক্তগণ সাবধানে তাঁকে কেউ হাওয়া করতে লাগলেন, কেউ জল দিতে লাগলেন ও কেউ কোলে করে রইলেন। দশজন পাঠান সৈন্য সেইপথ দিয়ে যাচ্ছিল, প্রভুর মূর্চ্ছা দশা দেখে তারা অশ্ব থেকে নেমে, চারজন ভক্তকে চোর জ্ঞানে বন্দী করল।

ভট্টাচার্য্য ও ভৃত্য ব্রাহ্মণটি ত' ভয়ে কাঁপতে লাগল। সনোড়িয়া ব্রাহ্মণ ও কৃষ্ণদাস রাজপুত তারা সে-দেশেরই অধিবাসী, তারা ভয় করে না। কৃষ্ণদাস রাজপুত বলতে লাগলেন—আমি যদি হাঁক মারি তাহলে তিনশত তুড়কধারী এখনি আসবে। পাঠান সৈন্যগণ বলল তোমরা চোর। এই সন্ন্যাসীর কাছে অনেক ধনরত্ন ছিল, তোমরা বিষ খাইয়ে সব হরণ করেছ। কৃষ্ণদাস বললেন আমরা চোর নই, তোমরা চোর। ইনি আমাদের গুরু, এঁনার মৃগীরোগ আছে, মাঝে মাঝে এইরূপ মূর্চ্ছা হয়। তখন আমরা এঁনাকে রক্ষা ও সেবা করি। তোমরা একটু অপেক্ষা কর, এখনি উনি উঠবেন। ইতিমধ্যে মহাপ্রভু 'হরি' 'হরি' ধ্বনি করে উঠে নৃত্য করতে লাগলেন। তা দেখে পাঠান সৈন্যদের মনে ভয় হল, তাড়াতাড়ি ভক্তদের বন্ধন মোচন করে দিল। সকলে বিস্ময়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রভুর বাহ্যদশা হল, শান্তভাবে বসলেন। পাঠান সৈন্যদের অধ্যক্ষ ছিলেন রাজকুমার বিজলি খাঁন, তিনি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। তিনি মহাপ্রভুর শ্রীচরণ বন্দনা করলেন এবং উপদেশ চাইলেন। মহাপ্রভু তাঁদের প্রতি অনেক উপদেশ করলেন। প্রভুর করুণায় সমস্ত পাঠানগণ শুদ্ধমতি হলেন, সকলেই প্রভুর শ্রীচরণে পড়ে কৃষ্ণনাম গ্রহণ করলেন, প্রভুও তাদের অহৈতুকী কৃপা করলেন। তারা "পাঠান-বৈষ্ণব" নামে খ্যাত হলেন।

অতঃপর মহাপ্রভু প্রয়াগে এলেন। কৃষ্ণদাস রাজপুত ও সনোড়িয়া বিপ্রকে মহাপ্রভু নিজ গৃহে যেতে আদেশ করলেন। তাঁরা প্রভুর বিচ্ছেদ ভাবনায় ক্রন্দন করতে লাগলেন। মহাপ্রভু উপদেশ ও আলিঙ্গন দিয়ে তাঁদের বিদায় করলেন। কিছুদিন প্রভু প্রয়াগ ধামে থেকে ত্রিবেণীতে স্নান করলেন এবং পরে নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করলেন। প্রভুর দর্শন উৎকণ্ঠায় নীলাচলবাসী ভক্তগণ অতি দুঃখে দিন যাপন করছিলেন, এমন সময় শ্রীমহাপ্রভুর শুভবিজয় দর্শনে আনন্দসাগরে ভাসতে লাগলেন। আবার ভক্তগণের ও প্রভুর মিলন হল। শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুর অত্যদ্ভুত লীলাবলী সকল ভক্তদের কাছে বলতে লাগলেন। ভক্তগণ শুনে শুনে সুখসাগরে ভাসতে লাগলেন।

**।। জয় শ্রীল বলভদ্র ভট্টাচার্য্য কি জয়।।**

# শ্রীদেবকী নন্দন দাস

অনেকেই বলে থাকেন মহাপ্রভুর কৃপা লাভের পর চপলগোপালের নাম হয় শ্রীদেবকীনন্দন দাস। কিন্তু এ ধরণের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। শ্রীদেবকীনন্দন দাসের মন্ত্রদাতা গুরু শ্রীপুরুষোত্তম দাস। শ্রীপুরুষোত্তম দাসের পিতা শ্রীসদাশিব কবিরাজ। শ্রীপুরুষোত্তম দাস শ্রীনিত্যানন্দের পার্ষদ-ভক্ত ছিলেন। অতএব দেবকীনন্দন দাস শ্রীনিত্যানন্দ-পরিবার ভুক্ত। বৈষ্ণব বন্দনায় আছে—

ইষ্টদেব বন্দিব শ্রীপুরুষোত্তম নাম।<br>
কি কহিব তাঁহার যে গুণ অনুপম।।<br>
সর্ব্বগুণহীন যে তাহারে দয়া করে।<br>
আপনার সহজ করুণা শক্তি বলে।।<br>
সপ্তম বৎসরে যাঁর কৃষ্ণের উন্মাদ।<br>
ভুবনমোহন নৃত্য শকতি অগাধ।।

শ্রীমনোহর দাস কৃত ''অনুরাগবল্লী''তেও দেখা যায়—

শ্রীনিত্যানন্দের প্রিয় শ্রীপুরুষোত্তম মহাশয়।<br>
দেবকীনন্দন ঠাকুর তাঁর শিষ্য হয়।।<br>
তেঁহো যে করল বড় বৈষ্ণব বন্দনা।।

শ্রীদেবকীনন্দন ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইনি বাংলা বৈষ্ণব বন্দনা ছাড়া সংস্কৃত ''বৈষ্ণবাভিধান'' গ্রন্থ রচনা করেন। বাসস্থান কুমারহট্ট বা হালিশহরে ছিল।

শ্রীদেবকীনন্দন দাস নিজের পিতামাতার বিশেষ পরিচয় প্রদান করেন নাই। মন্ত্রদাতাগুরু নিত্যানন্দ পার্ষদ ছিলেন। এইটুকু মাত্র বলেছেন। ইনি একজন বিশেষ পদকর্ত্তা।

শ্রীদেবকীনন্দন দাসের শ্রীবৈষ্ণব বন্দনা—

বৃন্দাবনবাসী যত বৈষ্ণবের গণ।<br>
প্রথমে বন্দনা করি সবার চরণ।।<br>
নীলাচলবাসী যত মহাপ্রভুর গণ।<br>
ভূমিতে পড়িয়া বন্দোঁ সবার চরণ।।<br>
নবদ্বীপবাসী যত মহাপ্রভুর ভক্ত।<br>
সবার চরণ বন্দোঁ হঞা অনুরক্ত।।<br>
মহাপ্রভুর ভক্ত যত গৌড়দেশে স্থিতি।<br>
সবার চরণ বন্দো করিয়া প্রণতি।।<br>
যেদেশে যেদেশে বৈসে গৌরাঙ্গের গণ।<br>
ঊর্দ্ধবাহু করি বন্দোঁ সবার চরণ।।<br>
হঞাছেন হইবেন প্রভুর যত দাস।<br>
সবার চরণ বন্দোঁ দন্তে করি ঘাস।।<br>
ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে-জনে।<br>
এ বেদ পুরাণে গুণ গায় যেবা শুনে।।<br>
মহাপ্রভুর গণ সব, পতিত-পাবন।<br>
তাই লোভে মুঞি পাপী লইনু শরণ।।<br>
বন্দনা করিতে মুঞি কত শক্তি ধরি।<br>
তমোবুদ্ধি দোষে মুঞি দম্ভ মাত্র করি।।<br>
তথাপি মুকের ভাগ্য মনের উল্লাস।<br>
দোষ ক্ষমি মো অধমে কর নিজদাস।।<br>
সর্ব্ব বাঞ্ছা সিদ্ধি হয় যমবন্ধ ছুটে।<br>
জগতে দুর্ল্লভ হঞা প্রেমভক্তি লুটে।।<br>
মনের বাসনা পূর্ণ অচিরাতে হয়।<br>
দেবকীনন্দন দাস এই লোভে কয়।।

—

পদ কীর্ত্তন শ্রীগৌর চন্দ্রস্য—

চৌদিকে ভকতগণ হরিহরি বলে।<br>
রঙ্গন মালতী মালা দেই গোরা গলে।।<br>
কুঙ্কুম কস্তুরী আর সুগন্ধ চন্দন।<br>
গোরাচাঁদের অঙ্গে সব করয়ে লেপন।।

রাঙ্গা প্রান্ত পট্টবাস কোঁচার বলনি।
ঝলমল করে কিযে অঙ্গের লাবনি।।
চাঁচর চিকুরে চাঁপা মনোহর ঝুটা।
উন্নত নাসিকা ঊর্দ্ধ চন্দনের ফোঁটা।।
আজানুলম্বিত ভুজ সরু পৈতা কান্ধে।
মদন বেদন পাঞা ঝুরি ঝুরি কান্দে।।
দেবকীনন্দন বলে সহচর সনে।
দেখ সভে গোরাচাঁদ শ্রীবাস ভবনে।।

* * * *

নাহি নাহি নাহি ভাই শ্রীগৌরাঙ্গ চাঁদ বিনে
দয়ার ঠাকুর নাহি আর।
কৃপাময় গুণনিধি সব মনোরথ সিদ্ধি
পূর্ণ পূর্ণতম অবতার।।
রাম আদি অবতারে ক্রোধে নানা অস্ত্র ধরে
অসুরেরে করিলা সংহার।
এবে অস্ত্র না ধরিল প্রাণে কারে না মারিল
মন শুদ্ধি করিলা সবার।।
কলি কবলিত যত জীব সব মুরছিত
নাহি আর মহৌষধি তন্ত্র।
তনু অতি ক্ষীণ প্রাণী দেখি মৃত সঞ্জীবনী
প্রকাশিলা হরিনাম মন্ত্র।।
এ হেন করুণা তাঁর পাষাণ হৃদয় যার
সে না হইল মনির সোসর।
দৈবকীনন্দন ভনে হেন প্রভু যে না মানে
সেই জন বড় দুরাচার।।

—

শ্রীনিত্যানন্দ বন্দনা

গজেন্দ্র গমনে নিতাই চলয়ে মন্থরে।
যারে দেখে তারে ভাসায় প্রেমের পাথারে।।
পতিত দুর্গত পাপীর ঘরে ঘরে গিয়া।
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম দিছেন যাচিয়া।।
যে না লয় তারে কয় দন্তে তৃণ ধরি।
আমারে কিনিয়া লও বল গৌরহরি।।
তো সভার লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
শুন নাই গৌরাঙ্গ সুন্দর নদীয়ার।।
যে পহুঁ গোকুলপুরে নন্দের কুমার।
তো সভার লাগিয়া এবে কৈল অবতার।।
শুনিয়া কান্দয়ে পাপী চরণে ধরিয়া।
পুলকে পুরল অঙ্গ গরগর হিয়া।।
তারে কোলে করি নিতাই যার আন ঠাম।
হেনমতে প্রেমে ভাসাইল পুরগ্রাম।।
দৈবকীনন্দন বলে মুঞি অভাগিয়া।
ডুবিলুঁ বিষয় কূপে নিতাই না ভজিয়া।।

**।। জয় শ্রীদেবকী নন্দন দাস কি জয়।।**



# শ্রীবৈষ্ণবদাস পদকর্ত্তা

শ্রীবৈষ্ণব দাসের শ্রীগুরু পাদপদ্ম শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রপৌত্র শ্রীরাধা মোহন ঠাকুর। তাঁর পূর্ব্বনাম শ্রীগোকুলানন্দ সেন। ইনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। নিবাস টেঞা বৈদ্যপুর।

বাংলাদেশে স্বকীয়া ও পরকীয়ার শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে ১১১৫ সালে যে বিচার হয়েছিল, ঐ বিচার সভায় শ্রীগোকুলানন্দ সেন ছিলেন। ইনি শ্রীউদ্ধব দাস (কৃষ্ণকান্ত মজুমদার) মহাশয়ের সখা ছিলেন এবং উভয়ই পদকর্ত্তা ছিলেন।

শ্রীবৈষ্ণবদাস পদ-কল্পতরু গ্রন্থ সংকলন করেছিলেন। গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদকীর্ত্তন –

পহুঁ মোর গৌরাঙ্গ গোসাঞি।
এই কৃপা কর যেন তোমার গুণ গাই।।
যে সে কুলে জন্ম হউ যে সে দেহ পাইয়া।
তোমার ভক্ত সঙ্গে ফিরি তোমার গুণ গাইয়া।।
চিরকালে আশা প্রভু আছয়ে হিয়ায়।
তোমার নিগূঢ় লীলা স্ফুরাবে আমায়।।
তোমার নামে সদা রুচি হউক মোর।
তোমার গুণ গানে যেন সদা হউ ভোর।।
তোমার গুণ গাইতে শুনিতে ভক্ত সঙ্গে।
সাত্ত্বিক বিকার কি হইবে মোর অঙ্গে।।
অশ্রু কম্প পুলকে পুরিবে সব তনু।
ভূমিতে পড়িব প্রেমে অগেয়ান জনু।।
যে সে কর প্রভু এক তুমি মাত্র গতি।
কহয়ে বৈষ্ণব দাস তোমায় রহু মতি।।

—

গোরাচাঁদ! ফিরি চাহ নয়নের কোণে
দেখি অপরাধি জনা যদি তুমি কর ঘৃণা
অযশ ঘুষিবে ত্রিভুবনে।।
তুমি প্রভু দয়া সিন্ধু পতিত জনার বন্ধু
সাধু মুখে শুনিয়া মহিমা।
দিয়াছি তোমার দায় এই মোর উপায়
উদ্ধারিলে মহিমার সীমা।।
মুঞি ছার দুষ্ট মতি তুয়া নামে নাহি রতি
সদাই অসত পথে ভোর।
তাহাতে হইছে পাপ আর অপরাধ তাপ
সে কত তাহার নাহি ওর।।
তোমার কৃপা বলবানে অপরাধ নাহি মানে
শুনি নিবেদিয়ে রাঙ্গা পায়।
পুরাহ আমার আশ ফুকারে বৈষ্ণব দাস
তুয়া নাম স্ফুরুক জিহ্বায়।।

—

নীলাচলে যব মঝু নাথ।
দেখিব আপনে জগন্নাথ।।
রাম রায় স্বরূপ লইয়া।
নিজ ভাব কহে উঘারিয়া।।
মোর কি হইবে হেন দিনে।
তাহ কি মুঞি শুনিব শ্রবণে।।
পুন কিয়ে জগন্নাথ দেবে।
গুণ্ডিচা মন্দিরে চলি যবে।।
প্রভু মোর সাত সম্প্রদায়।
করিবে কীর্ত্তন উচ্চ রায়।।
মহানৃত্য কীর্ত্তন বিলাস।
সাত ঠাঞি হইবে প্রকাশ।।
মোর কি এমন দিন হব।
সে সুখ কি নয়নে দেখিব।।
সকল ভকতগণ মেলি।
উদ্যানে করিবে নানা কেলি।।

বৈষ্ণব দাসের অভিলাষ।
দেখি মোর-পুরিবেক আশ।।

—

হে নাথ গোকুলচন্দ্র হা কৃষ্ণ পরমানন্দ
হা হা ব্রজেশ্বরীর নন্দন।
হা রাধা চন্দ্রমুখি গান্ধর্ব্বা ললিতা সখি
কৃপা করি দেহ দরশন।।
তোমা দোঁহার শ্রীচরণ আমার সর্ব্বস্ব ধন,
তাহার দর্শনামৃত পান।
করাইয়া জীবন রাখ মরিতেছি এই দেখ,
করুণা কটাক্ষ কর দান।।
দোঁহে সহচারী সঙ্গে মদন মোহন রঙ্গে
শ্রীকুণ্ডে কল্পতরু ছয়।
আমারে করুণা করি দেখাইবে সে মাধুরী,
তবে হয় জীবন উপায়।।
হা হা শ্রীদাম সখা, কৃপা করি দেও দেখা
হাহা বিশাখা প্রাণ সখি।
দোঁহে সকরুণ হৈয়া চরণ দর্শন দিয়া
দাসিগণ মাঝে লেহ লোখি।।
তোমার করুণা রাশি তেঞি চিএত্ত অভিলাষি
কৃপা করি পুর মোর আশ।
দশনেতে তৃণ ধরি ডাকি নাম উচ্চ করি
দীন হীন বৈষ্ণবের দাস।।

**।। জয় শ্রীবৈষ্ণবদাস পদকর্ত্তা কি জয়।।**

# শ্রীনয়নানন্দ ঠাকুর

শ্রীনয়নানন্দ ঠাকুর শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং প্রিয় শিষ্য। শ্রীগদাধর পণ্ডিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাণীনাথ মিশ্র। শ্রীনয়নানন্দ ঠাকুর মহাশয় শ্রীবাণীনাথ মিশ্রের পুত্র। ইনি দার পরিগ্রহ করেছিলেন। তাঁর বংশধরগণ অদ্যাপি মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কাঁদির নিকটবর্ত্তী শ্রীপাট ভরতপুর গ্রামে বাস করছেন। এই ভরতপুর গ্রামে শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী-স্থাপিত শ্রীরাধাগোপীনাথ বিগ্রহ আছেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত নীলাচলে যাবার সময় শ্রীনয়নানন্দকে এই শ্রীবিগ্রহ সেবায় নিযুক্ত করে যান।

শ্রীনয়নানন্দ ঠাকুরের অপর নাম শ্রীধ্রুবানন্দ। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে ইনি 'মিশ্রনয়ন' নামে উল্লিখিত।

শ্রীনয়নানন্দ নামের কারণ সম্বন্ধে প্রবাদ আছে—নবদ্বীপ ধামে শ্রীগৌর ও শ্রীগদাধর পণ্ডিত ভাব ভরে যখন যে কীর্ত্তন করতেন শ্রীধ্রুবানন্দ শ্রবণ মাত্র তা লিখে ফেলতেন। তাতে শ্রীগৌর ও শ্রীগদাধর পণ্ডিত সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে নয়নানন্দ নাম প্রদান করেন।

পদসমুদ্র গ্রন্থে—

''পণ্ডিতের স্নেহপাত্র শ্রীনয়ন মিশ্র।
বাল্যকালে প্রভু যাঁরে করিলেন শিষ্য।।
ঐছে চেষ্টা দেখি প্রভু হরষিত হৈলা।
নয়নানন্দ বলি নাম পশ্চাৎ থুইলা।।
নীলাচলে যাইতে প্রভু যবে ইচ্ছা কৈলা।
শ্রীনয়নানন্দ ভরতপুর নিয়োজিলা।''

শ্রীনরোত্তম ও শ্রীনিবাস আচার্য্যের তত্ত্বাবধানে

খেতরিতে যে মহোৎসব হয়েছিল তাতে শ্রীনয়নানন্দ ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন। শ্রীনয়নানন্দ ঠাকুর একজন পদকর্ত্তা ছিলেন। তাঁর পদকীর্ত্তন গ্রন্থ তেমন দেখা যায় না। পদকল্পতরু গ্রন্থে মাত্র কিছু কিছু পদ পাওয়া যায়।

শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়ক গীত–

গোরা মোর গুণের সাগর।
প্রেমের তরঙ্গ তায় উঠে নিরন্তর।।
গোরা মোর অকলঙ্ক শশী।
হরিনাম সুধা তাহে ক্ষরে দিবানিশি।।
গোরা মোর হিমাদ্রিশেখর।
তাহা হৈতে প্রেম বহে নিরন্তর।।
গোরা মোর প্রেমকল্পতরু।
যাঁর পদছায়ে জীব সুখে বাস করু।।
গোরা মোর নবজলধর।
বরষি শীতল যাহে করে নারী নর।।
গোরা মোর আনন্দের খনি।
নয়নানন্দের প্রাণ যাহার নিছনি।।

—

কিনা সে সুখের সরোবরে।
প্রেমের তরঙ্গ উথলিয়া পড়ে ধারে।।
নাচত পহুঁ বিশ্বম্ভরে।
প্রেমভরে পদধরে ধরণী না ধরে।।
বয়ান কনয়াচাঁদ ছাঁদে।
কত সুধা বরিষয়ে থির নাহি বাঁধে।।
রাজহংশ প্রিয় সহচর।
কেহ ভেল মধুকর কেহ বা চকোর।।
নব নব নটন লহরী।
প্রেম লছিমা নাচে নদীয়া নাগরী।।
নবনব ভকতি রতনে।
অযতনে পাইল সব দীন-হীন জনে।।
নয়নানন্দ কহে সুখসারে।
সেই বৃন্দাবন ভেল নদীয়া নগরে।।

—

আওত পিরীতি, মুরতিময় সাগর,
অপরূপ পহুঁ দ্বিজরাজ।
নব নব ভকত, নব রস যাবত,
নবতনু রতন সমাজ।।
ভালি ভালি নদীয়াবিহার।
সকল বৈকুণ্ঠ, বৃন্দাবন সম্পদ
সকল সুখের সুখসার।। ধ্রু।।
ধনি ধনি অতিধনি, অবভেল সুরধনী,
আনন্দে বহয়ে রসধার।
স্নান পান অবগাহ, আলিঙ্গন সঙ্গম,
কত কত বার।।
প্রতি পুর মন্দির, প্রতি তরুকুল তল,
ফুল বিপিন বিলাস।
কহে নয়নানন্দে, প্রেমে বিশ্বম্ভর,
সবাকার পুরাইল আশ।।

—

কলি ঘোর তিমিরে, গরাসল জগজন,
ধরম করম রহু দূর।
অসাধনে চিন্তামণি, বিধি মিলাওল আনি,
গোরা বড় দয়ার ঠাকুর।।
ভাইরে ভাই! গোরা গুণ কহনে না যায়।
কত শত আনন, কত চতুরানন,
বরণিয়া ওর নাহি পায়।।
চারি বেদ ষড়, দরশন পড়িয়া যে,
সে যদি গৌরাঙ্গ নাহি ভজে।
কিবা তার অধ্যয়ন, লোচনবিহীন যেন,
দরপণে অন্ধে কিবা কাজে।।
বেদ বিদ্যা দুই, কিছুই না জানত,

সে যদি গোরাঙ্গ জানে সার।
নয়নানন্দ ভনে, সেইত সকলি জানে,
সর্ব্বসিদ্ধি করতলে তার।।

—

কো কহুঁ আজুক আনন্দ ওর।
ফুল বনে দোলত গৌর-কিশোর।।
নিত্যানন্দ গদাধর সঙ্গে।
শান্তিপুর নাথ গাওই রঙ্গে।।
সহচর ফাগু পেলই গোরা গায়।
ধায়ই শুনি সব লোক নদীয়ায়।।
খোল করতাল ধ্বনি হরি হরি বোল।
নয়নানন্দে আনন্দে বিভোর।।

আচার্য্য মন্দিরে ভিক্ষা করিয়া চৈতন্য।
পতিত পাতকী দুঃখী করিলেন ধন্য।।
চন্দনে শোভিত অঙ্গ অরুণ বসন।
সংকীর্ত্তন মাঝে নাচে অদ্বৈত জীবন।।
মুকুন্দ মাধবানন্দ গায় উচ্চস্বরে।
নিতাই চৈতন্য নাচে অদ্বৈত মন্দিরে।।
আচার্য্য গোসাঞি নাচে দিয়া করতালি।
চিরদিনে মোর ঘরে গৌর বনমালী।।
কহয়ে নয়নানন্দ গদাধর পাছে।
কিবা ছিল কিবা হৈল আর কিবা আছে।।

শ্রীনয়ানন্দ ঠাকুরের রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কোন পদের উল্লেখ বিশেষভাবে পদকল্পতরুতে দেখা যায় না।

**।। জয় শ্রীনয়নানন্দ ঠাকুর কি জয়।।**

# শ্রীবল্লভাচার্য্য (শ্রীবল্লভ ভট্ট)

শ্রীবল্লভাচার্য্য ১৪৭৯ খৃষ্টাব্দে বৈশাখী কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে চম্পারণ্য নামক বনে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম-- শ্রীলক্ষ্মণ ভট্ট। মাতার নাম--শ্রীষল্লমাগারু। ভরদ্বাজ গোত্রীয় আন্ধ্র ব্রাহ্মণ। শ্রীলক্ষ্মণ ভট্ট কাশীতে বসবাস করতেন। সেখানে বল্লভাচার্য্য অধ্যয়ন করেন। অল্পকালে সমস্ত শাস্ত্রে পারঙ্গত হন এবং দিগ্বিজয় করেন। বিবাহের পর তিনি প্রয়াগে আড়াইল গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।

শ্রীবৃন্দাবন ধামে যাবার পথে মহাপ্রভু প্রয়াগ ধামে উপস্থিত হলেন। প্রয়াগ ধামে তিনি অপূর্ব্ব প্রেম বিকার প্রকাশ করলেন। তাঁর সে দিব্য ভাব দর্শনে সমস্ত লোক প্রেমময় হলেন। গঙ্গা যমুনা প্রয়াগ ধামকে প্লাবিত করতে পারেনি, কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর প্রেমজলে সকলকে প্লাবিত করলেন। মহাপ্রভুর সে প্রভাবের কথা শুনে একদিন শ্রীবল্লভাচার্য্য তাঁকে দেখতে এলেন। বল্লভাচার্য্য দূর থেকে প্রভুর অলৌকিক দিব্য মূর্ত্তি দেখে বুঝতে পারলেন, তিনি এক মহাপুরুষ হবেন। নিকটে এসে প্রণাম করলে, প্রভু তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করে হাসতে হাসতে তাঁকে দৃঢ় আলিঙ্গন করলেন। প্রভু বুঝতে পারলেন ইনি মহাভাগবত। অনন্তর উভয়ে কৃষ্ণকথা আরম্ভ করলেন। উভয়ের মনে প্রেম উথলে উঠল। বাৎসল্য-ভাবের উপাসক বল্লভাচার্য্য। প্রভু তা বুঝতে পেরে প্রেম সঙ্কোচ করলেন। মহাপ্রভুর অদ্ভুত প্রেম বিকার দেখে বল্লভাচার্য্য চমৎকৃত হলেন। ঠিক

এ সময় শ্রীরূপ ও অনুপম প্রভুর শ্রীচরণে এলেন এবং প্রভুর শ্রীচরণ বন্দনা করলেন। বল্লভাচার্য্যের নিকট মহাপ্রভু দু'ভায়ের পরিচয় করিয়ে দিলেন। শ্রীরূপ ও অনুপম বল্লভাচার্য্যকে বন্দনা করলেন। তাঁদের বৈষ্ণবভাব দেখে বল্লভাচার্য্য উঠে তাঁদের আলিঙ্গন করতে উদ্যত হলেন। দু'ভাই দৈন্য ভরে বললেন—"অস্পৃশ্য পামর মুঞি না ছুইঁহ মোরে।।" (চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৯/৬৭) আমরা অস্পৃশ্য পামর; আমাদের ছোঁবেন না। তাঁদের এরূপ দৈন্য দেখে আচার্য্য অবাক হলেন। বললেন তোমরা সর্ব্বোত্তম, তোমাদের মুখে কৃষ্ণ-নাম নৃত্য করছে। তখন আচার্য্যকে পরীক্ষা করবার জন্য প্রভু ভঙ্গী করে বলতে লাগলেন—আপনি বৈদিক যাজ্ঞিক ও কুলীন। এঁরা হীন জাতি। এঁদের স্পর্শ করবেন না। আচার্য্য বললেন—

দুঁহার মুখে কৃষ্ণনাম করিছে নর্ত্তন।
এই দুই অধম নহে, হয় সর্ব্বোত্তম।।

—চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৯/১৭

অহো বত শ্বপচোহতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানুচুর্নাম গৃণন্তি যে তে।।

—ভাঃ ৩/৩৩/৭

মহাপ্রভু বল্লভাচার্য্যের মুখে এ সমস্ত সিদ্ধান্ত শুনে পরম সুখী হলেন। স-পার্ষদ মহাপ্রভুকে নিজগৃহে নিয়ে যাওয়ার জন্য বল্লভাচার্য্য নিমন্ত্রণ করলেন। প্রভু আচার্য্যের নিমন্ত্রণ স্বীকার করলেন ও সপার্ষদ তাঁর গৃহে চললেন।

সগণে প্রভুরে ভট্ট নৌকাতে চড়াঞা।
ভিক্ষা দিতে নিজ ঘরে চলিলা লঞা।।
যমুনার জল দেখি চিক্কণ শ্যামল।
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু হইলা বিহ্বল।।
হুঙ্কার করি যমুনার জলে দিল ঝাঁপ।
প্রভু দেখি সবের মনে হৈল ভয় কাঁপ।।
আস্তে ব্যস্তে সবে ধরি প্রভুরে উঠাইল।
নৌকার উপরে প্রভু নাচিতে লাগিল।।
মহাপ্রভুর ভরে নৌকা করে টলমল।
ডুবিতে লাগিলা নৌকা, ঝলকে ভরে জল।।
যদ্যপি ভট্টের আগে প্রভুর ধৈর্য্য হৈল মন।
দুর্ব্বার উদ্ভট প্রেম নহে সম্বরণ।।
দেশ পাত্র দেখি মহাপ্রভু ধৈর্য্য হৈল।
আড়াইলের ঘাটে নৌকা আসি উত্তরিল।।

—চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৯/৭৭-৮৩

তারপর বল্লভাচার্য্য সাবধানে প্রভুকে যমুনায় স্নানাদি করিয়ে নিজ গৃহে নিয়ে এলেন।

আনন্দিত হঞা ভট্ট দিল দিব্যাসন।
আপনে করিলা প্রভুর পাদ-প্রক্ষালন।।
সবংশে সেই জল মস্তকে ধরিল।
নূতন কৌপীন বহির্ব্বাস পরাইল।।
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপে মহাপূজা কৈল।
ভট্টাচার্য্যে মান্য করি পাক করাইল।।
ভিক্ষা করাইল প্রভুরে সস্নেহ যতনে।
রূপ গোসাঞি দুই ভাইয়ে করাইল ভোজনে।।
ভট্টাচার্য্য শ্রীরূপে দেওয়াইল অবশেষ।
তবে সেই প্রসাদ কৃষ্ণদাস পাইল শেষ।।
মুখবাস দিয়া প্রভুরে করাইল শয়ন।
আপনি ভট্ট করেন প্রভুর পাদ-সম্বাহন।।
প্রভু পাঠাইল তাঁরে করিতে ভোজন।
ভোজন করি আইলা তেঁহো প্রভুর চরণ।।

—চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৯/৮৫-৯১

শ্রীবল্লভ ভট্ট শীঘ্র ভোজন করে পুনঃ প্রভুর চরণে এলেন। এমন সময় রঘুপতি উপাধ্যায় এলেন। প্রভু তাঁর কাছে কৃষ্ণকথা শুনতে চাইলেন। রঘুপতি উপাধ্যায় ত্রিহুত পণ্ডিত, মহাভাগবত। তিনি কৃষ্ণের

বর্ণনা করতে লাগলেন। তাঁর মুখে কৃষ্ণ-নাম শুনে প্রভুর প্রেম উথলে উঠল। প্রভু প্রেমাবেশে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন।

দেখি বল্লভ ভট্ট মনে চমৎকার হৈল।
দুই পুত্র আনি প্রভুর চরণে পড়িল।।
প্রভু দেখিবারে গ্রামের সব লোক আইল।
প্রভুর দরশনে সব লোক কৃষ্ণ-ভক্ত হইল।।
ব্রাহ্মণ সকল, করেন প্রভুর নিমন্ত্রণ।
বল্লভ ভট্ট তাঁ সবারে করেন নিবারণ।।
প্রেমোন্মাদে পড়ে গোসাঞি মধ্য যমুনাতে।
প্রয়াগে চালাইব ইঁহা না দিব রহিতে।।
যাঁর ইচ্ছা প্রয়াগে যাঞা করিবে নিমন্ত্রণ।
এত বলি প্রভু লৈঞা করিল গমন।।

—চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৯/১০৮-১১২

প্রভু সপার্ষদ প্রয়াগে এলেন।

এই মত বিলাস প্রভুর ভক্তগণ লঞা।
হেনকালে বল্লভ ভট্ট মিলিল আসিয়া।।

—চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৭/৪

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বছরের ন্যায় রথযাত্রার পূর্ব্বে গৌড়দেশের ভক্তগণ ক্রমে ক্রমে সব নীলাচলে এলেন। এমন সময় শ্রীবল্লভ ভট্টও নীলাচলে এলেন। মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হলেন। বল্লভ ভট্ট বন্দনা করলে প্রভু ভাগবত বুদ্ধিতে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। প্রভু মান্য করে তাঁকে নিকটে বসালেন, তখন বল্লভ ভট্ট বিনয় করে বলতে লাগলেন—

বহু দিন মনোরথ তোমা দেখিবারে।
জগন্নাথ পূর্ণ কৈলা দেখিলুঁ তোমারে।।
তোমার দর্শন যে পায় সেই ভাগ্যবান্।
তোমাকে দেখিয়ে যেন সাক্ষাৎ ভগবান্।।
তোমারে যে স্মরণ করে সে হয় পবিত্র।
দর্শনে পবিত্র হবে,—ইথে কি বিচিত্র।।

যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুদ্ধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ।
কিং পুনর্দ্দর্শনস্পর্শপাদশৌচাসনাদিভিঃ।।

ভাঃ ১/১৯/৩০

কলিকালের ধর্ম—কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণ শক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন।।
তাহা প্রবর্ত্তাইলা তুমি,—এই ত প্রমাণ।
কৃষ্ণ-শক্তি ধর তুমি,—ইথে নাহি আন।।
জগতে করিলা তুমি কৃষ্ণনাম প্রকাশে।
যেই তোমা দেখে সেই কৃষ্ণপ্রেমে ভাসে।।
প্রেম-পরকাশ নহে কৃষ্ণ শক্তি বিনে।
কৃষ্ণ—এক প্রেমদাতা, শাস্ত্র প্রমাণে।।

—চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৭/৭-১৪

বল্লভ ভট্ট সমস্ত বলে মহাপ্রভুকে প্রশংসা করলে প্রভু বললেন—আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী! কৃষ্ণ-ভক্তি কি জানিনা। এ শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য। ইনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর। এঁনার সঙ্গ-প্রভাবে আমার মন নির্মল হয়েছে। এঁনার কৃপায় ম্লেচ্ছগণও কৃষ্ণ-ভক্তি লাভ করেছে। তারপর প্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে দেখিয়ে বললেন—ইনি শ্রীনিত্যানন্দ অবধূত। সাক্ষাৎ ঈশ্বর ভাবোন্মাদে সর্বদা কৃষ্ণ-প্রেম সাগরে ডুবে থাকেন। ইনি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য। ষড় দর্শনের অধ্যাপক জগদ্গুরু ও ভাগবতোত্তম। ইনি আমাকে ভক্তিযোগ কি তা দেখিয়েছেন। ইনি রামানন্দ রায়। কৃষ্ণ-ভক্তি রসের নিধান। কৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান তা তিনি আমাকে জানিয়েছেন। ভঙ্গী করে প্রভু বল্লভ ভট্টের নিকট এ ভাবে নিজ পার্ষদগণের পরিচয় দিতে লাগলেন।

ভট্টের হৃদয় দৃঢ় অভিমান জানি।
ভঙ্গী করি মহাপ্রভু কহে এত বাণী।।
আমি সে বৈষ্ণব,—ভক্তিসিদ্ধান্ত সব জানি।
আমি সে ভাগবত অর্থ উত্তম বাখানি।।

ভট্টের মনেতে এই ছিল দীর্ঘ গর্ব্ব।
প্রভুর বচন শুনি সে হইল খর্ব্ব।।
প্রভুর মুখে বৈষ্ণবতা শুনিয়া সবার।
ভট্টের ইচ্ছা হৈল সবারে দেখিবার।।

—চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৭/৫১-৫৪

বল্লভ ভট্ট জিজ্ঞাসা করলেন এ-সমস্ত বৈষ্ণব কোথায় থাকেন? প্রভু বললেন—কেহ গৌড়দেশে, কেহ উৎকলে, কেহ বা দেশান্তরে। বর্ত্তমানে সকলেই রথযাত্রা দর্শনের জন্য আগমন করেছেন। আপনি এখানে সবার দর্শন পাবেন। অতঃপর বল্লভ ভট্ট বহু অনুনয় করে প্রভুকে নিজ গৃহে ভোজনের জন্য আমন্ত্রণ করলেন।

অন্য একদিন মহাপ্রভু যখন অদ্বৈত আচার্য্য, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীরামানন্দ রায়, শ্রীসার্ব্বভৌম পণ্ডিত ও শ্রীস্বরূপ দামোদর প্রভৃতি পার্ষদবৃন্দসহ উপবিষ্ট ছিলেন, ঠিক সে সময় শ্রীবল্লভ আচার্য্য তথায় উপস্থিত হলেন এবং তিনি বৈষ্ণবগণকে দেখে চমৎকৃত হলেন।

তবে ভট্ট বহু মহাপ্রসাদ আনাইল।
গণ সহ মহাপ্রভুরে ভোজন করাইল।।

—চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৭/৬১

রথযাত্রা দিবসে সাত সম্প্রদায় চৌদ্দমাদল বাদ্য, তার মধ্যে প্রভুর অদ্ভূত নৃত্য-কীর্ত্তন দেখে বল্লভ ভট্টের আনন্দের সীমা রইল না। তিনি পরম বিস্ময়ান্বিত হলেন। রথযাত্রা হয়ে গেল। গৌড়ের ভক্তগণও বিদায় হলেন। বল্লভ ভট্ট পুরীতে অবস্থান করতে লাগলেন। একদিন তিনি প্রভুস্থানে ভাগবত শাস্ত্রের স্ব-কৃত টীকা শুনাতে ইচ্ছা করলেন। প্রভু বললেন— আমার ভাগবত অর্থ শুনবার অধিকার নাই বলে, আমি বসে কৃষ্ণনাম মাত্র জপ করি। রাত্র-দিনে সংখ্যা পূর্ণ হয় না। কখন ভাগবত আদি শাস্ত্র শুনব?

বল্লভ ভট্ট বললেন—আমি কৃষ্ণ নামের বহু অর্থ করেছি। প্রভু বললেন—"কৃষ্ণনামের বহু অর্থ না মানি। 'শ্যামসুন্দর' 'যশোদানন্দন'—এই মাত্র জানি।"

বল্লভ ভট্টের প্রয়াস ব্যর্থ হল। তিনি বিমর্ষ হলেন। সে দিন গৃহে এলেন, মনে মনে চিন্তা করলেন, অন্যান্য ভক্তদিগকে ইহা শুনাবেন। তারপর তিনি ভক্তদের কছে এ কথা প্রস্তাব করলে প্রভুর উপেক্ষা হেতু কেউ শুনতে রাজি হলেন না। ভট্ট বড়ই লজ্জিত হলেন। পরিশেষে দুঃখিত চিত্তে শ্রীগদাধর পণ্ডিতের কাছে এলেন এবং বহু অনুনয়-বিনয় করে কৃষ্ণনামের ব্যাখ্যা শুনাতে লাগলেন। অতিশয় সরল শ্রীগদাধর পণ্ডিত যেন সঙ্কটে পড়লেন। বল্লভাচার্য্য একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। বাইরে তাঁকে কিছু বলতে পারছেন না। অথচ প্রভু, উপেক্ষা করেছেন শুনে নিজের শুনবার ইচ্ছাও নাই। মনে মনে মহাপ্রভুর শ্রীচরণ স্মরণ করতে লাগলেন। প্রভুকে ত ভয় করি না। তাঁর যে ভক্তগণ আছেন তাঁরা বিষম। তাঁদের ভয় করি।

প্রত্যহ বল্লভ ভট্ট প্রভু স্থানে আসেন এবং বিবিধ তর্ক উত্থাপন করেন। অদ্বৈত আচার্য্য প্রভৃতি তা খণ্ডন করেন। কোন সিদ্ধান্ত প্রভুর ভক্তগণের আগে বল্লভ ভট্ট স্থাপন করতে পারেন না। তজ্জন্য বড় বিষণ্ণ হলেন।

একদিন বল্লভ ভট্ট অদ্বৈত আচার্য্যকে প্রশ্ন করলেন—জীব প্রকৃতি, কৃষ্ণ পতি। পতিব্রতা পত্নী স্বামীর নাম উচ্চ করে বলে না। কিন্তু আপনারা বলেন কেন?

অদ্বৈতাচার্য্য বললেন—আমাদের সামনে সাক্ষাৎ ধর্ম-স্বরূপ প্রভু বসে আছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করুন।

প্রভু কহেন—তুমি না জানহ ধর্মাধর্ম।
স্বামী আজ্ঞা পালে—এই পতিব্রতাধর্ম।।
পতির আজ্ঞা—নিরন্তর তাঁর নাম লইতে।

পতির আজ্ঞা—পতিব্রতা না পারে লঙ্ঘিতে।।
অতএব নাম লয় নামের ফল পায়।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়।।

—চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৭/১০২-১০৪

এ সমস্ত সিদ্ধান্ত শুনে বল্লভ ভট্ট নির্ব্বাক হলেন। ঘরে এসে চিন্তা করতে লাগলেন।

''নিত্য আমার এই সভায় হয় কক্ষাপাত।
একদিন উপরে যদি হয় মোর বাত।।
তবে সুখ হয়, আর সব লজ্জা যায়।
স্ব-বচন স্থাপিতে আমি কি করি উপায়।।

চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৭/১০৬-১০৭

আর একদিন বল্লভ ভট্ট বৈষ্ণব সভায় এলেন ও প্রভুকে নমস্কার করে আসনে বসলেন। অনন্তর গর্ব্বভরে কিছু বলতে লাগলেন—

''ভাগবতে স্বামীর ব্যাখ্যান করিয়াছি খণ্ডন।
লইতে না পারি তাঁর ব্যাখ্যান বচন।।
প্রভু হাসি কহে,—স্বামী না মানে যেই জন।
বেশ্যার ভিতরে তারে করয়ে গণন।।
এত কহি মহাপ্রভু মৌন ধরিলা।
শুনিয়া সবার মনে সন্তোষ হইলা।।
জগতের হিত লাগি গৌর-অবতার।
অন্তরের অভিমান জানেন তাহার।।
নানা অবজ্ঞানে ভট্টে শোধেন ভগবান্।
কৃষ্ণে যৈছে খণ্ডিলেন ইন্দ্রের অভিমান।।
অজ্ঞ জীব নিজ হিতে অহিত করি মানে।
গর্ব্ব চূর্ণ হৈলে, পাছে উঘাড়ে নয়নে।।
ঘরে আসি, রাত্রে ভট্ট চিন্তিতে লাগিল।
পূর্ব্বে প্রয়াগে মোরে মহাকৃপা কৈল।।
স্বগণ সহিতে মোর মানিলা নিমন্ত্রণ।
এবে কেনে প্রভুর মোতে ফিরি গেল মন।।
আমি জিতি—এই গর্ব্ব শেল মোর চিত্তে।
ঈশ্বর স্বভাব করেন সবাকার হিতে।।
আপনা জানাইতে আমি করি অভিমান।
সে গর্ব্ব খণ্ডাতে মোর করে অপমান।।
আমার হিত করেন—ইহো আমি মানি দুঃখ।
কৃষ্ণের উপরে যেন কৈল ইন্দ্র মূর্খ।।
এত চিন্তি, প্রাতে আসি প্রভুর চরণে।
দৈন্য করি স্তুতি করি লইল শরণে।।
আমি অজ্ঞ জীব,—অজ্ঞোচিত কর্ম কৈলু।
তোমার আগে মূর্খ আমি পাণ্ডিত্য প্রকাশিলুঁ।।
তুমি ঈশ্বর নিজোচিত কৃপা কৈলা।
অপমান করি সর্ব্ব গর্ব্ব খণ্ডাইলা।।
প্রভু কহে—তুমি পণ্ডিত মহাভাগবত।
দুইগুণ যাঁহা, তাঁহা নাহি গর্ব্ব পর্ব্বত।।
শ্রীধর স্বামী নিন্দি নিজ টীকা কর।
শ্রীধর স্বামী নাহি মান,—এত গর্ব্ব ধর।।
শ্রীধর স্বামী প্রসাদে ভাগবত জানি।
জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামী গুরু করি মানি।।
শ্রীধর উপরে গর্ব্বে যে কিছু লিখিবে।
অর্থ ব্যর্থ লিখন সেই লোকে না মানিবে।।
শ্রীধরের অনুগত যে করে লিখন।
সব লোক মান্য করি' করিবে গ্রহণ।।
শ্রীধরানুগত কর ভাগবত ব্যাখ্যান।
অভিমান ছাড়ি ভজ কৃষ্ণ ভগবান্।।
অপরাধ ছাড়ি কর কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন।
অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ।।
ভট্ট কহে--যদি মোরে হইলা প্রসন্ন।
একদিন পুনঃ মোর মান নিমন্ত্রণ।।

জগদ্ হিতার্থে অবতীর্ণ শ্রীগৌরসুন্দর তাঁকে দণ্ড দিয়ে শোধন করলেন ও সমস্ত জগদ্‌কে তাঁকে লক্ষ্য করে শিক্ষা দিলেন। যোগ্য প্রিয়জনের মাধ্যমে ছাড়া জগতকে শিক্ষা দেওয়া যায় না। অতঃপর মহাপ্রভু বল্লভ ভট্টের আমন্ত্রণ স্বীকার করলেন এবং সপার্ষদ তাঁর গৃহে ভোজন করলেন। শ্রীবল্লভ

ভট্টের মন পরম আনন্দিত হল। শ্রীমদ্ বল্লভ ভট্ট বাল গোপালের উপাসনা করতেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁর কিশোর গোপালের উপাসনা করবার ইচ্ছা হল। অনন্তর তিনি প্রভুর আজ্ঞা নিয়ে শ্রীগদাধর পণ্ডিতের নিকট থেকে কিশোর কৃষ্ণ উপাসনা মন্ত্র গ্রহণ করলেন।

তাঁহাই বল্লভ ভট্ট প্রভুর আজ্ঞা লৈল।
পণ্ডিত ঠাঞি পূর্ব্ব প্রার্থিত সব সিদ্ধি হৈল।।
চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৭/১৬৭

১৫৩১ খৃষ্টাব্দে আষাঢ়ী শুক্ল পক্ষে শ্রীবল্লভাচার্য্য অপ্রকট হন।

**।। জয় শ্রীল বল্লভ ভট্ট কি জয়।।**

# শ্রীরঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য

শ্রীরঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য বরাহনগরে অবস্থান করতেন। মহাপ্রভু নীলাচলে যাবার পথে কুমার হট্ট, পানিহাটি হয়ে বরাহ-নগরে এলেন।

তবে প্রভু আইলেন বরাহনগর।
মহাভাগ্যবন্ত এক ব্রাহ্মণের ঘর।।
সেই বিপ্র বড় সুশিক্ষিত ভাগবতে।
প্রভু দেখি' ভাগবত লাগিলা পড়িতে।।
শুনিয়া তাহান ভক্তিযোগের পঠন।
আবিষ্ট হইলা গৌরচন্দ্র নারায়ণ।।
'বল বল' বলে প্রভু গৌরাঙ্গরায়।
হুঙ্কার গর্জ্জন প্রভু করয়ে সদায়।।
—চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৫/১১০ শ্লোক

বরাহনগরে শ্রীরঘুনাথ পণ্ডিতের গৃহে প্রভু উপস্থিত হলেন, রঘুনাথ প্রেমাবিষ্ট হয়ে ভাগবত পাঠে মগ্ন, ভাগবতে তাঁর এ রকম মনোনিবেশ দেখে প্রভু আনন্দ ভরে বলতে লাগলেন 'পড় পড়'। প্রভু পরম সুখী হয়ে তাঁর নাম দিলেন ভাগবতাচার্য্য।

''প্রভু বলে ভাগবত এমত পড়িতে।
কভু নাহি শুনি আর কাহার মুখেতে।।
এতেকে তোমার নাম ভাগবতাচার্য্য।
ইহা বিনা আর কোন না করিহ কার্য্য।।"
—চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৫/১২০

প্রভুর আশীর্ব্বাদ শুনে ব্রাহ্মণ বড় সুখী হলেন। তিনি প্রভুকে দণ্ডবৎ করতেই প্রভু তাঁকে দৃঢ় আলিঙ্গন করলেন। একরাত্র প্রভু পরম সুখে ব্রাহ্মণের গৃহে যাপন করলেন।

শ্রীভাগবতাচার্য্য নিজেকে শ্রীগদাধর গোস্বামীর শিষ্য বলে পরিচয় দিয়েছেন—

''বন্দে নিত্যমনন্ত ভক্তিনিরতং ভক্তিপ্রিয়ং সদ্‌গুরুম্।
মদীশ্বর গদাধরং দ্বিজবরং ভৃত্যৈরূপাকৃতিম্।।
—শ্রীকৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিণী

পণ্ডিত গোসাঞি শ্রীল গদাধর নামে।
যাঁহার মহিমা ঘোষে এ তিন ভুবনে।।
ক্ষিতিতলে কৃপায় করিলা অবতার।
অশেষ পাতকী জীবে করিতে উদ্ধার।।
বৈকুণ্ঠ নায়ক কৃষ্ণ চৈতন্য মূরতি।
তাঁহার অভিন্ন তেঁহ সহজে শকতি।।
মোর ইষ্ট দেব গুরু সেই দুই চরণ।

দেহ মন বাক্যে মোর সেই সে শরণ।।
—শ্রীকৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিণী উপসংহার

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—

শ্রীগদাধর পণ্ডিত উপশাখা মহোত্তম।
তাঁর শাখাগণ কিছু করিয়ে গণন।।
শাখা শ্রেষ্ঠ ধ্রুবানন্দ শ্রীধর ব্রহ্মচারী।
ভাগবতাচার্য্য হরিদাস ব্রহ্মচারী।।
—চৈঃ চঃ আদি ১২/৭৮-৭৯

শ্রীভাগবতাচার্য্য কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিণীতে মাঝে মাঝে শ্রীগৌরসুন্দরের অপূর্ব্ব মহিমা বলেছেন—

জয় পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণ বিচিত্র-বিহার।
জয় জগন্নাথ নীলাচল-অবতার।।
জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ চৈতন্য মূরতি।
প্রেম-ভক্তিদাতা প্রভু ভকতের গতি।।
—কৃষ্ণ প্রেঃ ১০/১/৩১

কলিযুগ-অবতার শুন, সাবধানে।
কলিযুগে কেবল ভজিবে সংকীর্ত্তনে।।
'কৃষ্ণ' পদে 'কৃষ্ণ' বলি বর্ণ পদে নাম।
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম জানিবে বিধান।।
'তিষাকৃষ্ণ'—অকৃষ্ণ 'গৌরাঙ্গ' নিজ-ধাম।
গৌরচন্দ্র-অবতার বিদিত বাখান।।
অঙ্গ-উপাঙ্গ অস্ত্র পারিষদ সঙ্গে।
গৌরচন্দ্র-অবতার সংকীর্ত্তন-রঙ্গে।।
—কৃঃ প্রেমঃ ১১/৫/৭৩

জয় জয় গৌরচন্দ্র চৈতন্য-বিহার।
ভক্তকুল-প্রাণধন ভক্ত-অবতার।।
শ্রীঅদ্বৈত-শ্রীনিবাস-হরিদাস-সঙ্গ।
নিত্যানন্দ-বলরাম-সহ নিত্য রঙ্গ।।
গদাধর প্রাণনাথ ভক্তকুলপতি।
ভক্তরূপ অবতার ত্রিজগৎ পতি।।
—কৃঃ প্রেমঃ ১/১৩৪

শ্রীমদ্ ভাগবতাচার্য্য কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী মহাপ্রভুর দর্শন লাভের পরেই লিখেছিলেন। মহাপ্রভুর সঙ্গে যখন ভাগবতাচার্য্যের প্রথম মিলন হয়, তখন গ্রন্থ রচনার উদ্যোগ চলছিল ও কিছু কিছু প্রবন্ধ লেখা হচ্ছিল।

বর্ত্তমান কলিকাতার উত্তর উপকণ্ঠে গঙ্গার তীরে বরাহনগরের মালী পাড়া পল্লীতে শ্রীভাগবাতাচার্য্যের শ্রীপাট অবস্থিত। শ্রীপাটে শ্রীভাগবতাচার্য্যের হস্তলিখিত পুঁথিখানি দর্শন করান হয়ে থাকে।

চৈত্র কৃষ্ণ-দ্বাদশীতে শ্রীগৌরসুন্দর বরাহনগরে শ্রীভাগবতাচার্য্যের গৃহে শুভাগমন করেছিলেন।

**।। জয় শ্রীরঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য প্রভু কি জয়।।**



# ভক্ত চাঁদ কাজী

শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশে ভক্তগণ গৃহে গৃহে হরি সংকীর্ত্তন করতে লাগলেন। পাষণ্ডিগণের তা সহ্য হল না। বিধর্ম্মী কাজীকে তারা জানাল। কাজী শুনে ক্রোধে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন। সন্ধ্যার সময় নগরে-নগরে তিনি লোকজন নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এক দিন সন্ধ্যার সময় মায়াপুরে শ্রীবাস অঙ্গনে কীর্ত্তন শুনতে পেলেন। সেখানে ঢুকে মৃদঙ্গ প্রভৃতি ভেঙ্গে দিলেন এবং বললেন—আবার যদি কীর্ত্তনের আওয়াজ শুনতে পাই তোমাদের প্রাণ নাশ করব।

যবনের অত্যাচারে ভক্তগণ বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। পরদিন তাঁরা এই ব্যাপারটি মহাপ্রভুকে জানালেন। ভক্তদের দুঃখের কথায় প্রভু ক্রুদ্ধ হলেন। বললেন—আমার কীর্ত্তনে বাধা দেয় কাজীর এত বড় স্পর্দ্ধা! প্রভু ভক্তগণকে জানালেন, আজ সন্ধ্যায় নগরে-নগরে মহাসংকীর্ত্তন হবে। সন্ধ্যা গত না হতে ভক্তগণ মহাপ্রভুর বাড়ীতে সমবেত হতে লাগলেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য, শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীহরিদাস ঠাকুর, শ্রীবক্রেশ্বর, শ্রীবাসুদেব ঘোষ প্রভৃতির এক একটি দল হল। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু প্রত্যেক দলের সঙ্গে নৃত্য-কীর্ত্তন করে ভ্রমণ করতে লাগলেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীবাস পণ্ডিতকে মহাপ্রভু প্রথমে চন্দন পুষ্পমালা প্রদান করলেন। অনন্তর অন্যান্য ভক্তগণকেও চন্দন মালায় ভূষিত করলেন। মহাপ্রভুর স্বহস্তের চন্দন-মালা পেয়ে ভক্তগণ মহানন্দে মত্ত হয়ে উঠলেন। প্রত্যেকেই নিজের মধ্যে আজ এক অভূতপূর্ব্ব তেজ ও প্রভাব অনুভব করতে লাগলেন। তারপর শত শত মৃদঙ্গ ও করতাল বাদ্যের তালের সহিত উঠল মধুর শ্রীনাম-ধ্বনি—

''হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।।
''হেন মহারঙ্গে প্রতি নগরে-নগরে।
কীর্ত্তন করেন সর্ব্বলোকের ঈশ্বরে।।
অবিচ্ছিন্ন হরিধ্বনি সর্ব্বলোক করে।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া ধ্বনি যায় বৈকুণ্ঠেরে।।''

—চৈঃ ভাঃ ২৩/২৯৪-২৯৫

এই মহা-সংকীর্তনের সঙ্গে সহস্র সহস্র ভক্তসহ মহাপ্রভু নগরের পথে পথে চলেছেন। অচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন ভগবান্ শ্রীগৌর সুন্দরের প্রভাবে নবদ্বীপ নগর যেন বৈকুণ্ঠ পুরীর শোভা ধারণ করল। নগরবাসীর দ্বারে-দ্বারে কদলীবৃক্ষ, পূর্ণঘট, আম্রসার ও দীপাবলী শোভা পেতে লাগল।

''লক্ষ কোটি মহাদীপ চতুর্দিকে জ্বলে।
লক্ষ কোটি লোক চতুর্দিকে হরি বলে।।
চন্দ্রের আলোকে অতি অপূর্ব্ব দেখিতে।
দিবা নিশি একো কেহ নারে নিশ্চয়িতে।।''

—চৈঃ ভাঃ ২৩/৩০১-৩০২

অন্তরীক্ষে থাকি যত স্বর্গ দেবগণ।
চম্পক মল্লিকা পুষ্প করে বরিষণ।।

—চৈঃ ভাঃ ২৩/২০৪

এইমত কীর্ত্তন করি নগরে ভ্রমিলা।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে প্রভু কাজীদ্বারে গেলা।।

—চৈঃ চঃ আদি ১৭/১৩৯

এইভাবে নগরে কীর্ত্তন করতে করতে মহাপ্রভু এলেন কাজী দ্বারে। লক্ষ লক্ষ লোক নিয়ে শ্রীনিমাই পণ্ডিত মহা-সংকীর্ত্তনের সঙ্গে আসছেন দেখে কাজী ভয়ে গৃহমধ্যে লুকিয়ে রইলেন। ভক্তগণ সহ মহাপ্রভু কাজীর দরজায় বসে পড়লেন। কাজী কোথায়? কাজী অন্তঃপুরে লুকিয়ে আছেন। একজন বিশিষ্ট লোককে মহাপ্রভু কাজীকে ডাকতে পাঠালেন।






কাজী সাহেব অবনত মস্তকে বাইরে এলেন।

মহাপ্রভু বললেন—আমি আপনার অভ্যাগত। আপনি আমায় দেখে পালালেন। এ কি ধর্ম?

কাজী বললেন—পণ্ডিত! আপনি ক্রোধের ভাব নিয়ে এসেছেন। তাই ভাবলাম কিছুক্ষণ পরে দেখা করব। যাক্ আমার সৌভাগ্য যে আপনার মত অতিথি পেয়েছি। পণ্ডিতজী! আপনার মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী গ্রাম সম্বন্ধে আমার চাচা। সে সম্বন্ধে আপনি আমার ভাগিনা। দেহ সম্বন্ধ অপেক্ষা গ্রাম সম্বন্ধ লোকে বড় বলে। আমার ভাগিনা হয়ে, আমার উপর রাগ করে এসেছেন। আমায় অবশ্য সইতে হবে। আর এক কথা বলছি। আমি হলাম আপনার মামা। মামার অপরাধ ভাগিনা কখনও গ্রহণ করে না। এ ভাবে কাজী মহাপ্রভুর সঙ্গে আকারে-ইঙ্গিতে নর্ম আলাপ করতে লাগলেন। ভিতরের নিগূঢ় অর্থ কেহ বুঝতে পারলেন না। আসলে এই কাজী হল কংস মামা।

প্রভু—মামা! একটি প্রশ্ন করতে এলাম।

কাজী—পণ্ডিতজী! কি প্রশ্ন বলুন।

প্রভু—গো-দুগ্ধ খান। তাই গাভী হল মাতা। বৃষদ্বারা ক্ষেত চাষ করে অন্ন উৎপাদন করেন তাই বৃষ হল পিতা। পিতা-মাতাকে মেরে খান। এ আপনাদের কোন্ ধর্ম্ম? কিসের ভরসায় আপনারা এত বড় পাপ কাজ করেন?

কাজী--পণ্ডিতজী! আপনাদের যেমন বেদপুরাণ, আমাদের তেমন কেতাব কোরাণ। উভয় শাস্ত্রেই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মার্গের কথা আছে। নিবৃত্তি মার্গমতে প্রাণীমাত্র বধ নিষেধ। প্রবৃত্তি মার্গমতে বধ করা চলে। শাস্ত্র আজ্ঞা বলে করলে পাপ হয় না। আপনার বেদেও গোবধের কথা আছে। পুরাকালে হিন্দুদের কোন কোন মুনি গো-বধ করতেন।

প্রভু—বেদে গো-বধ নিষেধ। তাই কোন হিন্দু গো-বধ করে না। পুনরায় জীবন দিতে পারলে জীব হত্যা করা চলে। পুরাকালে জরদগবকে (বৃদ্ধ বৃষকে) যজ্ঞস্থলে বধ করে বেদ মন্ত্রের দ্বারা পুনর্ব্বার তাকে জীবন দান করা হত। তাতে তার উপকার হত, পুণ্য হত। কলিকালে ব্রাহ্মণদের এ প্রকার শক্তি নাই। এখন কেউ গো-বধ করে না। মামা! আপনারা বাঁচাতে পারেন না, কেবল বধ করতে পারেন। এ পাপের ফলে, নরক থেকে নিষ্কৃতি পাবেন না।

কলিকালে গো বধ, কর্ম সন্ন্যাস, মাংস দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ, অশ্বমেধ যজ্ঞ ও দেবের দ্বারা পুত্র উৎপাদন—এ পাঁচটী কার্য্য শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। (চৈঃ চঃ আদি ১৭/১৬৪)

গো-অঙ্গে যত লোম আছে গো হত্যাকারীর তত বৎসর মহা-রৌরব নরকে বাস করতে হয়। আপনাদের শাস্ত্রকর্ত্তা ভ্রান্তবুদ্ধি নিয়ে শাস্ত্রমর্ম্ম না জেনে ঐ সব মত প্রকাশ করেছেন। মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত শুনে কাজী সাহেব স্তব্ধ হলেন। বললেন—পণ্ডিত! আপনার সিদ্ধান্তই ঠিক সিদ্ধান্ত। আমাদের শাস্ত্র আধুনিক। তার বিচার সঙ্গতি নাই। সব কিছুই কল্পিত। আমি তা বুঝি। তথাপি কর্ত্তব্যের অনুরোধে সব কিছু করছি। কাজী সাহেবের কথা শুনে মহাপ্রভু হাসতে লাগলেন।

মহাপ্রভু—মামা! আর একটি প্রশ্ন আপনাকে করতে চাই। এখন নগরে নগরে যে হরিনাম সংকীর্ত্তন হচ্ছে তাতে আপনি বাধা দিচ্ছেন না কেন? আপনি কাজী, হিন্দুধর্ম বিরোধ করাটা মুসলমানদের বিশেষ নিয়ম।

কাজী—সকলে আপনাকে গৌরহরি বলে। তাই আমিও গৌরহরি বলে সম্বোধন করছি। গৌরহরি! এ প্রশ্ন সম্বন্ধে আপনাকে সব কিছু বলব যদি আপনি নিভৃতে শুনেন।

প্রভু—মামা! আপনি এঁদের সামনে স্বচ্ছন্দে

বলতে পারেন। এঁরা আমার অন্তরঙ্গ জন। কোন ভয় নাই। আপনি বলুন।

কাজী—যে দিন খোল ভেঙে কীর্ত্তন বন্ধ করি, সে রাত্রে এক ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখি। এক ভয়ঙ্কর নরসিংহ মূর্ত্তি বক্ষের উপর চড়ে আমাকে বধ করতে এলেন। আমি ভয়ে অর্দ্ধমৃত হলাম। দন্ত কড়মড় করতে করতে সেই মূর্ত্তি আমাকে বললেন—মৃদঙ্গের বদলে তোর বক্ষস্থল বিদীর্ণ করব। আমার কীর্ত্তনে বাধা দিয়েছিস্। তোকে সংহার করব। চক্ষু বুজে কাঁপতে লাগলাম, মনে মনে তাঁর চরণে শরণ নিলাম। আমাকে ভীত দেখে দয়ার্দ্র হয়ে তিনি বললেন—''আজ তোকে ক্ষমা করলাম। আবার যদি কীর্ত্তনে বাধা দিস্, তোকে সবংশে বিনাশ করব।" এই কথা বলে নৃসিংহ অন্তর্দ্ধান হলেন। দেখুন আমার বক্ষে তাঁর নখচিহ্ন এখনও রয়েছে।" এ বলে কাপড় সরিয়ে কাজী মহাপ্রভুকে বক্ষঃস্থল দেখালেন।

তারপর কাজী সাহেব বললেন—

''হিন্দুর ঈশ্বর বড় যেই নারায়ণ।<br>
সেই তুমি হও—হেন লয় মোর মন।।"

চৈঃ চঃ আদি ১৭/২১৫

আমার মনে হয় অপানি সেই ঈশ্বর।

আমি সেই দিন থেকে কীর্ত্তনে বাধা দিতে নিষেধ করেছি।

কাজীর কথা শুনে মহাপ্রভু বললেন—আপনার মুখে 'হরি' 'কৃষ্ণ' 'রাম' 'নারায়ণ' নাম। ইহা বড় বিচিত্র; আপনি সমস্ত পাপ মুক্ত হলেন। আপনি বড় ভাগ্যবান।

মহাপ্রভুর কথা শুনে কাজী সাহেবের হৃদয় বিগলিত হল। দুই নয়ন দিয়ে জল পড়তে লাগল। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে মহাপ্রভু কাজী সাহেবকে আলিঙ্গন করলেন। কাজী তখন মহাপ্রভুর শ্রীচরণে পড়ে বললেন—

তোমার প্রসাদে মোর ঘুচিল কুমতি।<br>
এই কৃপা কর যেন তোমাতে রহুঁ মতি।।

—চৈঃ চঃ আদি ১/২২০

তারপর প্রভু বললেনে—মামা! আপনার কাছে আমার একটি ভিক্ষা।

কাজী—আমি দীন-হীন কি ভিক্ষা দিব?

প্রভু—নবদ্বীপে যেন কেহ কীর্ত্তনে বাধা না দেয়।

কাজী—আমি শপথ করে বলে যাব আমার বংশধরগণ কেউ কীর্ত্তনে বাধা দেবে না।

কাজী সাহেবের কথা শুনে ভক্তগণ মহা হরি হরি ধ্বনি করে উঠলেন।

তারপর ভক্তগণ সহ মহাপ্রভু সংকীর্ত্তন করতে করতে চললেন। ভক্ত কাজী সাহেবও প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলতে লাগলেন। প্রভু তাঁকে অনেক বুঝিয়ে গৃহে পাঠিয়ে ছিলেন।

মৌলানা সিরাজুদ্দিন সেদিন থেকে ভক্ত চাঁদকাজী নামে খ্যাত হলেন। অদ্যাপি নবদ্বীপে বামন পুকুরে তাঁর পবিত্র সমাধি স্থানটি রয়েছে। হিন্দু ও মুসলীম উভয় সম্প্রদায়ের লোক সেখানে গিয়ে তাঁর সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এটাই সংহতির প্রকৃত কেন্দ্র। ঐতিহাসিকরা সংকীর্ত্তন রক্ষার্থে নিমাইয়ের এই লীলা প্রদর্শনকে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা বলে মনে করে থাকেন। শাস্ত্রে বর্ণনা আছে--চাঁদকাজীর সমাধি দর্শন করলে জীবের আধি-ব্যাধি দূর হয়।

ঐ দেখ ওহে জীব, কাজীর সমাধি।<br>
দেখিলে জীবের নাশ হয় আধি-ব্যাধি।।

নঃ মঃ ৬/৯১

**।। জয় ভক্ত চাঁদকাজী কি জয়।।**

# মধুপণ্ডিত

যস্তেন সুপ্রকটিতো গোপীনাথ দয়াম্বুধিঃ।
বংশীবট তটে শ্রীমদ্ যমুনোপতটে শুভে।।
—শ্রীসাধন দীপিকা

জয় জয় মধু পণ্ডিত সুজন।
গৌর-নিত্যানন্দ যাঁর হয় প্রাণধন।।
বংশীবটে যাঁরে কৃপা কৈল গোপীনাথ।
শ্রীচরণ সেবা দিয়ে যাঁরে কৈল আত্মসাৎ।।

শ্রীমধু পণ্ডিতের সবিশেষ পরিচয় চৈতন্য চরিতামৃতে পাওয়া যায় না। শ্রীভক্তিরত্নাকরে কেবল শ্রীগোপীনাথ তাঁর কাছে আবির্ভূত হয়েছেন এ কথা পাওয়া যায় মাত্র।

শ্রীমধু পণ্ডিত অতিশয় সরল, ভক্তিরসে বিহ্বল, অকিঞ্চনভাবে দিন যাপন ও বংশীবটে অবস্থান করতেন। অষ্টপ্রহর কাল স্মরণ কীর্ত্তনে দিন যাপন এবং মাধুকরী করে জীবন ধারণ করতেন। তাঁর প্রিয় সঙ্গী ছিলেন শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্য। উভয়ে কৃষ্ণ কথা রসে কালাতিপাত করতেন।

একদিন মধু পণ্ডিত বংশীবট তলে অকস্মাৎ অলৌকিক কিছু লীলা দেখতে লাগলেন। শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সখাগণ সঙ্গে বড়ই মধুর লীলা করছেন। বলরাম সখাগণের অগ্রণী। কৃষ্ণ বিবিধ ক্রীড়া করতে করতে কখন সুবলের স্কন্ধে আরোহণ করছেন, পুনঃ সুবল কৃষ্ণ-স্কন্ধে আরোহণ করছেন। অন্যান্য সখাগণও তাদৃশ ক্রীড়া সকল করছেন।

কৃষ্ণ কতক্ষণ পরে কন্দুক খেলতে লাগলেন। সব সখাগণও তখন কন্দুক ক্রীড়ায় মত্ত হলেন। কৃষ্ণ সকলকে পরাভূত করবার জন্য খুব চেষ্টা করছেন। কিছুক্ষণ কন্দুক খেলবার পর মল্লক্রীড়া আরম্ভ করলেন। কৃষ্ণের শরীর হতে দর দর ধারে ঘর্ম পড়ছে। ক্রীড়ারসে এমন মত্ত, পরস্পরের পদাঘাতে ধূলি সমূহে চতুর্দ্দিক অন্ধকার করছে। রামকৃষ্ণের চরণাঘাতে যেন ধরিত্রী কম্পমান হচ্ছে।

এরূপ কিছুক্ষণ মল্লযুদ্ধের পরে বিশ্রামের জন্য সকলে বংশীবটের তলে বসলেন এবং অশোকতরুর নবদল এনে তদ্দ্বারা শয্যা নির্ম্মাণ করে তাতে শ্রীকৃষ্ণকে শুইয়ে দিলেন, তখন কোন সখা শিশু শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে নব পত্রদলে ব্যজন, কোন সখা পাদ সম্বাহন, কোন সখা হস্ত পদাদি মর্দ্দন ও কোন সখা শ্রীকৃষ্ণের মস্তক ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক সেবা করতে লাগলেন। এদিকে অন্যান্য সখাগণ আনন্দ ভরে নৃত্য, গীত ও বংশী শৃঙ্গাদি বাজাতে লাগলেন, কি অপূর্ব্ব আনন্দ উৎসব তা অবর্ণনীয়।

মধু পণ্ডিত এসব দিব্য লীলা অকস্মাৎ দর্শন করে আনন্দে পুলকিত রোমাঞ্চিত শরীরে ধরাতলে মূর্চ্ছা পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁর আনন্দ মূর্চ্ছা ভাঙল, তখন আর কিছু দেখতে পেলেন না, দেখলেন তথায় শ্রীগোপীনাথের এক অপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি।

তিনি শ্রীমূর্ত্তির পাদপদ্মমূলে সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করে বহু স্তব স্তুতি করলেন। এ সংবাদ তৎক্ষণাৎ বৈষ্ণবগণের নিকট প্রেরণ করলেন। আনন্দে প্রেমাশ্রু নেত্রে বৈষ্ণবগণ তথায় এলেন এবং শ্রীমূর্ত্তির অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করে দণ্ডবৎ স্তুতি প্রভৃতি করলেন, শীঘ্রই অভিষেক মহাপূজার আয়োজন হল। অন্যদিকে নৈবেদ্য রন্ধন আরম্ভ হল। গোপগণ ভাঁরে ভাঁরে দই, দুধ আনতে লাগলেন। অতঃপর অভিষেকানন্তর বিচিত্র বস্ত্রালঙ্কার পরিধান করালেন। ভোগ আরম্ভ হল, বৈষ্ণবগণ ভোগারতি কীর্ত্তন করতে লাগলেন। অনন্তর মধ্যাহ্ন মহানিরাজনের পর গোপীনাথের

শয়ন দিলেন। সমাগত সহস্র সহস্র ভক্তগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করলেন। এরূপে গোপীনাথের প্রকট উৎসব সমাপ্ত হল।

গোপীনাথের সেবাধিকারী হলেন—শ্রীমধু পণ্ডিত ও শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্য।

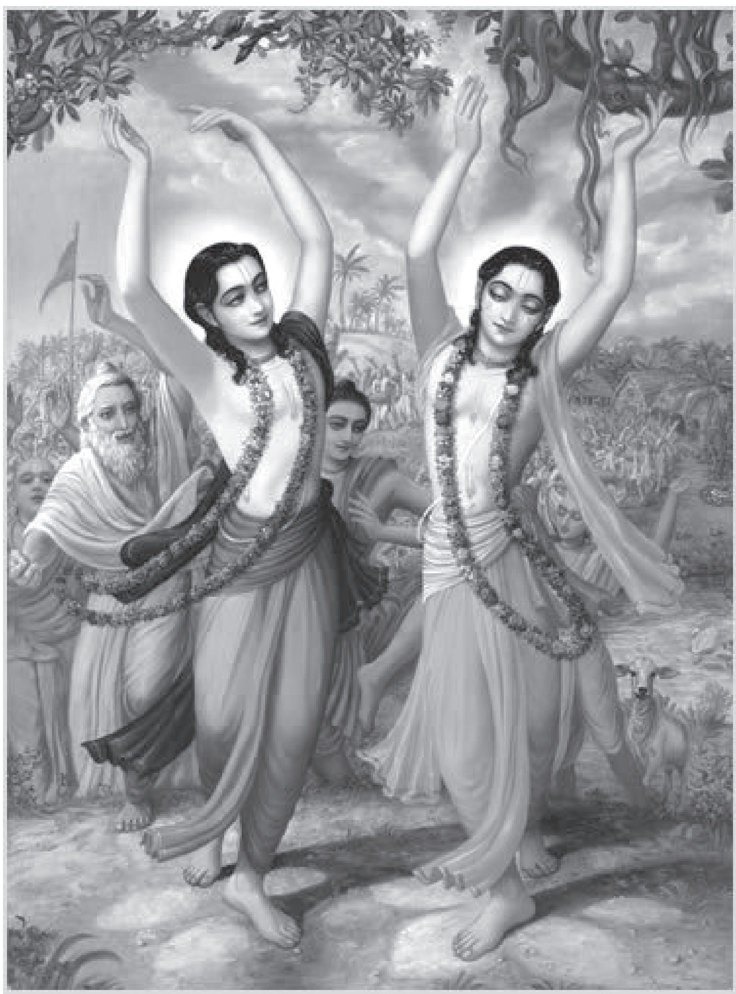
শ্রীভক্তিরত্নাকরে আছে—

পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়।
শ্রীমধু পণ্ডিত অতি গুণের আলয়।।
দোঁহা প্রেমাধীন কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র কুমার।
পরম দুর্গম চেষ্টা কহি সাধ্য কার।।
বংশীবট নিকটে পরম রম্য হয়।
তথা গোপীনাথ মহারঙ্গে বিলাসয়।।

—ভঃ রঃ ২/৪৭২

শ্রীমধু পণ্ডিত শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্য, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের ও শ্রীগোস্বামিগণের প্রিয়পাত্র ছিলেন।

**।। জয় শ্রীমধু পণ্ডিত কি জয়।।**






# যদুনাথ দাস কবিচন্দ্র

রত্নগর্ভ আচার্য্য বিখ্যাত তাঁর নাম।
প্রভুর পিতার সঙ্গী জন্ম এক স্থান।।
তিন পুত্র তাঁর কৃষ্ণপদ মকরন্দ।
কৃষ্ণানন্দ, জীব ও যদুনাথ কবিচন্দ্র।।
ভাগবতে পরম পণ্ডিত দ্বিজবর।
সুস্বরে পড়য়ে শ্লোক বিহ্বল অন্তর।।
ভক্তিযোগে শ্লোক পড়ে পরম আবেশে।
প্রভুর কর্ণেতে আসি হইল প্রবেশে।।

—চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ১/২৯৬-৩০০

শ্রীযদুনাথের পিতা শ্রীরত্নগর্ভ আচার্য্য। তিনি ছিলেন শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের সমসাময়িক ও সহচর। শ্রীহট্ট জেলার একই গ্রামে উভয়ের জন্ম হয়েছিল।

শ্রীকৃষ্ণানন্দ, শ্রীজীব ও শ্রীযদুনাথ তিন ভাই। শ্রীযদুনাথ শ্রীনিত্যানন্দের পার্ষদ ছিলেন।

যদুনাথ কবিচন্দ্র প্রেমরসময়।
নিরবধি নিত্যানন্দ-যাঁহার সহায়।।

চৈতন্য ভাগবত

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁর প্রতি সম্মান করে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বলেছেন—

মহাভাগবত যদুনাথ কবিচন্দ্র।
যাঁহার হৃদয়ে নৃত্য করে নিত্যানন্দ।।

শ্রীজীবও নিত্যানন্দ শাখাভুক্ত ছিলেন। শ্রীযদুনাথের কবিচন্দ্র উপাধি দ্বারা তিনি যে বহু গীতাদি রচনা করেন তাই প্রতীত হয়। কালস্রোতে সব লুপ্ত প্রায়। কিছু কিছু গীত, গীতি-সাহিত্য মাত্র প্রচলিত আছে। তাঁর ভাষা বড় সুমধুর, সরল, হৃদয়াকর্ষী ছিল।

তাঁর রচিত গৌর বিষয়ক পদাবলী—

গৌর বরণ তনু, সুন্দর সুধাময়,
সদয় হৃদয় রসালয়ে।
কুন্দ করবীর, গাঁথন থর থর,
দোলনি বনি বন মালয়ে।।
গৌর বামে বর, প্রিয় গদাধর,
নিগূঢ় রস পরকাশয়ে।
জগমণ্ডল ঐছে, ভাসল প্রেমে,
গদ গদ ভাসয়ে।।
নদীয়া নগরে, চাঁদ কত কত,
দূরে গেও আঁধয়ারে।
কতিহুঁ উয়ল, দীপ নিরমল,
ইবেহুঁ নামই না পাররে।।
গৌর-গদাধর প্রেম-সরোবর,
উথলি মহীতল পুররে।
দাস যদুনাথ, বিধি বিড়ম্বিত,
পরশ না পাইয়া ঝুররে।।

—

গদাধর নরহরি, করে ধরি গৌরহরি,
প্রেমাবেশে ধরণী লোটায়।
কহিলে না হয় তাহু, ফুকরি ফুকরি পহুঁ,
বৃন্দা বিপিন গুণ গায়।।
নিজ লীলা নিধুবন, সোঙরিয়া উচাটন,
কান্দে পহু যমুনা বলিয়া।
নয়ানে বহিছে কত, সুরধুনী ধারা মত,
দর দর শ্রীবুক বহিয়া।।
সুবলের শুদ্ধ সখ্য, বৃন্দাদেবীর প্রিয় বাক্য,
ললিতার ললিত সুলেহ।
বিশাখার প্রেম কথা, সোঙরি মরম ব্যথা,

কহি কহি না ধরয়ে দেহ।।
কাঁহা মোর প্রাণেশ্বরী, কাঁহা গোবর্দ্ধন গিরি,
কাঁহা মোর বংশী পীতবাস।
প্রেমসিন্ধু উথলিল, জগত ভরিয়া গেল,
না বুঝিল যদুনাথ দাস।।

—

অপরূপ চাঁদ উদয়, নদীয়া পুরে,
তিমির নাহিরে ত্রিভুবনে।
অবনিতে অখিল, জীবের শোক নাশল,
নিগম নিগূঢ় প্রেমদানে।।
আরে মোর গৌরাঙ্গ সুন্দর রায়।
ভকত হৃদয়, কুমুদ পরকাশল,
অকিঞ্চন জীবের উপায়।।
শেষ শঙ্কর, নারদ চতুরানন,
নিরবধি যাঁর গুণ গায়।
সো পহু নিরুপম, নিজ গুণ শুনইতে,
আনন্দে ধরণী লোটায়।।
অরুণ নয়নে, বরুণ আলয়,
বহয়ে প্রেমসুধা জল।
যদুনাথ দাস বলে, যেন সোণার কমলে,
প্রসবিছে মুকুতার ফল।।

—

শ্রীরাধার রূপ বর্ণন–

কষিত কনয়া কমল কিরে।
থীর বিজুরি নিছনি দিয়ে।।
কিরে সে সোন চম্পক ফুল।
রাই বরণে জলদ তুল।।
তাহি কিরণ ঝলকে ছটা।
বদনে শরদ বিধূর ঘটা।।
চাঁদর চিকুর সিথাঁয় মণি।
দশন কুন্দ কলিকা জিনি।।
অরুণ অধর বচন মধু।
অমিয়া উগারে বিমল বিধূ।।
চিবুকে শোভয়ে কস্তুরি বিন্দু।
কনক কমলে বেড়ল ভৃঙ্গু।।
গলায়ে মুকুতা দোসূতি ঝুরি।
সুরধুনী বেড়ি কনক গিরি।।
শঙ্খ ঝলমলি দুবাহ দোলা।
কিরে সরু সরু শশীর কলা।।
কর কোকনদ নখর মণি।
অহগুলে মুদরি মুকুর জিনি।।
খিন মাধখানি ভাঙ্গিয়া পড়ে।
বান্ধল কিঙ্কিণি নিতম্বভরে।।
রাম রম্ভা ডরু চরণ শোভা।
কি হয়ে অরুণ কিরণ আভা।।
নখর মুকুর অঙ্গুলা বলি।
জনু সারি সারি চম্পক কলি।।
নীল ওঢ়নি ঢাকিল তনু।
সববিধু রাহু ঝাপিল জনু।।
অলপে অলপে তেয়াগে তায়।
যদুনাথ চিতে ঐছল ভায়।।

—

বিরহ

শিশিরক শীত সবহুঁ দূরে গেল।
বিরহ অনলে জনু নিদাঘ সম ভেল।।
দহই কলেবরশীতল পবনে।
কো পতিয়ায়ব ইহ সব বচনে।।
জর জর অন্তর বিরহক ধূমে।
জাগরে জাগি দূরে রহু ঘুমে।।
বচন কহই যব জনু পরলাপ।
কহই না পারিয়ে যতহু সন্তাপ।।
কোই কহই তোহে রসময় কান।
তুহুঁ সম কঠিন জগতে নাহি আন।।
তোহারি বচনে আর নাহি পরতীত।

কুলবতী করু জনি তোহে পিরীত।।
যতহুঁ বিরহ দুঃখ কি কহব হাম।
দাস যদুনাথ তোহে পরণাম।।

—

আমার গৌরাঙ্গ জানে প্রেমের মরম।
ভাবিতে ভাবিতে ভেল রাধার বরণ।।
রা বোল বলিতে পুণিত কলেবর।
ধা বোল বলিতে বহে নয়নের জল।।
ধারা ধরণী সঘনে বহি যায়।
পুলকে পূরিত তনু জপে নাম তায়।।
মন নিমগন গৌরী ভাবের প্রকাশ।
একমুখে কি কহিব যদুনাথ দাস।।

**।। জয় শ্রীযদুনাথ দাস কবিচন্দ্র কি জয়।।**

# শ্রীযদুনন্দন দাস (পদকর্ত্তা)

যদুনন্দন নামে পাঁচজন গৌরভক্ত ছিলেন।

১ নম্বর—কন্টকনগর নিবাসী যদুনন্দন আচার্য্য। ইনি অদ্বৈত শাখা অন্তর্ভুক্ত।

২ নম্বর—ঝামটপুর নিবাসী যদুনন্দন আচার্য্য।

৩ নম্বর—যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী। ইনি নিত্যানন্দ পার্ষদ।

৪ নম্বর—যদুনন্দন আচার্য্য, ইনি বাসুদেব দত্তের শিষ্য ও রঘুনাথ দাসের গুরু।

৫ নম্বর—যদুনন্দন দাস। এখানে এঁনার সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে। মুর্শিদাবাদ জেলার তের ক্রোশ দক্ষিণে কন্টক নগরের উত্তরাংশে ভাগীরথীর পশ্চিম তটে খালিহাটী গ্রামে ১৪৫৯ শকে শ্রীযদুনন্দন দাস পদকর্ত্তার জন্ম হয়। ইনি বৈদ্য বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের কন্যা শ্রীযুক্তা হেমলতা ঠাকুরাণীর প্রিয় শিষ্য ছিলেন। শ্রীযদুনন্দন দাস লিখিত কর্ণানন্দ গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে শ্রীগুরু-চরণ মহিমা কীর্ত্তন করে অধ্যায় শেষ করেছেন।

শ্রীআচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীহেমলতা।
প্রেম কল্পবল্লী কিবা নিরমিল ধাতা।।
সে দুই চরণ পদ্ম হৃদয়ে বিলাস।
কর্ণানন্দ রস কহে যদুনন্দন দাস।।

শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃতের পদ্যানুবাদের বন্দনায় বলেছেন—

বন্দ্য গুরু পদতল চিন্তামণিময় স্থল
সর্ব্বগুণ খনি দয়ানিধি।
আচার্য্য প্রভুর সুতা নাম শ্রীল হেমলতা
তাঁহার স্মরণে সর্ব্বসিদ্ধি।।
অজ্ঞান অন্ধকারে পতিত দেখিয়া মোরে
জ্ঞানাঞ্জন দিলা দয়া করি।
যাঁহার করুণা হৈতে নেত্র হৈল প্রকাশিতে
দূরে গেল অন্ধকারাবলী।।

শ্রীযুক্তা হেমলতা ঠাকুরাণী গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে অদ্ভুত প্রতিভাশালিনী মহিলা ছিলেন। তিনি পিতা শ্রীনিবাস আচার্য্যের ন্যায় সর্ব্বত্র গৌরবাণী প্রচার করতেন। তার প্রভাবে পাষণ্ড প্রকৃতির ব্যক্তিগণও ভক্তিমার্গের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তিনি নির্ভীক বক্তা, 'সত্যশীল' সদাচার সম্পন্ন ছিলেন। কোন ভক্তি সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ অসৎ সিদ্ধান্তকে প্রশ্রয় দিতেন না। তাতে তিনি বজ্রাদপি কঠোর ছিলেন।

কোন অপসিদ্ধান্ত ব্যাপার নিয়ে শ্রীরূপ কবিরাজ নামক একজন শিষ্যকে তিনি সভাস্থলে কণ্ঠি ছিড়ে চিরদিনের জন্য ত্যাগ করেছিলেন।

শ্রীযদুনন্দন দাস গুরুর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। তিনি অনেক সময় শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণীর চরণে অবস্থান করতেন। শ্রীযুক্তা হেমলতা ঠাকুরাণীর বাসবাটী ছিল ভাগীরথীর পশ্চিম তটে বুধাইপাড়া গ্রামে।

শ্রীযদুনন্দন দাসের দার পরিগ্রহ কিম্বা পুত্র-কন্যা সম্বন্ধে কোন বিবরণ পাওয়া যায় না।

শ্রীযদুনন্দন দাস বহু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। বহু গ্রন্থের পদ্যানুবাদ করেছেন এবং গীতিও রচনা করেছেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা ছিলেন। কুঞ্জরাস্তব নামক একখানি কাব্য গ্রন্থও তিনি রচনা করেন।

তাঁর পদ্যানুবাদ গ্রন্থ—গোবিন্দলীলামৃত, কৃষ্ণকর্ণামৃত পদ্যানুবাদ, কর্ণামৃত মৌলিক গ্রন্থ, গৌরলীলাপদ ও কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদ প্রভৃতি।

পদাবলী—

গৌরাঙ্গ সুন্দর নট পুরন্দর
প্রকট প্রেমের তনু।
কিয়ে নবঘন পুরট মদন
সুধায়ে গড়ল জনু।।
ভাল নাচে গৌরাঙ্গ আনন্দ সিন্ধু।
বদন মাধুরী হাস চাতুরী
নিছয়ে শরদ ইন্দু।। ধ্রু।।
কিবা সে নয়ন জিনিয়া খঞ্জন
ভাঙর ভঙ্গিম শোভা।
অরুণ-বরণ যুগল চরণ
এ যদুনন্দন লোভা।।
দেবী ভগবতী পৌর্ণমাসী খ্যাতি
প্রভাতে সিনান করি।
কানুর দরশে চলিলা হরষে
আইলা নন্দের বাড়ী।।
শিরে শুভ্রকেশ তপসির বেশ
অরুণ বসন পরি।
বেদময় কথা ঘন হালে মাথা
করেতে লগুড় ধরি।।
দেখি নন্দরাণী ধাইয়া অমনি
পড়িয়া চরণ তলে।
তাঁরে কোলে লৈয়া শির পরশিরা
আশিষ বচন বলে।।
সতী শিরোমণি অখিল জননী
পরাণ বাছনি মোর।
পতি পুত্র সহ ধেনু বৎস সব
কুশলে থাকুক তোর।।
রাণী তারে লৈয়া তুরিতে আসিয়া
দেখয়ে পুত্রের মুখ।
গায়ে হাত দিয়া উঠায় ধরিয়া
স্নেহে দরদর বুক।।
নয়নের নীরে স্তনখির ধারে
ভিজয়ে শয়ন বাস।
ধনিষ্ঠার পাশে দেখি মনে হাসে
এ যদুনন্দন দাস।।

—

দহুঁ প্রেম গুরু তেল শিষ্য তনু মন।
শিখায় দোঁহারে নৃত্য অতি মনোরম।।
চাপল্য উৎসুক হর্ষ ভাব অলঙ্কার।
দুহুঁ মন শিষ্য পরে ভূষণের ভার।।
সুজৃম্ভাদি উদ্ভাব সুদীপ্ত সাত্ত্বিক।
এই সব ভাব ভূষা রাধার অধিক।।
অযত্নজ শোভা আদি সপ্ত অলঙ্কার।
স্বভাবজ বিলাসাদি দশ পরকার।।
ভাবাদি অঙ্গজ তিন মোন্দ্য চকিত।

দ্বাবিংশতি অলঙ্কারে রাধাঙ্গ ভূষিত।।
নানা ভাবে বিভূষিত কহনে না যায়।
এ যদুনন্দন দাস বিস্তারিয়া গয়।।

—

ভাগ্যবতী যমুনা মাই।
যার ও কূলে ও কূলে ধাওয়াধাই।।
শ্বেত শাঙল দোনো ভাই।
যার জলে দেখে আপন ছাই।।
যমুনার জলে কিবা শোভা।
এ যদুনন্দন মনলোভা।।

—

সহচরি সঙ্গে রঙ্গে চলু কামিনী দামিনি যৈছে উজোর।
গোবর্দ্ধন তট নিকট বাটহি লেই যজ্ঞ-ঘৃত-ঘোর।।
দেখ সখি অপরূপ রঙ্গ।।
নিরুপম বিলাস রসায়ন পিবইতে দুহুঁ জন পুলকিত অঙ্গ।।
দুর সঞে দরশন অনিমিখ লোচন বহতহিঁ আনন্দনীর।
আনন্দ সায়রে ডুবল দুহু জন বহু খণে ভৈ গেল থীর।।
অতিশয় আদর বিদগ্ধ নাগর রাই নিয়ড়ে উপনীত।
ইহ যদু নন্দন নিরখই দুহুঁ জন অতিসুখে নিমগন চীত।।

**।। জয় শ্রীযদুনন্দন দাস কি জয়।।**

# শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর

'শ্রীচৈতন্য ভাগবত' রচয়িতার নাম শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর। শ্রীচৈতন্য ভাগবতের পূর্ব নাম ছিল 'শ্রীচৈতন্য মঙ্গল'। শ্রীল লোচন দাস ঠাকুরও তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম চৈতন্য মঙ্গল রাখেন। একই নামে দুটি গ্রন্থ থাকলে পাঠকগণের বুঝতে অসুবিধা হয়। তাই পরবর্তীতে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁর রচিত শ্রীচৈতন্য মঙ্গলের নাম পরিবর্তন করে 'শ্রীচৈতন্য ভাগবত নাম রাখেন।

শ্রীল কবি কর্ণপুর গোস্বামী বর্ণনা করেছেন—

বেদব্যাসো য এবাসীদ্দাসো বৃন্দাবনোঽধুনা।
সখা যঃ কুসুমাপীড়ঃ কার্য্যতস্তং সমাবিশৎ।।

যিনি 'বেদব্যাস' ছিলেন তিনি এখন 'বৃন্দাবনদাস ঠাকুর' হয়েছেন। ব্রজের কুসুমাপীড় নামক সখা কোন কারণে এঁনার মধ্যে প্রবেশ করেছেন।।

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ১৪২৯ শকাব্দে বৈশাখী কৃষ্ণ দ্বাদশীতে মামগাছিতে (মতান্তরে কুমারহট্টে) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বিপ্র এবং মাতার নাম শ্রীনারায়ণী দেবী। নারায়ণী শ্রীবাস পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীনলিন পণ্ডিতের কন্যা। কবি কর্ণপুর গোস্বামী লিখেছেন, যিনি শ্রীকৃষ্ণের উচ্ছিষ্ঠ ভোজী 'কিলিম্বিকা' তিনিই এখন শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণী হয়েছেন (গৌঃ গঃ ৪৩)।

শ্রীমহাপ্রভু যখন শ্রীবাস অঙ্গনে মহাভাব প্রকাশ করে ভক্তগণকে আত্ম-স্বরূপ দর্শন করিয়েছিলেন তখন নারায়ণী দেবী ছিলেন চার বছরের বালিকা।

"সর্বভূত অন্তর্য্যামী শ্রীগৌরাঙ্গ চাঁদ।
আজ্ঞা কৈল নারায়ণী কৃষ্ণ বলে কাঁদ।।
চারি বৎসরের সেই উন্মত্ত চরিত।
হা কৃষ্ণ বলিয়া মাত্র পড়িল ভূমিত।।
অঙ্গ বহি পড়ে ধারা পৃথিবীর তলে।
পরিপূর্ণ হৈল স্থল নয়নের জলে।।"

চৈঃ ভাঃ

শ্রীনারায়ণী দেবীর পুত্র শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর। তিনি শ্রীচৈতন্য ভাগবতে শ্রীনারায়ণী দেবী কিরূপ গৌরসুন্দরের স্নেহ পাত্রী ছিলেন তা লিখেছেন—

"ভোজনের অবশেষ যতেক আছিল।<br>
নারায়ণী পুণ্যবতী তাহা সে পাইল।।<br>
শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা বালিকা অজ্ঞান।<br>
তাহারে ভোজন শেষ প্রভু করে দান।।"

মহাপ্রভুর এই কৃপাপ্রসাদ প্রভাবে ব্যাসাবতার শ্রীবৃন্দাবন দাস জন্মগ্রহণ করেছেন। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ হলেন তাঁর প্রাণ।

শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর স্বীয় পিতৃ-পরিচয় কোন স্থানে দেন নাই, সর্ব্বত্রই জননীর পরিচয় দিয়েছেন।

শ্রীচৈতন্য ভাগবতের ভূমিকায় শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ লিখেছেন—"তিনি শ্রীমালিনী দেবীর পিত্রালয়ে পতিগৃহ লাভ করিয়া শ্রীল বৃন্দাবন দাসের পৌগণ্ড কাল পর্য্যন্ত পুত্ররত্নের লালন-পালনাদি করিয়াছিলেন।"

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জন্ম মামগাছিতে (মতান্তরে কুমারহট্টে) হলেও তিনি দেনুড় গ্রামে বসবাস করেছিলেন। এজন্য বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীপাট দেনুড়। তিনি বাল্যকালে মায়ের সঙ্গে মামগাছিতে ছিলেন। পিতার মৃত্যু হলে তাঁর জননী নারায়ণী দেবী শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে আসেন। তাঁর পূর্ব পুরুষেরা শ্রীহট্ট নিবাসী ছিলেন।

গৌরসুন্দরের সন্ন্যাস গ্রহণের চার বছর পরে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জন্ম হয়। যখন মহাপ্রভু অপ্রকট লীলা করেন, তখন শ্রীবৃন্দাবন দাসের বয়স বিশ বছরের অধিক নয়।

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মন্ত্র শিষ্য। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বিশেষ কৃপায় তিনি ১৪৫৭ শকাব্দে শ্রীচৈতন্য ভাগবত রচনা করেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর সম্বন্ধে লিখেছেন,—

বৃন্দাবন দাস—নারায়ণীর নন্দন।<br>
'চৈতন্য-মঙ্গল' যেঁহো করিল রচন।।<br>
ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিলা বেদব্যাস।<br>
চৈতন্য-লীলাতে ব্যাস—বৃন্দাবন দাস।।

চৈঃ চঃ আঃ ১১/৫৪-৫৫

কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।<br>
চৈতন্য-লীলার ব্যাস—বৃন্দাবন দাস।।<br>
বৃন্দাবন দাস কৈল 'চৈতন্যমঙ্গল'।<br>
যাঁহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল।।<br>
চৈতন্য-নিতাইর যাতে জানিয়ে মহিমা।<br>
যাতে জানি কৃষ্ণভক্তিসিদ্ধান্তের সীমা।।<br>
ভাগবতে যত ভক্তিসিদ্ধান্তের সার।<br>
লিখিয়াছেন ইঁহা জানি' করিয়া উদ্ধার।।<br>
'চৈতন্যমঙ্গল' শুনে যদি পাষণ্ডী, যবন।<br>
সেহ মহা-বৈষ্ণব হয় ততক্ষণ।।<br>
মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।<br>
বৃন্দাবনদাস-মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য।।<br>
বৃন্দাবনদাস-পদে কোটি নমস্কার।<br>
ঐছে গ্রন্থ করি' তেঁহো তারিলা সংসার।।<br>
নারায়ণী—চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট-ভাজন।<br>
তাঁর গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাস-বৃন্দাবন।।<br>
তাঁর কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত-বর্ণন।<br>
যাহার শ্রবণে শুদ্ধ কৈল ত্রিভুবন।।

চৈঃ চঃ আঃ ৮/৩৪-৪২

শ্রীচৈতন্য ভাগবত এবং শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত একটি আরেকটির পরিপূরক গ্রন্থ। যেখানে চৈতন্য ভাগবত শেষ হয়েছে, সেখান থেকেই চৈতন্য চরিতামৃত শুরু হয়েছে। কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন—

চৈতন্য-লীলার ব্যাস,—দাস-বৃন্দাবন।
মধুর করিয়া লীলা করিলা রচন।।
গ্রন্থ-বিস্তার-ভয়ে ছাড়িলা যে যে স্থানে।
সেই সেই স্থানে কিছু করিব ব্যাখ্যান।।

চৈঃ চঃ আঃ ১৩/৪৮-৪৯

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাপ্রভুর অধ্যয়ন-লীলা, পৌগণ্ড লীলা, কাজীদলন লীলা, হরিদাস ঠাকুরের মহিমা, জগাই-মাধাই উদ্ধার, পুরীতে জল ক্রিড়া লীলা প্রভৃতি বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ দীনহীন জীবদের প্রতি অপরিসীম কৃপার নিদর্শন স্বরূপ শাসন বাক্য প্রয়োগ করেছেন,—

এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মাঁরো তার শিরের উপরে।।

শ্রীচৈতন্য ভাগবতের আদি, মধ্য ও অন্ত্যখণ্ডে বারবার এই ধরণের বাক্য প্রয়োগ হয়েছে। তাতে জগতের অনেক দুর্ভাগা অভিমানীর দল ভুল বুঝে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের সমালোচনা করে অপরাধ করে ফেলে। এই বিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন—

**“শ্রীনিত্যানন্দের মহিমায় ঈর্ষাপর হইয়া যে সকল নারকী তাঁহার নিন্দা করে--তাহাদিগের ভগবন্মর্য্যাদা-লঙ্ঘনের পুনঃ চেষ্টা চিরতরে অপনোদন করিয়া নিত্য কল্যাণ-সাধন ও সুমতি আনয়নের নিমিত্ত মস্তকে পদাঘাত করিতেও প্রস্তুত আছি। দয়াময় ঠাকুর মহাশয়ের মহা পাষণ্ডীর প্রতিও অমন্দোদয়া ভক্তিধারা শুদ্ধা সরস্বতী দেবী জগতে অত্যুজ্জ্বল অক্ষরে তাদৃশ শ্রীনিত্যানন্দ-গুরু-সেবকের দৃঢ়নিষ্ঠা প্রদর্শন পূর্ব্বক এই তাৎপর্য্য শিক্ষা দিলেন যে, স্ব-হিত সাধনে নিতান্ত পরাঙ্মুখ ও নিরয়পথে ধাবিত হইবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর, শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্বানভিজ্ঞ মূঢ়লোকের নিকট বিরাগভাজন হইয়াও শ্রীঠাকুর মহাশয় এবং তদনুগত যথার্থ আচার ও প্রচারকারী শুদ্ধভক্তগণ দীনজীবের প্রতি নিঃস্বার্থ অহৈতুক কৃপাময়। শ্রীনিত্যানন্দগুরুদাস- সাক্ষাদ্ ব্যাসাবতার বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত পদাঘাতাভিনয়কালে একটি ধূলিকণাও যে সকল সৌভাগ্যবান্ নিন্দকের শিরে পতিত হইবে, তাহাদের সুমঙ্গল অর্থাৎ অনর্থনিবৃত্তি সর্ব্বতোভাবে অবশ্যম্ভাবী। শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবের এতাদৃশ মহা করুণা স্ব-হিতাহিতানভিজ্ঞ নির্ব্বোধ অভক্তের বুদ্ধির বা কল্পনার অতীত। সাক্ষাৎ শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনের অনুগত শুদ্ধ গৌরকৃষ্ণ-ভক্তির আচার ও প্রচারকারিগণের নিত্য মঙ্গলময় প্রযত্ন ও ব্যবহারে একদিকে যেমন বিমুখ পতিত জীবের প্রতি স্থূলভাবে দণ্ডের অভিনয়, অপর দিকে তেমনই সূক্ষ্মভাবে তৎপ্রতি অসীম কৃপা নিহিত।”**

বৈশাখী কৃষ্ণা দশমী তিথিতে শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর তিরোধান লীলা করেন। সন সম্বন্ধে মতভেদ আছে, কেউ কেউ বলেন ১৫১১ শকাব্দে।

**।। জয় শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর কি জয়।।**

# শ্রীল লোচন দাস ঠাকুর

শ্রীলোচন দাস ঠাকুর ১৫২৩ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত কোগ্রামে রাঢ়ীয় বৈদ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শ্রীকমলাকর দাস এবং মাতার নাম শ্রীমতী সদানন্দী। ঠাকুরের শ্রীপাটের নিকটে অজয়নদ প্রবাহিত। তিনি পিতামাতার একমাত্র সন্তান ছিলেন বলে আদরের দুলাল ছিলেন। তিনি মাতামহের গৃহে থেকে পড়াশুনা করতেন। সেই সময়ের সামাজিক প্রথা অনুযায়ী শ্রীলোচন দাস ঠাকুরের অল্প বয়সেই বিবাহ হয়ে যায়। তাঁর শ্বশুরালয় আমেদপুর কাকুট গ্রামে। তিনি গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করলেও বিষয়ে বিরক্ত ছিলেন। সর্বদা ভক্তদের সাথে কৃষ্ণকথা আলোচনা করে সময়ের সদ্ব্যবহার করতেন।

শ্রীখণ্ডের প্রসিদ্ধ শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর লোচনদাসের প্রতি স্নেহে আবিষ্ট হয়ে তাঁকে দীক্ষা প্রদান করে শিষ্য করেছিলেন। লোচনদাস নিরন্তর শ্রীগুরুদেবের সেবা করতেন। শ্রীগুরুদেব তাঁকে কীর্ত্তন শিক্ষা দিতেন। তিনি গুরুদেবের সম্বন্ধে লিখেছেন—

ঠাকুর শ্রীনরহরি, দাস প্রাণ অধিকারী,
যাঁর পদ প্রতি আশে আশ।
অধমেহ সাধ করে, গোরা গুণ গাহিবারে,
এ ভরসা এ লোচন দাস।।

—চৈঃ মঃ সূত্র খণ্ড

আমার ঠাকুর শ্রীনরহরি দাস।
প্রণতি বিনতি করোঁ পুর মোর আশ।।

—চৈঃ মঃ সূত্র খণ্ড

শ্রীলোচন দাস ঠাকুর সম্বন্ধে একটি অলৌকিক ঘটনার কথা শোনা যায়—

অত্যন্ত অল্প বয়সে বিবাহ হওয়ায় লোচনদাসের স্ত্রী পিতামাতার কাছেই থাকতেন। কন্যা ধীরে ধীরে বড় হল। কিন্তু লোচনদাস বিষয়ে বিরক্ত হয়ে নিরন্তর গুরুদেবের কাছে থেকে গুরুদেবের সেবা করতেন। শ্বশুর মশাই কন্যার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে উদ্বিগ্ন হলেন। একদিন গুরুদেব শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের কাছে এসে সবিনয়ে সব নিবেদন করলেন। গুরুদেব লোচন দাসকে আদেশ করলেন শ্বশুর বাড়ীতে যেতে। নিরুপায় হয়ে লোচনদাস শ্বশুর বাড়ীর দিকে রওনা হলেন। কিন্তু দীর্ঘদিন শ্বশুর বাড়ীতে না যাওয়ায় রাস্তা ঠিক করতে না পেরে পথে একজন যুবতী মহিলাকে দেখে 'মা' বলে সম্বোধন করে শ্বশুরবাড়ীর ঠিকানা জিজ্ঞাসা করেন। পরে শ্বশুর বাড়ীতে এসে বুঝতে পারলেন কিছুক্ষণ পূর্বে তিনি যাকে 'মা' বলে সম্বোধন করেছেন, তিনিই তাঁর স্ত্রী। সেই থেকে শ্রীলোচনদাস ঠাকুর তাঁর স্ত্রীকে 'স্ত্রী' রূপে না দেখে 'জননী' রূপে দর্শন করে বৈরাগ্যের সাথে জীবনের শেষদিন অবধি শ্রীগুরু গৌরাঙ্গের ভজন করে অতিবাহিত করেছেন।

একসময় শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর লোচন দাসকে শ্রীচৈতন্য মঙ্গল রচনা করতে আদেশ করেন। শ্রীলোচনদাস গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করে চৈতন্য মঙ্গল রচনা করেন। পূর্ববঙ্গে লক্ষ্মীর পাঁচালী, শনির পাঁচালী ও মনসা ভাসান প্রভৃতি কবিগণ গান করতেন। সেই পাঁচালী অনুকরণে শ্রীলোচনদাস ঠাকুর চৈতন্য মঙ্গল রচনা করেন। পাঁচালী হচ্ছে পাঁচ প্রকার গীতিছন্দে রচিত গ্রন্থ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরিত্র শ্রবণ করলে সর্বোত্তম মঙ্গল লাভ হয়, এজন্য গ্রন্থের নাম 'শ্রীচৈতন্য মঙ্গল'। শ্রীলোচনদাস

ঠাকুরের চৈতন্য মঙ্গলের প্রধান উপাদান গ্রন্থ হল, শ্রীমুরারী গুপ্তের বিরচিত– ''শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্'' কাব্য। তিনি স্বয়ং একথা লিখেছেন–

''সেই সে মুরারি গুপ্ত বৈসে নদীয়ায়।।
শ্লোক বন্ধে কৈল পুঁথি গৌরাঙ্গ চরিত।
দামোদর সংবাদ মুরারি মুখোদিত।।
শুনিয়া আমার মনে বাড়িল পিরীত।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহোঁ গৌরাঙ্গ চরিত।।''

চৈঃ মঃ সূত্রখণ্ড

চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ লেখার আগে শ্রীলোচনদাস শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরকে বন্দনা করেছেন।

বৃন্দাবন দাস বন্দিব একচিতে।
জগত মোহিত যাঁর ভাগবত গীতে।।

চৈঃ মঃ সূত্র খণ্ড

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের রচিত গ্রন্থের নাম পূর্বে 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' ছিল। পরবর্তীতে নাম পরিবর্তিত হয়ে 'শ্রীচৈতন্য ভাগবত' হয়।

কেউ কেউ মনে করেন, শ্রীলোচন দাস ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের রচিত গ্রন্থের নাম 'শ্রীচৈতন্য ভাগবত' করেছেন। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থের প্রারম্ভে সূত্রখণ্ডে নরহরি সরকার ঠাকুরের কৃপাপ্রার্থনা এভাবে করা হয়েছে–

''ঠাকুর শ্রীনরহরি, দাস প্রাণ অধিকারী,
যাঁর পদপ্রতি আসে আশ।
অধমেহ সাধ করে, গোরাগুণ গাহিবারে,
সে ভরসা এ লোচনদাস।।''
''তাঁহা বিনু নাহি মোর তিন লোকে বন্ধু।
নরহরিদাস বন্দো গৌর-গুণ-সিন্ধু।।''
''আমার ঠাকুর প্রভু নরহরিদাস।
প্রণতি-বিনতি করোঁ পুর' মোর আশ।।''

শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য ভাগবতে অনেক লীলা স্পষ্ট করে বর্ণন করেন নাই, শ্রীলোচন দাস চৈতন্য মঙ্গলে করেছেন। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে তাঁর যে কথোপকথন হয়েছিল, শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর তা বর্ণনা করেন নাই। শ্রীলোচন দাস কিন্তু বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন।

''প্রভুর ব্যগ্রতা দেখি, বিষ্ণুপ্রিয়া চন্দ্রমুখী,
কহে কিছু গদ্‌গদ্ স্বরে।।
কহ কহ প্রাণনাথ, মোর শিরে দিয়া হাত,
সন্ন্যাস-করিবে নাকি তুমি।
লোক মুখে শুনি ইহা, বিদরিতে চাহে হিয়া,
আগুনিতে প্রবেশিব আমি।।
তো লাগি জীবনধন, রূপ নব যৌবন,
বেশ বিলাস ভাব-কলা।
তুমি যবে ছাড়ি যাবে, কি কাজ এ ছার জীবে,
হিয়া পোড়ে যেন বিষ জ্বালা।।''

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর এরূপ করুণ বিলাপ-বাণী শুনে মহাপ্রভু বলতে লাগলেন।

এ বোল শুনিয়া পহুঁ, মুচকি হাসিয়া লহু,
কহে শুন মোর প্রাণপ্রিয়া।
কিছু না করিহ চিতে, যে কহিরে তোর হিতে,
সাবধানে শুন মন দিয়া।।
জগতে যতেক দেখ, মিছা করি সব লেখ,
সত্য এক সবে ভগবান্।
সত্য আর বৈষ্ণব, তা বিনে যতেক সব,
মিছা করি করহ গেয়ান।।
মিছা সুত পতি নারী, পিতা-মাতা আদি করি,
পরিণামে কেবা বা কাহার।
শ্রীকৃষ্ণ চরণ বহি, আর ত কুটুম্ব নাহি,
যত দেখ সব মায়া তাঁর।।
কি নারী পুরুষ দেখ, আত্মা সে সবার এক,
মিছা মায়াবন্ধে ভাবে দুই।
শ্রীকৃষ্ণ সবার পতি, আর সব প্রকৃতি,

এ কথা না বুঝয়ে কোই।।
রক্ত রেত সম্মিলনে, জন্ম বিষ্ঠা মূত্র স্থানে,
ভূমে পড়ি হয় অগেয়ান।
বাল যুবা বৃদ্ধ হৈয়া, নানা দুঃখ কষ্ট পাইয়া,
দেহে-গেহে করে অভিমান।।
বন্ধু করি যারে পালি, তারা সবে দেই গালি,
অভিমানে বৃদ্ধ কাল বঞ্চে।
শ্রবণ নয়ান অন্ধে, বিষাদ ভাবিয়া কান্দে,
তবু নাহি ভজয়ে গোবিন্দে।।
কৃষ্ণ ভজিবার তরে, দেহ ধরি এ সংসারে,
মায়া বন্ধে পাসরি আপনা।
অহঙ্কারে মত্ত হৈয়া, নিজ প্রভু পাসরিয়া,
শেষে পায় নরক-যন্ত্রণা।।
তোর নাম বিষ্ণুপ্রিয়া, সার্থক করহ ইহা,
মিছা শোক না করহ চিতে।
এ তোর কহিলুঁ কথা, দূর কর আন চিন্তা
মন দেহ কৃষ্ণের চরিতে।।

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রতি এ সমস্ত উপদেশ দিয়ে, নিজ স্বরূপ চতুর্ভুজ মূর্তি দেখালেন।

আপনে ঈশ্বর হৈয়া, দূর করে নিজ মায়া,
বিষ্ণুপ্রিয়া পরসন্ন চিত।
দূরে গেল দুঃখ-শোক, আনন্দে ভরল বুক,
চতুর্ভুজ দেখে আচম্বিত।।

শ্রীগৌরসুন্দর যদিও উপদেশ বলে ও স্বরূপ মূর্ত্তি দর্শন দিয়ে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর মোহ দূর করলেন, কিন্তু পতি-বুদ্ধি বিষ্ণুপ্রিয়ার অটুট রইল।

তবে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, চতুর্ভুজ দেখিয়া,
পতি বুদ্ধি নাহি ছাড়ে তবু।
পড়িয়া চরণ তলে, কাকুতি মিনতি করে,
এক নিবেদন শুন প্রভু।।
মো অতি অধম ছার, অনমিল এ সংসার,
তুমি মোর প্রিয় প্রাণ-পতি।
এ হেন সম্পদ মোর, দাসী হৈয়াছিলুঁ তোর,
কি লাগিয়া ভেল অধোগতি।।
ইহা বলি বিষ্ণুপ্রিয়া, কান্দে উতরোলী হৈয়া,
অধিক বাড়িল পরমাদ।
প্রিয়জনে আর্ত্তি দেখি, ছল ছল করে আঁখি,
কোলে করি করিলা প্রসাদ।।
শুন দেবি বিষ্ণুপ্রিয়া, তোমারে কহিল ইহা,
যখনে যে তুমি মনে কর।
আমি যথা তথা যাই, আছিয়ে তোমার ঠাঁই,
এই সত্য কহিলাম দৃঢ়।।
প্রভু আজ্ঞা বাণী শুনি, বিষ্ণুপ্রিয়া মনে গুণি,
স্বতন্ত্র ঈশ্বর এই প্রভু।
নিজ সুখে কর কাজ, কে দিবে তাহাতে বাধ,
প্রত্যুত্তর না দিলেন তবু।।
বিষ্ণুপ্রিয়া হেট মুখী, ছল ছল করে আঁখি,
দেখি প্রভু সরল সম্ভাষে।
প্রভুর আচরণ কথা শুনিতে লাগয়ে ব্যথা
গুণ গায় এ লোচন দাসে।।

—চৈঃ চঃ মধ্যঃ ৫৬৯ গীত

শ্রীলোচন দাস ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দের গুণ মহিমা অতি সরল সুন্দর ভাষায় গান করেছেন—

পরম করুণ, পহুঁ দুই জন,
নিতাই গৌরচন্দ্র।
সব অবতার, সার শিরোমণি,
কেবল আনন্দ কন্দ।।
ভজ ভজ ভাই, চৈতন্য নিতাই,
সুদৃঢ় বিশ্বাস করি।
বিষয় ছাড়িয়া, সে রসে মজিয়া,
মুখে বল 'হরি হরি'।।
দেখ ওরে ভাই, ত্রিভুবনে নাই,
এমন দয়াল দাতা।

পশু-পাখী ঝুরে, পাষাণ বিদরে,
শুনি যাঁর গুণ-গাঁথা।।
সংসারে মজিয়া, রহিলি পড়িয়া,
সে পদে নহিল আশ।
আপন করম, ভুঞ্জয়ে শমন,
কহয়ে লোচন দাস।।

—

নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি।
আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাইল অবনী।।
প্রেমের বন্যা লৈঞা নিতাই আইলা গৌড়দেশে।
ডুবিল ভকতগণ দীন-হীন ভাসে।।
দীন হীন পতিত পামর নাহি বাছে।
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম সবাকারে যাচে।।
আবদ্ধ করুণাসিন্ধু (নিতাই) কাটিয়া মোহান।
ঘরে ঘরে বুলে প্রেম অমিয়ার বান।।
লোচন বলে মোর নিতাই যেবা না ভজিল।
জানিয়া শুনিয়া সেই আত্মঘাতী হল।।

শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলা-বিষয়ক বর্ণনাও শ্রীলোচন দাস ঠাকুর অতি সুন্দরভাবে করেছেন—

আরে নিকুঞ্জ বনে, শ্যামের সনে, কিরূপ দেখিলুঁ রাই।
কেমন বিধাতা, গড়ল মুরতি, লখই নাহিক যাই।।
সজল জলদ, কানুর বরণ, চম্প বরণী রাই।
মণি মরকত, কাঞ্চনে জড়িত, ঐছন রহল ঠাই।।
কিয়ে অপরূপ, রাস মণ্ডল, রমণী মণ্ডল ঘটা।
মনমথ মন, পাইল অচেতন, দেখিয়াও অঙ্গ ছটা।।
বদনে মধুর, হাস অধরে, হৃদয়ে হৃদয়ে সঙ্গ।
কোন রসবতী, রসের আবেশে, কুসুম শয়নে অঙ্গ।।
নবীন মেঘের, নিবিড় আভা, তাহে বিজুরি উজোই।
দাস-লোচনের, রাই সরবস ও-রস আবেশে সোই।।

বিশ্বকোষ মতে শ্রীলোচন দাস ঠাকুরের জন্ম শকাব্দ ১৪৪৫, তিরোভাব—শকাব্দ ১৫৩০।

তাঁর শ্রীচৈতন্য মঙ্গল ছাড়াও 'দুর্লভসার' নামক একখানি গ্রন্থ আছে।

শ্রীলোচন দাস ঠাকুর চৈতন্য মঙ্গল ছাড়া অন্যান্য যে সকল গ্রন্থ লিখেছেন—প্রার্থনা, দুর্ল্লভসার পদাবলী(ধামালী), জগন্নাথবল্লভ নাটক, রাস পঞ্চাধ্যায়ের পদ্যানুবাদ। গুস্করা ষ্টেশনের নিকট কাঁদড়া গ্রামে শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তীর গৃহে শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের স্বহস্ত লিখিত 'চৈতন্য মঙ্গল' গ্রন্থ আছে। এরকম কথা শোনা যায়।

শ্রীনরহরি চক্রবর্তীর রচিত ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে লোচন দাস ঠাকুরের নাম উল্লেখিত হয়েছে—

''শ্রীযদুনন্দন, শ্রীলোচন দুইজন।
লইলেন পুষ্পমাল্য সুগন্ধি চন্দন।।"

একশ্রেণীর অপসম্প্রদায় লোচনদাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে 'গৌরনাগরী' বাদের কথা আছে, এরূপ বলে থাকেন কিন্তু তাদের সেই ধারণা সঠিক নয়। শ্রীচৈতন্য ভাগবত রচয়িতা বৃন্দাবন দাস ঠাকুর গৌরনাগরবাদকে পরিত্যাগ করেছেন। 'গোরাঙ্গনাগর হেন স্তব নাহি বলে'। —চৈঃ ভাঃ।

শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন— ''শ্রীগৌরসুন্দর—রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণসেবার নিমিত্ত আশ্রয়-জাতীয় শ্রীমতী রাধিকাদি গোপীগণের যে হৃদয়ভাব, তাহা পরিত্যাগ করিয়া কখনই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় বিষয়জাতীয় চেষ্টাযুক্ত হইয়া, অর্থাৎ ভোক্তার অভিমানে পরস্ত্রী দর্শনাদিদ্বারা 'লম্পটনাগরে'র বৃত্তির পরিচয় দেন নাই।"

১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরের তিরোধান হয়। ঠাকুরের শ্রীপাটে ইষ্টকনির্ম্মিত সমাধি আছে।

**।। জয় শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর কি জয়।।**

# শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের ভূমিকায় লিখেছেন—"শ্রীচরিতামৃত রচয়িতা পিতৃমাতৃদত্ত কি নামে পরিচিত ছিলেন, তাহা আমরা জানি না। তাঁহার পিতা বা জননীর যে সকল নবোদ্ভাবিত নাম বা অনুষ্ঠানের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহা প্রকৃত কি না, তদ্বিষয়ে দৃঢ়তা নাই।"

এক সময় তাঁর গৃহে অহোরাত্র শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন হচ্ছিল। তাতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ভৃত্য শ্রীমীনকেতন রামদাস আগমন করেছিলেন। মহান্তগণ শ্রীমীনকেতন রামদাসকে দেখে আনন্দে তাঁকে স্বাগত সৎকার ও দণ্ডবৎ করেন এবং কীর্ত্তন-মণ্ডপে নিয়ে বসান। তিনি তথায় আনন্দে উপবেশন করলেন। ভাগবতগণ সকলে—সম্ভাষণ করতে লাগলেন। সে সময় তিনি প্রেমাবেশে কাউকেও গাঢ় আলিঙ্গন, কারও পৃষ্ঠে চাপড় মেরে ক্রোড়ে ধারণ, কারও শিরে হস্ত দিয়ে আশীর্ব্বাদ প্রভৃতি করতে লাগলেন। তাঁর শুভাগমনে সকলের শ্রীনিত্যানন্দ স্মৃতি উদয় হল। খুব নৃত্য-গীত হতে লাগল। তিনিও প্রেমে মত্ত করীন্দ্রবৎ ভ্রমণ করতে লাগলেন। এভাবে কিছুক্ষণ অতীত হল। তিনি ভক্তগণসহ বিশ্রাম করলেন।

গুণার্ণব মিশ্র নামে একজন ব্রাহ্মণ শ্রীমূর্ত্তি সেবা করছিলেন। তিনি শ্রীমীনকেতন রামদাসকে কোন প্রকার সম্ভাষণ করলেন না। তা দেখে শ্রীমীনকেতন রামদাস বললেন—

'এই ত' দ্বিতীয় সুত রোমহর্ষণ।'<br>
বলদেব দেখি, যে না কৈল প্রত্যুদ্‌গম।।

—চৈঃ চঃ আদি ৫/১৭০

শ্রীমীনকেতন রামদাস একথা বলে পুনঃ নৃত্য-গীত করতে লাগলেন। ভাগবতগণ অজ্ঞের অপরাধ গ্রহণ করেন না। এভাবে উৎসব সমাপ্ত হল। শ্রীমীনকেতন রামদাস সকলকে কৃপা-আশীর্ব্বাদ দিয়ে বিদায় হলেন।

একদিন শ্রীকবিরাজ মহাশয়ের ছোট ভাই শ্যামদাসের সঙ্গে শ্রীমীনকেতন শ্রীরামদাসের বাক-বিতণ্ডা হচ্ছিল। শ্যামদাস শ্রীগৌরসুন্দরকে পূর্ণ ভক্তি করেন কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি তাঁর তত ভক্তি নাই।

দুই ভাই এক তনু—সমান-প্রকাশ।<br>
নিত্যানন্দ না মান', তোমার হবে সর্ব্বনাশ।।<br>
একেতে বিশ্বাস, অন্যে না কর সম্মান।<br>
'অর্দ্ধকুক্কুটি-ন্যায়' তোমারে প্রমাণ।।<br>
কিংবা, দোঁহা না মানিঞা হও ত' পাষণ্ড।<br>
একেমানি' আরে না মানি,—এইমত ভণ্ড।।

চৈঃ চঃ আদি ৫/১৭৫-১৭৭

শ্রীরামদাস বললেন দু'জন অভিন্ন দুজন ঈশ্বর। তুমি একজনকে মান, অন্যকে মান না—এতে তোমার সর্ব্বনাশ হবে। এই বলে ক্রোধভরে বংশী ভেঙ্গে চলে গেলেন। শ্রীশ্যামদাসের মহা অপরাধ হল।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ছোট ভাইয়ের প্রতি রুষ্ট হলেন এবং তাকে ভর্ৎসনা করলেন। তিনি যেহেতু মীনকেতন রামদাসের পক্ষ থেকে ভর্ৎসনা করলেন, তাই সন্তুষ্ট হয়ে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কবিরাজ গোস্বামীকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বললেন,—

আরে আরে কৃষ্ণদাস, না করহ ভয়।<br>
বৃন্দাবনে যাহ, তাঁহা সর্ব্ব লভ্য হয়।।

—চৈঃ চঃ আদি ৫/১৯৫

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণমূলে দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন। তখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু স্বীয় অভয় শ্রীচরণযুগল তাঁর মস্তকে ধারণ করে বললেন—তুই শীঘ্র বৃন্দাবনে যা। সেখানে তোর সমস্ত আশা পূর্ণ হবে। স্বপ্নে তিনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপাশীর্ব্বাদ লাভ করে আনন্দে শ্রীবৃন্দাবন অভিমুখে চলতে লাগলেন।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী দৈন্যপূর্ণ বাক্যের দ্বারা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপার কথা জগতে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন—

জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ।।
মোর নাম শুনে যেই, তার পুণ্য ক্ষয়।
মোর নাম লয় যেই, তার পাপ হয়।।
এমন নির্ঘৃণ্য মোরে কেবা কৃপা করে।
এক-নিত্যানন্দ বিনু জগৎ ভিতরে।।
প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা-অবতার।
উত্তম, অধম, কিছু না করে বিচার।।
যে আগে পড়য়ে, তারে করয়ে নিস্তার।
অতএব নিস্তারিল মো-হেন দুরাচার।।

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর প্রথমে সূত্ররূপে পরে বিশদভাবে চৈতন্যলীলা বর্ণন করেছেন। গ্রন্থ বেশী বড় হয়ে যাওয়ার ভয়ে তিনি কিছু সূত্রে বর্ণিত লীলা বিস্তারিত বর্ণনা করেন নি। বিশেষ করে নিত্যানন্দ লীলা বর্ণনে আবেশ হওয়ায় চৈতন্যের শেষলীলা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই বৃন্দাবনবাসী গৌরভক্তগণ মহাপ্রভুর শেষ লীলা বর্ণন করার জন্য শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেন। তাই চৈতন্যলীলা বর্ণন করার জন্য কবিরাজ গোস্বামী শ্রীমদন গোপালের নিকট আদেশ নিতে যান। তিনি যেই মাত্র প্রভুর কাছে আজ্ঞা চেয়েছেন, অমনি মদন গোপালের গলার মালাটি খুলে পড়ে। বৈষ্ণবগণ হরিধ্বনি করতে লাগলেন। পূজারী সেই মালা কবিরাজ গোস্বামীর গলায় পড়িয়ে দিলেন। আজ্ঞামালা পেয়ে কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত লিখতে আরম্ভ করলেন। তিনি দৈন্য করে লিখেছেন—

"এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনমোহন।
আমার লিখন যেন শুকের পঠন।।
সেই লিখি, মদনগোপাল মোরে যে লেখায়।
কাষ্ঠের পুত্তলী যেন কুহকে নাচায়।।"

—চৈঃ চঃ আ ৮/৭৮-৭৯

**শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর কড়চা, যাহা রঘুনাথ দাস গোস্বামীর কণ্ঠে রক্ষিত হইয়াছিল, তাহা অবলম্বন করিয়া শ্রীচৈন্যচরিতামৃত গ্রন্থ লিখিয়াছেন। "স্বরূপ গোস্বামী মহাপ্রভুর শেষলীলা কড়চাসূত্র করিয়া শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর কণ্ঠে রাখিয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহাকে কণ্ঠস্থ করাইয়া কবিরাজ গোস্বামীর দ্বারা তাহা জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীস্বরূপকৃত কড়চা পৃথক্ পুস্তকাকারে লিখিত হয় নাই। এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতই স্বরূপের কড়চার নিষ্কর্ষ।"**

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

"স্বরূপ গোসাঞি কড়চায় যে লীলা লিখিল।
রঘুনাথদাসমুখে যে সব শুনিল।।
সেইসব লীলা কহি, সংক্ষেপ করিয়া।
চৈতন্যকৃপাতে লিখি ক্ষুদ্রজীব হঞা।।"

—চৈঃ চঃ অ ৩/২৬৭-২৬৮

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত কোন সাধারণ কাব্য উপন্যাস নয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নাম-রূপ গুণ লীলার মহিমা কবিরাজ গোস্বামীর হৃদয়ে প্রকট

হয়ে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত রূপে প্রকাশিত হয়েছেন। কবিরাজ গোস্বামীর লেখনী থেকেই তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায়–

শেষ-লীলার সূত্রগণ, কৈলুঁ কিছু বিবরণ,
ইঁহা বিস্তারিতে চিত্ত হয়।
থাকে যদি আয়ুঃ-শেষ, বিস্তারিব লীলা-শেষ,
যদি মহাপ্রভুর কৃপা হয়।।
আমি বৃদ্ধ জরাতুর, লিখিতে কাঁপয়ে কর,
মনে কিছু স্মরণ না হয়।
না দেখিয়ে নয়নে, না শুনয়ে শ্রবণে,
তবু লিখি,–এ বড় বিস্ময়।।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত সর্বকালের শ্রেষ্ঠ্য গ্রন্থ। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ বলেছেন–

**“পৃথিবীর যদি এইরূপ পরিস্থিতি হয় যে সবই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ দুইটী বিদ্যমান থাকিলেই মনুষ্যগণ সর্ব্বাভীষ্ট বস্তু প্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হইবে না। যদি এমন হয় যে, শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থেরও বিলুপ্তি ঘটিল, তাহা হইলে একমাত্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত থাকিলেই মানুষের কোন লোকসান হইবে না। শ্রীমদ্ভাগবতে যাহা অনভিব্যক্ত, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অভিব্যক্ত হইয়াছে। রাধাকৃষ্ণ মিলিত তনু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পরম-তত্ত্ব। তাঁহারই অভিন্ন শব্দমূর্ত্তি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।”**

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বর্ণনা করেছেন–

‘‘কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রসিক ভকত মাঝ,
যিঁহো কৈল চৈতন্যচরিত।
গৌর গোবিন্দ লীলা শুনিতে গলয়ে শীলা,
তাহাতে না হৈল মোর চিত।।”

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর রচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীগোবিন্দলীলামৃত ও কৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা এই তিনটি অমূল্য গ্রন্থ। শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃতে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টকালীন লীলা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই গ্রন্থ লিখে তিনি ‘কবিরাজ’ উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। বৈষ্ণব জগতে তিনি রূপানুগবর রূপে পূজিত।

প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলেছেন, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী রাধারাণীর নিজজন। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর হৃদয়ে ভগবৎ তত্ত্ব প্রকাশিত; তাঁর প্রত্যেকটি বাক্যই পরম প্রামাণিক”। একদিন বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী চিন্তিত হলেন, কারণ কবিরাজ গোস্বামী ব্রহ্ম গায়ত্রীর ব্যাখ্যায় পঁচিশ অক্ষর না লিখে সাড়ে চব্বিশ অক্ষর লিখেছেন। তিনি অনেক চিন্তা করেও কিছু স্থির করতে পারলেন না। পরিশেষে রাধাকুণ্ড তটে দেহ ত্যাগ করার সঙ্কল্প করলেন। মধ্যরাতে রাধারাণী স্বপ্নে এসে বললেন, ‘‘হে বিশ্বনাথ! হে হরিবল্লভ! তুমি শীঘ্রই উঠ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ যা লিখেছেন তা সত্যই। তিনি আমার নর্ম্ম সহচরী।’’ ০০ ‘বর্ণাগমভাস্বৎ’ গ্রন্থে উল্লেখ আছে,–যদি ‘য’ কারের পর ‘বি’ অক্ষর থাকে, তাহলে সেই ‘য’ কারই অর্দ্ধকার।’

কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীপাট ঝামট্পুরে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর একটি ছোট্ট পাদপীঠ মন্দির আছে। প্রবাদ আছে কবিরাজ গোস্বামী উক্ত স্থানে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর থেকে দীক্ষা নিয়েছিলেন। আবার প্রেমবিলাস গ্রন্থে বর্ণনা আছে, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর গুরু শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী। তাঁর শ্রীপাটে গৌরনিত্যানন্দ বিগ্রহ বিরাজিত আছেন। সেখানে একটি কাঠের পাদুকা কবিরাজ গোস্বামীর ব্যবহৃত বলে দেখানো হয়। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভজন কুটীর ও সমাধি রাধাকুণ্ডে রয়েছে।

গৌর গণোদ্দেশ দীপিকার বর্ণনা অনুসারে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী পূর্বলীলায় 'রত্নরেখা' ছিলেন (গৌঃ গঃ ১৬৭)। আবার কোন কোন গ্রন্থে তাঁকে 'কস্তুরী মঞ্জরী' বলা হয়েছে।

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর অপ্রকটের পর আশ্বিন শুক্লা-দ্বাদশীতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন।

**।। জয় শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কি জয়।।**

# শ্রীমীনকেতন রামদাস

অমুং প্রাবিশতাং কার্য্যাৎ সহজৌ নিশঠোল্মুকৌ।
মীনকেতনরামাদিব্যূহঃ সঙ্কর্ষণোহপরঃ।।

বলদেব প্রভুর দুই পুত্র 'নিশঠ' ও 'উল্মুক' শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মধ্যে প্রবেশ করেছেন। ইদানিং ঐ দু'জন 'মীনকেতন' ও 'রামদাস' নামে বিখ্যাত হয়েছেন।।

গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় মীনকেতন ও রামদাস দুজন পৃথক ব্যক্তিকে নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ও নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের বর্ণনায় দেখা যায়, মীনকেতন রামদাস একজন ব্যক্তিরই নাম। তাহলে ঘটনাটা এমন হতে পারে যে, বলদেব লীলায় যারা নিশঠ ও উল্মুক ছিলেন তারা নিত্যানন্দ লীলায় মীনকেতন রামদাসের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছেন।

আমার আলয়ে অহোরাত্র-সঙ্কীর্ত্তন।
তাহাতে আইলা তিঁহ পাঞা নিমন্ত্রণ।।

চৈঃ চঃ আঃ ৫/১৬২

শ্রীমীনকেতন রামদাসের জন্মস্থান, পিতামাতার পরিচয় সবই অজ্ঞাত। তবে চৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণনা অনুযায়ী অনুমান করা যায়, ঝামট্পুরের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে মীনকেতন রামদাসের শ্রীপাট ছিল।

খেতরী উৎসবে শ্রীজাহ্নবা মাতার সাথে যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে মীনকেতন রামদাস অন্যতম।

''সঙ্গেতে চলিলা মহাভাগবতগণ।
যাঁ সবার দর্শনে পবিত্র ত্রিভুবন।।

* * * *

শ্রীমীনকেত রামদাস মনোহর।
মুরারিচৈতন্য, জ্ঞানদাস, মহীধর।।
শ্রীশঙ্কর, শ্রীকমলাকর পিপ্পলাই।
নৃসিংহ, চৈতন্য, জীব, পণ্ডিত কানাই।।''

—ভক্তিরত্নাকর ১০/৩৭২,৩৭৪-৩৭৫

এক সময় শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর গৃহে অহোরত্র শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন হচ্ছিল। তাতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ভৃত্য শ্রীমীনকেতন রামদাস আগমন করেছিলেন। মহান্তগণ শ্রীমীনকেতন রামদাসকে দেখে আনন্দে তাঁকে স্বাগত সৎকার ও দণ্ডবৎ করেন এবং কীর্ত্তন-মণ্ডপে নিয়ে বসান। তিনি তথায় আনন্দে উপবেশন করলেন। ভাগবতগণ সকলে তাঁকে—সম্ভাষণ করতে লাগলেন। সে সময় তিনি প্রেমাবেশে কাউকেও গাঢ় আলিঙ্গন, কারও পৃষ্টে চাপড় মেরে ক্রোড়ে ধারণ, কারও শিরে হস্ত দিয়ে আশীর্ব্বাদ প্রভৃতি করতে লাগলেন। তাঁর

শুভাগমনে সকলের শ্রীনিত্যানন্দ স্মৃতি উদয় হল। খুব নৃত্য-গীত হতে লাগল। তিনিও প্রেমে মত্ত করীন্দ্রবৎ ভ্রমণ করতে লাগলেন। এভাবে কিছুক্ষণ অতীত হল। তিনি ভক্তগণসহ বিশ্রাম করলেন।

গুণার্ণব মিশ্র নামে একজন ব্রাহ্মণ শ্রীমূর্ত্তি সেবা করছিলেন। তিনি শ্রীমীনকেতন রামদাসকে কোন প্রকার সম্ভাষণ করলেন না। তা দেখে শ্রীমীনকেতন রামদাস বললেন—

‘এই ত’ দ্বিতীয় সুত রোমহর্ষণ।’
বলদেব দেখি, যে না কৈল প্রত্যুদ্গম।।

—চৈঃ চঃ আদি ৫/১৭০

শ্রীমীনকেতন রামদাস একথা বলে পুনঃ নৃত্য-গীত করতে লাগলেন। ভক্তগণ অজ্ঞের অপরাধ গ্রহণ করেন না। এভাবে উৎসব সমাপ্ত হল। শ্রীমীনকেতন রামদাস সকলকে কৃপা-আশীর্ব্বাদ দিয়ে কৃতার্থ করলেন।

একদিন শ্রীকবিরাজ মহাশয়ের ছোটভাই শ্যামদাসের সঙ্গে শ্রীমীনকেতন রামদাসের বাক-বিতণ্ডা হচ্ছিল। শ্যামদাস শ্রীগৌরসুন্দরকে পূর্ণ ভক্তি করেন কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি তাঁর তত ভক্তি নাই।

দুই ভাই এক তনু—সমান-প্রকাশ।
নিত্যানন্দ না মান’, তোমার হবে সর্ব্বনাশ।।
একেতে বিশ্বাস, অন্যে না কর সম্মান।
‘অর্দ্ধকুক্কুটি-ন্যায়’ তোমারে প্রমাণ।।
কিংবা, দোঁহা না মানিঞা হও ত’ পাষণ্ড।
একেমানি’ আরে না মানি,—এইমতভণ্ড।।

চৈঃ চঃ আদি ৫/১৭৫-১৭৭

শ্রীরামদাস বললেন দু’জন অভিন্ন, দুজন ঈশ্বর। তুমি একজনকে মান, অন্যকে মান না—এতে তোমার সর্ব্বনাশ হবে। এ বলে ক্রোধভরে বংশী ভেঙ্গে চলে গলেন। শ্রীশ্যামদাসের মহা অপরাধ হল।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এতে দুঃখ পেলেন, এবং তাকে ভর্ৎসনা করলেন। তিনি যেহেতু মীনকেতন রামদাসের পক্ষ থেকে ভর্ৎসনা করলেন, এই গুণে সন্তুষ্ট হয়ে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কবিরাজ গোস্বামীকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বললেন,—

আরে আরে কৃষ্ণদাস, না করহ ভয়।
বৃন্দাবনে যাহ, তাঁহা সর্ব্ব লভ্য হয়।।

—চৈঃ চঃ আদি ৫/১৯৫

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণমূলে দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন। তখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু স্বীয় অভয় শ্রীচরণযুগল তাঁর মস্তকে ধারণ করে বললেন—তুই শীঘ্র বৃন্দাবনে যা। সেখানে তোর সমস্ত আশা পূর্ণ হবে। স্বপ্নে তিনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপাশীর্ব্বাদ লাভ করে আনন্দে শ্রীবৃন্দাবন অভিমুখে চলতে লাগলেন।

**।। জয় শ্রীল মীনকেতন রামদাস কি জয়।।**



# শ্রীনিবাস আচার্য্য

শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্যের জন্ম চাখন্দি গ্রামে। তিথিটি ছিল ১৪৪১ শকাব্দ, রোহিণী নক্ষত্র, বৈশাখী পূর্ণিমা। তাঁর পিতা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ শ্রীগঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য এবং মাতা লক্ষ্মীপ্রিয়া।

মহাপ্রভু সন্ন্যাস নিয়ে নীলাচলে চলে গেলে শ্রীগঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য বিরহ সমুদ্রে নিমজ্জিত হলেন। নিরন্তর 'হা চৈতন্য', 'হা চৈতন্য', বলে ক্রন্দন করতে লাগলেন। গঙ্গাধর প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় নিরন্তর 'হা চৈতন্য' বলে কাঁদতেন বলে লোকে তাঁর নাম দেয় 'চৈতন্যদাস'। চৈতন্যদাসের মনে কোন কামনা-বাসনা ছিল না। একদিন হঠাৎ তাঁর মনে হল একটি পুত্র সন্তান হলে ভাল হয়। একথা তিনি তাঁর পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়াকে জানালেন। লক্ষ্মীপ্রিয়া বললেন, তাহলে নীলাচলে গিয়ে মহাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা কর। আর বিলম্ব না করে চৈতন্যদাস লক্ষ্মীপ্রিয়াকে সঙ্গে নিয়ে নীলাচলের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। পথে কয়েকদিন যাজিগ্রামে শ্রীবলরাম বিপ্রের গৃহে অবস্থান করলেন। বলরাম বিপ্র লক্ষ্মীপ্রিয়ার পিতা।

কতদিনে নীলাচলে উত্তরিলা গিয়া।
প্রভুর দর্শন লাগি উৎকণ্ঠিত হিয়া।।

—ভঃ রঃ ২/৮৭

চৈতন্যদাস ও তাঁর স্ত্রী দূর থেকে মহাপ্রভুকে দেখে কেঁদে দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন। তাঁরা মহাপ্রভুকে কিছু বলার পূর্বেই মহাপ্রভু তাঁদের অন্তরের কথা জানতে পেরেছেন। তাই কৃপা দৃষ্টিপাত করে মধুর বাক্যে বলতে লাগলেন--

''জগন্নাথ তোমা আনাইলা হৃষ্ট হৈয়া।।
চল চল জগন্নাথ করহ দর্শন।
করিবে কামনা পূর্ণ শ্রীপদ্মলোচন।।

ভঃ রঃ ২/১০৪

শ্রীজগন্নাথ কি ইচ্ছা পূর্ণ করবেন, ভক্তগণ তা' জানার জন্য উৎকণ্ঠিত হলে মহাপ্রভু গোবিন্দকে ডেকে বললেন, ''চৈতন্যদাসের পুত্রকামনা হয়েছে। শ্রীনিবাস নামে তাঁর একটি পুত্র হবে। ঐ পুত্রটি আমার অভিন্ন প্রেমস্বরূপ হয়ে সকলের উল্লাস বৃদ্ধি করবে। শ্রীরূপ আদির দ্বারা আমি ভক্তিশাস্ত্র প্রকাশ করব এবং শ্রীনিবাসের দ্বারা গ্রন্থ বিতরণ করব।

''হেনই সময়ে প্রভু গোবিন্দে ডাকিয়া।
কহয়ে গভীরনাদে ভাবাবিষ্ট হইয়া।।
'পুত্রের কামনা করি' আইলা ব্রাহ্মণ।
শ্রীনিবাস নামে তাঁর হইবে নন্দন।।
শ্রীরূপাদি দ্বারে ভক্তি শাস্ত্র প্রকাশিব।
শ্রীনিবাস দ্বারে গ্রন্থরত্ন বিতরিব।।
মোর শুদ্ধপ্রেমের স্বরূপ শ্রীনিবাস।
তারে দেখি' সর্ব্বচিত্তে বাড়িল উল্লাস।।"

ভঃ রঃ

শ্রীচৈতন্যদাস মহাপ্রভুর শুভ আশীর্বাদ পেয়ে আনন্দে গৌড় দেশে ফিরে এলেন। এ সময় ব্রাহ্মণীর গর্ভে শ্রীচৈতন্যের কৃপা-শক্তির অধিষ্ঠান হল। লক্ষ্মীপ্রিয়ার বাবা পণ্ডিত ও জ্যোতিষী ছিলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, লক্ষ্মীর গর্ভে কোন মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করবেন।

বৈশাখ পূর্ণিমা দিবা রোহিণী নক্ষত্র।
শুভক্ষণে লক্ষ্মীপ্রিয়া প্রসবিলা পুত্র।।

—ভঃ রঃ ২/১৫৬

শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা দিবসে রোহিণী নক্ষত্রে সর্ব্ব শুভ লগ্নে এক অপূর্ব্ব সন্তান প্রসব করলেন। পুত্রের অঙ্গকান্তি যেন স্বর্ণচাঁপার ন্যায়। দীর্ঘ নাসা, আকর্ণ নেত্র, বিস্তৃত বক্ষস্থল,

আজানুলম্বিত ভুজ যুগল। মহাপুরুষের যাবতীয় লক্ষণ তাতে স্পষ্ট দেখা যেতে লাগল।

শ্রীচৈতন্যদাস পুত্রকে তৎক্ষণাৎ শ্রীচৈতন্য পাদ-পদ্মে অর্পণ করলেন। পুত্রের জন্মোৎসব উপলক্ষে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীগণকে সেবা, দান-দক্ষিণা প্রদান করলেন। পুত্র পেয়ে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী বড়ই সুখী হলেন। লক্ষ্মীপ্রিয়া পুত্র কোলে নিয়ে শ্রীগৌরনাম কীর্ত্তন করতে করতে পুত্রকে গৌর নাম শিখাতেন। চন্দ্রকলার ন্যায় পুত্র দিন দিন বাড়তে লাগল। ক্রমে চূড়াকরণ যজ্ঞোপবীত প্রভৃতি হল। তারপর শ্রীধনঞ্জয় বিদ্যাবাচস্পতির নিকট ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে লাগলেন। বালক অল্পকালের মধ্যে শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী হলেন।

বাল্যকালেই শ্রীনিবাস শ্রীগোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর ও শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর প্রভৃতির কৃপা প্রাপ্ত হলেন। কিছুদিন পরে শ্রীনিবাসের পিতৃ বিয়োগ হয়। পিতার অন্তর্ধানে শ্রীনিবাস অত্যন্ত কাতর হলেন। ভক্তগণ শ্রীনিবাসকে অনেক প্রবোধ দিয়ে শান্ত করলেন। শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া পতি বিয়োগে বড়ই কাতর হলেও পুত্র মুখপানে তাকিয়ে ধৈর্য্য ধারণ করলেন।

শ্রীনিবাস জননীকে নিয়ে চাখন্দি থেকে কিছুদিন পরে যাজিগ্রামে মাতামহ শ্রীবলরাম বিপ্রের গৃহে এলেন। যাজি গ্রামে শ্রীনিবাসের আগমনে তথাকার সজ্জনবৃন্দ পরম আনন্দ লাভ করলেন। শ্রীনিবাসের অগাধ পাণ্ডিত্য ও ভক্তিপ্রেম দেখে তথাকার পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ চমৎকৃত হলেন। শ্রীনিবাসের হৃদয় কোন বস্তুর জন্য লালায়িত নয়। তিনি কেবল শ্রীচৈতন্য চরণ দর্শন চিন্তায় বিভোর থাকেন। ক্রমে নীলাচলে যাবার জন্য বড়ই অধীর হয়ে পড়লেন।

শ্রীনিবাস শ্রীখণ্ডের শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করতে শ্রীখণ্ডে এলেন এবং প্রেমে গদ্‌গদ্ চিত্তে তাঁর শ্রীচরণমূলে লুটিয়ে পড়লেন। এতাদৃশ প্রেম দেখে শ্রীসরকার ঠাকুর তাঁকে কোলে তুলে নিলেন। শ্রীনিবাস গৌরসুন্দরের নাম স্মরণ করে ক্রন্দন করতে লাগলেন। তারপর প্রার্থনা জানালেন নীলাচলে গিয়ে শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন করবেন। শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর ও শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর প্রভৃতি তাঁর শুভ প্রস্তাব শুনে সুখী হলেন, বললেন-কয়েকদিন ধৈর্য্য ধারণ কর। যখন গৌড়ীয় ভক্তগণ পুরী যাবেন তখন তাদের সঙ্গে যেয়ো।

**গৌর-ক্ষেত্র ও ব্রজমণ্ডল দর্শন**

শ্রীনিবাস শ্রীখণ্ডের ভক্তগণের থেকে বিদায় নিয়ে যাজিগ্রামে এলেন এবং জননীকে এই প্রস্তাব জানালেন। জননী বড় কাতর হয়ে পড়লেন। তথাপি পুত্রের একান্ত ইচ্ছা দেখে যাবার অনুমতি দিলেন। অতঃপর কিছুদিন পর গৌড়ীয় ভক্তদিগের সঙ্গে শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে তিনি পুরীর দিকে যাত্রা করলেন।

কিছুদূর গিয়েই শুনলেন, মহাপ্রভু অপ্রকট হয়েছেন। সাথে সাথেই তিনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। মূর্চ্ছাভঙ্গ হলে প্রাণ ত্যাগের সঙ্কল্প করলেন। মহাপ্রভু তাঁকে স্বপ্নে দর্শন প্রদান করলেন এবং নীলাচলে যেতে আদেশ দিলেন।

তিনি বড় বিহ্বল অন্তরে ক্রমে নীলাচলে পৌঁছলেন সন্ধ্যাকালে। রাত্রে সিংহদ্বারের নিকট এক পাণ্ডাগৃহে অবস্থান করলেন। প্রাতঃকালে শ্রীগদাধর পণ্ডিতের গৃহে এলেন। পণ্ডিতকে দেখে শ্রীনিবাস ভূতলে পড়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত তাঁকে স্নেহে ধরাতল থেকে উঠিয়ে কোলে করলেন। শ্রীনিবাস গদাধরের কোলে গৌর বিরহে ক্রন্দন করতে লাগলেন।

শ্রীগদাধর পণ্ডিতের গৃহে একদিন অবস্থানের পর শ্রীনিবাস, শ্রীরামানন্দ রায়, শ্রীসার্ব্বভৌম পণ্ডিত, শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত, শ্রীপরমানন্দ পুরী,

শ্রীশিখি মাহিতি, গোবিন্দ, শঙ্কর ও গোপীনাথ আচার্য্য প্রভৃতি শ্রীগৌর-পার্ষদগণের শ্রীচরণ দর্শনে চললেন। শ্রীনিবাসকে দর্শন করে ভক্তগণ সকলে সুখী হলেন। শ্রীনিবাসের অপূর্ব্ব গৌর প্রেম দর্শনে ভক্তগণ বুঝতে পারলেন তিনি গৌরশক্তি। তাঁর দ্বারা জগতে ভবিষ্যতে গৌরবাণী ও গ্রন্থাবলী প্রচারিত হবে। ভক্তগণ শ্রীনিবাসকে বিবিধ উপদেশ প্রদান করতে লাগলেন। শ্রীনিবাস কিছু দিন পুরীতে থেকে শ্রীগৌরসুন্দরের যাবতীয় লীলাস্থলী সকল দর্শন করলেন। অনন্তর গৌড় দেশে আসবার জন্য ভক্তগণের কাছে বিদায় প্রার্থনা করলেন। ভক্তগণ শ্রীনিবাসকে স্নেহে আলিঙ্গন আদি করে বিদায় দিলেন। শ্রীনিবাস ভক্তদের থেকে বিদায় নিয়ে গৌড় দেশাভিমুখে আসতে লাগলেন। কিছু পথ চলবার পর সংবাদ পেলেন শ্রীগদাধর পণ্ডিত অপ্রকট হয়েছেন। শ্রীনিবাস তাঁর বিরহে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হলেন, অতঃপর বিরহে আর্ত্তস্বরে রোদন করতে লাগলেন। রাত্রে স্বপ্নযোগে শ্রীগদাধর পণ্ডিত তাঁকে দর্শন দিয়ে শান্ত করলেন। শ্রীবাস পুনঃ গৌড় দেশাভিমুখে চলতে লাগলেন। পথে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অপ্রকট বার্ত্তা শ্রবণ করলেন। শ্রীনিবাস সেদিন তথায় অবস্থান করলেন, বিরহে অবিরাম অশ্রুপাত করতে লাগলেন। স্বপ্নে দর্শন দিয়ে করুণাময় শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য তাঁকে শান্ত করলেন। শ্রীনিবাস ক্রমে গৌড়দেশে এলেন। প্রথম শ্রীখণ্ডে শ্রীনরহরি সরকার, শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর আদির শ্রীচরণ দর্শন করলেন। তাঁদের আশীর্ব্বাদ নিয়ে তিনি নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরে আগমন করলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মভূমি দর্শন করে শ্রীনিবাস প্রেমে ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। মহাপ্রভুর গৃহে তখন শ্রীবংশীবদন ঠাকুর অবস্থান করছিলেন। শ্রীনিবাস বংশীবদন ঠাকুরের শ্রীচরণে দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন। শ্রীবংশীবদন ঠাকুর তাঁর পরিচয় পেয়ে পরম সুখী হলেন। মহাপ্রভুর নাম স্মরণ করে শ্রীনিবাস উচ্চৈঃস্বরে রোদন করতে লাগলেন। শ্রীনিবাস শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর শ্রীচরণ দর্শন প্রার্থনা করলেন। সেইকালে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী কাউকেও দর্শন দিতেন না। শ্রীবংশীবদন ঠাকুর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর শ্রীচরণে শ্রীনিবাসের কথা জ্ঞাপন করলেন। অনেক ক্ষণ ভাবার পর আজ্ঞা করলেন, তাঁকে নিয়ে এস।

শ্রীনিবাসকে শ্রীবংশীবদন ঠাকুর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর শ্রীচরণে নিয়ে গেলেন। শ্রীনিবাস ঠাকুরাণীকে দর্শন মাত্রই প্রেমাশ্রু নেত্রে ভূমি তলে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করলেন।

‘‘শ্রীনিবাস গেলেন শ্রীঈশ্বরী সাক্ষাতে।।
প্রেমধারা নেত্রেতে বহয়ে নিরন্তর।
ধরণী লোটাঞা কৈল প্রণতি বিস্তর।।

—ভঃ রঃ ৪/৪১

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী তাঁকে আশীর্ব্বাদ করলেন এবং সেদিন সেখানে প্রসাদ পেতে বললেন।

গৌর বিরহে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর শ্রীঅঙ্গ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর চাঁদের মত অতি ক্ষীণ। তণ্ডুলের সাহায্যে শ্রীহরিনামের সংখ্যা রাখতেন, তাতে যে কয়েকটি তণ্ডুল হত তা রন্ধন করে শ্রীগৌর সুন্দরকে অর্পণ করতেন, তা স্বয়ং গ্রহণ করে জীবনধারণ করতেন।

শ্রীনিবাস নবদ্বীপে শ্রীমুরারি গুপ্ত, শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীদামোদর পণ্ডিত, শ্রীসঞ্জয়, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, দাস গদাধর প্রভৃতির শ্রীচরণ দর্শন করলেন। তিনি কয়েক দিন নবদ্বীপে অবস্থান করবার পর শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত ভবনে এলেন এবং সীতা ঠাকুরাণীর শ্রীচরণ দর্শন করলেন—

প্রাণ মাত্র আছে সীতা মাতার শরীরে।
শ্রীনিবাসে বোলাইয়া লৈল অন্তঃপুরে।।

—ভঃ রঃ ৪/৭০

শ্রীসীতা ঠাকুরাণী গৌর বিরহে প্রাণে মাত্র জীবিত আছেন। শ্রীনিবাসকে প্রচুর আশীর্ব্বাদ করলেন। শ্রীনিবাস শান্তিপুরে অন্যান্য ভক্তগণেরও শ্রীচরণ দর্শন-বন্দনাদি করলেন। ক্রমে সেখান থেকে খড়দহ গ্রামে এলেন। খড়দহে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর গৃহে শ্রীপরমেশ্বরী দাস ঠাকুর তখন অবস্থান করছিলেন। তিনি শ্রীনিবাসকে শ্রীবসুধা, শ্রীজাহ্নবা ও শ্রীবীরচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ-কার করালেন। শ্রীনিবাস প্রেমাশ্রুপূর্ণ নয়নে দণ্ডবৎ করতেই শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী তাঁর শিরে শ্রীচরণ ধূলি দিলেন। শ্রীনিবাসকে সকলে পরম স্নেহ করতে লাগলেন। খড়দহ গ্রামে কয়েক দিন তিনি রইলেন। অনন্তর শ্রীজাহ্নবা মাতা তাঁকে শ্রীবৃন্দাবন ধামে যেতে আদেশ করলেন। শ্রীনিবাস শ্রীজাহ্নবা দেবীর আদেশ শিরোধার্য্য করে খানাকুলে শ্রীঅভিরাম গোপাল ঠাকুরের গৃহে এলেন। শ্রীঅভিরাম গোপাল ঠাকুরকে বন্দনা করতেই তিনি তাঁর জয়-মঙ্গল নামক চাবুক তিনবার শ্রীনিবাসের দেহস্পর্শ করালেন। তাঁর পত্নী শ্রীমালিনী দেবী নিষেধ করলেন।

প্রেমাবেশে পুনঃ সে চাবুক স্পর্শাইতে।
শ্রীমালিনী দেবী আসি ধরিলেন হাতে।।

ভঃ রঃ ৪/১৪১

জয়মঙ্গল চাবুক স্পর্শে শ্রীনিবাসের দেহে প্রেমের সঞ্চার হল। শ্রীনিবাস অভিরাম গোপাল ঠাকুরকে বন্দনা করে তাঁর কৃপাশীর্ব্বাদ নিয়ে শ্রীখণ্ডে এলেন। শ্রীখণ্ডের শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর ও শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর তাঁকে দেখে অতি সুখী হলেন। অতঃপর তিনি যাজিগ্রামে নিজ গৃহে এলেন এবং স্বীয় জননীর চরণ বন্দনা করলেন। শ্রীনিবাস মায়ের কাছে বৃন্দাবনে যাবার আজ্ঞা প্রার্থনা করলেন। পুত্রের ব্যাকুলতা দেখে জননী অনুমতি দান করলেন। শ্রীনিবাস শীঘ্র বৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করলেন। পথে গয়াধামে উপস্থিত হয়ে শ্রীবিষ্ণু-পাদপদ্ম দর্শন করলেন। এই স্থানে শ্রীঈশ্বরপুরীর সঙ্গে মহাপ্রভুর মিলন হয় এবং প্রভু তাঁর থেকে মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করেন।

গয়াধামে দুই তিন দিন অবস্থান করে কাশীতে শ্রীচন্দ্রশেখরের গৃহে এলেন। শ্রীনিবাসের অন্যান্য ভক্তগণের সহিত তথায় মিলন হল। শ্রীচন্দ্রশেখর ও শ্রীতপন মিশ্রের মুখে কাশীতে মহাপ্রভু যে যে লীলা করেছিলেন তা শ্রবণ করে আনন্দ সাগরে ভাসতে লাগলেন। কয়েকদিন তথায় থাকার পর সেখান থেকে শ্রীমথুরা ধামে এলেন। বিশ্রাম ঘাটে স্নান করলেন। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ কংসাসুরকে বধ করার পর বিশ্রাম করেছিলেন। তাই বিশ্রামঘাট নাম হয়েছে।

### দীক্ষা ও অধ্যয়ন

শ্রীনিবাস মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ জন্মস্থান ও আদিকেশব দর্শন করে শ্রীবৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করলেন, পথে কয়েকজন বৃন্দাবনবাসী ব্রাহ্মণের মুখে শ্রীরূপ-সনাতনের তথা রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভৃতির অপ্রকট কথা শুনলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীসনাতন গোস্বামী, শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিত গোস্বামী ও শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী অপ্রকট হয়েছেন। শুনে অতি বিষন্ন হলেন। ''শুনি শ্রীনিবাস ভাসিলেন নেত্র জলে। মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন ভূমি-তলে।।" (ভঃ রঃ ৪/২০৩) তাঁর সঙ্গে ব্রাহ্মণগণ ছিলেন, তাঁরা শ্রীনিবাসকে অনেক কথা বুঝিয়ে শ্রীজীব গোস্বামীর কছে নিয়ে এলেন। শ্রীজীব গোস্বামী পূর্ব্বেই শ্রীনিবাসের পরিচয় শুনেছিলেন। শ্রীনিবাস শ্রীজীব গোস্বামীর শ্রীপাদ-পদ্ম বন্দনা করলেন। শ্রীজীব গোস্বামী আনন্দে শ্রীনিবাসকে ধরে আলিঙ্গন করলেন। অতঃপর উভয়ে বিবিধ কথোপকথন করতে লাগলেন। শ্রীজীব গোস্বামী গৌড় দেশবাসী

ভক্তগণের বিবিধ কুশল বার্ত্তাদি জিজ্ঞাসা করলেন এবং তাঁর থাকবার ও প্রসাদ পাবার ব্যবস্থা করলেন। সেদিন শ্রীগোবিন্দদেবের সেবক শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত প্রসাদ নিয়ে এলেন। শ্রীজীব গোস্বামী সে প্রসাদ শ্রীনিবাসের সঙ্গে গ্রহণ করলেন। বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা দিবসে অপরাহ্নে শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামীর কাছে এসেছিলেন। প্রাতঃকালে তিনি শ্রীজীব গোস্বামীর সঙ্গে শ্রীরাধারমণ দর্শন করলেন। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর সঙ্গেও দেখা হল। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী শ্রীনিবাসকে দেখে পরম সুখী হলেন। শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীনিবাসের সবিশেষ পরিচয় প্রদান করলেন। শ্রীনিবাস শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর শ্রীপাদ-পদ্ম বন্দনা পূর্ব্বক অতি বিনীতভাবে মন্ত্র-দীক্ষাদি প্রার্থনা করলেন। শ্রীভট্ট গোস্বামী আনন্দের সহিত রাজি হলেন। পরদিবস শ্রীনিবাসকে শ্রীশ্রীরাধারমণ সন্নিধানে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী মন্ত্র-দীক্ষা দান করলেন। শ্রীজীব গোস্বামী পরদিন শ্রীনিবাসকে শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর নিকট প্রেরণ করলেন। শ্রীনিবাস আনন্দে শ্রীরাধাকুণ্ডে এসে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীরাঘব পণ্ডিত প্রভৃতির শ্রীচরণ বন্দনা করলেন। তিন দিন শ্রীনিবাস রাধাকুণ্ডে গোস্বামীদের সঙ্গে অবস্থান করে অনেক রকমের ভজনোপদেশ লাভ করেন। সকলের অনুমতি নিয়ে শ্রীনিবাস পুনঃ শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামিপাদের নিকট ফিরে এলেন।

অনন্তর শ্রীমদ্ জীব গোস্বামী শ্রীনিবাসকে শ্রীমদ্ভাগবত ও গোস্বামী গ্রন্থ অধ্যয়ন করাতে লাগলেন। অল্প সময়ের মধ্যে গোস্বামী গ্রন্থের সিদ্ধান্ত সমূহ শ্রীনিবাস হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন। তাঁর প্রতিভা দর্শন করে শ্রীমদ্ জীব গোস্বামী তাঁকে ‘‘আচার্য্য’’ পদবী প্রদান করলেন। সে দিন থেকে তিনি শ্রীনিবাস আচার্য্য নামে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে খ্যাত হলেন। তাছাড়া তিনি নরোত্তমকে ‘ঠাকুর’ ও দুঃখী কৃষ্ণদাসকে ‘শ্যামানন্দ’ পদবী প্রদান করেছিলেন।

শ্রীনিবাস আচার্য্য পূর্ব্বে শ্রীনরোত্তমের নাম শ্রবণ করেছিলেন। শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট তাঁর সাক্ষাৎ দর্শন পেলেন। শ্রীনিবাস ও শ্রীনরোত্তমের মিলন হল, চির সৌহার্দ্য ভাব জেগে উঠল। শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীনিবাস ও শ্রীনরোত্তমকে শ্রীরাঘব গোস্বামীর সঙ্গে ‘বন’ ভ্রমণের আদেশ দিলেন। শ্রীগোস্বামীর আদেশ পেয়ে তাঁরা আনন্দে ‘বন’ ভ্রমণে যাত্রা করলেন।

শ্রীরাঘব গোস্বামী দাক্ষিণাত্য নিবাসী ব্রাহ্মণ। তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের একান্ত অনুরক্ত প্রিয়জন ছিলেন।

শ্রীমদ্ কবি কর্ণপুর লিখেছেন—

শ্রীরাধা প্রাণরূপা যা শ্রীচম্পকলতা ব্রজে।  
সাদ্য রাঘব গোস্বামী গোবর্দ্ধন কৃতস্থিতিঃ।।

পূর্ব্বে যিনি ব্রজে শ্রীরাধার প্রাণসখী চম্পকলতা নামে পরিচিত ছিলেন, তিনি বর্ত্তমান শ্রীগৌরলীলায় শ্রীরাঘব গোস্বামী নামে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং নিয়ত গোবর্দ্ধন গিরিরাজে অবস্থান করে গিরিরাজের আনন্দ বর্দ্ধন করছেন।

শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ভক্তিরত্নাকরের পঞ্চম তরঙ্গে শ্রীনিবাস ও শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শ্রীরাঘব গোস্বামীর সহিত শ্রীমথুরা মণ্ডলের ৮৪ ক্রোশ ভ্রমণ প্রসঙ্গ অতি বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করেছেন।

কিছুদিন শ্রীনিবাস ও শ্রীনরোত্তম শ্রীরাঘব গোস্বামীর সঙ্গে বন ভ্রমণ করে বৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট ফিরে এলেন। এমন সময় দুঃখী শ্রীকৃষ্ণদাস (শ্যামানন্দ প্রভু) গৌড়দেশ থেকে ব্রজে এলেন। শ্রীজীব গোস্বামী তাঁকে দেখে বড় আনন্দিত

হলেন। দুঃখী কৃষ্ণদাস শ্রীহৃদয়চৈতন্য প্রভুর প্রিয় শিষ্য। শ্রীহৃদয় চৈতন্য প্রভু স্বয়ং তাঁকে শ্রীজীবের নিকটে পাঠিয়েছেন। দুঃখী কৃষ্ণদাস শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট গৌড় দেশ ও উৎকল দেশবাসী ভক্তগণের কুশল বার্ত্তা প্রদান করলেন।

অতঃপর দুঃখী কৃষ্ণদাসের সঙ্গে শ্রীনিবাস আচার্য্যের ও শ্রীনরোত্তমের পরিচয় হল। তিনজন সর্ব্বগুণমণ্ডিত, পরস্পর চির মৈত্রী ভাবযুক্ত। তিনজন শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট 'গোস্বামী-গ্রন্থ' অনুশীলন করতে লাগলেন। এই সমস্ত গোস্বামী-গ্রন্থ শ্রদ্ধালু প্রিয়জনগণকে অধ্যয়ন করাব, শ্রীজীব গোস্বামীর অন্তরে এইরূপ যে বাসনা ছিল, তা যেন সিদ্ধ হল।

এ সময় ব্রজের গোস্বামীগণ মিলিত হয়ে ঠিক করলেন এই তিনজনের দ্বারা গৌড়দেশে গোস্বামী-গ্রন্থ প্রচার করতে হবে। তিনজন মহাবৈরাগ্যশীল ও ভক্তিরস শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত। অতঃপর তিনজনকে আহ্বান করে গোস্বামিগণের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করলেন। তিনজন অবনত শিরে সে আদেশ পালন করতে রাজি হলেন। শ্রীমদ্ জীব গোস্বামী গ্রন্থ সম্পুটের অধ্যক্ষ করলেন শ্রীনিবাস আচার্য্যকে। তাঁদের গ্রন্থ নিয়ে যাবার দিন ঠিক হল অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষে।

অতঃপর শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীমদন মোহনের বন্দনা করে গোস্বামিদের অনুমতি নিয়ে শ্রীমদ্ জীব গোস্বামী, শ্রীনিবাস, শ্রীনরোত্তম ও শ্রীদুঃখী কৃষ্ণদাসকে (শ্যামানন্দ) গ্রন্থসহ গৌড়দেশে প্রেরণ করলেন। গ্রন্থের গাড়ী রক্ষার জন্য উপযুক্ত রক্ষক পুরুষগণও চলতে লাগলেন। মথুরা থেকে সুপ্রসিদ্ধ পথ ধরে গাড়ী গৌড়দেশ অভিমুখে চলবার সময় বহু পথিকও গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল। স্থানে স্থানে বিশ্রাম, সংকীর্ত্তন, ভোগ-রাগ প্রদান প্রভৃতি সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। ক্রমে গাড়ী বনবিষ্ণুপুরে প্রবেশ করল।

### গ্রন্থ চুরী

বনবিষ্ণুপুরের অধিকারী ছিলেন দস্যু দলপতি বীর হাম্বীর। তিনি চরের মুখে জানতে পারলেন যে বহু লোকজনসহ ধনরত্ন পূর্ণ এক গাড়ী গৌড় দেশের দিকে যাবার পথে বনবিষ্ণুপুরে প্রবেশ করেছে। তাই তিনি স্থির করলেন গাড়ী লুঠ করতে হবে। এদিকে গাড়ী বিষ্ণুপুরে প্রবেশ করতে সূর্য্যদেব অস্তমিত হলেন। তিনজন মন্ত্রণা করে ঐ নগরীর মধ্যে সরোবর তটে উপবন প্রান্তে বিশ্রামের ব্যবস্থা করলেন। সন্ধ্যায় তথায় সঙ্কীর্ত্তন নৃত্য আরম্ভ হল। গ্রামের বহু লোক তা দেখবার জন্য ছুটে এল। বৈষ্ণবগণের অঙ্গ তেজ, ভজন-কীর্ত্তনাদি শুনে সকলে আশ্চর্য্য হল।

রাজা বীর হাম্বীর বার বার চর প্রেরণ করে খবর নিচ্ছেন। ভাবছেন বিধাতা বহুদিন পরে মনের সাধ মিটালেন। ক্রমে রাত্রি গভীর হলে বৈষ্ণবগণ প্রসাদ গ্রহণের পর গ্রন্থ পূর্ণ গাড়ীর চারি পার্শ্বে শয়ন করলেন। সকলে নিদ্রিত হলেন। এ সময় দস্যুগণ সাবধানে গাড়ী থেকে গ্রন্থ পূর্ণ সিন্দুকটি নিয়ে রাজার কাছে এল। রাজা গ্রন্থের সিন্দুক দেখে বিবেচনা করলেন—তাতে বহু ধন-রত্ন আছে। তিনি আনন্দে আত্মহারা হলেন। দস্যুগণকে ডেকে বস্ত্র-ভূষণাদি দিয়ে তাদের প্রশংসা করতে লাগলেন।

শ্রীবীর হাম্বীর রাজা মনে বিচারয়।
এই গাড়ী পশ্চিম দেশের সুনিশ্চয়।।
বহু দিন বহু অর্থ লাভ হৈল মোরে।
এরূপ আনন্দ কভু না হয় অন্তরে।।
বুঝিলু অমূল্য রত্ন আছয় ইহায়।
এত কহি গ্রন্থের সম্পুট পানে চায়।।

—ভঃ রঃ ৭/৮০-৮২

রাজা বীর হাম্বীরের একজন গণক ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে তিনিও বললেন সিন্দুকে বহু অমূল্য নিধি আছে।

এদিকে বৈষ্ণবগণ প্রাতঃকালে জেগে দেখলেন গাড়ীতে গ্রন্থ সম্পুটটী নাই। অমনি সকলের শিরে যেন বজ্রপাত হল। সকলে চতুর্দিকে অন্বেষণ করতে বের হলেন। কিন্তু কোন সন্ধান পেলেন না। বিষাদে সকলে মৃতপ্রায় হলেন। কিছুক্ষণ পরে বৈষ্ণবগণ একটু ধৈর্য্য ধারণ করে বলতে লাগলেন—শ্রীগোবিন্দদেবের কি ইচ্ছা, কি জানি? তাঁর শুভ আশীর্ব্বাদ নিয়ে যাত্রা করেছি। তিনি গ্রন্থপূর্ণ সম্পুট বের করে দিবেন। বৈষ্ণবগণ এভাবে বলাবলি করতে লাগলেন। এমন সময় গ্রামবাসীদিগের কাছে শুনতে পেলেন, এ দেশের রাজা দস্যু দলপতি। তিনিই এ সমস্ত জিনিস হরণ করেছেন।

এদিকে রাজা বীর হাম্বীর সেই রাত্রে গ্রন্থ সম্পুট খুললেন—দেখলেন মূল্যবান বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত গ্রন্থ- রত্নরাজি। পরে গ্রন্থগুলি খুলে যখন ''শ্রীরূপ গোস্বামী'' এ নাম ও তাঁর মুক্তা পাঁতির ন্যায় শ্রীহস্ত অক্ষর দর্শন করলেন তখন তাঁর জীবনের পুঞ্জীভূত পাপ দূর হয়ে গেল। হৃদয় পবিত্র হল। শুদ্ধ হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হল। রাজা গ্রন্থ সম্পুট রেখে নিদ্রিত হলেন। তখন স্বপ্নে দেখতে লাগলেন—

স্বপ্নচ্ছলে দেখে এক পুরুষ সুন্দর।
জিনি হেম পর্ব্বত অপূর্ব্ব কলেবর।।
শ্রীচন্দ্রবদনে কহে হাসিয়া হাসিয়া।
চিন্তা না করিহ তেঁহ মিলিবে আসিয়া।।
হইবে তোমার প্রতি প্রসন্ন অন্তর।
জন্মে জন্মে হও তুমি তাহার কিঙ্কর।।

—ভঃ রঃ ৭/১০৩-১০৫

অপূর্ব্ব গ্রহরত্ন দেখে রাজা মনে মনে বললেন—এ গ্রহরত্ন যাঁদের তাঁদের বড় দুঃখ দিয়েছি নিশ্চয়ই। আমার কি গতি হবে জানি না। স্বপ্নে এক দিব্য মহাপুরুষ এসে বলতে লাগলেন—''রাজা! তুমি চিন্তা কর না। যাঁর এ অপূর্ব্ব গ্রহরত্ন তিনি সত্বর তোমার সঙ্গে মিলিত হবেন। জন্মে জন্মে তুমি তাঁর কিঙ্কর হও।''

শ্রীনরোত্তম ঠাকুরকে খেতরি গ্রামে এবং শ্রীদুঃখী কৃষ্ণদাসকে উৎকলে প্রেরণ করে, রাজগৃহ থেকে গ্রন্থ উদ্ধার করবার জন্য শ্রীনিবাস আচার্য্য স্বয়ং বিষ্ণুপুরে রইলেন।

বিষ্ণুপুরবাসী শ্রীকৃষ্ণবল্লভ নামক একজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ শ্রীনিবাস আচার্য্যকে দর্শন করে মুগ্ধ হলেন এবং আচার্য্যকে যত্ন করে গৃহে নিয়ে তাঁর পূজাদি করলেন। অনন্তর তাঁর থেকে মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করলেন। তথায় আর কয়েকজন ব্যক্তিও তাঁর প্রতি মুগ্ধ হয়ে মন্ত্র দীক্ষাদি নিলেন।

রাজা নিত্য ভাগবত শুনেন—শুনে শ্রীনিবাস আচার্য্য ইচ্ছা করলেন একদিন রাজগৃহে ভাগবত পাঠ করবেন। এ প্রস্তাব শ্রীকৃষ্ণবল্লভের কাছে করলেন। শ্রীকৃষ্ণবল্লভ বললেন রাজার ভাগবত ও সাধুর প্রতি শ্রদ্ধা আছে। চলুন অদ্যই আমরা রাজগৃহে গমন করি।

ভাগবত শুনে রাজা এ কথা শুনিয়া।
রাজসভা চলে কৃষ্ণবল্লভে লইয়া।।
আচার্য্যের তেজ দেখি রাজা সাবধানে।
ভূমে পড়ি প্রণমি আপনা ধন্য মানে।।

—ভঃ রঃ ৭/১৩৬-১৩৭

শ্রীনিবাস আচার্য্য শ্রীকৃষ্ণবল্লভকে নিয়ে শীঘ্র রাজভবনে এলেন। রাজা বীর হাম্বীর শ্রীআচার্য্যের দিব্য তেজোময় শ্রীঅঙ্গ দর্শন করে ভূমিতলে দণ্ডবৎ হয়া পড়লেন এবং বহু যত্ন করে তাঁকে উত্তম আসনে

বসিয়ে গন্ধ পুষ্প-মাল্যাদি প্রদান করলেন। অতঃপর শ্রীনিবাস আচার্য্য সুমধুর কণ্ঠে গুরু বন্দনাদি করে শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ করতে লাগলেন। আচার্য্যের কি অদ্ভুত শ্লোক উচ্চারণ এবং ব্যাখ্যা! তা শুনে সভাসদ্ সহ রাজা বীর হাম্বীর প্রেমার্দ্র হয়ে পড়লেন।

''দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ।'' মহাদস্যু দলপতি রাজা শ্রীনিবাস আচার্য্যকে দর্শন মাত্রই পবিত্র হলেন। বৈষ্ণব দর্শনে পবিত্রতা লাভ হয়। শ্রীনিবাস আচার্য্য ভাগবত পাঠ সমাপ্ত করে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন করলেন ও কিছুক্ষণ নৃত্যাদি সহ কীর্ত্তন করলেন। অনন্তর রাজা গলে বস্ত্র দিয়ে দৈন্যভরে শ্রীনিবাস আচার্য্যের শ্রীচরণ মূলে সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করলেন এবং বারংবার তাঁর কৃপা প্রার্থনা করতে লাগলেন। শ্রীআচার্য্য তাঁকে ধরে আলিঙ্গন করলেন। বললেন অচিরাৎ শ্রীগৌরসুন্দর তোমাকে কৃপা করবেন। তারপর রাজা গ্রন্থ সম্পুটসহ নিজেকে আচার্য্য পাদপদ্মে অর্পণ করলেন।

শ্রীনিবাস আচার্য্য শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের অসীম কৃপা-মাধুর্য্যের কথা বুঝতে পারলেন। তাঁর ইচ্ছায় সব কিছুই হচ্ছে প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পেলেন।

শ্রীনিবাস আচার্য্য গ্রন্থ সম্পুট ফিরে পেয়েছেন। এই খবর শীঘ্র তিনি শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট পাঠালেন। লোক মারফৎ নরোত্তম ও শ্যামানন্দকেও খবর পাঠালেন। শ্রীমদ্ জীব গোস্বামী ও অন্যান্য গোস্বামিগণ সব শুনে পরম আশ্চর্য্য ও আনন্দিত হলেন।

### বিবাহ লীলা

একদিন নরহরি সরকার ঠাকুর শ্রীনিবাস আচার্য্যকে বললেন, তোমার মা তোমাকে বিবাহ দেবার জন্য ব্যাকুল হয়েছেন, অতএব তুমি বিবাহ কর। শ্রীনিবাস আচার্য্য এর পূর্বে বিবাহের জন্য স্বপ্নের মাধ্যমে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর থেকেও আদেশ পেয়েছিলেন। তাই নিজের ইচ্ছা না থাকলেও জননী, নরহরি সরকার ঠাকুর ও অদ্বৈত আচার্য্যের আদেশকে মান্যতা দিয়ে তিনি যাজীগ্রাম নিবাসী শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তীর কন্যা 'ঈশ্বরীকে' (মতান্তরে দ্রৌপদীকে) বিবাহ করলেন। বৈশাখ মাসের অক্ষয় তৃতীয়ায় শ্রীনিবাস আচার্য্যের বিবাহ কর্ম্ম সম্পন্ন হয়। কেউ কেউ বলেন, আচার্য্যের পত্নীর পূর্ব নাম ছিল দ্রৌপদী, বিবাহের পর নাম হয় ঈশ্বরী। পরবর্ত্তীতে শ্রীনিবাস আচার্য্যের শ্বশুর গোপাল চক্রবর্ত্তী ও তাঁর দুই পুত্র শ্যামদাস ও রামচন্দ্র তাঁর থেকে দীক্ষা নেন। মহাপ্রভুর ভক্তগণের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝা খুব কঠিন। ভক্ত ও ভগবানে একান্ত শরণাগত ব্যক্তিই তা বুঝতে পারে।

### জীব উদ্ধার লীলা

রাজা বীরহাম্বীর ও তাঁর পরিজনবর্গ সকলেই শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর থেকে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। দীক্ষিত হয়ে রাজা কায়-মন-বাক্যে গুরুসেবা করতে লাগলেন। বীর হাম্বীরের দীক্ষা নাম হল 'শ্রীচৈতন্যদাস'।

শ্রীনিবাস আচার্য্য রাজার থেকে বিদায় নিয়ে গ্রন্থ সম্পুটসহ যাজিগ্রামে এলেন এবং তত্রস্থ ভক্তগণের কাছে সমস্ত কথা বললেন। বৈষ্ণবগণ শুনে সকলেই পরম সুখী হলেন। এই সময় তিনি শ্রীনবদ্বীপে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর অন্তর্দ্ধান বার্ত্তা শুনলেন। বিষাদে শ্রীনিবাস আচার্য্য ভূতলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। ভক্তগণ বহু প্রবোধ বাক্যে শ্রীআচার্য্যকে একটু স্থির করালেন। এমন সময় শ্রীখণ্ড হতে শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের আহ্বান পত্র এল। শ্রীআচার্য্য বিলম্ব না করে শ্রীখণ্ডে যাত্রা করলেন। শ্রীআচার্য্যকে দর্শন করে শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর, শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর প্রভৃতি প্রভুর পার্ষদগণ বড় সুখী হলেন। শ্রীআচার্য্য পার্ষদগণের শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ

বন্দনা-পূর্ব্বক তাঁদের নিকট শ্রীবৃন্দাবন ধামবাসী গোস্বামী সমূহের সংবাদ বললেন।

একদিন শ্রীনিবাস আচার্য্য যাজিগ্রামে স্বীয় গৃহে ভক্তগণ সঙ্গে বসে ভগবদ্ কথা বলছেন। এমন সময় তাঁর গৃহের পাশ দিয়ে গৌরপার্ষদ শ্রীচিরঞ্জীব সেনের পুত্র শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ বিবাহ করে নব বধূ নিয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করছেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য দূর থেকে তাঁকে দেখলেন, শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজও দূর থেকে শ্রীআচার্য্যকে দর্শন করলেন। পরস্পরের দর্শনে নিত্যসিদ্ধ সৌহার্দ্যভাব যেন তখন থেকেই জেগে উঠল। দর্শনের পর মিলনের আকাঙ্ক্ষা উভয়ের হতে লাগল। শ্রীনিবাস আচার্য্য লোকমুখে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের পরিচয় নিলেন। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজও শ্রীনিবাস আচার্য্যের পরিচয় নিলেন।

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ নব বধূ সঙ্গে গৃহে এলেন। কোন রকমে দিনটা কাটালেন। রাত্রিকালে গৃহ থেকে বের হয়ে যাজি গ্রামে এসে কোন এক ব্রাহ্মণ গৃহে রাত্রি যাপন করলেন। প্রাতঃকালে শ্রীনিবাস আচার্য্যের গৃহে এলেন এবং তাঁর চরণে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন। আচার্য্য শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজকে ভূমি থেকে উঠিয়ে দৃঢ় আলিঙ্গন করলেন এবং বললেন—''জন্মে জন্মে তুমি আমার বান্ধব। বিধাতা সদয় হয়ে আজ পুনঃ মিলিয়ে দিয়েছেন। মিলনে উভয়ের খুব আনন্দ হল। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের অগাধ পাণ্ডিত্য প্রতিভা জেনে আচার্য্য অতিশয় সুখী হলেন। তিনি যখন তাঁকে গোস্বামী গ্রন্থ শ্রবণ করাতে লাগলেন। কয়েকদিন পরে আচার্য্য তাঁকে শ্রীরাধা-কৃষ্ণ যুগল মন্ত্রে দীক্ষিত করলেন।

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু রামচন্দ্রের কবিত্বে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে 'কবিরাজ' উপাধি প্রদান করেছিলেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের সাথে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর লিখেছেন—

''দয়া কর শ্রীআচার্য্য প্রভু শ্রীনিবাস।
রামচন্দ্র সঙ্গ মাগে নরোত্তম দাস।।''

শ্রীনিবাস আচার্য্য ও শ্রীনরোত্তম ঠাকুর শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজকে সঙ্গে নিয়ে নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা করেছিলেন।

শ্রীল শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীল দাস গদাধর, শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর ও দ্বিজ হরিদাস আচার্য্য অপ্রকট হলে শ্রীনিবাস আচার্য্য পুনরায় বিরহ ব্যাকুল হয়ে বৃন্দাবনে গেলেন। সেখানে শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী, শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামী, শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী ও শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামীর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। গোস্বামীগণের স্নেহপূর্ণ মধুর বাক্যে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর বিরহ সন্তপ্ত হৃদয় শীতল হয়। সেসময় শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুও ব্রজে গিয়েছিলেন। তাঁদের সাথে শ্রীনিবাস আচার্য্যের সাক্ষাৎ হয়েছিল। বৃন্দাবন থেকে প্রত্যাবর্ত্তনের পর শ্রীনিবাস আচার্য্য কাটোয়ায় শ্রীল দাস গদাধরের, শ্রীখণ্ডে শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের এবং কাঞ্চনগড়িয়াতে দ্বিজ হরিদাস আচার্য্যের বিরহ মহোৎসবে যোগ দিয়েছিলেন।

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর নির্দ্দেশে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বৃন্দাবন হতে খেতরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সেসময় ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে খেতরীর মন্দিরে সংকীর্ত্তন সহযোগে শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবল্লভীকান্ত, শ্রীব্রজমোহন, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধাকান্ত ও শ্রীরাধারমণ সেবা প্রকটিত হন। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু বিগ্রহগণের মহা-অভিষেক ও পূজা সম্পন্ন করেছিলেন। ঐ অনুষ্ঠানে নিত্যানন্দ শক্তি জাহ্নবা মাতা উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুর অপ্রকট হয়ে গেলে শ্রীনিবাস পুনরায় বিরহ সাগরে নিমজ্জিত হলেন।

শ্রীখণ্ডে গিয়ে বিরহ মহোৎসবে যোগদান করলেন। তারপর যাজিগ্রামে ফিরে এলেন। কিছুদিন পরে তিনি বনবিষ্ণুপুরে পৌঁছলেন। রাজা বীরহাম্বীর ও তাঁর পরিজনবর্গ শ্রীনিবাস আচার্য্যকে দর্শন করে পরম আনন্দিত হলেন। সেখানেই মহাপ্রভু শ্রীনিবাস আচার্য্যকে স্বপ্নে আদেশ দিলেন,–রাঢ়দেশের অন্তর্গত গোকুলপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীরাঘব চক্রবর্ত্তীর কন্যা শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয়া দেবীকে বিবাহ করার জন্য। এদিকে শ্রীরাঘব চক্রবর্ত্তী ও তাঁর পত্নী মাধবী দেবীও তাঁদের কন্যাকে বিবাহ দেবার জন্য সৎপাত্রের অনুসন্ধান করছিলেন। মহাপ্রভু তাঁদেরকেও স্বপ্নে আদেশ করলেন শ্রীনিবাস আচার্য্যকে কন্যা সমর্পন করতে। রাজা বীরহাম্বীর মহা সমারোহে শ্রীনিবাস আচার্য্যের বিবাহের আয়োজন করলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করলেন। তাঁর তিনটি কন্যা ও তিনটি পুত্র হয়। পুত্রদের নাম বৃন্দাবন বল্লভ, রাধাকৃষ্ণ ও শ্রীগতিগোবিন্দ। কন্যাদের নাম--কৃষ্ণপ্রিয়া, হেমলতা ও ফুলপি ঠাকুরাণী। তাঁর বংশধরগণ এখনও মুর্শিদাবাদের মানিক্যহার গ্রামে বসবাস করছেন। শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর গানের সুরের নাম ছিল 'মনোহরসাহী'।

**।। জয় শ্রীনিবাস আচার্য্য কি জয়।।**

# শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর

### জন্ম ও বিদ্যালাভ

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর কৃষ্ণলীলায় 'চম্পক মঞ্জরী' ছিলেন। তিনি বর্তমান বাংলাদেশের রাজশাহীর অন্তর্গত গোপালপুর নগরে পদ্মানদীর তটে খেতুরীধামে আবির্ভূত হন।

মাঘী পূর্ণিমায় জন্মিলেন নরোত্তম।
দিনে দিনে বৃদ্ধি হইলেন চন্দ্রসময়।।

ভঃ রঃ ১/২৮১

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর যেই তিথিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, সেই মাঘীপূর্ণিমার দিন প্রথম কলিযুগ প্রবৃত্ত হয়। এই তিথিতে পূণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান অনন্ত ফলদায়ক।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের পিতার নাম শ্রীকৃষ্ণানন্দ দত্ত এবং মাতার নাম শ্রীনারায়ণী দেবী। কৃষ্ণানন্দ দত্ত গোপালপুর পরগনার রাজা ছিলেন। রাজা কৃষ্ণানন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন শ্রীপুরুষোত্তম দত্ত। তাঁর পুত্রের নাম শ্রীসন্তোষ দত্ত।

শিশু নরোত্তম রাজপ্রাসাদে দিন দিন শশীকলার ন্যায় বাড়তে লাগল। মহাপুরুষের লক্ষণ সমূহ তাঁর শরীরে বর্ত্তমান। পুত্র দর্শনের জন্য রাজপ্রাসাদে সর্ব সময় লোকজনের ভিড় লেগেই থাকত। ক্রমে অন্নপ্রাশন ও চূড়াকরণাদি হল। পুত্রের কল্যাণের জন্য রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্ত বহু দান-ধ্যান করলেন। নারায়ণী দেবী অপূর্ব্ব পুত্র পেয়ে আনন্দ সাগরে ভাসতে লাগলেন। ক্রমে নরোত্তমের হাতে খড়ি হল। বালক যে বর্ণ গুরুর মুখ থেকে একবার শুনতেন সঙ্গে সঙ্গে তা কণ্ঠস্থ করে ফেলতেন। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি ব্যাকরণ, কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী হলেন। পণ্ডিতের কাছে কিছুদিন দর্শন শাস্ত্রও অধ্যয়ন করলেন।

## গৃহ ত্যাগ

শ্রীনরোত্তম দত্তের মন দিনের পর দিন সংসারের প্রতি উদাসীন হতে লাগল। তিনি ধীরে ধীরে রাজ ঐশ্বর্যের প্রতি আসক্তিহীন হয়ে পড়লেন। ভক্তদের মুখ থেকে গৌর নিত্যানন্দের মহিমা শুনে আকৃষ্ট হয়ে গেলেন। শ্রীগৌর নিত্যানন্দের নাম করতে করতে পাগল প্রায় হলেন। দয়াময় গৌরসুন্দর একদিন সপার্ষদে নরোত্তমকে স্বপ্নে দর্শন দিলেন।

''শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দাদ্বৈতগণে।
করয়ে বিজ্ঞপ্তি অশ্রু ঝরে দুনয়নে।।
স্বপ্নচ্ছলে প্রভু গণসহ দেখা দিয়া।
প্রিয় নরোত্তমে স্থির করিল প্রবোধিয়া।।

ভঃ রঃ ১/২৮৫-২৮৬

অতঃপর শ্রীনরোত্তম সংসার ত্যাগ করার জন্য দিন রাত ভাবতে লাগলেন।

হরি! হরি! কবে হব বৃন্দাবনবাসী।
নয়নে নিরখিব যুগল রূপরাশি।।

কৃষ্ণানন্দ দত্ত পুত্রের ভাব দেখে কয়েকজন রক্ষক নিযুক্ত করলেন যাতে সে কোনভাবেই গৃহ ছেড়ে পালাতে না পারে। একদিন তিনি রাজকার্য্যে বাইরে গেলেন। নরোত্তম দেখলেন, এই সুযোগ। কোনরকমে মাতাকে বুঝিয়ে রক্ষককে ভুলিয়ে কার্ত্তিক পূর্ণিমা তিথিতে সংসার ত্যাগ করলেন।

প্রেমবিলাস গ্রন্থে বর্ণনা আছে–

''মহাপ্রভু কানাইর নাটশালায় এসে আনন্দে নৃত্য কীর্ত্তন করতে করতে হঠাৎ 'নরোত্তম', 'নরোত্তম' বলে ডাকতে লাগলেন। নিত্যানন্দ প্রভু জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রভু কি হল তোমার? হঠাৎ এই নাম ধরে ডাকছ কেন'? মহাপ্রভু বললেন, ''শ্রীপাদ! তোমার মহিমা তুমি নিজেই জান না। নীলাচলে যাওয়ার সময় তুমি প্রেমে দিনের পর দিন অনেক কেঁদেছিলে, আমি তা বেঁধে রেখেছি। আজ সেই প্রেম আমি পদ্মার কাছে গচ্ছিত রেখে যাব নরোত্তমকে দেওয়ার জন্য।'' তারপর মহাপ্রভু নরোত্তমকে প্রেম দেওয়ার জন্য কুতুবপুরে এসে পদ্মা-নদীতে স্নান করে অনেক নৃত্য-কীর্ত্তন করলেন। পদ্মাকে বললেন, 'এই প্রেম নাও, গোপনে রেখে দেবে। নরোত্তম এলে তাঁকে দেবে।'' পদ্মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি করে বুঝব যে নরোত্তম এসেছে? আমি তো তাঁকে চিনি না।' মহাপ্রভু উত্তরে বললেন,–

যাঁহার পরশে তুমি অধিক উছলিবা।
সেই নরোত্তম, প্রেম তাঁরে তুমি দিবা।।

মহাপ্রভু যেই স্থানে নরোত্তমের জন্য প্রেম রেখেছিলেন, পরবর্তীকালের সেই স্থানের নাম হয় 'প্রেমতলী'। নরোত্তমের বয়স যখন ১২ বছর, তখন একদিন নিত্যানন্দ প্রভু তাঁকে স্বপ্নে দর্শন দিলেন। আদেশ করলেন, পদ্মায় গিয়ে প্রেম নিয়ে আসতে। নিত্যানন্দ প্রভুর স্বপ্নাদেশে শ্রীনরোত্তম একদিন একাই পদ্মানদীতে গিয়ে স্নান করলেন। নরোত্তমের স্পর্শে পদ্মা অধিক উছলাতে আরম্ভ করলেন। বুঝলেন ইনিই নরোত্তম। মহাপ্রভুর গচ্ছিত প্রেম তাঁকে প্রদান করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভাব, বর্ণ সবই পরিবর্তন হয়ে গেল। নরোত্তমের প্রেমবিকার দেখে তাঁর পিতামাতা তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু গৌর-নিত্যানন্দের প্রেম প্রাপ্ত হয়ে নরোত্তমের মন বৃন্দাবনের দিকে ধাবিত হতে লাগল। একদিন সুযোগ বুঝে গৃহ থেকে বেড়িয়ে পড়লেন।

## বৃন্দাবন গমন

শ্রীনরোত্তম আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করে নগ্ন পদে ছুটেছেন বৃন্দাবনের দিকে। বৃন্দাবনে পৌঁছে একটি বৃক্ষের নীচে গিয়ে অচেতন হয়ে পড়লেন। এমন সময় একজন গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণ বালক একভাণ্ড দুধ দিয়ে মধুর স্বরে বললেন,–নরোত্তম! এই দুধ পান কর। তোমার সব ক্লান্তি দূর হবে। এই বলে বালক

অদৃশ্য হয়ে গেল। নরোত্তম দুধ পান করলেন। তাঁর সমস্ত ক্লান্তি দূর হল। শ্রীরূপ-সনাতনের সাথে নরোত্তমের সাক্ষাৎ হল। তাঁরা পরম স্নেহে নরোত্তমকে চৈতন্য মহাপ্রভুর আনীত দুধ পান করালেন। নরোত্তমের সমস্ত ক্লেশ দূর হল। নরোত্তম ঠাকুরের আবির্ভাব মাঘী পূর্ণিমায়, সংসার ত্যাগ করেন কার্ত্তিক পূর্ণিমায় এবং লোকনাথ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন শ্রাবণ পূর্ণিমায়। কেউ কেউ বলে থাকেন, নরোত্তম ঠাকুর পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠতাত শ্রীপুরুষোত্তম দত্তের পুত্র সন্তোষ দত্তের উপর রাজ্যভার অর্পণ করে বৃন্দাবন গিয়েছিলেন।

''শ্রীনরোত্তমের ক্রিয়া কহিতে কি পারি।
সর্ব্বতীর্থদর্শী আকুমার ব্রহ্মচারী।।''

ভঃ রঃ ১/২৭৮

**দীক্ষা**

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বারা আদিষ্ট হয়ে সর্বপ্রথম শ্রীলোকনাথ গোস্বামী শ্রীভূগর্ভ গোস্বামীকে সাথে নিয়ে বৃন্দাবনে আসেন। অনেকেই তাঁকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ শিষ্য মনে করেন। তিনি তীব্র বৈরাগ্যের সাথে বৃন্দাবনে ভজন আরম্ভ করেন। তিনি বিবিক্তানন্দী বৈষ্ণব ছিলেন। কাউকেও শিষ্য করবেন না এরূপ সঙ্কল্প করেছিলেন কিন্তু শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর সঙ্কল্প করেছিলেন, তিনি লোকনাথ গোস্বামীর নিকট থেকে দীক্ষা গ্রহণ করবেন। একদিন তিনি শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর চরণ বন্দনা করলেন। শ্রীলোকনাথ গোস্বামী জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? নরোত্তম বললেন, 'আমি আপনার দাস। আপনার শ্রীচরণ সেবাকাঙ্ক্ষী। আপনার শিষ্য হতে চাই'। শ্রীলোকনাথ গোস্বামী বললেন, আমি নিজেই শিষ্য হতে পারলাম না, তোমাকে কি শিষ্য করব। তুমি অন্য কোন গুরুর সন্ধান কর। কিন্তু নরোত্তম দৃঢ় সঙ্কল্প করেছেন। দীক্ষা তিনি শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর থেকেই নেবেন। তাই তাঁর কৃপা লাভের জন্য প্রতিদিন মধ্যরাত্রে বাহ্য কৃত্যের স্থানটি পরিস্কার করে রাখতেন। প্রেমবিলাস গ্রন্থে বর্ণনা আছে–

'যে স্থানে গোসাঞি জীউ যান বহির্দ্দেশ।
সেই স্থানে যাই করেন সংস্কার বিশেষ।।
মৃত্তিকার শৌচের লাগি মাটি ছানি আনে।
নিত্য নিত্য এইমত করেন সেবনে।।
ঝাটাগাঠি পুতি রাখে মাটির ভিতরে।
বাহির করি' সেবা করে আনন্দ অন্তরে।।
আপনাকে ধন্য মানে, শরীর সফল।
প্রভুর চরণ প্রান্তে এই মোর বল।।
কহিতে কহিতে কাঁদে ঝাটা বুকে দিয়া।
পাঁচ সাত ধারা বহে হৃদয় ভাসিয়া।।'

লোকনাথ গোস্বামী চিন্তা করলেন, কে প্রতিদিন বাহ্যকৃত্যের স্থানটি পরিস্কার ও দুর্গন্ধমুক্ত করে। একদিন তিনি শৌচস্থানের নিকটে লুকিয়ে রইলেন। দেখলেন মাঝরাতে কেউ একজন এসেছে। কাছে গিয়ে দেখলেন রাজপুত্র নরোত্তম। নরোত্তম শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর চরণে লুটিয়ে পড়লেন। নরোত্তমের দৈন্য আর্ত্তি দেখে শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী তাঁকে দীক্ষা প্রদান করলেন।

''হেনই সময়ে নরোত্তম তথা গিয়া।
গুরুসেবা যথোচিত কৈলা হর্ষ হৈয়া।।
সেবায় প্রসন্ন হৈয়া দীক্ষা মন্ত্র দিল।
নরোত্তমে কৃপার অবধি প্রকাশিল।।''

–ভক্তিরত্নাকর ১/৩৪৫-৩৪৬

'কিবা নব্য যৌবন সে পরম সুন্দর।
কার্ত্তিক পূর্ণিমাদিনে ছাড়িলেন ঘর।।
ভ্রমিয়া অনেক তীর্থ বৃন্দাবন গেলা।
লোকনাথ গোস্বামীর স্থানে শিষ্য হৈলা।।

শ্রাবণ মাসের পৌর্ণমাসী শুভক্ষণে।
করিলেন শিষ্য লোকনাথ নরোত্তমে।।”

—ভক্তিরত্নাকর ১/২৯২-২৯৪

শ্রীল নরোত্তম মাধুকরী করে খেতেন এবং শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট গোস্বামী গ্রন্থ অধ্যয়ন করতেন। শ্রীরূপ সনাতন আদির অপ্রকটের পর শ্রীজীব গোস্বামী 'বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার' শ্রেষ্ঠ পাত্ররাজ হয়েছিলেন। তিনি শ্রীনিবাসকে 'আচার্য্য', নরোত্তমকে 'ঠাকুর' এবং দুঃখী কৃষ্ণদাসকে 'শ্যামানন্দ' নাম প্রদান করে যাবতীয় গোস্বামী শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়ে যাবতীয় শাস্ত্রসহ গৌড়দেশে নাম প্রেম বিতরণ করার জন্য প্রেরণ করেন। তাঁরা তিনজনে যখন গ্রন্থের সম্পূট নিয়ে বনবিষ্ণুপুরে প্রবেশ করলেন তখন সেখানকার রাজা দস্যু দলপতি বীর হাম্বীর গ্রন্থের সম্পূট চুরি করলেন। ঘটনাটি এই গ্রন্থের ৪১৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু উৎকল অভিমুখে এবং শ্রীনরোত্তম ঠাকুর খেতরির দিকে যাত্রা করলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য গ্রন্থ সম্পূট উদ্ধার করার ইচ্ছায় বনবিষ্ণুপুরে অবস্থান করতে লাগলেন।

**খেতরী গমন**

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের খেতরী যাওয়া নিয়ে একটি বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় লক্ষিত হয়। নরোত্তম ঠাকুরের মধ্যে রাজোচিত সামাজিক রীতিনীতির অনুকূল ব্যবহার দেখে লোকনাথ গোস্বামী তাঁকে পূর্বাশ্রম খেতরীতে চলে যেতে আদেশ করেন। এখানে দুটি কারণ রয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ বিরক্ত বৈষ্ণবের ভজনাদর্শ কিরকম হওয়া উচিৎ সেই শিক্ষা দেওয়া। আর দ্বিতীয়টি উত্তরবঙ্গের কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবদের আত্যন্তিক কল্যাণ করা। বনবিষ্ণুপুরে গ্রন্থ সম্পূট চুরি হয়ে গেলে শ্রীনিবাস আচার্য্যও লোকনাথ গোস্বামীর অভিপ্রায় জেনে নরোত্তম ঠাকুরকে উত্তরবঙ্গে প্রচারে যেতে বলেছিলেন—

“খেতরী গ্রামেতে শীঘ্র করিয়া গমন।
প্রভু লোকনাথ আজ্ঞা করহ পালন।।”

ভঃ রঃ ৭/১১৯

ভজনানন্দী বৈষ্ণবগণ অপ্রাকৃত ভূমিকায় শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সেবায় নিযুক্ত থাকাকালে কখনই মায়াবদ্ধ জীবের সাংসারিক উন্নতি-মূলক কাজে রুচি দেখান না। “শ্রীকৃষ্ণের সেবাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য—এই ভাবের ব্যতিক্রম ঘটলেই জাগতিক কল্যাণকর কার্য্যে রুচি হয়” 'ঝি' কে মেরে 'বৌ'কে শিক্ষা দেওয়ার ন্যায় লোকনাথ গোস্বামী নিজ প্রিয় শিষ্য নরোত্তমকে দিয়ে জগৎ' বাসীকে শিক্ষা দিলেন। নরোত্তম ঠাকুর গুরুদেবের আদেশকে শিরোধার্য্য করে খেতরীতে এসে শুদ্ধ প্রেম-ভক্তির বাণী প্রচার করে উত্তরবঙ্গ নিবাসী ভক্তগণের কল্যাণ করলেন। তিনি আক্ষেপ করে লিখেছেন—

“অনেক দুঃখের পরে, ল'য়েছিলে ব্রজপুরে,
কৃপা-ডোর গলায় বান্ধিয়া।
দৈব-মায়া বলাৎকারে, খসাইয়া সেই ডোরে,
ভবকূপে দিলেক ডারিয়া।।
পুনঃ যদি কৃপা করি', এজনারে কেশে ধরি',
টানিয়া তুলহ ব্রজধামে।
তবে সে দেখিয়ে ভাল, নতুবা পরাণ গেল,
কহে দীন দাস নরোত্তমে।।

**গৌরমণ্ডল দর্শন**

শ্রীনরোত্তম মহাপ্রভুর জন্ম-স্থান দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়ে শীঘ্র নবদ্বীপে এলেন। হা গৌর হরি, হা গৌর হরি বলে গঙ্গা তটে তিনি শত শত বার বন্দনা করতে লাগলেন। একটি বৃক্ষতলে উপবেশন করলেন এবং কোথায় প্রভুর জন্ম স্থান? কি করে দর্শন পাবেন ভাবতে লাগলেন, এমন সময় অতিবৃদ্ধ এক জন ব্রাহ্মণ তথায় আগমন করলেন।

শ্রীনরোত্তম উঠে ব্রাহ্মণকে প্রণাম করলেন। ব্রাহ্মণ বললেন—বাবা কোথা থেকে এসেছ? কি নাম? শ্রীনরোত্তম নিজ পরিচয় দিয়ে শ্রীগৌরসুন্দরের জন্ম স্থান দর্শনের ইচ্ছা নিয়ে এসেছেন বললেন।

ব্রাহ্মণ বললেন,—আহা, আজ প্রাণ শীতল হল। গৌরের প্রিয় ভক্তের দর্শন পেলাম।

শ্রীনরোত্তম—বাবা! আপনি শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন পেয়েছিলেন?

ব্রাহ্মণ—কি বলব বাবা! শ্রীনিমাই প্রতিদিন এই ঘাটে বসে শিষ্যগণসহ শাস্ত্র চর্চ্চা করতেন। দূর থেকে আমরা তখন তাঁর কি অপূর্ব্ব রূপ দেখতাম, আজও সেই রূপ স্মরণ করে এই বৃক্ষ তলে প্রতিদিন একবার করে আসি। ব্রাহ্মণ বলতে বলতে অশ্রু জলে ভাসতে লাগলেন।

শ্রীনরোত্তম—বাবা! আজ আপনার চরণ দর্শন করে জীবন ধন্য হল! এ বলে অশ্রুপূর্ণ নয়নে শ্রীনরোত্তম ব্রাহ্মণের চরণ তলে লুটিয়ে পড়লেন।

ব্রাহ্মণ—বাবা! আমি আশীর্ব্বাদ করছি, তুমি গোবিন্দ চরণে ভক্তি লাভ কর। গৌর-গেবিন্দের কথা সর্ব্বত্র প্রচার কর।

অতঃপর ব্রাহ্মণ নরোত্তম দাসকে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহে যাবার পথ দেখিয়ে দিলেন। শ্রীনরোত্তম সে পথ দিয়ে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ভবনে গমন করলেন। অশ্রুপূর্ণ নয়নে তিনি মিশ্র গৃহের দ্বার দেশে সাষ্টাঙ্গ বন্দনাপূর্ব্বক ক্রন্দন করতে লাগলেন। অনন্তর ভবনে প্রবেশ করে শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর চরণ দর্শন পেলেন। নরোত্তম তাঁর শ্রীচরণ বন্দনা করলেন। অনুমানে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী বুঝতে পারলেন ইনি গৌরসুন্দরের কোন কৃপা পাত্র।

শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কে?

শ্রীনরোত্তম ঠাকুর নিজ পরিচয় দিয়ে বললেন বর্ত্তমানে শ্রীব্রজ ধাম, শ্রীজীব গোস্বামী ও শ্রীলোকনাথ গোস্বামী প্রভৃতির সন্নিকট থেকে এসেছি।

শ্রীশুক্লাম্বর—বাবা তুমি ব্রজে শ্রীলোকনাথ ও শ্রীজীবের থেকে এসেছ? এ বলে উঠে নরোত্তম দাসকে দৃঢ় আলিঙ্গন করলেন। অনন্তর তিনি যাবতীয় গোস্বামীগণের কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারীর নিকট ব্রজের যাবতীয় সংবাদ যথাযথ বর্ণনা করলেন। অনন্তর শ্রীনরোত্তম শচীমাতার সেবক—অতিবৃদ্ধ শ্রীঈশান ঠাকুরের চরণ বন্দনা করলেন এবং স্বীয় পরিচয় প্রদান করলেন। শ্রীঈশান ঠাকুর তাঁর শির স্পর্শ করে আশীর্ব্বাদ করতে করতে স্নেহে আলিঙ্গন করলেন। তথায় শ্রীদামোদর পণ্ডিতকেও নরোত্তম বন্দনা করলেন।

তারপর শ্রীনরোত্তম শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে এসে শ্রীপতি ও শ্রীনিধি পণ্ডিতকে বন্দনা করলেন। তাঁরা স্নেহ ভরে শ্রীনরোত্তমকে আলিঙ্গন করলেন। কয়েকদিন নবদ্বীপ মায়াপুরে থাকার পর শ্রীনরোত্তম শান্তিপুরে অদ্বৈত ভবনে এলেন ও শ্রীঅচ্যুতানন্দের চরণ বন্দনা করলেন। পরিচয় পেয়ে শ্রীঅচ্যুতানন্দ সাদরে তাঁকে আলিঙ্গন এবং ব্রজে গোস্বামীদিগের কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করলেন। শান্তিপুরে নরোত্তম দাস দুই দিন অবস্থানের পর অম্বিকা কালনায় শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের ভবনে এলেন। তখন শ্রীহৃদয় চৈতন্য প্রভু তথায় অবস্থান করছেন। তিনি গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য। শ্রীনরোত্তম শ্রীহৃদয় চৈতন্য প্রভুকে বন্দনা করলেন। সাদরে হৃদয় চৈতন্য প্রভু নরোত্তম দাসকে ধরে আলিঙ্গন পূর্ব্বক উপবেশন করলেন এবং ব্রজের গোস্বামিগণের সন্দেশ নিতে লাগলেন। একদিন অম্বিকা কালনাতে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর থাকবার পর গঙ্গা, যমুনা ও

সরস্বতীর মিলনস্থলী সপ্তগ্রামে এলেন। এ স্থানে শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর থাকতেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় সপ্তগ্রাম-বাসীরা পরম ভক্ত হন। শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের অপ্রকটের পর সপ্তগ্রাম অন্ধকারময় হয়। শ্রীনরোত্তম উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের গৃহে গমন করলেন। সেখানে যে কয়েকজন ভক্ত আছেন প্রভু বিরহে অতি দুঃখে তাঁরা দিন যাপন করছেন। শ্রীনরোত্তম দাস বৈষ্ণবগণকে বন্দনা করে সেখান থেকে হতে খড়দহ গ্রামে এলেন।

খড়দহ গ্রামে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অবস্থান করতেন। তাঁর শক্তিদ্বয় শ্রীবসুধা ও জাহ্নবা দেবী তথায় অবস্থান করছেন। শ্রীনরোত্তম নিত্যানন্দ ভবনে এসে অঙ্গনে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নাম স্মরণ পূর্ব্বক গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। শ্রীপরমেশ্বরী দাস ঠাকুর শ্রীনরোত্তম দাসকে অন্তঃপুরে শ্রীবসুধা জাহ্নবা মাতার শ্রীচরণে নিলেন। তাঁরা নরোত্তম দাসের পরিচয় এবং শ্রীজীব ও শ্রীলোকনাথের পরম কৃপা পাত্র শুনে খুব অনুগ্রহ করলেন।

সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞাতা বসু জাহ্নবা ঈশ্বরী।
অনুগ্রহ কৈল যত কহিতে না পারি।।

—ভঃ রঃ ৮/২১২

চার দিন শ্রীনরোত্তম দাস খড়দহ গ্রামে কৃষ্ণ-কথা আনন্দে অবস্থান করবার পর শ্রীবসুধা-জাহ্নবা মাতার থেকে বিদায় নিয়ে খানাকুল কৃষ্ণনগর শ্রীঅভিরাম গোপাল ঠাকুরের আলয়ে গেলেন। শ্রীনরোত্তম দাস তাঁর শ্রীচরণ বন্দনা করলেন। তিনি শ্রীগৌর নিত্যানন্দ বিরহে অতি কষ্টে দিন যাপন করছেন। বাহ্য দশা প্রায় সময় থাকে না। শ্রীনরোত্তম তাঁর এরূপ দশা দেখে বহু ক্রন্দন করলেন। অভিরাম ঠাকুরের শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ অপূর্ব্ব দর্শন। নরোত্তম দাস বিগ্রহ দর্শন করে বহু স্তব-স্তুতি করলেন। এক দিন অভিরাম গোপাল ভবনে অবস্থানের পর তাঁর অনুমতি নিয়ে নরোত্তম দাস শ্রীনীলাচল অভিমুখে যাত্রা করলেন।

**নীলাচল গমন**

শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর প্রভু-পরিকরগণের স্মরণ করতে করতে শীঘ্র নীলাচলে এলেন। শ্রীগোপীনাথ আচার্য্য প্রভৃতি ভক্তগণ শ্রীনরোত্তমের পথ নিরীক্ষণ করছিলেন। এমন সময় শ্রীনরোত্তম উপস্থিত হলেন। নরোত্তম শ্রীগোপীনাথ আচার্য্যের চরণে দণ্ডবৎ করতেই আচার্য্য তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন—অদ্য তুমি আসবে আমাদের মনে হচ্ছিল। শ্রীনরোত্তম ব্রজবাসী ও গৌড় দেশবাসী ভক্তগণের যাবতীয় সংবাদ প্রদান করলেন।

ভক্তগণ নরোত্তম দাসকে পেয়ে পরম সুখী হলেন, তাঁকে নিয়ে শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শনে গেলেন। শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলরাম ও শ্রীসুভদ্রা দেবীকে দর্শন করে নরোত্তম বহু স্তব-স্তুতি-দণ্ডবৎ করতে লাগলেন। তারপর শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধি পীঠে এলেন। নরোত্তম প্রেমে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। সেখান থেকে শ্রীগদাধর পণ্ডিতের গৃহে আগমন করলেন। নরোত্তম হা গৌর প্রাণ গদাধর বলে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করতে লাগলেন। সেখানে শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ দর্শন পূর্ব্বক শ্রীমামু গোস্বামী ঠাকুরকে বন্দনা করলেন। তিনি তৎকালে গোপীনাথের সেবা করছিলেন।

তারপর শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুরের কাছে, গোপীনাথের অঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভু কিরূপে অন্তর্দ্ধান হন তা' ভক্তগণ বর্ণনা করেন।

ন্যাসি শিরোমণি চেষ্টা বুঝে সাধ্য কার।
অকস্মাৎ পৃথিবী করিলা অন্ধকার।।
প্রবেশিলা এই গোপীনাথের মন্দিরে।
হৈলা অদর্শন, পুনঃ ন আইলা বাহিরে।।

—ভঃ রঃ ৮/৩৫৭

শ্রীনরোত্তম শ্রবণ মাত্রই হা শচীনন্দন গৌরহরি বলে ভূতলে অচৈতন্য হলেন। ভক্তগণ নরোত্তমের বিরহ আকুলতা দেখে প্রেমে ক্রন্দন করতে লাগলেন।

অতঃপর শ্রীনরোত্তম কাশী মিশ্র ভবনে শ্রীগোপাল গুরু প্রভুর চরণ দর্শন ও শ্রীরাধাকান্ত বিগ্রহ দর্শনাদি করলেন। শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির দর্শনের পথে মহাপ্রভুর লীলাস্থলী জগন্নাথবল্লভ উদ্যান, নরেন্দ্র সরোবর প্রভৃতি দর্শন করলেন। তিনি কিছুদিন নীলাচলে ভক্তগণ সঙ্গে আনন্দে মহাপ্রভুর বিলাসস্থলী সকল দর্শন করলেন। অতঃপর ভক্তগণ থেকে বিদায় নিয়ে শ্রীনৃসিংহপুরে এলেন। এ স্থানে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু অবস্থান করছিলেন। বহুদিন পরে শ্রীনরোত্তম ঠাকুরকে দর্শন করে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু আনন্দ সাগরে ভাসতে লাগলেন। দুইজন প্রেম ভরে পরস্পরকে কত আলিঙ্গন করলেন।

শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু বহু আদর পূর্ব্বক শ্রীনরোত্তম ঠাকুরকে কয়েক দিন নৃসিংহপুরে রাখলেন। শ্রীনরোত্তমের শুভাগমনে শ্রীনৃসিংহপুরে সংকীর্ত্তন বন্যা প্রবাহিত হল। শ্রীশ্যামানন্দ ও শ্রীনরোত্তম উভয়ে শ্রীকৃষ্ণ কথানন্দে দিন রাত জ্ঞান রহিত হলেন। অনন্তর শ্রীনরোত্তম ঠাকুর শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু থেকে বিদায় নিয়ে গৌড় দেশাভিমুখে যাত্রা করলেন।

### পুনঃ গৌরদেশে ভ্রমণ

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর শীঘ্র শ্রীখণ্ডে এলেন। শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর ও শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করলেন। শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর শ্রীনরোত্তম দাসের পিতা শ্রীকৃষ্ণানন্দ দত্তকে ভালভাবে জানতেন। শ্রীনরোত্তম বন্দনা করতেই শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর তাঁর শিরে হাত দিয়ে প্রচুর আশীর্ব্বাদ করলেন। শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর নরোত্তম ঠাকুরকে বসিয়ে পুরী ধামের ভক্তগণের কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। নরোত্তম ঠাকুরের আগমনে শ্রীখণ্ড আনন্দময় হয়ে উঠল। নরোত্তম ঠাকুর কয়েকদিন শ্রীখণ্ডে ভক্ত সঙ্গে সংকীর্ত্তন নৃত্যাদি রঙ্গ সুখে যাপন করলেন।

শ্রীনরোত্তম শ্রীখণ্ডবাসী গৌর-পার্ষদগণের থেকে বিদায় নিয়ে কন্টক নগরে শ্রীগদাধর দাস ঠাকুরের ভবনে এলেন। গৃহাঙ্গনে দণ্ডবৎ করতেই শ্রীগদাধর দাস ঠাকুর তাঁকে কোলে তুলে নিলেন।

নরোত্তমে দেখিয়া শ্রীদাস গদাধর।
কোলে করি সিঞ্চে নেত্রজলে কলেবর।।

—ভঃ রঃ ৮/৪৪৮

শ্রীগদাধর দাস প্রভু শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ বিরহে দুঃখে দিন যাপন করছেন। নরোত্তম ঠাকুর দুই দিন তথায় অবস্থান করবার পর রাঢ় দেশে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মস্থান দর্শন করতে চললেন। নরোত্তম ঠাকুর একচক্রা গ্রামে এলেন এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মস্থান দর্শন করলেন। তথায় একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নরোত্তমকে স্নেহ করে শ্রীনিত্যানন্দের বিবিধ লীলাস্থলী দর্শন করালেন। হাড়াই পণ্ডিত ও শ্রীপদ্মাবতী দেবীর নাম স্মরণ করে নরোত্তম ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মস্থান দর্শন করার পর খেতরির দিকে যাত্রা করলেন।

খেতরি গ্রামের পথ জিজ্ঞাসি লোকেরে।
অতিশীঘ্র আইলেন পদ্মাবতী তীরে।।
পদ্মবতী পার হৈয়া খেতরি যাইতে।
আইলা গ্রামবাসীলোক আগুসরি নিতে।।

—ভঃ রঃ ৮/৪৬৮

বহুদিন পরে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর খেতরি গ্রামে শুভবিজয় করছেন শুনে আনন্দে খেতরিবাসীগণ তাঁকে অভ্যর্থনা করতে এলেন।

রাজা শ্রীকৃষ্ণানন্দ দত্ত ও শ্রীপুরুষোত্তম দত্ত

পরলোকে গমন করবার পর পুরুষোত্তম দত্তের পুত্র শ্রীসন্তোষ দত্ত বিষয় সম্পত্তি দেখাশুনা করতেন। তিনি সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন। বহুদিন পরে শ্রীনরোত্তম শুভাগমন করছেন শুনে আনন্দে তাঁকে বহু সম্মান পুরঃসর অভিনন্দন করে আনবার জন্য লোকজন সঙ্গে খেতরি গ্রামের বহির্দ্দেশে অপেক্ষা করছিলেন। অতঃপর দূর থেকে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়কে দর্শন করে দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন এবং অগ্রসর হয়ে আনন্দাশ্রু ফেলতে ফেলতে চরণ-ধূলি গ্রহণ করলেন। শ্রীনরোত্তম সন্তোষ দত্তকে স্নেহ ভরে কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করলেন।

অতঃপর কয়েক দিবস পর শ্রীসন্তোষ দত্ত শ্রীনরোত্তম ঠাকুর থেকে শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত হলেন। রাজা সন্তোষ দত্ত মন্দির নির্মাণ পূর্ব্বক শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করবার জন্য শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শ্রীচরণে প্রার্থনা জানালেন। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় সানন্দে অনুমতি প্রদান করলেন।

রাজা সন্তোষ দত্ত কয়েক মাসের মধ্যে বিশাল মন্দির, ভোগশালা, কীর্ত্তন মণ্ডপ, ভক্তগণের নিবাস-গৃহ 'সরোবর' পুষ্পোদ্যান ও অতিথিশালা প্রভৃতি নির্মাণ করলেন। ফাল্গুন পৌর্ণমাসী শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মোৎসব বাসরে মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা মহা মহোৎসবের, রাজসূয় যজ্ঞের ন্যায়, বিপুল আয়োজন আরম্ভ করলেন। দেশ-বিদেশে রাজা, জমিদার, কবি, পণ্ডিত, বৈষ্ণব ও সাহিত্যিক প্রভৃতিকে আমন্ত্রণ করবার জন্য আমন্ত্রণপত্র সহ লোক প্রেরণ করলেন। কয়েকজন সজ্জন ব্যক্তিকে পুরী, শ্রীখণ্ড, যাজিগ্রাম, শান্তিপুর, নবদ্বীপ, খড়দহ, কালনা প্রভৃতি স্থানের গৌরপার্ষদগণকে আমন্ত্রণ করতে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের পত্র সহ প্রেরণ করলেন। দেশ বিদেশে উত্তম উত্তম গায়ক ও বাদকগণকে আমন্ত্রণের জন্য কিছু লোক প্রেরণ করলেন। এককালে ছয়টী শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হবার উদ্যোগ চলতে লাগল।

### খেতরি মহোৎসব

বুধরিগ্রাম শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের গৃহের মহোৎসব সেরে ভক্তগণসহ শ্রীনিবাস আচার্য্য খেতরির মহোৎসবের অধিবাসের দুই দিন পূর্ব্বে খেতরিতে শুভাগমন করলেন। অধিবাসের এক দিন পূর্ব্বে উড়িষ্যার নৃসিংহপুর হতে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু, খড়দহ থেকে শ্রীজাহ্নবা মাতার সঙ্গে শ্রীপরমেশ্বরী দাস, কৃষ্ণদাস সরখেল, মাধব আচার্য্য, রঘুপতি বৈদ্য, মীনকেতন রামদাস, মুরারি চৈতন্যদাস, জ্ঞানদাস, মহীধর, শ্রীশঙ্কর, কমলাকর পিপ্পলাই, গৌরাঙ্গদাস, নকড়ি, কৃষ্ণদাস, দামোদর, বলরামদাস, শ্রীমুকুন্দ ও শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর এলেন। শ্রীখণ্ড থেকে রঘুনন্দন ও অন্যান্য ভক্তগণ, নবদ্বীপ থেকে শ্রীপতি, শ্রীনিধি প্রভৃতি, শান্তিপুর থেকে অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর পুত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দ শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র ও শ্রীগোপাল প্রভৃতি; অম্বিকা কালনা হতে শ্রীহৃদয়চৈতন্য প্রভু ও অন্যান্য বৈষ্ণবগণ খেতরি গ্রামে উপস্থিত হলেন। রাজা সন্তোষ দত্ত পদ্মাবতী নদী পারের জন্য বৃহৎ বৃহৎ নৌকা এবং পদ্মাবতী তট হতে খেতরি পর্য্যন্ত পাল্কী ও গো যান প্রভৃতির সুন্দর ব্যবস্থা করেছিলেন। শ্রীনরোত্তম, শ্রীনিবাস আচার্য্য ও রাজা সন্তোষ দত্ত বৈষ্ণবগণের অভিগমন পূর্ব্বক সাদরে বহু সম্মান পুরঃসর পুষ্প মাল্যাদি দিয়ে অভিনন্দন পূর্ব্বক আনয়ন করেন। বৈষ্ণবগণের থাকবার জন্য পৃথক গৃহ ও ভৃত্য প্রস্তুত ছিল। ভুবনপাবন বৈষ্ণবগণের পদধূলিতে খেতরিগ্রাম মহাতীর্থে পরিণত হল। শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তন কোলাহলে গগন পবন পূর্ণ হল।

শ্রীভগবদ্ মন্দির ও অন্যান্য গৃহের দ্বারে দ্বারে কদলী স্তম্ভ, মঙ্গলঘট, পাত্র মধ্যে মাঙ্গলিক দ্রব্য সমূহ, পত্র পুষ্পের বৃহৎ তোরণ সকল দ্বারে দ্বারে

ও সর্ব্বত্র স্বস্তিক চিহ্ন দ্বারা অপূর্ব্ব শোভা পাচ্ছিল। উৎসব মণ্ডপের কোন স্থানে পর্ব্বত প্রমাণ মৃৎভাণ্ড সকল, কোন স্থানে রজত পাত্র সকল, কোন স্থানে দুধের বৃহৎ বৃহৎ গাগরী, কোন স্থানে ঘৃতের গাগরী, কোন স্থানে সহস্র সহস্র ভাণ্ড দধি, কোন স্থানে উৎসবের তরিতরকারি পর্বত প্রমাণে শোভা পাচ্ছিল।

অধিবাস দিবসে বৈষ্ণবগণ শ্রীজাহ্নবা মাতার আদেশ নিয়ে শ্রীশ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার ও শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব মহা-মহোৎসবের অধিবাস কার্য্য করতে লাগলেন। সন্ধ্যাকালে অধিবাস সংকীর্ত্তনের প্রারম্ভে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর প্রথমে চন্দন মাল্যাদি দ্বারা শ্রীজাহ্নবা মাতার পূজা করলেন। অনন্তর বৈষ্ণবগণকে মালা চন্দনে ভূষিত করলেন। শ্রীনরোত্তম ও শ্রীনিবাস আচার্য্যের অনুরোধে শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর মঙ্গলাচরণ গীত আরম্ভ করলেন; মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত মঙ্গল অধিবাস সঙ্কীর্ত্তন ইত্যাদি হবার পর বৈষ্ণবগণ বিশ্রাম করলেন। বহু সহস্র ব্যক্তি অধিবাস মহোৎসবের মহাপ্রসাদ গ্রহণ করলেন।

শ্রীশ্রীগৌর-আবির্ভাব মহামহোৎসব ও শ্রীবিগ্রহগণের প্রকট মহামহোৎসবের দিন বৈষ্ণবগণ মহা-সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য বিগ্রহগণের অভিষেক কার্য্যাদি করতে লাগলেন। পূর্বাহ্নে অভিষেক মুহূর্ত্তে শ্রীনিবাস আচার্য্য ছয় বিগ্রহ সাথে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করলেন। তখন দেশ-বিদেশ থেকে আগত বাদ্যকারগণ বিবিধ যন্ত্র বাদন, গায়কগণ মধুর সংগীত ও নর্ত্তকগণ মধুর নৃত্যাদি আরম্ভ করলেন। অপরদিকে বৈষ্ণবগণের মধুর নাম সংকীর্ত্তনের ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক আনন্দময় হচ্ছিল।

যথাবিধানে অভিষেক কার্য্য শ্রীআচার্য্য সমাপ্ত করবার পর বিগ্রহগণকে অপূর্ব বস্ত্র অলঙ্কারে বিভূষিত করলেন। অতঃপর বিবিধ মিষ্টান্ন তরি-তরকারী পিঠা পানা প্রভৃতি সহস্র প্রকার বস্তু শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীবল্লবীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীব্রজমোহন, শ্রীরাধারমণ এবং শ্রীরাধাকান্ত এই ছয় বিগ্রহের পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে ভোগ নিবেদন করলেন। ভোগ অর্পণ কীর্ত্তন হবার পর আচমন দিয়ে তাম্বুল বীটীকা অর্পণ করলেন; অনন্তর গন্ধ চন্দন মাল্যাদি দ্বারা বিগ্রহগণকে ভূষিত করে, মহা আরত্রিক করলেন। আরত্রিক সংকীর্ত্তনাদি বৈষ্ণবগণ মহানন্দ ভরে করতে লাগলেন। কীর্ত্তন নৃত্যাদির পর সকলে ভূলুণ্ঠিত হয়ে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করলেন।

তারপর শ্রীনিবাস আচার্য্য ভগবদ্ প্রসাদী চন্দন মালা শ্রীজাহ্নবা মাতাকে অর্পণ করলেন। অনন্তর বৈষ্ণবগণকে প্রদান করলেন। শ্রীনিবাস, শ্রীনরোত্তম ও শ্রীশ্যামানন্দ সকলকে প্রসাদী চন্দন মালা দেওয়া শেষ হলে, জাহ্নবা মাতার আদেশে শ্রীনৃসিংহ-চৈতন্য দাস তিনজনকে প্রসাদী চন্দন মালা পরিয়ে দিলেন। বৈষ্ণবগণ কীর্ত্তন মণ্ডপে যথাযথ আসন গ্রহণ করলেন। শ্রীজাহ্নবা মাতা কীর্ত্তন মণ্ডপের সম্মুখে উত্তম আসনে উপবিষ্ট হলেন। অনন্তর শ্রীজাহ্নবা মাতার ও শ্রীঅচ্যুতানন্দের আদেশে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় কীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ দাস, শ্রীগোকুল দাস ও শ্রীবল্লভ দাস প্রভৃতি তাঁর দোঁহারী করতে লাগলেন, দেবীদাস মৃদঙ্গ বাজাতে লাগলেন। পূর্বোক্ত শ্রীগৌরাঙ্গ দাসাদি নিবদ্ধ, অনিবদ্ধ, শ্রুতি, স্বর, গ্রাম ও মূর্চ্ছণাদিতে পটু ছিলেন।

শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের সেই সুমধুর কীর্ত্তন ধ্বনি ও স্বর-মূর্চ্ছণাদিতে চতুর্দ্দিকস্থ অগণিত নরনারী প্রেমাশ্রু বর্ষণ করতে লাগলেন। সকলে বৈকুণ্ঠানন্দ সুখসিন্ধুতে বিহার করতে লাগলেন, অধিক কথা কি






স্বয়ং শ্রীগৌরসুন্দর সপার্ষদ সেই সংকীর্ত্তনে উদিত হলেন।

কহিতে কি সংকীর্ত্তন সুখের ঘটায়
গণ সহ অবতীর্ণ হইলা গৌররায়।।
মেঘেতে উদয় বিদ্যুতের পুঞ্জ যৈছে।
সংকীর্ত্তন মেঘে প্রভু প্রকটয় তৈছে।।

—ভঃ রঃ ১০/৫৭২

মহাপ্রভুর সঙ্গে শ্রীনরহরি, শ্রীমুকুন্দ, শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীমাধব ঘোষ, শ্রীবাসুঘোষ, শ্রীগোবিন্দ ঘোষ, আচার্য্য পুরন্দর, শ্রীমহেশ, শ্রীশংকর, শ্রীধর, শ্রীজগদীশ পণ্ডিত, শ্রীযদুনন্দন ও শ্রীকাশীশ্বর প্রভৃতি প্রভু-পার্ষদগণ প্রকটিত হয়ে মহানৃত্য-গীত করতে লাগলেন। এঁদের সঙ্গে শ্রীঅচ্যুতানন্দন, শ্রীরঘুনন্দন, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি প্রভৃতি মিলিত ভাবে মহানৃত্য-গীত করতে লাগলেন।

কিবানন্দে বিহ্বল অদ্বৈত নিত্যানন্দ।
কিবা ভক্ত মণ্ডলী মধ্যেতে গৌরচন্দ্র।।
প্রকাশিল প্রভু কিবা অদ্ভুত করুণা।
কিবা এ বিলাস ইহা বুঝে কোন জনা।।
শ্রীনিবাস নরোত্তমে কিবা অনুগ্রহ।
দুঁহে অভিলাষ পূর্ণ কৈলা গণসহ।।

—ভঃ রঃ ১০/৬০৭

ভক্তবৎসল শ্রীগৌরহরি নিজগণ সহ অবতীর্ণ হয়ে শ্রীনিবাস ও শ্রীনরোত্তমের অভিলাষ পূর্ণ করলেন। সংকীর্ত্তন অন্তে শ্রীজাহ্নবা মাতা শ্রীবিগ্রহগণকে ফাগু অর্পণ করে বৈষ্ণবদের ফাগু খেলতে আদেশ করলেন। বৈষ্ণবগণ আনন্দ ভরে ফাগু খেলতে লাগলেন।

কিবা পরস্পর ফাগু খেলায় বিহ্বল।
কিবা ফাগুময় অঙ্গ করে ঝলমল।।

—ভঃ রঃ ১০/৬৫১

এভাবে ফাগু খেলায় অপরাহ্ন কাল সমাপ্ত হ'লে বৈষ্ণবগণ সন্ধ্যায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মাভিষেক গীত আরম্ভ করলেন। সন্ধ্যাকালে স্নানাদি করে শ্রীনিবাস আচার্য্য অভিষেক কার্য্য করতে লাগলেন।

অভিষেক গীত—

ফাল্গুন পূর্ণিমা মঙ্গলের সীমা প্রকট গোকুল ইন্দু।
নদীয়া নগরে প্রতি ঘরে ঘরে উথলে আনন্দ সিন্ধু।।
কিবা কৌতুক পরস্পরে।
শচীদেবী ভালে পুত্র লৈয়া কোলে
বিলাসে সূতিকা ঘরে।।
বালক দেখিতে ধায় চারিভিতে
কেহ না ধরয়ে ধৃতি।
গ্রহণান্ধকারে কে চিনে কাহারে
অংসখ্য লোকের গতি।।
বালক মাধুরী দেখি আঁখি ভরি
পাসরে আপন দেহ।
নরহরি কয় শচীর তনয়
প্রকাশে কি নবনেহা।।

অপূর্ব্ব কীর্ত্তনানন্দে সমস্ত রাত কিভাবে কেটে গেল কেউ জানতে পারলেন না। অতঃপর মঙ্গল আরতি আরম্ভ হল। মঙ্গল আরতির নৃত্যগীত সমাপ্ত হলে বৈষ্ণবগণ দণ্ডবৎ করে নিজ নিজ কুটীরে গমন করলেন এবং প্রাতঃকৃত্য স্নানাদি করতে লাগলেন। এ দিকে শ্রীজাহ্নবা মাতা তাড়াতাড়ি স্নান সেরে শ্রীবিগ্রহগণের ভোগ রন্ধনের জন্য রন্ধন শালায় প্রবেশ করলেন। রন্ধন বিদ্যানিপুণা শ্রীজাহ্নবা মাতা অল্প সময়ের মধ্যে বহু প্রকার ব্যঞ্জন তরকারী মিষ্টান্ন পিঠা পানাদি তৈরি করলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য বিগ্রহগণের স্নান অভিষেক পূজাদি সেরে ভোগ লাগালেন।

অতঃপর ভোগ আরত্রিক অন্তে মহান্তগণ মহাপ্রসাদ ভোজন করতে বসলেন। স্বয়ং জাহ্নবা মাতা পরিবেশন করলেন। মহা 'হরি' 'হরি' ধ্বনি

সহ ভাগবতগণ প্রসাদ সেবা করতে লাগলেন। মহান্তগণের প্রসাদ পাওয়া শেষ হ'লে শ্রীজাহ্নবা মাতার অনুরোধে শ্রীনরোত্তম, শ্রীনিবাস ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু প্রসাদ পেলেন। সর্ব্বশেষে শ্রীজাহ্নবা মাতা প্রসাদ গ্রহণ করলেন।

বাহিরের মণ্ডপে উৎসবে আগত সহস্র সহস্র লোককে রাজা সন্তোষ দত্ত বিচিত্র মহাপ্রসাদ দানে তৃপ্ত করলেন। সমস্ত বন্ধু-বান্ধব অতিথি ব্রাহ্মণাদির প্রসাদ গ্রহণ সমাপ্ত হলে রাজা গৃহ পরিজনের সহিত মহাপ্রসাদ গ্রহণ করলেন।

দ্বিতীয় দিবসে রাজা সন্তোষ দত্তের একান্ত অনুরোধে ভাগবতগণ নিজ নিজ কুটীরে বিবিধ ব্যঞ্জনাদি রন্ধন পূর্ব্বক ভগবানকে অর্পণ করে প্রসাদ গ্রহণ করলেন।

তৃতীয় দিবসে বৈষ্ণবগণ যথাস্থানে বিজয় করতে উদ্যোগ করলেন। রাজা সন্তোষ দত্ত অশ্রুপূর্ণ লোচনে ভাগবতগণকে মুদ্রা, বস্ত্র ও বিবিধ প্রকার জল পাত্রাদি অর্পণ করে ভাগবতগণকে বন্দনা করলেন। ভাগবতগণ রাজাকে বহু আশীর্ব্বাদ ও আলিঙ্গন দিয়ে বিদায় নিলেন। শ্রীজাহ্নবা মাতা নিজ পরিকর-সহ বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করলেন। খেতরিতে কয়েকদিন শ্রীনিবাস আচার্য্য ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু অবস্থান করবার পর তাঁরাও যথাস্থানে বিদায় হলেন।

খেতরির এ মহোৎসবের পর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের যশ চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। রামকৃষ্ণ আচার্য্য ও গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী আদি বিদ্বান্ মণ্ডলী শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের পাদপদ্মে আশ্রয় নিলেন।

গোপালপুর গ্রামে শ্রীবিপ্রদাস নামক এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। অকস্মাৎ তাঁর গৃহে একদিন শ্রীনরোত্তম ঠাকুর শুভ বিজয় করলেন। বিপ্রদাস বড়ই সুখী হলেন, যথাবিধি আসনাদি দিলেন। বিপ্রদাসের ধানের গোলায় এক ভয়ঙ্কর সর্প বাস করছিল, তার ভয়ে কেউ গোলার ধারে যেতে পারত না। এই কথা বিপ্রদাস শ্রীল ঠাকুর মহাশয়কে বললেন। শুনে ঠাকুর মহাশয় ঈষৎ হাস্য করলেন, বললেন কোন চিন্তা কর না। ঠাকুর মহাশয় গোলার দরজা খুলতেই সর্প অন্তর্ধান হল।

গোলা হৈতে প্রিয়া সহ শ্রীগৌরসুন্দর।
ক্রোড়ে আইলা হৈল সর্ব্ব নয়ন গোচর।।

—ভঃ রঃ ১০/২০২

সকলে দেখে আশ্চর্য্যান্বিত হল যে গোলা খুলতেই গোলার ভিতর থেকে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া বেরিয়ে শ্রীঠাকুর মহাশয়ের কোলে উঠলেন। সে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া বিগ্রহ নিয়ে ঠাকুর মহাশয় খেতরিতে এনে প্রতিষ্ঠা করলেন। বর্ত্তমানে বিগ্রহ গাম্ভীলাতে আছেন।

**শ্রীঠাকুরের যশ মহিমা**

কোন সময় এক স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ-অধ্যাপক নিজ ছাত্রদের কাছে শ্রীঠাকুর মহাশয়কে শূদ্র বুদ্ধি করে তাঁর অনেক নিন্দা করেন। সেই অপরাধে ব্রাহ্মণের সর্ব্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ হয়। রোগের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে ব্রাহ্মণ গঙ্গায় ডুবে মরবেন সঙ্কল্প করলেন। সে রাত্রে ভগবতী দেবী ব্রাহ্মণকে স্বপ্নে বললেন—''তুই পরম ভাগবত শ্রীনরোত্তমকে শূদ্র বুদ্ধি করেছিস্, তোর কোটি জন্মেও নিস্তার নাই, তুই যদি তাঁর চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিস্ তো তোর ভাল হবে।'

পরদিন প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণ গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি হয়ে দীন ভাবে ক্রন্দন করতে করতে শ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে পতিত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কুষ্ঠ রোগ সেরে গেল। শ্রীঠাকুর মহাশয় তাঁকে কৃষ্ণ-ভজন

করতে উপদেশ দিলেন; তিনি ঠাকুর মহাশয়ের ভক্ত হলেন।

একদিন শ্রীনরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ পদ্মাবতী নদীতে স্নান করতে যাচ্ছেন। এমন সময় দেখলেন—দুই ব্রাহ্মণ কুমার অনেক ছাগ ও মেষ নিয়ে যাচ্ছে। ঠাকুর মহাশয় বললেন এ দুই ব্রাহ্মণ কুমার যদি হরি ভজন করত তাদের রূপ-যৌবনাদি সার্থক হত। ব্রাহ্মণ কুমারদ্বয় এ কথা শুনতে পেল। তারা শ্রীঠাকুর মহাশয়ের ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের দিব্য মূর্তি ও মধুর বাক্য শুনে তাঁদের কাছে এল এবং বিনীত ভাবে বন্দনা করল। ঠাকুর মহাশয় তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। তারা বলল আমরা গোয়াস গ্রামের জমিদার শ্রীশিবানন্দ আচার্য্যের পুত্র। আমাদের নাম হরিরাম ও রামকৃষ্ণ। গৃহে দুর্গাপূজা হচ্ছে, পিতার আদেশে বলি দেওয়ার জন্য এসব ছাগ ও মেষ নিয়ে যাচ্ছি। আপনারা আমাদের কিছু উপদেশ প্রদান করুন। আপনাদের দেখে বড় শান্তি পাচ্ছি।

ব্রাহ্মণ পুত্রদ্বয়ের দৈন্যভাব দেখে শ্রীঠাকুর মহাশয় মধুর হাস্য পূর্ব্বক ভগবদ্ তত্ত্ব কথা বলতে লাগলেন। বেদোক্ত যে কর্মকাণ্ড তা রাজস ও তামস ভাবযুক্ত, পরিণামে নরকপ্রদ। বেদোক্ত কর্মকারী কর্মিগণ পুণ্য ক্ষয়ে স্বর্গ হতে চ্যুত হয় এবং নরক যন্ত্রণা ভোগ করে। বিষয় দ্বারা আচ্ছন্নমতি বিষয়ী বেদের আপাততঃ মধুর বাক্য বহুমানন পূর্ব্বক জীব-হত্যাদি করে ও অন্তে নরক যন্ত্রণা পেয়ে থাকে। সমস্ত জীব ভগবদ্ শক্তি। পরমাত্মদর্শী, হিংসা শূন্য, নিরহঙ্কার ভগবদ্ ভজনকারীগণ বাস্তবতঃ সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবদ্ পাদপদ্ম লাভ করতে পারে।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের মুখে এই সমস্ত কথা শুনে ব্রাহ্মণ কুমারদ্বয় উঠে ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীচরণে দণ্ডবৎ হয়ে বললেন, অধম ব্রাহ্মণ কুমারদ্বয়কে চরণরজঃ দিয়ে কৃপা করুন। ঠাকুর মহাশয় তাদের শিরে হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন—"তোমাদের কৃষ্ণ-ভক্তি হউক।"

ব্রাহ্মণ কুমারদ্বয় ছাগ ও মেষগুলিকে ছেড়ে দিয়ে শ্রীঠাকুর মহাশয় ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের সঙ্গে পদ্মাবতী নদীতে স্নান করে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দিরে এলেন। সে দিবস প্রসাদ পাওয়ার পর পুনঃ তারা ঠাকুর মহাশয়ের ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের নিকট থেকে বিবিধ তত্ত্ব-কথা শ্রবণাদি করলেন। দ্বিতীয় দিবসে মস্তক মুণ্ডন পূর্বক শ্রীহরিরাম শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ থেকে এবং রামকৃষ্ণ শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের থেকে রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র গ্রহণ করলেন।

এদিকে তাদের পিতা শিবানন্দ আচার্য্য খোঁজ করতে করতে দেখলেন পুত্রদ্বয় খেতরিতে শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সেখানে বাস করছে। শিবানন্দ আচার্য্যের ক্রোধের সীমা রইল না।

কিছুদিন পরে দুই ভাই গৃহে ফিরে এলেন। তাঁদের ললাটে উর্দ্ধপুণ্ড্র, কণ্ঠে তুলসী মালা, দ্বাদশ অঙ্গে তিলক ও শিরে শিখা দেখে শিবানন্দ আচার্য্য অগ্নির ন্যায় জ্বলে উঠলেন এবং বলতে লাগলেন—

ওরে মূর্খ কহ দেখি কোন্ শাস্ত্রে কয়।
ব্রাহ্মণ হৈতে কি বৈষ্ণব বড় হয়?
ভগবতী নিগ্রহ করিলা এতদিনে!
বৃথাই জীবন তোর ভগবতী বিনে।।
বিপ্রে শিষ্য কৈল সে বা কেমন বৈষ্ণব।
পণ্ডিতের সমাজে করাব পরাভব।।

—শ্রীনরোত্তম বিলাস ১০/৪৩-৪৪

পিতার এই সমস্ত কথা শুনে কুমারদ্বয় বলতে লাগলেন—পিতা! যেই ধর্ম যাজন করলে অন্যের উপর হিংসা করতে হয়—কাউকে দুঃখ দিতে হয় তা ধর্ম বলে অভিহিত হতে পারে না। তার নাম অকর্ম

কিংবা অধর্ম। ওহে পিতা! শ্রীশালগ্রাম নারায়ণ ছাড়া কোন দেব-দেবীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হতে পারে কি? সেই শ্রীনারায়ণ ভজন বাদ দিয়ে কেবল দেব-দেবীর পূজা নিরর্থক মনে করি।

শিবানন্দ আচার্য্য ও স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ পুত্রদ্বয়ের কাছে সিদ্ধান্তে পরাভূত হলেন। মনে মনে শিবানন্দ আচার্য্য বিচার করলেন, একটি বড় স্মার্ত্ত পণ্ডিত এনে এদের পরাভূত করব এবং বৈষ্ণব ধর্ম ছোট বলে প্রতিপাদন করব। মিথিলা থেকে স্মার্ত্ত মহাপণ্ডিত মুরারিকে শিবানন্দ আচার্য্য নিয়ে এলেন এবং এক তর্ক সভার আয়োজন করে পুত্রদ্বয়কে তথায় ডাকলেন এবং বললেন তোমরা কি সিদ্ধান্তে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বৈষ্ণব বড় বলছ তা এ সভার মধ্যে বল।

শ্রীহরিরাম ও শ্রীরামকৃষ্ণ দুইজন শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্মরণ পূর্ব্বক ভাগবত সিদ্ধান্ত দ্বারা স্মার্ত্ত মত খণ্ড বিখণ্ড করতে লাগলেন। স্মার্ত্ত মহাপণ্ডিত মুরারি তাঁদের সামনে কোন যুক্তি উত্থাপন করতে পারলেন না। পরিশেষে তিনি অধোবদনে সভা ত্যাগ করলেন ও লজ্জায় ভিক্ষুধর্ম গ্রহণ করলেন।

শিবানন্দ আচার্য্য পরাভূত হয়ে রাত্রে দেবীর চিন্তা করতে লাগলেন। নিদ্রিত হ'লে দেবী স্বপ্নে বলতে লাগলেন—ওহে শিবানন্দ! সকলের পতি, গতি ও প্রভু হলেন শ্রীহরি। তাঁকে অবজ্ঞা করে যারা আমাকে ভজন করে আমি তাদের বিনাশ করে থাকি। যারা শ্রীহরিকে মানে না তারা দৈত্য। যারা শ্রীহরির প্রিয় ভক্ত, তাঁরাই আমার প্রিয়। তুই যদি রক্ষা পেতে চাস্ তবে নরোত্তমের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা কর, নতুবা বৈষ্ণব অপরাধী তোকে আমি বিনাশ করব। দেবী শিবানন্দ আচার্য্যকে এইরূপ বাক্যে শাসন করে অন্তর্হিতা হলেন। অবশেষে শিবানন্দ আচার্য্য দেবীর আদেশ পালন করলেন।

গাম্ভীলা গ্রামে শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী নামে একজন বিদ্বান ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তিনি শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শ্রীমুখে গোস্বামী সিদ্ধান্ত শুনে একান্তভাবে তাঁর শ্রীচরণ আশ্রয় করলেন এবং ঠাকুর মহাশয়ের নিকট গোস্বামী গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে লাগলেন।

শ্রীজগন্নাথ আচার্য্য নামক এক ব্রাহ্মণ একান্ত দেবীর উপাসনা করতেন। তিনি একদিন স্বপ্নে দেখছেন দেবী তাঁকে বলছেন—ওহে সরল বিপ্র! তুমি শ্রীনরোত্তমের নিকট যাও ও তাঁর আশ্রয় করে কৃষ্ণ ভজন কর। তোমার পরম কল্যাণ হবে। কৃষ্ণই আমাদের প্রভু, পতি ও গুরু। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া আমরা কেউ স্বতন্ত্র হয়ে চলতে পারি না।

জগন্নাথ আচার্য্য প্রাতঃকালে স্নানাদি সেরে খেতরি গ্রামে এলেন এবং শ্রীনরোত্তম ঠাকুরকে দণ্ডবৎ করে সমস্ত কথা বললেন। শুনে ঠাকুর মহাশয় হাস্য করে বললেন আপনার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ আছে। শুভদিনে ঠাকুর মহাশয় তাঁকে রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত করলেন। শ্রীজগন্নাথ আচার্য্য ঠাকুর মহাশয়ের স্নিগ্ধ শিষ্য হলেন।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের মহিমা দেখে স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ সমাজ ঈর্ষায় দগ্ধ হতে লাগল। সকলে রাজা নরসিংহের কাছে গিয়ে নালিশ করল-- মহারাজ! আপনি যদি ব্রাহ্মণ সমাজকে না বাঁচান, তবে তাঁরা ধ্বংস হবে। রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্তের পুত্র নরোত্তম শূদ্র হয়ে ব্রাহ্মণগণকে শিষ্য করছে এবং যাদু করে সকলকে মুগ্ধ করছে।

রাজা নরসিংহ বললেন—আমি আপনাদের রক্ষা করব। আমায় কি করতে হবে বলুন। ব্রাহ্মণগণ বললেন মহাদিগ্বিজয়ী পণ্ডিত শ্রীরূপনারায়ণকে সঙ্গে নিয়ে আমরা খেতরি যাব এবং নরোত্তমকে

পরাভূত করব। সে আমাদের সামনে কিছু বলতে পারবে না। এতে আপনি আমাদের সাহায্য করুন।

রাজা নরসিংহ বললেন আমি স্বয়ং আপনাদের সঙ্গে যাব। স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণগণ দিগ্বিজয়ী রূপনারায়ণকে সঙ্গে নিয়ে খেতরি গ্রামের অভিমুখে যাত্রা করলেন। একজন লোক এসে খেতরিতে শ্রীল নরোত্তম ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ-আদির নিকট সমস্ত ঘটনা জানালেন। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ও শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী এসব শুনে বড় দুঃখিত হলেন। তখন দুইজন অনুসন্ধান করে জানতে পারলেন স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ কুমারপুরের বাজারে একদিন বিশ্রাম করে খেতরিতে আসবেন। তাঁরা শীঘ্রই কুমারপুরের বাজারে এলেন এবং দুইজন দুইখানি দোকান খুললেন। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ কুম্ভকারের দোকান ও গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী পান সুপারির দোকান।

এদিকে রাজা নরসিংহ ও স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ কুমারপুর বাজারে এলেন এবং বাজারের বৃহৎ দোকান গৃহাদিতে অবস্থান করতে লাগলেন। স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণের ছাত্রগণ কুম্ভকারের দোকানে এল হাঁড়ি কিনতে; কুম্ভকার (রামচন্দ্র কবিরাজ) সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতে লাগলেন। ছাত্রগণও সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতে লাগল, ক্রমে তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ হল। এদিকে পান সুপারির দোকানদারের (গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী) সঙ্গে ছাত্রদেরও তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ হল। ক্রমে অধ্যাপকগণ তর্ক-বিতর্ক ক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। তখন তাঁদের সঙ্গে কথা আরম্ভ হল। অধ্যাপকগণও তাঁদের কথার জবাব দিতে পারছেন না। পরিশেষে রাজা নরসিংহ ও রূপনারায়ণ পণ্ডিত সেখানে এলেন। কিন্তু ভক্তি সিদ্ধান্ত বিচারে পণ্ডিত রূপনারায়ণ তথায় পরাস্ত হলেন। চতুর্দ্দিকে মহাকোলাহল হতে লাগল। বাজারের কুম্ভকার তাম্বুলিকের সহিত স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ পরাভূত হলেন। তখন রাজা নরসিংহ অনুসন্ধান নিলেন এই কুম্ভকার ও তাম্বুলিক শ্রীল নরোত্তম দাসের শিষ্য। তিনি পণ্ডিতগণকে বললেন আপনারা যখন তাঁর এই সামান্য শিষ্যগণের সঙ্গে সিদ্ধান্ত বিচারে পারেন না, তখন তাঁর সঙ্গে কিরূপে বিচার করবেন? স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ নীরবে সেখান থেকে স্বস্থানে প্রস্থান করলেন।

রাত্রিকালে রাজা নরসিংহ ও শ্রীরূপনারায়ণ স্বপ্নে দেখলেন স্বয়ং দুর্গাদেবী বলছেন—"যদি শ্রীনরোত্তমের চরণে শরণ না নিস্ এ খড়্গ দ্বারা সকলকে বিনাশ করব।" প্রাতঃকালে রাজা নরসিংহ ও রূপনারায়ণ শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের সন্নিধানে এলেন। ঠাকুর মহাশয় তাঁদের বহু আদর সৎকার পূর্ব্বক বসালেন এবং দৈন্য করে বললেন আপনাদের ন্যায় সজ্জন পণ্ডিতের দর্শনে আমি ধন্য হলাম। রাজা নরসিংহ ও রূপনারায়ণ শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুরের বৈষ্ণবীয় নম্র ব্যবহারে একেবারেই মুগ্ধ হলেন এবং তাঁর চরণে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করে ক্ষমা ভিক্ষা করতে লাগলেন। পরিশেষে দেবীর কথা জ্ঞাপন করলেন। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর শুনে মৃদুহাস্য করলেন। অনন্তর কিছুদিন বাদ তাঁদের রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র প্রদান করলেন।

## শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের অন্তর্দ্ধান

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় নিরন্তর গৌর নিত্যানন্দের গুণ গানে বিভোর থাকতেন। দিনের পর দিন কত পাষণ্ড তাঁর শ্রীচরণ স্পর্শ করে পবিত্র হতে লাগলেন। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ঠাকুর মহাশয়ের অনুমতি নিয়ে শ্রীবৃন্দাবন ধামে গেলে, কয়েকমাস পর সেখানে তিনি শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্যলীলায় প্রবেশ করলেন। বোধ হয় এই নিদারুণ সংবাদ শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রাপ্ত হলে, ভক্ত বিরহ সইতে অক্ষম হয়ে তিনিও কয়েক দিন বাদে নিত্যলীলায় প্রবেশ করলেন। এ সব নিদারুণ সংবাদ পেয়ে

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বিরহ সিন্ধুতে যেন নিমজ্জিত হলেন। কাতর কণ্ঠে গাইতে লাগলেন—''যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর। হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর।।'' এ নিদারুণ বিরহ সিন্ধুতে ভাসতে ভাসতে শ্রীল ঠাকুর মহাশয় ভক্তগণ সঙ্গে গঙ্গাতটে গাম্ভীলায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দিরে এলেন। ভক্তগণকে ঠাকুর মহাশয় নাম-সংকীর্ত্তন করতে আদেশ করলেন। ভক্তগণ নাম-সংকীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। অতঃপর সংকীর্ত্তন সহ ঠাকুর মহাশয় গঙ্গাতীরে এলেন এবং সজল নয়নে গঙ্গা দর্শন করতে করতে দণ্ডবৎ করলেন; অনন্তর স্নান করলেন। গঙ্গা তীরে স্বল্পজলে উপবেশন করলেন, চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ উচ্চৈঃস্বরে শ্রীনাম সংকীর্ত্তন করতে লাগলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ আচার্য্য ও শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী দুই দিকে কীর্ত্তন করছেন। ইতিমধ্যে শ্রীল ঠাকুর মহাশয় দুই জনকে বললেন শ্রীগঙ্গাজলে আমার অঙ্গ মার্জ্জন কর। এই বলে তিনি নামসংকীর্ত্তনে মগ্ন হলেন। কীর্ত্তন করতে করতে তাঁরা গঙ্গাজল নিয়ে যখন অঙ্গ মার্জ্জন করতে উদ্যত হলেন তৎক্ষণাৎ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন করতে করতে শ্রীগঙ্গার সহিত মিলিত হয়ে গেলেন।

কার্ত্তিক কৃষ্ণ পঞ্চমীতে তিনি অপ্রকট লীলা করলেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে লিখিত আছে,—রাজধানী খেতুরী হতে একক্রোশ দূরে 'ভজনটুলিতে' ঠাকুর মহাশয়ের আশ্রম ছিল। তিনি কীর্ত্তনের দ্বারাই প্রচার করেছিলেন। তিনি 'গরানগাটী' নামে কীর্ত্তনের অপূর্ব সুর প্রবর্ত্তন করেছিলেন। তাঁর রচিত প্রার্থনা ও 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' ভক্তগণের প্রাণস্বরূপ।

**।। জয় শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় কি জয়।।**

# শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু

শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু আবির্ভূত হন উৎকলে ধারেন্দা বাহাদুরপুরে ১৪৫৬ শকে মধুপূর্ণিমা তিথিবাসরে। পিতার নাম শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল, মাতার নাম শ্রীদুরিকা। সদ্গোপ বংশে জাত শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডলের বহু পুত্র কন্যা গত হবার পর এই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এজন্য এঁর নাম রাখা হয়েছিল দুঃখিয়া। সকলে বলতে লাগলেন এ ছেলে মহাপুরুষ হবে, যেহেতু চৈত্র পূর্ণিমার শুভক্ষণে শ্রীশ্রীজগন্নাথের কৃপায় এ জন্মেছে। বোধ হচ্ছে শ্রীজগন্নাথ দেব জগতে নিজের কথা প্রচার করবার জন্য একে এনেছেন, একে যত্নে পালন কর। পুত্রটি মদনের ন্যায়। দর্শনে নয়ন মন জুড়িয়ে যায়।

''দণ্ডেশ্বর গ্রামে বাস সর্ব্বাংশে প্রবল।
মাতা শ্রীদুরিকা, পিতা শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল।।
সদ্গোপকুলেতে শ্রেষ্ঠ অতি সুচরিত।
কৃষ্ণ সে সর্ব্বস্ব তাঁ'র ভক্তে অতি প্রীত।।
শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল-দুরিকার গুণগণ।
গ্রন্থের বাহুল্য-ভয়ে না হয় বর্ণন।।
ধারেন্দা-বাহাদুরপুরেতে পূর্ব্বস্থিতি।
শিষ্টলোক কহে শ্যামানন্দ-জন্ম তিথি।।
কোনমতে মণ্ডলের নাহি প্রতিবন্ধ।
পুত্রকন্যা গত হৈলে হৈল শ্যামানন্দ।।

* * * *

মাতা-পিতা দুঃখসহ পালন করিল।
এই হেতু দুঃখী নাম প্রথমে হইল।।”

—ভক্তিরত্নাকর ১/৩৫১-৩৫৫, ৩৫৯

ছেলের ক্রমে অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ ও বিদ্যারম্ভ প্রভৃতি হল। শিশুর অদ্ভুত মেধা দেখে পণ্ডিতগণ বিস্মিত হ'তে লাগলেন। বালক অল্প কাল মধ্যে ব্যাকরণ, কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্র অধ্যয়ন করলেন। গ্রামবাসী বৈষ্ণবগণের মুখে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের মহিমা শ্রবণ করতে করতে তাঁদের শ্রীচরণে বালকের প্রবল অনুরাগ উৎপন্ন হল। শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল পরম ভাগবত পুরুষ ছিলেন। তিনি পুত্রকে সর্ব্বদা গৌর-নিত্যানন্দের ভাবে আবিষ্ট দেখে মন্ত্র গ্রহণ করতে বললেন।

বালক বললেন শ্রীহৃদয় চৈতন্য প্রভু আমার গুরু, তিনি অম্বিকা কালনায় আছেন। তাঁর গুরু শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ দুই ভাই তাঁর গৃহে নিত্য বিরাজ করছেন। যদি আজ্ঞা দেন, তথায় গিয়ে তাঁর শিষ্য হই।

শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল বললেন, ‘‘দুঃখিয়া! তুমি সেখানে কেমনে যাবে?”

দুঃখিয়া—বাবা! দেশের অনেক লোক গৌড় দেশে গঙ্গাস্নান করতে যাচ্ছেন, তাদের সঙ্গে যাব।

পিতা অনেকক্ষণ চিন্তা করবার পর অনুমতি প্রদান করলেন। দুঃখিয়া পিতা মাতার আশীর্ব্বাদ নিয়ে গৌড় দেশ অভিমুখে যাত্রা করল। ক্রমে নবদ্বীপ শান্তিপুর হয়ে অম্বিকা কালনায় এল এবং লোক মুখে জিজ্ঞাসা করে শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের ভবনে এল। মহাপ্রভুর মন্দিরের বহির্দ্বারে দণ্ডবৎ করতেই শ্রীহৃদয় চৈতন্য প্রভু বাহিরে এসে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘তুমি কে?’

দুঃখিয়া বললেন—আমি আপনার শ্রীচরণ সেবা করতে এসেছি। ধারেন্দা বাহাদুরপুরে আমার নিবাস। সদ্গোপবংশে আমার জন্ম। পিতার নাম শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল। আমার নাম দুঃখিয়া।

শ্রীহৃদয় চৈতন্য প্রভু বালকের মধুর আলাপে সুখী হলেন। বললেন এখন থেকে তোমার নাম হল কৃষ্ণদাস। আমি অদ্য প্রাতঃকাল থেকে অনুভব করছিলাম কেউ আসবে।

শ্রীকৃষ্ণদাস খুব নিষ্ঠার সহিত সেবা করতে লাগলেন। শুভদিন দেখে শ্রীহৃদয় চৈতন্য প্রভু তাঁকে মন্ত্র দীক্ষা প্রদান করলেন। হৃদয় চৈতন্য প্রভু কৃষ্ণদাসের সেবা নিষ্ঠা ভক্তি এবং অগাধ বুদ্ধি মেধা দেখে তাঁকে বৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট যেতে আদেশ করলেন এবং তাঁর নিকট গোস্বামী গ্রন্থ প্রভৃতি পড়তে নির্দ্দেশ দিলেন।

শ্রীকৃষ্ণদাস নত শিরে বৃন্দাবনে যেতে স্বীকৃত হলেন। শুভদিন দেখে শ্রীবৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করলেন। যাবার সময় শ্রীহৃদয় চৈতন্য প্রভু তাঁকে অনেক কথা বললেন ও বৃন্দাবনবাসী গোস্বামিদিগের শ্রীচরণে দণ্ডবন্নতি জ্ঞাপন করলেন। দুঃখী কৃষ্ণদাস প্রথমে নবদ্বীপে এলেন। লোককে জিজ্ঞাসা করে মায়াপুরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ভবনে প্রবেশ করলেন। গৌর গৃহে শ্রীঈশান ঠাকুরকে দর্শন পূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করলেন। বৃদ্ধ ঈশান ঠাকুর ‘‘কে তুমি” বলে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। কৃষ্ণদাস সমস্ত পরিচয় প্রদান করলেন। শুনে ঈশান ঠাকুর তাঁকে প্রচুর আশীর্ব্বাদ করলেন। এক দিন নবদ্বীপে অবস্থান করবার পর তিনি মথুরা অভিমুখে যাত্রীগণ সহ যাত্রা করলেন। পথে গয়া ধামে শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শন এবং মহাপ্রভুর শ্রীঈশ্বর পুরী হতে মন্ত্রাদি গ্রহণ প্রভৃতির কথা স্মরণ পূর্ব্বক প্রেমে বিহ্বল হলেন। সেখান থেকে কাশী ধামে এলেন এবং তপন মিশ্র, চন্দ্রশেখর আদি ভক্তগণের চরণ দর্শন এবং বন্দনাদি করলেন। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণদাসকে প্রচুর আশীর্ব্বাদ করলেন। অনন্তর

তিনি মথুরা ধামে প্রবেশ করলেন। বিশ্রাম ঘাটে স্নান, আদি কেশব দর্শন করলেন ও শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানে প্রেমে গড়াগড়ি দিলেন। তথা হতে শ্রীবৃন্দাবনের দিকে চললেন। লোক মুখে শ্রীজীব গোস্বামীর কুটীরের ঠিকানা জেনে সেখানে গেলেন এবং শ্রীমদ্ জীব গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্ম সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করলেন। শ্রীমদ্ জীব গোস্বামী তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। কৃষ্ণদাস সবিশেষ পরিচয় প্রদান করলেন। শ্রীহৃদয় চৈতন্য প্রভু কৃষ্ণদাসকে তাঁর কাছে সমর্পণ করেছেন—''দুঃখী কৃষ্ণ দাস শিষ্যে সঁপিলু তোমারে। ইহার যে মনোভীষ্ট পুরিবে সর্ব্বথা। কত দিন পরে পুনঃ পাঠাইবে এথা।।''—ভক্তি রত্নাকর ১/৪০৭

শ্রীহৃদয় চৈতন্য প্রভু দুঃখী কৃষ্ণদাসকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছেন জেনে শ্রীজীব গোস্বামী অতিশয় সুখী হলেন। শ্রীকৃষ্ণ-দাসকে তাঁর কাছে রাখলেন। শ্রীকৃষ্ণদাস সাবধানে শ্রীজীব গোস্বামীর সেবা এবং গোস্বামী-গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে লাগলেন। শ্রীনিবাস ও শ্রীনরোত্তম প্রভু পূর্ব্ব হতেই শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট এসেছিলেন এবং গোস্বামী গ্রন্থ অধ্যয়ন করছিলেন। শ্রীকৃষ্ণদাসের তাঁদের সঙ্গে মিলন হল।

শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট সেবা প্রার্থনা করলেন। শ্রীজীব গোস্বামী উল্লাসের সহিত বললেন তুমি প্রতিদিন কুঞ্জ কানন ঝাড়ু দিবে। দুঃখী কৃষ্ণদাস সেদিন থেকে অতি প্রীতি সহকারে কুঞ্জ ঝাড়ু দিতে লাগলেন। সেবার সুযোগ পেয়ে জীবনকে কৃতার্থ মনে করতে লাগলেন। কুঞ্জ ঝাড়ু দিতে দিতে আনন্দে দু'নয়ন দিয়ে অশ্রু পড়ে। কখনও শ্রীরাধা-গোবিন্দের নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন ও কখন লীলা স্মরণ করতে করতে জড়বৎ অবস্থান করতেন। তিনি কখন কখন রজঃকণা-যুক্ত ঝাড়ু খানি শিরে ধারণ করতেন। এ রজঃকণা ব্রহ্মা শিবও কামনা করেন।

## নুপুর প্রাপ্তি

দুঃখী কৃষ্ণদাস এইরূপে কুঞ্জ ঝাড়ু সেবা করতে লাগলেন। তাঁর সেবায় ব্রজেশ্বর ও ব্রজেশ্বরী সুখী হলেন। তাঁকে দর্শন দিতে ইচ্ছা করলেন। একদিন কৃষ্ণদাস প্রেম ভরে কুঞ্জ ঝাড়ু দিচ্ছেন। এমন সময় দেখলেন কুঞ্জ মধ্যে পড়ে আছে এক অপূর্ব নুপুর। তিনি বিস্ময়ান্বিত ভাবে নুপুরখানি তুলে শিরে ঠেকালেন ও আনন্দ ভরে ওড়নীর অঞ্চলে বেঁধে রাখলেন, যাঁর নুপুর তিনি খোঁজ করতে এলে দিবেন।

এদিকে সখীগণ প্রাতঃকালে শ্রীরাধা ঠাকুরাণীর বাম পদে নুপুর না দেখে অবাক হলেন। শ্রীরাধা ঠাকুরাণী বললেন— নিশাকালে কুঞ্জে নৃত্য করবার সময় নুপুরখানি তথায় পড়েছে; তোমরা অনুসন্ধান করে এনে দাও। অনুসন্ধান করতে করতে বিশাখা দেবী কুঞ্জে এলেন এবং কৃষ্ণদাসকে কুঞ্জ ঝাড়ু দিতে দেখলেন।

বিশাখা দেবী জিজ্ঞাসা করলেন, ''তুমি কি একখানি নুপুর পেয়েছ?''

দুঃখী কৃষ্ণদাস স্বর্গচ্যুত দেবীর ন্যায় অপূর্ব্ব কান্তিযুক্তা সে দেবীর অমৃতের ন্যায় মধুর কথা শুনে স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। বিশাখা দেবী আবার জিজ্ঞাসা করলেন, ''তুমি কি একখানি নূপুর পেয়েছ?'' দুঃখী কৃষ্ণদাস নমস্কার করে বিনীত ভাবে বললেন—হ্যাঁ পেয়েছি। আপনি কে? আমি গোপকন্যা। কোথায় থাকেন? এ গ্রামে থাকি। নুপুরখানি আপনার? আমার নয়। আমার ঘরের এক বন বধূর। এখানে কি করে পড়ল? কাল কুঞ্জে ফুল তুলতে এসেছিল, পা থেকে পড়ে গেছে। যাঁর নুপুর তিনি এসে নিয়ে যান। বিশাখা দেবী বললেন, ''তুমি দাড়াও।''

কিছুক্ষণ পরে বিশাখা দেবীর সঙ্গে শ্রীরাধা

ঠাকুরাণী এলেন এবং একটি বৃক্ষের আড়ালে দাঁড়িয়ে রইলেন। বিশাখা দেবী বললেন, ভক্ত! যাঁর নুপুর তিনি এসেছেন। দুঃখী কৃষ্ণদাস দূর হতে শ্রীবৃষভানু নন্দিনীর অপূর্ব্ব কান্তিচ্ছটা দেখেই আত্মহারা হলেন। আনন্দে নূপুরখানি বিশাখা দেবীর হাতে দিলেন। গূঢ় রহস্য তিনি কিছু অনুভব করতে পারলেন। প্রেমাশ্রুপূর্ণ নয়নে সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করলেন। আনন্দে রজে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। তখন বিশাখা দেবী বলতে লাগলেন—হে ভক্তবর! আমাদের সখী তোমাকে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কোন বর দিতে চান।

দুঃখী কৃষ্ণদাস বললেন, ''অন্য কোন বর চাই না। কেবল শ্রীচরণ রজঃ প্রার্থনা করি।''

বিশাখা বললেন, 'ঐ কুণ্ডে স্নান করে এসো।'

দুঃখী কৃষ্ণদাস কুণ্ড-স্নানে চললেন, নমস্কার করে কুণ্ডে যেই অবগাহন করছেন অমনি এক সুন্দরী মূর্ত্তি হলেন ও বিশাখা দেবীর কাছে ফিরে এসে বন্দনা করলেন। বিশাখা দেবী সে নব সখীকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীরাধা ঠাকুরাণীর নিকট এলেন। নব সখী শ্রীরাধা ঠাকুরাণীর শ্রীপাদ-পদ্মমূলে দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন।

সখীগণ তাঁকে ধরে সামনে বসালেন। শ্রীরাধা ঠাকুরাণী চরণের কুমকুম দিয়ে নুপুর দ্বারা তিলক করে দিলেন—বললেন এই তিলক তোর ললাটে থাকবে। আজ থেকে তোর নাম হবে ''শ্যামানন্দ। তুই চলে যা'' শ্রীরাধা ঠাকুরাণী এ বলে সখীদিগের সঙ্গে অন্তর্ধান হলেন। দুঃখী কৃষ্ণদাসের সমাধি ভাঙল। দেখলেন ললাটে নুপুরের উজ্জ্বল তিলক রয়েছে। তিনি ভাবাবিষ্ট হৃদয়ে কি দেখলাম! কি দেখলাম! বলে কিছুক্ষণ ক্রন্দন করলেন। তারপর শ্রীরাধা ঠাকুরাণীর উদ্দেশ্যে শত শত বার বন্দনা করে শ্রীজীব গোস্বামীর শ্রীচরণে ফিরে এলেন।

শ্রীমদ্ জীব গোস্বামী তাঁর ললাটে নূতন ধরণের উজ্জ্বল তিলক দেখে অবাক হলেন এবং কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। দুঃখী কৃষ্ণদাস দণ্ডবৎ করে সজল নয়নে সমস্ত ঘটনা বললেন। শ্রীজীব গোস্বামী শুনে পরম সুখী হলেন, বললেন—লোকের কাছে এসব কথা প্রকাশ কর না। আজ থেকে তোমার নাম 'শ্যামানন্দ' হল।

দুঃখী কৃষ্ণদাসের নাম, তিলক বদলে গেছে দেখে বৈষ্ণবদিগের মধ্যে অনেক কথোপকথন হতে লাগল। ক্রমে ক্রমে সে কথা গৌড় দেশে অম্বিকা কালনায় এল। শ্রীহৃদয় চৈতন্য প্রভু শুনে ক্রোধে অস্থির হয়ে উঠলেন। তিনি শীঘ্র ছুটে এলেন বৃন্দাবনে। কৃষ্ণদাস কই? কৃষ্ণদাস সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করে পড়লেন শ্রীগুরু পাদপদ্মে। শ্রীহৃদয় চৈতন্য প্রভু তাঁর তিলক দেখে রেগে অস্থির হয়ে বলতে লাগলেন—তুমি আমার সঙ্গে গর্হিত আচরণ করেছ। তিনি গালি দিতে দিতে প্রহার করতে লাগলেন, বৈষ্ণবগণ শ্রীহৃদয় চৈতন্য প্রভুকে ধরে অনেক বুঝিয়ে শান্ত করলেন। দুঃখী কৃষ্ণদাস অম্লান মনে সব সহ্য করে গুরুর সেবা করতে লাগলেন।

শ্রীহৃদয় চৈতন্য প্রভু সেই রাত্রে স্বপ্নে দেখলেন-- শ্রীরাধা ঠাকুরাণী স্বয়ং তাঁকে তিরস্কার করে বলছেন—''আমি দুঃখী কৃষ্ণদাসের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাকে তিলক করে দিয়েছি ও তার নাম বদলিয়েছি। তাতে অন্যের কিছু বলার কি আছে?'' হৃদয় চৈতন্য প্রভু শ্রীব্রজেশ্বরীর শ্রীচরণে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন এবং নিজেকে অপরাধী মনে করতে লাগলেন।

অতঃপর প্রাতঃকালে শ্রীহৃদয় চৈতন্য প্রভু শ্যামানন্দকে ডেকে কোলে তুলে নিলেন, স্নেহে বারংবার আলিঙ্গন করতে লাগলেন। প্রেমাশ্রুনেত্রে বললেন তুমি ধন্য। শ্রীহৃদয় চৈতন্য প্রভু কিছুদিন ব্রজ ধামে রইলেন। শ্রীশ্যামানন্দকে আরও কিছুদিন

জীব গোস্বামীর নিকট থাকবার আদেশ দিয়ে তিনি গৌড় দেশে ফিরে এলেন।

শ্রীশ্যামানন্দ, শ্রীনিবাস ও শ্রীনরোত্তম তিন জন আনন্দে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট গোস্বামী গ্রন্থ অধ্যয়ন ও ব্রজে মাধুকরী করে দিন কাটাতে লাগলেন। তিনজন ব্রজে মাধুকরী করে একান্তে ভজন করবেন--এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় হলেন।

এদিকে গোস্বামিগণ মন্ত্রণা করলেন এই তিনজনের দ্বারা গৌড় দেশে মহাপ্রভুর বাণী প্রচার এবং গোস্বামী গ্রন্থ প্রচার করতে হবে। একদিন শ্রীজীব গোস্বামী তিনজনকে ডেকে গোস্বামিগণের নির্দ্দেশ জানালেন। তিনজন সে আদেশ অবনত শিরে ধারণ করলেন। অতঃপর শুভ দিন দেখে শ্রীমদ্ জীব গোস্বামী গোস্বামী-গ্রন্থ সহ তিনজনকে গৌড় দেশে প্রেরণ করলেন। পথে বনবিষ্ণুপুরে রাজা বীর হাম্বীর গ্রন্থ হরণ করলেন। প্রসঙ্গটি এই গ্রন্থে ৪১৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে। সেই গ্রন্থ উদ্ধারের জন্য তথায় শ্রীনিবাস আচার্য্য রইলেন। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর খেতরিতে এবং শ্যামানন্দ অম্বিকা কালনায় চলে এলেন। শ্রীশ্যামানন্দ হৃদয় চৈতন্য প্রভুর চরণ বন্দনা করতেই তিনি সানন্দে তাঁকে কোলে তুলে নিলেন এবং ব্রজস্থিত গোস্বামিগণের কুশল বার্ত্তাদি জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। পরিশেষে গ্রন্থ অপহরণ বার্ত্তা শুনে বড়ই মর্মাহত হলেন। শ্যামানন্দ শ্রীহৃদয় চৈতন্য প্রভুর শ্রীচরণ সেবা করতে লাগলেন।

**উৎকলে প্রচার**

উৎকল দেশের শ্রীগৌর ভক্তগণ প্রায় একে একে সব অপ্রকট হলেন। গৌরসুন্দরের বাণী প্রচার প্রায় রুদ্ধ হয়ে পড়ল। শ্রীহৃদয় চৈতন্য প্রভু এ সব কথা বিশেষ ভাবে অনুভব করলেন। অতঃপর তিনি শ্রীশ্যামানন্দকে গৌর বাণী প্রচারের জন্য উৎকল দেশে যাবার আজ্ঞা করলেন। শ্রীশ্যামানন্দ শ্রীগুরুদেবকে ছেড়ে যাবেন ভেবে বড়ই মর্ম্মাহত হয়ে পড়লেন। শ্রীহৃদয় চৈতন্য প্রভু তা বুঝতে পেরে তাঁকে ডেকে অনেক বুঝালেন। অগত্যা শ্রীশ্যামানন্দ গুরু বাণী শিরে ধরে উৎকলে যাত্রা করলেন। তিনি উৎকলের পথে ধারেন্দা বাহাদুরপুরে নিজ জন্মস্থানে এলেন। বহুদিন পরে গ্রামবাসীগণ তাঁকে দেখে অতিশয় সুখী হলেন। তিনি সেখানে কয়েকদিন গৌর বাণী প্রচার করলেন। বহুলোক তা শুনে আকৃষ্ট হ'লেন এবং তাঁর চরণ আশ্রয় করলেন। সেখান থেকে দণ্ডেশ্বর নামক স্থানে গেলেন। সেখানে পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল অবস্থান করতেন। দণ্ডেশ্বর গ্রামে শ্যামানন্দ প্রভুর শুভাগমনে ভক্তগণ পরম সুখ প্রাপ্ত হ'লেন। কয়েকদিন তিনি তথায় হরিকথা মহোৎসব অনুষ্ঠান করলেন। অনেক লোক তাঁর দিব্য বাণীতে আকৃষ্ট হয়ে শিষ্য হলেন। উৎকল দেশে শ্রীশ্যামানন্দের শুভাগমনে পুনঃ সর্ব্বত্র গৌর বাণী প্রচার আরম্ভ হল।

সুবর্ণরেখা নদীর তটে শ্রীঅচ্যুতদেব নামে একজন ধর্মনিষ্ঠ জমিদার বাস করতেন। রসিক নামে তাঁর একমাত্র পুত্র ছিলেন। রসিক শিশুকাল থেকে কৃষ্ণভক্তি পরায়ণ। তাঁকে অধ্যয়নের জন্য পিতা পণ্ডিতগণকে নিযুক্ত করলেন। রসিক পণ্ডিতদের স্থানে অধ্যয়ন করতে লাগলেন। কিন্তু এ জগতের বিদ্যাকে তিনি বহুমানন করলেন না। হরি-ভক্তিই সর্ব্বোত্তম রূপে নির্ণয় করলেন।

শ্রীরসিক গুরু পাদপদ্ম আশ্রয় করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। একদিন নির্জনে বসে চিন্তা করছেন। এমন সময় দৈববাণী শ্রবণ করলেন—''রসিক! তুমি কোন চিন্তা কর না। এস্থানে অতি শীঘ্র শ্রীশ্যামানন্দ নামে এক মহাভাগবত পুরুষ আগমন করবেন, তুমি তাঁর চরণ আশ্রয় কর।'' দৈব বাণী শুনে রসিক কিছু আশ্বস্ত হলেন, প্রতি ক্ষণে শ্রীশ্যামানন্দের আগমন

পথ দেখতে লাগলেন।

কিছুদিন পরে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু সুবর্ণরেখা নদীতটে রোহিণী নামক গ্রামে শ্রীরসিক দেবের ঘরে শিষ্যগণ সহ শুভাগমন করলেন। শ্রীরসিক দেবের আনন্দের সীমা রইল না। সাষ্টাঙ্গ-দণ্ডবৎ করে অতি বিনীতভাবে তাঁকে স্বগৃহে নিয়ে তাঁর শ্রীপাদপদ্ম পূজা পূর্ব্বক, সমস্ত স্বজন-কলত্র ও পুত্রাদি সহ রসিকদেব আত্মনিবেদন করলেন। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু শুভ দিনে শ্রীরসিকদেবকে রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত করলেন। শ্রীরসিকদেব গৃহে নাম সংকীর্ত্তন যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। সমস্ত বন্ধু-বান্ধব ও প্রজাগণকে আমন্ত্রণ করলেন। সেই সংকীর্ত্তন মহাযজ্ঞে সকলে উপস্থিত হয়ে আচার্য্য শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শ্রীচরণ দর্শন পূর্ব্বক সকলেই শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের বাণীতে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর শ্রীচরণ আশ্রয় করলেন। রোহিণীতে আচার্য্য শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর বহু শিষ্য হল।

রোহিণীতে দামোদর নামে এক বড় যোগী ছিলেন। এক দিন তিনি আচার্য্য শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুকে দর্শন করতে এলেন। দূর থেকে সূর্য্যসম উজ্জ্বল দিব্য কান্তি দর্শন করে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। অতঃপর নিকটবর্ত্তী হয়ে শ্যামানন্দ প্রভুর চরণে বন্দনা করলেন। শ্যামানন্দ প্রভু তাঁকে প্রতি-নমস্কার করে সজল নয়নে বললেন—আপনি পবিত্র শুদ্ধভাবাপন্ন হয়ে নিরন্তর শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নাম করুন। তাঁরা পরম দয়াল ঠাকুর। আপনাকে কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করবেন। এই উক্তি শ্রবণে যোগী দামোদরের মন বিগলিত হল। বললেন আমি গৌর-নিত্যানন্দের চরণ ভজন করব; আপনি কৃপা করুন। আচার্য্য তাঁকে অনুগ্রহ করলেন। যোগী দামোদর পরম ভক্ত হলেন। নিরন্তর গৌর-নিত্যানন্দের নাম নিয়ে ক্রন্দন করতেন।

বলরামপুরে অনেক ধনীর বসবাস ছিল। সেখানে শ্যামানন্দ প্রভুর মহিমা শুনে সকলে তাঁকে দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লেন। শ্রদ্ধালু কয়েকজন সজ্জন ব্যক্তি এসে শ্যামানন্দ প্রভুকে বহু অনুনয় সহ প্রার্থনা করলেন বলরামপুরে যাবার জন্য। শ্যামানন্দ প্রভু তাঁদের প্রতি কৃপা করলেন। আমন্ত্রণ অঙ্গীকার করলেন। শ্রীরসিক ও দামোদর-আদি ভক্তগণ সঙ্গে তিনি বলরামপুরে শুভ বিজয় করলেন। বলরামপুরের সজ্জনগণের আনন্দের সীমা রইল না। শ্যামানন্দ প্রভুর শ্রীচরণ পূজা করে তাঁর ভোজনাদির সুন্দর ব্যবস্থা করলেন। তিনি কয়েকদিন বলরামপুরে হরিকথা কীর্ত্তন মহোৎসব করলেন। বহু লোক তাঁর পাদপদ্ম আশ্রয় করলেন। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু সেখান থেকে শ্রীনৃসিংহপুরে গেলেন। নৃসিংহপুরে পূর্ব্বে বহু নাস্তিক পাষণ্ডী ব্যক্তির দল ছিল। কয়েকদিন তিনি তথায় সংকীর্ত্তন মহোৎসব অনুষ্ঠান করলেন। তাঁর দর্শনে এবং তাঁর অমৃতময় কথা শ্রবণে নাস্তিক পাষণ্ডিগণের মন বিগলিত হল। তারাও শ্রীআচার্য্যের চরণ আশ্রয় নিল।

শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর মহিমা দিন দিন উৎকল দেশে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। আচার্য্য নৃসিংহপুর হতে শ্রীগোপীবল্লভপুরে এলেন। সেখানে বহু ধনীর বাস ছিল। শ্রীআচার্য্যপাদকে দর্শন করে তাঁরা আকৃষ্ট হলেন। বহু লোক শ্রীআচার্য্যের চরণ আশ্রয় করলেন। সকলে আচার্য্যের চরণে প্রার্থনা করলেন তথায় শ্রীবিগ্রহ সেবা প্রকাশ হউক। আচার্য্য ভক্তগণের প্রার্থনা অঙ্গীকার করলেন। অতঃপর তথায় ভক্তগণের সহায়তায় ভগবদ্ মন্দির, সংকীর্ত্তন গৃহ, ভোগরন্ধন গৃহ, ভক্তগণের আবাস গৃহ, সরোবর ও উদ্যান আদি নির্মাণ করা হল। অতঃপর আচার্য্য শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু মন্দিরে শ্রীরাধাগোবিন্দ জীউর প্রকট উৎসব করলেন। সে

উৎসব যেন সমগ্র বঙ্গ ও উৎকল দেশ ভরে হল। শ্রীবিগ্রহগণের শোভা মাধুরী দেখে সকলের প্রাণ শীতল হল। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু তথাকার সেবাভার দিলেন শ্রীরসিকানন্দের উপর।

সমগ্র উৎকল দেশ ভরে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু গৌর-নিত্যানন্দের বাণী প্রচার করে ফিরে এলেন অম্বিকা কালনায় শ্রীহৃদয় চৈতন্য প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে। শ্রীগুরু পাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গ বন্দনা পূর্ব্বক উৎকল দেশাদিতে গৌর-নিত্যানন্দের বাণী প্রচারের বিজয়-বৈজয়ন্তীর কথা বর্ণন করলেন। শ্রীহৃদয় চৈতন্য শ্রবণ করে শ্যামানন্দকে স্নেহে আলিঙ্গন করতে লাগলেন।

খেতরির প্রসিদ্ধ উৎসবে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু আমন্ত্রিত হলেন। সশিষ্য শ্যামানন্দ প্রভু খেতরির দিকে যাত্রা করলেন। যথাকালে খেতরিতে উপস্থিত হলেন। তথায় পূর্ব্বতম প্রাণের মিত্র শ্রীনিবাস ও শ্রীনরোত্তমের সঙ্গে মিলন হল। পরস্পর কত প্রণয় আলিঙ্গন করে যেন সুখসিন্ধুতে ভাসতে লাগলেন। সে উৎসবে শ্রীজাহ্নবা মাতা, শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর, শ্রীঅচ্যুতানন্দ ও শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর প্রভৃতি গৌর-পার্ষদগণ ও কত মহান্ত শুভাগমন করেছিলেন। উৎসব অন্তে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু বৈষ্ণব-দিগের থেকে বিদায় নিয়ে উৎকল অভিমুখে পুনর্ব্বার যাত্রা করলেন। পথে গৌড়দেশে কণ্টকনগরে শ্রীগদাধর দাস ঠাকুরের ভবনে, যাজিগ্রামে শ্রীনিবাস আচার্য্য ভবনে ও শ্রীখণ্ডে শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের গৃহে আগমন করলেন। তখন বহু গৌরপার্ষদ অপ্রকট হয়েছেন।

শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু ক্রমে উৎকল দেশে প্রবেশ করলেন। পথে পথে ভক্তগৃহে অবস্থান এবং বহু সজ্জনকে অনুগ্রহ দান করতে করতে শ্রীগোপীবল্লভপুরে আগমন করলেন। এই সময় স্বীয় শ্রীগুরু পাদপদ্ম শ্রীহৃদয় চৈতন্য প্রভুর অপ্রকট বার্ত্তা শ্রবণ করলেন। নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ মাত্রই শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। বহু রোদন করতে লাগলেন। তিনি বড়ই ব্যাকুল হয়ে পড়লে শ্রীহৃদয় চৈতন্য প্রভু স্বপ্নে তাঁকে দর্শন দিলেন এবং আশ্বস্ত করলেন।

উৎকল দেশে আচার্য্য শ্যামানন্দ প্রভুর মহিমা চতুর্দিকে ঘোষিত হল। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নিত্য সেবা পূজা স্থানে স্থানে প্রকটিত হল। শ্রীরসিকমুরারি, শ্রীরাধানন্দ, শ্রীপুরুষোত্তম, শ্রীমনোহর, চিন্তামণি, বলভদ্র, শ্রীজগদীশ্বর, শ্রীউদ্ধব, অক্রুর, মধুবন, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীজগন্নাথ, গদাধর, আনন্দানন্দ ও শ্রীরাধা-মোহন প্রভৃতি শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর অন্তরঙ্গ প্রিয় ভক্ত ছিলেন।

শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু সর্ব্বত্র বিজয় করে ফিরে এলেন শ্রীগোপীবল্লভপুরে এবং তথায় কয়েকদিন ব্যাপী মহোৎসব করলেন।

শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু যে কীর্ত্তনের সুর প্রবর্ত্তন করেছিলেন, তার নাম 'রেনেটী'। তাঁর প্রাণমাতানো কীর্ত্তনের সুরে ভক্তগণ মোহিত হতেন। বর্তমানে এই ধরণের সুর প্রচলিত দেখা যায় না।

শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু তাঁর প্রধান শিষ্য শ্রীরসিকানন্দ দেব গোস্বামীকে গোপীবল্লভপুরে তাঁর সেবিত শ্রীগোবিন্দের সেবা সমর্পন করেছিলেন। বৃন্দাবনে শ্যামানন্দ প্রভুর সেবিত বিগ্রহ শ্রীরাধাশ্যামসুন্দর তাঁর অধস্তন কর্তৃক বর্তমানে রাধাশ্যামসুন্দর মন্দিরে সেবিত হচ্ছেন। ঐ মন্দিরটি সপ্ত দেবালয়ের মধ্যে অন্যতম।

শ্রীশ্যামানন্দপ্রভু শেষ জীবনে উৎকলে নৃসিংহপুর গ্রামে থেকে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচার করেছিলেন। ১৫৫২ শকে আষাঢ়ী কৃষ্ণ-প্রতিপৎ তিথিতে তিনি এই নৃসিংহপুর গ্রামেই তিরোধান লীলা করেন।

অদ্যাপি তাঁর সমাধিপীঠ শ্রীগোপীবল্লভপুরে নিত্য সেবা হচ্ছে।

**।। জয় শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু কি জয়।।**




# শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের পিতৃ প্রদত্ত নাম রামচন্দ্র সেন। শ্রীজীব গোস্বামী তাঁকে 'কবিরাজ' উপাধি প্রদান করেন।

শ্রীরামচন্দ্রের ভ্রাতা গোবিন্দকেও তিনি 'কবিরাজ' উপাধি প্রদান করেছিলেন।

শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গেয়েছেন—

দয়া কর শ্রীআচার্য্য প্রভু শ্রীনিবাস।
রামচন্দ্র সঙ্গ মাগে নরোত্তম দাস।।

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের অন্তরঙ্গ জন ছিলেন। সব সময় অভিন্নাত্মরূপে অবস্থান করতেন। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীনিবাস আচার্য্যের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ মহাশয়ের পিতার নাম শ্রীচিরঞ্জীব সেন, মাতার নাম—শ্রীসুনন্দা। শ্রীচিরঞ্জীব সেন প্রথমে কুমার নগরে বাস করতেন। শ্রীসুনন্দাকে বিবাহ করবার পর তিনি শ্রীখণ্ডে বাস করতেন।

শ্রীচিরঞ্জীব সেন মহাভাগবত ছিলেন। খণ্ডবাসী শ্রীনরহরি সরকার প্রভৃতি তাঁকে প্রাণের সমান ভাল বাসতেন।

শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—

মুকুন্দদাস নরহরি শ্রীরঘুনন্দন।
খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব, আর সুলোচন।।
চিরঞ্জীব সেন মহাবিজ্ঞ সর্ব্বমতে।
খণ্ডে বিলসয়ে নিজ পত্নীর সহিতে।।
অরুন্ধতীসম পতিব্রতা পত্নী তাঁর।
পরম সুশীলা অলৌকিক চেষ্টা যাঁর।।

—চৈঃ চঃ মধ্য ১১/৯২

শ্রীমুকুন্দদাস, শ্রীনরহরি, শ্রীরঘুনন্দন ও শ্রীচিরঞ্জীব সেন এঁনারা শ্রীখণ্ডে বাস করতেন এবং এক প্রাণ এক আশয়বিশিষ্ট ছিলেন। প্রতি বছর রথ-যাত্রা সময় শ্রীক্ষেত্রধামে যেতেন এবং শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণ দর্শন করে রথাগ্রে নৃত্য-গীত করতেন।

শ্রীচিরঞ্জীব সেন বৈদ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দুই পুত্র শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীগোবিন্দ। দুই পুত্র মহারত্ন ছিলেন। উভয়ে শ্রীনিবাস আচার্য্যের কৃপা লাভের পর তেলিয়া বুধরিগ্রামে বসবাস করতেন। বুধরিগ্রাম মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত।

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ অত্যন্ত উদ্যমশীল বুদ্ধিমান ও রূপবান ছিলেন। তাঁর মাতামহ ছিলেন কবি শ্রীদামোদর কবিরাজ। তিনি মহাকবি নামে খ্যাত ছিলেন। তিনি শক্তি উপাসনা করতেন এবং শাক্ত ধর্মে দীক্ষিত ছিলেন।

পিতা চিরঞ্জীব সেন পরলোক গমন করবার পর শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীগোবিন্দ মাতামহ শ্রীদামোদর কবিরাজের আলয়ে বসবাস করতেন। যেহেতু শ্রীরামচন্দ্র ও গোবিন্দ মাতামহের আলয়ে বসবাস করতেন, তাই তাঁরা শাক্ত ভাবাপন্ন হয়ে পড়েন। শ্রীরামচন্দ্র সেন চিকিৎসক ছিলেন ও তিনি মহা কবি ও যশস্বী ছিলেন।

শ্রীরামচন্দ্র সেন যাজিগ্রামের পথ দিয়ে বিবাহ করে যাচ্ছেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যের গৃহের পার্শ্ব দিয়ে যেতে তিনি ভক্তগণ পরিবেষ্টিত শ্রীনিবাস আচার্য্যকে গৃহ-অলিন্দে (বারান্দায়) বসে হরিকথা বলতে দেখলেন। আচার্য্যকে দর্শন মাত্রই শ্রীরামচন্দ্রের মনে এক অভিনব ভাবোদয় হল। দীর্ঘকাল পরে যেন প্রাণের প্রিয়তমকে দর্শন করলেন। আচার্য্যও তাঁকে দেখলেন এবং তাঁর

সঙ্গীদিগের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন। ''কি নাম? কি জাতি? এ পাত্রের কোথা স্থিতি?'' (ভঃ রঃ ৮/৫৩০) তখন তাঁরা বলতে লাগলেন–

এ মহাপণ্ডিত। রামচন্দ্র নাম কবি নৃপতি বিদিত।।
দিগ্বিজয়ী চিকিৎসক যশস্বীপ্রবর।
বৈদ্য কুলোদ্ভূত বাস কুমার নগর।।
(ভঃ রঃ ৮/৫৩২)

এ সব কথা শুনে শ্রীনিবাস আচার্য্য মৃদু হাস্য করে বললেন--

''এই দেখ বিবাহের এতেক উৎসাহ।
অর্থব্যয় করি কিনে মায়ার কলহ।।
গলে ফাঁস দিল মায়া তাহা না বুঝিয়া।
মঙ্গল আচরে দেখ কৌতুক করিয়া।।
অমঙ্গলে শুভজ্ঞান সদাই করিয়া।
উৎসব করে লোক কৃতার্থ মানিয়া।।''

শ্রীরামচন্দ্র সেন পালকীর মধ্যে বসে শ্রীল আচার্য্যের দর্শন এবং কথা শ্রবণ করেন। তখন থেকে আচার্য্যের দর্শন ও মিলনের জন্য প্রবল উৎকণ্ঠা মনে জেগে উঠে। বাড়ীতে এলেন, মহা আনন্দ কোলাহল হল, স্বজনগণের আদর আপ্যায়নের সীমা নাই। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের মন পড়ে রয়েছে পথে সেই মহাপুরুষের প্রতি। বাড়ীতে পৌঁছে মহাকষ্টে রামচন্দ্র কবিরাজ দিবা অতিবাহিত করলেন। রাত্রিকালে যাজিগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করলেন। যাজিগ্রামে এক ব্রাহ্মণ গৃহে রাত্রিযাপন পূর্ব্বক প্রাতে শ্রীনিবাস আচার্য্য ভবনে এলেন এবং আচার্য্য চরণে দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন।

শ্রীনিবাস আচার্য্য পূর্ব্ব দিবসে শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করবার পর থেকে অন্তরে কেবল তাঁর কথাই মনে করছিলেন। প্রাতঃকালে তাঁকে দর্শন করে মহানন্দে ভূমি থেকে তুলে আলিঙ্গন করলেন ও বললেন–''জন্মে-জন্মে তুমি মোর বান্ধবাতিশয়।'' (ভঃ রঃ ৮/৫৭৪) জন্মে-জন্মে তুমি আমার বান্ধব।

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ আচার্য্য চরণে অবস্থান করে গোস্বামী গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে লাগলেন। তাঁর শুদ্ধ সদাচার শিষ্টাচার ও মহানুভবতায় আচার্য্য পরম সুখী হলেন এবং কয়েক দিন বাদে তাঁকে শুভক্ষণে 'রাধাকৃষ্ণমন্ত্র' প্রদান করলেন।

কিছু দিন রামচন্দ্র কবিরাজ যাজিগ্রামে অবস্থান করবার পর নিজ গৃহে ফিরে এলেন। তৎকালে শাক্তগণ তাঁকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে পড়লেন। তাতে কবিরাজ মহাশয় ভ্রুক্ষেপ করলেন না। তিনি নিত্য দ্বাদশ-অঙ্গে তিলক ধারণ ও শ্রীহরিনাম জপাদি সর্ব্ব-সমক্ষে করতে লাগলেন।

একদিন শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ স্নান করে গৃহে যাচ্ছেন, তখন শাক্তগণ ডেকে বলতে লাগলেন–কবিরাজ! এ কি তুমি শিব পূজা না করে ঘরে যাচ্ছ? তোমার মাতামহ দামোদর কবিরাজ শিবের পরম ভক্ত ছিলেন। তুমি সেই শিবের পূজা কি ছেড়ে দিলে?

শ্রীরামচন্দ্র বললেন–শিব ও ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের গুণাত্মক অবতার। শ্রীকৃষ্ণই সকল অবতারের মূল। অতএব শ্রীকৃষ্ণের পূজা দ্বারা সকলেরই পূজা হয়। যেমন বৃক্ষের মূলে জল দিলে শাখা পল্লব সহজেই পুষ্ট হয়। প্রহ্লাদ-ধ্রুব-বিভীষণ প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ভক্ত ছিলেন বলে শ্রীশিব ও শ্রীব্রহ্মা তাঁদের প্রতি সহজেই সদয় ছিলেন। রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বান প্রভৃতি হরি-বিদ্বেষী, কেবল শিবের ভক্ত ছিল। তজ্জন্য শিব তাঁদের স্বয়ং বিনাশ করেছেন। শাস্ত্রে কথিত হয়েছে ব্রহ্মা শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা প্রভাবে বিশ্ব সৃজন এবং শিব ভগবদ্ পাদোদক গঙ্গা শিরে ধারণ-প্রভাবে জগৎ মঙ্গল করতে সমর্থ হয়েছেন। এই সমস্ত কথা শুনে স্মার্ত্ত পণ্ডিত নির্বাক হলেন।

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীবৃন্দাবন ধাম ও

গোস্বামিবৃন্দের শ্রীচরণ দর্শন করবার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লেন। শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর ও অন্যান্য বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে অনুমতি প্রার্থনা করলেন। বৈষ্ণবগণ সানন্দে তাঁকে বৃন্দাবনে গমনের অনুমতি দিলেন। শুভ দিনে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ বৃন্দাবন ধামাভিমুখে যাত্রা করলেন। পথে তিনি ক্রমে গয়া-কাশী-প্রয়াগাদি তীর্থ হয়ে শ্রীমথুরা ধামে আগমন করলেন এবং যমুনায় বিশ্রাম ঘাটে স্নান ও বিশ্রাম করলেন। আদিকেশব জন্মস্থানাদি দর্শন পূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করলেন। এ সময় শ্রীনিবাস আচার্য্য বৃন্দাবনে অবস্থান করছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীনিবাস ও শ্রীজীব গোস্বামীর শ্রীচরণ বন্দনা করলেন এবং গৌড়দেশের ভক্তগণের কুশল সংবাদ প্রদান করলেন। শ্রীরামচন্দ্র সেন শ্রীজীব গোস্বামীর আদেশ নিয়ে শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীমদনমোহন প্রভৃতি বিগ্রহ দর্শন এবং শ্রীসনাতনের সমাধি দর্শন করলেন। শ্রীগোপাল ভট্ট, শ্রীলোকনাথ ও শ্রীভূগর্ভ প্রমুখ গোস্বামিপাদের শ্রীচরণ দর্শনাদি করলেন। তাঁরা সকলেই রামচন্দ্র সেনের অদ্ভুত কবিত্ব দেখে তাঁকে কবিরাজ উপাধি প্রদান করেন।

শুনি রামচন্দ্রের কবিত্ব চমৎকার।
কবিরাজ খ্যাতি হৈল সম্মত সবার।।

—ভঃ রঃ ৯/২১৪

ব্রজে গোস্বামিগণের কাছে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ কিছুদিন অবস্থান করবার পর তাঁদের আদেশ নিয়ে পুনঃ গৌড় দেশে ফিরে এলেন। তিনি শ্রীখণ্ড, যাজিগ্রাম, খড়দহ, অম্বিকা কালনা প্রভৃতি স্থান দর্শন করে নবদ্বীপ মায়াপুরে এলেন। মায়াপুরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ভবনে তখন অতি বৃদ্ধ ঈশান ঠাকুর অবস্থান করছিলেন। রামচন্দ্র কবিরাজ নিজ পরিচয় দিয়ে তাঁর পাদপদ্ম বন্দনা করলে, তিনি প্রচুর আশীর্ব্বাদ প্রদান করেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যের অতি প্রিয় ছিলেন শ্রীরামচন্দ্র। তেমনি শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় রামচন্দ্রকে প্রাণের সমান দেখতেন।

কোন সময় স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণগণ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়কে হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্য ষড়যন্ত্র করে খেতরিতে এসেছিল। সঙ্গে রাজা নরসিংহ এবং দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত শ্রীরূপ-নারায়ণ ছিলেন। এ সব ব্যাপারে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ও শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী বড়ই মর্মাহত হন এবং স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণকে পরাস্ত করবার জন্য অগ্রসর হন। কুমারপুরের বাজারে এসে কুম্ভকার হয়ে হাঁড়ি কলসীর দোকান এবং তাম্বুলিক হয়ে পান সুপারির দোকান দিলেন। স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ কুমারপুরের বাজারে এসে খাওয়াদাওয়ার জন্য শিষ্যগণকে হাঁড়ি ও পান সুপারি কিনতে পাঠালেন, তারা এল কুম্ভকার ও তাম্বুলিকের কাছে। কুম্ভকার ও তাম্বুলিক সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতে লাগলেন। ক্রমে ছাত্রদিগের সঙ্গে বাক-বিবাদ হতে লাগল। কুম্ভকারের ও তাম্বুলিকের অগাধ বিদ্যা প্রতিভা দেখে স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ অবাক্ হলেন এবং বিচারে প্রবৃত্ত হলেন। ক্রমে তথায় রূপনারায়ণ এবং রাজা নরসিংহ এলেন। দিগ্বিজয়ী রূপনারায়ণও বিচারে প্রবৃত্ত হলেন, কিন্তু ভাগবত সিদ্ধান্তের নিকট পরাস্ত হলেন। পরিশেষে রাজা তাঁদের পরিচয় নিলেন। তাঁরা বললেন--আমরা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের অতি ক্ষুদ্র শিষ্য দাসানুদাস।

স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ ও রূপনারায়ণ তাঁদের কাছে পরাভূত হবার পর আর খেতরির দিকে অগ্রসর হতে ইচ্ছা করলেন না। সেখান থেকেই সকলে স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করলেন। রাজা নরসিংহ গৃহে ফিরে এলেন। রাত্রে দুর্গাদেবী রাজাকে স্বপ্নে স্বয়ং বললেন—''রে নরসিংহ! তোরা নরোত্তমের চরণে ঘোরতর অপরাধ করেছিস্। সে বৈষ্ণব অপরাধের

জন্য এ খড়্গ দিয়ে তোদের সকলকে খণ্ড খণ্ড করব। যদি রক্ষা পেতে চাস্ শীঘ্র নরোত্তমের পদাশ্রয় কর।'' রাজার নিদ্রাভঙ্গ হল, দেবীর কথা স্মরণপূর্ব্বক স্নানাদি করবার পর খেতরির অভিমুখে যাত্রা করলেন। এদিকে শ্রীরূপনারায়ণ পণ্ডিতও এইরূপ স্বপ্ন দেখেন। তিনিও খেতরির দিকে যাত্রা করলেন। রাজা ও রূপনারায়ণ খেতরিতে পৌঁছালেন এবং শ্রীনরোত্তম ঠাকুরকে দর্শন করবার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দিরে এলেন। ঠাকুর মহাশয় নাম ভজনে নিমগ্ন ছিলেন। সেবক রাজা ও পণ্ডিতের আগমন বার্ত্তা নিবেদন করলে বাহিরে এলেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের কৃষ্ণপ্রেমময় অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শন করেই যেন তাঁরা পবিত্র হলেন ও দণ্ডবৎ করলেন। ঠাকুর মহাশয় অতি দীনভাবে বললেন আমি অধম। আপনারা উত্তম বিদ্যাবুদ্ধি ও রাজৈশ্বর্য্যবান্। আপনাদের কিরূপে সৎকার করব? রাজা নরসিংহ ও পণ্ডিত রূপনারায়ণ ঠাকুর মহাশয়ের দৈন্যময়ী উক্তিতে একেবারেই বিগলিত হলেন। করজোড় পূর্ব্বক কৃপা প্রার্থনা করতে লাগলেন এবং দেবীর আদেশ জানালেন। ঠাকুর মহাশয় তাদের কৃপা করবেন বলে আশ্বাস দিলেন। পরে দীক্ষা মন্ত্র প্রদান করলেন।

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ মহাশয়ের কল্যাণে অনেক পাপীপাষণ্ডী উদ্ধার লাভ করে। খেতরিতে যে মহোৎসব হয়েছিল তাতে কবিরাজ মহাশয় অগ্রণী ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীনরোত্তম ও শ্রীনিবাস আচার্য্যের আদেশ নিয়ে বৃন্দাবনে পুনর্ব্বার যাত্রা করলেন। বৃন্দাবনে এসে গোস্বামিদিগের শ্রীচরণ দর্শন আর পান নাই। সকলেই প্রায় অপ্রকট লীলা করেছেন। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ গোস্বামিগণের অদর্শনে পরম ব্যাকুল হৃদয়ে অবস্থান করছিলেন। কিছুদিন বাদে তিনি শ্রীব্রজধামে শ্রীব্রজেশ্বর ও ব্রজেশ্বরীর শ্রীপাদ পদ্মযুগল চিন্তা করতে করতে নিত্য লীলায় প্রবেশ করেন। পৌষ কৃষ্ণ তৃতীয়া তাঁর নিত্যলীলা প্রবেশ তিথি।

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য ছিলেন শ্রীহরিরাম আচার্য্য।

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ একজন পদকর্ত্তা ছিলেন। তাঁর রচিত একটি গীত—

দেখ দেখ আরে ভাই, গৌরাঙ্গ চাঁদ পরকাশ।
পুর্ণিমার চাঁদ যেন উদিত আকাশ।।
সিংহরাশি পৌর্ণমাসী গোরা অবতার।
ছাড়ল যুগের ভার ধরণী নিস্তার।।
মহীতলে আছয়ে যতেক জীবতাপ।
হরল সকল পহুঁ নিজহি প্রতাপ।।
কলিযুগে তপ-জপ নাহি কোন তন্ত্র।
প্রকাশিল মহাপ্রভু হরেকৃষ্ণ মন্ত্র।।
প্রেমের বাদর করি ভরিল সংসার।
পাতকী-নারকী সব পাইল নিস্তার।।
অন্ধ অবধি যত করে পরকাশ।
বিন্দু না পড়িল মুখে রামচন্দ্র দাস।।

**।। জয় শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজ কি জয়।।**




# শ্রীল রসিকানন্দ দেব গোস্বামী

শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর (শ্রীঘনশ্যাম দাস) রচিত ভক্তিরত্নাকরে (১৫/২৭-২৮) লিখিত আছে–

''রয়নীগ্রামে প্রসিদ্ধ অচ্যুত-তনয়।
শ্রীরসিকানন্দ, শ্রীমুরারী নামদ্বয়।।
'রসিক-মুরারী' নাম প্রসিদ্ধ লোকেতে।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ অল্পক্ষণ হৈতে।।''

১৫৯০ খৃষ্টাব্দে ১৮ই কার্ত্তিক (শকাব্দ ১৫১২) শুক্ল-প্রতিপদ তিথিতে দীপমালিকা মহোৎসবের রাত্রে শ্রীরসিকানন্দদেব আবির্ভূত হন। তাঁর পিতা ছিলেন রয়ণী বা রোহিণীর জমিদার রাজা শ্রীঅচ্যুতদেব। মাতার নাম শ্রীভবানীদেবী। তিনি বহুকাল অপুত্রক ছিলেন পরে শ্রীজগদীশের করুণায় এই পুত্র-রত্ন লাভ করেন।

দশরথনন্দন ভগবান শ্রীরামচন্দ্র বন ভ্রমণের সময় রয়নীর নিকটবর্ত্তী বারায়িত (বারজিত) গ্রামে 'রামেশ্বর' শিব স্থাপন করে সীতা ও লক্ষণসহ কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন।

শ্রীরসিকানন্দের অন্য নাম মুরারি। অনেকে তাঁকে শ্রীরসিক মুরারি বলতেন। রাজা অচ্যুতদেব অল্প বয়স্ক পুত্রের বিবাহ দিয়েছিলেন। শ্রীরসিকানন্দের পত্নীর নাম ছিল শ্যামদাসী। শ্রীরসিক যেমন রূপবান্ তেমনি বিদ্বান ছিলেন ও সর্ব্ববিষয়ে যোগ্যতা সম্পন্ন ছিলেন। তিনি শ্রীগুরু পদাশ্রয় করবার জন্য উদ্গ্রীব হলে, একদিন আকাশ বাণীতে শুনলেন–

হইল আকাশ বাণী–চিন্তা না করিবে।
এথায় শ্রীশ্যামানন্দ স্থানে শিষ্য হবে।।

ভঃ রঃ ১৫/৩৪

আকাশ-বাণী বললেন–তুমি চিন্তা কর না। শ্রীশ্যামানন্দ নামে একজন মহাভাগবত পুরুষ শীঘ্র এখানে আগমন করবেন। তুমি তাঁর পদাশ্রয় কর। তখন থেকে শ্রীরসিক শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর পথ দেখতে লাগলেন।

এমন সময় ধারেন্দা বাহাদুরপুর থেকে ভক্তগণ-সঙ্গে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু রোহিণীতে শুভাগমন করলেন। শ্রীরসিকের স্বপ্ন সত্য হল, তাঁকে দেখেই বুঝতে পারলেন ইনি শ্রীশ্যামানন্দ। আচার্য্যের অপূর্ব্ব অঙ্গদ্যুতি, সর্ব্বদা গৌর-কৃষ্ণ-রসে বিহ্বল, নয়ন যুগল হতে প্রেমাশ্রু ধারা ক্ষরিত হচ্ছে। হস্তে জপ মালিকা শোভা পাচ্ছে। শ্রীরসিক শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুকে সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করে, সাদরে আহ্বান-পূর্ব্বক নিজ রাজপুরে নিয়ে এলেন। শ্রীপাদপদ্ম যুগল ধৌত পূর্ব্বক গন্ধ পুষ্প দিয়ে পূজা করলেন এবং রাজ্য কলত্রও পুত্রাদির সহিত আত্মসমর্পণ করলেন। শুভ দিনে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু রসিকানন্দকে ও তাঁর পত্নীকে রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত করলেন।

শ্রীরসিকানন্দ মন্ত্র গ্রহণের পর হ'তে, নিয়ত শ্রীগুরু পাদপদ্মের সঙ্গে সঙ্গে পরিভ্রমণ করতেন। তিনি আচার্য্যের অন্তরঙ্গ শিষ্য হলেন। শ্রীগোপীবল্লভপুরের শ্রীরাধা-গোবিন্দ দেবের সেবাভার শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু শ্রীরসিকানন্দকে সমর্পণ করলেন।

শ্রীরসিকানন্দ দেব গোপীবল্লভপুরে শ্রীরাধা-গোবিন্দদেবের সেবায় নিযুক্ত হলেন। তাঁর অপূর্ব্ব সেবায় ভক্তগণ মুগ্ধ হলেন। তিনি গোপীবল্লভপুরে ও অন্যান্য স্থানে বিশেষ ভাবে গৌর-নিত্যানন্দের

বাণী প্রচার করতে লাগলেন। তাঁর প্রভাবে বহু নাস্তিক পাষণ্ডী ব্যক্তিও গৌর-নিত্যানন্দের ভক্ত হয়েছিল।

রসিকানন্দের মহাপ্রভাব প্রচার।
কৃপা করি কৈলা দস্যু পাষণ্ডী উদ্ধার।।
ভক্তিরত্ন দিলা কৃপা করিয়া যবনে।
গ্রামে-গ্রামে ভ্রমিলেন লৈয়া শিষ্যগণে।।
দুষ্টের প্রেরিত হস্তী তারে শিষ্য কৈল।
তারে কৃষ্ণ-বৈষ্ণব সেবায় নিয়োজিল।।
সে দুষ্ট যবন রাজ প্রণত হইল।
না গণিলা ঘর কত জীব উদ্ধারিল।।
শ্রীরসিকানন্দ সদা মত্ত সংকীর্ত্তনে।
কেবা না বিহ্বল হয় তাঁর গুণগানে।।

—ভঃ রঃ ১৫/৮৬

শ্রীরসিকানন্দের কৃপায় বহু যবন, পাষণ্ডী ও নাস্তিক ব্যক্তি ভগবদ্ ভজন করে। ময়ুরভঞ্জের রাজা বৈদ্যনাথ ভঞ্জ, পটাশপুরের রাজা গজপতি, ময়নার রাজা চন্দ্রভানু প্রভৃতি সজ্জন রাজন্যবর্গ তাঁর শ্রীচরণ আশ্রয় করেন। পাপকর্ম্ম পরায়ণ জমিদার ভীম, যবন সুবা, তৎকালীন সময়ের শাসন কর্ত্তা নবাব ইব্রাহিম খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আহম্মদবেগ ও পাষণ্ডী শ্রীকর প্রভৃতি ব্যক্তিগণ তাঁর শ্রীচরণ আশ্রয় নিয়েছিল। দুষ্ট বন্য হস্তী শ্রীরসিকানন্দ দেবের কৃপায় শিষ্ট হয়ে গোপালদাস নাম প্রাপ্ত হয়েছিল, দুই বন্য ব্যাঘ্র শ্রীরসিকানন্দের কৃপায় হিংস্র ভাব ত্যাগ করেছিল।

শ্রীরসিকানন্দ দেব শ্রীগুরু শ্যামানন্দের আজ্ঞা শিরে ধারণ করে প্রায় ছয়চল্লিশ বৎসর কাল ধরাতলে শ্রীগৌরবাণী প্রচার করেছিলেন। অতঃপর তিনি রেমুনায় শ্রীগোপীনাথ দেবের শ্রীচরণ তলে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন।

কথিত আছে– শকাব্দ ১৫৭৪ ফাল্গুন শুক্ল প্রতিপদ তিথিতে ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে শ্রীরসিকানন্দ দেব বাঁশদহ হতে সাতজন সেবককে নিয়ে সংকীর্ত্তন করতে করতে রেমুনা গ্রামে গমন করেন এবং তত্রস্থ ভক্তগণের সঙ্গে কিছুক্ষণ কৃষ্ণ কথা আলাপ করে সকলকে কৃষ্ণ ভজন করতে আদেশ দিয়ে শ্রীগোপীনাথের মন্দিরে প্রবেশ করেন। শ্রীগোপীনাথের শ্রীচরণ যুগল স্পর্শ করে তিনি তাঁর অভয় শ্রীচরণে বিলীন হন।

আজও রেমুনায় ক্ষীরচোরা গোপীনাথ মন্দিরের প্রাঙ্গনে একটি বেড়ের মধ্যে রসিকমুরারীর পুষ্পসমাধি ও তাঁর সজ্জন সেবকের সমাধি দৃষ্ট হয়।

শ্রীরসিকানন্দ দেব গোস্বামীর তিরোভাব উপলক্ষ্যে রেমুনায় শিব-চতুর্দ্দশীর পর থেকে বার দিন ব্যাপী প্রতি বছর বিশেষ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীরসিকানন্দ দেবের তিন পুত্র–(১) শ্রীরাধানন্দ, (২) শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ ও (৩) শ্রীরাধাকৃষ্ণ। শ্রীগোপীবল্লভপুরের বর্ত্তমান মহান্ত বংশধরগণ শ্রীরসিকানন্দ দেবের এই পুত্রদের বংশধর।

শ্রীরসিকানন্দ দেব শ্রীশ্যামানন্দ শতক, শ্রীমদ্ভাগবতাষ্টক, কুঞ্জকেলি দ্বাদশকম্ ও বিবিধ স্তবাদি গীতাদি রচনা করেন।

**।। জয় শ্রীল রসিকানন্দ দেব গোস্বামী কি জয়।।**



# শ্রীগঙ্গামাতা গোস্বামিনী

গৌরশক্তি শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর শিষ্য-পরম্পরায় শ্রীহরিদাস পণ্ডিত গোস্বামীর দীক্ষিতা চরণাশ্রিতা শিষ্যা শ্রীগঙ্গামাতা গোস্বামিনী। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বর্ণনা করেছেন—

''সেবায় অধ্যক্ষ শ্রীপণ্ডিত হরিদাস।
তাঁর যশঃগুণ সর্ব্বজগতে প্রকাশ।।
সুশীল, সহিষ্ণু, শান্ত, বদান্য, গম্ভীর।
মধুর-বচন, মধুর-চেষ্টা, মহাধীর।।
সবার সম্মান-কর্ত্তা, করেন সবার হিত।
কৌটিল্য-মাৎসর্য্য-হিংসা শূন্য তাঁর চিত।।
কৃষ্ণের যে সাধারণ সদ্গুণ পঞ্চাশ।
সে সব গুণের তাঁর শরীরে নিবাস।।

—

পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য--অনন্ত আচার্য্য।
কৃষ্ণপ্রেমময়তনু, উদার, সর্ব্ব-আর্য্য।।
তাঁহার অনন্ত গুণ কে করু প্রকাশ।
তাঁ'র প্রিয় শিষ্য ইহ--পণ্ডিত হরিদাস।।''

চৈঃ চঃ আ ৮ম পঃ ৫৪-৫৭, ৫৯-৬০

বর্ত্তমান বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার অন্তর্গত পুঁটিয়ার রাজা ছিলেন শ্রীযুত নরেশনারায়ণ। তাঁর শচী নাম্নী একমাত্র কন্যা ছিল। শচী শিশুকাল থেকে ভগবদ্ভক্তি পরায়ণ। শচী অল্পকাল মধ্যে ব্যাকরণ কাব্য প্রভৃতি শাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। শচীর বয়স হলে তাঁর অপরূপ সৌন্দর্যে সকলে মুগ্ধ হলেন। কিন্তু শচীর মন জগতের কোন সৌন্দর্য্যশালী কিম্বা ঐশ্বর্য্যশালী পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হল না। তাঁর মন পড়ে রইল শ্রীমদনগোপালের উপর।

শ্রীযুত নরেশনারায়ণ কন্যার বিবাহের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়লেন। শ্রীশচী তা' জানতে পেরে বললেন—তিনি কোন মর্ত্ত্য মরণশীল পুরুষকে বিবাহ করবেন না। রাজা রাণী শিরে হাত দিয়ে বসলেন। একমাত্র কন্যা বিবাহ করতে চায় না। এ সব চিন্তা করতে করতে রাজা ও রাণী স্বধাম প্রাপ্ত হলেন। রাজ্যভার পড়ল শ্রীশচীর উপর। তিনি কিছু দিন রাজকার্য্য দেখাশুনা করবার পর স্বজন প্রতিনিধিগণের উপর ভার দিয়ে তীর্থ পর্য্যটনে বের হলেন। কোথায়ও চিত্তের সন্তোষ উৎপাদন হল না। সদ্গুরুর অনুসন্ধান করতে লাগলেন। পুরী ধামে এলেন। কয়েক দিন দর্শনাদি করবার পর, কোন এক প্রেরণায় শ্রীব্রজধামে এলেন। এইবার শ্রীশচীর সৌভাগ্য-শশী উদিত হল। তথায় শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের একান্ত অনুরক্ত শ্রীহরিদাস পণ্ডিত গোস্বামীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার হল। তাঁর দিব্য তেজ এবং বৈরাগ্য মূর্ত্তি দর্শন করে শ্রীশচী পরম আনন্দিত হলেন, মনে মনে চিন্তা করলেন বহু দিন পরে তিনি যেন আশ্রয় পেয়েছেন। শ্রীশচী হরিদাস পণ্ডিত গোস্বামীর শ্রীচরণে দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন ও প্রেমাশ্রুপূর্ণ নয়নে করজোড়ে তাঁর কৃপা প্রার্থনা করলেন।

শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য শ্রীঅনন্ত আচার্য্য। তিনি সর্ব্বদা কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হয়ে থাকতেন। তাঁর প্রিয় শিষ্য ছিলেন শ্রীহরিদাস পণ্ডিত গোস্বামী।

শ্রীহরিদাস পণ্ডিত গোস্বামী শ্রীশচীকে পরীক্ষা করবার জন্য বললেন—রাজকন্যার পক্ষে ব্রজে থেকে নিষ্কিঞ্চনভাবে ভজন করা সম্ভব নয়। গৃহে থেকে ভজন করা তোমার পক্ষে ভাল হবে। শ্রীশচীদেবী বুঝতে পারলেন এ সব কথা ছল করে বলা হল।

শ্রীশচী সে কথায় কান দিলেন না। তীব্র বৈরাগ্যের সহিত সেবা করতে লাগলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি উত্তম বস্ত্রাদি পরিধান করা কিম্বা অলঙ্কারাদি ব্যবহার করা একবারেই বর্জ্জন করলেন।

একদিন শ্রীহরিদাস পণ্ডিত গোস্বামী শ্রীশচীকে বললেন—যদি লজ্জা, মান ও ভয় ত্যাগ করে ব্রজে মাধুকরী করতে পার তবে কৃপা পেতে পাবে। শ্রীশচী গুরুবাক্য শ্রবণ করে অতি আনন্দিত হলেন। তখন হতে অভিমান শূন্য হয়ে সামান্য একখানা মলিন বস্ত্রে গাত্র আবৃত করে ব্রজবাসীগণের গৃহে-গৃহে মাধুকরী করতে লাগলেন। ব্রজবাসীগণ তাঁর অঙ্গের দিব্য তেজ দেখে বুঝতে পারতেন তিনি অসাধারণ স্ত্রীলোক। তাঁর তীব্র বৈরাগ্যে বৈষ্ণবগণ চমৎকৃত হলেন।

শ্রীশচীর অঙ্গখানি অতিশয় ক্ষীণ ও মলিন হয়ে পড়ল। তাতে তিনি ভ্রূক্ষেপ না করে নিয়মিত যমুনা স্নান, মন্দির মার্জন, পরিক্রমা, আরাত্রিক দর্শন ও কথা শ্রবণাদি করতে লাগলেন। শ্রীশচীর তীব্র বৈরাগ্য দেখে শ্রীহরিদাস পণ্ডিত গোস্বামীর মনে কৃপার উদ্রেক হল। তিনি শ্রীশচীকে ডেকে হাস্য করতে করতে বললেন—তুমি রাজকুমারী হয়েও শ্রীকৃষ্ণভজন প্রয়াসে যে এত ত্যাগ ও বৈরাগ্য দেখিয়েছ তাতে আমি পরম সুখী হয়েছি। তুমি শীঘ্র মন্ত্র গ্রহণ কর।

অনন্তর শ্রীশচী চৈত্রী শুক্ল-ত্রয়োদশীর দিন শ্রীহরিদাস পণ্ডিত গোস্বামীর থেকে রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। শ্রীশচী অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র পেয়ে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমময়ী হলেন। তিনি অতি দীনহীন ভাবে শ্রীগুরু গোবিন্দের সেবা করতে লাগলেন এবং প্রতিদিন পণ্ডিত গোস্বামীর নিকট গোস্বামী শাস্ত্রাদি শ্রবণ করতে লাগলেন। অল্পকালেই শ্রীশচীকে গোস্বামী সিদ্ধান্তে পারঙ্গত দেখে সকলে পরম সুখী হলেন।

শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া নাম্নী শ্রীহরিদাস পণ্ডিত গোস্বামীর একজন পরম স্নিগ্ধা শিষ্যা বৃন্দাবনে এলেন। লক্ষ্মীপ্রিয়া প্রত্যহ তিন লক্ষ হরিনাম করতেন। পণ্ডিত গোস্বামী তাঁকে আদেশ করলেন—তিনি যেন শচীকে নিয়ে শ্রীরাধাকুণ্ডে ভজন করেন। শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া শ্রীগুরুদেবের বাণী শিরে ধারণ করে শ্রীশচীসহ রাধাকুণ্ডে এলেন ও ভজন করতে লাগলেন। শ্রীশচী লক্ষ্মীপ্রিয়ার সঙ্গে প্রতিদিন গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করতে লাগলেন। শ্রীশচী এ ভাবে রাধাকুণ্ডে তীব্র ভজন করতে থাকলে শ্রীহরিদাস পণ্ডিত গোস্বামী তাঁকে ডেকে আদেশ করলেন—তুমি শীঘ্র শ্রীপুরী ধামে গিয়ে ভজন কর এবং শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের বাণী শ্রদ্ধালু জনদের মধ্যে প্রচার কর। তথাকার গৌর-পার্ষদগণ প্রায় অপ্রকট লীলা করেছেন। শ্রীশচী বৃন্দাবন থেকে ক্ষেত্র ধামে গেলেন এবং গুরুদেবের নির্দ্দেশ অনুযায়ী শ্রীসার্ব্বভৌম পণ্ডিতের গৃহে থেকে ভজন করতে লাগলেন এবং শ্রদ্ধালুজনের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করতে লাগলেন। সার্ব্বভৌম পণ্ডিতের গৃহটি বহুদিন লোকজন না থাকায় জীর্ণ শীর্ণ হয়েছিল, সেখানে কেবল মাত্র সার্ব্বভৌম সেবিত শ্রীদামোদর শালগ্রাম বিরাজ করছিলেন। শ্রীশচী সেখানে অবস্থান পূর্ব্বক নিয়মিত ভজন করতে লাগলেন। শ্রীশচীদেবীর অপূর্ব ভাগবত সিদ্ধান্ত শ্রবণ করবার জন্য শ্রদ্ধালু সজ্জন দিনের পর দিন তাঁর স্থানে আসতে লাগলেন। অল্পকালের মধ্যে প্রসিদ্ধ ভাগবত বক্তা হিসাবে তাঁর খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

পুরীর রাজা শ্রীমুকুন্দদেব একদিন শ্রীশচীদেবীর স্থানে ভাগবত শুনতে এলেন। তাঁর অপূর্ব সিদ্ধান্ত

শুনে বড়ই আকৃষ্ট হলেন। মনে-মনে তাঁকে কিছু অর্পণ করতে ইচ্ছা করলেন। ঠিক সেই দিবসের রাত্রে স্বপ্নে দেখতে লাগলেন—''শ্রীজগন্নাথ বলছেন—শচীকে শ্বেত গঙ্গার নিকটবর্ত্তী স্থানটি অর্পণ কর।'' পরদিন প্রাতে রাজা মুকুন্দদেব শ্রীশচী দেবীর নিকট এলেন। অতি বিনীতভাবে রাজাকে বসবার আসন দিয়ে শ্রীশচী তাঁর আসবার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। শ্রীমুকুন্দদেব শ্রীজগন্নাথদেবের আদেশের কথা জ্ঞাপন করে শ্বেত গঙ্গার নিকটবর্ত্তী স্থানটি গ্রহণ করতে প্রার্থনা করলেন। শ্রীশচী বিষয় সম্পত্তি গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করলেন। কিন্তু রাজা বারংবার বলতে লাগলেন। তখন শ্রীজগন্নাথের আদেশ জেনে রাজী হলেন। শ্রীমুকুন্দদেব শ্রীশচীর নামে শ্বেত গঙ্গার নিকটবর্ত্তী ভূসম্পত্তি দান পত্র করে দিলেন। শ্রীশচী যে একজন রাজকুমারী তা পূর্ব্বেই পুরীধামে প্রচারিত হয়েছিল।

একবার মহাবারুণী স্নানের যোগ উপস্থিত হলে শ্রীশচী গঙ্গা স্নানে যাবার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু শ্রীগুরুদেবের নির্দ্দেশ শ্রীক্ষেত্রেই অবস্থান করা। শ্রীগুরুদেবের কথা স্মরণ করে তিনি গঙ্গা স্নানে যাবার ইচ্ছা ত্যাগ করলেন। সেই রাত্রে শ্রীজগন্নাথদেব শ্রীশচীকে স্বপ্নে বললেন—''শচী কোন চিন্তা কর না। যে দিন বারুণী স্নান হবে, সে দিন তুমি শ্বেত গঙ্গায় স্নান কর। গঙ্গা দেবী তোমার সঙ্গ প্রার্থিনী হয়ে শ্বেত গঙ্গায় আসবে।'' স্বপ্ন দর্শন করে শ্রীশচীদেবী বড় আনন্দিত হলেন। বারুণী স্নানের যোগ উপস্থিত হল। শ্রীশচী একাকী মধ্যরাত্রে শ্বেত-গঙ্গায় স্নান করতে গেলেন। তিনি যেই মাত্র শ্বেত গঙ্গায় নামলেন অমনি গঙ্গাদেবী মহাস্রোতে তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে চললেন। তিনি ভাসতে ভাসতে শ্রীজগন্নাথের মন্দিরের অভ্যন্তরে এসে উপস্থিত হলেন। দেখলেন ক্ষেত্রবাসী সহস্র সহস্র লোক সেখানে সানন্দে স্নান করছেন। চতুর্দ্দিকে স্তব স্তুতি আনন্দ কোলাহল। তিনি সেই আনন্দ কোলাহলের মধ্যে আনন্দে স্নান করছেন।

এ কোলাহলে মন্দিরের দ্বার-রক্ষকগণের নিদ্রা ভেঙ্গে গেল। তারা অবাক হয়ে চারিদিকে দেখতে লাগলেন। শুনলেন ঐ মহাশব্দ মন্দিরের ভিতর থেকে আসছে। দ্বার-রক্ষকগণ তাড়াতাড়ি ঐ সংবাদ কার্য্যাধ্যক্ষগণকে জানাল, তাঁরা এ সংবাদ রাজার নিকট উপস্থিত করলেন। রাজা মন্দির খুলে দেখতে আদেশ দিলেন। অতঃপর মন্দির খোলা হল। অদ্ভুত ব্যাপার, ভাগবত-পাঠিকা শ্রীশচীদেবী একাকী দাঁড়িয়ে আছেন। জগন্নাথের সেবক পাণ্ডাগণ মনে করতে লাগলেন—তিনি জগন্নাথ দেবের অলঙ্কার পত্রাদি হরণ করবার জন্য অলক্ষ্যে প্রবেশ করেছেন। অনেকে বললেন তা হতে পারে না। নিশ্চয় কোন রহস্য আছে। অনন্তর শ্রীশচী দেবীকে বিচারাধীন করে বন্দীশালে রাখা হল। শ্রীশচীদেবী এতে মুহ্যমান হলেন না। তিনি সানন্দে কৃষ্ণনাম করতে লাগলেন। রাজা মুকুন্দদেব শেষ রাত্রে স্বপ্ন দেখছেন শ্রীজগন্নাথদেব রাগ করে বলছেন--শচীকে এখনই বন্দীশালা হতে মুক্ত করে দে। আমি তাঁর স্নানের জন্য নিজ চরণ থেকে গঙ্গা নিঃসৃত করে মন্দিরে আনিয়েছি। যদি তুমি মঙ্গল চাও পূজক পাণ্ডাগণসহ শচী-চরণে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাঁর থেকে মন্ত্র গ্রহণ কর। এ স্বপ্ন দেখে রাজা খুব সন্ত্রস্ত হলেন এবং প্রাতে শীঘ্র স্নানাদি সেরে পূজারী পাণ্ডাগণসহ যেখানে শ্রীশচী-দেবীকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল, সেখানে এলেন ও শীঘ্র তাঁকে মুক্ত করে তাঁর চরণে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন। রাজা বহু অনুনয়-বিনয় সহ শ্রীশচীদেবীর চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন এবং জগন্নাথদেবের আদেশ জানিয়ে মন্ত্র প্রার্থনা করতে লাগলেন।

শ্রীজগন্নাথদেবের এ লীলা দেখে শ্রীশচীদেবী প্রেমে ক্রন্দন করতে লাগলেন ও রাজাকে ভাগ্যবান্ বলে শিরে হস্ত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন। অতঃপর শ্রীশচীদেবী শ্রীজগন্নাথদেবের আদেশ জেনে এক শুভদিনে শ্রীমুকুন্দদেবকে রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দীক্ষা প্রদান করলেন। রাজার সঙ্গে বহু পূজারীও তাঁর চরণ আশ্রয় করলেন। সেই দিন থেকে শ্রীশচীর নাম হল শ্রীগঙ্গামাতা গোস্বামিনী।

মহারাজ শ্রীমুকুন্দদেব গুরু দক্ষিণা স্বরূপ কিছু ভূ সম্পত্তি শ্রীগঙ্গামাতাকে দিতে চাইলেন। তিনি রাজী হলেন না, বললেন তোমার শ্রীকৃষ্ণচরণে ভক্তি হউক এইমাত্র আমি চাই। অন্য কোন দক্ষিণা গ্রহণের অধিকারিণী আমি নই। রাজা বারংবার শ্রীগঙ্গামাতার চরণে কাতর প্রার্থনা করতে লাগলেন। অবশেষে শ্রীগঙ্গামাতা বৈষ্ণব সেবার্থে দুই ভাণ্ড মহাপ্রসাদ, এক ভাণ্ড তরকারী, একখানি প্রসাদী বস্ত্র, দুই পণ কড়ি (১৬০ পয়সা) প্রত্যহ মধ্যাহ্ন ধূপের পর মঠে প্রেরণ করবার অনুমতি দিলেন। অদ্যাবধি সে মহাপ্রসাদ নিয়মিত শ্রীগঙ্গামাতা মঠে প্রেরিত হয় এবং তা শ্রীগঙ্গামাতার সমাধি পীঠে অর্পণ করা হয়।

একবার মহীধর শর্মা নামক একজন স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্বেত গঙ্গার তীরে পিতৃ-পুরুষগণের তর্পণাদি করতে আসেন এবং শ্রীগঙ্গামাতা গোস্বামিনীর মহিমা শুনে তাঁর চরণ দর্শন করতে যান। শ্রীগঙ্গামাতা পণ্ডিতকে বহু সম্মান দিয়ে আসনে বসিয়ে এবং তাঁর অভিপ্রায় শুনতে চাইলেন। পণ্ডিত ব্রাহ্মণ সরলতার সহিত অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। তাঁর সরলতা দেখে শ্রীগঙ্গামাতা তাঁকে ভাগবত সিদ্ধান্ত শুনাতে লাগলেন। ব্রাহ্মণ সেই অপূর্ব্ব ভাগবত সিদ্ধান্ত সকল শ্রবণ করতে করতে একে-বারেই মুগ্ধ হয়ে পড়লেন। পরে তিনি শ্রীগঙ্গামাতার চরণে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। শ্রীগঙ্গামাতা শুভদিনে তাকে রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দীক্ষা প্রদান করলেন। মহীধর শর্মার জন্মস্থান ধনঞ্জয়পুর। শ্রীগঙ্গামাতার আদেশে তিনি গঞ্জাম জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নাম-প্রেম প্রচার করতেন।

### শ্রীশ্রীরসিক রায় জীউ

রাজস্থানের অন্তর্গত জয়পুর নগরীতে শ্রীচন্দ্রশর্মা নামক এক সদ্-ধর্মশীল ভক্ত ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তহার গৃহে শ্রীরসিক নামক শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ ছিলেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণ ঠিক মত শ্রীবিগ্রহের ভোগাদি অর্পণ করতে পারতেন না। এক রাতে শ্রীজগন্নাথদেব ব্রাহ্মণকে স্বপ্নে বললেন—দোমার ঘরে যে রসিক রায় শ্রীবিগ্রহ আছে, তাহর ভাল ভাবে সেবা হচ্ছে না। তুমি শীঘ্র তাকে শ্রীক্ষেত্রে শ্বেত গঙ্গার তটস্থিতা গঙ্গামাতার নিকট পৌহছিয়ে দাও। নতুবা দোমার অকল্যাণ হবে। ব্রাহ্মণ ভগবানের আদেশ পেয়ে বেশী বিলম্ব করলেন না। শীঘ্র রসিক রায়কে নিয়ে শ্রীক্ষেত্রে এলেন এবং লোককে জিজ্ঞাসা করে শ্রীগঙ্গামাতার নিকট উপস্থিত হলেন। শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহ দর্শন করে শ্রীগঙ্গামাতা খুব সুখী হলেন। ব্রাহ্মণ সমস্ত কথা বললেন। তা শুনে শ্রীগঙ্গামাতা বললেন—আমি ভিখারিণী। মাধুকরী করে খাই। বিগ্রহ সেবা কি করে করব? আপনি বিগ্রহ নিয়ে যান। আমাকে অপরাধী করবেন না। ব্রাহ্মণ নিরুপায়। কি করেন? খুব চিন্তা করলেন। অবশেষে শ্রীগঙ্গামাতার তুলসী কাননের মধ্যে শ্রীরসিক রায়কে রেখে ব্রাহ্মণ রাত্রে পালিয়ে গেলেন।

এদিকে শ্রীরসিক রায় রাত্রে স্বপ্নে গঙ্গামাতাকে বলতে লাগলেন—আমি দোমার সেবা গ্রহণ করবার জন্য এখানে এসেছি। ব্রাহ্মণ আমাকে তুলসী কাননে ছেড়ে চলে গেছে। আমার এখনও ভোজন হয়নি। আমাকে কিছু ভোজন করাও।

স্বপ্ন দেখে শ্রীগঙ্গামাতা চমৎকৃত হলেন। স্বয়ং






শ্রীহরি তহার কছে এসে কিছু ভোজন করতে চান। এ সব চিন্তা করে গোস্বামিনী প্রেমে পুলকিত হয়ে তাড়াতাড়ি স্নান করলেন ও তুলসী কাননে এলেন। দেখলেন শ্রীরসিক রায় বিরাজ করছেন। শ্রীগঙ্গামাতা প্রেমাশ্রু-পূর্ণ নয়নে বিগ্রহকে সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করলেন। ঠাকুরের ভোজন হয়নি। তিনি ক্ষুধার্ত্ত ভেবে বড় ব্যাকুল চিত্তে তঁহাকে গৃহে নিয়ে গেলেন, তাড়াতাড়ি স্নানাদি করিয়ে কিছু ভোগ লাগালেন। তিনি দেখলেন ক্ষুধার্ত্ত রসিক রায় সমস্ত উপকরণ দ্রুত ভোজন করছেন। শ্রীগঙ্গামাতা আনন্দাশ্রুতে ভাসতে লাগলেন। তারপর নূতন বস্ত্রাদি পেতে ঠাকুরকে শয়ন করালেন।

সকাল বেলা ভক্তগণ শ্রীগঙ্গামাতার গৃহে শ্রীরসিক রায়কে দেখে অবাক হলেন। তারপর সকলে শ্রীরসিক রায়ের বৃত্তান্ত শুনে আনন্দে 'হরি' 'হরি' ধ্বনি করতে লাগলেন।

প্রতিদিন শ্রীগঙ্গামাতা বহু প্রণয় ভরে বহু প্রকার ব্যঞ্জন পিঠা-পানাদি দৈরী করে শ্রীরসিক রায়কে ভোজন করাতে লাগলেন। বিগ্রহ সেবায় শ্রীগঙ্গামাতার চার প্রহর সময় অতিবাহিত হত।

কিছুদিন ভিক্ষা করে তিনি শ্রীরসিক রায়ের সেবা করেন। বয়স হওয়ায় শ্রীগঙ্গামাতার ভিক্ষাদি করতে পরিশ্রম হত। শ্রীরসিক রায় তঁহার পরিশ্রম দেখে কৌশলে ধনী বণিকদের থেকে দ্রব্য সম্ভার সংগ্রহ করতেন। বয়স হবার পর সেবার ত্রুটি হচ্ছে মনে করে গঙ্গামাতা শ্রীরসিক রায়ের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করে বলেন—পরিচর্য্যা করতে তিনি অক্ষম। তাই জীবন আর ধারণ করতে চান না। তা শুনে শ্রীরসিক রায় স্বপ্নে বললেন— দোমার সেবায় আমি সুখী, তুমি খেদ কর না। তুমি আর কিছুদিন সেবা কর।

অনন্তর কিছুদিন পরে গঙ্গামাতা শ্রীরসিক রায়কে আবার জানান যে তিনি আর থাকতে চান না। প্রাণ ত্যাগের সময় তঁহার নাম করতে করতে যেন যেতে পারেন। শ্রীরসিক রায় বললেন—তুমি কোন চিন্তা কর না, উপযুক্ত শিষ্যের হাতে আমার সেবা ভর দিয়ে তুমি আমার ধামে চলে এস।

অতঃপর বনমালী দাস নামক একজন শান্ত দান্ত ভক্তের হাতে শ্রীগঙ্গামাতা শ্রীরসিক রায়ের সেবা অর্পণ করে ১২০ বছর বয়সে ১৭২১ খৃষ্টাব্দে আশ্বিন শুক্লা একাদশী তিথিদে শ্রীরসিকরায়ের শ্রীচরণ চিন্তা এবং নয়নে তঁহার শ্রীরূপ মাধুরী দর্শন করতে করতে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন।

শ্রীগঙ্গামাতা গোস্বামিনীর আবির্ভাব ১৬০১ খৃষ্টাব্দে।

গঙ্গামাতা মঠের বিবৃতি অনুসারে জানা যায় শ্রীগঙ্গামাতা ১৬০১ খৃষ্টাব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাদশমী তিথিতে আবির্ভূত হয়ে ১৭২১ খৃষ্টাব্দে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন।।

**।। জয় শ্রীগঙ্গামাতা গোস্বামিনী কি জয়।।**



# শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর আনুমানিক ১৫৬০ শকাব্দে (মতান্তরে ১৫৭৬ শকাব্দে) নদীয়া জেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ দেবগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর পিতার নাম শ্রীরামনারায়ণ চক্রবর্ত্তী। শ্রীরামভদ্র চক্রবর্ত্তী ও শ্রীরঘুনাথ চক্রবর্ত্তী নামে তাঁর দুজন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের গুরুদেবের নাম শ্রীরাধারমণ চক্রবর্ত্তী। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাস পঞ্চাধ্যায়ে সারার্থ দর্শিনী টীকায় নিজ গুরু-পরম্পরা বর্ণনা করেছেন—

''শ্রীরামকৃষ্ণ গঙ্গাচরণান্ নত্বা গুরুনুরুপ্রেম্নঃ।
শ্রীল নরোত্তমনাথ শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুং নৌমি।।''

শ্রীগৌরসুন্দর থেকে শ্রীলোকনাথ গোস্বামী, তাঁর থেকে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর থেকে শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী। তাঁর থেকে শ্রীকৃষ্ণচরণ চক্রবর্ত্তী। তাঁর থেকে শ্রীরাধারমণ চক্রবর্ত্তী। এই রাধারমণ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর নদীয়াতে থাকতেই ব্যাকরণ কাব্য অলঙ্কার শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেছিলেন। প্রবাদ আছে যে পাঠদ্দশাতেই তিনি এক জন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে তর্কে পরাস্ত করেছিলেন। বাল্যকাল থেকে তিনি সংসারের প্রতি উদাসীন ছিলেন। সংসারে আবদ্ধ করে রাখবার জন্য পিতা তাঁকে অল্পবয়সে বিবাহ দিয়েছিলেন। কিছুকাল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর গৃহে ছিলেন। অনন্তর গৃহ ত্যাগ করে তিনি বৃন্দাবনবাসী হন। স্বজনগণ গৃহে ফিরিয়ে আনবার জন্য অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বৃন্দাবন ধামে গিয়ে রাধাকুণ্ড তীরে শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভজন কুটীরে তদীয় শিষ্য শ্রীমুকুন্দ দাসের সঙ্গে বসবাস করতেন এবং গোস্বামী গ্রন্থ-অধ্যয়ন করেন। তিনি বহু গোস্বামী গ্রন্থের টীকা ঐ স্থানে বসেই লিখে ছিলেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীগোকুলানন্দ বিগ্রহের সেবা করতেন। তিনি মহান্ত সমাজে শ্রীহরিবল্লভ দাস নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁর চক্রবর্ত্তী উপাধিটি ভক্তগণ দিয়েছিলেন। স্বপ্ন বিলাসামৃত গ্রন্থের ভূ মিকায় আছে—

বিশ্বাস্য নাথরূপোঽসৌ ভক্তির্বর্ত্ম প্রদর্শনাৎ।
ভক্ত চক্রে বর্ত্তীতত্ত্বাচ্চক্রবর্ত্ত্যাখ্যয়া ভবৎ।।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের মধ্যকালীয় সংরক্ষক ও আচার্য্য। সাধারণ ভক্তগণের মধ্যে তাঁর তিনটি গ্রন্থের বিষয়ে কিংবদন্তী আছে,—

''কিরণ-বিন্দু-কণা।
এই তিন নিয়ে বৈষ্ণবপনা।।''

অর্থাৎ কিরণ-উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থের তাৎপর্য প্রকাশ গ্রন্থ 'উজ্জ্বল নীলমণি কিরণ', বিন্দু—ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর তাৎপর্য প্রকাশক গ্রন্থ 'ভক্তিরসামৃত সিন্ধু-বিন্দু' এবং কণা—লঘু ভাগবতের সার সংকলনে 'শ্রীভগবতামৃত কণা'।

মহাপ্রভুর পরে ষড়গোস্বামী ও অন্যান্য গোস্বামীগণের অপ্রকটের পরে শুদ্ধভক্তির ধারা নরোত্তম, শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দ প্রভুকে আশ্রয় করে প্রবাহিত হয়েছিল। এই প্রভুত্রয়ের পরে নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য পরম্পরায় বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর চতুর্থ অধস্তন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ বহিষ্কৃত শ্রীরূপকবিরাজ অতিবাড়ী নামে একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি করে এরূপ প্রচার করেন যে,– ''শুধুমাত্র ত্যাগী ব্যক্তিই আচার্য্যের কার্য্য করতে পারবেন, গৃহস্থগণ কখনই তা করতে পারবেন না।'' তিনি বিধিমার্গকে সম্পূর্ণরূপে অবজ্ঞা করে শ্রবণ কীর্ত্তনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা নাই এরূপ বলে বিশৃঙ্খলতাপূর্ণ রাগমার্গ প্রচার করেছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের সারার্থ-দীর্শিনী টীকায় এর প্রতিবাদ করে জীবের আত্যন্তিক কল্যাণ বিধান করেছেন। রূপকবিরাজের অভিমত– আচার্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করলেও গৃহস্থ কখনও 'গোস্বামী' শব্দ বাচ্য নয়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-এর প্রতিবাদ করে শাস্ত্রযুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেছেন,– আচার্য্যবংশের যোগ্য অধস্তন গৃহস্থসন্তানও আচার্য্যের কার্য্য করতে বা গোস্বামী হতে পারেন। কিন্তু ধন-শিষ্যাদির লোভে অযোগ্য আচার্য্যকুলোৎপন্ন নিজ নিজ সন্তানগণের নামের পেছনে 'গোস্বামী' শব্দের ব্যবহার শাস্ত্র বিরুদ্ধ ও নিতান্ত অবৈধ।

একবার জয়পুর রাজ দরবারে রামানুজ সম্প্রদায়ের লোকেরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় সম্পর্কে কিছু তর্ক উত্থাপন করলে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী তাঁর শিষ্য ও ছাত্র শ্রীবলদেব বিদ্যাভুষণকে সেখানে পাঠিয়েছিলেন। পরিশেষে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিজয় হয়েছিল এবং ভগবৎ ইচ্ছায় বলদেব বিদ্যাভূষণের দ্বারা গোবিন্দ ভাষ্য রচিত হয়েছিল। ঘটনাটি এই গ্রন্থের... পৃষ্ঠায় শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের জীবনীতে দ্রষ্টব্য।

একদিন বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী চিন্তিত হলেন, কারণ কবিরাজ গোস্বামী ব্রহ্ম গায়ত্রীর ব্যাখ্যায় পঁচিশ অক্ষর না লিখে সাড়ে চব্বিশ অক্ষর লিখেছেন। তিনি অনেক চিন্তা করেও কিছু স্থির করতে পারলেন না। পরিশেষে রাধাকুণ্ড তটে দেহ ত্যাগ করার সঙ্কল্প করলেন। মধ্যরাতে রাধারাণী স্বপ্নে এসে বললেন, ''হে বিশ্বনাথ! হে হরিবল্লভ! তুমি শীঘ্রই উঠ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ যা লিখেছেন তা সত্যই। তিনি আমার নর্ম্ম সহচরী।'' ০০ 'বর্ণাগমভাস্বৎ' গ্রন্থে উল্লেখ আছে,–'য' কারের পর যদি 'বি' অক্ষর থাকে, তাহলে সেই 'য' কারই অর্দ্ধকার।'

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ সম্বন্ধে একটি অলৌকিক ঘটনার কথা শোনা যায়। তিনি যেস্থানে ভাগবত লিখ তেন সেইস্থানে পুঁথিতে জল পড়লেও জলের দ্বারা সিক্ত হত না, পাতাগুলি অটুট থাকত। তাঁর স্থাপিত বিগ্রহ শ্রীগোকুলানন্দ জীউ বৃন্দাবনস্থ শ্রীগোকুলানন্দ মন্দিরে বিরাজিত আছেন। আনুমানিক ১৬৩০ শকাব্দে মাঘী গৌরপঞ্চমী তিথিতে (মতান্তরে কৃষ্ণাপঞ্চমী) তিনি শ্রীরাধাকুণ্ডে অপ্রকট হন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর যে সমস্ত গ্রন্থ লিখেছেন, তার একটি তালিকা–

১। ব্রজরীতিচিন্তামণি, ২। শ্রীচমৎকারচন্দ্রিকা, ৩। প্রেমসম্পুটম্ (খণ্ডকাব্যম্), ৪। গীতাবলী, ৫। সুবোধিনী (অলঙ্কারকৌস্তুভটীকা), ৬। আনন্দ-চন্দ্রিকা (উজ্জ্বলনীলমণিটীকা), ৭। শ্রীগোপালতাপনীটীকা,৮।স্তবামৃত-লহরীধৃত--(ক) শ্রীগুরুতত্ত্বাষ্টকম্, (খ) মন্ত্রদাতৃগুরোরষ্টকম্, (গ) পরম-গুরোরষ্টকম্, (ঘ) পরাৎপরগুরোরষ্টকম্, (ঙ) পরমপরাৎপরগুরোরষ্টকম্, (চ) শ্রীলোকনাথাষ্টকম্, (ছ) শ্রীশচীনন্দনাষ্টকম্, (জ) শ্রীস্বরূপচরিতামৃতম্, (ঝ) শ্রীস্বপ্নবিলাসামৃতম্, (ঞ) শ্রীগোপালদেবাষ্টকম্, (ট) শ্রীমদনমোহনাষ্টকম্, (ঠ) শ্রীগোবিন্দাষ্টকম্, (ড) শ্রীগোপীনাথাষ্টকম্, (ঢ) শ্রীগোকুলানন্দাষ্টকম্, (ণ) স্বয়ং ভগবদাষ্টকম্, (ত) শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টকম্,

(থ) জগন্মোহনাষ্টকম্, (দ) অনুরাগবল্লী, (ধ) শ্রীবৃন্দাদেব্যষ্টকম্, (ন) শ্রীরাধিকাধ্যানামৃতম্, (প) শ্রীরূপচিন্তামণিঃ, (ফ) শ্রীনন্দীশ্বরাষ্টকম্, (ব) শ্রীবৃন্দাবনাষ্টকম্, (ভ) শ্রীগোবর্দ্ধনাষ্টকম্, (ম) শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুমঃ, (য) শ্রীনিকুঞ্জবিরুদাবলী (বিরুৎকাব্য), (র) সুরতকথামৃতম্ (আর্য্যশতকম্), (ল) শ্রীশ্যামকুণ্ডাষ্টকম্, ৯। শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতমহাকাব্যম্, ১০। শ্রীভাগবতামৃতকণা, ১১। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিঃ কিরণলেশঃ, ১২। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু বিন্দুঃ, ১৩। রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা, ১৪। ঐশ্বর্য্যকাদম্বিনী (দুষ্প্রাপ্য), ১৫। মাধুর্য্যকাদম্বিনী, ১৬। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুটীকা, ১৭। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিটীকা, ১৮। দানকেলিকৌমুদীটীকা, ১৯। শ্রীললিত-মাধবনাটকটীকা, ২০। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-টীকা (অসম্পূর্ণা), ২১। ব্রহ্মসংহিতা-টীকা, ২২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার 'সারার্থবর্ষিণী'-টীকা, ২৩। শ্রীমদ্ভাগবতের 'সারার্থদর্শিনী'-টীকা।

**।। জয় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কি জয়।।**

# শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু

শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-সারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে শুদ্ধ ভাগবত পরম্পরায় অথবা গুরুপরম্পরায় শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু নিত্য স্মরণীয়।

বিশ্বনাথ ভক্ত সাথ, বলদেব জগন্নাথ
তাঁর প্রিয় শ্রীভক্তিবিনোদ।

শ্রীমৎ বলদেব বিদ্যাভূষণ ছিলেন নিষ্কিঞ্চন পরম ভাগবত। কোন প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খা তাঁর বিন্দুমাত্র ছিল না। তিনি বহু অমূল্য গ্রন্থ রত্ন লিখে মানব জাতির মহৎ উপকার করে গেছেন। তিনি কোথাও নিজের বংশ, পিতা-মাতা কিম্বা জন্মস্থানের কোন পরিচয় প্রদান করেন নাই। তজ্জন্য তাঁর জন্ম সম্বন্ধে সঠিক খবর পাওয়া যায় না।

কেউ কেউ অনুমান করেন বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত রেমুনার পার্শ্ববর্ত্তী কোন গ্রামে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে তাঁর জন্ম হয়। অল্প বয়সে ব্যাকরণ কাব্য অলঙ্কার ও ন্যায় শাস্ত্রে বিশেষ সুদক্ষতা লাভ করেন এবং তিনি তীর্থ ভ্রমণে বের হন। এ সময় কিছুদিন তিনি তত্ত্ববাদী শ্রীমাধ্বাচার্য্যের মঠে অবস্থান করে তত্ত্ববাদ শুদ্ধাদ্বৈত সিদ্ধান্তে পারঙ্গত হন। পরে তত্ত্ববাদ সিদ্ধান্ত প্রবলভাবে ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচার করেন।

ভ্রমণ করতে করতে শ্রীমৎ বলদেব বিদ্যাভূষণ পুনরায় উৎকল দেশে আগমন করেন এবং কিছুদিন প্রচার কার্য্য চালান। এ সময় শ্রীরসিকানন্দ দেবের প্রশিষ্য পণ্ডিত শ্রীরাধা-দামোদর দেবের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ও বাক্যালাপ হয়।

শ্রীমদ্ রাধাদামোদর দেব গোস্বামী তখন তাঁর কাছে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা অবদানের কথা বর্ণন করেন এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের সার্ব্বভৌমত্বের কথা তাঁকে জানান। শ্রীমদ্ রাধাদামোদর দেব গোস্বামীর কথা শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের মর্ম স্পর্শ করে।

তিনি সেখান থেকে শ্রীজীব গোস্বামীর কৃত ষট্সন্দর্ভ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করে গৌড়ীয়

বৈষ্ণব ধর্মের সর্ব্বোত্তমতা উপলব্ধি করেন। কিছুদিন পরে তিনি শ্রীরাধাদামোদর দেবকে গুরুত্বে বরণ করেন।শ্রীরাধাদামোদর দেব গোস্বামী শ্রীনয়নানন্দের দীক্ষিত শিষ্য ছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য পরম্পরায় শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত-শ্রীহৃদয়চৈতন্য প্রভু শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু-শ্রীরসিকানন্দ দেব গোস্বামী-শ্রীনয়নানন্দ- শ্রীরাধাদামোদর দেব গোস্বামী।

শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ অল্পকাল মধ্যে গৌড়ীয় সিদ্ধান্তে পারঙ্গত হলেন। কিছুদিন শ্রীরাধাদামোদর দেব গোস্বামীর নিকট অবস্থান করবার পর, তিনি তাঁর অনুমতি নিয়ে শ্রীপীতাম্বর দাসের নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন আর কিছু বিশেষ জানবার আশায় বৃন্দাবনে শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদের নিকট আগমন করেন।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী (শ্রীহরিবল্লভ দাস) শ্রীবলদেবের বিনয়, নম্রতা, বৈরাগ্য ও স্বাধ্যায়শীলতা দর্শন করে বড় সুখী হন। তিনি তাঁকে তাঁর কাছে রেখে গৌড়ীয় অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধে বিশেষভাবে শিক্ষা প্রদান করতে লাগলেন। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ এ সময় থেকে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত মনে প্রাণে একান্তভাবে গ্রহণ করেন এবং প্রচার করতে থাকেন।

এই সময় জয়পুর রাজ দরবারে গৌড়ীয় সম্প্রদায় সম্বন্ধে শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ের লোকেরা কিছু তর্ক উত্থাপন করেন। তাঁরা রাজাকে জানান গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের কোন ভাষ্য-গ্রন্থ নাই, অতএব তাঁদের মত সিদ্ধান্ত নয় সেকারণে শ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথের সেবা শ্রীসম্প্রদায়ের হাতে দেওয়া হোক। তখন জয়পুরের রাজা গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের শিষ্য ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ এই সংবাদ বৃন্দাবনে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর নিকট প্রেরণ করেন এবং জানতে চান গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বেদান্ত ভাষ্যগ্রন্থ আছে কিনা? যদি থাকে তা যেন শীঘ্র জয়পুরে শ্রীসম্প্রদায়ী পণ্ডিতগণের সম্মুখে স্থাপন করা হয়।

তখন শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ অতি বৃদ্ধ দুর্গম পথ অতিক্রম করে জয়পুরে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তিনি তাঁর শিষ্য ও ছাত্র শ্রীবলদেবকে প্রেরণ করলেন। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ সর্ব্ব দর্শন-শাস্ত্রে পারঙ্গত। তিনি বিশাল সভামধ্যে শ্রীসম্প্রদায়ী রামানন্দী পন্থি পণ্ডিতগণের সহিত তুমুল তর্ক যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। সিদ্ধান্ত বিচারে তাঁরা শ্রীবলদেবের সম্মুখে দাঁড়াতে পারলেন না। তিনি বললেন—গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতকেই অকৃত্রিম বেদান্ত ভাষ্য বলে স্বীকার করেছেন। ষট্সন্দর্ভ তাঁর প্রমাণ। এতে সভাস্থলে শ্রীসম্প্রদায়ী পণ্ডিতগণ আপত্তি তুললেন—সাক্ষাৎ বেদান্ত ভাষ্য ব্যতীত অন্য কিছু স্বীকার করতে চাইলেন না। অগত্যা শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ তাঁদের ভাষ্য দেখাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ অতি দুঃখিত মনে শ্রীগোবিন্দ মন্দিরে এলেন এবং সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করে সমস্ত কথা শ্রীগোবিন্দ দেবের কাছে নিবেদন করলেন। রাত্রে স্বপ্নে শ্রীগোবিন্দ দেব তাঁকে বললেন তুমি ভাষ্য রচনা কর। উহা আমার সম্মত ভাষ্য হবে। কেউ অগ্রাহ্য করতে পারবে না। স্বপ্ন দর্শনে শ্রীবলদেব সুখী হলেন ও হৃদয়ে পূর্ণবল লাভ করলেন। অতঃপর শ্রীগোবিন্দ পাদপদ্ম যুগল ধ্যানপূর্ব্বক ভাষ্য লিখতে আরম্ভ করলেন, কয়েক দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ করলেন। ভাষ্যের নাম রাখা হল শ্রীগোবিন্দ ভাষ্য।

ভাষ্যের শেষভাগে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ লিখলেন—

বিদ্যারূপং ভূষণং মে প্রদায়
খ্যাতিং নিন্যে তেন যো মামুদারঃ।
শ্রীগোবিন্দ স্বপ্ননির্দ্দিষ্ট ভাষ্যো
রাধাবন্ধুবন্ধুরাঙ্গঃ স জীয়াৎ।।

যিনি আমার প্রতি অতি উদার ও দয়া পরবশ হয়ে স্বপ্নাদেশ দিয়ে ভাষ্য লিখিয়েছেন, যে ভাষ্য বিদ্বৎ সমাজে পরম খ্যাতি লাভ করেছে এবং যে ভাষ্যের জন্য বিদ্বানগণ আমাকে বিদ্যাভূষণ উপাধি দান করেছেন, সে শ্রীরাধিকার প্রাণবন্ধু শ্রীগোবিন্দ জয় যুক্ত হউন।

ভাষ্য গ্রন্থ নিয়ে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ সভাস্থলে এলেন এবং রামানন্দী পণ্ডিতগণকে দেখালেন। এবার সকলে নির্ব্বাক হল। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের জয় ঘোষিত হল। রাজা এবং গৌড়ীয় ভক্তগণ পরম সুখী হলেন। পণ্ডিতগণ শ্রীবলদেবকে 'বিদ্যাভূষণ' উপাধি প্রদান করলেন। সেই থেকে তিনি বলদেব বিদ্যাভূষণ হলেন।

এই সভা জয়পুরের গলতা নামক স্থানে ১৬২৮ শকাব্দে হয়েছিল। সে দিন থেকে মহারাজ ঘোষণা করেন যে—শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউর আরতি সর্ব্বাগ্রে হবে।

শ্রীসম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণ বলদেব বিদ্যাভূষণের নিকট পরাভব স্বীকার করলেন এবং শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে চাইলেন। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ অতি বিনীতভাবে তাতে অস্বীকৃতি জানালেন। চারি সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীসম্প্রদায় ভগবদ্ দাস্য ভক্তিতে শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বমান্য। তাঁদের কোন প্রকার মর্য্যাদাহানি হলেই অপরাধ সম্ভাবনা।

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ জয়পুর থেকে জয় পত্র নিয়ে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করলেন ও সমস্ত কথা নিবেদন করলেন। বৃন্দাবন বাসী বৈষ্ণবগণ পরম সুখী হলেন। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী শ্রীবলদেবকে প্রচুর আশীর্ব্বাদ করলেন। শ্রীবলদেব ষট্সন্দর্ভের ভাষ্য লিখতে আরম্ভ করলেন।

অতঃপর শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর অপ্রকট হলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতের একটি জ্যোতিষ্ক যেন অস্তমিত হল। সেই সময় শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণপাদ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সঙ্ঘের পাত্ররাজরূপে অধিষ্ঠিত হন।

শোনা যায়, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু বিরক্ত বৈষ্ণবের বেশও গ্রহণ করেছিলেন। সেই সময় তাঁর নাম হয় 'কান্তী গোবিন্দ দাস'। তাঁর দুইজন প্রসিদ্ধ শিষ্য ছিলেন—শ্রীউদ্ধব দাস ও শ্রীনন্দন মিশ্র। কথিত হয় শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু গল্তাগাদীতে 'বিজয়গোপাল' বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত গ্রন্থ সমূহ—

১। ব্রহ্মসূত্রভাষ্য--গোবিন্দভাষ্য, ২। সিদ্ধান্তরত্ন, ৩। বেদান্তস্যমন্তক, ৪। প্রমেয়রত্নাবলী, ৫। সিদ্ধান্তদর্পণ, ৬। সাহিত্যকৌমুদী, ৭। কাব্যকৌস্তুভ, ৮। ব্যাকরণকৌমুদী (দুষ্প্রাপ্য), ৯। পদকৌস্তুভ, ১০। বৈষ্ণবানন্দিনী (শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধের টীকা), ১১। গোপালতাপনী-ভাষ্য, ১২। ঈশাদি-দশোপনিষদ্-ভাষ্য, ১৩। শ্রীগীতাভূষণ- ভাষ্য, ১৪। শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম-ভাষ্য (নামার্থসুধা), ১৫। শ্রীসংক্ষেপভাগবতামৃতটিপ্পনী – ''সারঙ্গরঙ্গদা', ১৬। তত্ত্বসন্দর্ভটীকা, ১৭। শ্রীল রূপ গোস্বামীর স্তবমালার—'স্তবমালা-বিভূষণ' -ভাষ্য, ১৮। নাটকচন্দ্রিকাটীকা (দুষ্প্রাপ্য), ১৯। ছন্দঃকৌস্তুভ-ভাষ্য, ২০। শ্রীশ্যামানন্দশতকটীকা,

২১। চন্দ্রালোকটীকা (দুষ্প্রাপ্য), ২২। সাহিত্য-কৌমুদীটীকা– কৃষ্ণানন্দিনী, ২৩। শ্রীগোবিন্দভাষ্যটীকা–সূক্ষ্মা, ২৪।সিদ্ধান্তরত্নটীকা– 'সূক্ষ্মা'। তাছাড়া এও শোনা যায় যে, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু 'ঐশ্বর্যকাদম্বিনী' নামে একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন যা বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ লিখিত 'ঐশ্বর্য্যকাদম্বিনী' হতে পৃথক্। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ লিখিত 'ঐশ্বর্যকাদম্বিনী' গ্রন্থে দ্বৈতাদ্বৈত প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু বলদেবকৃত 'ঐশ্বর্য্যকাদম্বিনী'তে উক্ত প্রসঙ্গ নাই।

**।। জয় শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু কি জয়।।**

# শ্রীমধুসূদন দাস বাবাজী মহারাজ

ইংরাজী ১৯৩২ সনে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীবাসুদেব প্রভু (ভক্তি প্রসাদ পুরী) কে সঙ্গে নিয়ে শ্রীশ্রীমদ্ মধুসূদন দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি দর্শন ও জীবনতথ্য সংগ্রহের জন্য ব্রজ ধামে সূর্য্যকুণ্ডে গিয়েছিলেন। সেই সময় তিনি যে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, তার কিছু অংশ এখানে সংক্ষিপ্ত ভাবে উদ্ধৃত হল।

শ্রীমধুসূদন দাস বাবাজী মহারাজ ছিলেন পরম নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবত। জগতের লোক যে কনক কামিনী ও প্রতিষ্ঠার জন্য লালায়িত, তিনি সে সমস্তকে ভজনের পরম প্রতিকূল জেনে বহুদূরে অবস্থান করতেন। দুঃখের বিষয় এরূপ একজন মহাভাগবত পুরুষের সমাধি ছাড়া জগতে আর কোন পরিচয় নাই।

''শ্রীমধুসূদন দাস বাবাজী মহারাজ সূর্য্যকুণ্ডে ভজন করতেন। সূর্য্যকুণ্ডে শ্রীমতী রাধা ঠাকুরাণী সূর্য্য পূজার জন্য আগমন করতেন ও সূর্য্য পূজা করতেন। তিনি কুণ্ডতটে একখানি লাল প্রস্তরের উপরে মুকুট রেখে স্নান করতেন। সে প্রস্তরে মুকুটের চিহ্ন আজও পরিদৃষ্ট হয়।

শ্রীরাধাকুণ্ড হতে প্রায় পাঁচ মাইল উত্তরে সূর্য্যকুণ্ড। কুণ্ডতীরে শ্রীসূর্য্য বিহারী (শ্রীকৃষ্ণের) মন্দির। সূর্য্যকুণ্ডের পশ্চিমতটে শ্রীশ্রীমধুসূদন দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি মন্দির। পার্শ্বে একটি মন্দিরে বাবাজী মহারাজের সেবিত শ্রীশ্রীগিরিধারীর ও নামব্রহ্মের ফটো আছে। মাধুকরী ভিক্ষার দ্বারা বাবাজী মহারাজের নিত্য ভোগ ও গুড় মাত্র ভোগের দ্বারা গিরিধারীর সেবা হয়।

অগ্রহায়ণী শুক্লাষ্টমী তিথিতে শ্রীবাবাজী মহারাজের সমাধিতে অপ্রকট মহোৎসব হয়। শ্রীবাবাজী মহারাজের সমাধির দক্ষিণ দিকে আত্ম রও তিনটি সমাধি পরিদৃষ্ট হয়। দুইটি শ্রীবাবাজী মহারাজের শিষ্যদ্বয় শ্রীগোবিন্দ দাসের ও শ্রীহরিগোপাল দাসের। অপরটি শ্রীহরিগোপাল দাসের শিষ্য শ্রীগৌর দাসের।

গুরু পরম্পরায় শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীপাদের শিষ্য শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণ। বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণের শিষ্য উদ্ধব দাস বা উদ্ধর দাস, তাঁর শিষ্য শ্রীমধুসূদন দাস বাবাজী মহারাজ।

শ্রীমধুসূদন দাস বাবাজী মহারাজের প্রধান তিন শিষ্য– শ্রীগোবিন্দ দাস, শ্রীহরিগোপাল দাস ও শ্রীজগন্নাথ দাস। শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের

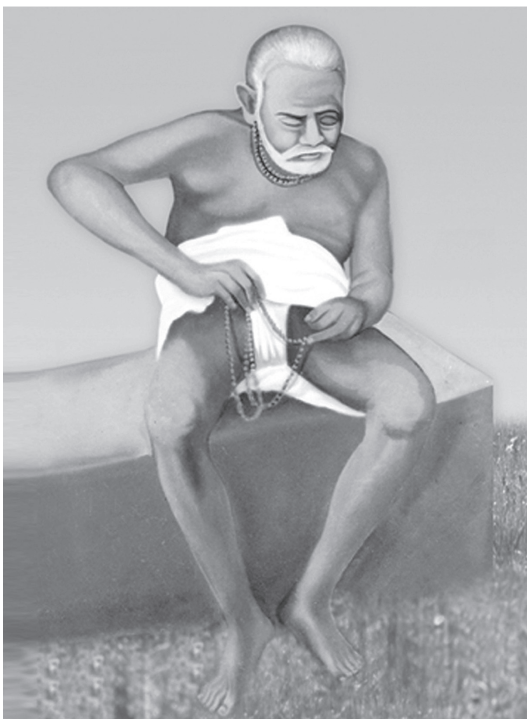
বেশ শিষ্য শ্রীভাগবত দাস বাবাজী মহারাজ। এই ভাগবত দাস বাবাজী মহারাজের বেশ শিষ্য শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ। তাঁর শিষ্য শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ।

শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ অতি বৃদ্ধ বয়সে শ্রীনবদ্বীপধামে শুভাগমন করেছিলেন। এ সময় তিনিই শ্রীমায়াপুরে গৌর জন্মভিটা ও শ্রীবাস অঙ্গন খোল ভাঙ্গা ডাঙ্গা প্রভৃতি নির্ণয় করেছিলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর শিক্ষা-শিষ্য ছিলেন।

ব্রজে শ্রীল মধুসূদন দাস বাবাজী মহারাজের সম্বন্ধে কিংবদন্তি আছে যে, শ্রীল বাবাজী মহারাজ ভজন কুটীরে যখন ভাগবত পাঠ করতেন তখন তথায় এক অজগর সাপ আসতো, পাঠ শেষ হলে দণ্ডবৎ করে অন্তর্ধান হতো।

।। **জয় শ্রীল মধুসূদন দাস বাবাজী মহারাজ** কি জয়।।

# শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ



গৌরাবির্ভাবভূমেস্তং নির্দ্দেষ্টা সজ্জনপ্রিয়ঃ।
বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীজগন্নাথায় তে নমঃ।।

গৌড়মণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল ও ব্রজমণ্ডলে সমানভাবে পূজিত বৈষ্ণবপ্রিয় বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজকে প্রণাম করছি। যিনি শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবস্থলী তাঁর দিব্যদর্শনের দ্বারা নির্দ্দেশ করেছেন।

শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের দ্বারা নিত্য স্মরণীয় এবং পূজিত হন।

"বিশ্বনাথ ভক্তসাথ, বলদেব জগন্নাথ,
তাঁর প্রিয় শ্রীভক্তিবিনোদ।
মহাভাগবতবর, শ্রীগৌরকিশোরবর,
হরিভজনেতে যাঁর মোদ।।
শ্রীবার্ষভানবীবরা, সদা-সেব্যসেবাপরা,
তাঁহার দয়িতদাস নাম।"

শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ এই জগতে প্রায় ১৩৫ বছরেরও বেশী সময় প্রকট ছিলেন। তিনি বর্তমান বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার কোন এক গ্রামে সম্ভ্রান্ত বংশে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে চারটি অন্ধকার যুগের কথা শুনা যায়—





১। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে।

২। ষড়গোস্বামীর অপ্রকটের পর।

৩। শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু ও শ্রীরসিকমুরারীর অপ্রকটের পর।

৪। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ও শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর অপ্রকটের পর।

অন্ধকার যুগ মানে শ্রীরূপানুগধারায় আচার্য্য পরম্পরার বিচ্যুতি নয়। রূপানুগ ধারায় বিশুদ্ধ বৈষ্ণব তখনও ছিল। কিন্তু প্রচার ছিল না।

গুরু পরম্পরা বা ভাগবত পরম্পরায় শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ। তাঁর শিষ্য উদ্ধর দাস বা উদ্ধব দাস। তাঁর শিষ্য উদ্ধব দাস, তাঁর শিষ্য সূর্যকুণ্ড বাসী শ্রীমধুসূদন দাস বাবাজী, তাঁর শিষ্য শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ।

শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ বহু দিন শ্রীব্রজ মণ্ডলে ভজন করেন। সিদ্ধ বাবা বলে তাঁর সর্ব্বত্র খ্যাতি ছিল। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বৃন্দাবন ধামে প্রথম তাঁর শ্রীচরণ দর্শন করেন এবং তাঁর থেকে বহু উপদেশ প্রাপ্ত হন।

শ্রীল বাবাজী মহারাজ ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ফাল্গুন মাসে বর্দ্ধমানের আমলাজোড়া নামক গ্রামে শুভ বিজয় করেন। সেই সময় শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কোন কার্য্য উপলক্ষে সেখানে যান এবং দ্বিতীয় বার শ্রীল বাবাজী মহারাজের শ্রীচরণ দর্শন লাভ করেন।

শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের নাম প্রচারাদি কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ দেখে শ্রীল বাবাজী মহারাজ অতিশয় সুখী হন। তিনি আমলাজোড়া গ্রামে একাদশী দিবসে অবস্থান করে অহোরাত্র শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমলাজোড়া গ্রামে পর দিবস শ্রীপ্রপন্নাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ শ্রীগোদ্রুমে সংকীর্ত্তন উৎসবে এবং শ্রীমায়াপুর দর্শন উৎসবে বহু বৈষ্ণবসহ যোগ দিয়েছিলেন। ১২৯৯ বঙ্গাব্দে মাঘ মাসে বাবাজী মহারাজ কুলিয়া-নবদ্বীপ হতে সপরিকরে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনস্থলী গোদ্রুমস্থ সুরভিকুঞ্জে শুভাগমন করেছিলেন। ২৭ মাঘ বুধবার সেখানে অপূর্ব হরিকীর্ত্তন মহোৎসব হয়েছিল।

একবার বাবাজী মহারাজের সেবক বিহারী দাস; বাবাজী মহারাজকে চুপড়ীতে বসিয়ে মহাপ্রভুর জন্মস্থান যোগপীঠে নিয়ে আসেন। তখন বাবাজী মহারাজ 'জয় শচীনন্দন গৌরহরি' বলে উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করেন। সকলেই বিস্মিত! যিনি চলতে পারেন না, তিনি নৃত্য করছেন কি করে? বাবাজী মহারাজ দিব্য দর্শনের দ্বারা মহাপ্রভুর জন্মস্থান এবং খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা শ্রীবাস অঙ্গন নির্দেশ করলেন। ২০ ফাল্গুন বৃহস্পতিবার ১২৯৯ বঙ্গাব্দে, ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের দিন বাবাজী মহারাজ কুলিয়া নবদ্বীপ থেকে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ মায়াপুর যোগপীঠে শুভাগমন করেন। ঘটনাটি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর সজ্জনতোষণীতে লিখেছেন,—

"২০ ফাল্গুন বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টার সময় পশ্চিমপার-নবদ্বীপের ভক্তবৃন্দ তিনখানি নৌকায় পার হইলেন। ভক্তবর মহেন্দ্রবাবু তাঁহাদিগকে পার করিয়া আনিলেন। পরমভাগবত শ্রীযুক্ত জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয়কে পাল্কীতে করিয়া লওয়া হইল। শ্রীমায়াপুর যাত্রিসংখ্যা তখন আর গণনা করা যায় না, মায়াপুরের নিকবর্ত্তী হইয়া দেখা গেল যে, শ্রীযুক্ত ভক্তবর দ্বারিকবাবু শ্রীমহাপ্রভুর জন্মস্থানে একটি সঙ্কীর্ত্তনের দল লইয়া

নানাবিধ পতাকা উড্ডীয়মান করতঃ মহানন্দে বাবাজী মহাশয়দিগের প্রতীক্ষা করিতেছেন। সমস্ত ভক্তবৃন্দ যখন জন্মটিলার উপর উঠিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, তখন একটি আশ্চর্য্য শোভা সমস্ত নবদ্বীপমণ্ডলে বিস্তীর্ণ হইয়াছিল, বোধ হয় এরূপ শোভা আর চারিশত বৎসর হয় নাই। সকল বৈষ্ণব বসিয়া শেষে স্থির করিলেন যে, প্রভুর জন্মস্থানে একটি সেবা ও শ্রীবাসাঙ্গন-ভূমিতে একটি সেবা স্থাপন হউক। শ্রীযুত জগন্নাথ দাস বাবাজী মহাশয় শেষে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন যে, জন্মস্থানে শ্রীজগন্নাথমিশ্র ও শ্রীশচীদেবী এক গৃহে এবং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও লক্ষ্মীদেবী দুইপার্শ্বে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৈশোরমূর্ত্তি অন্যঘরে স্থাপিত হউক। শ্রীবাসাঙ্গনে পঞ্চতত্ত্ব স্থাপিত হউক।"--(সজ্জনতোষণী ৪র্থ খণ্ড, ২৩৪-২৩৫ পৃষ্ঠা, 'আবির্ভাবোৎসব' প্রবন্ধ)।

শ্রীল বাবাজী মহারাজ বেশীর ভাগ সময় কুলিয়াতে গঙ্গাতটে ভজন করতেন। তথায় তাঁর ভজন কুটীর ও সমাধি মন্দির অদ্যাপি বর্ত্তমান। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে শ্রীল বাবাজী মহারাজ তাঁর কুটীরের সামনে ভক্তগণের বসবার জন্য একখানি চালা নির্মাণ করে দিতে আদেশ করেছিলেন। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর তা' করে দিয়েছিলেন।

শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর বার বছর বয়সে জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশেষ পারঙ্গত হন, তা শুনে শ্রীল বাবাজী মহারাজ একদিন তাঁকে ডেকে বলেন যে তুমি বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত মতে চৈতন্যাব্দ, ভগবদ্ সম্বন্ধী মাস, বার তিথি পর্ব্ব প্রভৃতি সংবলিত পঞ্জিকা রচনা কর। তাতে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর আবির্ভাব, পঞ্চমী তিথি ও অন্যান্য গৌর-পার্ষদগণের আবির্ভাব তিরোভাব তিথি সমূহ যথাযথ সন্নিবেশিত কর। শ্রীল বাবাজী মহারাজের নির্দ্দেশ অনুযায়ী শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা গণনা আরম্ভ করেন।

কীর্ত্তনে ও বৈষ্ণব সেবায় শ্রীল বাবাজী মহারাজের বিশেষ উৎসাহ ছিল। তিনি প্রায় একশ পঁয়ত্রিশ বছর কাল ধরাধামে প্রকট থেকে শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী প্রচার করেন। বার্দ্ধক্য বশতঃ যদিও তিনি খর্ব্বাকৃতি হয়েছিলেন, কিন্তু কীর্ত্তন কালে তাঁকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ন্যায় আজানুলম্বিতভুজ ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল তনু, চারি হস্ত পরিমিত দীর্ঘ পুরুষ বলে মনে হত।

শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের বেশ শিষ্য শ্রীভাগবত দাস। এই শ্রীভাগবত দাসের বেশ শিষ্য ছিলেন শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ। শ্রীল বাবাজী মহারাজের সেবকের নাম ছিল শ্রীবিহারী দাস। তাঁর শরীর খুব বলিষ্ঠ ছিল। বার্দ্ধক্য বশতঃ শ্রীল বাবাজী মহারাজ চলতে পারতেন না। বিহারী দাস তাঁকে কাঁধে করে এক স্থান হতে অন্য স্থানে নিয়ে যেতেন।

কলিকাতায় আসলে শ্রীল বাবাজী মহারাজ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মানিকতলা স্ট্রীটের বাড়ীতে থাকতেন। অনেকে আগ্রহ করে তাঁকে তাদের গৃহে নিতে চাইলে বা ভোজন করাবার ইচ্ছা করলেও তিনি স্বীকার করতেন না।

বার্দ্ধক্য বশতঃ শ্রীল বাবাজী মহারাজের দৃষ্টি শক্তি হ্রাস পেয়েছিল। লোকে তাঁকে দর্শনের জন্য আসতেন এবং প্রণামী দিতেন। সেবক বিহারী দাস, সে সমস্ত প্রণামী একটি কলসীর মধ্যে রাখতেন। কোন সময় হঠাৎ শ্রীল বাবাজী বলতেন– বিহারী! কত টাকা প্রণামী হয়েছে সমস্তই আমাকে দে। বিহারী দাস যদি অন্য সেবার জন্য দশ-বার টাকা সরিয়ে রাখতেন, বাবা টাকাগুলি হাতে নিয়ে বলতেন–বিহারী তুই বার টাকা রেখে





ছিস্ কেন? আমার টাকা নিয়ে আয়। বিহারী তখন হাসতে হাসতে টাকাগুলি এনে দিতেন। সে সমস্ত টাকা বাবাজী মহারাজ নিজের ইচ্ছা মত খরচ করতেন। একবার দুইশত টাকার রসগোল্লা কিনে ধামের গো সেবা করেছিলেন।

শ্রীল বাবাজী মহারাজের গঙ্গাতটের তাঁবুতে একবার একটা কুকুরের পাঁচটা বাচ্চা হয়েছিল। বাবাজী মহারাজ যখন প্রসাদ পেতেন, বাচ্চাগুলি থালার চারি দিকে ঘিরে বসত। বিহারী দুই একটি বাচ্চা লুকিয়ে রাখলে, বাবাজী মহারাজ বলতেন—বিহারী, তোর থালা নিয়ে যা, আমি খাব না। বিহারী তখন বাচ্চাগুলি এনে দিয়ে বলতেন—এই নিন বাচ্চাগুলি। বাবাজী মহারাজ বলতেন—এঁরা ধামের কুকুর।

অনেক লোক শ্রীল বাবাজী মহারাজের কাছে ভেক্ নেবার জন্য আসতেন। শ্রীবাবাজী মহারাজ সকলকে ভেক্ দিতে চাইতেন না। তাদের সেবা করতে বলতেন। খুব সেবার চাপ পড়লে অনেকে পালাত। একবার শ্রীগৌরহরি দাস নামে একজন ব্যক্তি ভেক্ নিতে এসেছিলেন। বাবাজী মহারাজ তাকে ভেক্ দিতে চাইলেন না। তিনি তিন দিন অনাহারে তাঁবুর সামনে পড়ে রইলেন। অগত্যা শ্রীবাবাজী মহারাজ বিহারী দাসকে কৌপীন দিতে আদেশ করলেন।

একবার শ্রীবাবাজী মহারাজ এক প্রসিদ্ধ ভাগবত পাঠককে বলেছিলেন—ভাগবত কীর্ত্তন ব্যবসা বেশ্যা বৃত্তি মাত্র। যারা ভাগবত ব্যবসা করে তারা নামাপরাধী, তাদের মুখে ভাগবত পাঠ বা কীর্ত্তন শুনতে নাই। উহা শ্রবণে নামাপরাধ ও অধোগতি হয়। সেই ভাগবত পাঠক সেই দিন থেকে ভাগবত পাঠ ব্যবসা ত্যাগ করেন। পরবর্ত্তী কালে তিনি বৃন্দাবনবাসী হন এবং অতি দীনহীনভাবে ভজন করেন।

শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীল বাবাজী মহারাজকে ভক্তগণের সেনাপতি বলতেন।

শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ ১৩০১ বঙ্গাব্দে ১৪ ফাল্গুন, ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ২৫ ফেব্রুয়ারী সোমবার শুক্ল-প্রতিপদ তিথিতে দিবা ১০ ঘটিকায় অপ্রকট হন। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর সজ্জনতোষণীতে লিখেছেন—

"বিগতবর্ষে ১৩০১ বঙ্গাব্দ ১৪ ফাল্গুন সোমবার দিবা ১০ ঘটিকার সময় ভক্তগণের বৃদ্ধ সেনাপতি শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয় শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলের অন্তর্গত কোলদ্বীপস্থ ভজনকুটীরে শ্রীধাম লাভ করিয়াছেন। সিদ্ধ বাবাজী মহাশয় গৌরভূমি অন্ধকার করিয়া চিজ্জগতে প্রবেশ করিলেন। আমরা জড়নয়নে তাঁহার আনন্দজনক নৃত্য-কীর্ত্তন আর দেখিতে পাইব না। তিনি চিজ্জগতে অবস্থিত থাকিয়া আমাদিগের প্রতি কৃপাবিধান করুন।"

—সজ্জন-তোষণী ২য় বর্ষ ২য় পৃষ্ঠা।

শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের অলৌকিক বিচার সম্বন্ধে 'শ্রীসরস্বতী জয়শ্রী গ্রন্থে' প্রকাশিত কিছু ঘটনাঃ

১৭ আশ্বিন, ৪ অক্টোবর প্রভুপাদ শ্রীসনাতনের প্রাণধন শ্রীশ্রীরাধামদন-মোহন দর্শনে গমন করেন। ঐ দিবস কালিয়দহের একটি প্রাচীর-বেষ্টিত বাগানে রাধাবল্লভী সম্প্রদায়ের মন্দিরপার্শ্বে শ্রীমদনমোহনের ঠোরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ দাস বাবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহার সহিত প্রভুপাদের অনেক শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গ আলোচনা হয়। পণ্ডিতজী বলেন— 'শ্রীনামকীর্ত্তন' অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গ যাজনের সহিত তুল্য এবং আধুনিক কল্পিত রসাভাসদুষ্ট যে সকল ছড়াগান শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাও শ্রীনামকীর্ত্তনের সহিত সমান। তিনি আরও বলেন,

–ন্যায়শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য না থাকিলে বেদান্তে অধিকার হয় না এবং প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বিষয়ের আলোচনার বিশেষ আবশ্যকতা নাই।'

ইহাতে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরূপসনাতনাদি গোস্বামীবর্গের এবং শ্রীল বিশ্বনাথ- বলদেব-জগন্নাথ- গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজ প্রমুখ মহাজনগণের সিদ্ধান্ত উল্লেখ করিয়া বলিলেন,–

''শ্রীনামকীর্ত্তনই শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশে মুখ্য সাধন ও সাধ্য এবং কীর্ত্তন-মুখে স্বাভাবিক অপ্রাকৃত স্মরণই গোস্বামিগণের সিদ্ধান্ত। অপ্রাকৃত বিচারই শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গৌড়ীয়গণের বৈশিষ্ট্য। অপ্রাকৃত বিচারে অনুক্ষণ প্রতিষ্ঠিত না থাকিলে প্রাকৃত সাহজিক চিত্তবৃত্তি হরিভজনের রূপ ধরিয়া লোকবঞ্চনা ও আত্মবঞ্চনা করে। শ্রীরূপানুগগণ শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের শিক্ষায় 'রসাভাসযুক্ত ছড়াগান' ও কোনপ্রকার নামাপরাধ– 'শুদ্ধনাম' ও শ্রীনামকীর্ত্তন-পদবাচ্য হয় নাই। হেলায় শ্রদ্ধায় হরিনাম গ্রহণ এক কথা, আর 'নামাপরাধ' পরিত্যাগ না করা ও 'নামাপরাধ'কেই 'নাম' বলিবার জ্ঞাত বা অজ্ঞাত বিচার লইয়া দশবিধ অপরাধের যে কোন একটি সংরক্ষণ বা পোষণ করিয়াও শ্রীহরিনামকীর্ত্তনই সুষ্ঠুভাবে সাধিত হইতেছে–এরূপ আত্মবঞ্চনার প্রশ্রয় দেওয়া পৃথক্ কথা।''

'সরস্বতী জয়শ্রী' গ্রন্থের ৬ষ্ঠ বৈভব, ৪১ পৃষ্ঠা–

''শ্রীপঞ্চমী বা মাঘী শুক্লাপঞ্চমীই শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাব-তিথি''–ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে এই কথা জানাইয়াছিলেন। তদনুসারেই বর্ত্তমান জগতে বৈষ্ণব-সমাজের সর্ব্বত্র ঐ তারিখে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাবতিথিপূজার প্রচলন হইয়াছে।

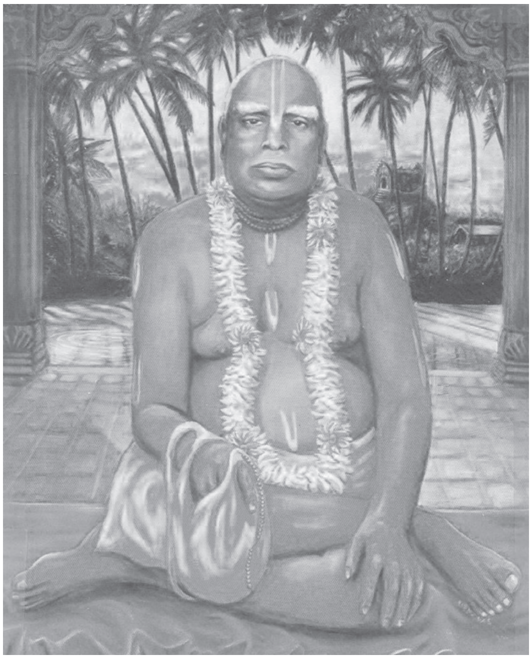
শ্রীলপ্রভুপাদশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ারআবির্ভাবতিথিদিবসে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা পুনঃ সংস্থাপন করিবার ইচ্ছা করিলেন। তদনুসারে হরিকীর্ত্তনমুখে সেই সভা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। (৫ ফেব্রুয়ারী ১৯১৯; ২১ মাঘ, ১৩২৫)। শ্রীল প্রভুপাদ বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিলেন। ১০ ফেব্রুয়ারী (১৯১৯) তারিখের দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-মহোৎসব ও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব- রাজসভার পুনঃসংস্থাপন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রচারিত হইয়াছিল–

"On Wednesday last (5th instant) was celebrated with great eclat the Advent Ceremony of Sree Sree Vishnupriya Devi at the same Asana (1 Ultadanga Junction Road). The occasion was solemnised by the re-institution of Sree Viswa-Vaishnava-Rajsabha as inaugurated by no less a Personage than Sree Jeeva Goswami Himself eleven Years after the passing of Sree Sree Mahaprabhu and as given a fresh impetus by Sree Bhaktivinod Thakur 33 years ago."

শ্রী'সজ্জনতোষণী' ২১শ বর্ষ ৯ম সংখ্যায় শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পূর্ণ একটি প্রবন্ধ 'শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা' শিরোনামায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

।। জয় শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ কি জয়।।

# শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর



গৌড়ীয়-বৈষ্ণবজগতে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সকলেরই আরাধ্য।

নমোভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ নামিনে।
গৌরশক্তি স্বরূপায় রূপানুগবরায়তে।।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জীবনী অল্প বিস্তরে লেখা সম্ভব নয়। লেখনীর কালি শেষ হয়ে যাবে কিন্তু ওনার লীলা কথা শেষ হবে না।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও তাঁর অনুগত গোস্বামীগণ অপ্রকট হলে গৌড়ীয় গগণে অন্ধকার যুগ নেমে আসে। মহাপ্রভুর বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম্মের তাৎপর্য্য বুঝতে অসমর্থ হয়ে তেরটি অপসম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। এই অপসম্প্রদায়ীগণের অসৎ আচরণ দেখে তৎকালীন সময়ের শিক্ষিত সমাজ বৈষ্ণবধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হয়ে পড়ে। প্রেম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জীবের প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত হয়ে তাঁর নিজজন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে এই জগতে প্রেরণ করেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সিদ্ধ পরিচয় 'কমলমঞ্জরী'।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ 'জৈবধর্ম' গ্রন্থের 'উপোদ্ঘাতে' লিখেছেন—

**"শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের অত্যন্ত প্রিয়জন। কাল-প্রভাবে শ্রীচৈতন্যদেবের মনোভীষ্টের প্রচারকবৃন্দ প্রপঞ্চ হইতে নিত্যলীলায় প্রবেশ করিলে পর গৌড়গগণ ভোগ ও ত্যাগের নিবিড় অন্ধকারের ঘনঘটায় গৌরবিহিত কীর্ত্তনকিরণ বঞ্চিত হইয়া আবৃত হয়। গৌড়গগণের সূর্য্য, চন্দ্র ও উজ্জ্বল তারকারাশি একে একে লোকলোচনের অন্তরালে স্ব-স্ব জ্যোতির্বিম্ব প্রদর্শনে বিরত হইলে মেঘাবৃত আকাশে বিদ্যুতালোক ব্যতীত অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইবার আর অন্য উপায় ছিল না। কাল-ব্যবধানে সৌর পঞ্চবর্ষাধিক ত্রিশত বর্ষান্তে নদীয়াজেলান্তর্গত বীরনগর-গ্রামে এই শ্রীগৌর-নিজজনের আবির্ভাবকাল গৌড়ীয় গগণতল প্রোদ্ভাসিত করিয়াছিল।**

**'সর্ব্ব মহাগুণগণ বৈষ্ণবশরীরে।
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চারে।।
সেই সব গুণ হয় বৈষ্ণব-লক্ষণ।
সব কহা না যায় করি দিগ্‌দরশন।।
কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন।।
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।**

**অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্গুণ।।**
**মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।**
**গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী।।'**

**কৃষ্ণভক্তের এই সমস্ত গুণই আমরা ঠাকুরের শুদ্ধভক্তিময় জীবনে পরিপূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত দেখিতে পাই। কৃপালু দয়ানিধি গৌরহরি বদ্ধজীবকে নববিধভাবে অমন্দোদয়া কৃপা প্রদর্শন করিয়াছেন। তদীয় প্রেষ্ঠ নিজজন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়েও তাদৃশ দয়া-বিতরণের কার্য্য দেয়া যায়।"**

### জন্ম ও বংশ পরিচয়

শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় শ্রীগৌর সুন্দরের নিজজন ছিলেন। তিনি রূপানুগ ধারায় শ্রীগৌর সুন্দরের লুপ্তপ্রায় বাণী মর্ত্ত্যলোকে প্রচার করেছিলেন। তাঁর গুণ-মহিমা অমিত ও অপার।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নদীয়া জেলার অন্তর্গত বীরনগর উলাগ্রামে ৩৫২ গৌরাব্দ, ১২৪৫ বঙ্গাব্দ ১৮ ভাদ্র, ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ ২ সেপ্টেম্বর রবিবার, শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপাপাত্র আন্দুল নিবাসী রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্তের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। কৃষ্ণানন্দ দত্তের গৃহে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সপার্ষদে শুভ-পদার্পণ করে তাঁকে প্রচুর আশির্বাদ করেছিলেন। তাঁরই বংশে পরবর্ত্তীকালে জন্মগ্রহণ করেন মহাত্মা শ্রীগোবিন্দশরণ দত্ত। তিনি গোবিন্দপুর নামে একটি গ্রাম পত্তন করেছিলেন। পরবর্ত্তীকালে কালীঘাট, সুতানটী ও গোবিন্দপুর এই তিনটি গ্রাম নিয়ে কলকাতা শহরের উদ্ভব হয়। গোবিন্দশরণের পৌত্র শ্রীরামচন্দ্র। শ্রীরামচন্দ্রের পৌত্র শ্রীমদনমোহন দত্ত। ইনি কলকাতার হেদুয়া পুষ্করিণী জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য মিউনিসিপ্যালিটীকে দান করেছিলেন। গয়ার প্রেতশিলা তীর্থে ও চন্দ্রনাথের পাহাড়ে তিনি বিপুল অর্থ ব্যয়ে সিঁড়ি নির্মাণ করিয়েছিলেন। শ্রীমদনমোহন দত্তের পৌত্র ছিলেন শ্রীরাজবল্লভ দত্ত। তিনি সাধক ও দৈবজ্ঞ ছিলেন। তিনি স্বজনগণের উৎপীড়নে উড়িষ্যা প্রদেশের কটক জেলার অন্তর্গত বিরূপা নদীর তটে ছুটি গোবিন্দপুর গ্রামে বসবাস করতেন। শ্রীরাজবল্লভ দত্তের পুত্র শ্রীআনন্দচন্দ্র দত্ত। তিনিও পরম ধার্মিক প্রকৃতির লোকছিলেন। তিনি বিবাহ করেন নদীয়া জেলার অন্তর্গত বীরনগর উলা গ্রামের প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীঈশ্বরচন্দ্র মুস্তৌফীর কন্যা শ্রীমতী জগন্মোহিনীকে। শ্রীআনন্দচন্দ্র দত্ত ও শ্রীজগন্মোহিনী দেবীই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পিতামাতা। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পিতৃপ্রদত্ত নাম 'শ্রীকেদার নাথ দত্ত'। বাল্যকাল থেকেই তাঁর অলৌকিক প্রতিভা। মাত্র দুই বছর বয়স থেকেই কেদারনাথ দত্তের জিহ্বায় কবিত্বের স্ফূর্ত্তি হয়।

ঠাকুর মহাশয় এগার বৎসর বয়সে পিতৃহারা হয়ে মাতা-মহের আলয়ে প্রতিপালিত হন। তাঁর মাতামহের ন্যায় ধনাঢ্য জমিদার নদীয়া জেলায় তখন ছিল না। বীরনগরে তাঁর প্রসিদ্ধ অট্টালিকা দেখবার জন্য অনেক জায়গা থেকে লোক আসত। শ্রীঠাকুর মহাশয়ের বড় দুই ভাই কালক্রমে পরলোক গমন করেন। তিনি বড় কষ্টে প্রতিপালিত হন ও পড়ালেখা করেন। পাঁচ বৎসর বয়সে মাতামহের আলয়ে থেকে পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ করেন। তাঁর অসাধারণ মেধা ছিল। নয় বৎসর বয়সে জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অল্পকাল মধ্যে রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ বিশদভাবে পাঠ করেন। ঠাকুরের স্বলিখিত কিছু ঘটনা—

**"যাহার বাটীতে যে উৎসব হয়, আমি দেখিতে যাই। ব্রহ্মচারীর বাটীতে অনেক পূজা হয়। সেই বাটীর বাহিরে একটী ভাল মন্দির। ভিতরদিকে**

বাগান ও হোমের স্থান। তান্ত্রিকমন্ত্রে ব্রহ্মচারীর উপাসনা। মড়ার মাথার খুলি গুপ্ত ছোট ছোট ঘরে থাকিত। কেহ কেহ বলিত যে, দুগ্ধ-গঙ্গাজল দিলে মড়ার মাথা হাসে। আমি মড়ার মাথা নামাইয়া জল দিয়া দেখিয়াছিলাম, কিন্তু কোন হাসি দেখিতে পাই নাই। সেইখানে সর্ব্বজ্ঞদিগের বাটী, তথায় গিয়া গান শুনিতাম।

জগদ্ধাত্রীর চাল চিত্র করিতে একজন বৃদ্ধ ছুতোর নিযুক্ত থাকিত। আমি তাহার নিকট বসিয়া তাহাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতাম। সে সকল বিষয়ের উত্তর দিত। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,–'বল দেখি, এই প্রতিমার মধ্যে দেবতা কখন আসিবেন?' সে উত্তর করিল,–'আমি যেদিন ইঁহার চক্ষু দান করিব, সেই দিন দেবতা আসিয়া প্রতিমায় অধিষ্ঠান হইবেন।' আমি আগ্রহের সহিত সেইদিনে দেখিতে আসিলাম; কিন্তু দেবতার কোন অধিষ্ঠান দেখিতে পাইলাম না। আমি কহিলাম, –'গোলোক পাল প্রথমে খড়ে, তৎপরে মাটিতে এই প্রতিমা গড়িয়াছে। আবার তোমরা প্রথমে খড়ি, পরে রংচিত্র করিলে। দেবতা ত' বস্তুতঃ কখনই আসিলেন না?' তখন সেই বৃদ্ধ সূত্রধর কহিল–'ব্রাহ্মণেরা ঘট বসাইয়া মন্ত্র পড়িলে ঠাকুর আবির্ভূত হইবেন'। (কিন্তু) আমি তখনও দেখিয়া কিছুই দেখিতে পাইলাম না। সেই বৃদ্ধ সূত্রধরকে বিজ্ঞ জানিয়া তখন তাহার বাটীতে গিয়া সব কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে তখন বলিল–'এই প্রতিমা-পূজায় আমার কিছু বিশ্বাস নাই। আমার বোধ হয়, ব্রাহ্মণেরা জুয়াচুরি করিয়া এই ব্যবস্থা দ্বারা টাকা অর্জ্জন করে।' বৃদ্ধ বার্দ্ধকীর সেই কথায় আমার বিশেষ প্রীতি হইল। আমি তাহাকে পরমেশ্বরের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম; সে বলিল,–'যে যাহাই বলুক, আমি এক পরমেশ্বর ব্যতীত আর কাহাকেও বিশ্বাস করি না। দেব-দেবী কল্পিত, আমি প্রত্যহ সেই পরমেশ্বরকে আরাধনা করি।' বৃদ্ধের এই কথায় আমার শ্রদ্ধা হইল।

আমি জিজ্ঞাসু হইয়া উঠিলাম। গোলাম খাঁ পেয়াদা তোষাখানার দ্বারে পাহারা দেয়। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল--'ঈশ্বরের নাম খোদা, তিনি এক ছিলেন, আর কেহ ছিল না। খোদা নিজের শরীরের ময়লা তুলিয়া রুটীর মত করিয়া একার্ণবের জলে ফেলিলেন। রুটির উপরার্দ্ধ আকাশ ও নিম্নার্দ্ধ পৃথিবী হইল। এইরূপে জগৎ সৃষ্টি হইল। আদম হাওয়া সৃষ্টি করিয়া মানুষ সৃষ্টি করিলেন, আমরা সকলেই আদম হাওয়ার বংশ।' আমি এই গল্পটী শুনিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,–'তুমি রামকে কি বল?' সে বলিল–'রাম রহিম এক, তিনিই খোদা' আমি তখনই ভূতের মন্ত্রের সন্ধান পাইলাম। ভূতের কথায় গোলাম খাঁ কহিল,–'সকল ভূতই শয়তানের আওলাত, তাহারা রহিমের নামে ভয় করে।' তত্ত্বজ্ঞানে আমার চিত্ত প্রসন্ন হইল।

পরশুরাম মুস্তৌফী তখন আইন পড়ে। প্রথমে তিনি একটু একটু ঈশ্বর মানিতেন। শেষে ঈশ্বরকে জবাব দিয়াছিলেন। যখন ঈশ্বর মানিতেন, তখন রঘুমামা ও নশুমামা তাঁহার চেলা ছিলেন। ঈশ্বরবিশ্বাস ছাড়িয়া দিলে রামমোহন রায়কে 'গুরু মহাশয়' বলিতে লাগিলেন। আমার মহা মুস্কিল; আমি একে ছেলেমানুষ, অনেক কথা জানি না, তাহাতে মতভেদ দেখিয়া মনে সুখ হইল না। পরশুরাম মামা বলিলেন,–''বাবা, সকলেই প্রকৃতি হইতে হইয়াছে। 'ঈশ্বর' বলিয়া প্রকৃতি হইতে পৃথক্ কেহই নাই'। এইসব কথা শুনিয়া আমি কোন কোন টোলের ভট্টাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা আরও গোলমেলে কথা বলিতে লাগিলেন। অস্থিরসিদ্ধান্ত

হইলেও আমি 'রাম' নাম ছাড়ি না।"

শৈশবকালে আমাকে সকলে ভূতের ভয় দেখাত। আমি ভূতের ভয়ে বাগিচায় গিয়ে আম জাম খেতে পারতাম না। ভয় কি করে যায় তা একদিন মাতামহের ভাণ্ডার রক্ষয়িত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম। সে বললে 'রাম' 'রাম' বললে ভূত পালায়। তার কাছ থেকে ভূত তাড়ানো মন্ত্র পেলাম। সর্ব্বদা 'রাম', 'রাম' জপ করতে লাগলাম, আর ভূতের ভয় করি না। স্বচ্ছন্দে আম জাম খেতে পারি। অন্যান্য ছেলেদেরও 'রাম' 'রাম' বলতে বললাম। পাড়ায় যাদের ঘরে রামায়ণ মহাভারত পাঠ হত তথায় যেতাম। রামের কথা আমার খুব ভাল লাগত। আমি পুরোহিত ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলাম ঠাকুর কথা বলে না কেন? পুরোহিত বললেন কলিকালের ঠাকুর কথা বলে না। কারও কারও কাছে বলেন। আমি মন্দিরে ঢুকে শিবের মাথায় হাত দিয়ে পালাতাম। কোন কোন দিন কথা বলতেন, মন্দিরের ভিতরে প্রতিধ্বনি শুনে মনে করতেন ঠাকুর কথা বলছে। বৃদ্ধাদের কাছে রাম ও কৃষ্ণ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতাম। শৈশব হতেই ভগবানের প্রতি আমার দৃঢ় অনুরাগ প্রকাশ পায়। জগৎ কি? আমরাই বা কে? এইসব বিষয়ে দশ বছর হতে আমার মনে অনুসন্ধিৎসা জাগে।

### বিবাহ ও অধ্যয়ন

মাত্র এগার বছর বয়সে ঠাকুরের পিতৃবিয়োগ হয়। সে সময় বঙ্গের প্রথা মেনে জননী শ্রীজগন্মোহিনী দেবী শ্রীকেদারনাথকে বার বছর বয়সে রাণাঘাটের মধুসূদন মিত্রের পাঁচ বছরের বালিকার সাথে বিবাহ দেন। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখেছেন—"ঠিক যেন পুতুল-খেলা। শ্বশুরবাড়ীতে একলা থাকিতে পারিব না বলিয়া আমার সঙ্গে ঝি গিয়াছিল।"

ঠাকুর ছয় বছর বয়সে বিদ্যাবাচস্পতির টোলে গিয়ে সংস্কৃত পাঠ শুনতেন। ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তোফী মহাশয় শ্রীকেদার নাথকে সাত বছর বয়সে কৃষ্ণনগর কলেজে ভর্ত্তি করে দেন। তখন কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন ক্যাপ্টেন ডি এল রিচার্ডসন এবং দেশীয় প্রধান অধ্যাপক ছিলেন রামতনু লাহিড়ী। পরে উলাতে ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হলে ঠাকুর তাতে ৮ বছর বয়সে ভর্ত্তি হলেন। কিছুদিন পরে কেদারনাথের মাতামহ (ঠাকুরদা) মারা গেলে মেশো মশায় শ্রীকাশীপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের কলকাতার হেদুয়া ও বির্ডনষ্ট্রীটের মোড়ের বাড়িতে এসে পড়াশোনা আরম্ভ করেন। ৪ বছর ধরে 'হিন্দু চেরিটেবল ইন্‌স্টিটিউশনে' বিদ্যালাভের পর ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে 'হিন্দু স্কুলে ভর্ত্তি হন। সেই বছরই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং এন্ট্রান্স পরীক্ষা আরম্ভ হয়। সেই সময় কেদারনাথের সহাধ্যায়ী ছিলেন শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীগণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীতারকনাথ পালিত ও শ্রীনবগোপাল মিত্র। কেদারনাথের ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে প্রতিভা দেখে প্রিন্সিপাল ক্লিন্ট সাহেব, পাদ্রী ডাল সাহেব, জর্জ মৈসন এবং শ্রীকেশবচন্দ্র সেন আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ইংরাজী ভাষায় লিখিত 'পোরিয়েড্' কাব্য শিক্ষিত লোকের সমাদরের পাত্র হন। তাঁর রচিত ইংরাজী কবিতাসমূহ 'লাইব্রেরী গেজেট্' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

সিপাহী বিদ্রোহের কিছুদিন পরে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ঠাকুর মহাশয় পিতামহ রাজবল্লভ দত্তকে দেখবার জন্য উড়িষ্যাভিমুখে যাত্রা করেন। বাষ্পীয় যান তখনও হয় নাই। যেখানে হউক পায়ে হেটেই যেতে হত। পদব্রজেই তিনি মাতা ও পত্নীকে নিয়ে অতি কষ্টে উড়িষ্যা ছুটী গেবিন্দপুরে পিতামহের কাছে গেলেন। তাঁদের দেখে পিতামহ কাঁদতে লাগলেন।

পিতামহ খুব বৃদ্ধ হয়েছিলেন। তথাপি রাত্র ১২টার পর স্বহস্তে খিচুড়ী তৈরী করে খেতেন, দিনের বেলায় জপাদি করতেন। তিনি সন্ন্যাসীদের ন্যায় অরুণ বস্ত্র পরতেন।

এক দিন তাঁর পিতামহ মহোদয় দ্বিপ্রহর সময়ে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে নাম জপ করতে লাগলেন। (স্বলিখিত জীবনী পৃঃ ৯৩) এমন সময় ঠাকুর মহাশয় ভোজন করে এলেন। দাদা মহাশয় তখন বলতে লাগলেন–"আমার মৃত্যুর পর তোমরা আর এদেশে থেকো না। ২৭ বছর বয়সে তোমার বড় চাকরী হবে। আমি আশীর্ব্বাদ করছি তুমি এক বড় বৈষ্ণব হবে।" এই কথা বলা মাত্রই তাঁর ব্রহ্মতালু ভেদ করে জীবন নির্গত হল। ঠাকুর মহাশয় যথাশাস্ত্র বিধানে পিতামহের তর্পণ কৃত্যাদি সমাপ্ত করলেন।

ঠাকুর মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয়ের চেষ্টায় ভদ্রকের উচ্চ বিদ্যালয়ে হেড মাষ্টারী পেলেন। বেতন মাত্র ৪৫ টাকা। ভদ্রকে থাকাকালে "মঠস্ অফ উড়িষ্যা" নামে ইংরাজী পুস্তক লিখেন। ইতঃপূর্ব্বে তিনি পুরী, সাক্ষী-গোপাল ও ভুবনেশ্বরাদি বিশেষভাবে দর্শন করে আসেন। ভদ্রকে ১২ ৬৭ সালের ভাদ্র মাসে তাঁর প্রথম পুত্রের জন্ম হয়। সেই পুত্রের নাম অন্নদাপ্রসাদ। এ বছর তিনি মেদিনীপুরে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কার্য্য পান। পূর্ব্ব হতেই ঠাকুর মহাশয়ের বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা ছিল। একদিন ঐ স্কুলের পণ্ডিতের নিকট প্রসঙ্গক্রমে জানতে পারলেন যে– শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং আপামরে কৃষ্ণপ্রেম ভক্তি দান করেছিলেন। সেদিন থেকে তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের সম্বন্ধে বিস্তারিত জানবার জন্য বড়ই উদ্‌গ্রীব হন। তখন যেখানে সেখানে বৈষ্ণব গ্রন্থ পাওয়া যেত না।

মেদিনীপুরে ঠাকুর মহাশয়ের পত্নী কঠিন রোগে মারা গেলেন। তখন নবজাত শিশুর বয়স মাত্র দশ মাস। বৃদ্ধা জননীও সঙ্গে রয়েছেন। সুতরাং দ্বিতীয় বার বিবাহ করা ছাড়া উপায় নাই। যকপুরের গণমান্য রায় মহাশয়ের দৌহিত্রী– শ্রীমতী ভগবতীকে বিবাহ করলেন। পত্নী খুব সুশীলা, শান্ত ও যাবতীয় কার্য্যে নিপুণ ছিলেন। ঠাকুর মহাশয় 'বিজন গ্রাম কাব্য' ও our wants নামে কয়েকখানি ছোট গ্রন্থ রচনা করলেন। এ সময় তিনি আইন পরীক্ষায় পাশ করলেন। ছাপরা জেলায় ডেপুটি রেজিষ্টার এর পদ পেলেন। কিছুদিন সেখানে কাজ করবার পর কয়েকটা পরীক্ষা দিয়ে দিনাজপুরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট এর পদ পেলেন। ছাপরায় থাকাকালে তিনি গৌতম মুনির আশ্রমটি দর্শন করেন। তিনি যখন যেখানে যেতেন ধর্ম সম্বন্ধীয় সমস্ত ব্যাপার বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করতেন। মাঝে মাঝে কলিকাতা আসতেন এবং "বড়দাদা" দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ীতে থাকতেন। একবার ঠাকুর মহাশয় কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। সে খবর পেয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয় পত্রে এক ঔষধের কথা লিখে পাঠান। সেই ঔষধ তৈরী করে খেয়ে ঠাকুর মহাশয় শীঘ্র সুস্থ হন।

দিনাজপুরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট এর কাজ করবার সময় কোন বন্ধুর সৌজন্যে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত তাঁর হস্তগত হয়। এ তাঁর প্রথম শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পাঠ ও অনুশীলন।

পূর্ব্বে ঠাকুর মহাশয় রাধা কৃষ্ণের লীলাকে হেয় মনে করতেন। কিন্তু যখন দেখলেন শ্রীচৈতন্যদেব সেই লীলা একমাত্র অবলম্বন করেছেন, তখন তিনি শ্রীচৈতন্য চরণে শরণ নিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব কৃপা পূর্ব্বক তাঁর হৃদয়ে যথার্থ তত্ত্ব স্ফূর্তি করালেন। সে সময় হতে তাঁর শ্রীরাধাকৃষ্ণে ও শ্রীচৈতন্যে বিশেষ ভক্তি উৎপন্ন হল।

শ্রীঠাকুর মহাশয় "চৈতন্য গীতা" নামক এক

পুস্তক সচ্চিদানন্দ প্রেমালঙ্কার নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। ৪০০ গৌরাব্দে শ্রীগৌড়ীয় গোস্বামী সংঘ তাঁকে 'ভক্তিবিনোদ' উপাধি প্রদান করেন। তিনি আগে ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত করতেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পড়বার পর ব্রাহ্ম সমাজকে একেবারেই বাদ দিলেন।

ঠাকুর দিনাজপুরে থাকা কালে শ্রীকান্ত জীউ ও আত্রেয় নদী দর্শন করেন। ১৮৬৮ সালে তিনি পুরী ধামে বদলি হয়ে আসেন, বড় দাঁড়ে মণ্ডলের কোটা ভাড়া নিয়ে থাকলেন। সে সময় প্রত্যহ শ্রীজগন্নাথ দর্শন করতেন এবং মহাপ্রভুর লীলাস্থলী দর্শনাদি করতেন। তখন উড়িষ্যার কমিশনার ছিলেন রেভেন্সা সাহেব। তিনি ঠাকুর মহাশয়কে খুব স্নেহ করতেন।

**বিষ কিষন**

একসময় এক ঘটনা ঘটল। অতিবাড়ী দলের বিষকিষণ নামে একজন লোক ছিল। সে কিছু যোগ বিভূতি জানত। শরদাইপুরের ক্রোশ খানেক দূরে এক জঙ্গলে সে আপন দলবল নিয়ে এক মঠ স্থাপন করে এবং নিজেকে মহাবিষ্ণুর অবতার বলে জাহির করে। সে নিজের লোক দ্বারা কতকগুলি কল্পিত কথা প্রচার করে যে--''মহাবিষ্ণু বিষকিষণ গুপ্তভাবে আছে। ১৪ই চৈত্র রণ হবে। তখন চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধরে সব যবন বধ করবে।" এ সব কথা শুনে অনেক স্ত্রী পুরুষ তাকে দেখতে যেত। ভৃঙ্গারপুরের চৌধুরী রমণীদের সম্বন্ধে কোন কেলেঙ্কারী হওয়ায় চৌধুরীরা ব্যাপারটা কমিশনার রেভেন্সা সাহেবকে জানান। তিনি ঠাকুর মহাশয়কে তদারকি করতে পাঠান। ঠাকুর মহাশয় পুলিশের হেড্‌কে নিয়ে রাত্রিকালে সেই জঙ্গলে গিয়ে বিষকিষণের সঙ্গে আলাপ করেন। বিসকিষণ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে যে ইংরাজ রাজ ধ্বংস করবেই। পেছন থেকে Dist. supdt. সাহেব সব কথা শুনলেন। পরদিন বিষকিষণকে গ্রেপ্তার করে পুরীর জেলে পাঠানো হয়, তারপর বিচারে দেড় বছর তার কারাদণ্ড হয়। বিষকিষণের জটা কেটে ফেলা হল। এ সময় তার দলের প্রায় হাজার খানেক লোক পুরীতে উৎপাত করেছিল। এজন্য অনেকে বলেছিলেন তাকে মুক্ত করে দিলে ভাল হয়। কিন্তু ধর্ম পরায়ণ সত্যপ্রিয় ঠাকুর মহাশয় কারও কথায় কান দিলেন না। সে সময় যোগী বিষকিষণ কিছু যোগ বিভূতি প্রকট করেছিলেন। তাতে ঠাকুর মহাশয় ও তাঁর পুত্র কন্যাদির কিছু ক্লেশ হয়েছিল। কিন্তু তিনি তাতে ভ্রুক্ষেপ করেন নাই। জেলেই বিষকিষণ মারা যায়। এর পরে দিনাজপুরে একজন নিজেকে ব্রহ্মা বলে পরিচয় দিয়ে উৎপাত করতে থাকলে, ঠাকুর মহাশয় তাকেও অনুরূপ শাস্তি প্রদান করেন।

পুরীতে ঠাকুর মহাশয় শ্রীগোপীনাথ পণ্ডিত, শ্রীহরিদাস মহাপাত্র ও মার্কণ্ডেয় মহাপাত্র প্রভৃতি সজ্জন সঙ্গে শ্রীভাগবত পাঠ এবং শ্রীধর টীকা আলোচনা করবার সুযোগ লাভ করেন। এই সময় তিনি ষট্‌সন্দর্ভ ও গোবিন্দ ভাষ্য নকল করে তা অধ্যয়ন করেন। ভক্তিরসামৃত সিন্ধু পাঠ করেন। হরিভক্তি কল্পলতিকা নকল করেন এবং দত্তকৌস্তভ নামক গ্রন্থ রচনা করেন। শ্রীকৃষ্ণ সংহিতার অনেক শ্লোক সেই সময় রচনা করেন। তিনি শ্রীজগন্নাথ বল্লভ উদ্যানে 'ভাগবত' সংসদ স্থাপন করেন। সে সভায় অনেক সজ্জন পণ্ডিত আসতেন। সিদ্ধ রঘুনাথ দাস বাবাজী মহাশয় ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে মিশতেন না। অন্য কাউকেও তাঁর সঙ্গে মিশতে নিষেধ করতেন। বৈষ্ণব অপরাধের ফলে তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন। পরে জগন্নাথদেব তাঁকে স্বপ্নে আদেশ করেন, 'যদি তুমি বাঁচতে তাও তাহলে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কাছে গিয়ে ক্ষমা চাও।" জগন্নাথের কৃপায় তিনি তাঁর মাহাত্ম্য বুঝতে

পারলেন। একদিন ঠাকুরের কাছে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে বললেন—আপনার তিলক মালা না দেখে আমি আপনাকে অবজ্ঞা করেছি। ক্ষমা করুন। ঠাকুর বললেন—বাবাজী মহাশয়, আমার কি দোষ? তিলক মালা দীক্ষাগুরু দিয়ে থাকেন। মহাপ্রভু এখনও দীক্ষাগুরু জুটিয়ে দেন নাই। কেবল মালা-সাহায্যে হরিনাম জপ করি। এই অবস্থায় নিজের মনোমত তিলক মালা নেওয়া কি ভাল? শ্রীরঘুনাথ দাস বাবাজী সব বুঝতে পেরে ঠাকুর মহাশয়কে খুব প্রশংসা করতে লাগলেন।

মহাত্মা শ্রীস্বরূপ দাস বাবাজী একজন বড় বৈষ্ণব ছিলেন, ঠাকুর মহাশয় প্রায় সময় তাঁর দর্শনে যেতেন। তিনি তাঁকে অনেক উপদেশ দিতেন। ঠাকুর মহাশয় শ্রীজগন্নাথের অড়হর ডাল খুব পছন্দ করতেন। তিনি মন্দিরে প্রবেশ করতেই কে যেন তাঁকে ডাল এনে দিতেন। স্নানযাত্রা, রথযাত্রা ও দোল যাত্রাদি সময়ে ঠাকুর মহাশয়ের উপর পর্য্যবেক্ষণের ভার পড়ত। তিনি খুব পরিশ্রম করে যাত্রিদের শ্রীজগন্নাথ দর্শনের সুন্দর ব্যবস্থা করে দিতেন। তিনি পূর্ণ পাঁচ বছর কাল শ্রীজগন্নাথদেবের এই সেবায় নিযুক্ত ছিলেন।

পুরীর গ্র্যাণ্ড রোডে ১৮৭৪ খৃঃ ৬ই ফেব্রুয়ারী মাঘী কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে শ্রীবিমলা প্রসাদ (শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ) শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ৬ষ্ঠ সন্তানরূপে পুরীতে আবির্ভূত হলেন। শ্রীজগন্নাথদেব ঠাকুরের সেবায় সন্তুষ্ট হ'য়ে যেন এই পুত্রটিকে দান করেন। পুত্রটি যেন স্বর্ণ প্রতিমা বলে মনে হচ্ছিল। লগ্ন দেখে জ্যোতিষী পণ্ডিতগণ বলেছিলেন—পুত্র ভবিষ্যতে একজন বড় আচার্য্য হবে, ধর্ম প্রচার করবে 'হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমতাৎ"। কয়েক মাস পরে ঠাকুর মহাশয় শিশু ও তাঁর মা এবং অন্যান্য ছেলে মেয়েদের পাল্কী যোগে রানাঘাটে পাঠিয়ে দেন। কিছু দিন পরে তিনিও বদলী হয়ে নড়াইলে আসেন।

১২৮৬ সাল নড়াইলে থাকার সময় ঠাকুর মহাশয় কৃষ্ণ সংহিতা এবং কল্যাণ কল্পতরু গ্রন্থ নতুন ভাবে প্রকাশ করেন। নড়াইলে মফস্বলে অনেক বৈষ্ণবের সঙ্গে ঠাকুরের পরিচয় হয়। রাইচরণ গায়ক নামে বৈদ্যবংশ জাত একজনকে ঠাকুর শুদ্ধ বৈষ্ণব বলে মনে করতেন।

ঠাকুর মহাশয় কিছু দিনের জন্য তীর্থ ভ্রমণে বের হয়ে বৃন্দাবন ধামে এলেন এবং বিভিন্ন স্থান দর্শন করলেন। সেই সময় শ্রীরূপ দাস বাবাজীর কুঞ্জে শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের দর্শন পেলেন। বাবাজী মহারাজ তাঁকে অনেক উপদেশ দান করলেন। বৃন্দাবন হতে ঠাকুর মহাশয় কার্য্য-স্থানে পুনঃ ফিরে এলেন। মিত্র উকিল সারদা চরণ মৈত্র মহাশয় তাঁকে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা সহ শ্রীমদ্ভাগবত খরিদ করে দেন। মাতৃদেবীর পরলোক গমনে ঠাকুর মহাশয় শ্রাদ্ধ করবার জন্য গয়া ধামে যান ও তর্পণ ক্রিয়াদি করেন। প্রেতশিলা পর্ব্বতে উঠতে ৩৯৫টা ধাপ তাঁর বৃদ্ধ প্রপিতামহ শ্রীযুত মদন মোহন দত্ত নির্মাণ করেছিলেন। তা দর্শন করলেন এবং পর্ব্বত গাত্রে পিতামহের নাম দেখলেন। ১২৮৮ সালে নড়াইলে 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ করেন। ১৮৮৫ সালে রামবাগানের বাটীতে বৈষ্ণব ডিপোজিটারী হয়। এই সালে ঠাকুর মহাশয় শ্রীবিমলা প্রসাদকে সঙ্গে নিয়ে কুলিন গ্রাম ও সপ্তগ্রাম প্রভৃতি দর্শন করেন। ১৮৮৬ সালে শ্রীরামপুরে থাকার সময় চৈতন্য শিক্ষামৃত রচনা ও প্রকাশ করেন। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকার সহিত স্বয়ং 'রসিকরঞ্জন' নামে অনুবাদ লিখে একখানি গীতা প্রকাশ করেন। তাতে শিক্ষাষ্টকের সংস্কৃত টীকাও প্রকাশ করেন। শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থ খানি এই সময় প্রথমবার ছাপা হয়। বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রকাশের জন্য

তিনি চৈতন্য যন্ত্র নামে প্রেস স্থাপন করেন।

**শ্রীধাম মায়াপুরের আবিষ্কার**

শ্রীঠাকুর মহাশয় ঠিক করেছিলেন চাকরীর থেকে অবসর নিয়ে বৃন্দাবনে বাস করবেন। এই সময় কোন কার্য্য উপলক্ষে তারকেশ্বরে যান। সেখানে স্বপ্নে শ্রীতারকেশ্বর বললেন— তোমার গৃহের নিকটবর্ত্তী শ্রীনবদ্বীপ ধাম আবিষ্কারের যে কার্য্য বাকি আছে তার কি করলে? স্বপ্ন দেখে তিনি বৃন্দাবনে যাবার ব্যবস্থা স্থগিত করলেন।

ঠাকুর মহাশয় গুরু করণের জন্য অনেক দিন ধরে চিন্তা করছিলেন। স্বপ্নে মহাপ্রভু তাঁকে জানান—তোমার গুরু বিপিন বিহারী শীঘ্র আগমন করবেন। এমন সময় বিপিন বিহারী গোস্বামীর পত্র পেলেন,—তিনি শীঘ্র এসে মন্ত্র দিবেন। শ্রীবিপিন বিহারী গোস্বামী বংশী বদনানন্দ ঠাকুরের বংশধর ছিলেন। গোস্বামী শীঘ্র এলেন এবং মন্ত্র দীক্ষা প্রদান করলেন। ঠাকুর চিত্তে বড়ই প্রফুল্লতা লাভ করলেন।

ঠাকুর মহাশয় শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের অমৃত প্রবাহ ভাষ্যে লিখেছেন—

বিপিন বিহারী তাঁর শক্তি অবতরি
বিপিন বিহারী প্রভুবর।
শ্রীগুরু গোস্বামীরূপে দেখি মোরে ভব কূলে
উদ্ধারিল আপন কিঙ্করে।।

শ্রীবিপিন বিহারী গোস্বামী বাগ্‌না পাড়ায় বাস করতেন। ঠাকুর মহাশয় যখন কিছুদিনের জন্য কৃষ্ণনগরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এলেন, শ্রীনবদ্বীপ ধাম সম্বন্ধে তিনি বহু চিন্তা করতে লাগলেন। তিনি প্রতি শনিবারে নবদ্বীপে যেতেন এবং প্রভুর লীলাস্থান ঠিক কোথায় তা অন্বেষণ করতেন। কিন্তু কোন সন্ধান পেলেন না। নবদ্বীপের লোকের শুধু গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তা, পারমার্থিক কোন সন্ধান নেই। এইসব দেখে ঠাকুর মহাশয় বড়ই দুঃখিত হলেন। একদিন রাত্রে তিনি কমলাপ্রসাদ ও একজন কেরাণীর সঙ্গে ছাদের উপর বসে আছেন। তখন রাত দশটা, খুব অন্ধকার এবং আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। এই সময় গঙ্গার ওপারে উত্তর দিকে এক অপূর্ব্ব আলোকময় অট্টালিকা দেখতে পেলেন। পুত্র কমলাপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনিও দেখেছেন বললেন। কেরাণীবাবু কিন্তু কিছুই দেখতে পাননি।

ঠাকুর মহাশয় প্রত্যেক শনিবারে নবদ্বীপ রাণীর বাড়ীতে বৈকালে আসতেন এবং রবিবার থেকে সোমবার ভোরে কৃষ্ণনগরে যতেন। তিনি পরের শনিবারে এলেন এবং রাত্রে ছাদের উপর বসে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন। সে দিনেও ঐ অপূর্ব্ব আলোকময় অট্টালিকাটি দেখতে পেলেন। বড় আশ্চার্য্যান্বিত হলেন। কারও কারও কাছে জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁরা বললেন সেখানে কিছুই নাই। প্রাতে গঙ্গা পার হয়ে তিনি সেই স্থানে এলেন। দেখলেন সেখানে মাত্র একটি নিম গাছ আছে। অনন্তর তিনি নিকটবর্ত্তী স্থানগুলি দেখতে লাগলেন। অনুসন্ধানকালে বল্লাল সেন রাজার প্রাচীন কীর্ত্তি, ভগ্নপ্রাসাদ ও দীঘি জানতে পারলেন।

অতঃপর ‘ভক্তি রত্নাকর’ ও ‘চৈতন্য ভাগবত’ প্রভৃতি গ্রন্থে উদ্ধৃত গ্রামের নামগুলি অনুসন্ধান করতে করতে গ্রামের লোকেদের থেকে অনেক গ্রামের সন্ধান পেলেন। তার মধ্যে মায়াপুরেরও সন্ধান পেলেন। সে সময় গ্রাম্য লোকেরা ঐ স্থানটীকে ম্যেয়াপুর বলত। কারণ গ্রামের আশেপাশে মুসলীমদের বসবাস ছিল।

নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান।
যথায় জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান্।।

—ভক্তিরত্নাকর

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বড় আনন্দিত হলেন। এই

সময় তিনি শ্রীনবদ্বীপ ধাম মাহাত্ম্য নামক গ্রন্থ রচনা করেন এবং তা ছাপিয়ে প্রচার করতে লাগলেন। কৃষ্ণনগরের ইঞ্জিনিয়ার দ্বারিকাবাবু নবদ্বীপের একখানা মানচিত্রও তৈরী করে দিলেন। ঐ গ্রন্থে তাও ছাপা হল। ক্রমে মায়াপুরের প্রচার আরম্ভ হল। মহাপ্রভুর আদেশ কিছুটা পালন করতে পেরেছেন বুঝে ঠাকুর মহাশয় বড়ই খুশী হলেন।

শ্রীঠাকুর মহাশয় একদিন কুলিয়ায় শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজকে দর্শন করতে গেলেন। ঠাকুর দণ্ডবৎ করলেন, বাবাজী তাঁর প্রতি বললেন—কুটীরের বারান্দাটা আপনি করে দেন। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় স্বীকার করলেন এবং ১৫০ টাকা খরচ করে শীঘ্র বারান্দাটা করে দিলেন। বাবাজী মহারাজের কাছে ঠাকুর মহাশয় মহাপ্রভুর সম্বন্ধে অনেক কথা শুনলেন। এই সময় তিনি স্বরূপগঞ্জে গোদ্রুমে একখানি গৃহ নির্মাণ করেন এবং মাঝে মাঝে তথায় অবস্থান করতে লাগলেন। এর পূর্ব্বেই তিনি নাম-হট্টের কার্য্য আরম্ভ করেছিলেন।

১৯৯১ ইং সালে আশ্বিন মাসে ঠাকুর মহাশয় রামসেবক বাবু, সীতানাথ ও শীতল নামে একজন ভৃত্য সঙ্গে নিয়ে রামজীবনপুরে নাম প্রচার করতে বের হলেন। রামজীবনপুরে শ্রীযদুনাথ ভক্তিভূষণ মহোদয় খুব উৎসাহের সহিত প্রচার কার্য্যের সহায়তা করতে লাগলেন। তথায় অনেক জায়গায় ঠাকুর মহাশয় নাম সম্বন্ধে বক্তৃতাদি করলেন। তার প্রচারে সেখানকার ভদ্রমণ্ডলী খুব সুখী হলেন। সেখান থেকে ঘাটালে এলেন। সেখানেও খুব নাম প্রচার কীর্ত্তনাদি হল। ঠাকুর মহাশয় গোদ্রুমে ফিরে এলেন। গোদ্রুমে খুব সংকীর্ত্তন হল। কৃষ্ণনগরে অনেক বড় বড় সভা করে ঠাকুর মহাশয় শুদ্ধভক্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা করতে লাগলেন। মনোর সাহেব, গুপ্ত সাহেব বেভওয়ালেস ও বাটলার সাহেব প্রভৃতি বিশিষ্ট সজ্জনগণ বক্তৃতা শুনে খুব সুখী হলেন।

১৮৯২ ইং সালে ১৫ই ফাল্গুন ঠাকুর মহাশয় রামসেবক ও তারকব্রহ্ম গোস্বামীকে সঙ্গে নিয়ে বসিরহাটে প্রচার করতে যান। তথায় খুব প্রচার কার্য্য হয়েছিল। ২৭শে ফাল্গুন ঠাকুর মহাশয় রামসেবককে সঙ্গে নিয়ে বৃন্দাবন ধামে যাত্রা করেন। পথে বর্দ্ধমান, আমলাজোড়া গ্রামে ক্ষেত্রমোহনবাবুর বাড়িতে উঠেন। সেখানে শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজীর পুনঃ দর্শন লাভ ঘটে। বাবাজী মহারাজকে নিয়ে ভক্তগণ হরি বাসর একাদশী তিথির দিন রাত্রি জাগরণ করেন। পরদিন তথাকার প্রপন্নাশ্রম প্রতিষ্ঠা করে ঠাকুর মহাশয় বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করেন। পথে এলাহাবাদ প্রভৃতি দর্শন করে ৯ই চৈত্র শ্রীবৃন্দাবন ধাম পৌঁছেন। তথায় কয়েকদিন থেকে শ্রীগোবিন্দদেব শ্রীরাধারমণ প্রভৃতি দর্শন করলেন এবং বহু সজ্জনের সভাতে হরিকথা প্রচার করে কলিকাতা ফিরে এলেন।

১৮৯৩ ইং সালে শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ মায়াপুর দর্শন করতে এসেছিলেন। সেই দিবসে বহু বৈষ্ণব তথায় আগমন করেছিলেন। শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ ভক্তি বিনোদ ঠাকুরকে গিরিধারী সেবা দিয়েছিলেন। (গৌঃ ২০/২৮-২৯ সং)

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় কখন কখন পুরী ধামে বাস করবার জন্য ১৯০২ খৃঃ শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধির নিকট 'ভক্তিকুটি' নামে এক ভবন নির্মাণ করেন। মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ শ্রীল ঠাকুর মহাশয়কে পরম শ্রদ্ধা করতেন। তিনি ঠাকুর মহাশয়কে সপ্তম গোস্বামী বলতেন। শ্রীযুত বলরাম বসু মহাশয়ের পিতৃদেব শ্রীযুত রাধারমণ বসু প্রায় সময় ঠাকুরের কাছে আসতেন। শ্রীযুত রসিক মোহন বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি বিজ্ঞগণ ঠাকুর মহাশয়কে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। শ্রীল ঠাকুর

মহাশয় জগতে পুনঃ শুদ্ধভক্তি মন্দাকিনী প্রবাহিত করলেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ঠাকুর শ্রীভাগবত পরমহংস বেশ গ্রহণ করেছিলেন।

১৩২১ বঙ্গাব্দ ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ ৯ই আষাঢ় শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর অপ্রকট তিথি বাসরে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় শ্রীগৌর গদাধরের লীলা চিন্তন করতে করতে নিত্য লীলায় প্রবেশ করেন।

শ্রীচৈতন্য মঠ ও বিশ্বব্যাপী সমস্ত গৌড়ীয় মঠে দৈনন্দিন কৃত্যসমূহ যা অনুষ্ঠিত হয়, তাঁর মূলে রয়েছেন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর। শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠান ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর দুটিই অপৃথক্। ঠাকুরের অলৌকিক অবদানের নিকট গৌড়ীয় মঠ সর্ব্বতোভাবে ঋণী।

যারা শাস্ত্র সিন্ধু মন্থন করে তাঁর গূঢ় অর্থ অনুধাবন করতে অপারগ, তাঁদের জন্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অসংখ্য কীর্ত্তন রচনা করেছেন। তাঁর রচিত কীর্ত্তনের মধ্যেই সমস্ত শাস্ত্রের নিগূঢ় অর্থ রয়েছে। তাছাড়া জীব কল্যাণের জন্য তিনি শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন।

ইংরাজী ১৯১৮ সালের ৪ সেপ্টেম্বর বুধবার শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ৮০ তম আবির্ভাব তিথি উপলক্ষ্যে কলেজ স্কোয়ারস্থিত থিওসফিক্যাল সোসাইটীতে একটি বিরাট সভার অধিবেশন হয়েছিল। স্বনামধন্য, দেশমান্য রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্-এ, বি-এল্ ভক্তিভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন। ঐ দিনের বক্তৃমহোদয়গণের বক্তৃতার কিছু অংশ শ্রীসরস্বতী জয়শ্রী গ্রন্থ থেকে তুলে ধরা হল,--

**বক্তৃগণের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে সংস্কৃত-কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় ডক্টর সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্-এ, পি-এইচ-ডি মহাশয়কে বলিতে শুনিলাম—**

**'শ্রীভক্তিবিনোদ মহাশয়ই শ্রীগৌরাঙ্গের প্রচারিত প্রকৃত নির্ম্মল বৈষ্ণবধর্ম্ম এ যুগে পুনঃ প্রচার করিয়াছেন। তিনি অনেক অনুসন্ধান করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকৃত জন্মভূমি নির্দ্দেশ করেন। প্রকৃত নবদ্বীপ খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য তিনি বহির্ম্মুখ লোকের গঞ্জনা ও অবমাননা সহ্য করিয়া শ্রীমায়াপুরই যে মহাপ্রভুর প্রকৃত জন্মস্থান, তাহা নির্দ্ধারণ করেন। এই কার্য্যে স্বার্থের খাতিরে অনেকে তাঁহার বিরুদ্ধ আচরণ করিয়াছিলেন এবং এখনও করিতেছেন। কারণ, যদি শ্রীমায়াপুরে মহাপ্রভুর জন্মস্থান পুনঃ প্রচারিত হয়, তাহা হইলে মহাপ্রভুর নাম লইয়া যাঁহারা জীবিকা অর্জ্জন করেন, তাঁহাদের জীবিকানির্ব্বাহের ব্যাঘাত হয়। যখন তিনি এই সকল কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তখন আমি কৃষ্ণনগরে ছিলাম। স্বরূপগঞ্জ দিয়া আমাদের বাড়ীতে যাতায়াতের রাস্তা ছিল। ঐ স্বরূপগঞ্জেই তিনি তখন বাস করিতেন। তখনই তাঁহার মাহাত্ম্য ও চিত্তের অভূতপূর্ব্ব উদারতার পরিচয় পাই। অনেকে তাঁহার ধর্ম্ম- প্রচার ও শ্রীগৌরাঙ্গের-জন্মস্থান- নিরূপণ- সম্বন্ধে বিরুদ্ধ আচরণ করিলেও তিনি বিশেষ উৎসাহের সহিত সকল কার্য্য করিতেন। সত্যের প্রচারের জন্য তাঁহার হৃদয়ে অমিত বল ছিল। শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান-আবিষ্কার এবং বৈষ্ণবধর্ম-বিষয়ে শিক্ষিত লোকের চক্ষুর উন্মেষণ করাই ছিল তাঁহার প্রধানতম কার্য্য।'**

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহোদয় শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সর্ব্বতোমুখী স্বাভাবিকী প্রতিভার কথা বলিয়া শেষে জানাইলেন,—'ডক্টর বিদ্যাভূষণ মহোদয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমি সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করি।' তৎপরে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

মহাশয় কিছু বলিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বলেন, —'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইউরোপ ও ভারতের সমগ্র দর্শন-শাস্ত্র আলোচনা করিয়া বহু গ্রন্থ লিখিয়াছেন। বর্ত্তমানে শিক্ষিতমণ্ডলী বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি যে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছেন, তাহা কেবল তাঁহারই লেখনীর প্রভাবে।' শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিষ্কপটতা-সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছিলেন।

সভাপতি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র বাবুকে তাঁহার অভিভাষণে বলিতে শুনিয়াছিলাম যে, তিনি শিক্ষিত ব্যক্তিগণ, ছাত্রবৃন্দ এবং যুবকগণকে শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদঠাকুরেরঅন্ততঃ'শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত,' 'জৈবধর্ম্ম' ও 'কৃষ্ণসংহিতা'-গ্রন্থ পাঠ করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন ও বলেন,—'ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমস্ত গ্রন্থই সনাতন-শাস্ত্রের নবনীত।' তিনি আরও বলিলেন,—'বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপটি আচরণ ও সুশিক্ষার মধ্যে প্রকাশিত না থাকায় চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আধুনিক শিক্ষিত লোক বৈষ্ণবধর্ম্মকে আমলই দিতেন না। এমন কি, রাজা রামমোহন রায়ের ন্যায় ব্যক্তিও তখন বৈষ্ণবধর্ম্মের যে বিকৃত আদর্শ দেখিয়াছিলেন এবং প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্মের তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত-বিচারে অনভিজ্ঞ যে দুই একটি লোকের সহিত আলাপ ও বিচারে যাহা জানিয়াছিলেন, তাহাকেই তিনি যথার্থ বৈষ্ণবধর্ম্ম মনে করিয়া ঐ ধর্ম্মের প্রতিবাদী হইয়া পড়িয়াছিলেন। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে'র ন্যায় অপূর্ব্ব গ্রন্থ জগতের কোন ভাষাতেই অদ্যাপি রচিত হয় নাই। কিন্তু সেই গ্রন্থখানি বটতলার ভ্রমপূর্ণ-সংস্করণে প্রকাশিত ছিল। ঐ গ্রন্থখানি প্রথমে আমি ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে প্রকাশ করিতে অনুরোধ করি। তিনি টীকা-টিপ্পনী প্রভৃতি দিয়া চরিতামৃত প্রথম প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন; বহরমপুরের রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয় ঐ সময় ঐ গ্রন্থের একটি সংস্করণ ছাপিতেছিলেন; ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের উৎকৃষ্ট সংস্করণ দুই খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে দেখতে পাইয়া তিনি ভক্তিবিনোদ মহাশয়কে অনুরোধ করেন যে, তাঁহার এই সংস্করণ প্রকাশিত হইলে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পুস্তক-বিক্রয়ে বিশেষ ক্ষতি হইবে। কাজেই দুইখণ্ড-প্রকাশের পর ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের ঐ পুস্তকপ্রকাশ বন্ধ হয়। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বহুদিন পরে 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য'-সহ শ্রীচরিতামৃত প্রকাশ করেন। তিনি যদি সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মকে বর্ত্তমান সময়োপযোগী প্রণালীতে অবিকৃতভাবে প্রচার না করিতেন, তবে আমরা তাহা বুঝিতে পারিতাম না। তাঁহারই কৃপায় আমরা শিশিরকুমার ঘোষ-প্রমুখ মনীষিবৃন্দকে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি অনুরাগী দেখিতে পাইয়াছি।'

সভাপতি মহাশয় থিওসফিক্যাল্-সোসাইটীর সেক্রেটারীর হস্তে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গ্রন্থাবলী প্রদান করেন। গভর্ণমেন্টের রেজিষ্ট্রেশন্ ডিপার্টমেন্টের ইন্স্পেক্টর-জেনারেল রায় প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর উক্ত সোসাইটীর পক্ষ হইতে ঠাকুরের গ্রন্থাবলী প্রাপ্তিতে কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ-পূর্ব্বক তাঁহার অভূতপূর্ব্ব রচনা-প্রণালীর কথা বলিয়াছিলেন। রায় রাধাচরণ পাল বাহাদুর ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

# শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদশকম্

(গৌড়ীয় ৭ম খণ্ড ৪১ সংখ্যা আষাঢ় ১৩৩৬, জুলাই ১৯৩৯)

অমন্দকারুণ্যগুণাকর শ্রীচৈতন্যদেবস্য দয়াবতারঃ।
স গৌরশক্তির্ভবিতা পুনঃ কিং পদং দৃশোর্ভক্তিবিনোদদেবঃ।। ১।।

যিনি পরমকারুণ্যগুণাকর শ্রীচৈতন্যদেবের দয়ার অবতারস্বরূপ, সেই গৌরশক্তি শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব পুনরায় আমদের নয়নগোচর হবেন কি? ১।।

শ্রীমজ্জগন্নাথপ্রভুপ্রিয়ো য একাত্মকো গৌরকিশোরকেন।
শ্রীগৌরকারুণ্যময়ো ভবেৎ কিং নিত্যং স্মৃতৌ ভক্তিবিনোদদেবঃ।। ২

যিনি শ্রীজগন্নাথপ্রভুর পরমপ্রিয় অনুগত এবং শ্রীমদ্ গৌরকিশোরদেবের অভিন্নাত্মস্বরূপ, সেই শ্রীগৌরকারুণ্যশক্তি শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব নিত্যকাল আমাদের স্মৃতিগোচর হবেন কি? ২।।

শ্রীনামচিন্তামণি-সম্প্রচারৈরাদর্শমাচারবিধৌ দধৌ যঃ।
স জাগরূপকঃ স্মৃতিমন্দিরে কিং নিত্যং ভবেদ্ ভক্তিবিনোদদেবঃ।। ৩

যিনি শ্রীনামচিন্তামণির প্রচারমুখে আচার-বিধির আদর্শ স্থাপন করেছেন, সেই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব নিত্যকাল আমাদের স্মৃতিমন্দিরে জাগরূক থাকবেন কি? ৩।।

নামাপরাধৈ রহিতস্য নাম্নো মাহাত্ম্যজাতং প্রকটং বিধায়।
জীবে দয়ালুর্ভবিতা স্মৃতৌ কিং কৃতাসনো ভক্তিবিনোদদেবঃ।। ৪।।

যিনি নামাপরাধরহিত শ্রীনামের মাহাত্ম্য-সমূহ প্রকাশপূর্ব্বক পরম-জীবদয়ালুতার পরিচয় প্রদান করেছেন, সেই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব আমাদের স্মৃতিসিংহাসনে সমারূঢ় থাকবেন কি? ৪।।

গৌরস্য গূঢ় প্রকটালয়স্য সতোহসতো হর্ষকুনাট্যয়োশ্চ।
প্রকাশকো গৌরজনো ভবেৎ কিং স্মৃত্যাস্পদং ভক্তিবিনোদদেবঃ।। ৫

যিনি গৌরাঙ্গদেবের গূঢ় আবির্ভাবক্ষেত্র প্রকাশ করে সজ্জনগণের হর্ষ এবং দুর্জ্জনগণের কুনাট্যভাব যুগপৎ জগতে প্রকাশিত করেছেন, সেই গৌরজন শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব আমাদের স্মৃতিবিষয়ীভূত হবেন কি? ৫।।

নিরস্য বিঘ্নানিহ ভক্তিগঙ্গাপ্রবাহনেনোদ্ধৃত সর্ব্বলোকঃ।
ভগীরথো নিত্যধিয়াং পদং কিং ভবেদসৌ ভক্তিবিনোদদেবঃ।। ৬

যিনি ভক্তিপথের কণ্টকসমূহের নিরাসপূর্ব্বক ভক্তিগঙ্গাপ্রবাহদ্বারা নিখিললোকের উদ্ধারসাধন করেছেন, সেই ভক্তিভাগীরথীর ভগীরথস্বরূপ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব আমাদের নিত্য আরাধনার বিষয় হবেন কি? ৬।।

বিশ্বেষু চৈতন্যকথাপ্রচারী মাহাত্ম্যশংসী গুরুবৈষ্ণবানাম্।
নামাগ্রহাদর্শ ইহ স্মৃতঃ কিং চিত্তে ভবেদ্ ভক্তিবিনোদদেবঃ।। ৭

যিনি জগতে সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যকথা প্রচার, গুরুবৈষ্ণবমাহাত্ম্য প্রকাশ এবং নামগ্রহণের আদর্শ প্রদর্শন করেছেন, সেই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব আমাদের হৃদয়ে স্মৃত হবেন কি? ৭।।

প্রয়োজনং সম্বন্ধ্যাভিধেয়ভক্তিসিদ্ধান্তবাণ্যা সমমত্র গৌরকিশোর।
সম্বন্ধযুতো ভবেৎ কিং চিত্তং গতো ভক্তিবিনোদদেবঃ।। ৮

যিনি স্বয়ং প্রয়োজনতত্ত্বস্বরূপ, সেই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব, শ্রীগৌরকিশোররূপ সম্বন্ধতত্ত্বের সহিত মিলিত হয়ে অভিধেয়তত্ত্ব শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর সহিত আমাদের চিত্তে উদিত হবেন কি? ৮।।

শিক্ষামৃতং সজ্জনতোষণীঞ্চ চিন্তামণিঞ্চাত্র সজৈবধর্ম্মম্।
প্রকাশ্য চৈতন্যপ্রদো ভবেৎ কিং চিত্তে ধৃতো ভক্তিবিনোদদেবঃ।। ৯

যিনি শিক্ষামৃত, সজ্জনতোষণী, হরিনাম-চিন্তামণি ও জৈবধর্ম্মের প্রকাশদ্বারা জীবগণের মধ্যে চৈতন্য বিতরণ করেছেন, সেই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব আমাদের হৃদয়ে ধৃত হবেন কি? ৯।।

আষাঢ়দর্শেত্বনি গৌরশক্তি--গদাধরাভিন্নতনুর্জহৌ যঃ।
প্রপঞ্চলীলামিহ নো ভবেৎ কিং দৃশ্যঃ পুনর্ভক্তিবিনোদদেবঃ।। ১০।।

যিনি আষাঢ়ী অমাবস্যাতিথিতে গৌরশক্তি শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুর অভিন্নবিগ্রহরূপে প্রপঞ্চলীলা পরিত্যাগ করেছেন, সেই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব পুনরায় আমাদের দৃষ্টিগোচর হবেন কি? ১০।।

**শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত গ্রন্থ সমূহ ঃ--**

'হরিকথা' (বাঙ্গালা পয়ার)–১২৫৭ বঙ্গাব্দ; 'শুম্ভ-নিশুম্ভ-যুদ্ধ' (বাঙ্গালা পয়ার)–১২৫৮; 'সাময়িক-পত্র-সমূহে প্রবন্ধাদি-রচনা'–১২৬২; 'পোরিয়েড়' (ইংরাজী কাব্য) ১ম ভাগ--১২৬৪; ঐ ২য় ভাগ–১২৬৫; 'উড়িষ্যার মঠ' (ইংরাজী)–১২৬৭; বিজন-গ্রাম (বাঙ্গালা-কাব্য); 'সন্ন্যাসী' (বাঙ্গালা-কাব্য); 'আওয়ার ওয়ান্টস্' (ইংরাজী)–১২৭০; 'বালিদে রেজিষ্ট্রি' (উর্দ্দুতে রচিত); 'স্পিচ্ অন্ গৌতম' (ইংরাজী)–১২৭৩; 'স্পিচ্ অন্ ভাগবত' (ইংরাজী)–১২৭৬; 'গর্ভস্তোত্র-ব্যাখ্যা' অথবা 'সম্বন্ধতত্ত্ব-চন্দ্রিকা' (বাঙ্গালা)–১২৭৭; 'রিফ্লেক্সন্' (ইংরাজী-কাব্য); 'ঠাকুর হরিদাসের সমাধি-সম্বন্ধে পয়ার'; 'পুরীর জগন্নাথ-মন্দির' ও 'পুরীর আখড়া' প্রভৃতি (ইংরাজী)–১২৭৮; 'দত্তকৌস্তুভম্' (সংস্কৃত-তত্ত্ববিষয়ক রচনা)–১২৮১; 'দত্তবংশমালা' (সংস্কৃত শ্লোক) –১২৮৩; 'বৌদ্ধ-বিজয়-কাব্য' (সংস্কৃত-শ্লোক)--১২৮৫; 'শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতা' (সংস্কৃত-শ্লোক, বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি-সহ)–১২৮৭; 'কল্যাণকল্পতরু' (বাঙ্গালা হরিকীর্ত্তন-গান); 'শ্রীসজ্জনতোষণী' (১ম-১৭শ খণ্ড)–১২৮৮; 'নিত্যরূপ-সংস্থাপন'-সম্বন্ধে 'রিভিউ' (ইংরাজী)--১২৯০; 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' (শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা ও বাঙ্গালায় 'রসিকরঞ্জন' ভাষ্য); 'শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত' (বাঙ্গালা গদ্য-রচনা); শ্রীশিক্ষাষ্টকের সংস্কৃত 'সন্মোদন'-ভাষ্য; 'শ্রীমনঃশিক্ষা' (হরিভজন-সম্বন্ধে বঙ্গানুবাদ-গান); 'শ্রীভাবাবলী' সংস্কৃত শ্লোক ও টীকা; 'প্রেমপ্রদীপ' (বাঙ্গালা গদ্য উপন্যাস); 'শ্রীবিষ্ণু-সহস্রনাম' (শ্রীবলদেব-কৃত ভাষ্যসহ)--১২৯৩; 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' (শ্রীগুণরাজ খান-কৃত পদ্যগ্রন্থ); 'শ্রীচৈতন্যোপনিষৎ' (সংস্কৃত 'শ্রীচৈতন্যচরণামৃত'-ভাষ্য-সহ সম্পাদন)–১২৯৪; 'শ্রীবৈষ্ণব-সিদ্ধান্তমালা' (বাঙ্গালা গদ্যে তত্ত্বোপদেশ)–১২৯৫; 'শ্রীমদাম্নায়-সূত্রম্' (সংস্কৃত সূত্র, টীকা ও বাঙ্গালা ব্যাখ্যা-সহ); 'শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য' (বাঙ্গালা পদ্য)–১২৯৭; 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' (শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-ভাষ্য ও বাঙ্গালা 'বিদ্বদ্রঞ্জন' ভাষা-ভাষ্যসহ)--১২৯৮; 'শ্রীহরিনামি', 'শ্রীনাম', 'শ্রীনামতত্ত্ব'

(শিক্ষাষ্টক); ‘শ্রীনাম-মহিমা’, ‘শ্রীনাম-প্রচার’, ‘শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা’ (বাঙ্গালা গদ্য)--১২৯৯; ‘শ্রীতত্ত্ববিবেক’ বা ‘শ্রীসচ্চিদানন্দানুভূতি’ (সংস্কৃত শ্লোকে দার্শনিক তথ্য ও বাঙ্গালা ব্যাখ্যা); ‘শ্রীশরণাগতি’ (বাঙ্গালা গান); ‘শোক-শাতন’ (বাঙ্গালা গান); ‘জৈবধর্ম্ম’ (গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের চরম কথা, বাঙ্গালা গদ্য)–১৩০০; ‘শ্রীতত্ত্বসূত্র’ (সংস্কৃত সূত্র, ভাষ্য এবং বাঙ্গালা ব্যাখ্যা); ঈশোপনিষদের ‘বেদার্ক-দীধিতি’ ব্যাখ্যা; ‘শ্রীতত্ত্বমুক্তাবলী’ বা ‘মায়াবাদ-শতদূষণী’র বাঙ্গালা ব্যাখ্যা–১৩০১; শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ‘অমৃতপ্রবাহ’ ভাষ্য (বাঙ্গালা গদ্য)–১৩০২; ‘শ্রীগৌরাঙ্গস্মরণমঙ্গল-স্তোত্র’ (সংস্কৃত শ্লোক); ‘শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষা’ (ইংরাজী); ‘শ্রীরামানুজ-উপদেশ-ব্যাখ্যা’ (সংস্কৃত শ্লোক ও বঙ্গানুবাদ)–১৩০৩; শ্রীব্রহ্ম-সংহিতার বঙ্গানুবাদ ও ‘প্রকাশিনী’ নাম্নী বাঙ্গালা বৃত্তি–১৩০৪; ‘শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে’র বাঙ্গালা ব্যাখ্যা; শ্রীউপদেশামৃতের ‘পীযূষবর্ষিণী’ বৃত্তি; শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার ‘মাধ্বভাষ্য’-প্রকাশ; ‘শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতান্তর্গত গোলোক-মাহাত্ম্যের সংস্কৃত টীকা ও বাঙ্গালা ব্যাখ্যা’–১৩০৫; ‘শ্রীভজনামৃতে’র বাঙ্গালা ব্যাখ্যা; ‘শ্রীনদ্বীপভাবতরঙ্গ’ (বাঙ্গালা পয়ার)–১৩০৬; ‘শ্রীহরিনামচিন্তামণি’ (বাঙ্গালা পদ্য)–১৩০৭; ‘শ্রীভাগবতার্ক-মরীচিমালা’ –গুম্ফিত ভাগবত-শ্লোক ও বাঙ্গালা ব্যাখ্যা; ‘শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুমে’র বাঙ্গালা ব্যাখ্যা; সমগ্র ‘শ্রীপদ্মপুরাণ’ সম্পাদন–১৩০৮; ‘শ্রীভজনরহস্য’ (সঙ্কলিত শ্লোক ও বাঙ্গালা পয়ার)–১৩০৯; ‘সৎক্রিয়াসারদীপিকা’ (সম্পাদন)–১৩১১; ‘শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত’ (পরিবর্দ্ধন)–১৩১২; ‘শ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত’ (সম্পাদন)–১৩১৩; ‘স্বনিয়ম-দ্বাদশকম্’–১২১৪।

**।। জয় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কি জয়।।**






# শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ

শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ পরমহংস (অবধূত) বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁর জন্ম বর্তমান বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার জামালপুরের নিকটবর্ত্তী মজিদপুর গ্রামে। শ্রীল বাবাজী মহারাজ পূর্ববঙ্গ থেকে নবদ্বীপে এসে অবধূতভাবে অত্যন্ত বৈরাগ্যের সাথে ভজন-সাধন আরম্ভ করেন। তিনি গঙ্গার তটে বৃক্ষতলে থেকে অতি দীনহীনভাবে ভজন-সাধন করতেন। বাবাজী মহারাজের পরমহংস বৈষ্ণবোচিত ক্রিয়া দেখে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি দূর থেকে বাবাজী মহারাজকে প্রণাম করতেন। বাবাজী মহারাজ রাগমার্গের ভজন করতেন। তাঁর বাহ্যিক আচরণ দেখে সন্দেহ হতে পারে তাই শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর অনুগত ভক্তদের বাবাজী মহারাজের কাছে যেতে নিষেধ করতেন।

শোনা যায় বাবাজী মহারাজের দুটি কাপড়ের ঝোলা ছিল। একটি ঝোলায় নিতাই গৌরাঙ্গ ও অপর ঝোলায় রাধাগোবিন্দের মূর্ত্তি থাকত। তিনি মূর্ত্তিগুলোকে ঝোলা থেকে বের করে পূজা-অর্চ্চনা করে যথাস্থানে রেখে দিতেন, আবার কখনও ঝোলার বাইরে রাখতেন। কখনও গড়গড়ায় তামাক সাজিয়ে দূর থেকে গড়গড়ার নলটি রাধাগোবিন্দকে দেখাতেন। কিন্তু নিতাই-গৌরকে দেখাতেন না। বহু ভক্ত চাল, আটা, ফল, কলা, মূলা বাবাজী মহারাজকে সেবার জন্য দিতেন, বাবাজী মহারাজ সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করতেন না। যখন বহু দ্রব্য একত্রিত হয়ে স্তুপের আকার ধারণ করত, তখন হঠাৎ কি খেয়াল হত– ঠাকুরকে দৃষ্টিভোগ দিয়ে উপস্থিত সকলকে সব প্রসাদই বিলিয়ে দিতেন। তাঁর এসব অলৌকিক আচরণ সাধারণ মানুষ কিছুই বুঝতেন না।

বাবাজী মহারাজ কারও সাহায্য না নিয়ে বড় বড় বৃক্ষ থেকে পূজার জন্য ফুল তুলে আনতেন। একবার ফুল পাড়তে গিয়ে বৃক্ষ থেকে পড়ে গিয়ে বাবা খঞ্জ হওয়ার লীলা অভিনয় করেছিলেন।

বাবাজী মহারাজ নিজের ভাবেই বিভোর থাকতেন, বেশী কথা বলতেন না। তাঁর নিকট বহু লোক যেতেন, অনেকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করতেন, তিনি খেয়াল হলে কারও কথার উত্তর দিতেন, নাহলে অধিকাংশ সময়ই মৌন থাকতেন। ঠাকুরের দিকে মুখ করে কত কি বলতেন, কখনও হাসতেন, কখনও কেঁদে আকুল হতেন। তিনি শাস্ত্র থেকে কোন শ্লোক বলতেন না। কিন্তু তাঁর অলৌকিক অনুভূতি হতে যে দু-চারটি কথা বলতেন, তাই চিত্তে গভীর রেখাপাত করত। এক ব্যক্তি প্রতিদিন বাবাজী মহারাজকে জিজ্ঞাসা করতেন, 'ভগবৎ প্রাপ্তির উপায় কি?' বাবাজী মহারাজ চুপ করে থাকতেন, কিছু বলতেন না। একদিন হঠাৎ বাবাজী মহারাজ বললেন,–''যদি ভগবানকে পেতে চাও, তাহলে 'কাঁদো'–কান্না কর।''

বাবাজী মহারাজ মাঝে মধ্যে বিভিন্ন তীর্থ স্থানে গিয়ে ভজন করতেন। তাঁর হৃদয় ছিল 'কৃষ্ণভক্তি-রসভাবিত মতি'। তিনি সর্বদা কৃষ্ণরসে মগ্ন থাকতেন। সবকিছুকেই কৃষ্ণময় দেখতেন। বিশেষ করে বটবৃক্ষ দেখলেই 'বংশীবট' মনে করতেন। তাই কোন বটবৃক্ষের নীচে বসে পড়লে সহজে উঠতে চাইতেন না।

১২ ফাল্গুন ১৩৪৭, ২৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৪১ সোমবার ত্রয়োদশী তিথিতে বাবাজী মহারাজ

কোলদ্বীপ থেকে বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। কখনও পায়ে হেটে, কখনও গরুর গাড়িতে, কখনও রেলপথে গমন করেছিলেন। তিনি প্রথমে কাটোয়ায় যায়। রেলস্টেশনের নিকটে একটি বটবৃক্ষ দেখতে পেয়ে সেখানে দুইদিন কাটান। তারপর কাটোয়া থেকে ট্রেনে উঠে ভাগলপুর স্টেশনে নেমে সেখানে স্টেশনের নিকটবর্তী বটবৃক্ষের নীচে একদিন, গঙ্গার তটে চারদিন, ভাগলপুর থেকে গয়ায় গিয়ে শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মের নিকটে ফল্গুনদীর তীরে তিনদিন, কাশীধামে শ্রীদশাশ্বমেধঘাটে গঙ্গাবক্ষে নৌকায় তিনদিন, অযোধ্যায় সরযু নদীর তটে তিনদিন, সেখানে বটবৃক্ষের নীচে এক প্রহর, প্রয়াগে ত্রিবেণীতে দশদিন, মথুরায় শ্রীবিশ্রামঘাটে যমুনার তটে দুইদিন, বৃন্দাবনে বংশীবটে আটদিন, যমুনার তীরে মধ্যচড়ায় নয়দিন, গোবিন্দজীর মন্দিরে একদিন, কালীয়দহে দুইদিন, নন্দগ্রামে সূর্যকুণ্ডের পূর্বপারে তমালবৃক্ষের নীচে আটদিন, পাবনসরোবরে দুইদিন, পীলু গাছের তলায় চারদিন, পুনরায় বৃন্দাবনে বংশীবটের ঘাটে নয়দিন ভজনানন্দে নিমগ্ন থেকে প্রায় তিনমাস বাদে জ্যৈষ্ঠ ত্রয়োদশী তিথিতে শ্রীনবদ্বীপ ধামে ফিরে আসেন। বাবাজী মহারাজের সাথে যাঁরা গিয়েছিলেন, তারা বাবাজী মহারাজকে ব্রজমণ্ডলে বিভিন্ন বনে কৃষ্ণলীলাকীর্ত্তন, কখনও নবদ্বীপের মহিমা কীর্ত্তন, কখনও বা উচ্চৈঃস্বরে গান, কখনও অট্টহাস্য, কখনও বা উন্মত্তের ন্যায় অসংলগ্ন কথা বলতে, কখনও সম্পূর্ণ মৌন থাকতে, কখনও বা শ্রীবিগ্রহের সাথে মনে মনে কি সব বিড় বিড় করে অস্ফুট ভাবে কথা বলতে ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার ভাবে বিভাবিত দেখে চমৎকৃত হয়েছিলেন।

প্রাচীন সাপ্তাহিক গৌড়ীয় পত্রিকায় বাবাজী মহারাজের ভ্রমণ বৃত্তান্ত জানা যায়,—''তিনি ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাস থেকে আরম্ভ করে সম্বৎসরকাল পর্যন্ত শ্রীঅম্বিকা কালনা, খড়গপুর-মেদনীপুর, বালেশ্বর, সোরো, ভদ্রক, খুরদা রোড, পুরুষোত্তমধাম, পুনঃ গয়া, কাশী, সৈয়দপুর গ্রাম, পাটনা, মুঙ্গের প্রভৃতি বহুস্থানে শুভ পদার্পণ করেছিলেন।

বহু লোকে বাবাজী মহারাজকে বিভিন্ন প্রশ্ন করতেন। বাবাজী মহারাজ কখনও মৌন থাকতেন, আবার কখনও সে সকল প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিতেন। যেমন—

প্রশ্নঃ —বাবা! আমরা কি করব?

উত্তর ঃ- নিতাই ভজলে গৌর পাবে। নিরানন্দ দূরে যাবে, পরানন্দের উদয় হবে।

প্রশ্ন ঃ- ইন্দ্রিয়ের তাড়না থেকে নিস্কৃতির উপায় কি?

উত্তর ঃ- শুনিয়া গোবিন্দরব আপনি পলাবে সব, সিংহরবে যথা করিগণ।

প্রশ্ন ঃ- বাবা! আপনার সংসারেও তো নিরানন্দ?

উত্তর ঃ এখানে নিরানন্দ, ভজলে গৌরনিতাই, পাবে আনন্দ। আমার এটা নিত্য সংসার, আর তোমার মায়ার সংসার। শিশু যেমন ঘুমের মধ্যে হাসে, কাঁদে, তোমার সংসারের সুখও সেইরকম।

প্রশ্ন ঃ- কৃষ্ণের কৃপা, ভক্তের কৃপা বুঝব কি করে?

উত্তর ঃ- 'যে করে তোমার আশ, তার হয় সর্বনাশ।' কাউকেও টাকা দেয়, কারও টাকা নেয়। তোমাস্থানে অপরাধে নাহি পরিত্রাণ। ঠেকাবি কি করে? পরিত্রাণ করবে কে? কাকেই বা বলি, কেই বা শুনে। বৈষ্ণবেতে লেশমাত্র রতি হল না।

প্রশ্ন ঃ- কৃপা পাব কি করে?

উত্তর ঃ কাঁদলে ত' কৃপা হবে। কাঁদে কই? প্রেমকাদাঁ কাঁদলে ত' পাবে। 'মুখে বলি হরি, কাজে






অন্য করি, প্রেমবারি চোখে এলো না'।

প্রশ্ন ঃ সুখ কিসে? ত্যাগে না ভোগে?

উত্তর ঃ- সাধুরা সরযু নদীর তীরে থাকে, আর সীতারাম বলে। সেখানে আনন্দ, নিরানন্দ থাকে না। দুর্য্যোধন রাজার পক্ষ্যে যারা, তাদের নিরানন্দ। আর যুধিষ্ঠির মহারাজের পক্ষ্যে যারা ছিলেন, তাঁদের সুখ। এই সুখ ও দুঃখই দুই ভাই। ভোগ আর ত্যাগ। কেউ ভোগ করে, কেউ ত্যাগ করে।

প্রশ্ন ঃ মায়াপুরে কখনও গেছেন?

উত্তর ঃ- গিয়েছি। তাঁকে মায়াপুরও বলে, নবদ্বীপও বলে। মায়াপুরের মন্দিরের চারিদিকে ঘর আছে, নিমগাছের তলায় সেবা আছে। আমি একবার ছিঁড়া কাঁথা ও করঙ্গ নিয়ে মায়াপুরে গিয়েছিলাম। শচীনন্দন গোসাঞি এসে আমার করঙ্গটি নিয়ে গেল। আমি বসে রইলাম। কতক্ষণ পরে করঙ্গটি ফিরিয়ে দিয়ে শচীনন্দন গোসাঞি চলে গেলেন। আমিও চলে এলাম।

মেদিনীপুরে শ্রীল ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের প্রতিষ্ঠিত একটি মঠ আছে। একবার তীর্থ ভ্রমণকালে শ্রীল বাবাজী মহারাজ মেদিনীপুরে এলেন। বাবাজী মহারাজ গরুর গাড়িতে আসছেন শুনে শ্রীল ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বাবাজী মহারাজের নিকট সেবক পাঠালেন তাঁকে সগোষ্ঠী মঠে আমন্ত্রণের জন্য। বাবাজী মহারাজ রাজি হলেন। শ্রীল মাধব মহারাজ যথোচিত সেবার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু মধ্যাহ্ন ভোগ আরতির পর বহু সময় ধরে অপেক্ষা করার পরও বাবাজী মহারাজ এলেন না দেখে শ্রীল মাধব মহারাজ নিজেই বাবাজী মহারাজের নিকট পৌঁছলেন। বাবাজী মহারাজ একটি বটগাছ দেখে ভাবাবিষ্ট হয়ে সেই বটবৃক্ষকে 'বংশীবট' ভেবে সেখানেই ভোগের ব্যবস্থা করেন। তিনি শ্রীল মাধব মহারাজকে প্রচুর স্নেহ করেন এবং তাঁকে পরমান্ন প্রসাদ দেন। পরমান্ন প্রসাদের অপূর্ব আস্বাদন।

শ্রীল ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীল বাবাজী মহারাজের অলৌকিক চরিত্র সম্বন্ধে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন—

**"একটি চাক্ষুষ ঘটনা—বাবার শ্রীনবদ্বীপ গঙ্গাতটস্থ ভজনকুটীরে শ্রীবিগ্রহসমক্ষে স্তূপীকৃত ফল থাকিত, তাহাতে কাহারও হস্তক্ষেপ করিবার উপায় ছিল না। একদিন একটি গরু আসিয়া সেই ফলগুলি ভক্ষণ করিতেছে, বাবা হাততালি দিতেছেন আর অট্টহাস্য হাসিতেছেন। বাবার সেবকের নাম পূর্ণ বা পুণ্য, আমি কৌতুহলপরবশ হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—বাবা আজ এত হাসিতেছেন, ইহার কারণ কি? তিনি কহিলেন—গত রাত্রে বাবার ভোগের ও পূজার বাসনগুলি চোরে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে, এখন আবার গরুতে আসিয়া ফলগুলি খাইয়া যাইতেছে দেখিয়া বাবা আনন্দে আটখানা হইয়া হাসিতেছেন আর বলিতেছেন—'এক চোরা দেয় এক চোরা নেয়।' গরুকে কাহারও তাড়াইবার উপায় নাই, এই চৌরাগ্রগণ্য পুরুষই ত' কৃষ্ণ।**

**বাবা কাহাকেও তাঁহার পাদপদ্মে হাত দিতে দিতেন না। কিন্তু আজ ফাল্গুনী পূর্ণিমার পরদিন, শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসব। বাবা আজ আনন্দে আত্মহারা হইয়া কল্পতরু হইয়াছেন, আজ তাঁহার পাদপদ্মে হস্তার্পণ করিবার সৌভাগ্য বরণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলাম। একদিন তাঁহার ফেলালবও পাইবার সৌভাগ্য হইয়াছিল।**

**'ত্যজিয়া শয়নসুখ বিচিত্র পালঙ্ক। কবে ব্রজের ধূলায় ধূসর হবে অঙ্গ।।' এইসকল পদ গান করিতে শুনিয়া বাবাজী মহারাজ ছল ছল নেত্রে—গদগদ কণ্ঠে বলিয়া উঠিতেন—তোমরা ত' কেবল**

গাহিয়াই গেলে, যার ফাটল, তার ফাটল। অর্থাৎ আমরা কেবল মহাজন-পদ শুনি, গানই করি, কিন্তু হৃদয় বিগলিত হয় না, ধামের ধূলা গায়ে লাগিলে তাহা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিতে চাই, তাহার মূল্য কিছুই বুঝি না।

আমরা শুনিয়াছি, শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ আমাদের পরমগুরুদেব শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের নিকট বেষাশ্রয় করিয়াছিলেন।

একদিন বাবার ভজনকুটীর-প্রাঙ্গণে মহামন্ত্র নাম কীর্ত্তনের পরিবর্ত্তে অন্য স্বকপোলকল্পিত রসাভাসদোষদুষ্ট ও সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ নামগান আরম্ভ করিবামাত্র বাবা 'ঐ নাম এখানে চলিবে না' বলিয়া নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন।

এক সজ্জন প্রায়ই বাবাকে 'কৃপা কর' 'কৃপা কর' বলিয়া প্রার্থনা জানাইতেন। একদিন বাবা তাঁহার ডোর কৌপীন খুলিয়া তাঁহার দিকে তাহা ধরিয়া বলিতে লাগিলেন—'কের্‌পা লিবি কের্‌পা লিবি, এই লে'। বাবার বচনভঙ্গী শ্রবণ করিয়া তিনি ভীত হইলেন। আমরা 'বৈষ্ণবের কৃপা, যাহে সর্ব্বসিদ্ধি' এরূপ কৃপা লাভ করিতে হইলে বৈষ্ণবচরণে নিষ্কপটে শরণাগতি লাভের বিচার বরণ করিতে পারিতেছি কোথায়? মুখে 'কৃপা কর' বলিলে কি হইবে?

শ্রীগোকুলদাস বাবাজী বলিয়া আমাদের এক বৃদ্ধ গুরুভ্রাতা ছিলেন। শুনিয়াছি তাঁহার পূর্ব্বাশ্রম, বাবার পূর্ব্বাশ্রমের নিকট ছিল। তিনি প্রায়ই শ্রীমায়াপুর হইতে বাবার দর্শন করিতে যাইতেন। বাবা পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায় তাঁহার সহিত প্রাণ খুলিয়া হরিকথা বলিতেন।"

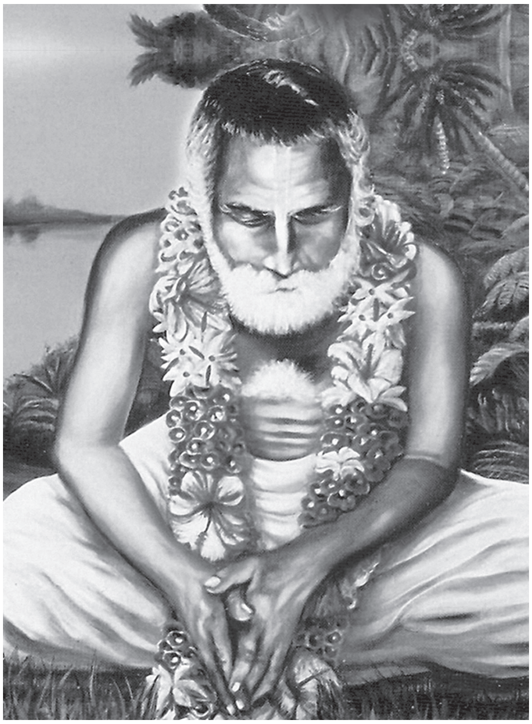
শ্রীল বাবাজী মহারাজ বৃন্দাবন পুরী প্রভৃতি স্থানে দীর্ঘ ভ্রমণের পর নবদ্বীপ ধামে প্রত্যাবর্ত্তন করতেন। মাঝে মাঝে ভক্তদের বিশেষ আগ্রহে আবির্ভাব স্থলী মজিদপুরে যেতেন। কিন্তু সুখলাভ করতেন না। বলতেন এটি পাণ্ডববর্জিত স্থান।

শ্রাবণ মাসের শুক্লা-চতুর্থীবাসরে শ্রীল বাবাজী মহারাজ অপ্রকট হন।

।। জয় শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ কি জয়।।



# শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ



''নমো গৌরকিশোরায় সাক্ষাদ্বৈরাগ্য-মূর্ত্তয়ে।
বিপ্রলম্ভ-রসাম্ভোধে পাদাম্বুজ্যায় তে নমঃ।।''

শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের বিশেষ পরিচয়; তিনি বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও সমগ্র গৌড়ীয় মঠ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদের দীক্ষাগুরু। তিনি বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত ফরিদপুর জেলার টেপাখোলার নিকটে পদ্মা নদীর তটবর্ত্তী 'বাগ্‌যান' গ্রামে অষ্টাবিংশ শতাব্দিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর পিতামাতার পরিচয় জানা যায় নি।

শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের পূর্বাশ্রমের নাম ছিল 'বংশীদাস'। পূর্বাশ্রমে তিনি শস্যের ব্যবসা করতেন। তাঁর পত্নী ভক্তিমতী ছিলেন। উভয়ে পরমার্থ অনুশীলন করতেন। পত্নীবিয়োগ হলে তিনি সংসার পরিত্যাগ করে শ্রীধাম বৃন্দাবনে গমন করেন এবং শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের অন্যতম বেষশিষ্য শ্রীল ভাগবত বাবাজী মহারাজের নিকট থেকে পরমহংস বেষ গ্রহণ করে ৮৪ ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডলের বিভিন্ন স্থানে বৃক্ষতলে অবস্থান করে তীব্র বৈরাগ্যের সাথে ভজন করতে থাকেন।

শ্রীব্রজমণ্ডলে প্রায় ৩০ বছর ভজন করার পর যখন শুনলেন যে, শ্রীধাম মায়াপুরে মহাপ্রভুর জন্মস্থান প্রকাশিত হয়েছে, তখন তিনি শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের নির্দ্দেশে নবদ্বীপে এসে নবদ্বীপকে অভিন্ন ব্রজমণ্ডল ভেবে বসবাস শুরু করেন। তিনি অপ্রাকৃত নেত্রে নবদ্বীপ মণ্ডলের অধিবাসীগণকে ধামবাসীরূপে দর্শন করতেন। পরিত্যক্ত মাটির পাত্রে মাধুকরী ভিক্ষার দ্বারা লব্ধ দ্রব্য রন্ধন করে কোন প্রকারে জীবন ধারণ করতেন। শুনা যায়, তিনি কখনও গঙ্গাজল, কখনও গঙ্গার মাটি আবার কখনও অভুক্ত অবস্থায় থেকে নিরন্তর হরিনাম করতেন। তিনি মাঝে-মধ্যে গোদ্রুম দ্বীপে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনকুটীরে সানন্দসুখ দকুঞ্জে এসে অবস্থান করতেন এবং ঠাকুরের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করতেন।

বাবাজী মহারাজ কখনও কারও নিকট থেকে কোন সেবা গ্রহণ করতেন না। সর্বক্ষণ কখনও তুলসীর মালা, কখনও ছেড়া বস্ত্রে গীট দিয়ে মালা তৈরী করে তাতে হরিনাম করতেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের 'প্রার্থনা ও প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা' গ্রন্থ তাঁর সর্ব্বস্ব ছিল।

ইংরেজী ১৮৯৮ সালে গোদ্রুমস্থ শ্রীস্বানন্দ-

সুখদকুঞ্জে শ্রীল বাবাজী মহারাজের সাথে শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের প্রথম সাক্ষাদ্ হয়। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নির্দ্দেশে গোদ্রুম স্বানন্দসুখদকুঞ্জে শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের নিকট থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেন। বিবিক্তানন্দী শ্রীল বাবাজী মহারাজের সঙ্কল্প ছিল, 'তিনি কাউকেও মন্ত্র দেবেন না'। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের অনন্য নিষ্ঠায় তাঁর সঙ্কল্প ভঙ্গ হয়। শ্রীল প্রভুপাদই শ্রীল বাবাজী মহারাজের একমাত্র শিষ্য। শোনা যায় শ্রীল প্রভুপাদ বাবাজী মহারাজের নিকট দীক্ষার জন্য পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা জানালে শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলেন, ''আমি প্রথমে মহাপ্রভুকে বা নিত্যানন্দ প্রভুকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি যদি অনুমতি দেন তাহলে অবশ্যই তোমাকে দীক্ষা দিব"। শ্রীল প্রভুপাদ দ্বিতীয় দিন এসে জিজ্ঞাসা করলে বাবাজী মহারাজ বলেন,—''আমি মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছি"। শ্রীল প্রভুপাদ হতাশ না হয়ে তৃতীয় দিন এসে জিজ্ঞাসা করলে, বাবাজী মহারাজ বলেন,—''সুনীতি, পাণ্ডিত্য এই সবের দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায় না, দীক্ষা গ্রহণে অধিকার হয় না।" বাবাজী মহারাজের দ্বারা বার বার প্রত্যাখ্যাত হয়েও শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর নিষ্ঠা পরিত্যাগ করলেন না। শ্রীরামানুজ আচার্য্য ১৮ বার প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর গুরু গোষ্ঠীপূর্ণের কৃপা লাভ করেছিলেন। তদ্রূপ শ্রীল প্রভুপাদও অসীম ধৈর্য্য ধারণ করে বাবাজী মহারাজকে বার বার দৈন্য আর্ত্তি জানাতে থাকেন। একদিন অভিমান ভরে বলে বসেন—''আপনারা লম্পটচূড়ামণির উপাসক, সুতরাং আমার ন্যায় নীতিপরায়নকে কৃপা করবেন কেন? মহাপ্রভু আচার্য্যলীলায় লম্পট চূড়ামণির ভজনই শিক্ষা দিয়েছেন 'সুতরাং তিনিই বা আমাকে কৃপা করার আদেশ দিবেন কেন? কিন্তু করুণা না হলে এ প্রাণ আর রাখব না।" এই বলে কাঁদতে থাকেন। তখন শ্রীল বাবাজী মহারাজের হৃদয় বিগলিত হল। তিনি শ্রীল প্রভুপাদকে চরণধূলি দিয়ে অভিষিক্ত করে দীক্ষা প্রদান করলেন। শ্রীল প্রভুপাদের দীক্ষিত নাম হয়—শ্রীবার্ষভানবীদয়িতদাস। কিংবদন্তী আছে, শ্রীল প্রভুপাদ ১২ বার প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর ১৩ বারে শ্রীল বাবাজী মহারাজের কৃপা লাভ করেছিলেন। আবার অনেকে বলেন, তিনবার প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পরে চতুর্থ বারে কৃপালাভ করেছিলেন। এখানে বিবিক্তানন্দী শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর নিকট শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের দীক্ষাগ্রহণ লীলার স্মৃতি উদিত হয়। গুরুতে অনন্য নিষ্ঠাই সৎ শিষ্যের লক্ষণ।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর গুরু শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সম্বন্ধে লিখেছেন—

**"আমার অভাব-পূরণের জন্য আব্রহ্মস্তম্ব অনেক বিষয় হস্তগত করিতে আমি ব্যস্ত ছিলাম। মনে করিতাম, বিষয় পাইলেই আমার অভাব পূরণ হইবে। অনেক সময় অনেক দুর্ল্লভ বিষয় লাভ করিলাম, কিন্তু আমার অভাব দূর হইল না। জগতে অনেক মহৎচরিত্র ব্যক্তি পাইলাম; কিন্তু তাঁহাদিগের নানা অভাব দেখিয়া তাঁহাদিগকে সম্মান দিতে পারিলাম না। এহেন দুর্দ্দিনে আমার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া পরমকারুণিক শ্রীগৌরসুন্দর তদীয় প্রিয়তমদ্বয়কে আমার প্রতি প্রসন্ন হইবার অনুমতি করিলেন। আমি পার্থিব অহঙ্কারে প্রমত্ত হইয়া জড়ীয় আত্মশ্লাঘা করিতে করিতে নিজমঙ্গল হারাইয়াছিলাম। কিন্তু প্রাক্তন-সুকৃতি-প্রভাবে আমার মঙ্গলময়-শুভাকাঙ্ক্ষিরূপে শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদকে পাইয়াছিলাম। তাঁহারই নিকটে আমার প্রভু অনেক সময় শুভাগমন করিতেন এবং অনেক সময় তাঁহার নিকট থাকিতেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর দয়াপরবশ হইয়া আমার**






প্রভুকে দেখাইয়া দেন। প্রভুকে দেখিয়া অবধি আমার পার্থিব অহঙ্কার হ্রাস পাইতে থাকে। আমি জানিতাম, নরাকার ধারণ করিয়া সকলেই আমার ন্যায় হেয় ও অধম, কিন্তু আমার প্রভুর অলৌকিক চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমি ক্রমশঃ জানিতে পারিলাম যে, আদর্শবৈষ্ণব ইহজগতে থাকিতে পারেন।"

"তাঁহাকে দেখিয়াও অনেক অর্ব্বাচীন, অনেক চতুর, সমীচীন, বালক, বৃদ্ধ, পণ্ডিত, মূর্খ, ভক্তাভিমানী ব্যক্তি তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারে নাই। এইটিই কৃষ্ণভক্তের ঐশী শক্তি। শত শত অন্যাভিলাষী তাঁহার নিকট নিজ ক্ষুদ্র অভিলাষের পরামর্শ পাইতেন সত্য; কিন্তু সেই উপদেশগুলিই তাহাদের বঞ্চনাকারক। অসংখ্য লোক সাধুর বেষ গ্রহণ করে, সাধুর ন্যায় অনুষ্ঠান প্রদর্শন করে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সাধু হইতে বহুদূরে অবস্থান করিয়া থাকে। আমার প্রভু তাদৃশ কপট ছিলেন না, নির্ব্ব্যলীকতাই (অকপটতাই) যে সত্য, তাহা তাঁহার অনুষ্ঠানে অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার নিষ্কপট স্নেহ--অতুলনীয়, যাহা বিভূতিলাভকেও ফল্গুত্বে প্রতিষ্ঠিত করে। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী বা বিরোধি-ব্যক্তির প্রতি কোনপ্রকার বিতৃষ্ণা ছিল না, কৃপাপাত্রের প্রতিও কোন বাহ্য অনুগ্রহ-প্রদর্শন ছিল না। তিনি বলিতেন,–'আমার বিরাগভাজন বা প্রীতিভাজন জগতে কেহ নাই, সকলেই আমার সম্মানের পাত্র।' আরও এক অলৌকিক কথা এই যে, শুদ্ধভক্তি-ধর্ম্মবিরোধী ছলপরায়ণ অনেকগুলি প্রাকৃত লোক কিছু না বুঝিয়া সর্ব্বদা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিত এবং আপনাদিগকে তাদৃশ সাধুর স্নেহপাত্র জ্ঞান করিয়া কুবিষয়েই প্রমত্ত থাকিত। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে প্রকাশ্যভাবে দূরে ত্যাগ করেন নাই, আবার তাহাদিগকে কোনপ্রকারে গ্রহণও করেন নাই।"

শ্রীল বাবাজী মহারাজের জীবন অপ্রাকৃত। তাঁর দর্শনও ছিল অসাধারণ। 'সরস্বতী জয়শ্রী' গ্রন্থে একটি চমৎকার ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। ঘটনাটি ঐ গ্রন্থের বৈভবপর্বে শ্রীমৎ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন বর্ণনা করেছেন–

"শ্রীযুক্ত শম্ভুবাবু নূতন বিবাহ করিবার পর শ্রীল প্রভুপাদের নিকট তাঁহার বিবাহিত জীবনে কিরূপভাবে হরিভজন করিবার সুযোগ হইতে পারে, তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রার্থনা করেন। প্রভুপাদ (শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর) শম্ভুবাবুর পক্ষে বিবাহিত জীবনে হরিভজনের অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হইবে বলিলে শম্ভুবাবু ইহাতে বিশেষ দুঃখিত হইলেন বলিয়া মনে হইল। ইহার পরে ১১ই কার্তিক শ্রীল প্রভুপাদের সহিত শম্ভুবাবু প্রভৃতি আমরা কয়েকজন আমাদের নিজের নৌকায় চড়িয়া কুলিয়ার চড়ায় শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের চরণসমীপে উপনীত হইলাম। শ্রীল বাবাজী মহারাজের নিকট অন্যান্য কথার পর শম্ভুবাবুর বিবাহের কথা উত্থাপিত হওয়ায় তিনি (পরমহংস বাবাজী মহারাজ) বলিলেন,–'বেশ, শম্ভুবাবু বিবাহ করিয়াছেন ত' ভালই, এখন তিনি প্রত্যহ নিজহস্তে বিষ্ণুনৈবেদ্য রন্ধন করিয়া বিষ্ণুকে নিবেদনের পর সেই প্রসাদ সহধর্মিণীকে সেবন করাইয়া বৈষ্ণববুদ্ধিতে সহধর্মিণীর অবশেষ গ্রহণ করিবেন, তাঁহার প্রতি ভোগ্যবুদ্ধির পরিবর্তে ন্যূনাধিক সেব্যগুরুবুদ্ধি করিবেন, তাহা হইলেই শম্ভুবাবুর মঙ্গল হইবে। সমস্ত জগৎ–পৃথিবীর সমস্ত ধন, রত্ন, স্ত্রী, পুরুষ একমাত্র কৃষ্ণেরই ভোগের বস্তু, তিনি কৃষ্ণের বস্তু কৃষ্ণের সেবায় লাগাইয়া দিন, স্ত্রীকে নিজ সেবিকা না করিয়া কৃষ্ণের সেবিকা-বুদ্ধিতে সম্মান করুন।"

শ্রীরূপ রঘুনাথের বৈরাগ্যের মূর্তবিগ্রহ শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের নিকট কখনও কপটতা স্থান পায় নি। তিনি কখনও মর্কট বৈরাগ্যের প্রশ্রয় দেন নি। মর্কট (বাঁদর) ফল-মূল ভক্ষণ করে দিগম্বর হয়ে বনে বনে বৃক্ষে বৃক্ষে বিচরণ করলেও হিংস্র ও কামুক প্রকৃতির হয়। যারা নিষ্কিঞ্চন বাবাজী বেষ গ্রহণ করেও 'মহাপ্রভুর ছোট হরিদাসের প্রতি শিক্ষাকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে লাম্পট্যের প্রশ্রয় দেয় তারা মর্কট বৈরাগী। এই সব মর্কট বৈরাগীর দূরাবস্থা দেখে শ্রীল বাবাজী মহারাজ একদিন সুন্দর পাড় ওয়ালা ধূতি ও চাদর পরে শ্রীসানন্দসুখদকুঞ্জে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হলেন। নিষ্কিঞ্চন-শিরোমণির ঐ বেষ দেখে ঠাকুর বিস্মিত হলেন। বাবাজী মহারাজ বললেন,--''কৌপীন পরে ব্যভিচার করার থেকে বাবু-ভায়ার পোষাক পরিধান সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। পল্লীগ্রামের ত' কথাই নাই, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সুপ্রসিদ্ধ তীর্থস্থানেও মর্কটরা অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে! এরা ভুলে যায়—

'গোরার আমি, গোরার আমি, মুখে বলিলে নাহি চলে।
গোরার আচার, গোরার বিচার লইলে ফল ফলে।
লোক-দেখান গোরা ভজা তিলকমাত্র ধরি'।
গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি।।''

এক সময় কাশিম বাজারের মহারাজ মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর শ্রীল বাবাজী মহারাজকে তাঁর রাজ প্রাসাদে নেবার জন্য এক বিশিষ্ট লোক পাঠান। তখন শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলেছিলেন, আমি মহারাজের প্রাসাদে গেলে আমার অর্থলোভ হতে পারে। তাতে মহারাজের সঙ্গে আমার মনোমালিন্য হবার সম্ভাবনা আছে। আমার যাবার পরিবর্ত্তে তিনিই সমস্ত বিষয় বৈভব আত্মীয় স্বজনকে নিয়ে আমার নিকট আসুন। আমি তাঁর অবস্থানের জন্য আমার ন্যায় একটা ছৈ প্রস্তুত করে দিব এবং উভয়ে আনন্দে হরি ভজন করব।

শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলতেন যেখানে সেখানে ভোজন করলে ভজন পণ্ড হয়। এক বার ভক্ত হরেনবাবু নবদ্বীপের ভজন কুটীরের উৎসবের প্রসাদ গ্রহণ করেছিলেন। তজ্জন্য শ্রীল বাবাজী মহারাজ তিন দিন তাঁর সঙ্গে কথা বলেন নাই। চতুর্থ দিন বললেন—ভজন কুটীরে যে উৎসবের প্রসাদ দেওয়া হয়েছিল তা এক কুলটা রমণীর প্রদত্ত বস্তু। সঙ্গ বিচার না করে যেখানে সেখানে খেলে ভজন নষ্ট হয়।

একবার শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদের তিরোভাব তিথির পূর্ব্ব দিনে শ্রীল বাবাজী মহারাজ বললেন--''আগামীকল্য শ্রীগোস্বামী প্রভুর অপ্রকট তিথি। সুতরাং আমরা মহোৎসব করব। নিকটস্থ সেবকটি জিজ্ঞাসা করলেন--মহোৎসবের জিনিষ পত্র কোথায় পাওয়া যাবে? শ্রীল বাবাজী মহারাজ বললেন কারও নিকট কিছু বল না, একবেলা খাওয়া বন্ধ করে সর্ব্বক্ষণ কেবল হরিনাম করব। তাই আমাদের ন্যায় কাঙ্গালের মহোৎসব।

এক সময় আগরতলা নিবাসী শ্রীনরেন্দ্র কুমার সেন শ্রীল বাবাজী মহারাজের নিকট আসলেন এবং শ্রীগুরু প্রণালী (সিদ্ধ প্রণালী) জানতে চাইলেন। তদুত্তরে শ্রীল বাবাজী মহারাজ বললেন--শ্রীভগবানকে কল্পনার দ্বারা জানা যায় না। শ্রীহরিনাম করতে করতে শ্রীনামের অক্ষর সমূহের ভিতর দিয়ে তাঁর স্বরূপ প্রকাশ পায়। সাধকও তৎকালে আত্মস্বরূপ জানতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে সাধকের প্রিয় সেবাদিও জেগে উঠে।

একবার কোন একজন ডাক্তার শ্রীল বাবাজী মহারাজকে বলেছিলেন, তিনি শ্রীনবদ্বীপ ধামে বাস করে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করতে চান। তাকে শ্রীল বাবাজী মহারাজ বললেন— আপনি যদি সত্যই

নবদ্বীপে বাস করতে চান তবে বিনামূল্যে চিকিৎসা করে বিষয়ী লোকের বিষয় চেষ্টার সহায়তা করবার ইচ্ছা ত্যাগ করুন। যাঁরা বাস্তবিক হরিভজন করেন তাঁদের হরিভজনের সহায়তা ব্যতীত অন্য কোন প্রকারের সেবা বা ধর্ম সমস্তই ঘোর বন্ধনের কারণ হয়ে থাকে।

কোন সময় একজন নবীন কৌপীন ধারী শ্রীল বাবাজী মহারাজের নিকট কয়েকদিন যাতায়াত করবার পর নবদ্বীপে কোন ভূম্যধিকারিণী রাণীর এষ্টেটের কর্ম্মচারীর থেকে পাঁচকাঠা জমি সংগ্রহ করেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজ সেই কথা শুনে অতি ক্রোধভরে বলেন—শ্রীনবদ্বীপ ধাম অপ্রাকৃত। এখানে প্রকৃত ভূম্যমিধকারিগণ কিরূপে ভূমি প্রাপ্ত হলেন যে তা হ'তে তাঁরা উক্ত কৌপীনধারীকে পাঁচ কাঠা জমি দিতে সমর্থ হলেন? বিনিময়ে এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত রত্নরাজি প্রদান করলেও অপ্রাকৃত নবদ্বীপের একটি বালুকার মূল্যের তুল্য হয় না। উক্ত কৌপীন ধারীরই বা কত ভজন বল আছে যে সে তার ভজন মুদ্রার বিনিময়ে নবদ্বীপে এত জমি সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছে?

একদিন একজন ভক্ত কিছু মিষ্টি মহাপ্রভুকে ভোগ দিয়ে শ্রীল বাবাজী মহারাজের নিকট নিয়ে গেলেন এবং তা গ্রহণ করবার জন্য প্রার্থনা জানালেন। বাবাজী মহারাজ বললেন—''যারা মাছ খায়, ব্যভিচার করে কিংবা অন্য কোন অভিলাষ নিয়ে মহাপ্রভুকে ভোগ দেয়, তাদের হাতে মহাপ্রভু খান না। তা প্রসাদ হয় না।''

শ্রীল বাবাজী মহারাজ স্বয়ং চাল ভিক্ষা করে তা রান্না করে ভোগ দিয়ে নিজে গ্রহণ করতেন। কখনও অন্যের দেওয়া কোন জিনিষ গ্রহণ করতেন না। কোন সময় তিনি বর্ষাকালে ফুলিয়া নবদ্বীপের ধর্ম্মশালায় কিছু দিন বাস করেন। কিছু প্রসাদ একটি ভাণ্ড করে রেখে দিয়েছেন। একটি সর্প তার পাশ দিয়ে চলে যায়, কোন মহিলা তা দেখতে পায়। যখন শ্রীল বাবাজী মহারাজ সেই প্রসাদ পেতে বসলেন, স্ত্রীলোকটি তথায় উপস্থিত হয়ে সর্পের কথা বলতে লাগল। বাবাজী মহারাজ বললেন মা এখান থেকে আপনি না গেলে আমি প্রসাদ গ্রহণ করব না। বাধ্য হয়ে স্ত্রীলোকটি চলে গেল। তখন বাবাজী মহারাজ বললেন—মায়ার কার্য্য দেখ। মায়া সহানুভূতির ছল নিয়ে কিরূপে ধীরে ধীরে প্রবেশ করতে চায়। মায়া বহুরূপিণী। জীবকে হরিভজন করতে বাধা দেয়।

এক সময় শ্রীযুত গিরীশবাবু শ্রীল বাবাজী মহারাজকে নবদ্বীপে তাঁর কুটীরে থাকাবার জন্য সপত্নীক বহু অনুনয় বিনয় করেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজ তাঁদের ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে বললেন—আপনাদের পায়খানাটি দিলে তথায় বসে আমি ভজন করতে পারি। শ্রীগিরীশবাবু সপত্নীক বহু অনুনয় বিনয় করতে লাগলেন কিন্তু শ্রীল বাবাজী মহারাজ দৃঢ়ভাবে পায়খানাটি চাইলেন। অগত্যা গিরীশবাবু পায়খানাটি ভালমতো পরিষ্কার করে দিলেন। বাবাজী মহারাজ তার মধ্যে বসে হরিনাম করতে লাগলেন। মহাভাগবতগণ যেখানে সেখানে বসে হরিভজন করতে পারেন। তাঁরা যে জায়গায় থাকেন তা হয় বৈকুণ্ঠ ধাম। বাহ্য চক্ষে অবশ্য আমরা অন্যরূপ দেখি।

শ্রীল বাবাজী মহারাজ মহাভাগবত পুরুষ ছিলেন। তিনি কখনও ছল ধর্ম, কাপট্য ধর্ম বা অশাস্ত্রীয় কোন কথা বা সিদ্ধান্ত প্রশ্রয় দিতেন না। কোন প্রসিদ্ধ ভাগবত পাঠক সর্ব্বদা 'গৌর' 'গৌর' বলতেন—একদিন শ্রীল বাবাজী মহারাজের নিকট কোন ভক্ত তাঁর কথা উল্লেখ করলে বাবাজী মহারাজ বললেন—ও 'গৌর' 'গৌর' বলছে না। টাকা টাকা বলছে। যারা পয়সা নিয়ে ভাগবত পাঠ করে, তাদের

মুখে ভগবানের নাম হয় না।

একদিন কুলিয়া নবদ্বীপের বৈষ্ণব বেষধারী ব্যক্তি বাবাজী মহারাজের নিকটে গেলেন। তার সঙ্গে বেশ কয়েকজন অনুচর। অনুচররা তাদের প্রভুর মহিমা কীর্তন করে বাবাজী মহারাজকে বলতে লাগলেন, –“আমাদের গোসাঞি পতিত জীবদের উদ্ধারের জন্য দেশে দেশে ভ্রমণ করে থাকেন, কত কষ্ট করেন। তিনি যদি প্রচারে না যান, তাহলে সে সব স্থানের কি গতি হবে? বাবাজী মহারাজ তা শুনে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উত্তর দিলেন,–লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জগৎ উদ্ধারের অভিনয় করলে জগতের উদ্ধার হওয়া ত দূরে থাকুক, তিনি নিজেই পতিত হয়ে যাবেন, জগৎকে বঞ্চনা করবেন।”

একদিন বাবাজী মহারাজ হরিনাম করছেন, রাত্রি তখন ১১টা। হঠাৎ বলে উঠলেন–“দেখেছ! দেখেছ! একজন পাঠক পাবনা জেলায় গিয়ে এই রাতের বেলায় একটি বিধবার ধর্ম নষ্ট করছে। হায়! হায়! এই দুষ্ট লোকগুলি ধর্মের নামে কলঙ্ক।” বাবাজী মহারাজ কথাগুলি এমনভাবে বলছিলেন যেন তিনি সাক্ষাৎ দর্শন করছিলেন।

কোন এক ব্যক্তি শীতে কষ্ট হবে বলে বাবাজী মহারাজকে একটি লেপ দিয়েছিলেন। বাবাজী মহারাজ সেটি ছঁইয়ের উপর লটকিয়ে রাখলেন। ঐ ব্যক্তি কারণ জিজ্ঞাসা করলে বাবাজী মহারাজ বললেন ওটা দেখলেই শীত পালিয়ে যাবে।

শ্রীল বাবাজী মহারাজ ১৩২২ বঙ্গাব্দের ১লা অগ্রহায়ণ উত্থান একাদশী তিথিতে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজ অপ্রকটের পূর্বে কুলিয়ায় রাণীর ধর্ম্মশালায় অবস্থান করতেন। ঘটনাক্রমে সেদিন সেখানে শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ তথা শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজ উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই প্রসঙ্গে ‘সরস্বতী জয়শ্রী’ গ্রন্থের ১৫শ বৈভবে যে বিবরণ দিয়েছেন তা উল্লেখ করা হল–

**“বাবাজী মহারাজের নির্যাণের পর কে তাঁহাকে সমাধি দিবেন ইহা লইয়া নানাপ্রকার মতভেদ ও গোলযোগ উপস্থিত হইল। হীরালাল গোস্বামী প্রভৃতি কএকজন শ্রীল প্রভুপাদকে (শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরকে) আনিবার জন্য পদ্মনাভ ব্রহ্মচারী ওরফে কৃষ্ণচৈতন্যদাসকে শ্রীধাম মায়াপুরে পাঠাইয়া দিলেন, তাঁহার সঙ্গে আমাকে ও যাইতে বলিলেন! কুলিয়ার খেয়া নৌকায় পার হইয়া দেখিলাম, –প্রভুপাদ নগ্নপদে সবুজবর্ণের একটী গরম চাদরে আবৃত হইয়া আসিতেছেন, তাঁহার সঙ্গে শ্রীযুক্ত পরমানন্দ ব্রহ্মচারী ছিলেন। তখন চাতুর্মাস্যের সময়, প্রভুপাদের কেশ, শ্মশ্রু প্রভৃতি বড় হইয়াছে, তাঁহাকে দেখিয়াই দণ্ডবৎ প্রণাম করিলাম এবং সমস্ত ঘটনা সবিস্তার জানাইলাম। প্রভুপাদ খেয়া-নৌকায় নদী পার হইয়া রাণীর ধর্মশালায় উপস্থিত হইলেন। সেখানে শ্রীল বাবাজী মহারাজ অবস্থান করিতেন। নবদ্বীপের বিভিন্ন আখড়ার মহান্তগণ শ্রীল বাবাজী মহারাজের চিদানন্দ দেহ লইয়া পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করিলেন এবং সমাধি দিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন; উদ্দেশ্য,–এইরূপ সিদ্ধ মহাপুরুষের সমাধিকে ভবিষ্যৎতে তাঁহার অর্থ রোজগারের যন্ত্র করিয়া তুলিতে পারিবেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদিগের ঐরূপ অবৈধ চেষ্টায় বাধা দিলেন। শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় নবদ্বীপের দারোগা বাবু তখন সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। ডিটেক্‌টিভ্ ডিপার্টমেন্টের কমিশনার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয় তখন নবদ্বীপের দারোগা ছিলেন।**

**অনেক বাদানুবাদের পর বাবাজীগণ বলিলেন’– “সরস্বতী ঠাকুর সন্ন্যাসী নহেন, সুতরাং**

ত্যক্তগৃহ ব্যক্তিকে সমাধি দিবার তাঁহার অধিকার নাই।" প্রভুপাদ তদুত্তরে ব্রজনির্ঘোষস্বরে বলিলেন,—"আমি পরমহংস বাবাজী মহারাজের একমাত্র শিষ্য। আমি সন্ন্যাসগ্রহণ না করিলেও আকুমার ব্রহ্মচারী এবং বাবাজী মহারাজের কৃপায় কোন মর্কট ব্যক্তির ন্যায় গোপনে কদাচারপরায়ণ ও ব্যভিচারগ্রস্ত নহি। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে যদি কেহ প্রকৃত নির্মলচরিত্র ত্যক্তগৃহ ব্যক্তি থাকেন, তাহা হইলে তিনি বাবাজী মহারাজের সমাধি প্রদান করিতে পারেন, ইহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। গত এক বৎসরকাল, কিংবা ছয় মাস, তিন মাস, এক মাস, অথবা অন্ততঃ গত ৩ দিন যিনি অবৈধ যোষিৎসঙ্গ করেন নাই, তিনি এই চিদানন্দ কলেবর স্পর্শ করিতে পারিবেন, অপরে স্পর্শ করিলে তাহার সর্বনাশ হইবে।" এই কথা শুনিয়া যতীন্দ্রবাবু বলিলেন,—"ইঁহার প্রমাণ কিরূপে পাওয়া যাইবে?" প্রভুপাদ বলিলেন,—"ইঁহাদের কথাই আমি বিশ্বাস করিয়া লইব।" আমরা সকলে দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলাম,—শ্রীল প্রভুপাদের এই কথার পর উপস্থিত বাবাজী-বেষ-ধারী ব্যক্তিগণ একে একে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন, দারোগা বাবু অবাক্ হইলেন।

তখন শ্রীল প্রভুপাদের আদেশক্রমে আমরা পরমহংস বাবাজী মহারাজের ভুবনপাবন চিদানন্দ দেহ বহন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিলাম। কেহ কেহ আমাদিগকে পরামর্শ দিলেন,—"বাবাজী মহারাজ প্রকটকালে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার দেহ যেন শ্রীধাম নবদ্বীপের রাস্তা দিয়া টানিতে টানিতে ধামের রজে অভিষিক্ত করা হয়। বাবাজী মহারাজের এই আদেশ পালিত হওয়া উচিত। প্রভুপাদ তখন বলিলেন—"আমার শ্রীগুরুদেব, যাঁহাকে স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র নিজের স্কন্ধে, মস্তকে ধারণ করিলে কৃতার্থ মনে করেন, তিনি বহির্মুখ লোকের দাম্ভিকতা বিনাশের জন্য দৈন্যভরে যে সকল কথা বলিয়াছেন আমরা মূর্খ, অনভিজ্ঞ, অপরাধী হইয়াও উহার তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে বিমুখ হইব না। শ্রীগৌরসুন্দর ঠাকুর হরিদাসের নির্যাণের পর ঠাকুরের চিদানন্দ দেহ কোলে করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, কত গৌরবে বিভূষিত করিয়াছিলেন। সুতরাং আমরাও শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কানুসরণ করিয়া বাবাজী মহারাজের চিদানন্দ দেহ মস্তকে বহন করিব।"

"প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা ভাল; বাবাজী মহারাজের দিব্য শরীর নিয়ে বাদানুবাদ চলাকালীন আরও একজন বিশিষ্ঠ বৈষ্ণব সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁর বন্ধুদের নিয়ে মায়াপুর দর্শনে এসেছিলেন। ঘটনাচক্রে তিনি ঐ বাদানুবাদের স্থানে গিয়ে পৌঁছান এবং সেখানেই শ্রীল প্রভুপাদের সাথে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। এই বিশিষ্ঠ বৈষ্ণব আর কেউ নন্। তিনি শ্রীপ্রমোদ ভূষণ চক্রবর্ত্তী। পরবর্তীকালে শ্রীল প্রভুপাদ যাঁকে প্রণবানন্দ নাম দিয়ে বৃহৎ মৃদঙ্গের সেবায় নিযুক্ত করেন। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারীর সন্ন্যাস নাম হয় শ্রীল ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর। পরবর্তীতে তিনি বিশ্বব্যাপী শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠা করেন।"

শ্রীল প্রভুপাদ কুলিয়ার নূতন চড়ার উপর ১৩২২ বঙ্গাব্দ ১ অগ্রহায়ণ শ্রীউত্থান একাদশী তিথিতে মধ্যাহ্নকালে বৈষ্ণবস্মৃতির বিধান অনুসারে স্বহস্তে বাবাজী মহারাজের সমাধি কৃত্য সম্পন্ন করেন। যশোহর জেলার লোহাগড়া নিবাসী পোদ্দার মহাশয় সমাধির স্থানটি প্রদান করেছিলেন এবং বলেছিলেন, ঐ স্থানের প্রতি তাঁর কোন অধিকার থাকবে না। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে তিনি তার প্রতিশ্রুত বাক্য বিস্মৃত

হন এবং ঐ স্থানের প্রতি অধিপত্য বিস্তার করে নানাপ্রকার অবৈধ কার্য্যের ইন্ধন দিতে থাকেন। ফলে ভগবৎ ইচ্ছায় সমাধিস্থানটি ক্রমশই গঙ্গাগর্ভে চলে যেতে থাকে। শ্রীল প্রভুপাদ ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ ৫ ভাদ্র শ্রীল বাবাজী মহারাজের চিন্ময় সমাধি গঙ্গাগর্ভ থেকে উত্তোলন করে শ্রীচৈতন্য মঠে রাধাকুণ্ডের তটে এনে ২ আশ্বিন, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে পুনরায় সংস্থাপিত করেন। ঐ স্থানে সমাধিমন্দির ও বাবাজী মহারাজের শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

শ্রীল বাবাজী মহারাজ শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর উদ্দেশ্যে একটি গীত রচনা করেন--

কোথায় গো প্রেমময়ী রাধে রাধে!  
রাধে রাধে গো জয় রাধে রাধে।।  
দেখা দিয়া প্রাণ রাখ রাধে রাধে।  
তোমার কাঙ্গাল তোমায় ডাকে রাধে রাধে।।  
রাধে বৃন্দাবন-বিলাসিনি রাধে রাধে।  
রাধে কানুমনোমোহিনি রাধে রাধে।।  
রাধে অঙ্গসখীর শিরোমণি রাধে রাধে।  
রাধে বৃষভানুনন্দিনি রাধে রাধে।।  
(গোসাঞী) নিয়ম ক'রে সদাই ডাকে রাধে রাধে।  
(গোসাঞী) একবার ডাকে কেশীঘাটে,  
আবার ডাকে বংশীবটে, রাধে রাধে।।  
(গোসাঞী) একবার ডাকে নিধুবনে,  
আবার ডাকে কুঞ্জবনে রাধে রাধে।  
(গোসাঞী) একবার ডাকে রাধাকুণ্ডে,  
আবার ডাকে শ্যামকুণ্ডে রাধে রাধে।।  
(গোসাঞী) একবার ডাকে কুসুমবনে,  
আবার ডাকে গোবর্দ্ধনে রাধে রাধে।  
(গোসাঞী) একবার ডাকে তালবনে,  
আবার ডাকে তমালবনে রাধে রাধে।।  
(গোসাঞী) মলিন বসন দিয়ে গায়,  
ব্রজের ধূলায় গড়াগড়ি যায় রাধে রাধে।  
(গোসাঞী) মুখে রাধা রাধা বলে,  
ভাসে নয়নের জলে রাধে রাধে।।  
(গোসাঞীঃ বৃন্দাবনে কুলি কুলি,  
কেঁদে বেড়ায় রাধা বলি' রাধে রাধে।  
(গোসাঞী) ছাপ্পান্ন দণ্ড রাত্রি দিনে,  
জানে না রাধা-গোবিন্দ বিনে রাধে রধে।।  
তারপর চারিদণ্ড শুতি থাকে,  
স্বপনে রাধা-গোবিন্দ দেখে রাধে রাধে।।

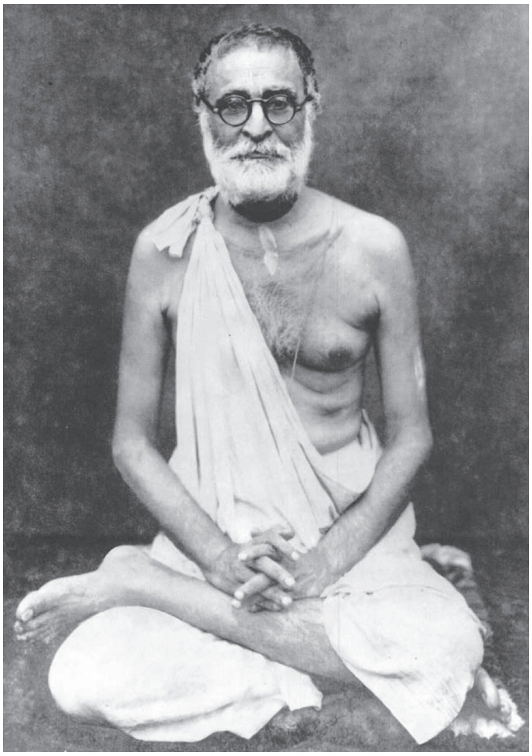
------

তিনি প্রায়শঃই একটি কীর্ত্তন করতেন। কীর্ত্তনটি শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুরের রচিত--

গোরা পহুঁ না ভজিয়া মৈনু।  
প্রেমরতন-ধন হেলায় হারাইনু।।  
অধমে যতন করি' ধন তেয়াগিনু।  
আপন করম দোষে আপনি ডুবিনু।।  
সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস।  
তে কারণে লাগিল যে কর্ম্মবন্ধ-ফাঁস।।  
বিষয় বিষম বিষ সতত খাইনু।  
গৌর-কীর্ত্তন-রসে মগন না হৈনু।।  
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ লাগিয়া।  
নরোত্তম দাস কেন না গেল মরিয়া।।

**।। জয় শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ কি জয়।।**

# শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ



নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতীতিনামিনে।।
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ।।
মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য শ্রীরূপানুগভক্তিদ
শ্রীগৌর করুণাশক্তি বিগ্রহায় নমোঽস্তুতে।।
নমস্তে গৌরবাণীশ্রীমূর্ত্তয়ে দীন তারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্ত হারিণে।।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সঙ্গে যাঁদের নিত্য সম্বন্ধ ছিল তাঁরা তাঁর অপ্রাকৃত ভজনশীল জীবনের কথা বলতে পারেন। জাগতিক কর্মবীর কিংবা ধর্মবীরের মত তাঁর জীবন গঠিত হয় নাই। শিশুকাল থেকে শুদ্ধ ভাগবত সঙ্গে ভাগবত জীবন গঠিত হয়েছিল। জাগতিক চমৎকারিতায় জগতের লোক মুগ্ধ হয়। কিন্তু শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর জীবনে এরূপ কোন জড় বিভূতি দেখানোর পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বরং ঐ প্রকার জড় বিভূতিকে বড় ঘৃণা করতেন। সর্ব্ব বিভূতিময় ভগবান যাঁদের বশীভূত হন, তাঁদের কোন বিভূতি লাভ করতে কি আর বাকী থাকে? ''সর্বসিদ্ধি করতলে তাঁর।''

### শুভ আবির্ভাব

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ করবার সময় যখন শ্রীশ্রীজগন্নাথ পুরীধামে শ্রীমন্দির--সন্নিকটে নারায়ণ ছাতা নামক ভবনে বাস করছিলেন, তাঁর গৃহে শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের (১২৮০ বঙ্গাব্দের) ৬ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার বিকাল ৩.৩০ ঘটিকায় মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে আবির্ভূত হন। যারা সেই সময় উপস্থিত ছিলেন, প্রত্যেকেই শিশুর শরীরে উপবীত বিজড়িত দেখে আশ্চর্য হয়েছিলেন। এই মহাপুরুষের জননীর নাম ছিল শ্রীমতী ভগবতী দেবী। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীজগন্নাথের পরাশক্তি শ্রীবিমলা দেবীর প্রসাদ দ্বারা শিশুর অন্নপ্রাশন করিয়ে নামকরণ করলেন ''বিমলা প্রসাদ।''

### শ্রীজগন্নাথের আশির্বাদ

শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের আবির্ভাবের ছয় মাস পরে রথযাত্রা হয়। এই রথ যাত্রার সময় তিন দিন শ্রীজগন্নাথের রথ বড় দাঁণ্ডের উপর সরস্বতী ঠাকুরের জন্ম গৃহের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। একদিন জননী ভগবতী দেবী শিশুকে নিয়ে রথোপরি আরোহণ করলেন এবং তাকে শ্রীজগন্নাথের শ্রীপাদপদ্মমূলে ছেড়ে দিলেন। শ্রীজগন্নাথদেব

যেন শিশুর কত কালের পরিচিত। আনন্দভরে শ্রীজগদীশকে শিশু জড়িয়ে ধরল। ঠিক সেই সময়ে শ্রীজগন্নাথদেবের কণ্ঠ থেকে একটি ফুলের মালা ছিন্ন হয়ে শিশুর শিরে পতিত হল। তা দেখে পূজারী পাণ্ডাগণ আনন্দে 'হরি হরি' ধ্বনি করে উঠলেন। বললেন--মা! তোমার এই শিশু কালে একজন মহাপুরুষ হবে। শ্রীজগন্নাথদেব একে আশীর্ব্বাদী মালা দিয়েছেন। এ তাঁর কথা জগতে প্রচার করবে। জননী পাণ্ডাগণের আশীর্ব্বাদ শুনে আনন্দে অশ্রুসিক্ত নয়নে শিশুকে কোলে নিলেন এবং বারংবার পাণ্ডাগণকে এবং জগন্নাথদেবকে বন্দনা করতে লাগলেন। আবির্ভাবের পরে শিশু বিমলা প্রসাদ জননীর সাথে দশমাস কাল পুরীতে থাকার পর পাল্কীতে স্থল পথে রাণাঘাটে উপনীত হন।

### শ্রীকূর্ম্মদেবের সেবা প্রাপ্তি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় পরম নিষ্ঠাবান সদাচার-সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। তাঁর পত্নী শ্রীভগবতী দেবীও তদ্রূপ সদগুণ সম্পন্না ছিলেন। তাঁরা পুত্র-কন্যাগণকে কদাপি ভগবদ্ প্রসাদ ছাড়া অন্য কোন বস্তু খেতে দিতেন না। কোন অসৎ সঙ্গেও মিশতে দিতেন না। ১৮৮১ সালে কলিকাতার রাম-বাগানে ভক্তি ভবনের ভিত্তি খনন কালে এক শ্রীকূর্মদেবের মূর্ত্তি প্রকট হয়। সপ্তমবর্ষ বয়স্ক শ্রীসরস্বতী ঠাকুরকে শ্রীভক্তি-বিনোদ ঠাকুর মহাশয় শ্রীনাম ও মন্ত্র দিয়ে সেই কূর্মদেবের সেবা করতে নির্দেশ দিলেন।

### হরিনাম ও নৃসিংহ মন্ত্র গ্রহণ ও 'সিদ্ধান্ত সরস্বতী' উপাধি

১৮৮৪ সালে ১লা এপ্রিল শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় শ্রীরামপুরের সিনিয়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হন। এই সময় সরস্বতী ঠাকুরকে শ্রীরামপুর হাইস্কুলে ভর্ত্তি করান হয়। তিনি যখন পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করতেন। সে সময় তিনি বিকৃন্তি বা Bicanto নামে এক নূতন লেখন প্রণালী আবিষ্কার করেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সেই সময় পুরী থেকে তুলসীর মালা আনিয়ে ৭ম শ্রেণীর ছাত্র বিমলা প্রসাদকে হরিনাম ও শ্রীনৃসিংহ মন্ত্র প্রদান করেন। এই সময় তিনি পণ্ডিতবর মহেশচন্দ্র চূড়ামণির নিকট গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শৈশবকাল থেকেই তাঁর পারমার্থিক গুরুবর্গ তাঁকে ''শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী'' নামে অভিহিত করেন।

### জড়বিদ্যার অবসান

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হন। তিনি লাইব্রেরীতে বসে বিভিন্ন দর্শন গ্রন্থ অধ্যয়ন করতেন। এই সময় তিনি শ্রীযুত পৃথ্বীধর শর্ম্মার নিকট বেদ অধ্যয়ন করতেন। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর বেশী দিন কলেজে অধ্যয়ন করতে পারলেন না। কলেজ ত্যাগের কারণ সম্বন্ধে তিনি আত্মচরিতে লিখেছেন—''আমি যদি মনোযোগ সহকারে বিদ্যালয়ের পাঠ শিক্ষা করতে থাকি তাহা হইলে সংসারে প্রবেশের জন্য আমার প্রতি যৎপরোনাস্তি পীড়ন হইবে। আর যদি মূর্খ অকর্মন্য রূপে প্রতিপন্ন হই, তাহা হইলে সাংসারিক উন্নতির জন্য প্রবৃত্ত হইতে কেহ আর তাদৃশী প্ররোচনা করিবে না।''

### জ্যোতিষ শাস্ত্রে প্রতিভা ও সারস্বত চতুষ্পাঠী নির্মাণ

পাঠ্যাবস্থায় তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় পারমার্থিক প্রবন্ধাদি লিখতেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত গৌড় মণ্ডলের বিভিন্ন শ্রীগৌর পার্ষদগণের শ্রীপাট সকল দর্শন করেন। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

১৮৯৮ সালে সারস্বত চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করবার সময় পৃথকভাবে 'ভক্তি ভবনে' পণ্ডিতবর শ্রীযুত পৃথ্বীধর শর্মার নিকট সিদ্ধান্ত কৌমুদী অধ্যয়ন করেন। অল্প কালের মধ্যে তিনি সিদ্ধান্ত কৌমুদীতে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। ১৯৯৭ সালে তিনি ভক্তিভবনে স্বতন্ত্র একটি সারস্বত ''চতুষ্পাঠী'' স্থাপন করেন। তাতে ছাত্রগণকে জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করান। 'স্বারস্বত চতুষ্পাঠী' হতে সরস্বতী ঠাকুর জ্যোতির্বিবদ, বৃহস্পতি প্রভৃতি মাসিক পত্রিকা এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রের অনেক প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশিত করেন।

### জড় কর্মে অরুচি

শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর কিছু দিন স্বাধীন ত্রিপুরা এষ্টেটে কর্ম গ্রহণ করে ত্রিপুরার রাজন্যবর্গের জীবন চরিত 'রাজরত্নাকর' গ্রন্থ প্রকাশের সম্পাদকতা করতে লাগলেন। পরে তিনি যুবরাজ ব্রজেন্দ্র কিশোরের সংস্কৃত ও বাংলা শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। কিছুদিন এই কার্য্য করার পর তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন কার্য্য পরিদর্শনের ভার নেন। বৈষয়িক কার্য্য মধ্যে বিবিধ প্রকারের হিংসা দ্বেষ মাৎসর্য প্রভৃতি দেখে তিনি উহা শীঘ্রই ত্যাগ করতে ইচ্ছা করলেন। মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর তা' অনুমোদন করে তাঁকে পূর্ণ বেতনে পেন্সন প্রদান করেন। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর তিন বছর পেন্সন ভোগ করে তা নিজেই বন্ধ করে দেন।

### বিভিন্ন তীর্থে ভ্রমণ

১৮৯৮ সালের অক্টোবর মাসে তিনি শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত কাশী, প্রয়াগ ও গয়া প্রভৃতি তীর্থস্থানে গমন করেন। কাশীতে শ্রীরামমিশ্র শাস্ত্রীর সহিত রামানুজ সম্প্রদায় সম্বন্ধে নানা আলাপ আলোচনা হয়। তখন থেকে তাঁর অদ্ভুত বৈরাগ্যময় জীবন বিকশিত হতে থাকে। তিনি মনে মনে সদ্গুরুর অনুসন্ধান করতে লাগলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর মনোভাব বুঝতে পেরে তাঁকে সিদ্ধ বাবা শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করতে নির্দ্দেশ দিলেন।

### গুরুকরণ

ইংরেজী ১৮৯৮ সালে গোদ্রুমস্থ শ্রীস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে শ্রীল বাবাজী মহারাজের সাথে শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের প্রথম সাক্ষাদ্ হয়। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নির্দ্দেশে গোদ্রুম স্বানন্দসুখদকুঞ্জে শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের নিকট থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেন। বিবিক্তানন্দী শ্রীল বাবাজী মহারাজের সঙ্কল্প ছিল, 'তিনি কাউকেও মন্ত্র দেবেন না'। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের অনন্য নিষ্ঠায় তাঁর সঙ্কল্প ভঙ্গ হয়। শ্রীল প্রভুপাদই শ্রীল বাবাজী মহারাজের একমাত্র শিষ্য। শোনা যায় শ্রীল প্রভুপাদ বাবাজী মহারাজের নিকট দীক্ষার জন্য পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা জানালে শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলেন, ''আমি প্রথমে মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি যদি অনুমতি দেন তাহলে অবশ্যই তোমাকে দীক্ষা দিব''। শ্রীল প্রভুপাদ দ্বিতীয় দিন এসে জিজ্ঞাসা করলে বাবাজী মহারাজ বলেন,—''আমি মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছি''। শ্রীল প্রভুপাদ হতাশ না হয়ে তৃতীয় দিন এসে জিজ্ঞাসা করলে, বাবাজী মহারাজ বলেন, —''সুনীতি, পাণ্ডিত্য এই সবের দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায় না, দীক্ষা গ্রহণে অধিকার হয় না।'' বাবাজী মহারাজের দ্বারা বার বার প্রত্যাখ্যাত হয়েও শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর নিষ্ঠা পরিত্যাগ করলেন না। শ্রীরামানুজ আচার্য্য ১৮ বার প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর গুরু গোষ্ঠীপূর্ণের কৃপা লাভ করেছিলেন। তদ্রূপ শ্রীল প্রভুপাদও অসীম ধৈর্য্য ধারণ করে বাবাজী

মহারাজকে বার বার দৈন্য আর্ত্তি জানাতে থাকেন। একদিন অভিমান ভরে বলে বসেন—''আপনারা লম্পটচূড়ামণির উপাসক, সুতরাং আমার ন্যায় নীতিপরায়নকে কৃপা করবেন কেন? মহাপ্রভু আচার্য্যলীলায় লম্পট চূড়ামণির ভজনই শিক্ষা দিয়েছেন 'সুতরাং তিনিই বা আমাকে কৃপা করার আদেশ দিবেন কেন? কিন্তু করুণা না হলে এ প্রাণ আর রাখব না।" এই বলে কাঁদতে থাকেন। তখন শ্রীল বাবাজী মহারাজের হৃদয় বিগলিত হল। তিনি শ্রীল প্রভুপাদকে চরণধূলি দিয়ে অভিষিক্ত করে দীক্ষা প্রদান করলেন। শ্রীল প্রভুপাদের দীক্ষিত নাম হয়— শ্রীবার্ষভানবীদয়িতদাস। কিংবদন্তী আছে শ্রীল প্রভুপাদ ১২ বার প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর ১৩ বারে শ্রীল বাবাজী মহারাজের কৃপা লাভ করেছিলেন। আবার অনেকে বলেন, তিনবার প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পরে ৪র্থ বারে কৃপালাভ করেছিলেন। এখানে বিবিক্তানন্দী শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর নিকট শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের দীক্ষাগ্রহণ লীলার স্মৃতি উদিত হয়। গুরুতে অনন্য নিষ্ঠাই সৎ শিষ্যের লক্ষণ।

**শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সঙ্গে ভ্রমণ**

১৯০০ সালের মার্চ মাসে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত সরস্বতী ঠাকুর বালেশ্বর, রেমুণা, ভুবনেশ্বর ও পুরী প্রভৃতি স্থানে পরিভ্রমণ করেন। স্থানে স্থানে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নির্দ্দেশ—মত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতাদি ব্যাখ্যা করেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দৌলতে শুদ্ধ ভক্তির মন্দাকিনী পুনঃ প্রবাহিত হয়। শ্রীগৌর পার্ষদগণের অপ্রকটের পর গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে এক অন্ধকার যুগ এসেছিল। সেই যুগের অবসানে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের বাণী জগতে প্রচার করেন। তিনি শুদ্ধ ভক্তি সিদ্ধান্ত বিষয়ক বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, বহু পারমার্থিক পত্রিকাও প্রকাশ করেন। তাঁর কৃপায় বহু সজ্জন ব্যক্তি গৌরসুন্দরের ভজন করতেন। তিনি বিভিন্ন স্থানে শ্রীনামহট্ট ও প্রপন্নাশ্রমাদি সংস্থাপন করেন।

**শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আদেশ**

১৯১৬ সালে বঙ্গাব্দ ১৩২১, ৯ই আষাঢ় গৌর শক্তি শ্রীগদাধর পণ্ডিতের তিরোভাব তিথির দিন শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অপ্রকট হন। ঠাকুর মহাশয় নিত্যলীলা প্রবেশ করবার পূর্ব্বে শ্রীসরস্বতী ঠাকুরকে বললেন—ষড় গোস্বামীর গ্রন্থ ও শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষা বিশেষভাবে সর্ব্বত্র প্রচার কর। মহাপ্রভুর জন্মস্থানের উন্নতিও করা চাই। জননী শ্রীভগবতী দেবীও কয়েক বৎসর পরে পরলোক গমন করেন। যাবার সময় তাঁর হাত ধরে বললেন—তুমি অবশ্যই আমার গৌরসুন্দরের কথা ও তাঁর ধাম শ্রীমায়াপুর সর্ব্বত্রই প্রচার করবে। শ্রীসরস্বতী ঠাকুর পিতৃ মাতৃ আজ্ঞা শিরে ধারণ করে বিপুল উদ্যমে শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী প্রচার করতে আরম্ভ করলেন।

মহাপ্রভুর প্রচারকে আরও শক্তিশালী করার জন্য তিনি আগষ্ট অ্যাসেম্বলি (August Assembly) বা চিরকুমার ব্রত নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল, সেখানে যারা অংশগ্রহণ করবেন, তারা কেউ বিবাহ করবেন না। আকুমার ব্রহ্মচারী থেকে ভগবানের নাম প্রচার করবেন। প্রথম অবস্থায় বহু কুমার প্রভুপাদের সাথে যোগ দেন। কিন্তু ধীরে ধীরে সকলে বিবাহ করে ফেলেন। প্রভুপাদ আবারও একা হয়ে গেলেন।

একদিন তিনি বিভ্রান্ত ও বিষাদগ্রস্ত মনে শ্রীধাম মায়াপুরে বর্তমান যোগপীঠ মন্দিরের সন্নিকটে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজন কুটীরের বারান্দায় বসে ব্রাহ্ম মুহূর্তের শুভ সময়ে মুদ্রিত নয়নে নিবিষ্ট চিত্তে হরিনাম করছিলেন। এমন সময় হঠাৎই শ্রীল প্রভুপাদের অবয়বের উপর এক দিব্য জ্যোতি এসে

পড়লো। প্রভুপাদ তাঁর মুদ্রিত নয়ন উন্মোচন করে পঞ্চতত্ত্ব, ষড়গোস্বামী ও অন্যান্য গুরুবর্গদের দর্শন করলেন। তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রী অদ্বৈত প্রভু, শ্রীগদাধর প্রভু, শ্রীবাস প্রভু, ষড় গোস্বামীর সাথে শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং সমস্ত গুরুবর্গদের দর্শন করলেন। তাঁরা সকলে তাঁকে বললেন, ''তুমি অবশ্যই ভগবৎ প্রেম ও শুদ্ধভক্তির বাণী বিপুল উৎসাহের সহিত জগতে প্রচার কর।'' বিমলা প্রসাদ আনন্দে আত্মবিভোর হয়ে গেলেন। কি করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। তাঁর চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু ঝরতে লাগল। তিনি গদগদ স্বরে বলতে লাগলেন, ''হে আমার পরম শ্রদ্ধেয় প্রভুগণ! আপনাদের দর্শন পেয়ে আমি ধন্য। আপনারা সকলে এই সেবকের প্রতি অহৈতুকী কৃপা বর্ষণ করুন, কিন্তু আপনাদের আদেশ আমি পালন করব কিভাবে? প্রচারের জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন লোকবল প্রয়োজন। কোথায় আমি সেই লোকবল পাব? কিভাবে সম্ভব শুদ্ধভক্তির বাণী প্রচার করা?'' বিমলাপ্রসাদের নিরাশাযুক্ত কথা শুনে তাঁরা আবার বললেন, ''ওহে বিমলাপ্রসাদ! হতাশ হয়ো না। তোমাকে প্রচারে সহায়তা করার জন্য শীঘ্রই আমরা যোগ্যতাসম্পন্ন ভক্তদের পাঠাব।''

**শ্রীল প্রভুপাদের সন্ন্যাস ও প্রচার অভিযান**

তারপর বার্ষভানবীদয়িত দাস (শ্রীল প্রভুপাদ) শতকোটী নামযজ্ঞ সম্পূর্ণ করেন। ১৯১৮ সালের গৌরপূর্ণিমার দিন ৪৪ বছর বয়সে তিনি রামানুজাচার্য্য সম্প্রদায়ের পণ্ডিতদের নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তিনি নদীয়া জেলার শ্রীধাম মায়াপুরে প্রথম প্রচার কেন্দ্র হিসাবে শ্রীচৈতন্য মঠ স্থাপন করেন। তখন থেকে তিনি 'ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী' নামে পরিচিত হন। একই বছর, বৈষ্ণব পণ্ডিত সমাজ চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাহার মধ্যে দৃঢ়তা ও পবিত্রতা লক্ষ্য করে ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকে 'প্রভুপাদ' উপাধিতে ভূষিত করেন। সংক্ষেপে, সকলে তাঁকে 'শ্রীল প্রভুপাদ' বলে ডাকতেন।

যদি আমরা গৌড়ীয় মঠের ইতিহাসের প্রতিবিম্ব দেখি, তাহলে দেখতে পাব ঠিক এই ঘটনার পরই শ্রীল প্রভুপাদকে প্রচারকার্যে সহায়তা করার জন্য অসংখ্য আধ্যাত্মিক বুদ্ধিদীপ্ত এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভক্তগণ গৌড়ীয় মঠে যোগদান করেছিলেন। তাদের মধ্যে প্রথমে এসেছিলেন শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, যিনি পরবর্তীকালে গৌড়ীয় মঠের সাধারণ সম্পাদক হয়েছিলেন এবং শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর শ্রীচৈতন্য মঠ ও তৎশাখা মঠ সমূহের আচার্য্য ও সভাপতি হয়েছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনি শ্রীল ভক্তি বিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজ নামে পরিচিত হন। তারপর ধীরে ধীরে অনেক মহিমান্বিত ব্যক্তিরা শ্রীল প্রভুপাদের কাছে আসেন। যেমন–শ্রীপাদ হরিপদ প্রভু (ভক্তি স্বরূপ পর্বত গোস্বামী মহারাজ), গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী (ভক্তি সর্বস্ব গিরি গোস্বামী মহারাজ), পরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, অনন্ত বাসুদেব প্রভু, জগদীশ চন্দ্র (ভক্তি প্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ), পতিতপাবন ব্রহ্মচারী (ভক্তিকেবল ঔরুলোমী গোস্বামী মহারাজ), বিনোদ দা (ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ), নয়নাভিরাম প্রভু (ভক্তি বিবেক ভারতী গোস্বামী মহারাজ) , নন্দসূনু ব্রহ্মচারী (ভক্তি হৃদয় বন গোস্বামী মহারাজ), অপ্রাকৃত ভক্তি সারঙ্গ প্রভু (ভক্তি সারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ), প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী (ভক্তি প্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ), কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী (ভক্তি কুসুম শ্রমণ গোস্বামী

মহারাজ), হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী (ভক্তি দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ), রামেন্দ্রসুন্দর ব্রহ্মচারী (শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর গোস্বামী মহারাজ), অভয়চরণ দাসাধিকারী (ভক্তিবেদান্ত স্বামী গোস্বামী মহারাজ) এবং অন্যান্য আরো অনেকে শ্রীল প্রভুপাদের কাছে যোগদান করেছিলেন।

১৯৩৩ সালে শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তি প্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ, ভক্তি হৃদয় বন গোস্বামী মহারাজ, ভক্তি সারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ এবং সম্বিদানন্দ প্রভুকে চৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী পাশ্চাত্য দেশে প্রচারের জন্য পাঠিয়েছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর অভয়চরণ প্রভুকে (ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ) ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের জন্য আদেশ করেছিলেন, শ্রীল প্রভুপাদ ১৯১৮ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত ১৮ বছর ব্যাপকভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের বাণী প্রচার করতে থাকেন এবং সমগ্র ভারতবর্ষ, ইউরোপ এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ৬৪ টি প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করেন।

**কাশিমবাজার সম্মিলনী ও শ্রীল প্রভুপাদ—**

১৯১২ সালের ২০ হতে ২৫ মার্চ কাশিম বাজারের মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী নিজ ভবনে একটি বৈষ্ণব সম্মিলনীর আয়োজন করেন। সেই সম্মিলনীতে মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করে নিয়েছিলেন। সেখানে সেই সময়ের বিখ্যাত কিছু পণ্ডিতও উপস্থিত ছিলেন। তারা চেয়েছিলেন, সরস্বতী ঠাকুর যাতে সভার মধ্যে কোনভাবেই কিছু বলতে না পারেন। কারণ তার বীর্যবতী হরিকথা একবার মহারাজের কর্ণে প্রবেশ করলে মহারাজ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়বেন।

প্রভুপাদ কাশিমবাজারে হরিকথা বলার সুযোগ না পেয়ে নিরন্তর হরিনাম করতেন। শয়ন ভোজন কোন কিছুই করতেন না। একদিন তাঁকে সভার মধ্যে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আহ্বান করা হয়। সময় দেওয়া হয় মাত্র ৫ মিনিট। শ্রীল প্রভুপাদ "ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব" প্রভৃতি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের কএকটি পয়ার উচ্চারণ করে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। কিন্তু ৫ মিনিট হতে না হতেই তাঁকে ক্রমাগত 'বসুন বসুন' বলা হল। বাধ্য হয়ে প্রভুপাদকে হরিকথার বিশ্রাম দিতে হল। কাশিমবাজারের মহারাজ প্রভুপাদের জন্য উত্তম উত্তম ভোজ্য সম্ভার পাঠিয়ে দিতেন। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ শুধুমাত্র একটি তুলসীর পত্র গ্রহণ করতেন। বাকী খাদ্য-সম্ভার আগন্তুক ভক্তদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন।

মহারাজের নিযুক্ত বৈদ্যবংশীয় একজন ভদ্রলোক কর্ম্মচারী শ্রীল প্রভুপাদের সেবার জন্য নিযুক্ত ছিল। তিনি একদিন প্রভুপাদকে বললেন—**"আপনিই প্রকৃত বৈষ্ণব, যেহেতু এখানে যাঁহাদিগকে দেখিলাম। তাঁহারা সকলেই মহারাজের অন্ন ধ্বংস করিয়া গেলেন। অথচ মহারাজের কোন উপকার করিলেন না। আপনি মহারাজের প্রকৃত উপকার করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু মহারাজের পার্ষদবর্গ মহারাজকে আপনার নিরপেক্ষতা ও বৈষ্ণবতার আদর্শ বুঝিতে দিলেন না, ইহা আমাদেরই পরম দুর্ভাগ্য।"**

চারদিন উপবাসের পর শ্রীল প্রভুপাদ মায়াপুরে এসে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন। পরে মহারাজ মনীন্দ্র নন্দী এব্যাপার বুঝতে পেরে দুঃখীত হন এবং মায়াপুরে এসে শ্রীল প্রভুপাদের চরণে ক্ষমা ভিক্ষা করেন।

**নেতাজী ও শ্রীল প্রভুপাদ**

১৯৩০ সালে একসময় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস

তার কিছু সহযোগীদের নিয়ে কলকাতার বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনে এলেন। ব্রিটিশ শাসকদের হাত থেকে ভারতের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য নেতাজী তার যুদ্ধে গৌড়ীয় মঠের কিছু সদস্যদের নিয়োগ করার জন্য এসেছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে তার সাক্ষাতের পর শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ থেকে গীতার ব্যাখ্যা শ্রবণ করে তিনি বিস্মিত হলেন। শ্রীল প্রভুপাদ ও নেতাজীর কথোপকথন বর্ণিত হল–

নেতাজী ঃ ব্রিটিশদের ঔপনিবেশিকতা থেকে মাতৃভূমিকে মুক্তি দেওয়ার জন্য আমি বদ্ধ পরিকর। সমগ্র জাতিকে আমি জানিয়েছি, ''তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।'' অনেক যুবক আপনার চরণাশ্রয় গ্রহণ করেছে। দয়া করে তাদের মধ্যে থেকে কয়েকজনকে আমার আন্দোলনে যোগদান করার জন্য দিন যাতে করে তারা স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে পারে।

প্রভুপাদ ঃ আপনি কি শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা পড়েছেন?

নেতাজী ঃ হ্যাঁ, আমি পড়েছি।

প্রভুপাদ ঃ আপনার নিশ্চয়ই গীতার এই শ্লোকটি মনে আছে ''যং যং বাপি স্মরন্ .......... তদ্ভাব-ভাবিতঃ'' এই শ্লোকের অর্থ হল ''হে অর্জুন মৃত্যুকালে একজন ব্যক্তি যা চিন্তা করেন, মৃত্যুর পর সেই বস্তুই প্রাপ্ত হন।''

নেতাজী ঃ হ্যাঁ, আমার শ্লোকটি মনে পড়েছে।

প্রভুপাদ ঃ সেক্ষেত্রে, আপনি অবশ্যই পুনর্জন্ম লাভে বিশ্বাসী?

নেতাজী ঃ অবশ্যই, আমি বিশ্বাস করি। পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে না এমন কোন হিন্দু কি আছে?

প্রভুপাদ ঃ যদি এই পরিস্থিতিতে আজ আপনি মারা যান এবং ইংল্যাণ্ডে পুনর্জন্ম লাভ করেন, তাহলে কি আপনি ভারতের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করবেন নাকি আপনি ভারতকে আপনার দেশের অধীনে রাখার চেষ্টা করবেন?

নেতাজী ঃ আমি আপনার যুক্তি বুঝলাম। এই মুহূর্তে জাতির স্বাধীনতার জন্য ভাবাই সমীচীন হবে।

প্রভুপাদঃ আপনি শুধুমাত্র ভারতের স্বাধীনতার জন্য চিন্তা করছেন কিন্তু এটা জড় জাগতিক এবং ক্ষণস্থায়ী অর্থাৎ জড় স্বাধীনতা। নিজেকে ভারতীয় ভাবাটাও জাগতিক। আমি সমগ্র মনুষ্য সমাজের জন্য চিন্তিত। মানুষ কিভাবে জড় মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হবে, আমি এই চিন্তায় চিন্তিত। প্রকৃত পক্ষে আমি শুধুমাত্র মানুষের জন্যই চিন্তা করি না, বরং সমগ্র জীবজগতের জন্য চিন্তিত-- 'কিভাবে তারা মায়িক বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করবে'। এটাই আমার মানসিকতা।

নেতাজী ঃ আমি ভগবদ্ গীতার এই প্রকার ব্যাখ্যা আগে কখনও শুনি নাই। আপনি আমাকে আশীর্বাদ করবেন।

একথা বলে নেতাজী শ্রীল প্রভুপাদকে আর কোন অনুরোধ করলেন না এবং নীরবে চলে গেলেন।

**কিছু অভূতপূর্ব ঘটনা**

বরিশালের ভোলা নিবাসী ভূতপূর্ব্ব হাইকোর্টের বিচারপতি চন্দ্রমাধব ঘোষের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীরোহিণী কুমার ঘোষ হরিভজন করবার আশায় সংসার ত্যাগ করে নবদ্বীপ কুলিয়ায় আসেন এবং একজন বাউলের চরণাশ্রয় করে তাঁদের শিক্ষাদীক্ষানুসারে চলতে লাগলেন। কিন্তু বাউলদের সেবাদাসী ব্যাপার দেখে তাঁর মনে মনে ঘৃণা হতে লাগল। রোহিণীবাবু একদিন মায়াপুরে যোগপীঠ দর্শনে এলেন। সেদিন শ্রীল প্রভুপাদ যোগপীঠে হরিকথা বলছেন। রোহিণীবাবু শ্রীল প্রভুপাদের অপূর্ব্ব তেজপুঞ্জ

বিশিষ্ট শ্রীমূর্ত্তি এবং অদ্ভুত সিদ্ধান্ত পূর্ণ বাণী সকল শুনে অতি আনন্দ অনুভব করতে লাগলেন। সেদিন শ্রীল প্রভুপাদের সমস্ত কথা শুনে তিনি কুলিয়ার বাউল গুরুর আশ্রমে ফিরে এলেন। একটু রাত্র হয়েছিল। রোহিণীবাবু শ্রীল প্রভুপাদের মুখে যে সমস্ত শুদ্ধ ভক্তিময়ী কথা শুনেছেন তা চিন্তা করতে করতে শুয়ে পড়লেন, কিছু খেলেন না। নিদ্রিত হলে স্বপ্নে দেখছেন সেই বাউলটি একটা ব্যাঘ্র মূর্ত্তিতে ও সেবাদাসী ব্যাঘ্রী মূর্ত্তিতে তাঁকে খাবার জন্য যাচ্ছে। রোহিণীবাবু ভয়ে কম্পিত কলেবরে মহাপ্রভুকে ডাকছেন। এমন সময় দেখলেন শ্রীল প্রভুপাদ তাঁকে তাদের হাত থেকে উদ্ধার করছেন। রোহিণীবাবু সেইদিনই চিরতরে বাউল গুরুকে ত্যাগ করে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ আশ্রয় করলেন।

এক সময় মায়াপুরে শ্রীব্রজপত্তনে শ্রীল প্রভুপাদ ভজন করছেন। ভাদ্রমাসে জন্মাষ্টমীর আগের দিন, ঠাকুরের নৈবেদ্যের দুগ্ধাদির কোন ব্যবস্থা করতে পারেন নি। শ্রীপ্রভুপাদ চিন্তা করতে লাগলেন—আজ দুধ পাওয়া গেলে মহাপ্রভুকে ভোগ দেওয়া যেত। পরক্ষণে প্রভুপাদ চিন্তা করতে লাগলেন, আমার নিজের জন্য এইরূপ চিন্তা হল না কি? অন্যায় হল। তখন বর্ষাকাল। গৌর জন্মভিটা জলমগ্ন। নৌকা ছাড়া চলা দুষ্কর। এই অবস্থায় অপরাহ্নকালে একজন গোয়ালা সেই জল কাদা ভেঙ্গে প্রচুর পরিমাণে দুধ, ক্ষীর, মাখন ও ছানা প্রভৃতি নিয়ে উপস্থিত হলো। তখন জানতে পারা গেল গোয়ালাটিকে জমিদার হরিনারায়ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় মহাপ্রভুর প্রেরণা অনুযায়ী এই সমস্ত জিনিষ দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ঠাকুরের ভোগের পর সেই প্রসাদ শ্রীল প্রভুপাদের কাছে নেওয়া হল। এত প্রসাদ দেখে তিনি অবাক হলেন। তারপর সমস্ত কথা শুনলেন। অনন্তর তিনি প্রসাদ নিয়ে মহাপ্রভুকে বলতে লাগলেন—''আমি আপনাকে কত কষ্টই না দিলাম। কেন আমার এইরূপ একটি দুর্বুদ্ধির উদয় হল? আপনি আমার জন্য অপরলোকের হৃদয়ে প্রেরণা দিয়ে এই সকল দ্রব্য পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন।''

কেদারনাথ দত্তের আটটি পুত্র ও পাঁচটি কন্যা ছিল। তার পুত্রগণ হলেন অন্নদাপ্রসাদ, রাধিকাপ্রসাদ, বীর্যপ্রসাদ, কমলাপ্রসাদ, বিমলাপ্রসাদ, বরদাপ্রসাদ, ললিতাপ্রসাদ এবং শৈলজাপ্রসাদ। তার কন্যাগণ হলেন সৌদামিনী দেবী, কাদম্বিনী দেবী, কৃষ্ণ বিনোদিনী দেবী, শ্যামসরোজিনী দেবী এবং হরি প্রমোদিনী দেবী।

একসময় অন্নদাপ্রসাদ গুরুতর অসুস্থ হয়েছিলেন। কোনরকম চিকিৎসায় তিনি সুস্থ হলেন না। পিতা কেদারনাথ দত্ত এবং মাতা ভগবতী দেবী সন্তানের এই অবস্থা দেখে বড়ই উদ্বিগ্ন ছিলেন। হঠাৎই, অন্নদাপ্রসাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হল যে তিনি পূর্বজন্মে রামানুজ সম্প্রদায়ের ভক্ত ছিলেন, তিনি সেই সময় কোনভাবে বিমলাপ্রসাদের চরণে অপরাধ করেছিলেন এবং সেই কারণেই তিনি এই শারীরিক অসুস্থতা ভোগ করছেন। একথা জানতে পেরে তার পিতা তাকে বিমলা প্রসাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে বললেন। যেইমাত্র অন্নদাপ্রসাদ, বিমলাপ্রসাদের কাছে সবকিছু জানালেন, বিমলাপ্রসাদ শ্রদ্ধার সহিত উত্তর দিলেন, ''আমার বড় দাদা, আমি জানি না আপনি পূর্বজন্মে আমার কাছে কি অপরাধ করেছেন। তবে আমি ভগবানের নিকট করজোড়ে হৃদয়ের অন্তকরণ থেকে প্রার্থনা জানাচ্ছি, হে ভগবান! কৃপাপূর্বক আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে তাঁর পূর্বজন্মের কৃত অপরাধ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করে দিন।'' বিমলাপ্রসাদের কথা শোনার পর, অন্নদাপ্রসাদ হঠাৎ অলৌকিকভাবে সুস্থ হয়ে গেলেন এবং তার কিছুদিন পর, তিনি অপ্রকট

লীলা প্রকাশ করলেন।

আমরা শাস্ত্রে পাই, মহাপ্রসাদে যদি কুকুরেও মুখ দেয়, তাও তা সম্পূর্ণভাবে পবিত্র রূপে বিবেচিত হয়। শ্রী অতুলচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় (শ্রীল ভক্তি সারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ) মন্দিরের জন্য অর্থ সংগ্রহে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। একদিন তিনি প্রচারে গিয়েছিলেন এবং মধ্যাহ্নে প্রসাদ সমাপ্ত হওয়ার পর তিনি মঠে ফিরে আসেন। তিনি ভাণ্ডারীর কাছে গিয়ে তার জন্য কোন প্রসাদ না রাখার জন্য দুঃখ প্রকাশ করছিলেন। প্রসাদের পর শ্রীল প্রভুপাদ তার ভজনকুটীরে হরিনাম জপ করতেন। তিনি অতুলচন্দ্রের উচ্চঃস্বরে দুঃখ সূচক বাক্য শ্রবণ করে হাতে একটি লাঠি নিয়ে ঘর থেকে বেড়িয়ে এলেন এবং অতুলচন্দ্রকে ডাকলেন। শ্রীল প্রভুপাদ বললেন, ''আমার সাথে এস।'' তখন তিনি অতুলচন্দ্রকে যেখানে প্রসাদের পর অবশিষ্টাংশ এবং প্রসাদের পাতা ফেলা হয় সেখানে নিয়ে গেলেন। একদল কুকুর সেখানে প্রসাদের অবশিষ্টাংশ ভক্ষণ করছিল। শ্রীল প্রভুপাদ লাঠি দেখিয়ে কুকুরদের বিতারিত করে আবর্জনার স্তূপে পড়ে থাকা উচ্ছিষ্ট পাতায় লেগে থাকা কিছু শস্য দানা তুলে নিয়ে তা গ্রহণ করলেন। তারপর, তিনি অতুলচন্দ্রকে বললেন, ''এটা মহাপ্রসাদ তুমিও গ্রহণ কর।'' এই ঘটনার মাধ্যমে শ্রীল প্রভুপাদ আমাদেরকে মহাপ্রসাদের অচিন্তনীয় মূল্য সম্পর্কে শিক্ষা দিলেন।

কলকাতায় একটি আন্তর্জাতিক ধর্মীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, গৌড়ীয় মঠকে নিমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল এবং শ্রীল প্রভুপাদ সর্বেশ্বর ব্রহ্মচারীকে (শ্রীল ভক্তি বিচার যাযাবর মহারাজকে) ঐ সম্মেলনে গৌড়ীয় মঠের দর্শন উপস্থাপন করার জন্য নির্বাচন করেছিলেন। সর্বেশ্বর ব্রহ্মচারীর জাগতিক শিক্ষা বিশেষ ছিল না। তাই তিনি এই বৃহৎ দায়িত্বের কথা ভেবে ভীতি অনুভব করছিলেন এবং ক্রন্দন করছিলেন। তিনি নিজেকে এই বিশাল সম্মেলনে গৌড়ীয় মঠের প্রতিনিধি হিসাবে অযোগ্য অনুভব করছিলেন। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের ব্যক্তিগত সেবক শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ প্রভুকে অনুরোধ করলেন, তিনি যেন শ্রীল প্রভুপাদকে কোন অধিক শিক্ষিত যোগ্য ব্যক্তিকে ঐ সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নিয়োজিত করার অনুরোধ করেন। শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ প্রভু শ্রীল প্রভুপাদকে এই বার্তাটি জানালে, শ্রীল প্রভুপাদ বললেন ''কেন তিনি ক্রন্দন করছেন? কোন পরিবর্তন হবে না। আমি যা বলেছি ওনাকে সেটাই অনুসরণ করতে হবে।'' অবশেষে উপায়বিহীন হয়ে সর্বেশ্বর ব্রহ্মচারী অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে অশ্রু জলে বুক ভাসিয়ে শ্রীল প্রভুপাদের আশীর্বাদ শিরোধার্য করে ঐ সম্মেলনে উপস্থিত হলেন। পরের দিন, শ্রীল প্রভুপাদ সংবাদপত্র পড়ছিলেন এবং শিরোনামে লেখা ''গৌড়ীয় মঠের মহিমা''। অর্থাৎ সর্বেশ্বর ব্রহ্মচারী ঐ সম্মেলনে এত বুদ্ধিদীপ্তভাবে গৌড়ীয় মঠের শিক্ষাকে উপস্থাপন করেছিলেন যে, সেটা সংবাদ শিরোনামে উঠে আসে। শ্রীল প্রভুপাদ তার নিকটস্থ শিষ্যগণকে ডেকে বললেন, ''দেখ, সে নিজেকে অযোগ্য বলছিল, এখন তার যোগ্যতা দেখ! আমরা সকলেই অযোগ্য কিন্তু গুরুপরম্পরার কৃপায় আমরা যোগ্য হয়েছি। আমাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা দিয়ে মহাপ্রভুর মিশন আমরা চালাতে পারব না। মহাপ্রভুর কৃপায় আমরা তাঁর মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যাব।''

একবার শ্রীল প্রভুপাদ নৈমিষারণ্যে গিয়েছেন। তিনি একটি কুণ্ডের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সঙ্গে বহু ভক্ত। এমন সময় কুণ্ডের জল বর্দ্ধিত হতে লাগল। ভক্তরা অবাক। কিন্তু প্রভুপাদ নির্বিকার। কুণ্ডের জল বৃদ্ধি পেয়ে যেইমাত্র প্রভুপাদের চরণ স্পর্শ করল, এমনি পূর্বের অবস্থা প্রাপ্ত হল। উপস্থিত

ভক্তগণ হরিধ্বনি জয়ধ্বনি করতে লাগলেন।

### শ্রীল প্রভুপাদের প্রচার

শ্রীল প্রভুপাদের অলৌকিক প্রভাবে জগৎ মুগ্ধ হল। তাঁর আকর্ষণে বহু সম্ভ্রান্ত কুলের বিদ্বান ব্যক্তি শ্রীগৌরসেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। ১৯১৮ সাল থেকে ১৯৩৭ সালের মধ্যে শ্রীনবদ্বীপ, মায়াপুর, কলিকাতা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর, রেমুণা বালেশ্বর, পুরী, আলালনাথ, মাদ্রাজ, কভুর, দিল্লী, পাটনা, গয়া, লক্ষ্ণৌ, কাশী, হরিদ্বার, এলাহাবাদ, মথুরা, বৃন্দাবন, আসাম, কুরুক্ষেত্র, ভারতের বহির্দেশে রেঙ্গুন ও লণ্ডন প্রভৃতি স্থানে শ্রীল প্রভুপাদ ৬৪টি শুদ্ধভক্তি মঠ স্থাপন করেন এবং মন্দার পর্ব্বতোপরি, শ্রীনৃসিংহাচল এবং দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে শ্রীগৌরপাদপীঠ স্থাপন করেন। প্রাচ্য তথা পাশ্চাত্য উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত ২৫ জন ব্যক্তিকে ভাগবত ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাস প্রদান করেন। তিনি জগতে বৈকুণ্ঠবাণী প্রচারের জন্য বহু শুদ্ধভক্তি পত্রিকা প্রকাশ করেন। (১) সজ্জনতোষণী বা The Harmonist পাক্ষিক পত্রিকা, (২) সাপ্তাহিক গৌড়ীয় পত্রিকা, (৩) হিন্দী পাক্ষিক ভাগবত নামক পত্রিকা, (৪) দৈনিক নদীয়া প্রকাশ, (৫) আসামী ভাষায় মাসিক কীর্ত্তন নামক পত্রিকা, (৬) উড়িয়া ভাষায় পরমার্থী নামক পত্রিকা। এতদ্ব্যতীত বহু বৈষ্ণব গ্রন্থও প্রকাশ করেন। তিনি পারমার্থিক জগতে একটি নূতন যুগ আনয়ন করেছিলেন। তিনি পৃথিবীর সর্ব্বত্র গৌর বাণী প্রচারের জন্য শুদ্ধ আচরণশীল-ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীদের প্রেরণ করলেন। মহা উদ্যমে শ্রীগৌরকৃষ্ণের বাণী পৃথিবীতলে প্রচার হতে লাগল। তিনি ষষ্টি বর্ষ পর্য্যন্ত এইরূপ উদ্যমে গৌর বাণী প্রচার করে যখন সঙ্কল্প কতকটা সিদ্ধ হয়েছে দেখলেন তখন হৃষ্ট মনে শ্রীগৌরকৃষ্ণের নিত্য সেবায় প্রবেশ করতে ইচ্ছা করলেন।

### শ্রীল প্রভুপাদের অন্তর্দ্ধান

১৯৩৬ সালের কার্তিক মাসে শ্রীল প্রভুপাদ পুরুষোত্তম মঠের চটক পর্বতে একটি গৌরবোজ্জ্বল অন্নকূট গোবর্দ্ধন পূজা উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। সে সময় তিনি ২৫শে অক্টোবর থেকে ৭ই ডিসেম্বর পর্যন্ত চটক পর্বতে অবস্থান করেছিলেন । তারপর তিনি শ্বাসক্রিয়া জনিত সমস্যায় অসুস্থ লীলা প্রকাশ করলে কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু ও অন্যান্য বয়োঃজ্যেষ্ঠ শিষ্যরা শ্রীল প্রভুপাদকে কলকাতার বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীল প্রভুপাদকে ব্যক্তিগতভাবে যত্ন নেওয়ার জন্য দিন রাত ২৪ ঘণ্টাই ভক্তদের বিভিন্ন সময়ে দেখাশোনার দায়িত্ব দিলেন।

সে সময় একদিন প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীল প্রভুপাদের ঘরে ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ ইজি চেয়ারে বসেছিলেন। প্রণবানন্দ প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের চোখে অশ্রু দর্শন করে, জিজ্ঞাসা করলেন, ''শ্রীল প্রভুপাদ! যদি আপনি এই জড়জগৎ ত্যাগ করে চলে যান, তাহলে আমাদের কী হবে? কে আমাদের আশ্রয় দেবে?'' শ্রীল প্রভুপাদ অশ্রুবিসর্জন করতে করতে বললেন, ''কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ''। মনে হচ্ছিল, শ্রীল প্রভুপাদ কৃষ্ণের বিরহে কাতর। প্রণবানন্দ প্রভুও ক্রন্দন করতে লাগলেন এবং শ্রীল প্রভুপাদের চরণপদ্ম তাঁর বক্ষে ধারণ করলেন। শ্রীল প্রভুপাদ ক্রন্দন করতে করতে বারংবার ''কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ'' বলতে থাকলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের কিছুদিন পূর্বে, শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু ও শ্রীল ভক্তি রক্ষক শ্রীধর গোস্বামী মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের ঘরে অবস্থান করছিলেন। হঠাৎ, শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তি

রক্ষক শ্রীধর মহারাজকে আদেশ করলেন, ''শ্রীরূপ মঞ্জরী পদ কীর্ত্তনটি করুন।'' শ্রীল শ্রীধর গোস্বামী মহারাজ কীর্ত্তন শুরু করবেন, এমন সময় কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মাঝখানে বাধা দিয়ে বললেন, ''অপেক্ষা করুন, আমি প্রণবকে ডাকছি। তার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর।'' শ্রীল প্রভুপাদ বললেন, ''আমি শ্রীধর মহারাজকে এই কীর্ত্তনটি করতে বলেছি। আমি প্রণবের সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর পরে শুনব।'' কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের ঘর থেকে বেড়িয়ে প্রণবানন্দ প্রভুর ঘরে গেলেন। তিনি প্রণবানন্দ প্রভুকে বললেন, ''প্রণব, এসো! শ্রীল প্রভুপাদকে কীর্ত্তন শোনাতে হবে।'' প্রণবানন্দ প্রভু একথা শোনা মাত্রই কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভুষণ প্রভুকে অনুসরণ করলেন এবং শ্রীল প্রভুপাদের ঘরে প্রবেশ করলেন। ঠিক তখনই, শ্রীল প্রভুপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণের দিকে তাকিয়ে বললেন, ''এখন শ্রীধর মহারাজ কীর্ত্তন করুন।'' তখন শ্রীল শ্রীধর গোস্বামী মহারাজ ''শ্রীরূপ মঞ্জরীপদ'' কীর্ত্তনটি করলেন। কীর্ত্তনটি শোনার পর শ্রীল প্রভুপাদ প্রণবানন্দ প্রভুর দিকে তাকিয়ে বললেন, ''প্রণব! তুমি এখন হরি হে দয়াল মোর জয় রাধানাথ কীর্ত্তনটি কর।'' প্রণবানন্দ প্রভু সুমিষ্ট স্বরে কীর্ত্তনটি করলেন। কৃষ্ণের সাথে মিলিত হওয়ার এই তীব্র আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ কীর্ত্তনটি শোনার পর উপস্থিত ভক্তগণ বুঝতে পারলেন যে, শ্রীল প্রভুপাদ খুব শীঘ্রই তাদেরকে ছেড়ে গোলোক বৃন্দাবনে চলে যাবেন।

১৯৩৭ সালের ১লা জানুয়ারী ভোরবেলা (৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত) প্রণবানন্দ প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। তারপর শ্রীল প্রভুপাদের ব্যক্তিগত সেবক কৃষ্ণানন্দ প্রভু এই সেবা করার জন্য শ্রীল প্রভুপাদের ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন প্রণবানন্দ প্রভু পাশের ঘরে তাঁর শয়নকক্ষে গিয়ে বিছানায় বসলেন। তিনি ভাবছিলেন, ''শ্রীল প্রভুপাদ এ জগত থেকে চলে গেলে কী হবে?''

কয়েক মিনিটের মধ্যে কৃষ্ণানন্দ প্রভু প্রণবানন্দ প্রভুর ঘরে প্রবেশ করে বললেন, ''প্রণব! সব শেষ শ্রীল প্রভুপাদ আমাদেরকে তাঁর সাক্ষাৎ সেবা হতে বঞ্চিত করেছেন।'' এটা ছিল ১৯৩৭ সালের ১লা জানুয়ারী ভোর ৫টা ৩০ মিনিট। বাগবাজার গৌড়ীয় মঠের সমস্ত ঘড়িগুলি ঠিক ৫টা ৩০ মিনিটেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। গৌড়ীয় মঠের দীপ্তিমান সূর্য অস্তমিত হয়ে গেল। সমগ্র জগত অভাবনীয় অন্ধকারে পর্যবসিত হল।

তারপর শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রাকৃত শ্রীঅঙ্গ বিশেষ ট্রেনে করে শিয়ালদা থেকে ধুবুলিয়া স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হল। সমগ্র ট্রেনে শুধু ভক্তরাই ছিলেন এবং তারা মহামন্ত্র কীর্ত্তন করছিলেন। ধুবুলিয়া স্টেশন থেকে শ্রীল প্রভুপাদের চিন্ময় শ্রীঅঙ্গ মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠে নিয়ে যাওয়া হল। এক বিশাল শোভাযাত্রা। কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর নির্বাচন অনুযায়ী, শ্রীল ভক্তি গৌরব বৈখানস গোস্বামী মহারাজ, শ্রীল ভক্তি রক্ষক শ্রীধর দেব গোস্বামী মহারাজ এবং প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি কার্য সম্পন্ন করলেন। শ্রীল ভক্তিবিচার যাযাবর গোস্বামী মহারাজ শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুরের লিখিত বিরহ গীতি ''যে আনিল প্রেমধন'' কীর্ত্তনটি করলেন। বিরহ কাতর ভক্তবৃন্দ শ্রীল প্রভুপাদের অদর্শনে ক্রন্দন করতে থাকলেন। আজ বহির্দৃষ্টিতে সকলেই তাদের অভিভাবককে হারিয়েছেন। সেখানে এক হৃদয়স্পর্শী ভক্তিপূর্ণ পরিবেশ অবস্থান করছিল।

**শ্রীল প্রভুপাদে অন্তিম উপদেশ–**

গৌড়ীয়াচার্য্য-ভাস্কর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ

অপ্রকট লীলা আবিষ্কারের কএকদিবস পূর্ব্বে অর্থাৎ ২৩শে ডিসেম্বর (১৩৩৬) প্রাতঃকালে সমবেত ভক্তগণের নিকট নিম্নলিখিত উপদেশাবলী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন—

⁜ ''আমি বহু লোককে উদ্বেগ দিয়েছি! অকৈতব সত্যকথা ব'লতে বাধ্য হ'য়েছি ব'লে, নিষ্কপটে হরিভজন ক'রতে ব'লেছি ব'লে অনেক লোক হয়ত' আমাকে শত্রুও মনে ক'রেছে'ন। অন্যাভিলাষ ও কপটতা ছে'ড়ে নিষ্কপটে কৃষ্ণসেবায় উন্মুখ হবার জন্যই আমি অনেক লোককে নানাপ্রকার উদ্বেগ দিয়েছি। একথা তাঁরা কোনও না কোনও দিন বুঝতে পার্‌বেন।

⁜ সকলে রূপ-রঘুনাথের কথা পরমোৎসাহের সহিত প্রচার করুন। শ্রীরূপানুগগণের পাদপদ্মধূলি হওয়াই আমাদের চরম আকঞ্ক্ষার বিষয়। আপনারা সকলেই এক অদ্বয়জ্ঞানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে, আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে মিলে-মিশে থাক্‌বেন। সকলেই এক হরিভজনের উদ্দেশ্যে এই দু'দিনের অনিত্য সংসারে কোনরূপে জীবন নির্ব্বাহ করে চ'ল্‌বেন। শত বিপদ্, শত গঞ্জনা ও শত লাঞ্ছনায়ও হরিভজন ছাড়্‌বেন না। জগতের অধিকাংশ লোক অকৈতব কৃষ্ণসেবার কথা গ্রহণ করছে না দেখে নিরুৎসাহিত হবেন না, নিজ-ভজন, নিজ-সর্ব্বস্ব কৃষ্ণকথা-শ্রবণ, কীর্ত্তন ছাড়বেন না। তৃণাদপি সুনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হ'য়ে সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন ক'রবেন।

আমাদের এই জরদ্গম-তুল্য দেহটাকে আমরা সপার্ষদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে আহুতি দিবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ ক'রছি। আমরা কোনপ্রকার কর্ম্মবীরত্ব বা ধর্ম্মবীরত্বের অভিলাষী নহি, কিন্তু জন্মে-জন্মে শ্রীরূপপ্রভুর পাদপদ্মের ধূলিই আমাদের স্বরূপ--আমাদের সর্ব্বস্ব। ভক্তিবিনোদ-ধারা কখনও রুদ্ধ হ'বে না, আপনারা আরো অধিকতর উৎসাহের সহিত ভক্তিবিনোদ-মনোহভীষ্ট প্রচারে ব্রতী হ'বেন। আপনাদের মধ্যে বহু যোগ্য ও কৃতী ব্যক্তি রয়েছেন। আমাদের অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, আমাদের একমাত্র কথা এই—

আদদানস্তৃণং দন্তৈ রিদং যাচে পুন পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি।।

⁜ সংসারে থাকাকালে নানাপ্রকার অসুবিধা আছে, কিন্তু সেই অসুবিধায় মুহ্যমান হওয়া বা অসুবিধা দূর করবার চেষ্টা করাই আমাদের প্রয়োজন নয়। এই সকল অসুবিধা বিদূরিত হবার পর আমরা কি বস্তু লাভ ক'রব, আমাদের নিত্যজীবন কি হ'বে, এখানে থাকাকালেই তার পরিচয় লাভ করা আবশ্যক। এখানে যতরকম ধরণের আকর্ষণ ও বিকর্ষণের বস্তু আছে--যাহা আমরা চাই ও চাই না, এই উভয় প্রকারেরই মীমাংসা হওয়া আবশ্যক। কৃষ্ণপাদপদ্ম হতে আমরা যতটা তফাৎ হ'ব, ততই এখানকার আকর্ষণ ও বিকর্ষণ আমাদিগকে আকৃষ্ট ক'রবে। এই জগতের আকর্ষণ ও বিকর্ষণের অতীত হ'য়ে অপ্রাকৃত নামাকৃষ্ট হ'লেই কৃষ্ণসেবারসের কথা বুঝতে পারা যায়। কৃষ্ণের কথা আপাত বড়ই startling (হঠাৎ বিস্ময়জনক) ও perplexing (হতবুদ্ধিকর বা জটিল)। যে আগন্তুক ব্যাপার সমূহ আমাদের নিত্যপ্রয়োজনের অনুভূতিতে বাধা প্রদান ক'রছে, তাহা eliminate কর্‌বার (অপসারিত ক'রবার বা স'রাবার) জন্য মনুষ্য নামধারী সকলেই জ্ঞান ও অজ্ঞাতসারে ন্যূনাধিক struggle ক'রছে (চেষ্টা ক'রছে বা উদ্যম প্রয়োগ ক'রছে)। দ্বন্দ্বাতীত হয়ে সেই নিত্য প্রয়োজনের রাজ্যে প্রবেশই আমাদের একমাত্র প্রয়োজন।

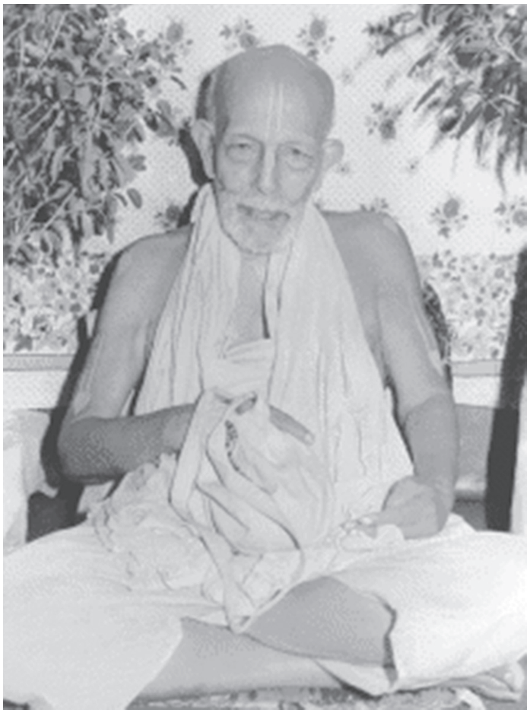
⁜ এ জগতে কাহারও প্রতি আমাদের অনুরাগ

বা বিরাগ নাই। এ জগতের সকল বন্দোবস্তই ক্ষণস্থায়ী। প্রত্যেকের পক্ষেই সেই পরম প্রয়োজনের অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তা আছে। আপনারা একই উদ্দেশ্যে ঐকতানে অবস্থিত হয়ে মূল আশ্রয় বিগ্রহের সেবাধিকার লাভ করুন। জগতে শ্রীরূপানুগ-চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হ'ক। সপ্তজিহ্ব শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের প্রতি যেন কখনও আমরা কোন অবস্থায় বিরাগ প্রদর্শন না করি। তা'তে একান্ত বর্দ্ধমান অনুরাগ থাকলেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হ'বে। আপনারা শ্রীরূপানুগগণের একান্ত আনুগত্যে শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা পরমোৎসাহে ও নির্ভীক কণ্ঠে প্রচার করুন।

**।। জয় শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ কি জয়।।**



# শ্রীল ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর



শ্রীল ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর বর্ত্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত যশোর জেলার গঙ্গানন্দপুর গ্রামে কপোতাক্ষ নদের তীরে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ই অক্টোবর, ২রা কার্ত্তিক ১৩০৫ বঙ্গাব্দ, বুধবার গৌর চতুর্থী তিথিতে এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে আবির্ভূত হন। তার পিতা শ্রীতারিণীচরণ চক্রবর্ত্তী এবং মাতা 'শ্রীরামরঙ্গিনী দেবী'। মাতাপিতা পুত্ররত্নের নাম রাখেন 'প্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী'।

প্রমোদভূষণের জন্মের পূর্বে তার মাতাপিতা চার বছরের এক কন্যা এবং এক বছরের একটি পুত্রকে হারিয়েছিলেন। তাই সন্তান লাভের আশায় রামরঙ্গিনী দেবী গ্রামের বৃদ্ধ-শিব মন্দিরে আরাধনা করেন। শিবের আশির্বাদেই শ্রীতারিণীচরণ চক্রবর্ত্তী ও রামরঙ্গিণী দেবীর গৃহে শ্রীপ্রমোদ ভূষণের জন্ম হয়। এজন্য শৈশবে প্রমোদভূষণকে 'শিবের বরপুত্র' বলা হত। সেই সময়ের প্রথা অনুযায়ী রামরঙ্গিণী দেবী তিনটি কড়ির বিনিময়ে ধাত্রীমাতার কাছ থেকে প্রমোদ ভূষণকে ক্রয় করেছিলেন বলে, শিশুর নাম হয় 'তিনকড়ি'। সকলে ভালবেসে তিনু বলে ডাকতেন। পরবর্তীতে তিনুর আরও দুটি ভাই ও দুই বোনের জন্ম হয়। তাদের নাম বিনোদবিহারী, ননীগোপাল, শিবাণী ও কাত্তায়নী। ছোট ভাই বিনোদবিহারী শৈশব অবস্থাতেই কলেরায় মারা যায়।

তারিণীচরণ চক্রবর্তী মহাশয় গঙ্গানন্দপুরের পাশের গ্রামের একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। যদিও তিনি একজন দরিদ্র স্মার্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু পরিবারে খাদ্যদ্রব্যের কোন অভাব ছিল না। প্রমোদভূষণকে তার নিজের গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো হল। শ্রেণীকক্ষে সে শীঘ্রই নিজেকে বুদ্ধিদীপ্ত ও অধ্যবসায়ী ছাত্র হিসাবে প্রমাণ করল। সে গ্রামবাসীদের বলত, ''লোকে বিদ্যা অর্জন করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার জন্য। যদি তাই না হয়, তাহলে বিদ্যায় কী লাভ?''

''পড়ে কেনে লোক?– কৃষ্ণভক্তি জানিবারে।
সে যদি নহিল তবে বিদ্যায় কি করে!।।''

(চৈঃ ভাঃ আদি ১২/৪৯)

বিদ্যালয়ে প্রমোদভূষণ সর্বোত্তম ছাত্র হিসাবে পরিচিত হল। একই সাথে, সমগ্র গ্রামের জীবন ও আত্মাস্বরূপ শিব ঠাকুরের প্রতিও প্রমোদভূষণ চরমভাবে উৎসর্গীকৃত ছিল। প্রমোদভূষণ ও শিবের মধ্যে এক বিশেষ বন্ধন দেখে গ্রামবাসীরা

আশ্চার্য্যান্বিত হয়ে যেত। সাধারণত, তারা তাদের শিশুদের পড়াশোনার ক্ষতি হতে পারে ভেবে শিব মন্দিরে বা কোন উৎসব অনুষ্ঠানে যেতে দিত না। কিন্তু প্রমোদভূষণ প্রতিদিন শিব মন্দিরে যেত এবং দীর্ঘক্ষণ পূজা-অর্চনা করত। তবুও বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষায় সে সর্ব্বোচ্চ নম্বর পেত। গ্রামবাসীরা তার এই আসাধারণ বিদ্যার প্রতিভা দেখে বিস্মিত হত।

একদিন প্রমোদভূষণের মা রামরঙ্গিনী দেবী মাছ রান্না করার জন্য মাছের আঁশ ছাড়াচ্ছিলেন। মাছটি জ্যন্ত ছিল তাই তীব্র যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল। ঐদিন কোন এক কারণ বশতঃ বিদ্যালয়ের নির্দিষ্টি সময়ের অনেক পূর্বেই ছুটি হয়ে যায়। এইজন্য ছোট্ট প্রমোদভূষণ আকস্মাৎ স্কুল থেকে বাড়ি ফিরেই মাছের প্রতি মায়ের নিষ্ঠুর আচরণ লক্ষ্য করে। ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে প্রমোদভূষণের চোখে জল চলে আসে। সে খুবই দয়াশীল অভিব্যক্তি নিয়ে এই দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার মা ভাবছিল, “ হয়ত আজ স্কুলে আমার ছেলের সাথে কোন সহপাঠীর ঝগড়া হয়েছে।” তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য তিনি স্নেহপরায়ণ হয়ে বলতে লাগলেন, “ তিনু আজ কী তোমার কিছু হয়েছে? কেউ কী তোমায় তিরস্কার করেছে? আমাকে বল, কে তোমায় কী বলেছে?”

বারংবার অনুসন্ধান করায়, প্রমোদভূষণ সাশ্রু বদনে উত্তর দিল, “কেন তুমি আমাকে কেটে টুকরো করে রান্না করছ না? আমিও তো ঐ মাছটার মতোই অসহায়। কিভাবে তুমি এই রক্তাক্ত মাছকে পরিষ্কার করে রান্না করে খেতে পার? আমরা সকলে নিজেদেরকে মানুষ বলে পরিচয় দিই কিন্তু একটা অসহায় জীবকে হত্যা করে তাকে খাওয়াটা কোন মানুষের শোভা পায় না। ভগবান মানুষের শরীরটা সৃষ্টি করেছে শাকসব্জি ও শষ্য খাওয়ার জন্য। ভগবানের অভিমত অনুযায়ী মাছ খাওয়াটা বেআইনী ও পাপ। যারা অপরাধ মূলক কাজ করে এবং যারা তাদের সেই কার্যকে প্রশ্রয় দেয় তারা উভয়ই অপরাধী। সেকারণে আজ থেকে যদি তুমি রান্নাঘরে মাছ নিয়ে আসো, তাহলে এখানকার রান্না করা কোন খাবার আমি কখনোই গ্রহণ করব না। এটাই আমার স্থির সংকল্প।”

ছোট্ট ছেলেটির এই বুদ্ধিদীপ্ত কথা শুনে, মাতা রামরঙ্গিনীদেবী আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। তিনি তার ছেলের যুক্তি সঙ্গত কথা শুনে রাজী হয়ে গেলেন। সেইদিন থেকে রান্নাঘরে আর কখনই মাছ প্রবেশ করেনি।

একদিন প্রমোদভূষণ তার মায়ের সাথে গোশালায় গিয়েছিল। তার মা মনোযোগ সহকারে গরুগুলির দেখাশোনা করছিলেন আর সে তার মায়ের পাশে বসে ছিল। তাদের পাঁচটি গরু ছিল, তার মধ্যে একটি গরু দুধ দিত না। প্রমোদভূষণ পর্যবেক্ষণ করল যে, তার মা যেসব গাভীরা দুধ দেয়, তাদের মুখরোচক ও পুষ্টিদায়ক খাদ্য; যেমন– সরষে ও তিসির খোল, মুগডালের দানা, গমের ভুসি, গুড়, প্রভৃতি দিচ্ছে আর যে গুরুটি দুধ দেয় না তাকে সেইসব খাবার দিচ্ছে না, শুধু খড় দিচ্ছে। এই সমস্ত বৈচিত্রময় গো-খাদ্য বন্টন দেখে ছোট্ট বালক প্রমোদভূষণ বিস্ময়ান্বিত চিত্তে উৎসুক নেত্রে মাকে জিজ্ঞাসা করল; “মা! তোমার এরূপ বৈচিত্র্যময় খাদ্য বন্টন কেন?”। যদিও তার মা গ্রাম্য মহিলা ছিলেন কিন্তু তিনি যথেষ্ট বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি প্রমোদভূষণের প্রশ্নটিকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন এবং স্নেহবশত বললেন, “তিনু! কেন তুমি এসব জিজ্ঞাসা করছ? তোমার এরকম প্রশ্ন করার প্রয়োজন নেই।” শিশু প্রমোদভূষণ চিন্তিত হয়ে বললেন, “মা, আমি শুধু জানতে চাইছি এই গরুটার

পেটে কি কোন অসুখ হয়েছে? অথবা কী এমন হয়েছে যে, তুমি এই গরুটি ছাড়া অন্য গরুদের পুষ্টিকর খাবার দিচ্ছ?”

বুদ্ধিমতী মা রামরঙ্গিনী দেবী চিন্তা করলেন, তার পুত্র প্রমোদভূষণ নিশ্চয়ই তাকে আবার কোন ভালো শিক্ষা দেবে। তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন এবং তারপর বললেন, “ তিনু! আমরা দরিদ্র ব্রাহ্মণ। আমাদের খুব সাবধানে জীবন যাপন করতে হয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে তোমার বাবা যা উপার্জন করে তা আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাপনের জন্য যথেষ্ট নয়। তাই দুধ বিক্রী করে আমরা কিছু অর্থ উপার্জন করি। এই গরুগুলিকে ভালো খাবার দিই যাতে করে তারা বেশী দুধ দেয়। যতটা আমাদের প্রয়োজন ততটা দুধ আমরা পান করি আর বাকি দুধ বিক্রি করে গরুদের জন্য খাবার কেনা হয়। এই গরুটি এখন দুধ দিচ্ছেনা, তাই একে সাধারণ খাবার দিচ্ছি। যদি একেও উচ্চমানের খাবার দিই তাহলে আমাদের অর্থনৈতিক ক্ষতি হবে।”

তার মায়ের এই যুক্তিপূর্ণ কথা শোনার পর, শিশু প্রমোদভূষণ কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, “মা! আমিও তো কোন কাজ করি না। আমি কোন অর্থ উপার্জন করতে পারি না। তাহলে তুমি আমাকে ভালো ভালো খাবার খেতে দাও কেন? দুধ না দেওয়া গরুটির মতো তুমি আজ থেকে আমাকে নিম্নমানের খাবার দেবে আর তোমরা যারা অর্থ উপার্জন করছ তারা ভালো খাবার খাবে। যখন থেকে আমি অর্থ উপার্জন করে পরিবারে আর্থিক সহায়তা করতে পারব তখন থেকে তুমি আমাকে ভালো খাবার দেবে।” প্রমোদ ভূষণের কথা শুনে সেদিন থেকে রামরঙ্গিনী দেবী গাভীদের খাবার দেওয়ার সময় পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গী ত্যাগ করলেন।

এভাবে, শৈশবকাল থেকে প্রমোদভূষণ সমস্ত জীবের প্রতি দয়া দেখিয়েছেন। এটা সাধুর একটি বিশেষ গুণ। “সুহৃদঃ সর্বদেহিনাম্” অর্থাৎ সাধুরা সমস্ত জীবের হিতাকাঙ্ক্ষী। তারা সমস্ত জীবের প্রতি দয়াশীল।

গঙ্গানন্দপুর গ্রামে অনেক পুকুর ছিল, কিন্তু নদীতে স্নান করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। তাই গ্রামবাসীরা অনেকেই কপোতাক্ষ নদে স্নান করত। বর্ষাকালে বন্যা হত। সে সময় নদের জলে স্রোত থাকার জন্য রামরঙ্গিনী দেবী তার সন্তানদের কাকার সাথেই স্নান করতে পাঠাতেন। একদিন প্রমোদভূষণ নদের তীরে দাঁড়িয়ে সকলের স্নান করা দেখছিল। এমন সময় হঠাৎ জলের উপরে একটা কুমির দেখে সে চিৎকার করে উঠল, “কুমির! কুমির! সকলে জল থেকে উঠে এস।” প্রমোদভূষণ পরোপকারী ও হিতাকাঙ্ক্ষী ছিল। যারা স্নান করছিল ‘কুমির’ শব্দটি শোনামাত্র, প্রত্যেকেই দ্রুত ভয়ে জল থেকে উঠে এল। প্রত্যেকেই মন থেকে প্রমোদভূষণকে অনেক কৃতজ্ঞতা জানাল, “ভাই! আজ আমরা তোমার জন্য প্রাণে বাঁচলাম।” এই ঘটনা ভবিষ্যতের এক ঝলক ছিল। আজ সে কুমিরের কবল থেকে গ্রামবাসীদের বাঁচাল, একদিন সে মায়ার কবল থেকে জগৎবাসীকে বাঁচাবে। জগতে কৃষ্ণনাম প্রচার করবে।

একদিন, প্রমোদভূষণের কাকা শিশুদের সাথে ঐশ্বর্যশালী খেলা উপভোগ করার জন্য প্রতিবেশী গ্রামের জমিদারের কাছ থেকে একটা পালিত হাতি ভাড়া করে এনেছিলেন। তিনি ভাইপো-ভাইঝিদের হাতির পিঠে চড়ানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। বৈষ্ণবরা কখনো জাগতিক ঐশ্বের্য্যর প্রতি লালায়িত হয় না। তাই প্রমোদভূষণ হাতির পিঠে বসেছিল কিন্তু কোন আনন্দ উপভোগ করেনি। সে বৈষ্ণবীয় গুণে পরিপূর্ণ ছিল। এত অল্প বয়সে প্রমোদভূষণের এই প্রকার মানসিকতা দেখে প্রতিবেশীরা ভাবল, সে





কোন সাধারণ ছেলে নয়, সে অবশ্যই এক মহাপুরুষ যাকে ভগবান কোন এক বিশেষ কার্য সম্পাদন করতে পাঠিয়েছেন।

ভগবৎ ইচ্ছায় শ্রীমনীন্দ্রনাথ দত্ত শ্রীপ্রমোদভূষণের প্রতিবেশী ছিলেন। শ্রীমণীন্দ্রনাথ দত্ত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গুরুভ্রাতা ছিলেন। তাঁর পারমার্থিক নাম ছিল শ্রীভক্তিরত্ন ঠাকুর। তাঁর গৃহে শ্রীমদনমোহনের সেবা হত। ছোটবেলা থেকে শ্রীভক্তিরত্ন ঠাকুরের সাথে প্রমোদভূষণের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল। একদিন শ্রীপ্রমোদভূষণ ভক্তিরত্ন ঠাকুরকে বললেন,--

"আপনার আদেশে আমি শ্রীশ্রীরাধা মদনমোহনের সেবাপূজা করতে চাই।" একথা শোনা মাত্রই, শ্রী মনীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় আনন্দের সাথে জানালেন, "তুমি নিজেই যখন এই সেবা চাইছ, তাহলে তুমি সময় পেলেই এখানে চলে এসো এবং কোন সঙ্কোচ না করে শ্রীবিগ্রহের সেবা কর। এটা জীবন্ত বিগ্রহ। কখনো ভেব না এটা পাথরের তৈরী। এই বিগ্রহ সাক্ষাৎ শ্রীশ্রীরাধা মদনমোহন।" শ্রীরাধা মদনমোহন সত্যিই যে সাক্ষাৎ বিগ্রহ ছিলেন তা নীচের ঘটনা থেকে পরিস্কার হয়ে যাবে।

প্রতিদিন দত্ত পরিবারের লোকজন, বাড়ির পাশের একটা গাছ থেকে খেজুর রস এনে শ্রীরাধা মদনমোহনকে নিবেদন করত। একদিন মদনমোহন নিজেই চলে গেল এবং গাছে উঠে খেজুর রস পান করতে শুরু করল। যে ব্যক্তি খেজুর রস গাছ থেকে নামিয়ে আনে, সে দেখল গাছে উঠে কেউ রস পান করছে। তাই সে যখন মদনমোহনকে ধরতে গেল, তখন সে পালিয়ে এসে দত্ত বাড়িতে প্রবেশ করল। সেই ব্যক্তি তাকে অনুসরণ করতে করতে দত্ত বাড়িতে এসে সেই ছেলের নামে অভিযোগ করল। পরিবারের সকলেই আশ্চর্য হয়ে গেল। কারণ এই রকম কোন কালো ছেলে তাদের বাড়িতে নেই। তথাপি তারা বাড়ির সমস্ত ছোট ছেলেদের একত্রিত করে জিজ্ঞাসা করল এবং ছেলেগুলি এই বিষয়ে কিছুই জানে না বলে খেলতে চলে গেল। তখন ভক্তিরত্ন ঠাকুর ঠাকুরঘরে প্রবেশ করে দেখল বিগ্রহের গায়ে সরষে ফুল ও খেজুর কাঁটা। তৎক্ষণাৎ তিনি বুঝতে পারলেন খেজুর রস খেতে যাওয়া কালো ছেলেটি মদনমোহন ছাড়া আর কেউ নয়।

একদিন ভক্তিরত্ন ঠাকুর প্রমোদ ভূষণকে বললেন, "মদনমোহনের সেবাটা আত্মবৎ, আমরা সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত যেমন নিজেদের সন্তুষ্টির জন্য সবকিছু করি, ঠিক সেইভাবে মদনমোহনের জন্যও সবকিছু করা উচিত।"

এক শীতের রাতে প্রমোদভূষণ মদনমোহনকে শয়ন দেওয়ার সময় ঘটনাক্রমে কম্বল দিতে ভুলে গেল। ঐ রাত্রে সে সারা রাত ধরে জ্বরে ভুগল এবং ঠাণ্ডায় খুব কষ্ট পেল। ওদিকে মদনমোহন ভক্তিরত্ন ঠাকুরকে অভিযোগ করল, "আমি ঠাণ্ডায় কষ্ট পাচ্ছি।" আসলে, মদনমোহনই ইচ্ছাকরে প্রমোদভূষণকে ভুলিয়ে দিয়েছিল যাতে করে সে নিজেকে তাঁর ভক্তের কাছে প্রকাশিত করতে পারে এবং প্রমোদভূষণও উপলব্ধি করতে পারে যে, বিগ্রহ কোন পুতুল নয়, সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন। পরের দিন খুব ভোরে, প্রমোদভূষণ জ্বর অবস্থাতেই মদনমোহন মন্দিরে এসে উপস্থিত হলে ভক্তিরত্ন ঠাকুর তার শারীরিক কষ্টের প্রতি কোনরকম দৃষ্টিপাত না করে তাকে বললেন, " পানা পুকুরের ঠাণ্ডা জলে ডুব দিয়ে এসে মদনমোহনকে কম্বল দাও, তাহলে তুমি সুস্থ হয়ে যাবে।" প্রমোদভূষণ ভক্তিরত্ন ঠাকুরের নির্দেশ পালন করল এবং সাথে সাথেই সে জ্বর থেকে মুক্তি পেল। সেদিন সে সত্যিই মদনমোহনের

কৃপা উপলব্ধি করল। দীক্ষা গ্রহণ করার আগেই, প্রমোদভূষণের শ্রীবিগ্রহের সাথে পারস্পরিক আদানপ্রদানের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হল। এই ঘটনার পর প্রমোদভূষণের শ্রীবিগ্রহ সেবার প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে থাকল।

প্রমোদভূষণের শৈশবের কৃতকর্ম ও আচরণ পর্যবেক্ষণ করে ভক্তিরত্ন ঠাকুর তাঁর দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পেলেন যে, ভবিষ্যতে প্রমোদভূষণ একজন আচার্য্যের লীলা করবে। তাই তিনি প্রমোদভূষণকে বিদ্যালয়ের পাঠের পাশাপাশি অবসর সময়ে অধ্যয়নের জন্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থ দিলেন।প্রমোদভূষণ সেগুলি অধ্যয়ন করতে লাগল। ক্রমে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত দুর্লভ গ্রন্থগুলি তার কাছে প্রকৃত পাঠ্য বইয়ে পরিণত হল। তবে একটি আশ্চর্যের বিষয় হল প্রমোদভূষণের এই গ্রন্থগুলি অধ্যয়ণের সময় মনে হত, যেন সেগুলো সে আগে কখনো পড়েছে।

পরবর্তীতে শ্রীপ্রমোদ ভূষণ জ্ঞাতি কাকা শ্রীখগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর কৃপায় ডায়মণ্ড হারবার লাইনে বারুইপুর হাইস্কুলে ভর্ত্তি হন। বারুইপুরের নিকটবর্তী গ্রামের নাম 'শাসন'। সেই গ্রামে ননীগোপাল চট্টোপাধ্যায়, নন্দগোপাল চট্টোপাধ্যায় ও সরোজ কুমার চট্টোপাধ্যায় নামক জমিদারদের পরিবারে প্রমোদ ভূষণের থাকার ব্যবস্থা হয়।

১৯১৫ সালে শ্রীপ্রমোদভূষণ তাঁর সহপাঠীদের নিয়ে শ্রীধাম মায়াপুর দর্শনে যায়। বন্ধুদের নিয়ে মায়াপুরের বিভিন্ন স্থান দর্শন করতে করতে গঙ্গার অপর পারে যায়। সেখানে একটি কোন্দল চলছিল। শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ এই দিনে অপ্রাকৃত শরীর ত্যাগ করেন। তাঁর শরীর নিয়ে কোন্দল উপস্থিত হয়। তখন শ্রীল প্রভুপাদ সদর্থক যুক্তি দিয়ে বাবাজী মহারাজের শরীরকে সমাধি দিয়ে মায়াপুরে ফিরে যান। সেই স্থানেই শ্রীল প্রভুপাদের সাথে প্রমোদভূষণের সাক্ষাৎ হয়। শ্রীল প্রভুপাদের সুন্দর অবয়ব দর্শনে এবং অপ্রাকৃত কথা শ্রবণে প্রমোদভূষণ মুগ্ধ হয়ে যায়। শাসন গ্রামে ফিরে এসে তাঁর আর কিছুই ভাল লাগে না। এদিকে তাঁর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার সময়ও উপস্থিত হয়। প্রত্যেকেই প্রমোদভূষণের ফলাফলের অপেক্ষায় থাকে। প্রত্যেকের আশানুরূপ ফলও হয়। সেই বিদ্যালয়ের ইতিহাসে প্রমোদভূষণের মতো নাম্বার কখনও কেউ পায় নি। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে সোনার মেডেল উপহার দেয়।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীপ্রমোদভূষণ কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্ত্তি হল। এরই মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদের সাথে শ্রীধাম মায়াপুরে তার দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হয়। সে শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি এতটাই আসক্ত হয়ে পড়ে যে, জাগতিক পড়াশোনার দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে পারেনি। যাইহোক পরীক্ষার ফল আশানুরূপ না হলেও সে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়। পরিবারের আর্থিক সংকট মেটানোর জন্য সে পোর্ট কমিশনের অফিসে চাকুরীতে যোগ দেয়। ৬ মাস অফিসে কাজ করার পর বউবাজারে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে মা ও ছোট বোনকে গঙ্গানন্দপুর থেকে নিয়ে এসে নিজের কাছে রাখতে শুরু করে।

একদিন প্রমোদভূষণ জানতে পারল, একজন বৈষ্ণব উল্টোডাঙ্গা জংশন রোডে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করছেন। সেইদিন বিকালে অফিসের কাজ সেরে সে ঐ বৈষ্ণবের দর্শনে গেল। সেখানে গিয়ে সে আশ্চর্য হল। কারণ সেই বৈষ্ণবটি আর অন্য কেউ নয় 'শ্রীল প্রভুপাদ'। তাঁকে দেখে প্রমোদভূষণ আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। শ্রীল প্রভুপাদ তার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলেন। প্রমোদভূষণও শ্রীল

প্রভুপাদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলেন। অবশেষে শ্রীল প্রভু পাদ বললেন, ''আমি এখন থেকে এখানেই থাকব, আপনি সময় পেলে মাঝে মধ্যে আসতে পারেন।''

প্রমোদভূষণ বলল, ''আমি নিশ্চয়ই আসব। আমি আপনার শ্রীমুখ-নিঃসৃত হরিকথা শুনে ও আপনার সেবা করে আমার জীবন সফল করতে চাই।'' শ্রীল প্রভুপাদ বললেন, ''শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হলে নিশ্চয়ই হবে।''

পরদিন অফিসের কাজ শেষ করে প্রমোদভূষণ হরিকথা শ্রবণের জন্য শ্রীল প্রভুপাদের কাছে চলে গেল। বহু ভক্তের সমাগম। শ্রীল প্রভুপাদ হরিকথা কীর্ত্তন করলেন। অদ্ভুদ ব্যাপার, প্রমোদভূষণ যেই প্রশ্নগুলো শ্রীল প্রভুপাদকে করবেন বলে ভেবে এসেছিল, শ্রীল প্রভুপাদ হরিকথার মাধ্যমেই সব বলে দিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ যেন অন্তর্য্যামী সূত্রে শ্রীপ্রমোদভূষণের মনের কথা জানতে পেরেছেন। এভাবে যখনই প্রমোদভূষণের মনে কোন প্রশ্নের উদয় হয়, শ্রীল প্রভুপাদ হরিকথার মাধ্যমে তার সব উত্তর দিয়ে দেন। এভাবে প্রমোদভূষণ নিত্য শ্রোতা হয়ে গেল এবং প্রভুপাদের হরিকথার প্রতি তীব্রভাবে আকৃষ্ট হল।

প্রমোদভূষণ শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথার প্রতি এতটাই আসক্ত হয়ে পড়েছিল যে, কোন কিছুই তাকে প্রতি সন্ধ্যায় প্রভুপাদের হরিকথায় যোগদান করা থেকে বিরত করতে পারত না।

একদিন প্রমোদভূষণ অফিস থেকে বাড়ি ফিরল এবং পোষাক পরিবর্তন করল। শ্রীল প্রভুপাদের সান্ধ্যকালীন হরিকথা শ্রবণের জন্য সে জুতো পড়তে যাচ্ছিল, এমন সময় হঠাৎ জুতোর ভিতরে লুকিয়ে থাকা একটা কাঁকড়াবিছা তাকে দংশন করল। কাঁকড়াবিছার কামড় চরম যন্ত্রণাদায়ক। প্রমোদভূষণ যন্ত্রণায় কাতর হয়ে গেল কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা শোনার প্রতি তার আকর্ষণ এত বেশী যে, সেই তীব্র যন্ত্রণাও তাকে বাড়িতে ধরে রাখতে পারল না। তার মাকেও এব্যাপারে কিছু জানালো না। সে দ্রুত মঠের উদ্দেশ্যে রওনা হল। শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথার পারমার্থিক কোমলতা তার সেই তীব্র যন্ত্রণাকে ভুলিয়ে দিল, কিন্তু হরিকথা শেষ হলে, সে আবার তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করতে লাগল। ব্যাথার যন্ত্রণায় প্রমোদভূষণের গৌরবর্ণ রক্তিম বর্ণে পরিণত হলে, শ্রীল প্রভুপাদ প্রমোদভূষণকে জিজ্ঞাসা করলেন, ''আপনার কিছু হয়েছে নাকি?'' প্রমোদভূষণ সমস্ত ঘটনাটিকে লুকানোর জন্য বলল না তেমন কিছু না। শ্রীল প্রভুপাদ ভগবানের প্রিয় পার্ষদ, নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষ। প্রমোদভূষণ নিজেকে লুকালে কি হবে, অন্তর্যামী সূত্রে তিনি সবকিছুই বিস্তারিতভাবে জেনে বললেন, ''কাঁকড়াবিছা কামড়ানোর তীব্র যন্ত্রণা সহ্য করেও হরিকথা শ্রবণের প্রতি আপনার কৌতুহল আমাকে বিস্মিত করছে। এভাবে ভাড়া বাড়িতে থেকে প্রতিদিন এখানে কেন এত কষ্ট করে আসছেন? আপনি আমার সাথে এখানে থাকলেই ভালো হবে। আপনি এখানে থেকেই অফিসে যাতায়াত করুন এবং আপনার পরিবারকে সহায়তা করুন। এখন থেকে আপনি মঠে থেকেই অফিসে যাওয়ার চেষ্টা করুন।'' শ্রীল প্রভুপাদের সেই নির্দেশ প্রমোদভূষণের হৃদয়কে স্পর্শ করল। সে প্রভুপাদের আদেশকে অকপটে স্বীকার করে মনের আনন্দে ভাড়া বাড়িতে ফিরে গেল। সে এতটাই আনন্দিত হল যে সেই তীব্র যন্ত্রণার কথা ভুলে গেল।

মা রামরঙ্গিনী দেবী প্রমোদভূষণকে দেখে আশ্চর্য হলেন। তিনি বললেন, ''আমার মনে হয়, আজ তোমার কিছু হয়েছে। পরম আনন্দে তোমার

মুখ উজ্জ্বল হয়ে গেছে, আবার মনে হচ্ছে তুমি কিছু একটা শারীরিক কষ্টও অনুভব করছ।" তখন প্রমোদভূষণ তার মাকে কাঁকড়াবিছার ঘটনাটি জানালো। শুনে রামরঙ্গিনীদেবী আশ্চর্য হয়ে গেলেন, "আজ এ আমি কি দেখছি, মনে হয় তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে। তখন আমার কী হবে?" প্রমোদভূষণ উত্তর দিল, "মা! এই জগতে আমরা কেউই রক্ষাকর্ত্তা নই; সবার মালিক কৃষ্ণ। শুধুমাত্র তিনিই পারেন আমাদেরকে রক্ষা করতে। অস্থির বা চিন্তিত হয়ো না। কাঁকড়াবিছার যন্ত্রণা কমানোর জন্য কি করতে হবে তাই বলো? রামরঙ্গিনী দেবী সে সময়ের প্রচলিত ওষুধ দিয়ে তার যন্ত্রণা প্রশমন করল। পরদিন সকালে সে পুরোপুরি সুস্থ অনুভব করল।

সে প্রতিদিনের মতোই স্বাভাবিকভাবে অফিসে গেল এবং অফিস থেকে মঠে হরিকথা শ্রবণ করতে গেল। শ্রীল প্রভুপাদ তাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, "কবে থেকে আপনি মঠে থেকে অফিসের কাজে যাওয়ার কথা ভাবছেন?" প্রমোদভূষণ বলল, "প্রভুপাদ! মাকে গঙ্গানন্দপুর গ্রামে পৌঁছিয়ে দিয়ে যত শীঘ্র সম্ভব আমি আপনার নিকট চলে আসব।"

একদিন প্রমোদভূষণকে চিন্তিত দেখে মা রামরঙ্গিনী দেবীর মনে সন্দেহ হল। তিনি প্রমোদভূষণকে জিজ্ঞাসা করলেন আজ তোমাকে অন্যরকম লাগছে কেন? তখন প্রমোদভূষণ শ্রীল প্রভুপাদের প্রস্তাবটি তার মাকে জানাল। সেই সংবাদটি যেন মায়ের হৃদয়ে ত্রিশূল বিদ্ধ হওয়ার মতো আঘাত করল।প্রমোদভূষণ বলল, "মা! আমি ভেবেছি দুর্গা পূজার পর এই ভাড়া বাড়িটা ত্যাগ করব এবং গৌড়ীয় মঠে থাকব।" মায়ের দুঃশ্চিন্তা হল, যদি প্রমোদভূষণ প্রভুপাদের সঙ্গে সবসময় থাকে, তাহলে একদিন সেও গৈরিক বসন পরিধান করে আমাদেরকে চিরকালের মতো ত্যাগ করবে। কে আমাদের এই দরিদ্র পরিবারকে দেখাশোনা করবে?" এসব চিন্তা করে, তিনি কাঁদতে লাগলেন।

অপরদিকে প্রমোদভূষণ শ্রীল প্রভুপাদের নিত্য সঙ্গ পাবার আশায় পরম আনন্দের সাগরে ভাসতে থাকলো। তবে জন্মদাত্রী মায়ের দুঃখের কথা ভেবে সেও দুঃখ অনুভব করল।

দুর্গাপূজা শুরু হতে চলেছিল। দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান মায়ের হৃদয়ে প্রমোদভূষণের জন্মের সুমিষ্ট স্মৃতি জাগরিত করল। জন্মদিনের স্মৃতি আনন্দ দিলেও মা রামরঙ্গিনী দেবী চিন্তা করছিলেন যে, হয়ত ভগবান তার প্রিয় পুত্রকে তার থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবেন। এই চিন্তায় তিনি অনবরত কাঁদতে থাকলেন। তিনি বুদ্ধিমতী ছিলেন। তাই তিনি প্রমোদভূষণকে বাড়িতে বন্দী করার উপায় খুঁজতে শুরু করলেন। তিনি ভাবলেন, যদি প্রমোদভূষণকে বিবাহের বন্ধনে বিজড়িত করা যায়, তাহলে সে এই মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাবে এবং পরিবারকে ত্যাগ করে গৈরিক বসন পরিধান করতে পারবে না। তাই একদিন তিনি প্রমোদভূষণকে বললেন, "তুমি গৌড়ীয় মঠে থেকে অফিসের কাজ করবে এটা ভালো কথা কিন্তু আমার একটা অনুরোধ আছে।"

প্রমোদভূষণ আনন্দ সহকারে জিজ্ঞাসা করল, "বল মা, কি তোমার অনুরোধ?" মা বললেন, "প্রথমে, তুমি প্রতিজ্ঞা কর তুমি আমার আদেশ অমান্য করবে না।" সে বলল, "আমার পক্ষে যতটা সম্ভব আমি চেষ্টা করব তোমার আদেশ পালন করতে।" তখন রামরঙ্গিনী দেবী বললেন, "আমি ভাবছি সামনের অগ্রহায়ণ মাসে তোমার বিবাহের আয়োজন করব!"

এই প্রস্তাবটি প্রমোদভূষণের হৃদয়ে তীরের মতো বিঁধল। আবার সে মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছে যে'

সে তার আদেশ পালন করবে। প্রমোদভূষণের কাছে এটা ছিল এক কঠিন পরীক্ষা। সে মাকে কি বলবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না। এমন সময় গীতার একটি শ্লোক তার মনে পড়ে গেল–

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ।।"
(গীতা ১০/১০)

অর্থাৎ আমি আমার ভজনশীল সেবককে বা ভক্তগণকে বুদ্ধিযোগ প্রদান করি যাতে করে তারা আমার সেবা প্রাপ্ত হন।

প্রমোদভূষণ শ্রীল প্রভুপাদের চরণপদ্ম স্মরণ করে তার মাকে বলল, "মা! বিবাহের প্রসঙ্গে তোমার কাছে আমার একটা প্রশ্ন আছে। আগে বল তুমি আমাকে সত্য উত্তর দেবে।" তার মা পুত্র স্নেহে বিগলিত হয়ে বললেন, "হ্যাঁ, আমি তোমায় সত্য বলব।"

প্রমোদভুষণ মাকে জিজ্ঞাসা করল, "মা! তুমি বিবাহ করেছ এবং আমাদেরকে এ'জগতে নিয়ে এসেছ। এখন বল, বিবাহিত জীবনে তুমি কী সুখ লাভ করেছ?" এ কথা শুনে রামরঙ্গিনী দেবীর প্রমোদভূষণকে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ করার আশা ভঙ্গ হল। তিনি প্রমোদভূষণকে স্নেহের বশে আলিঙ্গন করে বললেন, "আমি তোমাকে আর কখনও বিবাহের কথা বলব না। তুমি আমাকে গঙ্গানন্দপুরে রেখে এসো। আমি বুঝতে পেরেছি, তুমি শীঘ্রই আমাদের স্নেহের বন্ধন ত্যাগ করে শ্রীল প্রভুপাদের স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ হবে। সেই দিন আর বেশী দেরী নেই।" প্রমোদভুষণ তার মায়ের কাছ থেকে কাঙ্ক্ষিত আশীর্বাদ গ্রহণ করল।

দুর্গাপূজা অনুষ্ঠানের জন্য প্রমোদভূষণের অফিসে দশ দিনের ছুটি ছিল। সেই সুযোগে ষষ্ঠীর দিন সে মাকে নিয়ে গঙ্গানন্দপুর রওনা হল। বাড়ির প্রত্যেকেই বিশেষ করে ছোটভাই ননীগোপাল তাদেরকে দেখে খুবই আনন্দিত হল। ননীগোপাল ভাবল দশদিন বড় দাদার সাথে আনন্দে কাটাতে পারবে। কিন্তু হায়! কোনভাবে তিনদিন কাটল, বিজয়া দশমীর দিন প্রমোদভূষণ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজের বাহানা করে বাড়ি ত্যাগ করল। উল্টাডাঙ্গা জংশন রোডে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমদ্ ভাগবদ পাঠ শ্রবণ করার তীব্র ইচ্ছায় সে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হল।

শ্রীল প্রভুপাদ ছিলেন সর্বজ্ঞ। প্রমোদভূষণকে দেখামাত্রই তিনি বললেন, "আমি আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করার জন্য আপনাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। এখন থেকে আপনি আমার সাথে এখানে থাকবেন, অফিসের কাজে যোগদান করবেন এবং অবসর সময়ে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সেবা করবেন।"

শ্রীল প্রভুপাদের কথা শুনে প্রমোদভূষণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবায় যোগদানের জন্য পরমানন্দ লাভ করল। সে শ্রীল প্রভুপাদের চরণে দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করে বলল, "আজ থেকে আপনি কৃপা করে আমার সেবার দায়িত্ব নির্দেশ করবেন। আমি খুবই বোকা। আপনার আদেশ এবং নির্দেশ ছাড়া আমি কিভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই মূল্যবান সেবা সম্পাদন করতে পারব?" তখন শ্রীল প্রভুপাদ উত্তর দিলেন, "প্রমোদভূষণ, আপনার জন্য আমি দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করছি। ১৯১৭ থেকে ১৯২১ পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম এবং এখন আমি আপনাকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বৃহৎ মৃদঙ্গের একজন বাদক এর সেবায় নিযুক্ত করার সুযোগ পেয়েছি। যদি আপনি আন্তরিকতার সহিত চেষ্টা করেন, তাহলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় আপনি নিশ্চয়ই তাঁর সেবা করতে পারবেন। যাইহোক, আপনি অফিসের

চাকরীটা করুন আর মা-বাবা এবং পরিবারের সকলকে আর্থিকভাবে সহায়তা করুন।”

প্রমোদভূষণ হাতজোড় করে বিনয়ীভাবে মৃদুস্বরে বলল, “যদি আমি মঠে এভাবে থাকি, তাহলে অন্য ভক্তরা আপত্তি করবেন না?” শ্রীল প্রভুপাদ উত্তর দিলেন, “সেটা আমার দায়িত্ব।” “বিষয় খারাপ নয় কিন্তু যখন জড় বিষয়ের প্রতি আসক্তি বেশী হয়, তখন প্রকৃত সমস্যা শুরু হয়। আপনি মঠে থেকে অফিসের কাজ করবেন; এতে কোন দোষ নেই কিন্তু আপনি যদি জড় কাজে খুব বেশী আসক্ত হয়ে যান, তাহলে সমস্যা।” প্রমোদভূষণ উত্তরে বলল, “প্রভুপাদ! আপনার কৃপায় সবকিছুই সম্ভব।”

মঠের সমস্ত সেবা সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন, তৎসঙ্গে অফিসের কাজ দুটোই শ্রীপ্রমোদভূষণ যথাযথভাবে পালন করতে লাগল। এভাবে দু'বছর কেটে গেল। ১৯২৪ সালে জন্মাষ্টমীর দুই দিন পূর্বে শ্রীল প্রভুপাদ প্রমোদভূষণকে বললেন,—

“কতদিন আর আপনি এই জাগতিক প্রমোদভূষণ হয়ে থাকবেন?” জড় প্রমোদের ভূষণ হলে চলবে না। আগামী পরশু কৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী। ঐ দিন আমি আপনাকে জড় প্রমোদের ভূষণ থেকে পারমার্থিক প্রমোদের ভূষণে ভূষিত করতে চাই।

জন্মাষ্টমীর দিন উপস্থিত। মঠে অনেক ভক্তবৃন্দের আগমন হয়েছে। ঠিক মঙ্গল আরতির পর, শ্রীল প্রভুপাদ প্রমোদভূষণকে বললেন, “আপনি কি প্রস্তুত?” প্রমোদভূষণ বলল, “আপনার কৃপায় আমি প্রস্তুত হতে পেরেছি।” তখন শ্রীল প্রভুপাদ বললেন, আপনি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেছেন, তাই আলাদা করে কোন যজ্ঞ করার প্রয়োজন নেই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমার ঘরে আসুন। একথা বলে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর ঘরে ফিরে গেলেন। মঠের সমস্ত ভক্তবৃন্দ প্রমোদভূষণের দীক্ষানুষ্ঠানের কথা শুনে আনন্দিত হলেন। শ্রীল প্রভুপাদ প্রমোদভূষণকে হরিনাম ও দীক্ষা দিলেন। তার নতুন নাম হল— শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী।

প্রণবানন্দ প্রভু শ্রীল প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করলেন, “আমি কি সেবা করব?” শ্রীল প্রভুপাদ উত্তর দিলেন, “আজ থেকে আপনি কোন জড় আনন্দের যন্ত্র হয়ে থাকবেন না। এই কলমটি গ্রহণ করুন। এখন থেকে আপনি বৃহৎ মৃদঙ্গের সেবায় নিযুক্ত হবেন। বৃহৎ মৃদঙ্গ মানে ভক্তিগ্রন্থ ছাপানোর যন্ত্র। বৃহৎ মৃদঙ্গের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশ করে আপনি তা মানুষের মধ্যে প্রচার করুন। এতে মানুষের প্রকৃত উপকার হবে। লোক পরমানন্দে নিমগ্ন হবে। এই সেবাই আপনাকে প্রকৃত প্রণবানন্দে পরিণত করবে।”

প্রণবানন্দ প্রভুকে এভাবে নির্দেশ দেওয়ার পর, শ্রীল প্রভুপাদ জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনার নতুন গৈরিক বসন কোথায়?” শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশ অনুসারে প্রণবানন্দ প্রভু আগে থেকেই গেরুয়া বস্ত্র প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। তিনি সেটা শ্রীল প্রভুপাদকে দিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ গেরুয়া বস্ত্রটি নিয়ে মন্দিরে গেলেন এবং কৃষ্ণের চরণে স্পর্শ করিয়ে শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের হস্তে স্পর্শ করিয়ে প্রণবানন্দ প্রভুকে দিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী নিষ্ঠার সাথে বৃহৎ মৃদঙ্গ তথা প্রকাশনা বিভাগের দায়িত্ব পালন করতে লাগলেন। এই সেবার জন্য তাঁকে দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করতে হত। তার সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে ১৯২৯ সালের ২৯শে মার্চ নবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভায় তাঁকে ‘প্রত্নবিদ্যালঙ্কার’ উপাধি প্রদান করেন। তার চার বছর পর ১৯৩৪ সালে আবার ‘মহোপদেশক’ উপাধি প্রদান করেন।

১৯৩৬ সালের কার্তিক মাসে শ্রীল প্রভুপাদ

পুরুষোত্তম মঠের চটক পর্বতে একটি গৌরবোজ্জ্বল অন্নকূট গোবর্দ্ধন পূজা উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। সে সময় তিনি ২৫শে অক্টোবর থেকে ৭ই ডিসেম্বর পর্যন্ত চটক পর্বতে অবস্থান করেছিলেন। তারপর তিনি শ্বাসক্রিয়া জনিত সমস্যায় অসুস্থ লীলা প্রকাশ করলে কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু ও অন্যান্য বয়োঃজ্যেষ্ঠ শিষ্যরা শ্রীল প্রভুপাদকে কলকাতার বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীল প্রভুপাদকে ব্যক্তিগতভাবে যত্ন নেওয়ার জন্য দিন রাত ২৪ ঘণ্টাই ভক্তদের বিভিন্ন সময়ে দেখাশোনার দায়িত্ব দিলেন।

সে সময় একদিন প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীল প্রভুপাদের ঘরে ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ ইজি চেয়ারে বসেছিলেন। প্রণবানন্দ প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের চোখে অশ্রু দর্শন করে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘‘শ্রীল প্রভুপাদ! যদি আপনি এই জড়জগৎ ত্যাগ করে চলে যান, তাহলে আমাদের কি হবে? কে আমাদের আশ্রয় দেবে?’’ শ্রীল প্রভুপাদ অশ্রুবিসর্জন করতে করতে বললেন, ‘‘কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ’’। মনে হচ্ছিল, শ্রীল প্রভুপাদ কৃষ্ণের বিরহে কাতর। প্রণবানন্দ প্রভুও ক্রন্দন করতে লাগলেন এবং শ্রীল প্রভুপাদের চরণপদ্ম তাঁর বক্ষে ধারণ করলেন। শ্রীল প্রভুপাদ ক্রন্দন করতে করতে বারংবার ‘‘কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ’’ বলতে থাকলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের কিছুদিন পূর্বে, শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু ও শ্রীল ভক্তি রক্ষক শ্রীধর গোস্বামী মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের ঘরে অবস্থান করছিলেন। হঠাৎ শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তি রক্ষক শ্রীধর মহারাজকে আদেশ করলেন, ‘‘শ্রীরূপ মঞ্জরী পদ কীর্ত্তনটি করুন।’’ শ্রীল শ্রীধর গোস্বামী মহারাজ কীর্ত্তন শুরু করবেন, এমন সময় কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মাঝখানে বাধা দিয়ে বললেন, ‘‘অপেক্ষা করুন, আমি প্রণবকে ডাকছি। তার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর।’’ শ্রীল প্রভুপাদ বললেন, ‘‘আমি শ্রীধর মহারাজকে এই কীর্ত্তনটি করতে বলেছি। আমি প্রণবের সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর পরে শুনব।’’ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের ঘর থেকে বেড়িয়ে প্রণবানন্দ প্রভুর ঘরে গেলেন। তিনি প্রণবানন্দ প্রভুকে বললেন, ‘‘প্রণব, এসো! শ্রীল প্রভুপাদকে কীর্ত্তন শোনাতে হবে।’’ প্রণবানন্দ প্রভু একথা শোনা মাত্রই কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুকে অনুসরণ করলেন এবং শ্রীল প্রভুপাদের ঘরে প্রবেশ করলেন। ঠিক তখনই, শ্রীল প্রভুপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘‘এখন শ্রীধর মহারাজ কীর্ত্তন করুন।’’ তখন শ্রীল শ্রীধর গোস্বামী মহারাজ ‘‘শ্রীরূপ মঞ্জরীপদ’’ কীর্ত্তনটি করলেন। কীর্ত্তনটি শোনার পর শ্রীল প্রভুপাদ প্রণবানন্দ প্রভুর দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘‘প্রণব! তুমি এখন হরি হে দয়াল মোর জয় রাধানাথ কীর্ত্তনটি কর।’’ প্রণবানন্দ প্রভু সুমিষ্ট স্বরে কীর্ত্তনটি করলেন। কৃষ্ণের সাথে মিলিত হওয়ার এই তীব্র আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ কীর্ত্তনটি শোনার পর উপস্থিত ভক্তগণ বুঝতে পারলেন যে, শ্রীল প্রভুপাদ খুব শীঘ্রই তাদেরকে ছেড়ে গোলোক বৃন্দাবনে চলে যাবেন।

শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারীকে প্রতিরাত্রে শ্রীল প্রভুপাদের সেবায় নিয়োজিত করেছিলেন। একহাতে তালপাতার পাখা দিয়ে হাওয়া করতে হত আর অন্য হাতে শ্রীল প্রভুপাদের নাকে অক্সিজেনের ফানেল ধরে থাকতে হত। ১৯৩৭ সালের ১লা জানুয়ারী ভোরবেলা (৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত) প্রণবানন্দ প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। তারপর শ্রীল প্রভুপাদের ব্যক্তিগত সেবক কৃষ্ণানন্দ প্রভু এই সেবা

করার জন্য শ্রীল প্রভুপাদের ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন প্রণবানন্দ প্রভু পাশের ঘরে তাঁর শয়নকক্ষে গিয়ে বিছানায় বসলেন। তিনি ভাবছিলেন, ‘‘শ্রীল প্রভুপাদ এ জগত থেকে চলে গেলে কী হবে?’’

কয়েক মিনিটের মধ্যে কৃষ্ণানন্দ প্রভু প্রণবানন্দ প্রভুর ঘরে প্রবেশ করে বললেন, ‘‘প্রণব! সব শেষ।’’ এটা ছিল ১৯৩৭ সালের ১লা জানুয়ারী ভোর ৫টা ৩০ মিনিট। বাগবাজার গৌড়ীয় মঠের সমস্ত ঘড়িগুলি ঠিক ৫টা ৩০ মিনিটেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। গৌড়ীয় মঠের দীপ্তিমান সূর্য অস্তমিত হয়ে গেল। সমগ্র জগত অভাবনীয় অন্ধকারে পর্যবসিত হল।

তারপর শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রাকৃত শ্রীঅঙ্গ বিশেষ ট্রেনে করে শিয়ালদা থেকে ধুবুলিয়া স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হল। সমগ্র ট্রেনে শুধু ভক্তরাই ছিলেন এবং তারা মহামন্ত্র কীর্ত্তন করছিলেন। ধুবুলিয়া স্টেশন থেকে শ্রীল প্রভুপাদের চিন্ময় শ্রীঅঙ্গ মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠে নিয়ে যাওয়া হল। এক বিশাল শোভাযাত্রা। কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর নির্বাচন অনুযায়ী শ্রীল ভক্তি গৌরব বৈখানস গোস্বামী মহারাজ, শ্রীল ভক্তি রক্ষক শ্রীধর দেব গোস্বামী মহারাজ এবং প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি কার্য সম্পন্ন করলেন। শ্রীল ভক্তিবিচার যাযাবর গোস্বামী মহারাজ শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুরের লিখিত বিরহ গীতি ‘‘যে আনিল প্রেমধন’’ কীর্ত্তনটি করলেন। বিরহ কাতর ভক্তবৃন্দ শ্রীল প্রভুপাদের অদর্শনে ক্রন্দন করতে থাকলেন। আজ বহির্দৃষ্টিতে সকলেই তাদের অভিভাবককে হারিয়েছেন। সেখানে এক হৃদয়স্পর্শী ভক্তিপূর্ণ পরিবেশ অবস্থান করছিল।

শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি অনুষ্ঠান ও বিরহ উৎসব পালিত হওয়ার পর প্রণবানন্দ প্রভু বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে ফিরে আসেন। অনন্ত বাসুদেব প্রভু ও সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুর তত্ত্বাবধানে ‘গৌড়ীয়’ পত্রিকা প্রকাশনার সেবা চালিয়ে যেতে থাকেন। সেই সময় অনন্ত বাসুদেব প্রভু অর্থাৎ ভক্তিপ্রসাদ পুরী দাস ঠাকুরের শিষ্য অনন্ত দাস (পরবর্তীতে রাধাকুণ্ডের মহান্ত হয়েছিলেন) প্রণবানন্দ প্রভুকে প্রকাশনা সেবায় সহায়তা করতেন। শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় তারা অনেক ভক্তিমূলক গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। ভগবদ্ ইচ্ছায় মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের নিমিত্ত ঐ সময় আচার্য্যের বঞ্চনা লীলাকে কেন্দ্র করে নিজেকে কোন বিবাদের মধ্যে না জড়িয়ে প্রণবানন্দ প্রভু ১৯৩৯ সালে শান্তিপূর্ণভাবে বাগবাজার গৌড়ীয় মঠ থেকে অন্যত্র চলে গেলেন।

প্রণবানন্দ প্রভু শ্রীল ভক্তি হৃদয় বন গোস্বামী মহারাজ ও সাধিকানন্দ প্রভুর (শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজের) সাথে মিলিত হলেন। দক্ষিণ কলকাতার টালিগঞ্জের চারু এভিনিউ-এ একটি ভাড়া বাড়িতে তিন জনে থাকতে শুরু করলেন। তারা বিভিন্ন গৃহস্থ বাড়িতে প্রচার করতেন এবং ভিক্ষা করে যা অর্থ সংগ্রহ হত তাই দিয়ে ভাড়া বাড়িতে থেকে সাধন ভজন করতেন। একদিন তারা এক বিধবা মহিলার বাড়িতে হরিকথা পরিবেশন করতে গিয়েছিলেন। সেই বিধবা মহিলার ঘরে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ ছিল। তারা লক্ষ্য করলেন যে, রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ আলমারীতে রাখা আছে কিন্তু সেবা-পূজা করা হয় না। এত অপূর্ব বিগ্রহ দর্শন করে, প্রণবানন্দ প্রভু ঐদিন ঐ রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের সেবা করেছিলেন এবং শ্রীল বন গোস্বামী মহারাজ হরিকথা পরিবেশন করেছিলেন। তারপর একদিন সূর্যোদয়ের পূর্বে তাদের ভাড়া বাড়ির দরজায় ঠক্‌ঠক্ শব্দ শোনা গেল। দরজা খোলার পর দেখা গেল সেই বিধবা মহিলা রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ হাতে





নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি বললেন, ''গতরাত্রে এই বিগ্রহ তাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বলেছেন, যদি তুমি তোমার পরিবারকে বিপদের হাত থেকে বাঁচাতে চাও, তাহলে সূর্যোদয়ের আগেই আমাদেরকে (বিগ্রহকে) প্রণবানন্দ প্রভুর হাতে সমর্পণ কর। তাই স্বপ্নাদেশের পর, আমি জেগে উঠে বিগ্রহ দুটি আপনাকে দিতে এসেছি। আপনি কৃপাপূর্বক গ্রহণ করে আমার পরিবারকে রক্ষা করুন।'' প্রণবানন্দ প্রভু আশ্চর্য হয়ে চিন্তা করলেন, ''ভগবান কত কৃপাময়!'' তিনি আনন্দ সহকারে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ গ্রহণ করে ভগবানের কৃপা স্মরণ করতে করতে বিগ্রহের নাম দিলেন 'শ্রীরাধা গোপীনাথ'। প্রণবানন্দ প্রভু আনন্দের সহিত সেই বিগ্রহের সেবা করতে লাগলেন।

১৯৪০ সালে শ্রীল বন মহারাজ বিদেশে প্রচারে গেলে শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী যশোর গঙ্গানন্দপুর গ্রামে ফিরে যান। সেখানে মদনমোহন ঠাকুর বাড়িতে থেকে মদনমোহনের সেবাপূজা করতে থাকেন। সেখানে থাকা কালে তিনি 'শ্রীগোপীনাথ বিজ্ঞাপ্তি নামে একটি দীর্ঘ কীর্তন রচনা করেন। তারপর বিভিন্ন গুরুভ্রাতাদের মঠে ভ্রমণ করেন। ১৯৪৫ সালের ২৯শে জানুয়ারী তাঁর মা দেহত্যাগ করেন।

প্রণবানন্দ প্রভু তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন যে, ১৯৩৩ সালে ভুবনেশ্বরের ত্রিদণ্ডী গৌড়ীয় মঠে শ্রীল প্রভুপাদ তাকে সন্ন্যাস দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়নি। ১৯৪২ সালে শ্রীল প্রভুপাদ প্রণবানন্দ প্রভুকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে তাঁকে সন্ন্যাস মন্ত্র প্রদান করেছিলেন। পরের দিন সকালে তিনি সেই মন্ত্র ডায়েরিতে লিখে রাখেন। ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রণবানন্দ প্রভু নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমায় অংশ নেওয়ার জন্য সতীর্থদের সাথে নবদ্বীপ ধামে এসেছিলেন। পরিক্রমার সময় উনি সেই স্বপ্নের কথা সতীর্থদের কাছে প্রকাশ করলেন।

১৯৪৭ সালের ৩রা মার্চ আমলকী একাদশী তিথিতে, শ্রীপ্রণবানন্দ প্রভু শ্রদ্ধেয় সতীর্থ শ্রীল ভক্তিগৌরব বৈখানস গোস্বামী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁর সন্ন্যাস নাম হয় শ্রীল ভক্তি প্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ। শ্রীল ভক্তি প্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের সতীর্থ শ্রীল সৎপ্রসঙ্গানন্দ দাস ব্রহ্মচারী (সতীশ প্রভু) শ্রীল প্রভুপাদের আদেশানুসারে শ্রীশ্রী গৌরগদাধর বিগ্রহের সেবা লাভ করেছিলেন। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণের সময় ত্রিদণ্ড বানানো এবং অন্যান্য আয়োজনে সহায়তা করেছিলেন। প্রত্যেকেই এই শুভ অনুষ্ঠানে আনন্দিত হয়েছিলেন।

''পতিতানাং সমুদ্ধারে যতিবেশধরায় বৈ।
প্রচারাচারকার্য্যে চ জাগরূকায় সর্বদা।''

আমরা শ্রীল পুরী গোস্বামী মহারাজের প্রণাম মন্ত্র থেকে জানতে পারি যে, তিনি এজগতের পতিত জীবদের উদ্ধার করার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করতে তাঁর অনবদ্য ভজন ও প্রচার সর্বদা সক্রিয় ছিল। ১৯৯৩ সালে শ্রীল ভক্তি দর্শন আচার্য্য গোস্বামী মহারাজ, শ্রীল ভক্তি প্রমোদ পুরী মহারাজের প্রণাম মন্ত্র রচনা করেছিলেন। শিষ্যগণ ওনাকে 'ঠাকুর' বলে সম্বোধন করেন।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীল ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর কিছুদিন শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের উদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে অবস্থান করেন। তারপর তিনি শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ তথা শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান

যোগপীঠ মন্দিরে সেবা করেন। তিনি প্রায়শই বলতেন,--"**কুঞ্জবাবুর আশির্বাদ ছাড়া কেউ শ্রীল প্রভুপাদের কুঞ্জ সেবা লাভ করতে পারবে না।**" যোগপীঠে ৭ বছর সেবা করার পর তিনি শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজকে যথাযথ সম্মান জানিয়ে বিনীতভাবে যোগপীঠ মন্দির থেকে অম্বিকা কালনা যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

অম্বিকা কালনায় গিয়ে শ্রীল ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর প্রথমে ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। পরে শ্রীঅনন্ত বাসুদেব মন্দিরের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। কালনায় অবস্থানকালে শ্রীল ভক্তি প্রমোদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর মন্দিরের বারান্দাতেই থাকতেন এবং দিনে তিনবার পাঠ করতেন। কিছুদিন পর তিনি লক্ষ্য করলেন যে, হরিকথা শ্রবণ করতে আসা শ্রোতারা অধিকাংশই হল বৃদ্ধ ও অল্প সংখ্যক বিধবা মহিলা। তিনি অনুভব করলেন এভাবে অবস্থান করলে তিনি শ্রীল প্রভুপাদ কর্তৃক প্রদত্ত বৃহৎমৃদঙ্গের সেবা আদৌ করতে পারবেন না এবং শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা ও বাণীকে জগতে প্রচার করা সম্ভব হবে না। ১৯২৪ সালে দীক্ষামন্ত্র পাওয়ার সময় শ্রীল প্রভুপাদ তাঁকে বিভিন্ন প্রবন্ধ লেখা, সম্পাদনা করা, প্রুফ্ সংশোধন করার আদেশ করেছিলেন। ভগবদ্ ইচ্ছায় ১৯৬১ সালে শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজ শ্রীল পুরী গোস্বামী ঠাকুরকে তাঁর মঠে থেকে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রকাশনা বিভাগের নেতৃত্ব দেওয়ার প্রস্তাব দেন এবং শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে থেকে প্রচার কার্যে সহায়তা করার জন্য অনুরোধ করেন। শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছা বা আদেশকে অবিরত পরিপূরণ করার পরবর্তী ধাপ হিসাবে তিনি শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের প্রস্তাবকে গ্রহণ করার কথা ভাবতে থাকেন।

শ্রীল পুরী গোস্বামী ঠাকুর অনন্ত বাসুদেব মন্দিরের সমস্ত বৈধ দলিল তাঁর ছোট ভাই ননীগোপালের নামে প্রস্তুত করে তাঁকে মন্দিরের সেবার দায়িত্ব দেন। তখন থেকে ননীগোপাল তাঁর পুরো পরিবারের সাথে মায়াপুর থেকে কালনায় এসে কালনা মন্দির দেখাশোনা করতে শুরু করেন। ১৯৬২ সালে শ্রীল পুরী গোস্বামী ঠাকুর কলকাতায় শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের প্রতিষ্ঠিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে যোগদান করেন। তিনি শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রকাশনা বিভাগের নেতৃত্ব দিতেন এবং বিভিন্ন সময় শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের সাথে প্রচার অনুষ্ঠানে যোগদান করে তাঁকে সহায়তা করতেন।

শ্রীল ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরকে তৃণাদপি শ্লোকের মূর্ত্ত বিগ্রহ বলা হত। তবে তিনি বৈষ্ণব অপরাধের বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। এমনি একটি ঘটনা—

একসময় শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজ, শ্রীল পুরী গোস্বামী ঠাকুর এবং শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের শিষ্য যজ্ঞেশ্বর প্রভু (গোবিন্দ মহারাজ) ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা সমাপন করে হাওড়া স্টেশনে এসে উপস্থিত হলেন। তিনজনে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করলেন, মালপত্র ভরলেন এবং কালিঘাট শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। এক বিশাল সংকীর্ত্তন দল তাঁদের স্বাগত জানানোর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজ মিটারে নির্ধারিত ভাড়া অনুযায়ী ট্যাক্সি ড্রাইভারকে সেই ভাড়া শোধ করে ট্যাক্সি থেকে নামলেন । এমন সময়, ট্যাক্সি চালক শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজকে লক্ষ্য করে অপশব্দ বলতে লাগলেন। তার কারণ সে মালপত্রের জন্য কিছু অতিরিক্ত অর্থ আশা করেছিল। সকলে জানতেন, শ্রীল পুরী গোস্বামী ঠাকুর শিক্ষাষ্টকের তৃতীয় শ্লোকের প্রতিমূর্ত্তি ।

কিন্তু ট্যাক্সি চালকের কথা শুনে তিনি চীৎকার করে বললেন, ''এই, এনাকে বের কর।'' সংকীর্ত্তন দলের সমস্ত ভক্তরা শ্রীল পুরী গোস্বামী ঠাকুরের সুউচ্চ কণ্ঠস্বর শ্রবণ করে এগিয়ে এলেন। তিনি তাদেরকে বললেন, ''ট্যাক্সি চালককে গাড়ি থেকে বের কর এবং শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করতে বল। সে বৈষ্ণব অপরাধ করেছে। যদি সে ক্ষমা না চায়, তাহলে সে নরকে যাবে।'' সমস্ত ভক্তরা ট্যাক্সি চালককে টেনে বের করল। এত ভক্তদের দেখে সে ভয় পেয়ে গেল। সে তার ভুল বুঝতে পারল এবং শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করল। এই ঘটনা দেখিয়েছিল যে, শ্রীল পুরী গোস্বামী ঠাকুর কোমল স্বভাবের হলেও কখনো কখনো বজ্রের মতো কঠিনও হতে পারেন। তিনি সর্বদা কোমল স্বভাবের ছিলেন; কিন্তু যদি কেউ বৈষ্ণব অপরাধ করে, তাহলে তিনি তা সহ্য করতেন না।

১৯৮৬ সালে বিভিন্ন ভক্ত; বিশেষ করে গুরুভ্রাতা শ্রীমদন মোহন প্রভুর বিশেষ অনুরোধে শ্রীল ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর মায়াপুরে শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে খুবই সামান্য জায়গা নিয়ে শুরু হয়। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে মঠের কলেবর বৃদ্ধি পায়। এরপরে কলকাতা, বৃন্দাবন এবং পুরীতেও শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে বিশ্বের বহু দেশে শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের শাখা রয়েছে।

মায়াপুরের একটি অলৌকিক ঘটনা--

চন্দন যাত্রা অনুষ্ঠান চলাকালীন মায়াপুরে অত্যধিক গরম ছিল। সে সময় না এয়ার কণ্ডিশানার ছিল, না সিলিং ফ্যান চলার জন্য যথাযথভাবে বিদ্যুৎ থাকত। একদিন সকালে, শ্রীল পুরী গোস্বামী ঠাকুর ওনার ঘরে ধ্যানস্থ হয়ে আহ্নিক গায়ত্রী জপ করছিলেন। হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে ক্রোধিত হয়ে বললেন, ''এখন মন্দিরে পূজারী কে আছে? এখনই তাকে ডাক।'' পূজারী মন্দিরের ভিতরে ছিল। তিনি বিগ্রহের বস্ত্র পরিবর্তন করছিলেন''। শ্রীল পুরী গোস্বামী ঠাকুরের ডাক শুনে পূজারী তৎক্ষণাৎ মন্দির থেকে নেমে এসে শ্রীল পুরী গোস্বামী ঠাকুরের ঘরে গেলেন। শ্রীল পুরী গোস্বামী ঠাকুর উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, ''তুমি কি মনে কর আমার বিগ্রহ কাঠের পুতুল? কেন তোমার বাম হাতের কনুই দিয়ে গদাধরকে আঘাত করেছ?'' পূজারী স্তম্ভিত। তিনি আরও বললেন, ''যদি তুমি সত্যই এই ত্যক্তাশ্রমীর জীবন কাটাতে চাও, তাহলে এখনই গদাধরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নাহলে তোমাকে অবশ্যই দুর্দশাগ্রস্ত জড় জীবনে প্রবেশ করতে হবে।'' পূজারী একটি শব্দও উচ্চারণ করলেন না। তিনি ভীত হয়ে শ্রীল পুরী গোস্বামী ঠাকুরের ঘর থেকে বেড়িয়ে গেলেন। পূজারী চলে যাওয়ার পর ভক্তরা অনুসন্ধিৎসু হয়ে শ্রীল পুরী গোস্বামী ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, ''গুরুদেব! মন্দিরের দরজা জানালা সব বন্ধ। আর ভিতরে তো পূজারী ছাড়া কেউ ছিল না। তাহলে এই ঘটনা আপনি কিভাবে জানলেন?'' শ্রীল পুরী গোস্বামী ঠাকুর উত্তর দিলেন, ''বাবা! গদাধর নিজে আমার কাছে এসে অভিযোগ করেছে, নাহলে আমি জানব কিভাবে? আমি বৃদ্ধ এবং পঙ্গু। আমার ৯৭ বছর বয়স। তোমরা সবাই ভাবছ আমি এখানে বসে আছি আর তোমরা যা ইচ্ছা তাই করবে। ভগবান আমাকে প্রতিটি বিষয়ে অবগত করান। এজন্য ভগবানের সেবায় কোন ভুল ত্রুটি আছে কিনা নিশ্চিতভাবে জানবে। যদি কোন ভুল হয়ে যায় তাহলে সর্বনাশ

হয়ে যাবে। আমি এখানে সশরীরে থাকি বা না থাকি, আমি সর্বক্ষণ মায়াপুর মন্দিরেই থাকব। তোমরা এর লক্ষণগুলি ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারবে।"

আরও একটি অলৌকিক ঘটনা –

মে ১৯৮২। শ্রীল ভক্তি প্রমোদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপায় তাঁর এক শিষ্যার মাত্র ২২ বছর বয়সে বিবাহ হয়। বিবাহের প্রায় ছয়মাস পর ১৯৮২ সালের নভেম্বর মাসে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ডাক্তার পরীক্ষা করে বলেন 'ব্লাড ক্যান্সার' এবং রোগীকে তিন সপ্তাহের বেশী বাঁচানো যাবে না। সেই অসুস্থ শিষ্যা শ্রীল গুরুদেবের প্রতি উৎসর্গীকৃত ছিলেন। তাই শরীর ত্যাগ করার আগে জীবনের শেষ কয়েকদিন শ্রীল গুরুদেবের চরণামৃত পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ডাক্তারের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী, প্রস্তাবিত দিনের দু'সপ্তাহ আগে তিনি কলকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীল পুরী গোস্বামী ঠাকুরের কাছে এলেন। সেসময় শ্রীল পুরী গোস্বামী ঠাকুর সকালের জপ, শ্রীবিগ্রহের পূজা ইত্যাদিতে ব্যস্ত ছিলেন। সকাল সাড়ে ১১ টায় পূজা শেষ হলে শ্রীল পুরী গোস্বামী ঠাকুর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার স্বাস্থ্য খুব খারাপ হয়ে গেছে। কি হয়েছে?" তখন তিনি সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। তিনি আরও বললেন, "গুরু মহারাজ! আমি আপনার চরণামৃত চাই। আমি যে কদিন বাঁচব, প্রতিদিন এই চরণামৃত পান করব।" শ্রীল পুরী গোস্বামী ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "মা, রাখে হরি তো মারে কে? মারে হরি তো রাখে কে?" তারপর কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর, মৃদু স্বরে বললেন, "আমি জানি না আমার চরণামৃতে তোমার উপকার হবে কিনা? যদি তুমি সরাসরি কৃষ্ণের চরণামৃত পাও, তাহলে ভালো হবে।" এই বলে তিনি আদেশ দিলেন-- "মা! তুমি বৃন্দাবনে যাও। তিনদিন পরে, কৃষ্ণ কেশীঘাটে আসবেন এবং ভোর তিনটের সময় একটি বিশেষ স্তম্ভের কাছে স্নান করবেন। সে সময় ঐ স্থান থেকে একটি পাত্রে করে কেশীঘাটের জল নিয়ে পান করবে। এটাই কৃষ্ণের সরাসরি চরণামৃত হবে। পরেরদিন দুপুর ১২টার সময় রাধাকৃষ্ণ একসাথে নিধুবনে প্রবেশ করবেন। ঠিক ১২টার পর নিধুবনের প্রবেশ দ্বার থেকে এক চিমটি ধূলো নিয়ে মুখে দেবে। এটাই রাধাকৃষ্ণের সরাসরি চরণধূলি। তারপর শ্রীহরির কৃপার অপেক্ষা কর। যদি তিনি তোমাকে নিতে চান, তাহলে তোমায় চলে যেতে হবে। যদি তিনি তোমাকে রাখতে চান, তাহলে তুমি থাকবে। এই নিয়ে চিন্তা কর না।" তারপর শ্রীল পুরী গোস্বামী ঠাকুর অসুস্থ শিষ্যার মাথায় গঙ্গা জল ছিটিয়ে বিভিন্ন প্রকার বৈদিক মন্ত্র পাঠ করলেন। যাইহোক, সেই শিষ্যা অতি শীঘ্রই সমস্ত আয়োজন করে বৃন্দাবন চলে গেলেন এবং শ্রীল পুরী গোস্বামী ঠাকুরের নির্দেশ অনুসরণ করলেন। অলৌকিক ভাবে তিনি অতি শীঘ্রই সুস্থ হয়ে গেলেন। তার ক্যানসার ভালো হয়ে গেল। এখনও পর্যন্ত তিনি সুস্থ আছেন।

আমরা জানি, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন-- "আপন ভজন কথা না কহিবে যথা তথা," তথাপি শ্রীল পুরী গোস্বামী ঠাকুর তাঁর প্রিয় ভক্তের জীবন বাঁচানোর জন্য রাধাকৃষ্ণের লীলা প্রকাশ করেছিলেন।

"যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দসুখ।।"

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ৯/২৪০)

১৯৯৪ সালে শ্রী চৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বাৎসরিক উৎসব চলাকালীন বোলপুর থেকে সুধীর পাঁজা নামক এক বিখ্যাত জ্যোতিষী এসেছিলেন। উনি






শ্রীল ভক্তি দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের শিষ্য ছিলেন। শ্রীল নয়নানন্দ দাস বাবাজী মহারাজ ও শ্রীল ভক্তি দর্শন আচার্য্য মহারাজ শ্রীল পুরী গোস্বামী ঠাকুরের ভজন কুটীরে উপস্থিত ছিলেন। তখন সুধীর পাঁজা গুরুদেব শ্রীল ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের হাতের তালু দর্শন করে বললেন, "মহারাজ! আপনার ৭০ বছর বয়সে দেহ ত্যাগ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এখন আপনার ৯৬ বছর বয়স। এটা কিভাবে সম্ভব তা আমি বুঝতে পারছি না। আপনার ইচ্ছামৃত্যু আছে।" তখন ভক্তরা সকলে আশা করেছিলেন যে, প্রভু জগন্নাথ অ্যাসবেস্টের চাল থেকে তার সুরম্য মন্দিরে স্থানান্তর হওয়া পর্যন্ত গুরুদেব হয়তো প্রকটলীলা করবেন।

১৯৯৯ সালের ২৭ শে এপ্রিল ভোর ৩ টের সময় শ্রীল পুরী গোস্বামী ঠাকুর তাঁর অনুগত শিষ্যদেরকে দিব্য শ্রীঅঙ্গ সেবায় নিয়োজিত করার জন্য অসুস্থলীলাভিনয় প্রকাশ করলেন।

১৯৯৯ সালের ২২শে নভেম্বর রাত্রি ২টো ১০ মিনিটে রাসপূর্ণিমার আগের দিন চতুর্দশী তিথিতে তিনি নিত্যলীলায় প্রবেশ করলেন। মনে হয় তিনি রাধাগোপীনাথের রাসলীলায় প্রবেশের জন্য সঠিক সময়ের অপেক্ষা করছিলেন, গোলক বৃন্দাবনে নিত্য স্বরূপে তাঁর নিত্যসেবা পুষ্পচয়ন করে ললিতা দেবীকে অর্পণ করার নিমিত্তে ঐ রাসপূর্ণিমার পূর্বরাত্রে সকলকে তাঁর সাক্ষাৎ দর্শন থেকে বিরত করলেন।"

পুরীধামের ভক্তগণ তাঁর শ্রীঅঙ্গ মায়াপুর নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করলেন। গোপীনাথ খুঁটিয়া শ্রীল পুরী গোস্বামী ঠাকুরের জন্য জগন্নাথের মালা ও ধ্বজা নিয়ে এলেন। গোপীনাথ খুঁটিয়ার বাবা, হনুমান খুঁটিয়াকে শ্রীল প্রভুপাদ নিজে গৌড়ীয় মঠের পাণ্ডা হিসাবে নিয়োজিত করেন। শ্রীল পুরী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গ পুরী থেকে মায়াপুর নিয়ে যাওয়ার জন্য শ্রীল ভক্তি প্রপন্ন দামোদর গোস্বামী মহারাজের শিষ্য ললিত প্রভু একটি গাড়ি ভাড়া হিসাবে দিলেন। অসংখ্য ভক্তগণ ও স্থানীয় বাসীন্দারা শ্রীল পুরী গোস্বামী ঠাকুরকে শেষবার দর্শন করতে এলেন। তারপর তাঁর পবিত্র শ্রীঅঙ্গ পুরীর সমুদ্রে নিয়ে যাওয়া হল এবং সেখান থেকে বালি সংগ্রহ করা হল। তাঁর শ্রীঅঙ্গ হরিদাস ঠাকুরের সমাধিতে নিয়ে গিয়ে পরিক্রমা করানো হল। তারপর ওনাকে ওখান থেকে জগন্নাথ মন্দিরের কাছে নিয়ে গিয়ে পতিতপাবন জগন্নাথ দর্শন করানো হল। সেখান থেকে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব স্থানে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে কৃষ্ণকেশব প্রভু অর্থাৎ শ্রীল পুরী গোস্বামীর গুরুভ্রাতা তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করলেন। তারপর ভক্তগণ শ্রীল পুরী গোস্বামী ঠাকুরের অপ্রাকৃত শরীর নিয়ে মায়াপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। রাস্তা খারাপ হওয়ার জন্য গাড়িটি পরদিন সূর্যোদয়ের পূর্বে মায়াপুর পৌঁছালো। প্রথমে শ্রীল পুরী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গ শ্রীচৈতন্য মঠে নিয়ে যাওয়া হল। ঠিক তখনই মঙ্গল আরতি শেষ হয়েছিল। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ- গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর দর্শন করিয়ে, শ্রীল গৌর কিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি এবং শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিতে নিয়ে যাওয়া হল। শ্রীচৈতন্য মঠের ভক্তগণ শ্রীল প্রভুপাদের প্রসাদী মালা শ্রীল পুরী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে অর্পণ করলেন। তারপর মহাপ্রভুর জন্মস্থান যোগপীঠ মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়। পূজারী মহাপ্রভুর প্রসাদী মালা গুরুদেবের শ্রীঅঙ্গে অর্পণ করলেন। সকল ভক্তবৃন্দ ক্রন্দন করতে লাগলেন কারণ এটা ছিল শ্রীল গুরুদেবের শেষ দর্শন। সমস্ত মঠের ভক্তগণ তাদের শ্রদ্ধা

নিবেদন এবং গুরুদেবের শ্রীঅঙ্গে মাল্যদান করেন। তারপর শ্রীল পুরী গোস্বামী ঠাকুরকে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেও ভক্তগণ প্রসাদী মালা অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শেষ পর্যন্ত, ভক্তগণ শ্রীল পুরী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গ শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠে নিয়ে আসেন।

গুরুদেবকে শেষবার দর্শন করার জন্য অসংখ্য ভক্তগণ শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। শ্রীল পুরী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গ শ্রীশ্রীরাধা-গোপীনাথকে পরিক্রমা করিয়ে নাট্য মন্দিরে রাখা হয়। ভক্তগণের ক্রন্দন ধ্বনিতে এক হৃদয় বিদারক পরিবেশ সৃষ্টি হল। গুরুদেবের বিরহে কাতর ভক্তগণ ক্রন্দনরত অবস্থায় হা গুরুদেব! হা গুরুদেব! বলে আর্ত্তনাদ করতে লাগলেন।

সকলে শ্রীল গুরুদেবের সমাধি কার্য সম্পন্ন করার জন্য শ্রীল ভক্তি বিজ্ঞান ভারতী মহারাজের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। শ্রীল ভক্তি বল্লভ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ওনাকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীল ভারতী মহারাজের ফ্লাইট বিলম্বিত থাকায় শ্রীল ভক্তি সর্ব্বস্ব গোবিন্দ মহারাজ সমাধি কার্য শুরু করেন। ভক্তগণ সম্মিলিতভাবে বিভিন্ন প্রকার আচার-নিয়ম পালন করতে থাকেন। পুরীর সমুদ্রের বালুকা ও জগন্নাথের প্রসাদী সমস্ত উপকরণ শ্রীল পুরী গোস্বামী ঠাকুরের সমাধিতে অর্পণ করা হয়। সমাধি কার্য সম্পন্ন হয় দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। বিভিন্ন মঠের আচার্য্যগণ সমাধি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

**[বিঃ দ্রঃ ঃ সুধী ভক্তগণ! এখানে অতি সংক্ষেপে শ্রীল ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের জীবনী লিখিত হল। যারা বিশদে জানতে ইচ্ছুক তারা ওনার পূর্ণ জীবনী গ্রন্থ 'দিব্য পারমার্থিক রত্ন' অধ্যয়ন করুন।]**

**।। জয় শ্রীল ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর কি জয়।।**





# প্রাপ্তিস্থান

শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ-শ্রীমায়াপুর, নদীয়া-৭৪১৩১৩,
পঃ বঃ। ফোন-০৩৪৭২ - ২৪৫৩০৭
মো ঃ- ৯৮৫১৪০৪৯১৫

শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠ
(পুরাতন দাউজী মন্দির)
গোপীশ্বর রোড, বৃন্দাবন, মথুরা
পিন-২৮১১২১ (ইউ. পি.)
ফোন-০৫৬৫ -২৪৪৪১৮৫

শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠ
মৌখালী গোপীনাথপুর, (হোটর)
মগরাহাট, জেলা-দক্ষিণ
২৪ পরগণা। ফোন-৯৬৭৪৫২৬০৯২

শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠ
গ্রাম ও পোষ্ট - কানপুর
জেলা-হাওড়া-৭১১৪১০
ফোন- ৯৫৯৩০৬৮৩৫৮

শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠ
রাজহাটী, হুগলী।
মোবাইল- ৯৭৩২৬২৭৫১৫

প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত ওয়ার্ল্ড মিশন্ কেশীঘাট
বৃন্দাবন, মথুরা-২৮১১২১ উত্তর প্রদেশ।

শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠ
গোয়ালাপাড়া রোড, শ্রীমাপল্লী,
পোঃ- পর্ণশ্রী, বেহালা, কলিকাতা-৬০,
পঃ বঃ। ফোন-০৩৩ -২৪০৪২২৭২

শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠ
চক্রতীর্থ রোড, পুরী,
পিন-৭৫২০০২, উড়িষ্যা।
ফোন-০৬৭৫২ -২২৫৬৯০
মো ঃ- ৯০৪০১৪৭৭০৪

শ্রীজগন্নাথ আশ্রম
গ্রাম-বাড় ভগবানপুর (নূনহণ্ড)
পোঃ-পাইকভেরী, থানা-ভগবানপুর
জেলা- মেদিনীপুর, পঃ বঃ
ফোন-০৩২২০-২৭৮৪৫৬

শ্রীঅনন্ত-বাসুদেব মন্দির
শ্যামরায় পাড়া, কালনা জেলা-বর্ধমান,
পঃ বঃ ফোন-০৩৪৫৪-২৫৬০২১
মো ঃ- ৭৫৫১৮৩৩২৯৯

শ্রীশ্রীরাধাগিরিধারী মন্দির
(ভাগবত আশ্রম)
প্রাণকৃষ্ণ চৌধুরী রোড
হাসপাতাল মোড়,
চন্দননগর, জেলা-হুগলী

www.GopinathGaudiyaMath.com